মানসী

ও

মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ—২য় খণ্ড

(ভাদ্র—মাঘ—১৩২৯)

সম্পাদক।

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৯

ষাণ্মাসিক সূচী

(ভাদ্র—মাঘ ১৩২৯)

বিষয়-সূচী

লেখক সূচী

চিত্র পূর্ণপৃষ্ঠা

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
২য় খণ্ড

ভাদ্র, ১৩২৯

২য় খণ্ড
১ম সংখ্যা

চন্দ্রগুপ্ত

[কেবল মাত্র জৈনগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত]

মগধদেশে পাটলিপুত্র নগরে নন্দবংশীয় রাজা রাজ্যশাসন করিতেন। বন্ধু, সুবন্ধু, কুবের ও শাক্তল নামে রাজার চারটি মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শাক্তল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজনীতিজ্ঞ ও উপযুক্ত হওয়াতে অন্য মন্ত্রীরা তাঁহার হিংসা করিতেন। রাজ্য সীমানার কাছে ম্লেচ্ছদের রাজ্য ছিল। একবার ম্লেচ্ছেরা নন্দরাজ্য আক্রমণ করিল। রাজাকে অন্য মন্ত্রীরা বিদেশী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু শাক্তল পরামর্শ দিলেন যে, বিদেশী অর্থলোলুপ সৈন্যদের প্রতি নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত নহে; আক্রমণকারী ম্লেচ্ছেরা কেবল ধনাকাঙ্ক্ষাতে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের ধন দিয়া সন্ধি করুন। রাজা এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া শাক্তলকে সন্ধি করিবার পূর্ণ অধিকার দিলেন। শাক্তলের চেষ্টাতে সত্বর সন্ধি হইল, ম্লেচ্ছেরা দেশে ফিরিয়া গেল; দেশে শান্তি দেখা দিল।

ইহার অল্পকাল পরে রাজা রাজকোষ পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব্বের পূর্ণকোষ শূন্যপ্রায়। কোষাধ্যক্ষকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, মন্ত্রী শাক্তলের আজ্ঞামত অর্থব্যয় করিয়া রাজকোষের এই অবস্থা হইয়াছে। তখন দেশে শত্রু ছিল না, চারিদিকে শান্তি স্থাপিত। রাজারও (অন্য অনেক রাজাদের মত) উদ্ধার লাভ করিবার পর আর বিপদের কথা মনে থাকিত না। তিনি বিপদে সাহায্যকারীর সাহায্য কথা মনে করিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না, অতএব পূর্ব্ব কথা সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কোষ শূন্যপ্রায় দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত

হইলেন ও রাজ কর্ম্মচারীদের আজ্ঞা করিলেন, "মন্ত্রী শাক্তলকে, তাঁহার চারি পুত্র সহ, পাতালের অন্ধকূপ কারাগারে চিরকাল বা অনিশ্চিৎ সময়ের জন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখ, ও সকলের জন্ত প্রত্যহ মাত্র এক মুষ্টি চণক (ছোলা) ও একপাত্র জল দিবে!" রাজাজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইল।

শাক্তল দেখিলেন তাঁহাদের পাঁচজনের জন্ত যে আহারীয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মাত্র একটি প্রাণী অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে পারে। তিনি পুত্রদের বলিলেন, এ আহারীয় ভাগ করিয়া খাইলে একে একে সকলকেই মরিতে হইবে; কিন্তু একজন খাইলে কষ্টে বাঁচিতে পারে। এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিবার মত চতুরতা ও ক্ষমতা আছে বলিয়া যাহার মনে সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সেই একক আহার গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকুক, অন্তেরা অনশনে দেহত্যাগ করুক। পুত্রেরা দেখিল যে, তাহাদের বহুদর্শী, জ্ঞান-বৃদ্ধ পিতার মত চতুরতা বুদ্ধি ও সাহস তাহাদের নাই। অতএব তাহারা খাদ্যগ্রহণ করিল না। বৃদ্ধ শাক্তলই চণক ও জল খাইয়া প্রতিশোধের আশায় বাঁচিয়া রহিলেন। প্রিয় পুত্রদের অনশনে মৃত্যু তাঁহার প্রতিশোধ-স্পৃহা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিল।

শাক্তলের কারাবাসের পর অন্যান্য মন্ত্রীরা ক্ষমতা লাভ করিবার আশায় পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন। ফলে দেশে অশান্তি দেখা দিল। চতুর ম্লেচ্ছরাজ এ শুভ অবসর অবহেলা করিলেন না। তিনি মগধরাজ্য আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা বুঝিতে পরিলেন, তিনি শাক্তলকে কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন। শাক্তল অভাবে রাজ্যরক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। রাজা শাক্তলকে কারাগার হইতে ডাকিয়া, পূর্ব্ব ব্যবহারের উল্লেখ না করিয়াই, সহজ কথায় রাজ্যরক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ম্লেচ্ছদ্বারা রাজ্য নষ্ট হয় শাক্তলেরও সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি রাজাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য ও প্রজা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নানা কৌশলে, যুদ্ধ না করিয়াই ম্লেচ্ছ আক্রমণ নিবারণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলেন। রাজা তাঁহাকে আবার মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু শাক্তল স্বীকৃত হইলেন না। নগরের সামান্য এক রাজ-অতিথিশালার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

প্রকাশ্যে শাক্তল নির্ব্বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি আপন পূর্ব্ব অভিমান ও প্রিয় পুত্রদের অনশনে দেহত্যাগের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। তিনি দিবারাত্র রাজবংশ নির্ম্মূল করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন, অতিথিশালার সম্মুখে মাঠে একটি কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ, একটি একটি করিয়া কুশ শিকড় সহিত তুলিতেছে। তিনি ব্রাহ্মণকে এই-রূপ কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "মাঠে হাঁটিতে এই-কুশ আমার পায়ে ফুটিয়া রক্ত পড়িয়াছে, আমি পৃথিবী হইতে কুশের বংশ নির্ম্মূল করিব।" শাক্তল দেখিলেন, এইরূপ কোপনস্বভাবও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোককে একবার রাজার শত্রু করিতে পারিলে, তাঁহার প্রতিশোধ ক্রিয়া অনেকটা অগ্রসর হয়। তিনি ব্রাহ্মণকে সাদরে আপনার কাছে রাখিলেন, ও অবসর পাইলেই রাজার নানা সত্য ও কল্পিত ও অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, রাজার প্রতি ব্রাহ্মণের যথেষ্ট বিদ্বেষ হইয়াছে, তখন একদিন রাজার আজ্ঞা প্রতিপালনের ভাণ করিয়া ব্রাহ্মণকে মর্ম্মান্তিক অপমান করিলেন। ব্রাহ্মণ এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া, রাজার রাজ্য নাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। শাক্তলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

ইতিহাসে এই ব্রাহ্মণ চাণক্য নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উত্তেজনা ও চেষ্টাতে প্রতিবেশী রাজারা মগধ আক্রমণ করিলেন। নন্দ বংশের আর কেহ জীবিত রহিল না। চাণক্য ও শাক্তল উভয়ে বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিছুকাল রাজ্য করিয়া বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যে আপন পুত্র বিন্দুসার (বিন্দু সাগর) কে অভিষিক্ত করিয়া চাণক্যের সহিত তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। বিন্দুসারও কিছুকাল

রাজত্ব করিয়া আপনার পুত্র অশোককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করিলেন। এই অশোকের একমাত্র পুত্রের নাম কুনাল। কুনাল কৈশোর বা যৌবনে পিতৃ-আজ্ঞায় দুই চক্ষু হারাইয়াছিলেন। কুনালের কথা জৈন লেখকেরা লিখিয়াছেন, বৌদ্ধেরাও লিখিয়াছেন। কিন্তু রাজ-আজ্ঞায় চক্ষু উৎপাটন ছাড়া আর কোনও বিষয়ে উভয়ে মিল নাই।

জৈন লেখকেরা লিখিয়াছেন—কুনাল যখন কিশোরবয়স্ক, তখন একবার অশোক, রাজ্যভার মন্ত্রী কপিলের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে মন্ত্রিপ্রেরিত রাজ্যের সংবাদ পাইতেন ও মন্ত্রীকে সকল বিষয়ে উপদেশ বা আজ্ঞা পাঠাইতেন। তিনি একবার সংবাদ পাইলেন যে কুমার বিদ্যাশিক্ষায় বড় মনোযোগী নহে, তাঁহার জন্য এক নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাজা লিখিলেন, "উপাধ্যায়ায় কুরম্ দত্বা কুমারমন্দম্ অধ্যায়তাম্।" তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে উপাধ্যায় বা শিক্ষককে আহারীয় দিবে, ও কুমারকে (মন্দম্) তাড়া না দিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষা করিতে দিবে। হাতের লেখা পাঠ করা চিরকালই এক বিশেষ বিদ্যা; বিশেষতঃ রাজাদের হাতের লেখা আরও অপাঠ্য হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান মন্ত্রী মহাশয় রাজার আজ্ঞা পাঠ করিলেন, "কুমারম্ অন্ধম্ অধ্যায়তাম্।" এই আজ্ঞা মত তিনি কুমারের দুই চক্ষু গালিয়া দিলেন। রাজা যুদ্ধ জয় করিয়া দেশে আসিয়াই প্রিয় পুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রীকে যে পুরস্কৃত করেন নাই তাহা না বলিলেও চলে। রাজ-আজ্ঞায় মন্ত্রীর চক্ষু দুটি তুলিয়া লওয়া হইল এবং তিনি রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

বৌদ্ধেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন—কিন্তু কতকটা সম্ভব—কাহিনী লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কুমার যখন যুবক, রাজা তখন এক নবীনা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুবতী রাজ্ঞী বয়োবৃদ্ধ রাজা অপেক্ষা যুবক কুমারকেই আপনার যৌবন-তরীর কাণ্ডারী করিবার যোগ্যতর পাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন। কুমার তাঁহার প্রণয় উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজ্ঞী রাজার কাছে কুমারের নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে কুমার তাঁহার প্রণয়প্রার্থী।

অন্ধ কুনাল রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন না। চন্দ্রাননা নাম্নী এক চন্দ্রাননা বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ ও তাহার গর্ভে চন্দ্রগুপ্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশোক বৃদ্ধ বয়সে পৌত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া কুনালকে সঙ্গে লইয়া বনে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। এই চন্দ্রগুপ্তই গ্রীক (১) বর্ণিত Sandracopta বা Sandracoptus।

একবার কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে রাজা চন্দ্রগুপ্ত স্বপ্নে ষোলটি অদ্ভুত ঘটনা দেখিলেন। তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া যখন রাজসভাতে আসিয়া বসিলেন, তখন নগর-উপকণ্ঠের রাজ-উদ্যানের রক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজগুরু পরিব্রাজক-শ্রেষ্ঠ মহামুনি ভদ্রবাহু দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে নগরদ্বারে আসিয়াছেন। রাজা আপন মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যবর্গ লইয়া গুরুদেবের অভ্যর্থনা করিলেন এবং উপযুক্ত বাসস্থান দিয়া গত রাত্রের স্বপ্নের কথা বলিলেন।

[বঙ্গদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন (২) প্রদেশে কোটিকপুর নামে এক নগর ছিল। এই নগরে রাজা পদ্মরথ রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার রাণীর নাম পদ্মশ্রী। রাজপুরোহিতের নাম সোমশর্ম্মা, তাঁহার পত্নীর নাম সোমশ্রী। সোমশ্রীর গর্ভে এক পুত্ররত্ন উৎপন্ন হইল। উদার হৃদয়, বিদ্বান্, জ্যোতিষী পিতা শিশুর কোষ্ঠী বিচার করিয়া জানিতে

(১) এখানে দুইজন চন্দ্রগুপ্তের নাম পাইতেছি। বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্ত ও মুনি চন্দ্রগুপ্ত। গ্রীকের Sandracoptus সিংহাসন লাভ করিবার পূর্ব্বে যবন-বীর সিকন্দরের সহিত কিছুকাল ছিলেন, অতএব বৃদ্ধ চন্দ্রগুপ্তই হওয়া সম্ভব। এখানে জৈন পুস্তকের অনুসরণ করা হইয়াছে।

(২) জেনারাল কানিংহামের মতে আধুনিক পাবনার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল। কিন্তু পরে তিনি আপন মত পরিবর্ত্তন করিয়া বগুড়ার উত্তরে "মহাস্থান" নামক স্থানকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়াছেন। (Arch. Survey Roport XV. pp 104, 110)

পারিলেন যে পুত্র ভবিষ্যতে জৈন ধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ হইবে। তিনি বালকের নাম ভদ্রবাহু রাখিলেন, এবং স্বয়ং জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও জাতকর্ম্ম, উপনয়ন ইত্যাদি সকল সংস্কার ক্রিয়াই জৈন মতে করিলেন। যখন বালক সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, এক দিন অন্য বালকদের সহিত পথে খেলা করিতেছিল, সেই সময়ে জৈনাচার্য্য মহামুনি গোবর্দ্ধন সেই পথে যাইতেছিলেন। বিষ্ণু, নন্দীমিত্র ও অপরাজিত নামক মুনিগণ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। ইঁহারা চারিজনেই শ্রুতকেবলী। ইঁহারা পঞ্চশত শিষ্য সহিত কোটিকপুরে জম্বুস্বামীর সমাধিস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মহামুনি গোবর্দ্ধন বালক ভদ্রবাহুকে দেখিয়াই, তাহার অঙ্গে মহাপুরুষের নানা চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং বালক যে ভবিষ্যতে একজন শ্রুতকেবলী হইবে, তাহাও জানিতে পারিলেন। তিনি বালকের হস্তধারণ করিয়া তাহার পিতার কাছে লইয়া গেলেন। বালককে বিদ্যাদান করিবার জন্য পিতার কাছে চাহিয়া লইলেন। সোমশর্ম্মা হৃষ্টমনে পুত্রদান করিলেন, এবং তিনি যে বালকের জৈনমতে সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। কিন্তু সোমশ্রী, মুনিকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যদি বালক কোনও কালে মুনিব্রত (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে তাহাকে একবার মাতৃদর্শন করিয়া মাতার অনুমতি লইতে হইবে। গোবর্দ্ধন মুনি ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভদ্রবাহুকে লইয়া যাত্রা করিলেন। অক্ষ নামক তাঁহার এক শ্রাবক শিষ্যের গৃহে বালকের বাস ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

গোবর্দ্ধন মুনির শিক্ষার ফলে প্রতিভাবান্ ভদ্রবাহু অল্প সময়েই চতুর্ব্বেদ (যোগিনী, সঙ্গিনী, প্রজ্ঞানি, ও প্রজ্ঞাপ্তি), ব্যাকরণ ও চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববিদ্যা লাভ করিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু হইলেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তিনি কিছুকাল পিতামাতার সেবা করিতে, এবং মাতার অনুমতি লইতে আপন জন্মস্থান কোটিকপুরে আসিলেন। এই সময়ে কোটিকপুরের রাজার কাছে কোনও কবি একটি শ্লোক বা লেখ দিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানীয় কোন পণ্ডিতই তাহার অর্থ করিতে পারেন নাই। ভদ্রবাহু তাহার অর্থ করিলেন। তাহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিলেন এবং সংসারী হইয়া রাজপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত রূপে দেশে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভদ্রবাহু তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতামাতার অনুমতি লইয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া গেলেন, এবং দীক্ষা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে জ্ঞান, ধ্যান, তপ ও সাম্যম্ সাধন করিয়া আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে গোবর্দ্ধন শ্রুতকেবলী ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইতিহাসে, এই ঘটনার বহুকাল পরে, ভদ্রবাহুর বৃদ্ধাবস্থায়, তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সভাতে দেখিতে পাই।]

ভদ্রবাহু, চন্দ্রগুপ্তের ষোলটি স্বপ্নের ফল বিচার করিলেন। রাজা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। কেন না, ষোড়শ স্বপ্নে রাজা দ্বাদশ-শীর্ষক এক সর্পকে আসিতে দেখিয়াছিলেন এবং ভদ্রবাহু তাহার ফল বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ আগতপ্রায়।

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিবস পরে ভদ্রবাহু আহারীয় সংগ্রহ করিতে শিষ্যদের নগরে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং সেই উদ্দেশ্যে এক জৈন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইলেন। তিনি রাজগুরু ও রাজ অতিথি হইয়াও, ভিক্ষুদের নিয়ম মত প্রত্যহ সশিষ্য জৈন গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন, এবং সেই খাদ্যেই জীবন ধারণ করিতেন। সেই গৃহস্থের দ্বারের কাছে এক দোলাতে একটি শিশু শুইয়া এমন চীৎকার করিতেছিল যে, ভদ্রবাহু দ্বাদশবার আহ্বান করিয়াও গৃহস্থের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি এই লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন যে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

যদিও রাজা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তথাপি তাঁহার মন্ত্রীরা বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য সহস্র সহস্র পশুবধ করিয়া নানা প্রকার যজ্ঞ করিলেন। নিরপরাধ মূক পশুর রক্তপ্রবাহে ধরণী প্লাবিত হইল। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন

হইলেন না, একবিন্দু বারিপাত হইল না। অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী রাজা যজ্ঞকার্য্যে বাধা দেন নাই বলিয়া নিজ ধর্ম্মবুদ্ধির কাছে আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

পরে, পাপ রাজ-কার্য্য ত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহ সেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। সিংহ সেনের মন্ত্রীরা অন্য একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনিয়া পশুবধের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ আরম্ভ করিতেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও জৈনাচার্য্যদের মধ্যে ঘোর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং দীর্ঘকাল বাগ্‌যুদ্ধের পর জৈনেরাই জয়ী হইলেন। পশুবধ আর হইল না।

ভদ্রবাহু আপন জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে নীলগিরির দক্ষিণে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইবে না। তখন ভদ্রবাহুর সহিত ২৪০০০ মুনি বা সন্ন্যাসী ছিলেন। জৈন ভিক্ষুদের নিয়ম ছিল যে ভিক্ষুরা আহারের সময়ে জৈন গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে উপস্থিত হইবেন ; গৃহস্থ আপনাদের ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে অল্প অংশ সন্তুষ্ট চিত্তে যদি দান করে তবে তাঁহারা উহা স্বীকার করিবেন। এক গৃহস্থ বাটীতে একই ভিক্ষু উপর উপর দুই দিন যাইবেন না। নিমন্ত্রণ করিলে, বিরক্ত হইয়া দান করিলে অথবা ভিক্ষুদের জন্য কোনও বিশেষ প্রকার মূল্যবান বা মুখরোচক খাদ্য পাক করিয়া দান করিলে গ্রহণ করিবেন না। ভিক্ষুরা সাধারণ নদী বা কূপের জল পান করেন না। গৃহস্থেরা অন্ততঃ এক প্রহর কাল জল ফুটাইয়া সেই জল ভিক্ষুদের দান করিবেন। তাঁহারা কেবলমাত্র ঐরূপ সিদ্ধ করা জল পান করিতে পারেন। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময়ে কোন এক নগরে—সে নগর যতই সমৃদ্ধ-শালী হউক না কেন—প্রত্যহ ২৪০০০ ভিক্ষুর আহারীয় সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই ভিক্ষুরা পারতপক্ষে বৈষ্ণব (৩) গৃহস্থ দ্বারে যাইতেন না। ভদ্রবাহু মুনিদের জন্য চিন্তিত হইয়া স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ১২০০০ ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া নীলগিরির দক্ষিণে কোনও দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার ও জীবনরক্ষা করিবেন। অন্য ১২০০০ মুনিদের তিনি আজ্ঞা করিলেন যে, তোমরা স্থূলভদ্র মুনির শাসনাধীনে থাকিয়া দেশময় ছড়াইয়া জীবন ধারণ কর। দুর্ভিক্ষের সময়ে সাধারণ (৪) নিয়মগুলি কঠোর ভাবে পালন করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু নৈতিক (৫) নিয়মগুলি শিথিল করিতে পারিবে না। দুর্ভিক্ষের অন্তে সকলকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হইতে বলিলেন।

ভদ্রবাহু বারো হাজার শিষ্য ও চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। কিছুকাল ভ্রমণের পর, এক পর্ব্বত শিখরের কাছে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মহাপ্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বিশাখ মুনি বা বিশাখাচার্য্যকে শিষ্যদের ভার গ্রহণ করিয়া চোল ও পাণ্ড্য দেশে যাইতে বলিলেন। কেবল মাত্র চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার নিকট থাকিতে অনুমতি পাইলেন। গুরুর তিরোভাবের পর চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শ্রাদ্ধ করিলেন ও তাঁহার দেহত্যাগের স্থানে সমাধি স্থাপন করিলেন। তাহার উপর গুরুর চরণ-চিহ্ন স্থাপন করিয়া ঐ চরণ চিহ্ন পূজা (৬) করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই স্থানেই জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন।

ভদ্রবাহুর সমাধি স্থান আধুনিক মহীশূর রাজ্য মধ্যে

(৩) বৌদ্ধ ছাড়া অ-জৈন সকল সম্প্রদায়ের লোককে জৈনেরা বৈষ্ণব বলেন। শাক্ত, শৈব ইত্যাদি শব্দ জৈনগ্রন্থে নাই।

(৪) সাধারণ নিয়ম যেমন জৈনদের কন্দ, মূল, বীজ, কাঁচা ফল, তাঁহাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত কোনও মুখরোচক বা মূল্যবান খাদ্য খাইতে নাই। সূর্য্যাস্তের পর খাইতে নাই। কাঁচা জল খাইতে নাই ইত্যাদি।

(৫) নৈতিক নিয়ম যেমন ভিক্ষু মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে ইত্যাদি।

(৬) জৈন ধর্ম্মমতে মূর্ত্তি পূজা করিতে নাই। জৈন মন্দিরে গুরু, সাধু বা তীর্থঙ্করের চরণ চিহ্নের পূজা করা হয়। কিন্তু অনেক প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মন্দিরে তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্ত্তি হিন্দুদের বিষ্ণু বা শিবের মূর্ত্তির মত পূজিত হইতেছে। বোধ হয় ভারতে মূর্ত্তিপূজা জৈনেরাই প্রচলিত করিয়াছেন।

শ্রবণ-বেলগোলা নামে প্রসিদ্ধ (১২° ৫১′ উঃ ৭৬° ৩৬′ পূঃ)। চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত ভদ্রবাহুর চরণ চিহ্ন ও চন্দ্রগুপ্তের সমাধি স্থান (চন্দ্রগুপ্তের বস্তী) জৈন যাত্রীরা দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ শেষ হইলে বিশাখাচার্য্য উত্তর দিকে আপন গুরুর তিরোধান স্থান দর্শন করিতে সশিষ্য যাত্রা করিলেন। বিশাখাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গীরা এই অবসরে দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়া শ্রাবক, শ্রাবিকা ও মুনি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। জৈনেরা বলেন, ইতিপূর্ব্বে কনাড়ি ভাষায় "সাহিত্য" বলিয়া কোনও বস্তু ছিল না, তাঁহারাই ঐ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি ও তাহার উন্নতি করিয়াছেন।

বিশাখ মুনি দেখিলেন, চন্দ্রগুপ্ত মুনি গুরুর চরণচিহ্ন পূজা করিতেছেন, তাঁহার মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু ও মাথায় জটা হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত বিশাখকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বিশাখ প্রণাম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু নিয়ম মত প্রতি-প্রণাম করিলেন না, কেবল নমস্কার (১) করিলেন। তাঁহার ধারণা বা সন্দেহ হইয়াছিল যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজসুখ ও ঐশ্বর্য্যে পালিত চন্দ্রগুপ্ত খাদ্যাভাবের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কন্দ, মূল, বীজ, ফল ইত্যাদি ভিক্ষুর বর্জ্জনীয় দ্রব্যাদি খাইয়া অশুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। অতএব চন্দ্রগুপ্তের আতিথ্য স্বীকার করিয়াও সে দিবস উপবাস করিয়া, পরদিবস উত্তরে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কেন না তখনও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে খাদ্য-দ্রব্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। দুর্ভিক্ষে উত্তরাপথে মনুষ্য ও পশু নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। খাদ্যাভাবে লোকে গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে বৃক্ষমাত্রেই পত্রহীন হইয়া মরিয়া গিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে মনুষ্য ও পশুর দেহাবশিষ্ট পচিতে লাগিল, তাহাতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইল। যাহারা দুর্ভিক্ষ কাটাইয়া বাঁচিয়া ছিল, তাহারা রোগে মরিতে লাগিল। দ্বাদশ বর্ষ পরে বারিপাত হইলেও কয়েক বৎসর কৃষি অভাবে খাদ্যাভাব ছিল। চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, নিকটেই বনের অপর পারে, এক মহানগর আছে, সেখানে নানাপ্রকার আহারীয় সুলভে পাওয়া যাইতে পারে। সকলে বন-ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নাগরিকগণ অতিথি সৎকার করিতে উৎসুক, সকল গৃহই ধনধান্যে পরিপূর্ণ। নাগরিকেরা সকল ভিক্ষুদের পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় করিল। ফিরিবার পথে বন অতিক্রম করিবার সময়ে একজন ভিক্ষুর মনে পড়িল যে, তিনি আপনার জলপাত্রটি, যে গৃহস্থ-বাটীতে তিনি অতিথি ছিলেন, তাহার গৃহেই ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাহা লইতে আবার নগরে ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু বন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। নগর ও নাগরিক সকলই অদৃশ্য হইয়াছে। দেখিলেন, যেখানে সুদৃশ্য নগর ছিল, সেখানে গভীর বন—তাঁহার জলপাত্রটি একটি বৃক্ষ শাখায় ঝুলিতেছে। ভিক্ষু ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ বিশাখাচার্য্যকে দিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। বলিলেন, চন্দ্রগুপ্ত তপোবলে নগর ও খাদ্যদ্রব্য সৃষ্টি করিয়া সেই অপবিত্র বস্তু ভিক্ষুদের খাওয়াইয়াছিলেন বলিয়া সকলেই অপবিত্র হইয়াছে। অতএব বিশাখা-চার্য্য সশিষ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইলেন এবং চন্দ্র-গুপ্তের দাড়ী ও জটা ছিঁড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন।

অন্য সকল সম্প্রদায়ে প্রায়শ্চিত্ত ও দীক্ষা গ্রহণ কালে মুখের ও মাথার চুল ক্ষুর দি। কামাইবার প্রথা আছে, কিন্তু জৈন ভিক্ষুদের অন্য ব্যবস্থা। তাঁহারা যে শারীরিক কষ্ট গ্রাহ্য করেন না, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য মাথার ও মুখের চুল মুঠা মুঠা করিয়া ছিঁড়িয়া তুলিয়া ফেলেন। রক্তপাত হইয়া, ফুলিয়া মুখখানি এমন দেখিতে হয় যে নিকট আত্মীয়েরাও চিনিতে পারে না।

জৈনদের ২৪ জন গুরু বা তীর্থঙ্কর ছিলেন। প্রথম ২১ জন অতি প্রাচীন কালে ছিলেন। ২২তম নেমিনাথ স্বামী প্রায় ১০০০ খৃঃ পূ ও ২৩তম পার্শ্বনাথ স্বামী ৮৭০

(১) মুনিদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের স্থান তখন উচ্চে। তবে, তিনি এ অপমান কেন নীরবে সহ্য করিলেন তাহার কোন কারণ লেখা হয় নাই।

খৃঃ পূ জীবিত ছিলেন। শেষ বা ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী ৫৯৯ খৃঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ৫৬৯ খৃঃ পূঃ তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ কালেও মুখের ও মাথায় একটি একটি চুল টানিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। এখনও দীক্ষাগ্রহণ কালে ঐরূপে কেশ ত্যাগ করিতে হয় বা করা বিধি।

বিশাখাচার্য্যের উত্তরাপথে যাত্রা করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত আবার গুরুর চরণচিহ্ন পূজা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সিংহ সেনের পুত্র রাজকুমার ভাস্কর আপনার চতুরঙ্গিণী সেনা সহ ভদ্রবাহু মুনির তিরোধান স্থান ও আপনার পিতামহ ও দীক্ষাগুরু চন্দ্রগুপ্তকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি ঐ স্থানে কিছুকাল বাস করিয়া চৈত্যালয় ও বেলগোলা নামক পার্ব্বত্য নগরদ্বয় স্থাপিত করিলেন। ভাস্করের প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সমাধি (বস্তী) তাঁহার গুরুর চরণচিহ্নের নিকট এখনও অনেকে দেখিতে যায়।

চন্দ্রগুপ্তের জীবিতাবস্থায় জৈনেরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই। তখন মুনিমাত্রেই দিগম্বর থাকিতে বাধ্য ছিলেন। জৈনেরা বলেন, মুনি বা ভিক্ষুকে যেমন শারীরিক সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্মের কষ্ট ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ বাহ্যজ্ঞান বা লজ্জাও ত্যাগ করিতে হয়। তাঁহারা বলেন, যাহার নগ্ন অবস্থার জ্ঞান আছে তাহার নগ্ন থাকিবার অধিকার নাই; ভিক্ষু নগ্ন ও আচ্ছাদিত অবস্থাতে কোন প্রকার ভেদ জ্ঞান করিবে না। একজন জৈন লেখক লিখিয়াছেন, স্বর্গে আদম ও ঈব যত দিন পবিত্র ছিলেন, তত দিন তাঁহাদের নগ্নতা জ্ঞান ছিল না, অপবিত্র হইয়াই তাঁহাদের নগ্নতা জ্ঞান ও লজ্জা হইল। অতএব নগ্নতাই পবিত্রতা, আচ্ছাদনই অপবিত্রতা। তাঁহারা আরও বলেন যে এইরূপ নগ্ন না থাকিতে পারিলে জীবের নির্ব্বাণ লাভ হয় না। জৈন ভিক্ষুদের পাঁচটি প্রধান নিয়ম মধ্যে একটি নিয়ম যে, তাঁহারা স্থাবর, অস্থাবর কোনও বস্তু রাখিবেন না, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবেন; অতএব তাঁহাকে বস্ত্রও ত্যাগ করিতে হয়। চন্দ্রগুপ্তই শেষ রাজা যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মুনিব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে অশোক যে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহারই শিলালেখে পাওয়া যায়। অশোকের প্রথম ১২ বৎসরের লেখে তাঁহার নামের সহিত "দেবানাম্ প্রিয়, প্রিয়দর্শী" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ২৭তম বৎসরের লেখে "দেবানাম্ প্রিয়" শব্দটি নাই। এই শব্দটি খাঁটি জৈন উপাধি, অন্য সম্প্রদায়ে—বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মে—ইহার ব্যবহার নাই। ১৩ হইতে ২৬ সনের কোনও লেখ এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অশোক রাজ্যলাভের সময়ে ও তাহার পর বারো বৎসর জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার পর কোনও সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে অশোক ভারতের বাহিরে, দেশ দেশান্তরে, জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় এ কথার মূলে সত্য নাই। কেন না জৈনগুরু মহাবীর স্বামীর এক উপদেশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, পবিত্র ভারতবর্ষে আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তবে জীবের নির্ব্বাণ লাভ সম্ভব—নতুবা নহে। ভারতের বাহিরে এ উপদেশ শুনিয়া কেহ জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রামলীলা

এ অঞ্চলের সকল সহরে ও অধিকাংশ পল্লীগ্রামে রামলীলা উৎসব হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে দুই তিনটি রামলীলাও সম্পন্ন হয়। যেথানে রাজা বা জমিদার আছেন, সেথানে তাঁহার একটি রামলীলা হইবেই, সমস্ত ব্যয় তিনিই বহন করেন। তাহা ছাড়া সম্প্রদায়-বিশেষ চাঁদা করিয়া রামলীলা করেন। আমি জৌনপুরে থাকি। এই জৌনপুর সহরের মধ্যে তিনটী রামলীলা উৎসব স্থাপিত আছে। একটী রাজার, একটী মহাজনগণের, একটী জনসাধারণের—তিনটীই ভালরূপে সম্পন্ন হয়। তবে রাজার কথাই ভিন্ন, ধনবল লোকবল দুইই বেশী থাকে, কাযেই রাজার রামলীলাতে হাতী ঘোড়া চতুর্দ্দোলা বেশী থাকে এবং সাজসজ্জাও রাজোচিত।

ব্রাহ্মণ কুমারগণকেই রাম লক্ষ্মণ সীতা সাজান হইয়া থাকে। অন্যান্য অনুচরগণ শূদ্রজাতীয় হয়, ব্রাহ্মণও হয়। রাম সীতা লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সাজাইবার জন্য উহাদিগের পিতামাতার নিকট হইতে ভাড়া করিয়া লওয়া হয়। প্রতিমাসে পাঁচ টাকা হিসাবে পুত্রের মাতাকে দিয়া তবে কর্ত্তৃপক্ষ এই কিশোরগণকে কার্য্যে পাইয়া শিক্ষা দিতে থাকেন। একমাস পূর্ব্ব হইতেই রিহার্সাল হইতে থাকে। এই লীলার যিনি ম্যানেজার হন, তিনি বিশেষ ভাবে সকলকে সময়োচিত গান, অ্যাক্‌ট প্রভৃতি শিক্ষা দেন। ফলে দুইমাস কার্য্য করিয়া এই বালকগণের মাতারা চিরদিনই বসিয়া মাসে মাসে পঞ্চমুদ্রা লাভ করে। সাধারণতঃ কেহ নিজের সন্তানকে রাম সীতা প্রভৃতি সাজিতে দিতে চাহে না। যাহারা নেহাৎ গরীব তাহারাই বিপাকে পড়িয়া পুত্র সমর্পণ করে। ইহাদের বিশ্বাস, দেবতার রূপ ধারণ করিলে ছেলে বাঁচে না। ভাড়া অন্যান্য সকলকেই দিতে হয়, তবে বারোমাস নয়, যতদিন কাযে লাগে ততদিন। রাক্ষসগণ, বানরগণ, বাহক ও পাইকগণ দিন হিসাবে ভাড়া পাইয়া থাকে। কায ফুরাইলে যে যাহার বাড়ী চলিয়া যায়।

একটী মাস এই উৎসবে এ প্রদেশের সমগ্র পুরুষ ও নারী যেন ভাবে ভক্তিতে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ধনী দরিদ্র সকলেই পূর্ণোল্লাসে ইহাতে যোগ দান করে। অনেক পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকও শকটে আরোহণ করিয়া কিছু দূরে শকট দণ্ডায়মান করিয়া রামলীলা উৎসব দর্শন করে। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিবার সুবিধা হয় না, ভয়ানক ভিড় হয়, এবং পুরুষগণের যুড়ী, মোটর গাড়ী, এক্কা প্রভৃতির চলাচলের জন্য পথে শকট রাখিতে দেয় না।

পিতৃপক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই রামলীলার ভিত্তি-স্থাপনা হয়। আমরা প্রেতপক্ষ বলি, এদেশীয়গণ পিতৃপক্ষ কহেন।

দশরথ রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইতে রামলীলার গোড়া পত্তন। প্রথম হইতেই বাদ্যযন্ত্রে সুগায়কগণ রামায়ণ গাথা গান করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

অপেক্ষাকৃত বেশী মেলা বসে নয় দিন—চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী ও কোজাগরী পূর্ণিমা। এই কয়দিনে বেশী রকম আলো এবং সাজসজ্জা লোকজন ইত্যাদি হয়। উপরে চাঁদোয়া টাঙাইয়া চারিদিকে আম্র পল্লব বাঁধিয়া রামলীলার স্থানটী বড় সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। স্থানটী বহুদূর পর্য্যন্ত লম্বা ও চৌড়া থকে, তাহারই একাংশে প্রকাণ্ড লম্বা চৌড়া সিংহাসন স্থাপিত থাকে, সেই সিংহাসনের উপরে রাম সীতা লক্ষ্মণ উপবিষ্ট থাকেন। হনুমান যোড়হস্তে ইঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। হনুমানের মুখে মাটীর মুখোস, লাল-রঙের পোষাক পরা, কোমরে পেটী বাঁধা, পিছনে বৃহৎ লেজ—যে কোনও রঙেরই হউক, সাদা নয়। লেজটী বোধ হয় নলকাঠির দ্বারা প্রস্তুত করা হয়; তাহাকে একটু বক্র করিয়া তার উপর তুলা জড়াইয়া বস্ত্র

দ্বারা জাইয়া সেইটী কোমরে গুঁজিয়া দেওয়া হয়, উর্দ্ধদিকে লেজটা উঁচু করা থাকে। অন্যান্য বানর-বেশীগণের লেজ দুই গজের অধিক হয় না। রামলক্ষ্মণের সাজ পোষাক উত্তম রেশমী বস্ত্রে চুমকী বসানো থাকে; রঙ মিলাইয়া সুদৃশ্য রূপে প্রস্তত করা হয়। মস্তকে মুকুট শোভিত হয়; সীতাকেও রাজরাণী রূপে সাজান হয়—মস্তকে মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে পুঁতির ও মুক্তার অলঙ্কার পরাইয়া দেয়।

চতুর্থীর দিন রাত্রে সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করা হয়—সূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া খরদূষণকে বেদনা জানায়। পঞ্চমীর দিন রাত্রে খরদূষণের সহিত রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। তাহার একটী শোভাযাত্রা রাজপথে বাহির হয়, দেখিতে চমৎকার। প্রথমেই রাম লক্ষ্মণ সীতার সুসজ্জিত সিংহাসনখানি দর্শনপথে আসে। কতিপয় বানর সৈন্যও পদব্রজে যায়। সিংহাসনখানি বহন করিতে অন্যূন বারোজন বাহকের প্রয়োজন হয়—কিংবা আরও বেশী।

রামচন্দ্র কিছুদূরে গেলেই তখন রাক্ষসীয় চমূ দর্শন দেয়। খরদূষণ কালো সাজ পোষাক পরিধান করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থান করে। মন্ত্রী, কোটাল, কোতয়াল ঘোটকপৃষ্ঠে যায়, সৈন্যগণ পদব্রজে তীর ধনুক হস্তে কোলাহল করিতে করিতে অগ্রসর হয়। রাক্ষসী সঙ্গিনীদের মাঝে সূর্পণখা মুখসের কাটা নাকের উপর হাত রাখিয়া হেলিতে দুলিতে পথ অতিক্রম করে; সঙ্গে এই সমস্ত বীভৎস দৃশ্যাবলী লইয়া খরদূষণ যুদ্ধ করিতে করিতে যায়। যতক্ষণ শোভাযাত্রাটী রাজপথ অতিক্রম করে ততক্ষণ চারিদিকে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইয়া কর্ণ পটহ বধির করিবার উপক্রম করে।

সপ্তমীর দিন রাত্রিতে মহীরাবণ কর্ত্তৃক রাম লক্ষ্মণ বন্দী হইয়া পুনরায় উদ্ধার হন এবং তাহাকে বধ করেন। তৎসঙ্গে আরও কতিপয় বানর ও রাক্ষস বধ সমাপ্ত হয়। এই রামলীলা রাত্রি আটটা হইতে আরম্ভ হয় এবং রাত্রি একটায় ভাঙ্গে।

মহাষ্টমীর রাত্রিতে কুম্ভকর্ণ বধ হয়। লক্ষ্মণের শক্তি-শেল, পুনর্জীবন প্রাপ্তি এবং মন্দোদরীর পতিপদে রোদন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করা ও সীতাকে ফিরাইয়া দিতে বলা, এবং রাবণের অসম্মতি; এই সমস্ত হয়। কথাগুলি হিন্দি ভাষায় বলে এবং শুনিতে বড়ই সুমধুর হয়, থিয়েটারের মতই অ্যাক্ট করিয়া থাকে। এই রাত্রে কুম্ভকর্ণ, কাগজ ও কাঠি দ্বারা প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে সভার এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকে। এদিকে মানব মূর্ত্তি কুম্ভকর্ণ মারা গেলে, তাহাকে সরাইয়া সেই কাগজের কুম্ভকর্ণকে পোড়ান হয়। মূর্ত্তি খুব লম্বা চৌড়া প্রস্তত করে। রং চং করিয়া পোষাক পরায়; মস্তকে চিত্র বিচিত্র রঙের মুকুট পরাইয়া সুদৃশ্য করে।

নবমীর রাত্রিতে দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিৎ বধ হয়। ইন্দ্রজিৎ মারা গেলে মন্দোদরীর বিলাপ, রাবণের রোষ এবং প্রমীলার ক্রন্দন ইত্যাদি, সখীসহ যুদ্ধ সজ্জায় লঙ্কায় আগমন, দেখান হয়। প্রথমে মানব ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলাকে একত্রে চিতায় শয়ন করাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দেয়, সকলে যেন সতীর সহমরণ দেখিয়া লইল। পরে কাগজ নির্ম্মিত ইন্দ্রজিৎকে দাহ করে।

বিজয়া দশমীর দিন রাবণ বধের অভিনয়। সেদিন সহরবাসী পল্লীবাসী ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র চিত্তে সন্ধ্যার সাজ সজ্জা প্রস্তত করিতে থাকে। যাহার যে কায, সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সমাধা করিয়া লয়। তারপর হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষগণ এবং বাঙালী পুরুষগণ পুত্র কন্যা সহ সাজগোজ করিতে আরম্ভ করেন। কে কোন কাপড়খানি পরিবে, কোন জামাটী গায়ে দিবে, ইহাই নির্ব্বাচন করিতে বৈকাল হইয়া যায়। যাঁহারা অবস্থা-পন্ন লোক, তাঁহারা সকাল হইতে গাড়ী একা ভাড়া করিয়া রাখেন, নচেৎ পাওয়া যায় না, অন্য লোকে ভাড়ায় ঠিক করিয়া ফেলে। এমন কি ৮।১০ ক্রোশ দূর হইতেও স্ত্রীপুরুষগণ রাজার দশনী দেখিতে জৌনপুরে আগমন করে। সকল সহরেই এক ব্যবস্থা। দূর পল্লীবাসিগণ সহরে দশমীর রাবণ বধ দেখিতে আসিবেই।

হিন্দুস্থানী নারীগণের শোভা এই দিনে দেখিবার মত। সকাল হইতে সকল সঙ্গিনীগণ একসঙ্গে মিলিত হইয়া পুষ্করিণীতে গিয়া উত্তমরূপে আঠালো

মাটী দ্বারা মাথা ঘষিয়া ফেলে। যাহাদের তাবিজ বাজু জসম পৈঁচে যবদানা যাহা আছে, সমস্ত নূতন সুতায় গাঁথাইয়া লয়, মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কৃত করিয়া সকল অঙ্গে, সিঁথি হইতে ঢেঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ে সের খানেক ওজনের মল ঝাঁঝ বড় বড় আঙোট পরিধান করে। পরিপাটী রূপে পেটো পাড়িয়া চুল বাঁধে। তারপর রঙীন বস্ত্র এবং ছিটের হাতকাটা জামা পরিয়া এবং লংক্লথ নয়েনসুক্ বা মলমলের চাদর দ্বারা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আবরিত করিয়া, স্বামী দেবর ভাশুর শ্বশুর সহ মেলাতে গমন করে। যদি কোন বাড়ীর পুরুষগণ স্ত্রী জাতির 'ঝক্কি' সহিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে উহারা একটী নারী সম্প্রদায় গঠিত করিয়া লয় এবং পনের কুড়ি জন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া গানে রাজপথ মুখরিত করিয়া রামলীলায় উপস্থিত হয়। সভার মধ্যে অবশ্য প্রবেশ করিতে পারে না—অসংখ্য পুরুষের ভিড় ঠেলিয়া নারী জাতি কেমন করিয়া যাইতে পারে? দূরে দাঁড়াইয়া দেখে। হিন্দুস্থানী রমণীগণের মধ্যে চাদর গায়ে আবৃত করার নিয়মটী বড় সুন্দর। উহারা যথা তথা গমনাগমন করে বটে, সকলের সম্মুখেও যায়, গানও গাহে, কিন্তু চাদরখানি এমন ভাবে আপাদমস্তকে ঢাকা দিবে যে, তুমি তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখিতে পাইবে না। খুব চেষ্টা করিয়া দেখিলে তাহার চক্ষু দুটী এবং নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে পাইবে মাত্র।

যত ঝুঁটো পুঁতির, কাঁচের মুক্তার মালার ফিরিওয়ালাগণ, খেলনাওয়ালাগণ, এই সব নারীসেনার সম্মুখে ঘুরিতে থাকে এবং অচিরে সিকি আধুলী টাকাতে গেঁজে পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

ওদিকে কাগজের রাবণ দশ মুণ্ড কুড়িটা হস্ত ও নেত্র লইয়া দাঁড়াইয়াই আছে। সে বীভৎস মূর্ত্তি দর্শন করিলে স্বতঃই আতঙ্ক উপস্থিত হয়; যখন আঁধার হইয়া আসে, তখন রাবণ রাজার পাপ জীবনের অন্ত হয়। তার পরে বিলাপাদি—মন্দোদরীর রামকে ভৎর্সনা ইত্যাদি। পাপী রাবণের তখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়—সে ভক্তিভরে রাম লক্ষ্মণকে ডাকিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিয়া, সমস্ত অপরাধের ক্ষমা চাহে। তারপর রাবণকে চিতায় শয়ন করাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দেয় এবং কাগজের রাবণের দেহে অগ্নি সংযোগ করে।

পাতকাঠিগুলি চড়চড় পট পট রবে শব্দ করিয়া সগর্জ্জনে জ্বলিতে থাকে। আর সভাসদ্গণ সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করে—"জয় শ্রীরামচন্দ্রজিকি জয়! রাম লছমনজীকি জয়, জানকী দেবীকি জয়, হনুমানজীকি জয়!" সভাস্থল যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম। কেহ উর্দ্ধবাহু কেহ অধোবাহু হইয়া জয়ধ্বনি করিতে থাকে। চরকী বাজী আতস বাজী প্রভৃতি ফুটিতে থাকে; সভাস্থল ধুমায়মান হইয়া যায়। ওদিকে তাড়াতাড়ি করিয়া জনসংঘ বাহির হইতে থাকে, ফেরিওয়ালা বিক্রেতাগণ যাইতে ব্যগ্র হয়, সে এক বিরাট ব্যাপার!

সেই যে হিন্দুস্থানী নারীগণ একাংশে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা জনতা ভাঙ্গিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছে, গান গাহিতে গাহিতে প্রফুল্ল বদনে গৃহে ফিরিতেছে। বালকের দল হৈ হৈ রবে গৃহে ফিরে; প্রৌঢ়গণ যুবকগণ বাজী পোড়ানর সমালোচনা করিতে করিতে ফিরেন। বাঙ্গালী বাবুগণ অবস্থানুযায়ী যানারোহণে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিজয়ার সম্মিলন ব্যাপার সম্পন্ন করেন, বন্ধু গৃহে গিয়া জলযোগাদি করেন, দাস দাসীগণকে অবস্থানুযায়ী পারিতোষিক দেন। এ দেশের গয়লাগণ বিজয়ার দিন প্রত্যুষে ছোট ছোট খুলিতে করিয়া দধি আনিয়া গৃহস্থগণকে শুভ চিহ্ন প্রদর্শন করাইয়া পুরস্কার লয়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীরা যবশীষ দিয়া প্রতি গৃহের বালক বালিকাগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রণামী গ্রহণ করেন। এইরূপে পশ্চিমবাসিগণের বিজয়া দশমীর উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই যবশীষ ইঁহারা দেবীপক্ষের প্রথম দিনে কিছু মাটি খুঁড়িয়া রোপণ করেন। মাত্র দশ দিনে সেই যব হইতে শীর্ষ বাহির হয়। প্রায় আধ হাত লম্বা হয়, তাহাই লইয়া উহারা গৃহস্থগণের 'বাড় বাড়ন্ত' কামনা করে, বলে, "দশ দিনে এই যে যবশীষ বাহির হয়,

ইহাও সেই রামজীর করুণা !” কতদিন হইতে এই সব কার্য্য চলিতেছে !

একাদশীর দিন রাত্রে ভরত-মিলন হয় ! সেদিন একটী উত্তম শোভাযাত্রা বাহির হয়। সন্ধ্যারাত্র হইতে প্রথমে বিভীষণকে রাজ্যদান, সীতার উদ্ধার, হনুমান কর্ত্তৃক ভরতকে সংবাদ দান পালা শেষ করিয়া তারপর মিছিল বাহির হয়। একটী সুদৃশ্য সিংহাসনে ভরত শত্রুঘ্ন থাকেন, একটী সুন্দর সিংহাসনে রাম সীতা লক্ষ্মণ উপবিষ্ট রহেন, করিতে করযোড়ে পথ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্রের সিংহাসনোপরি আরোহণ করেন। রামচন্দ্র উঠিয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। দুই ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎপরে চারিভ্রাতা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েন। চারিজনের চক্ষে আনন্দের অশ্রু ঝরিতে থাকে। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া জনমণ্ডলীর চক্ষুও অশ্রুবর্ষণ করে, অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

সুকণ্ঠ গায়ক গান করিয়া রাম লক্ষ্মণ ভরতের উক্তি

রামলীলা

যথাযথ ভাবে সুচারুরূপে বর্ণনা করেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সেই গান অনুযায়ী কার্য্য সকল সম্পাদন করেন মাত্র। ভরত শত্রুঘ্ন সীতাকে প্রণাম করেন, লক্ষ্মণ ভরতকে প্রণাম করেন। এই রূপে চারি ভ্রাতার শুভ মিলন সমাপন করা হয়। জনমণ্ডলী সমস্বরে চারি ভ্রাতার নামে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া উঠে। কত ফুলের মালা চারি ভ্রাতাকে পরান হয়, কতলোকে ফুলের ডালা পাণ বাতাসা পয়সা দক্ষিণা দিয়া চারি ভ্রাতার পূজা করে ; সশব্দে বাদ্য বাজিয়া উঠে, বহু প্রকার আতসবাজী পোড়ান হয় এবং অনেক রাত্রি

হনুমান শ্বেত চামর ব্যজন করেন, সঙ্গে অনেক বানর সৈন্য পদব্রজে মুখোস পরিয়া চলিতে থাকে। বাজনা আলো যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ধনী ব্যক্তিগণকে লইয়া হাতী ঘোড়া ঘুড়ী মোটর অনেক থাকে। রাজা চতুর্দ্দোলায় আসেন। রাজপথে কত দ্রব্য বিক্রেতাগণ সারবন্দি ভাবে বসিয়া বেচা কেনা করিতে থাকে ;

রাত্রি একটার সময় দুইধার দিয়া দুটী সিংহাসন ধীর ভাবে অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়। তখন ভরত শত্রুঘ্ন সিংহাসন হইতে নামিয়া প্রণাম করিতে

পর্য্যন্ত সজ্জিত চারি ভ্রাতাকে লইয়া মিছিল রাজপথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে রাজার রামবাগে মহা-সমারোহের সহিত রামরাজা করা হয়। সেদিন রামবাগে বড় সুন্দর শোভা হয়। আলোকমালায় স্থানটী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সুবৃহৎ চন্দ্রাতপের নীচে কারুকার্য্য খচিত একটী সিংহাসন স্থাপিত করা থাকে। চারিধারে সুদৃশ্য কাষ্ঠাসন পাতা, পার্শ্বদেশে রাজার সিংহাসন খানি রক্ষিত; অনেক ধনী ভদ্রলোককে রামরাজা দেখিবার জন্য রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া কার্ড পাঠান।

পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন, 'হোমন' করেন। তারপর সিংহাসনারূঢ় রামচন্দ্রকে অভিষেক করা হয়। স্বয়ং রাজা উঠিয়া স্বহস্তে রামচন্দ্রের ললাটে তিলক চন্দন পরাইয়া দেন,বৃহৎ ফুলের মালায় রাম সীতার পূজা করেন। সমবেত জনমণ্ডলী উচ্চ চীৎকারে 'রাম সীতাকি জয়,' 'রাজা রামচন্দ্রকী জয়,' 'জানকী মায়িকী জয়,' 'হনুমান মাহাবীরজিকী জয়,' 'রাম৹লাছমান ভরত্ শাত্রুঘাণ কী জয়' রবে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তোলে, ' সুমধুর স্বরে বাদ্য বাজিতে থাকে।

সিংহাসনোপরি রাম সীতা উপবিষ্ট রহেন, বিচিত্র সাজ পোষাকে সুন্দর দেখায়! লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেত চামর ব্যাজন করেন, ভরত স্বর্ণছত্র হস্তে লইয়া রামের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রামচন্দ্রের মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন, প্রভুভক্ত হনুমান যোড়করে রাম সীতার সম্মুখে বসিয়া থাকেন। সকলেরই সাজ পোষাক সুদৃশ্য মনোহর—সেদিন রাজ-পোষাক থাকে, অন্যদিন ইহা ব্যবহৃত হয় না। রাজবাটী হইতে অলঙ্কার আনিয়া ইহাদের সাজানো হয়, পরে সমস্ত তুলিয়া রাখা হয়। রাম রাজা হইলে সম্ভ্রান্ত অনেকে সিকি আধুলী টাকা প্রণামী দেয়; হোমেতেও কেহ কেহ টাকা আধুলী প্রদান করে।

প্রাপ্ত টাকা পয়সা সমস্তই ম্যানেজার গ্রহণ করিয়া হিসাব নিকাস করিয়া রামলীলার ব্যয়ে লাগান্। যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা পুনরায় নূতন খাতায় জমা করা হয়। আগাম বৎসরে রামলীলা যাহাতে সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহার জন্য কামনা করিয়া নূতন খাতার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রামরাজার উৎসব চলিতে থাকে। গানবন্দনাদি শেষ হইলে সমবেত জনমণ্ডলী বিদায় গ্রহণ করে। রাজাও নিজ ভবনে রামলক্ষ্মণদের লইয়া প্রস্থান করেন। সেদিন রামলীলার দলদের নিজ গৃহে উত্তম রূপে ভোজন করান। রামলীলার দ্রব্যাদি রাজ ভাণ্ডারে একবৎসরের মত আবদ্ধ করা হয়। বৎসরের মত রামলীলার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

এই সব উৎসবে পল্লীগ্রামের লোকগুলিই বেশীর ভাগ হৈচৈ করে। নিজেরা গান গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া লীলা স্থান মুখরিত করিয়া তোলে। এই আমোদে পশ্চিমের হিন্দুস্থানী নরনারীগণ দুইমাস কাল যাপন করেন; তারপর পুনরায় শ্যামপূজার পর্ব্ব উপলক্ষে উৎসব করিবার জন্য প্রস্তুত হয়—সে উৎসবের নাম "দেওয়ালী।"

'রামলীলা' উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রতি নগরে ও পল্লীতে প্রতিবৎসর হইতেছে। ইহা বন্ধ করাকে এ প্রদেশবাসী বড়ই দোষের মনে করে। ইহাতে খরচ হয়, যথেষ্ট লোকের বিশেষ আবশ্যক হয়, সেই সমস্ত যোগাড় করিয়া উৎসাহের সহিত রামলীলা সম্পন্ন করা কম ক্ষমতার বিষয় নহে। প্রত্যেকের নিকট চাঁদা আদায় করা, সকলকে উত্তেজিত করা, স্থান ও সরঞ্জাম নির্দ্দেশ করা, সকল বিষয়েই এ প্রদেশবাসিগণের পরম উল্লাস থাকে। রামায়ণে "বিষ্ণু চারি অংশে প্রকাশ" যে ছবি আছে, অবিকল সেই ছবি অনুযায়ী ভরত মিলন দৃশ্যটী করে। কেবল খরদূষণের যুদ্ধের শোভাযাত্রাটী নিজেদের ইচ্ছামত সজ্জিত করে। সীতাহরণ করে বটে, কিন্তু সীতাকে প্রত্যহই রামের বামে বসাইয়া রাখে। রাম সীতা লক্ষ্মণকে সজ্জিত করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া, সম্মুখে বসিয়া রামলীলার বিষয় গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করে।

শ্রীসরযূবালা বসু।

বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী

শক্তিচর্চ্চা আমাদের দেশে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও এক আধটু আছে বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু এই শক্তির বিরুদ্ধে এত রকম বেরকমের শক্তি নিয়োজিত আছে যে অধুনা শক্তিচর্চ্চার নাম শুনিলেই একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে! আমাদের বাঙ্গলা-দেশে এককালে ঘরে-ঘরে শক্তিমান পুরুষের কথা শুনা যাইত, এখন সে সব স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। এমন কি পনেরো বিশ বছর আগে যে সব ছেলেদের সুপুষ্ট ও সুস্থ-দেহ চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া আনন্দানুভব করিতাম, তাহা-দের অনেককেই আর এখন দেখিতে পাই না; শুনিতে পাই তাঁহারা জীবিত—কিন্তু কোথায় কে জানে! যে দিনে বাঙ্গলাদেশে শক্তিমান যুবক এবং কিশোরদের লইয়া একটা ফাঁড়াছেঁড়া পড়িয়াছিল, ভীম ভবানী তখন অতি জীর্ণকায়, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কিশোর—বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, ডিঃ গুপ্ত খাইয়া, ছেলেটি আরাম
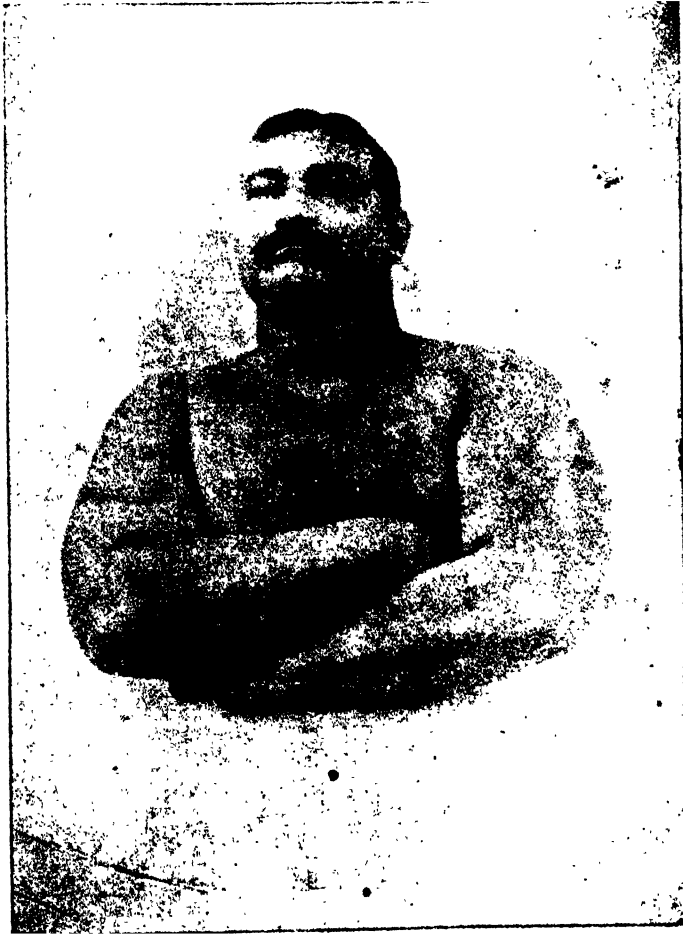
বাঙ্গালী বীর ভীমভবানী

হইল। তবুও মাঝে মাঝে জ্বর-জাড়ি হয়, প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে, না আছে শরীরের সুখ, না মনের শান্তি! "লেখাপড়াও" অমনি নাম মাত্র! স্কুলের খাতাতে নামটিই আছে।

সেই সময়েই একদিন সমবয়স্ক একটি ছেলে ভবানীকে বেদম প্রহার করিল। তাহাতে ভবানীর বড়ই মনে ধিক্কার আসে। সে এই সময় হইতেই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় তৎপর হইয়া উঠে।

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ায় তখন গুহ বাবুদের অসীম প্রতাপ। ধনে মানে তাঁহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট, আবার তাঁহাদের বাড়ীতে তখন পালোয়ানের আখ্‌ড়া। স্বর্গীয় ক্ষেতু গুহ মহাশয় তখন জীবিত। সারা ভারতবর্ষ হইতে নামজাদা পালোয়ানগণ তাঁহার আখড়ায় কুস্তি লড়িতে আসে। ক্ষেতু বাবুর আখড়ার মাটী না মাখিয়াছে এমন পালোয়ান তৎকালে ভারতবর্ষে ছিল না। ভবানী ক্ষেতু বাবুর শরণ লইল। ক্ষেতু গুহের আখড়াতেই বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী দুইটি যুবকই কুস্তীর প্যাঁচ শিখিতে লাগিল। এই দু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত—একটি আমাদের ভীম ভবানী, অন্যটি গোবর।

ভীম ভবানী ৫মণ বার-বেল ভাজিতেছেন

ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমূর্ত্তি

কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসেন। ভবানী খেলা দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ কাহার করস্পর্শে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দর দিব্যকায় ব্যক্তি! তেমন বীরমূর্ত্তি আর আইস; আমি তোমাকে ভাল যায়গা দিতেছি।" তাঁবুর মধ্যে যেখানে দলের লোকেরা বসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে একখানা আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বস!"

তাঁবুর মধ্যে উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া একেবারে দিন করিয়া ফেলিয়াছে। বীরকায় পুরুষ পলকহীন
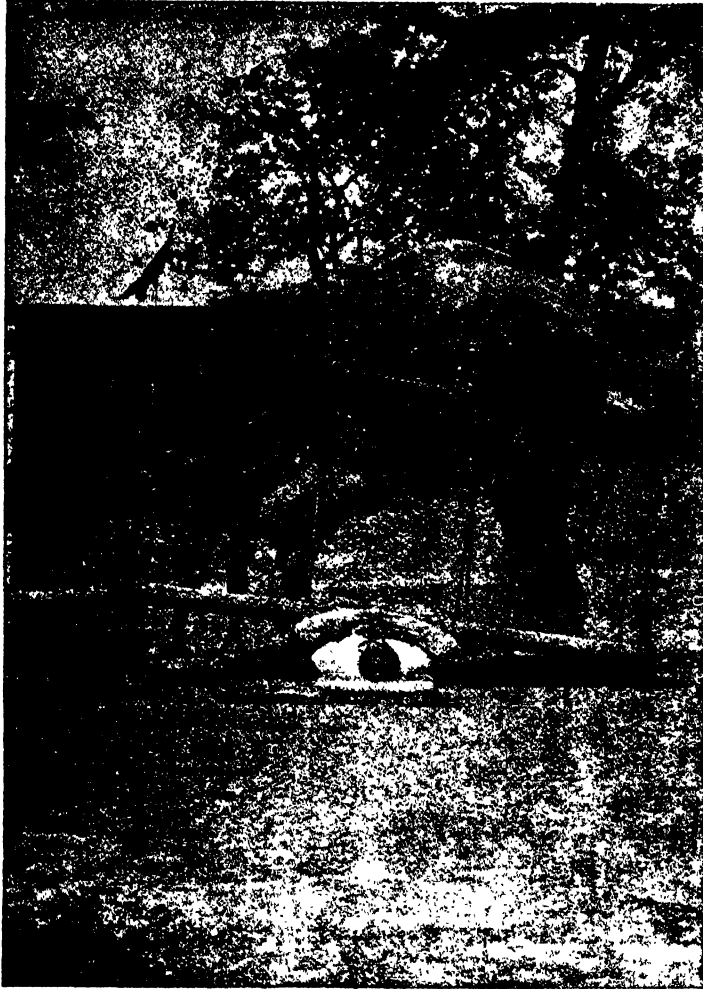
ভীম ভবানীর বক্ষে মুর্শিদাবাদ নবাবের হাতী

কখনও ভবানী দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আগন্তুক নির্ণিমেষ নেত্রে ভবানীর দিকে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি খেলা দেখিতে আসিয়াছ?" তাহাই উদ্দেশ্য শুনিয়া আগন্তুক ভবানীর হাত ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে নেত্রে তখনও সেই বঙ্গীয় যুবকের দেহের দিকে চাহিয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

ভবানী বলিল, "উনিশ।"

"এই বয়সে তোমার এমন শরীর! আমি অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান দেখিয়াছি, এমন অঙ্গসৌষ্ঠব, এমন

বাঘছাল পরিহিত ভীম ভবানী। সাধারণতঃ এই বেশে ইনি খেলা দেখাইতে নামিয়া থাকেন।

বীর গঠন ত দেখি নাই! তোমার মত যুবক পাইলে আমার সর্ব্ববিদ্যা দিয়া পারদর্শী করিয়া তুলি!"

ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই সুখ্যাত প্রোফেসর রামমূর্ত্তি! ভবানী রামমূর্ত্তির বীরপনা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁহার বীর বপুর দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয় মধ্যে তুফান বহিল। খেলা ভঙ্গে রামমূর্ত্তি আবার সস্নেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন; আবার বলিলেন, "যদি তোমার মত যুবক পাইতাম" ইত্যাদি!

মনস্থির করিতে, ভবানীর দিন তিনেক লাগিয়াছিল। রামমূর্ত্তির সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রামমূর্ত্তি ভবানীকে পাইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত পাওয়া শক্ত। জননী জীবিত, তিনি জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। রামমূর্ত্তির দলের সহিত একেবারেই রেঙ্গুন। রেঙ্গুন হইয়া সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ প্রভৃতি পরিভ্রমণ

করিতে লাগিলেন। তখনও ভবানীর খেলা দেখান আরম্ভ হয় নাই, শিক্ষা চলিতেছে। এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল।

যবদ্বীপে এক ওলন্দাজ পালোয়ান রামমূর্ত্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে প্রত্যাখান করা বীর-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। রামমূর্ত্তি সম্মত হইলেন। ভবানী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, "গুরুদেব! আমি আপনার শিষ্য!—আমার সঙ্গে আগে লড়ুক, আমি হারিলে গুরুদেব আছেন!"

রামমূর্ত্তি মহা খুসী। বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বেটা! লড়ো!"

তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান কাৎ! 'চিৎ' হইয়া পড়িতে রামমূর্ত্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাহেব, গুরুর সঙ্গে লড়িবে?"

ওলন্দাজের আর 'গুরু' দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। মুখটি চুণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

রামমূর্ত্তির স্নেহ ভোগ করা ভবানীর ভাগ্যে বেশী দিন ঘটে নাই। শুনিয়াছি কোন এক বিখ্যাত শিল্পী, কলা-বিদ্যার পারদর্শিতায় গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে দেখিয়া শিষ্যকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। রামমূর্ত্তিও ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। গুরুমারা বিদ্যা লইয়া ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসে না! মাংসপেশীগুলা ফুলিয়া কাঁপিয়া ধিক্কার দেয়—এই শরীর কি বসাইয়া রাখিতে পাইয়াছ? বাতে ধরিবে, জং ধরিবে, মড়িচা পড়িবে, খাটাও, খাটাও!

প্রোফেসর কে, বসাকের হিপোড্রোম সার্কাস তখন এসিয়া খণ্ডে খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। দৈবক্রমে তাহারা ভবানীকে লইয়া সফরে বাহির হইল। ভবানী সেই প্রথম স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে আত্মবলের পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্ব্বে লোকে রাম-মূর্ত্তির অদ্ভুত বলের পরীক্ষা দেখিয়াছিল, এবার যাহা দেখিল, তাহা আরো ভীষণ!

রামমূর্ত্তি একখানা মোটর গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী দু'খানাকে দুই হাতে অচল করিয়া দিলেন; ৫ মণ বারবেলটাকে শিশুর ক্রীড়নকের মত টানা হেঁচড়া দেখাই-লেন; সিমেণ্টের পিপের উপর ৫।৭ জন লোককে বসাইয়া পিপের ধার দাঁতে চাপাইয়া শূন্যে ঘুরাইয়া দিলেন; বুকের উপর চল্লিশ মণি পাথর চাপাইয়া তাহার উপর বিশ পঁচিশজনকে খাম্বাজ খেয়াল গাহিবার অবসর দিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সাঙ্ঘাইতে থাকিতে যেন ফার্ম্মার নামে একজন মার্কিণ পালোয়ান ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১০০০ ডলার বাজী। বেচারা হারিয়া, ১০০০ ডলার গণিয়া দিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ফার্ম্মার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন নাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। স্থানীয় কন্‌সাস ভবানীর প্রাণ রক্ষা করেন। ফার্ম্মারে ক্রোধের কারণ জানিয়া তিনি স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী বীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার একখানি নূতন মিনার্ভা মোটর গাড়ী ছিল। বলিলেন আমি চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়ী থামাইতে পারেন এই গাড়ী তাঁহার। ভবানী সফল হইলেন, মিনার্ভা গাড়ীখানি পাইয়া ভবানী তাহা সেইখানেই বিক্রয় করিয়া দেন।

জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট মিকাডো মহোদয় এক-বার ভবানীর বলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একখানি স্বর্ণপদক ও নগদ ৭৫০ টাকা পুরস্কার দেন।

এসিয়া জয় করিয়া ভবানী ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারতমাতা এই বীর পুত্রকে সযত্নে সগর্ব্বে বক্ষে ধরিলেন। সমগ্র ভারতমাতা ভবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লোকের মুখে ভবানী আর ভবানী! তখনও তিনি 'ভীম' খেতাব পান নাই।

ভরতপুরের মহারাজ একবার বলেন, ভবানী যদি তিনখানা মোটর ধরিতে পারেন তবে তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিই। ভবানী ইতিপূর্ব্বে দুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তিন খানা যে কিরূপে ধরিবেন তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর ছিল। মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এইবার

বুঝিব বাঙ্গালী কেমন বীর!' ভবানী বলিলেন, "মহারাজ! আয়োজন করুন।"

ভরতপুরের মহারাজ বাহাদুর, ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও রাজমন্ত্রী—তিনজনে তিনখানা মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে প্রকাণ্ড রজ্জু বাঁধা হইল। ভবানী একটা কোমরে ও দুইটি রজ্জু দুই হস্তে ধরিয়া বলিলেন—"*Go.*" তিনজনেই একসঙ্গে ষ্টার্ট দিলেন। বিরাট শব্দ করিয়া এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জানা গেল এঞ্জিন পুরাদমে চলিতেছে কিন্তু কোনও গাড়ীই এক ইঞ্চিও নড়িতে চড়িতে পারিল না। যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ী তিনখানির পিছনের চাকাগুলি শূন্যে উঠিয়া পড়িল—খর-র-র শব্দে চাকাই ঘুরিতে লাগিল। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সাদরে বঙ্গীয় বীরযুবকের করমর্দ্দন করিলেন।

একখানা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লোহার বরগার উপর ৩০ জন লোককে বসাইয়া কাঁধের উপর ঝুলাইয়া ভবানী, কর্ত্তৃক সে খানাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিণত করিতে, দেখিবার সৌভাগ্য এই লেখকেরই ঘটিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ শিকলবদ্ধ ভবানীকে কেবলমাত্র নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গেই মুক্ত হইতেও দেখিয়াছি। চক্ষের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একসঙ্গে মনুষ্য বোঝাই দুইখানি গো শকট (এক একখানিতে ৫০ জন করিয়া) একই সময় বুক ও উরু-দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

তার পর বুকের উপর হাতী তোলা। ভবানীর শিক্ষাগুরু প্রোফেসর রামমূর্ত্তি সর্ব্ব প্রথম বুকের উপর হাতী চালাইয়া অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুই একজন বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে সকলই সার্কাস দলের শিক্ষিত হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের হাতীই বুকের উপর তুলিতেছিলেন—এ পর্য্যন্ত অন্য হাতী তোলার চেষ্টাও করেন নাই। এক বার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাতীশালায় এক বুনো হাতী আসিয়া হাজির হয়। হাতীটা ওজনে ও আয়তনে, সচরাচর যে সব হাতী দেখা যায় তাহার চেয়ে অনেক বেশী! দৈর্ঘ্যে জীবটী নয় ফুট সাত ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছা বুনো হাতীটাকে ভবানীর বুকের উপর দিয়া চালাইতে পারেন কি না পরীক্ষা করা। ভবানী নবাব বাহাদুরের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের সন্তোষ বিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়া চালাইতে তিনি সম্মত আছেন।

ইতিপূর্ব্বে কোন বীরই এইরূপ একটা অশিক্ষিত বিরাটকায় হাতী বুকে তুলিবার দুরাশাও করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ সার্কাসে যে সব জন্তু থাকে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাহারা কৃশ ও নিবীর্য্য। ভবানী যখন সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাদুর ও তদনীন্তন বঙ্গেশ্বরের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়া সেই হাতীটাকে চালাইয়া দিয়া সুস্থ ও অক্ষত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল। বাঙ্গালীর অত্যদ্ভুত শক্তি দেখিয়া স্বয়ং বঙ্গেশ্বরও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ভবানী সর্ব্বশুদ্ধ ১২ খানি স্বর্ণ ও রৌপ্য পাদক পাইয়াছেন। পদক ব্যতীত শাল আলোয়ান অঙ্গুরি মোটর গাড়ী নগদ মুদ্রাও তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতি —ভারতবাসী—তাঁহার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

স্বদেশী মেলা বসিয়াছে। দেশমান্য (অধুনা স্যর) সুরেন্দ্র বন্দ্যো, বিপিন পাল, রসরাজ অমৃতলাল বসু প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে বীরত্ব লীলা দেখাইয়া ভবানী "ভীম" আখ্যা প্রাপ্ত হন। শুনা গিয়াছে অমৃত বাবু বলিয়াছিলেন, মহাভারতের ভীম এমনই একজন বীর ছিলেন। তুমি দেখিতেছি কলিকালের ভীম! আজ হইতে আর তুমি ত শুধু ভবানী নহ, তুমি ভীম ভবানী!"

তখন হইতেই সাধারণ্যে ইনি ভীম ভবানী বলিয়া পরিচিত। পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহাকে লোকে "ভীম মূর্ত্তি" বলিয়া থাকে।

ভীমমূর্ত্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বীডন ষ্ট্রীটের সা-গণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ভবেন্দ্রের পিতা ৺ উপেন্দ্রমোহন সাহাও বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানীরা বর্ত্তমানে নয় সহোদর। ভবানী মধ্যম; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলেই ভবানীর শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে এমন সুস্থ বলিষ্ঠ ও বীর পরিবার অধুনা অত্যন্ত বিরল।

ভীম ভবানীর বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। তিনি অকৃতদার। বিলাস বাসনা তাঁহার নাই বলিলেও চলে, অত্যন্ত মোটামুটি রকমের জীবন ধারণ করাই ইহাঁর জীবনের উদ্দেশ্য।

এখন ভীম ভবানী আগাসীর সার্কাসে খেলা দেখাইতেছেন। আগাসী সার্কাস দল বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ঘুরিতেছে। কিছুদিন তাহারা বেহালায় তাঁবু ফেলিয়াছিল শুনিয়াছি। ভীম ভবানী ইহাদের নিকট হইতে সাপ্তাহিক দেড় শত টাকা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। কিছু দিন হইতে তিনি আমেরিকায় যাইবার জন্য পাসপোর্টের চেষ্টা করিতেছেন; পাসপোর্ট পাইলেই ভবানী মার্কিন দেশ যাত্রা করিবেন। আমাদের গোবর পালোয়ন এখন আমেরিকায় আছেন; সে দেশের প্রায় সমস্ত পালোয়ানই গোবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

পরিশেষে ভীম ভবানীর খাওয়া দাওয়ার একটা মোটামুটি ফিরিস্তি দাখিল করিতেছি। প্রাতে ২০০ শত বাদামের সরবৎ, এক ছটাক গব্য ঘৃত; মধ্যাহ্নে সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহ্নে ২ বা ২৷৷০ টাকার ফল ও ৫০টি বাদামের সরবৎ এবং এক সের মাংস। রাত্রে আধসের আটার রুটি ও তিন পোয়া মাংস—ইহাই ভীম ভবানীর দৈনন্দিন আহার। ইহা ছাড়া, তাঁহাকে দুই সের মাংস জলযোগ করিতে দেখিয়াছি।

শ্রী বিজয়রত্ন মজুমদার।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগশয্যায়।

রুগ্ন পুত্রের শিয়রে ম্লানমুখে বসিয়া যোগমায়া তাহার ঈষত্তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে মিষ্টস্বরে কে ডাকিল, "খুড়ীমা!"

যোগমায়া স্নেহস্বরে বলিলেন, "অশোক? এস বাবা এস।" সঙ্গে সঙ্গে বিংশতিবর্ষীয় একটী প্রিয়দর্শন যুবক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রোগীর পায়ের কাছে শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ শরৎ?"

যুবককে দেখিয়াই রোগীর মলিন মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কুশল প্রশ্নে পুনরায় তাহা ম্লান হইয়া আসিল। রোগী ক্ষীণস্বরে বলিল, "ঠিক ১১টার সময়েই জ্বর এসেছে।"

"কৈ দেখি"—বলিয়া যুবক রোগীর কৃশ হাতখানি লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল ও আপনার দক্ষিণ হস্ত দিয়া সস্নেহে রোগীর বক্ষ ও ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিল, "জ্বর খুব সামান্যই হয়েছে। কালকের চেয়ে ঢের কম।"

রোগীর মুখে নিরাশাব্যঞ্জক ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল মাত্র। মাতার বুকে সেটুকু শেলের মত বাজিল। যুবক তাহা বুঝিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "খুড়ীমা, আপনি খেয়েছেন?"

মাতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রোগী অনুযোগের স্বরে কহিল, "আমি কখন থেকে বল্‌ছি মা যাও, চাট্টি খেয়ে এস। উনি কিছুতে নড়্‌লেন না; বল্‌লেন, অশোক এলেই যাব।"

যুবক বলিল, "আমার আস্‌তে আজ একটু দেরী হয়ে গেল। এবার তাহলে যান্, খুড়ীমা।"

যোগমায়া আর একবার গভীর স্নেহে পুত্রের মস্তকে, ললাটে ও বক্ষস্থলে হাত বুলাইয়া, ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিলেন। যে দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার বক্ষের ভিতর গুমরিয়া উঠিতেছিল, অতি কষ্টে তাহা রোধ করিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মাতা চলিয়া গেলেও সেই রুদ্ধ নিশ্বাসের কারুণ্যটুকু কক্ষটি ভরিয়া দিয়া বন্ধু দুটিরই চক্ষু সজল করিয়া তুলিল। খানিকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা আসিল না।

একটু পরে শরৎ বলিল, "মায়ের মুখখানি দেখ্‌লে বড় কষ্ট হয়।"

অশোক খুব সহজ স্বরেই বলিল, "তুমি মায়ের একটী মাত্র ছেলে, তোমার অসুখ দেখ্‌লে ভাবনা হবেই তো। আবার তুমি সেরে উঠ্‌লেই মায়ের মুখে হাসি ফুটতে দেরী হবে না দেখো।"

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া শরৎ বলিল, "আমি যে সেরে উঠ্‌বো এমন তো বোধ হয় না।"

"দূর পাগল! ম্যালেরিয়া জ্বর, একটু বেশী দিন হয়েছে বলেই যা একটু দেরী হচ্চে। ও রকম কথা মুখেও এনো না—খুড়ীমা শুন্‌লে মিছামিছি তাঁর মনে কি রকম দুর্ভাবনা হবে বল দেখি!"

অশোক মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে তাহার বুকটাও দমিয়া গিয়াছিল। আবার কিছুক্ষণ উভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

শরৎই সব প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "দেখ অশোক, ক'দিন থেকে একটা কথা বড়ই মনে হচ্চে। সেটার ব্যবস্থা না কল্লে মন স্থির হচ্চে না।"

"কি কথা?"

"ভাবছি, বাড়ীর অর্দ্ধেক, আর যা কিছু আছে তার খানিকটা অংশ মায়ের নামে লেখাপড়া করে দেবো।"

সব দিক দেখিয়া কথাটা যে খুবই যুক্তিযুক্ত তাহা অশোক বেশ বুঝিয়াছিল। তবু এ কথায় সায় দেওয়াতে একটু দোষ আছে। তাই সে চেষ্টা করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার মাথায় এসব খেয়াল ঢুকছে কেন? তুমি যা ভাবছ সে সব কিছুই দরকার হবে না, ভয় নেই।"

শরৎ বন্ধুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "তোমার কথাই না হয় মান্‌লাম—আমার জীবনের কোন ভয় নেই। কিন্তু এ রকম কল্লে কোন ক্ষতিও তো নেই! লোকে কি একেবারে বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লে তবে সম্পত্তি ইন্‌সিওর করে?"

অশোক কোন উত্তর করিল না।

শরৎ বলিতে লাগিল, "পৃথিবীতে মরাটাই যে সব চেয়ে স্বাভাবিক এটা তো মান? আর আমি অবশ্য ভগবানের কাছ থেকে মৌরুসি পাট্টা নিয়ে আসিনি তাও জান। তখন ওরকম একটা ব্যবস্থা করে রাখ্‌লে দোষ কি? ধর হঠাৎ যদি মারাই যাই, মায়ের যে তাহলে একটা কুটোতেও অধিকার থাকবে না। আমার শ্বশুরকে আমার বড়ই ভয় হয়।"

অশোক একটু ভাবিয়া বলিল, "ভবিষ্যৎ ভেবে এ রকম একটা ব্যবস্থা করে রাখা মন্দ নয়—বিশেষ এতে যখন কোনই ক্ষতি নেই। কিন্তু খুড়ীমা কি মনে করবেন?"

শরৎ অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই জন্যেই তোমায় দরকার। মাকে আমি এ কথা বল্‌তে পার্‌ব না। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে এ কাযটা করে দেও। মাকে না জানিয়েও করা চলে; কিন্তু কোন রকমে মার কাণে কথাটা উঠ্‌লেই মা একেবারে অনর্থ কর্‌বেন। সেই জন্যে ভাব্‌ছি বলে করাই ভাল।"

মায়ের কাছে কথাটা তোলা সত্যই শক্ত। অশোক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। আজ আর বলা হবে না। তাহলে উনি ভাব্‌বেন

দুজনে পরামর্শ করে এই কায করছি ; সময় মত একদিন কথায় কথায় এ প্রসঙ্গ তুল্‌ব।"

শরৎ দুয়ারের দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু বেশী দেরী কোরোনা ; ২।১ দিনের মধ্যেই কথাটা তোল। আমি নিজে তো বুঝ্‌ছি, আমার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।"

কথাটা যে সত্য তাহ' অশোক খুবই জানিত। বার বার সত্যের প্রতিবাদ করা মানুষের শক্তিতে সব সময়ে কুলায় না। সে এবার কথাটা একপ্রকার মানিয়া লইয়াই চুপ করিয়া রহিল।

ঘণ্টা খানেক পরে যোগমায়া পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দেহখানি পরিস্কৃত শুভ্র বসনে আবৃত। দেখিলেই বুঝা যায় এই মাত্র অৰ্দ্ধস্নান করিয়া আসিয়াছেন। মুখ খানিতে সর্ব্বদা একটি বিষণ্ণ শান্ত ভাব লাগিয়া আছে। একটি পবিত্রতার মাধুর্য্য সারা দেহ ভরিয়া বিরাজমান।

যোগমায়া আসিয়াই আল্‌না হইতে একখানি সুকোমল সুদৃশ্য আসন লইয়া, পুত্রের সম্মুখে শয্যার নিকট পাতিয়া, হস্তস্থিত পরিস্কৃত গেলাস হইতে একটু জল ঢালিয়া হস্ত মাৰ্জ্জনা করিয়া গেলাসটি যথা স্থানে রক্ষা করিলেন। পর মুহূর্ত্তে কক্ষ ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে দুইটি পাত্র পূর্ণ খাবার আনিয়া আসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এস বাবা, অশোক।"

দুইটি পাত্র—একখানি শ্বেত পাথরের থালা, অপর খানি জারমান সিলভারের। প্রথমটি আম, জাম ইত্যাদি ফলে পূর্ণ। অপরটিতে সদ্যপক্ব লুচি, কচুরি, সন্দেশ ইত্যাদি আহার্য্য বিরাজ করিতেছে।

অশোক শয্যা হইতে আসনে উঠিয়া আসিয়া আহার্য্যের দিকে এ'বারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা খুড়ীমা,তুমি বড় জোর ঘণ্টা খানেক এখান থেকে গিয়েছ, এরি মধ্যে নিজে খেয়ে, সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে', কাপড় চোপড় কেচে এসব খাবার কখন তৈরি করে?"

"তোমাদের কাছ থেকে কি এখন উঠিছি বাবা? মেয়েমানুষের খেতে আর এই দুখান লুচি ভাজতে আর কতক্ষণ বল?"

অকপট প্রশংসমান দৃষ্টিতে অশোক যোগমায়ার পানে চাহিয়া বলিল, "সত্যি খুড়ীমা, তোমার উদার মন। সমস্ত কাযের সুব্যবস্থা দেখে মনে হয় তোমার রাজরাণী হওয়া উচিত ছিল।"

ঈষৎ হাসিয়া যোগমায়া বলিলেন, "রূপে গুণে রাজপুত্রের মত তোরা দুজন যখন আমার ছেলে, তখন তো আমি রাজমাতা—রাজরাণীর চেয়েও বড়।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল, রাজার রাণীই তিনি ছিলেন সত্য। কয়জন রাজার তাঁহার স্বামীর মত উচ্চ মন হইতে পারে? তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া মৃদু আৰ্ত্তনাদের মতই শুনাইল। অনেক খানি প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন তাহাতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

মায়ের কোন্ খানটিতে যে আঘাত লাগিয়াছে, দুজনের কাহারও তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। অশোক অনেকটা অপরাধীর মত মুখ নীচু করিয়া, এটা ওটা মুখে দিতে লাগিল।

যোগমায়া আপনার একটু দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন, "অনেক দিনকার অভ্যাস এখনও ভুলতে পারিনি। খাবার গোছাবার সময় অন্যমনস্ক হয়ে তোমাদের দুজনের জন্যেই লুচি সাজাচ্ছিলাম।"

শরৎ মাতাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য হাসিয়া বলিল, "আর মাস খানেক পরে তোমার অশোককে একা লুচি খেতে হবেনা, আমিও ভাগ বসাচ্ছি।"

"বাবা বিশ্বনাথ শীগ্‌গির যেন তাই করেন" বলিয়া যোগমায়া গলায় বস্ত্র দিয়া যুক্তকরে বিশ্বনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাঁহার চোখের কোণে কোণে যে জল ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহা দুই জনেরই অলক্ষ্যে মুঁছিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব কথা—বংশমর্য্যাদা।

হরধামের যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট কুলীন

ছিলেন। তাঁহাদের আদিবাস বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার প্রপিতামহ হরিদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের হরধাম গ্রামে উঠিয়া আসেন। শুনা যায় উক্ত প্রপিতামহ হরিদেবের নাকি ৫৬টি স্ত্রী ছিলেন; এবং অতগুলি বন্ধন সত্বেও যখন তিনি ইহলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তখন সেই সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র ৫৫ট বিভিন্ন পল্লী হইতে একসঙ্গে দুই মিনিট ব্যাপী রোদন ধ্বনি উঠিয়াছিল। ৫৫টি বলিলাম এই জন্য, কারণ একটি স্ত্রী তাঁহার গৃহেই ছিলেন, এবং তাঁহার ক্রন্দন দুই মিনিটে সমাপ্ত হয় নাই।

যদুনাথ কৌলিন্যের বলে তাঁহার সমাজের সমাজপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি আপন চেষ্টায় সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলেন এবং তাহারই বলে বন বিভাগে কি একটা কায লইয়া বেশ অবস্থা ফিরাইয়াছিলেন; তাঁহারই অর্থে পূর্ব্বপুরুষের পর্ণকুটীর অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছিল। নগদ টাকাও তাঁহার হাতে বিস্তর জমিয়াছিল।

যদুনাথের দুই পুত্র—হরপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ। দুজনেই তাঁহার অধিক বয়সের সন্তান; কারণ অবস্থা ফিরাইয়া প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

৫০ বৎসর বয়সে পেন্সন লইয়া, পারিবারিক শান্তি উপভোগ করিবার জন্য তিনি দেশে আসেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ষোল বৎসর ও কনিষ্ঠের বয়স দশ। দেশে ফিরিবার বৎসরখানেকের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। তিনি আর দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই। বৎসর ২৫ বয়সের এক নিপুণা দাসী তাঁহার সংসারের কর্ত্রীরূপেই ছিল। লোকে সে সম্বন্ধে কাণাঘুসা করিতে ছাড়িত না। কিন্তু অর্থশালী সমাজপতির বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারে এমন সাহসী লোক সচরাচর বড় একটা মিলে না; কাযেই প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোনও মন্দ কথা শুনিতে হয় নাই। সমাজপতি হইতে হইলে যে আদর্শ পুরুষ হইতে হয় এমন কথাও কখন কাহারও মুখে শুনা যাইত না—এবং যতদিন তাঁহার লোহার সিন্ধুকের ভার কমিবে না ততদিন তাঁহার কোন ভয় নাই ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি তো আর বিলাত যান নাই যে তাঁহাকে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে!

যদুনাথ পুত্রদুটিকে ভালরূপ ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। নিকটস্থ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে হরপ্রসাদ এন্‌ট্রান্স পাশ করিতেই তিনি তাহাকে কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে রাখিয়া এফ-এ পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়েই পড়িতে লাগিল। যথাসময়ে হরপ্রসাদ এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে লাগিল।

সেই বৎসরই যদুনাথ পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্রবধূটি রূপে গুণে অতুলনীয়, নাম যোগমায়া। যোগমায়ার পিতার মাত্র দুইটি কন্যা ছিল, পুত্র আদৌ হয় নাই। কন্যা দুইটি জন্মিবার বৎসর কয়েক পরেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। উচ্চশিক্ষিত যজ্ঞপতি বাবু কন্যাদুটিকে নিজে সযত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দুটী কন্যাকেই ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে শিখাইয়াছিলেন, তা ছাড়া সীবন ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে তাহারা উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়াছিল।

বিবাহের পর দুই বৎসর হরপ্রসাদ ও যোগমায়ার বড় সুখেই কাটিয়াছিল। চরিত্র মাধুর্য্যে তিনি শ্বশুর, দেবর, স্বামী ও এমন কি গৃহের দাসী রূপসী কর্ত্রীটিরও সন্তোষ বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সুখ তাঁহার বেশী দিন সহিল না।

হরপ্রসাদ তখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, এমন সময় যদুনাথবাবু এক নিদারুণ সংবাদ পাইলেন। তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলেন যে, তাঁহার বধূমাতার জননীর চরিত্রে এমন একটী কলঙ্কের রেখাপাত হইয়াছিল, যাহা সমাজ এমন কি স্বামী পর্য্যন্ত কিছুতেই মার্জ্জনা করে না। কিন্তু যজ্ঞপতি বাবু সমস্ত জানিয়াও স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিয়াছিলেন যেন কিছুই ঘটে নাই। সমাজ ইহার জন্য তাঁহাকে নির্য্যাতন করিতে ক্রটি করে নাই, কিন্তু তিনি দৃঢ়চিত্ত ছিলেন এবং ক্রুদ্ধ ও বৃদ্ধ সমাজের ভ্রুকুটী গ্রাহ্য করেন নাই। শুনা

যায় স্বামীর এইরূপ উদার ক্ষমাশীল ব্যবহারে স্ত্রীর মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য অনুতাপের অন্ত ছিল না এবং এই অনুতাপই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। শেষ জীবনে স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিতে করিতে দেবতার চরণে মস্তক রাখিয়া তিনি তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যে কলঙ্ক অভাগিনী একবার অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার মার্জ্জনা কোথায়? যজ্ঞপতি বাবু ভাগলপুরে কার্য্য করিতেন এবং স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই তিনি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। পাছে দেশে আসিলে স্ত্রীর মনোবেদনার ও নিন্দার কোন কারণ ঘটে এই আশঙ্কায় তিনি আর দেশে ফিরেন নাই। দুই মেয়েরই বিবাহ তিনি ভাগলপুর হইতে দিয়াছিলেন। সেই জন্যই কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই।

বিবাহের মাস ছয়েক পরে তিনি গোপনে জামাতা হরপ্রসাদকে এই কুৎসার কথা বলিয়াছিলেন। এবং তাহা শুনিয়াও জামাতার তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছিল, ইহা দেখিয়া তিনি বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন এবং কি একটা বেদনাবিদ্ধ আনন্দে তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সংবাদ যদুনাথবাবুর সমাজপতিত্বে ভীষণ একটা আঘাত করিল। প্রতিবেশীরা এবার সাহস করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইল। তিনিও দেখিলেন, সমাজপতি হইয়া এ বিষয়ে নীরব থকো তাঁহার কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। সকলের পরামর্শ মতে স্থির হইল, বধূকে পরিত্যাগ করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। রূপে গুণে সর্ব্বাংশে কার্ত্তিকের মত অমন ছেলের আবার বিবাহের ভাবনা কি? গ্রামে বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল।

পুত্র তখন কলিকাতায়। তিনি তাহাকে 'বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ' দুই দিনের ছুটী লইয়া আসিতে লিখিলেন। যোগমায়া সেইদিন হইতে শ্বশুরের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন এবং শ্বশুরের অভিপ্রায় ও তাহার কারণ অবগত হইয়া, বুদ্ধিমতী হইয়াও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। স্বামীর ভালবাসায় তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তবু কিছুতে মন বাঁধিতে পারিলেন না।

পরদিন হরপ্রসাদ উদ্বিগ্নহৃদয়ে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর বিবর্ণ ও জীর্ণ মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, তিনি মায়ের কলঙ্কের কথা বলিতে গিয়া অর্দ্ধপথে কাঁদিয়া স্বামীর পা দুটী জড়াইয়া ধরিলেন। হরপ্রসাদ পিতার আহ্বানের কারণ তখনই বুঝিলেন। পায়ের কাছ হইতে স্ত্রীকে সস্নেহে তুলিয়া তাহার অশ্রু-মলিন মুখখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ছিঃ ও তো কিছুই নয়। তুমি আমাকে এমনি ভাব যে এরি জন্যে আমি তোমাকে ত্যাগ করব? ছিঃ, চুপ কর।" বলিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

স্বামীর বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া, এমন দেবোপম স্বামীর প্রেমে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করিয়াছিলেন ভাবিয়া যোগমায়া লজ্জায় মরিয়া গেলেন। অশ্রুধারায় কৃতজ্ঞতার সকল কথাই ভাসিয়া গেল।

এমন সময় পিতার আহ্বান আসিল। হরপ্রসাদ যোগমায়াকে আশ্বাস দিয়া পিতার নিকটে গেল। যোগমায়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদনের নাম জপ করিতে লাগিল।

যদুনাথ তখন অন্তঃপুরে আপনার শয়নকক্ষে বসিয়াছিলেন। কক্ষটী সুপ্রশস্ত। চারিটী দেওয়ালে চারিটী হরিণের শিংয়ের ব্রাকেট। মেঝেতে বিস্তৃত একখানি সুবৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন তাঁহার জীবনের বনপর্ব্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আহারান্তে দিবানিদ্রা ভঙ্গে তিনি পুত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া এইমাত্র পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। পালঙ্কের উপর শয্যায় বসিয়া তিনি পুত্রের অপেক্ষা করিতেছেন।

দাসী আসিয়া তামাক দিয়া গেল। নিদ্রাজড়িত স্বরে যদুনাথ বলিলেন, "রঙ্গ, দুটো পাণ দিয়ে যা তো। রঙ্গ বা রঙ্গিণী গোটা ছয়েক পাণ আনিয়া ডিবায় রাখিয়া গেল। এমন সময় হরপ্রসাদ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পিতাকে প্রণাম করিয়া হরপ্রসাদ পিতার সম্মুখস্থ

ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে বসিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই যদুনাথ সংক্ষেপে বধূমাতার জননীর কলঙ্কের কথা বলিলেন। তার পর, আপনার কলঙ্কলেশশূন্য বংশ-মর্য্যাদার কথা পুত্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"এক্ষেত্রে বধূকে ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। তুমি কালই ওকে ভাগলপুরে রেখে এস। এর জন্যে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়োনা, এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে উচ্চ বংশের বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দেবো।"

হরপ্রসাদ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আপনি যা শুনেছেন তা সবটা যদি সত্যও হয়, তাহলেও কি এ কাযটা উচিত হবে? ওর এতে কি দোষ?"

পুত্র যে এক কথায় পত্নীত্যাগে রাজী হইবে ইহা অবশ্য যদুনাথ ভাবেন নাই। তাই পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ হর, এ দোষগুণের কথা হচ্চে না। এ হচ্চে বংশমর্য্যাদার কথা। আগুনে হাত ইচ্ছায় দিলেও পোড়ে অনিচ্ছায় দিলেও পোড়ে এ কথা মান ত?"

শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধে হরপ্রসাদের কিছু বলিবার না থাকিলেও তিনি বলিলেন, "শুনেছি শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন বলে বোধ হয় না। তাঁর অবর্ত্তমানে অরক্ষিত অবস্থায় আপনার পুত্রবধূ সেখানে থাকলে অপমান হবে না? বংশমর্য্যাদায় আঘাত লাগবে না?"

যদুনাথ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাকে আমি মন্দ ভেবে পরিত্যাগ করছি, তার আখেরে কি হবে সে সব তো আমার ভাবার দরকার নেই। এমন মেয়ে যে এতদিন ঈশ্বরী বাঁড়ুয্যের বংশে থাকতে পেরেছে এই তার ভাগ্যি। তোমার শ্বশুর তো আমার সঙ্গে জুয়োচুরী করে আমার উচ্চ মাথা হেঁট করাবার উপক্রম করে-ছিলেন।"

হরপ্রসাদ পিতার পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "বিবাহের কিছু পরেই তিনি সব কথা আমাকে বলে-ছিলেন। সেটা, আপনি যা বলেছেন অতখানি নয়, সামান্য একটু অন্যায়—আর এরি জন্য তিনি সারাজীবন অনুতাপ করেছিলেন।"

শ্লেষের সহিত যদুনাথ বলিলেন, "সামান্য একটু অন্যায় বটে! তুমি তাহলে সব জেনেও কোন প্রতি-বিধান করনি?"

পুত্র নিরুত্তরে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। এবার ক্রোধের সহিত যদুনাথ বলিলেন, "যাক্, সে সব যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তোমার উদ্দেশ্য কি তাই বল। বউকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ ত?"

হরপ্রসাদ এবার বিনীত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আপনি যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছেন, তাকে বিনা দোষে আমি কি করে ত্যাগ করবো বলুন? আমায় ক্ষমা করবেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য যদুনাথের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পুরাতন খেলনার পরিবর্ত্তে নূতন খেলনা পাইলে শিশুরা তাহা লুফিয়া নেয়; আর ইহার না হয় একটু বেশী বয়স হইয়াছে—তাই বলিয়া কি একেবারে পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকিতে হইবে? যদুনাথ চেষ্টা করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, এইবার শেষ কথা তোমাকে বলব।" সঙ্গে সঙ্গে যদুনাথ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হরপ্রসাদও পিতার অনুগমন করিলেন।

সে কক্ষে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা বড় লোহার সিন্ধুক ছিল। আলমারী হইতে চাবি লইয়া যদুনাথ সিন্ধুক খুলিলেন। সিন্ধুকের ভিতর হইতে এক খানি পুরু ও বড় কাগজের খাম বাহির করিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিলেন। তার পর একে একে ৪০ খানি কোম্পানীর কাগজ তাহার ভিতর হইতে বাহির করি-লেন। সবগুলিই এক হাজার টাকার। পুত্রকে সেগুলি দেখাইয়া যদুনাথ বলিলেন, "দেখ হর, ৪০হাজার

কোম্পানীর কাগজ তুমি দেখলে। হাতে খাটানোর জন্যেও ১০৷১৫ হাজার টাকা আমার আছে জান। এ ছাড়া বিষয় সম্পত্তি কিছু আছে তাও তোমার অবিদিত নেই। আমি অবর্ত্তমানে, আমার শ্রাদ্ধাদির খরচ বাদ দিলেও, তোমাদের দুই ভায়ের এক এক অংশে সবশুদ্ধ হাজার পঁচিশ ত্রিশ পড়বে এটা বুঝতে পারছ। কিন্তু যদি আমার অবাধ্য হও, এর একটা কাণা কড়িও পাবে না। এখন তোমার অভিপ্রায় কি বল।"

মুহূর্ত্তের জন্য হরপ্রসাদের মুখে একট তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ছায়া পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি যদি একটা উচিত আদেশ করতেন, খুব শক্ত হলেও আপনার মুখের কথাতেই আমি তা করতাম, আপনার টাকার লোভে নয়। আপনি আমাদের বংশকে উচ্চ বংশ বলছেন, আমি সেই উচ্চ বংশেরই মর্য্যাদা রাখবো—টাকার লোভে অধর্ম্ম করব না।"

উচ্চ কণ্ঠে যদুনাথ কহিলেন, "তুমি তা হলে ঐ ছোটলোকের মেয়েকে ত্যাগ করবে না?"

পুত্র স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমায় ক্ষমা করবেন।"

ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া যদুনাথ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তা হলে এই দণ্ডে তোমরা দুজনে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। এখনি যাও—আর যেন কখনও তোমাদের মুখ আমার দেখতে না হয়।"

এবার হরপ্রসাদের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাঁহাদের মা নাই বলিয়া এত সহজে পিতা দূর হও কথাটা বলিতে পারিলেন। মা থাকলে—

প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুরোধ করিয়া হরপ্রসাদ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

উত্তরচরিতে চিত্রদর্শন

কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তর-রামচরিত সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যাকাশের সূর্য্য চন্দ্র। আলঙ্কারিক-মতে যাহাই হউক, উত্তরচরিত করুণ রসেরই নাটক। ভবভূতি এক স্থলে "একো রসঃ করুণএব নিমিত্তভেদাৎ" বলিয়া তাহা স্বীকারও করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের মহা বিয়োগান্ত কাব্য আজি মিলনান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে।

রামসীতার মিলন এবং বিরহের ভিতর দিয়া করুণ-রসের উদ্দীপনা করাই উত্তরচরিতের প্রধান কার্য্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—মিলন ব্যতীত বিরহ খোলে না; রাম-সীতার বিরহটি কি প্রকার, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদের মিলনদৃশ্য দেখা প্রয়োজন তাই চিত্রদর্শনের অবতারণা। কিন্তু চিত্রদর্শনে শুধু মিলনদৃশ্য বলিয়া নহে, বিরহদৃশ্যও ত উজ্জ্বল ভাবে ফুটান হইয়াছে; তবে চিত্রদর্শনে কেবল মিলনদৃশ্যের অবতারণা আর কৈ হইল?

আমরা বলি সীতাবিসর্জ্জন ঠিক্ কি জিনিষ, তাহা বুঝিতে হইলে রামসীতার মিলন এবং বিরহ দুইই ভাল-রূপে বোঝা আবশ্যক। স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় দুই দিক্ দিয়া না বুঝিলে কোন বস্তুই সম্যক্ বোঝা হয় না। পত্নীশোক প্রকৃত উপলব্ধি করিতে হইলে পত্নীপ্রেম এবং পত্নীবিরহ দুইই উপলব্ধি করা আবশ্যক।

সীতাহরণে রামের বিরহ সীমাবদ্ধ; আশাযুক্ত এবং প্রতীকারার্হ বলিয়া উহা সাধারণ বা ছোট বিরহ। সীতা-নির্ব্বাসনে রামের যে বিরহ, তাহার সীমা নাই, শেষ নাই, প্রতীকারেরও কিছু নাই। মিলনের কোন আশা নাই বলিয়া এ নির্ব্বাসন-বিরহ বড় অসাধারণ বিরহ। একটি মেঘে ঢাকা সূর্য্যের দশা, অপরটি অস্তগত সূর্য্যের

অবস্থা। একটি দৈবকৃত আকস্মিক ঘটনা, অন্যটি স্বহস্ত-কৃত হৃৎপিণ্ডচ্ছেদ—আত্মহত্যা।

আশা থাকিলেই সব থাকে; আশা ফুরাইলে সবই ফুরায়। সেই আশান্বিত সীতাহরণ-বিরহই যখন অত তীব্র, তখন বিসর্জ্জন বিরহ কত তীব্র, তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? সে দুঃখে পাষাণ বিগলিত হয়, বনের পশুপক্ষী কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, তরুলতাও অশ্রুবর্ষণ করে। সে দুঃখেও তবু ক্রন্দনের উপায় ছিল। কিন্তু এ সীতানির্ব্বাসন-দুঃখে রামের কাঁদিবারও উপায় নাই। লজ্জায় ক্ষোভে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তবু কাঁদিয়াও যে একটু তৃপ্তি হইবে, তাহারও যো নাই। তাই আমাদের মনে হয়, উত্তরচরিতে চিত্রদর্শনের

১ম উদ্দেশ্য—

রামসীতার অলৌকিক প্রণয় ও সীমাবদ্ধ প্রতীকার্য্য বিরহ উভয়ই পরিস্ফুট করা। রাম সীতাকে কেমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, সীতাকে হারাইয়া পাগলের মত কি ভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এই দুইটি ছবিই চিত্রদর্শনে সমুজ্জ্বল। বহ্নি ও গঙ্গোদকবৎ পবিত্রা জানিয়াও, লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনী করিয়া পূর্ণগর্ভা জানকীকে নির্ব্বাসন দেওয়ায় রামের যে যাতনা, সীতা-হরণ বিরহে সে যাতনার শতাংশের একাংশও ছিল না।

২য় উদ্দেশ্য—

রামের বাল্যজীবন মহাবীর-চরিত নাটকে বর্ণিত। উত্তরচরিতে মাত্র শেষার্দ্ধই বিবৃত। রামচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা না করিলে উত্তরচরিত স্বতন্ত্র নাটক রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। মহাবীর চরিতের শেষার্দ্ধরূপে উত্তরচরিতকে পরিগণিত করা কবির অভিপ্রায়ও নহে। চিত্রদর্শনচ্ছলে এই শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইল।

২য় উদ্দেশ্য (খ)—

ভবভূতি মহাবীর-চরিত নাটকে রামায়ণের পথ ছাড়িয়া দিয়া এক নূতন পথ অবলম্বন করেন, ফলে নাটকের সৌন্দর্য্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। রস-সিন্ধুটি লবণাক্ত জলেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শেষে কবি আবার উত্তরচরিত প্রণয়নের কালে মহাবীর চরিতে অনুসৃত নূতন পথ ছাড়িয়া দিয়া রামায়ণের চিরন্তন পথই গ্রহণ করিলেন।

মহাবীর চরিতে সমস্তই অদ্ভুত। বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া জনকভ্রাতা কুশধ্বজ, সীতা উর্ম্মিলাকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞস্থলে উপনীত। হরধনু সেই যজ্ঞস্থলেই সুরক্ষিত; ধনুর্ভঙ্গও সেই স্থানেই। অবশ্য বিবাহোৎসব মিথিলাতেই হয়। আবার সেই বিবাহ সভায় ভার্গবের আগমন এবং বীরদর্পের অবসান।

উত্তরচরিতে "এই মিথিলাবৃত্তান্ত," তার পরই সীতার উক্তি—অবহেলে হরধনু ভঙ্গ করিয়া ঐ যে আর্য্যপুত্র চিত্রিত রহিয়াছেন। বোঝা গেল মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ। "এই যে ভগবান্ ভার্গব", তার পরক্ষণেই "এই আমরা অযোধ্যায় আসিলাম।" জানা গেল পথিমধ্যেই ভার্গবের আগমন।

মহাবীর চরিতে মাল্যবান্ নামে কূটরাজনীতিজ্ঞ এক মন্ত্রীর অবতারণা করা হইয়াছে। সে মন্ত্রী রাবণের মাতামহ, রাক্ষসকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী। মন্ত্রী সীতার সহিত রাবণের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া জনকের নিকট এক দূত পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিল। বিফল হইয়া শেষে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া রামের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিল। শূর্পণখাই জাল মন্থরা সাজিয়া রামের হস্তে এক জালপত্র প্রদান করে। সে পত্র দশরথ নামের মোহরাঙ্কিত ছিল, কাযেই রাম সেই পত্র সত্য বলিয়া বুঝিয়া অভিষেক-ক্ষেত্র হইতে বনযাত্রা করিলেন। সে পত্রে ভরতের রাজ্যলাভ এবং সীতালক্ষ্মণ সহ রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এই দুইটি আদেশই ছিল।

রাক্ষসকুল নাশই রামের জীবনের ব্রত, সেই জন্য অরণ্যে নিরাশ্রয় রামকে হয় হত্যা করিতে হইবে, নতুবা সীতাহরণ করিয়া তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া জীবন্মৃত রাখিতে হইবে—মাল্যবানের ইহাই উদ্দেশ্য।

উত্তরচরিতে মন্থরাও জাল নহে, কৈকেয়ীও

নিরপরাধা নহে। "অয়ে মধ্যম মাতার বৃত্তান্ত আর্য্য কৌশলে এড়াইয়া গেলেন"—লক্ষ্মণের এই উক্তিই মন্থরা কৈকেয়ী ব্যাপারটির সত্যতা প্রমাণ করিতেছে।

৩য় উদ্দেশ্য –

উত্তরচরিত নাটকে কবি দুই এক স্থলে নূতন পথ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া নূতন সৌন্দর্য্যের অবতারণায় সমর্থ হইয়াছেন। সেই নূতন পদ্ধতির সম্বন্ধে একটি আভাসও সেই সঙ্গেই রাখিয়া গিয়াছেন। লবকুশের জৃম্ভকাস্ত্র বিদ্যার হেতুটিও পরিস্ফুট হইয়া রহিল।

সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, রামায়ণে পাঁচমাস গর্ভাবস্থাতে সীতার বিসর্জ্জন। আর উত্তরচরিতে "আতঙ্ক স্ফুরিত গর্ভগুর্ব্বী"—পূর্ণগর্ভা সীতার নির্ব্বাসন। উত্তর চরিতের সীতা বড় কোমলা দুর্ব্বলা, রামায়ণের সীতার মত আদৌ তেজস্বিনী নহেন। তাই তিনি রাবণকে লঙ্কেশ্বর জানিবামাত্র একেবারেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। কঠিন স্পর্শে নবমালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া একেবারে ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িল। একেবারেই জ্ঞানহীনা মূর্চ্ছিতা। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবামাত্র ভবভূতির সীতা অতি তীব্র শোক ক্ষোভ সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিলেন। রামায়ণের সীতার মত তিনি ভাবিলেন না যে গর্ভে রঘুকুল-সন্তান বর্ত্তমান।

ভবভূতির সীতা যেমনই গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিলেন অমনই ফুল্লকমলযুগল শিশু দুইটী সেই গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া উঠিল। গঙ্গাদেবী সেই সীতাকে আর পুত্র দুটিকে মাতা ধরিত্রী দেবীর নিকট পাতালে রাখিয়া আসিলেন। চিত্র দর্শন প্রস্তাবে রাম গঙ্গার উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—"রঘুকুল দেবতা মা আমার, অরুন্ধতীর মত সতত বধূ সীতার মঙ্গলচিন্তা-নিরতা থাকিও।" সেই অনুরোধেই গঙ্গাদেবী সীতার সকল ভার লইয়া আদর্শ সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। এই নূতন ঘটনার বীজটি চিত্রদর্শনের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছিল।

৪র্থ উদ্দেশ্য –

প্রকারান্তরে বধূসহবাসের সাক্ষী পঞ্চবটী, গদ্গদনাদিনী গোদাবরী, "বহু নির্ঝর কন্দর" প্রস্রবণ গিরি, "স্নিগ্ধশ্যাম-ভীষণাভোগরুক্ষ" দণ্ডকারণ্য প্রভৃতির চিত্রগুলি দেখান হইল। সেই পুত্রনির্ব্বিশেষে পালিত মৃগ ময়ূর করিশিশুদেরও পরিচয় দেওয়া হইল। ইন্দ্রজালপিচ্ছিকাবৎ বিচিত্র তুলিকার স্পর্শে জড়ও চেতন হইয়া দেখা দিল; পশুপক্ষীরাও যেন মানব মানবী আকারে ফুটিয়া উঠিল। পঞ্চবটী, গোদাবরী, দণ্ডকারণ্য, প্রস্রবণ, গিরি প্রভৃতি স্থানগুলি যে না দেখিল, সে রাম সীতার প্রণয় কি বুঝিবে? মৃগ ময়ূর করিশিশু, তরু লতা তৃণ গুল্ম যে না লক্ষ্য করিল—সে সীতার স্নেহ কি উপলব্ধি করিবে? যে স্নেহ জড়ে চেতনে, মানবে পশুতে, তরু লতায় ছড়াইয়া আছে, তাহা না অনুভব করিলে সীতার ভালবাসা যে সাধারণ ভালবাসার মতই বোধ হইবে! সীতার প্রতি রামের ভালবাসা, সীতার বিরহে রামের যন্ত্রণা যে না দেখিল, না বুঝিল, সে সীতা বিসর্জ্জনের কি বুঝিবে? সীতাবিসর্জ্জন ব্যাপারটি না বুঝিলে উত্তরচরিত পাঠই তাহার ব্যর্থ।

৫ম উদ্দেশ্য—

রামই সীতার সর্ব্বস্ব। রাম কাছে থাকিলে সীতার নিকট শ্মশানও নন্দনকানন, অরণ্যও অন্তঃপুর, মর্ত্তও স্বর্গ। রামের কথা, রামের ভালবাসা, রামের স্মৃতি, রামের দুঃখ সীতার বড় প্রিয়। সীতা কি ভালবাসেন, কি হইলে তিনি তৃপ্তি পান, লক্ষ্মণ তাহা ভালরূপই জানে। তাই দুর্ম্মনায়মানা জানকীর চিত্তবিনোদনের জন্যই লক্ষ্মণের এই চিত্রপ্রদর্শন। সীতার বহুদিনের সাধ একবার তিনি আবার বনে যাইবেন, সেই পরিচিত স্থানগুলি, সেই সমসুখদুঃখা সখীদের দেখিবেন। সে ইচ্ছা চিত্রদর্শনে আকুলতায় পরিণত হইল। অতীত বর্ত্তমান হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

সীতার মনে হইতেছিল করিপোতটি যেন তাঁহার

কর্ণপূর হইতে লবলী-পল্লব আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিতেছিল যেন ময়ূরশিশুটি করতালির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলাকারে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সীতা তখন এক নূতন রাজ্যে যেন আর্য্যপুত্রের হাত ধরিয়া দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন, স্নেহময় পতি তাঁহার মাথার উপর গুরুভার আতপত্র ধরিয়া আছেন। সীতার চক্ষু সুখাবেশে মুদিতপ্রায়। এমন সময় সৈকতলীন হংসশ্রেণী ডাকিয়া উঠিল। সীতার চমক ভাঙ্গিল—এ কি, এ যে চিত্র!

শূর্পণখার চিত্র দেখিয়াই যাহার এত ভয়, সেই স্বভাব-ভীরু গর্ভভারখিন্না সীতাকে নির্জ্জন অরণ্যে একাকিনী পরিত্যক্তা হইতে হইবে, নিন্দিত নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। হৃদয়ক্ষেত্র ঠিক মত প্রস্তুত না করিলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কবি পাঠক বা শ্রোতাদের হৃদয়-ক্ষেত্র এইরূপে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নচেৎ রস-ক্ষেপে ফল কি?

রাম, সীতার বনগমনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য লক্ষ্মণকে বনযাত্রার উপযোগী অস্খলিত-সম্পাত রথ আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। দশমাস গর্ভাবস্থায় বনগমন ব্যবস্থা যে কিরূপ, তাহা আমরা বুঝিলাম না। রামায়ণে পাঁচমাস গর্ভাবস্থায় অবশ্য সে ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে।

কবি মহত্ত্বের উচ্চ শিখর হইতে রামকে নামাইয়া সমতল ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, আবার সীতাকেও তদ্রূপ দুর্ব্বল-কোমলা করিয়া রামেরই অনু-রূপা করিয়া লইয়াছেন। বঙ্গীয় সমালোচক সীতা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া রামের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং তীক্ষ্ণ বাণক্ষেপে কবির অঙ্গে আঘাতও দিয়াছেন। ইহাতে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত।

রামায়ণের তেজস্বিনী সীতা মারীচ রাক্ষসের কপট ক্রন্দনকে রামেরই মৃত্যুকালীন আহ্বান নিশ্চয় করিয়া উদ্ভ্রান্তা হইয়া উঠেন; তাই সাহায্যার্থ গমনে অনিচ্ছুক দেখিয়া লক্ষ্মণকে অকথ্য গালি দেন। ভবভূতির সীতা সেরূপ কিছু করেন নাই। চিত্রদর্শনে তাহার কোন ইঙ্গিতও নাই। অমন কোমলা সীতার ঐরূপ অকথ্যকথন স্বাভা-বিক নহে। বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক কেন যে ভবভূতির প্রাপ্য সম্মান বঙ্গীয় কবিকে দিয়া গেলেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে চিত্রদর্শন দ্বারা মহা-কবি অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইলেন; এবং নূতন যে পথ অবলম্বন করিবেন, তাহারও পূর্ব্বাভাস দিয়া গেলেন। *

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মেদিনীপুর অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

"আমার দেখা লোক"

ই, ভি, ওয়েষ্টম্যাকট।

১৮৮০ অব্দের অক্টোবর মাসের শেষে আমি সর্ব্বপ্রথম চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া নোওয়াখালিতে গিয়া পৌছিলাম এবং পূর্ব্ব পরিচিত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ৺ভবতারা ঘোষের বাসায় গিয়া উঠিলাম। ভবতারা বাবুর পরিবারবর্গ তখনও চুঁচুড়ায় আমাদের বাড়ীর খুবই নিকটে গলির ঘাটের উপর বাড়ীটীতে থাকিতেন।

মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবকে দেখিলাম। কড়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; একটী চক্ষু টেরা বলিয়া সর্ব্বদা চশমা পরিয়া থাকেন, এবং সেই চশমার পরকলায় সবুজ কাগজ আঁটিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটী ফুটা রাখিয়া চক্ষুকে বল-

পূর্ব্বক সোজা দৃষ্টি অভ্যাস করাইতেছেন। শুনিলাম একদিন জ্বর হইয়াছিল; বিশ মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া মফস্বলে গিয়াছিলেন এবং জ্বরটাকে "ঝাড়িয়া ফেলিয়া" দিয়াছিলেন (শূক অফ্ দি ফীভার)।

সাহেব প্রথম সাক্ষাতে আমাকে বলিলেন, "তুমি এ কার্য্যে একেবারে নূতন লোক বলিয়া তোমাকে এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পেস্কার—নবকুমার ঘোষকে দিলাম। উহাকে আবার অপরের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে; এজন্য শীঘ্র শীঘ্র আফিসের সকল কায এবং সকল রেজেষ্টারির বিষয় নিজে জানিয়া লইও। ইহার পরের বারে হয়ত একেবারেই অজ্ঞ নূতন লোককে শিখাইয়া লইয়া তোমাকে কার্য্য করিতে হইবে।"

সাহেব প্রকৃতই ভাল লোক দিয়া আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথম মোকদ্দমার কথায় আমি নবকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এদেশে দিনে দুপুরে ধান চুরি হয় নাকি? আমি ইহা কখন শুনি নাই - তবে আমার বাড়ী পল্লীগ্রামে নয়।" নবকুমার বাবু বলিয়াছিলেন, "ওসব কথা পেস্কার প্রভৃতি আমলাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিতে নাই; অন্য হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—কিন্তু তাহাই বা কেন? বাবু যদুনাথ বসু এখানে খুব নামী হাকিম ছিলেন; তাঁহার সুবিচারের যশ এখানের সকলেই আজও করে। আমি তাঁহার নিষ্পত্তি করা কতকগুলা মোকদ্দমার নথি মহাফেজখানা হইতে আনিয়া দিতেছি, সেইগুলি পড়িবেন—তাহাতেই কিরূপভাবে সাক্ষীর কথা আলোচনা করিয়া মোকদ্দমার রায় লিখিতে হয় এবং অন্য সকল বিষয়ই বুঝিতে পারিবেন। দুইটা মোকদ্দমা করিয়া ফেলিলেই আর এতটা ভয় ভয় ভাব থাকিবে না; ন্যায় বিচার করিতে প্রকৃতপক্ষে যাঁহার আগ্রহ, তাঁহার হাত দিয়া যে বেশী ভুল হয় না—এটা এই ২৫ বৎসর পেস্কারী করিয়া দেখিতেছি।" আমার এই সহায়তার এবং এই সাহস প্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল। নবকুমার বাবুই আমার চক্ষে আদালতের আমলাদিগের মধ্যে, ৩৩ বৎসর নানা জেলায় চাকরীর পরও, সর্ব্বোচ্চ বলিয়া লক্ষিত আছেন,—তীক্ষ্ণদর্শী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব উঁহাকে ঠিকই চিনিয়া লইয়াছিলেন। 'ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব ডেপুটী কলেক্টর শিখাইয়া তোলেন ভাল'- এইরূপ খ্যাতি ছিল। তাঁহার কাছে আমি এক বৎসরেই সকল কার্য্য কিছু না কিছু শিখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথমে ইংলিশ আফিসের চার্জ্জ দিলেন। সকল চিঠির মুসাবিদা আমাকে দেখিয়া সহি করিয়া সাহেবের কাছে পাঠাইতে হইত। একটা জেলায় কত প্রকারই কায হয়। সকলের ভিতরই অল্প বা অধিক পরিমাণে ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের হাত। কতপ্রকার চিঠি আইসে; কত প্রকারই হুকুম দিতে হয়!

একখানা, বড় চিঠির জবাবের মুসাবিদায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলাম। দেখিলাম উহাতে সাহেব লাল পেন্সিলে তাঁহার বড় বড় অক্ষরে ভাল (গুড্) এই শব্দটী মাত্র লিখিয়া দিলেন; তাহার নিম্নে শাঁটে একটী সহি পর্য্যন্ত করেন নাই; মনে একটু সুখ হইল এবং সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, খাটুনিটা বুঝিয়া উৎসাহের জন্য মিষ্ট কথা বলাই বরাবর ভাল কায পাওয়ার সরল ও সহজ উপায়। আমিও ঐ ভাবে লাল পেন্সিলের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছি এবং উত্তরকালে অনেক লোক আমার কাছে আফিসের কাযে একটু বিশেষ উৎসাহের সহিতই খাটিয়াছেন। মাস দুই বাদে সাহেব আমাকে ট্রেজরির ভার দিলেন এবং বলিলেন, "ঐ কায জান না বলিয়া কোন চিন্তা করিও না—ঐ কার্য্যের মূলসূত্র এই যে টাকা লইতে কোন আপত্তি নাই; টাকা দিতেই যত আপত্তি।"

পর পর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সম্পূর্ণ ভারই পাইতে লাগিলাম। চর বন্দোবস্ত করা, লাইসেন্স ট্যাক্স, সরকারী জমি কেনা প্রভৃতি সকল কাযই এই ভাবে শেখান হইল। [ডেপুটীদিগের 'শিক্ষানবিসী' বা 'ট্রেজারি ট্রেণিং' প্রভৃতির সাধারণ ব্যবস্থা ইহার বহুকাল পরে আরম্ভ হয়।] তাহার পর হুকুম হইল রামগঞ্জ থানায় গিয়া তাঁবু ফেলিয়া দুই মাস থাকিতে হইবে এবং তথায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত মোকদ্দমা গ্রহণ

করিয়া বিচার করিতে হইবে এবং খোঁয়াড়, রাস্তা, পাঠশালা, আবগারী দোকান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। সবডিভিজনাল অফিসরের কার্য্যও এই ভাবে কতকটা শিক্ষা হইল। এভাবের শিক্ষাদান আমি অপর কোনও জেলায় কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিতে আমার জীবনে আর কখনও দেখি নাই।

সাহেব একদিন চট্টগ্রামবাসী কোন ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্যের সম্বন্ধে 'ষ্টুপিড' (বোকা) শব্দ ব্যবহার করায়, তাঁহার আহ্বানে আমাদের একটা 'জটলা' হইল। একখানা চিঠি মুসাবিদা হইল; তাহাতে ঐ শব্দ প্রত্যাহার করার জন্য দাবী ছিল। সে চিঠি সাহেবের কাছে গিয়া পৌছিতেই তিনি উক্ত ডেপুটী কলেক্টরকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসব কি? আমি ত তোমাকে অপমান করিতে চাহি নাই। তুমি ইংরাজের ব্যবহার না জানাতেই এই চিঠি লিখিয়াছ। আমরা দিনে দশবার নিজেদের 'ষ্টুপিড্' বলি। একটা জিনিস কোথা রাখিয়াছি মনে পড়িতেছে না, একটা নাম বা কায ভুলিয়া গিয়াছি, ইহাতে নিজেদের উপর বলি 'ওহ্ কি বোকামি' (ওহ্ হাউ ষ্টুপিড্!) উহাতে কোন দুষ্টবুদ্ধির আরোপ নাই; তোমরা সকলে (মুসাবিদা দেখিয়াই সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে উহা উক্ত ডেপুটী কলেক্টরের একার লেখা নহে—এবং সেই জন্য 'ইউ আর অল' বলিলেন!)—ঐ যা! আবার 'সেই শব্দ' ব্যবহার করিতে যাইতেছিলাম! আচ্ছা হাঁ (ওয়েল ইয়েস্) বালক বুদ্ধি (চাইল্‌ডিশ্)!" সাহেব চিঠিখানা ডেপুটী বাবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "সব ঠিক, যাও (অল রাইট—গো)।" তিনি সেলাম করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের জটলায় ঠিক হইল যে প্রত্যাহারের পরিবর্ত্তে সাহেব ঐ শব্দ ইঙ্গিতে আমাদের সকলেরই উপর এবার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিলেও, আর কথা বাড়াইলে 'বালক বুদ্ধি'ই প্রকাশিত হইবে।

এই সময়ে বাবু শ্যামাচরণ মিত্রের এজলাসে একটা মোকর্দ্দমা হইল। সাহেব নিজে সাক্ষী দিলেন যে তাঁহার বাবুর্চ্চি মুর্গির ডিম চুরি করিয়াছে; জেরায় দুই একটা প্রশ্নে প্রকাশ হইল যে উহা সাহেবের 'অনুমান' মাত্র; মেথর খানসামা প্রভৃতি অন্য কেহও চুরি করিয়া থাকিতে পারে। আসামীর রেহাই হইল। সকলেরই মনে কেমন শঙ্কা হইল যে শ্যামাচরণবাবুর শীঘ্র না হইলেও, শেষে একটা বিপদ হইবে। কয়েকমাস পরে শ্যামাচরণবাবুর আফিসের একজন এপ্রেন্টিস কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্প চুরি করে। তখনকার কোর্ট ফীর অন্যপ্রকার মূর্ত্তি ছিল এবং সহজে জল দিয়া তুলিয়া লওয়া যাইত। একটা পুরাতন মোকদ্দমার বাকী আসামী তলবের নথিতে মোক্তারনামা পাওয়া না যাওয়ায় শ্যামাচরণবাবু নিজেই অনুসন্ধান করিয়া সকল দোষ ধরিয়া ফেলেন এবং কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শ্যামাচরণ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া রিপোর্টে লিখিলেন, "এই অফিসারটী বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, উদ্যমশীল এবং সুবিচারক; কিন্তু সেরেস্তার কার্য্যে একটু অসাবধান এবং আমলাদের উপর একটু বিশ্বাসপ্রবণ (ইনক্লাইণ্ড টু ট্রষ্ট দি আমলা)। সেই জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।" অনেকেরই মনে হইল যে এত প্রশংসা, বিশেষতঃ উদ্যমশীলতার এবং সুবিচারের প্রশংসা এ ক্ষেত্রে বড়ই মারাত্মক হইবে; সেই ডিমচুরির মোকদ্দমার জন্য সাহেব চটিয়া আছেন এ কথা বলার পথ মারিয়া রাখা হইল, শ্যামাচরণ নিজেই সেরেস্তার দোষটা ধরিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া রাখা হইল! আমলাদের কার্য্য নিখুঁতভাবে পরিদর্শনই ডেপুটী কালেক্টরদিগের প্রধান কার্য্য; তাঁহাদের পক্ষে 'আমলার উপর নির্ভর' করার অপেক্ষা আর কি অধিক দোষ হইতে পারে? সরলচিত্ত বলায় অনবধানতার মার্জ্জনা হয় না!

রিপোর্টের ফলে গবর্ণমেণ্টের হুকুমে সুযোগ্য এবং তেজস্বী শ্যামাচরণ বাবুকে তাঁহার শ্রেণীর আটজনের নিম্নে নামাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট যে আবেদন করিলেন, তাহার জবাব আসিল যে, সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে ঠিক ঐ 'আমলার উপর নির্ভর

করার দোষ এই ঘটনার দুই একমাস পূর্ব্বেই কর্ম্মচারী-দিগের সম্বন্ধে বার্ষিক গুপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন।” আমাদের আবার মনে হইল, কি পাকা কড়া লোক!

হয় ত শ্যাম বাবুর কিছু অসাবধানতা ছিল। কিন্তু আসল কথা এই যে, শ্যামাচরণ বাবুর উপর আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রাজসাহীতে কার্য্য করার সময় একদিন তিনি নৌকা করিয়া পাখী শিকার করিতে গিয়া ছিটে গুলি ভরা বন্দুকটী বগলের মধ্যে দিয়া পার করিয়া রাখিয়া বসিয়াছিলেন; হঠাৎ নৌকাটা টলায় কিরূপ অসানালে বন্দুকটা সরিয়া আসে এবং ঘোড়া পড়িয়া আওয়াজ হইয়া যায়; তাঁহার ডান হাতটি ছিন্ন হইয়া গিয়া স্কন্ধ হইতে সামান্য মাত্র ঝুলিতে থাকে। ডাক্তারে উহা কাটিয়া দিলে আরোগ্য হন এবং শ্যামাচরণ বাবু অল্প দিনেই বামহস্তে সুন্দররূপে লিখিতে শিখেন। তাহার পর তিনি ঐ বাম হস্তেই বন্দুক ধরিয়া বাঘ শিকার করিতে পারিতেন, ঘোড়ার লাগাম বাম হস্তে রাখিয়া এবং তাহাতেই চাবুক ধরিয়া ঘোড়দৌড় করিতেন। বাঙ্গালী যে উৎকৃষ্ট সামরিক অফিসার হইতে পারে, উহার মধ্যে অদম্য উৎসাহ থাকিতে পারে, দক্ষিণ হস্তহীন শ্যামাচরণ বাবু আমার চক্ষে তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন।

ওদিকে ওয়েষ্টম্যাকট-সাহেবের নোয়াখালিতে আসার পূর্ব্বের ইতিহাসটা তাঁহার প্রতি কাহারও চিত্তাকর্ষক ছিল না। সাহেব দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট থাকা কালে একজন মোক্তারের কাণে খোলামকুচি দিয়া দুই জন-চাপরাশী দ্বারা কাছারির চারিদিকে দৌড় করাইয়াছিলেন; তাহাতে উহাঁকে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নামাইয়া দেওয়া হয়। *

সাহেব তখনই কয়েক মাস ছুটী লইয়া বিলাত চলিয়া যান এবং ফিরিয়া আসিয়া সুদূর নওয়াখালিতে (তখন রেলপথ ছিল না)—একটিন মাজিষ্ট্রেটভাবে আবির্ভূত হন। উঁহার উপর এজন্য একটা ভয় এবং সন্দেহের ভাব সকলেরই মনে মনে ছিল।

কথিত আছে অপর কোন জেলায় সাহেবের বদলীর সময়ে কয়েকজন আমলা আফিস বহিতে তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করায় সাহেব বলিয়াছিলেন, “আমার কাছে এক বৎসর কায করিয়াও যাহাদের সার্ভিস বহিতে দোষ লেখা হয় নাই, তাহাদের প্রশংসার ত কিছুই বাকী নাই!”

৺ভবতারা ঘোষ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র নিরীহ ভাল লোক ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং খাঁটি লোক বলিয়া জানিত। একটা জমিদারীর ম্যানেজার সাণ্ডিস সাহেব তখন নওয়াখালি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাহার বেনামী ঠিকাদারী কার্য্য ছিল বলিয়া শুনা যাইত। সে যাহাই হউক, ভবতারা বাবুর সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই আফিসের কাগজে খিটিমিটি চলিত। ওয়েষ্টম্যাকট সাণ্ডিস্ সাহেব বা তাঁহার মেমের সহিত অনেকটা সময় একত্রে থাকিতেন; ওরূপ মফস্বল স্থানে ইউরোপীয় আর কয়জন! ভবতারা বাবুর বিরুদ্ধে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারের উদ্যমশীলতা, পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাসম্বন্ধে সুখ্যাতি এ সবই ছিল—কেবল উহার “প্রধান কার্য্য” যে খরচ কম রাখার জন্য কড়া সজাগ লক্ষ্য রাখা, সেই দিকে যথোচিত চেষ্টার অভাবের আভাস দেওয়া ছিল; সততার উপর কোন কটাক্ষ সুস্পষ্ট ভাবে করা হয় নাই। কূট রচনার আদর্শস্বরূপ রিপোর্টের সমস্তটা পড়িলে এই ভাব আসিবে যে মানুষটা অজ্ঞ বা মন্দ নয়, তবে আসলে কায ভাল হইতেছে না—অপরের উপর চাপ রাখিয়া, “কায ঠিক ঠিক লওয়া” ইহাঁর দ্বারা কষ্টসাধ্য! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভবতারা বাবু গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া

* নওয়াখালিতে থাকার সময় ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব আবার যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হইলেন, তখন (উইথ এফেক্ট ফ্রম অমুক তারিখ হইতে শব্দ সংযুক্ত থাকায়) অবনতিতে যত টাকা কম পাইয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়া যায়।

বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন।* অসুস্থ শরীরে এ সকল খিটিমিটি ভাল লাগিল না, কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

আমাকেও অচিরে একটা হাঙ্গামায় পড়িতে হইল। লিলিভার সাহেব সুপারইণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। বাজারের নিকট খালে তাঁহার নৌকা ছিল; তিনি বাজারে পায়চারি করিতে থাকা কালে অনেক অজ্ঞ হাটুরে লোক চারিদিকে আসিয়া তাঁহার বেশভূষা, চুলের এবং চক্ষের রং প্রভৃতি দেখিতে থাকে! সাহেব একটু পথ পরিষ্কার করার জন্য হাতের ছাতাটা ঘোরান্, উহা একটি স্কুলের ছেলের গায়ে লাগে। সে "হোয়াই ডু ইউ বীট সার? (মহাশয় মারিলেন কেন)" বলিলে, সাহেব নিজের নৌকার দিকে চলিয়া যান। সাহেবকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া দর্শকেরা এবং ছেলেরা চেঁচায় যে নালিশ করিব (উই উইল কমপ্লেন)। কোন কোন স্কুলের বা অন্য হাটের ছোকরা মাটির ঢেলা ছোঁড়ে, সাহেবকে তাহা লাগে নাই। সুভদ্র সাহেবটী একটি ছেলেকে ছাতা দিয়া আঘাত করিয়া ফেলায় এবং নালিশের ভয় দেখানয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে তিনি ছাতা দিয়া ভিড় সরাইতেছিলেন; মারিতে ইচ্ছা ছিল না; শীঘ্রই তাঁহার চট্টগ্রামে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন; যেন নালিশ করিয়া কেহ উহাঁকে না আটক করে। উহাতে ঢেলা ছোড়ার কথাও ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে নিজে গিয়া পুলিস সহ তদারক করিয়া চারটী ছেলেকে দাঙ্গার অপরাধে চালান করাইয়া দিলেন এবং আমাকে কুঠীতে ডাকিয়া মোকদ্দমার নথিটী হাতে দিলেন। বলিলেন, "তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—তুমি স্কুলের ছেলেদের সাজা দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; জগদ্বন্ধু বাবু সাজা দিলে লোকে বলিবে, বাঙ্গালানবিশ হাকিম ইংরাজ বাদীর খাতির করিয়াছেন; তুমি ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করিও; জেলের প্রয়োজন নাই; আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি উহারা দোষী ঠিক। বাদীপক্ষের জবানবন্দী এবং জেরা শেষ করাইয়া আজই অভিযোগ (চার্জ্জ) শুনাইয়া তখনই পুনর্ব্বার জেরা করিতে বলিও। তাহা হইলে আর লিলিভার সাহেবকে আসামীর পক্ষীয় উকিল আটকাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে পারিবে না। তুমি বেশ কর্ম্মঠ, শিক্ষিত কর্ম্মচারী, এই জন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা না জন্মিয়া থাকিলেও তোমাকেই এই বিশেষ মোকদ্দমাটার ভার দিলাম।"

সাহেবকে নীরবে সেলাম করিয়া ফিরিলাম। পথে মনে হইল, "কেনই বা হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের পঞ্চাশ টাকার সম্মানিত অধ্যাপনার কার্য্য, বাড়ীর ভাত, গঙ্গাতীর এবং পূজ্যপাদ পিতৃদেবের চরণ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম! আর এ কি বে-ইজ্জতি যে একেবারে দোষী ঠিক, সাজার পরিমাণ ঠিক করিয়া অপরে নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আমাকে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া স্থির করিল যে আমি একেবারে গলিয়া গিয়া 'যো হুকুম ভাবে' উহার কথা মত কার্য্য করিব?" তখন এই চাকরী লইয়া আসার সময়ে পূজ্যপাদ পিতৃদেব, যাহা আমার এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জানিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে আসিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"এই বংশ চিরকাল অধ্যাপকের বংশ। তুমিও শিক্ষকতা করিতেছিলে। এক্ষণে একটা পেয়াদার চাকরীতে লোক নির্ব্বাচন হউক, আর খুনি মোকদ্দমাই হউক, যেখানে তোমাকে মত স্থির করিতে হইবে, তাহা তোমার ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যের কথা, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।" *

---

* টমটমে চড়িবার সময়ে অসাবধানে সহিসের হাতে রাশ হাতে না লইয়া উঠিতেই ঘোড়াটা জোর করিয়া সহিসের হাত ছাড়াইয়া দৌড় দেয়।

* বি ইট দি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অফ এ পিয়ন, অর দি ট্রায়ল অফ এ মার্ডার কেস, হোয়ার দি প্রাইভেট ডিস্ক্রেশন ইজ গিভন্‌টু ইউ ইট ইজ বিটুয়িন ইউ এণ্ড ইয়োর গড এণ্ড নো থার্ড পার্টি হ্যাজ এ ভয়েস ইন দি ম্যাটার।" উত্তরকালে পাটনায় লী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট আমার ফাইলে কোন মোকদ্দমার নথী সম্মুখে রাখিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন। আমি বলি, মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা কহিবার পূর্ব্বে

মনের ভার অনেকটা কমিয়া গেল—দেখিলাম যে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সেই যাবজ্জীবনের সহায়তা এখানেও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে; এরূপক্ষেত্রের জন্য সুশিক্ষা তিনি (প্রীতির ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিয়া) পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছেন! তখন চুঁচুড়ায় চারিদিনে চিঠি যাইত এবং চারিদিনে আসিত। তথাপি প্রথমেই তাঁহাকে একখানা চিঠি লিখিয়া মনের ভার আরও কমাইয়া ফেলিয়া, তাহার পর মোকদ্দমাটী ধরিলাম।

দেখিলাম যে জজকোর্টের সকল বড় বড় উকীল আসিয়াছেন। উকীল রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "এই বালকদিগের মোকদ্দমা খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন এবং পুলিশ চালান দিলে আপনাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইহা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। কিন্তু যে লোকের পুত্রের নিকট মোকদ্দমা হইবে তাহা স্মরণে সুবিচার সম্বন্ধে আমার এই মক্কেল দিগের অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক। সাক্ষী ডাকিবার পূর্ব্বেই আমি বালকদিগের গায়ে একখানি করিয়া র‍্যাপার জড়াইয়া দিতে চাই—কাহার গায়ে সাদা কামিজ, কাহার গায়ে কি রঙের পিরাণ, কাহার কাঁধে চাদর এইরূপ সনাক্ত করার জন্য পুলিসের দ্বারা শিক্ষিত উপায়গুলি তাহাতে ঢাকা পড়িবে; র‍্যাপার গায়ে আরও কয়েটী ঐ বয়সের ছেলেও উহাদের সহিত মিলাইয়া রাখিতে চাহি—তাহা হইলেই সাক্ষীরা প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ চিনিয়াছিল কি না ঠিক হইবে।" রত্নেশ্বর বাবু ঐমর্ম্মে লিখিত দরখাস্তও সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করিলেন। "এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করার কোন কারণ নাই"—আমি এই কয়েকটী কথামাত্র উহার উপর লিখিলাম। ১২।১৪টি এক মাপের এবং এক রঙের ছেলের সহিত চারিজন আসামীকে মিশাইয়া দিয়া, প্রত্যেকের গায়ে একখানি করিয়া ময়ূরকণ্ঠি র‍্যাপার জড়াইয়া দেওয়া হইল। পাঁচজনের মধ্যে একজন আসামী একটু বয়সে বড় ও দীর্ঘাকার ছিল। সাক্ষীরা তাহাকেই সনাক্ত করিল; অপর আসামীগুলিকে পারিল না—অন্যান্য ছেলেদেরই হাত ধরিল! সাহেব কাহাকেও সনাক্ত করিলেন না এবং ছাতির দ্বারা আঘাত করা স্বীকার করিলেন। রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন যে তাঁহারই ভুলে দীর্ঘ আকারের চারিজন বালককে আনা হয় নাই, তাই 'অন্ততঃ ঢেঙ্গাটীকে ধরিস্' পুলিসের এই উপদেশে উহারা সনাক্ত হইয়া গিয়াছে!

যাহা হউক, "তুমি পাঁচজন বা তদপেক্ষা অধিক লোকের সহিত অবৈধ জনতা করিয়া দাঙ্গা করিয়াছ" এই চার্জ্জ উহাকে শুনাইয়া, অপর বালকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিলাম।

দশ মিনিট মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নথি সহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সমগ্র জবানবন্দী শুনিয়া বলিলেন, "এই সকল ছেলে, উকীল এবং আমলাদের স্ব-সম্পর্কিত, এই জন্য প্রসকিউশন হয়ত একটু

আমার চাকরীতে আমার সম্বন্ধে আমার পিতা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বলিতে চাহি। তিনি বলিলেন, সহস্র সহস্র পুরুষ আমরা অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলাম। তুমিও প্রথমে মাষ্টারী করিয়াছ। তোমার এবার চাকরীতে একটু একজিকিউটিভ কার্য্য মিশ্রিত আছে। কিন্তু যেখানে তোমাকে মত স্থির করিতে হইবে সেখানে"—আমি উপরের লিখিত উপদেশটি ঠিক ঠিক বলিলাম। সুভদ্র সাহেবটী নথি টানিয়া ফিরাইয়া লইলেন এবং অন্য কথা পাড়িলেন। অপর একজন আমাকে অত সহজে ছাড়েন নাই। বলিয়াছিলেন,"কে তোমার বিচারকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছে? শুধু এই কথা যে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের আপিল শুনিবার সময় জামিনে খালাস দিও না। উহারা খুব সুশিক্ষিত, উহাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।" আমি বলি যে যাহাদের অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাদের সরাসরি বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইলে—আপিলের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যাহারা ভিন্নদেশে অল্পদিন আসিয়াছেন, এখানকার ভাষা এবং আচারাদি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ, তাঁহাদের কার্য্যে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই আইনে তাঁহাদের সকল হুকুমে আপীলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—এক আনা জরিমানারও আপীল। তবে আমাকে সাধারণ ভাবে সব আপীল শুনিবার হুকুম দিয়া না রাখিয়া যেগুলি, আপনি শুনিবার সময় করিতে পারিবেন সেগুলি নিজেই শুনিবেন—বাকীগুলি আমাকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন।" সাহেব ঐ ইঙ্গিত মতে সিবিলিয়নদের আপীল আর আমার কাছে পাঠাইতেন না।

আল্‌গা দিয়াছে। যাহা হউক, তুমি আসল আসামীটার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়াছ, একটার সাজা হইলেই এ সকল উপদ্রব করিতে লোকে ভয় পাইবে।" আমি নীরবে সেলাম করিয়া ফিরিলাম।

দাদা লিখিলেন যে পিতৃদেবের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি বিচারে অন্যায় করিব না এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে "ঠিক" যে সাজা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করিব—সাহেবের নির্দ্দেশিত সাজার সহিত তাহা মিল হউক আর না হউক ;—মাজিষ্ট্রেটের কথায় বা উকীলের কথায় বা সংবাদপত্রের উক্তিতে বা জনরবে কিছুতেই বিচলিত হইতে আমার অধিকার নাই।

যথাকালে আসামীর পক্ষে সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেল। বাদীর পক্ষে রবার্ট কেলি নামে কালো রঙের একজন কালেক্টারির কেরাণী এই আসামী-টীকে সনাক্ত করিয়াছিল। সে যে উহার সহিত বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং নিজে একান্তই চরিত্রহীন তাহা কয়েকজন সুভদ্র সাক্ষী—একজন তন্মধ্যে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্—প্রমাণ করিলেন। তদ্ভিন্ন জেল দারোগার ভ্রাতা বলিল, তাহার সহিত আসামী তাস খেলিতেছিল ; জেলের ঘড়ি বাজার সময়ের ঠিক ছিল। যে সময়ে বাজারে ঘটনা হয় সে সময়ে সুতরাং আসামীর তথায় থাকা অসম্ভব ; সনাক্তে ভুল হইয়া গিয়াছে—এই ভাবের সাক্ষ্য এবং তর্ক। জেরায় ছক্কা পঞ্জা ধরার ক্রম এবং সংখ্যা প্রভৃতি সাক্ষীরা এ বিষয়ে একই ভাবে বলিল। আসামী নির্দ্দোষ বিশ্বাসে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। [পরে শুনিলাম যে জেলদারোগা সংবাদবাহী এবং সাহেবের প্রিয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এজন্য তথায় থাকার (অ্যালিবাই) সাক্ষ্য সম্বন্ধে কাহারই সহজে অবিশ্বাস হইবে না এই যুক্তিতে ঐ ভাবে সাক্ষী সাজান হইয়াছিল, কিন্তু আমি প্রকৃত পক্ষেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পূর্ব্ব হইতে জেল দারগাও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার ভাই এ ভাবে সাক্ষ্য দিতে যাইবে। সাক্ষ্য দেওয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে এসব জানিয়া তিনি ভ্রাতাকে নাকি যথেষ্ট প্রহার করিয়া-ছিলেন।]

ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব কমিশনরকে রিপোর্ট করিলেন যে বিচার বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দিগের মফঃস্বলে সম্ভ্রম এবং প্রাণ নিরাপদ থাকিবে না ; সুতরাং গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পুনর্ব্বিচারের হুকুম আনাইতে হইবে। কমিশনর সাহেব নথি ফেরত দিলেন এবং লিখিলেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচার নথি দৃষ্টে নিখুঁত বলিয়াই বোধ হইল ; বাদী নিজে ঘটনাকে একটুও গুরুতর মনে করেন নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করার কোন কারণই দেখা যায় না।

কিছুদিন পরে সদর হইতে ২৭ মাইল দূরে কোনও খাস মহলের তহশীলদারের মৃত্যু সংবাদ আসিল। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব বৈকালে সন্ধ্যার অল্প একটু পূর্ব্বেই আমার নামে হুকুম পাঠাইয়া দিলেন যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ডেপুটী কলেক্টর রওয়ানা হইয়া সূর্য্যোদয় কালে পৌঁছিয়া তহশীলদারের কাগজপত্রের চার্জ্জ লইবেন—ডেপুটী কলেক্টর উত্তম ঘোড়সওয়ার সুতরাং ইহা অক্লেশেই পারিবেন। সিনিয়ার ডেপুটী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় হুকুমটা দেখিয়া বলিলেন, "অন্ধকার রাত্রে অচেনা খারাপ মেটে রাস্তায় একটা পথ ঘোড়া দৌড়াইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তুমি অবিলম্বেই তোমার ঘোড়ায় চড়িয়া সহিস লইয়া বাহির হইয়া যাও ; একখানা ছাপ্পরওয়ালা ভাল গরুর গাড়ীতে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপর তোমার বিছানা করাইয়া পাঠাইয়া দিতেছি ; মাইল তিন চার যাইতেই অন্ধকার হইবে, তখন কোথাও পথের ধারে ঘোড়া হইতে নামিয়া অপেক্ষা করিও ; সেখানে সেই দ্রুতগামী: গরুর গাড়ী, লণ্ঠন, জলখাবার এবং চাপরাসী পৌঁছিবে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত অবস্থায় যাইতে থাকিবে। সাহেবের অন্যায় তাড়াতাড়ি!" তাহাই করিলাম। প্রীতি এবং যত্ন এ জীবনে কতই অযাচিত পাইয়াছি!

প্রাতঃকালেই গন্তব্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া, কাগজপত্র গোরুর গাড়িতে তুলিয়া লইয়া ফিরিলাম।

শেষের ৭ মাইল দ্রুতবেগে ঘোড়ায় আসিয়া আফিসে গেলাম। মোটের উপর কষ্ট বা বিলম্ব কিছুই হইল না।

কয়েক দিন পরে, আমি সাহেবের হুকুম পাইলাম যে, সেই দিনই হাতিয়ায় গিয়া একটা মারপীট মোকদ্দমার সরেজমিন তদারক করিতে হইবে। হাতীয়া দ্বীপে মুনসেফের তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে। তিনি ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। হাতিয়ায় যাইতে সমুদ্রের একটা অংশ পার হইতে হয়। সেদিন অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং প্রবল বায়ু বহিতেছিল। চন্দ্রকুমার বাবু দেখিয়া বলিলেন, "সাতদিনে তদারক করিয়া রিপোর্ট দিবে এই রূপ বলাই দস্তর মত এবং সঙ্গত হইত। 'আজই' এই প্রবল বায়ুর মুখে কেন ?" তিনি বাদীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাহেবের ত এই হুকুম, তোমাকে ডেপুটী বাবুর সঙ্গে আজই পুলিশ বোটে যাইতে হইবে; উনি একা গিয়া কি করিবেন?"

লেকেটা বলিল, "পুলিশ বোটের লোকে দায়ে পড়িয়া পার হওয়ার চেষ্টা হয়ত করিতেও পারে, কিন্তু আমি এ নদীকে চিনি; আমি আজ ত যাইবই না; হাওয়া থামার পরও একদিন ঢেউ থামিবার সময় দিয়া তাহার পর পার হইব।" চন্দ্রকুমার বাবু বলিলেন, "সেকি হয়? সাহেবের হুকুম ডেপুটী বাবুকে তামিল করিতেই হইবে; সুতরাং তোমাকে সঙ্গে যাইতেই হইবে।" তখন বাদী কাতরভাবে বলিল, "হুজুর এর উপায় করুন, নচেৎ সকলেই ডুবিয়া মরিব।" চন্দ্রকুমার বাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা আপোষে মিটাইয়া ফেল না; অপর পক্ষের লোকেও তোমার 'মোশনে' কি হয় দেখিতে আসিয়া থাকিবে; তাহারাও যে ডুবিয়া মরিতে অনিচ্ছুক তাহার সন্দেহ নাই!" বাদী ঘণ্টাখানেক মধ্যেই আমার নিকট দরখাস্ত দিল যে মোকদ্দমার মিটমাট হইয়া গিয়াছে, আর তদারকের প্রয়োজন নাই।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধ অনুমান সত্ত্বেও ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি যে অসমসাহসী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হয়ত জলে স্থলে এই দুই হুকুম আমার পক্ষে অনুমাত্র বিপজ্জনক হইতে পারে বলিয়া মনে করেন নাই।

আমার চিরকাল ৺গঙ্গাতীরে বাস। পূর্ব্বে কখনও পুষ্করিণীর জল খাইতে হয় নাই। নওয়াখালির জল ভাল লাগিত না, অপরিমিত ডাবের জল খাইতাম। শ্লেষ্মার বৃদ্ধিতে অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর হইতে লাগিল; পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমার বদলী হওয়ার জন্য ককৃরেল সাহেবকে বলিলেন; আমার হাবড়ায় বদলী হওয়ার হুকম হইল। কিন্তু হুকুমের পর প্রায় তিন মাস আমাকে নওয়াখালিতে থাকিতে হয়। সাহেব ছাড়িলেন না; বলিলেন আরও একজন আসিয়া না পৌছিলে তিনি যাইতে দিবেন না। তখন বদলীর দশদিন মধ্যে চলিয়া যাইতে হইবে এরূপ সধোরণ হুকুম জারি ছিল না; তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটেরাও আটকাইয়া রাখিতে পারিতেন এবং কর্ম্মচারীরাও বদলীর বিরুদ্ধে লেখালেখি করাইতে পারিতেন।

চন্দ্রকুমার বাবু বলিয়াছিলেন, "অবশ্য বাড়ী যাইবার জন্য একটু ব্যগ্রতা হইতে পারে; কিন্তু ভাজার খোলা হইতে আগুনে পড়ার (ফ্রম ফ্রাইং প্যান ইনটু দি ফায়ার) জন্য আগ্রহের কারণ নাই; বকল্যাণ্ড সাহেব হাওড়ায়!"

আমার প্রথম চাকরী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের নিকট হওয়ায় বড়ই লাভ হইয়াছিল। অপর সকল সিভিলিয়নকে তুলনায় অল্পাধিক মিষ্ট বা পানসেই মনে হইয়াছে।

কিছুকাল পরে হাবড়াতে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতে হয়। তখন হাবড়া স্কুলের ছেলেদের নাঠে ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে পুলিশের রিপোর্টে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হেড মাষ্টারকে উপদেশ দেন যে, ছেলেদের অনেকটা করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে (টাস্ক) যেন দেন। দেখিলাম রাজধানীর নিকটে সাহেবের হুকুম স্কুলের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নরম।

যখন মেহেরপুরে (১৮৯৩) কার্য্য করি, তখন ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব কমিশনর। পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। বিশেষ কোন দোষ ধরেন নাই; বলিলেন, "তোমার কার্য্যে

সুখ্যাতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দুইট' সবডিবিজনের ভার পাইয়াছ। নওয়াখালিতে শিক্ষার কার্য্যে সুবিধা পাইতেছ কি না?" আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম। মনে হইল বুঝি পদোন্নতি সহ সাহেবের ধরণধারণ অনেকটা সুমিষ্ট হইয়াছে।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়ের সহিত ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের ইহার পর কিন্তু বনগাঁ সবডিবিজন পরিদর্শন কালে যে গোলযোগ ঘটে, তাহাতে সাহেবের স্বভাব পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই! সাহেব একখানা পুরাতন ট্রেজারির রেজিষ্টার চাহিয়া লইয়া তীব্র ভাষায় দোষ ধরিতেছিলেন; সেই সঙ্গে বাঙ্গালী মাত্রেরই উপর কর্ত্তব্যপরায়ণতার এবং সততার অভাব আরোপ করিতে করিতে উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্তের এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দের নামও তাচ্ছীল্যের সহিত উল্লেখ করেন। বন্ধুবর বলেন, "আপনি কমিশনর, পরিদর্শনে যে দোষ দেখিবেন তাহা লিখিয়া ফেলুন, জাতিগত বা ব্যক্তিগত ভাবে গালাগালি করিলে আমি তাহা ব্যক্তিগত কার্য্য বলিয়া ধরিতে বাধ্য হইব; মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না!" সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া রুল হস্তে দাঁড়াইয়া গালির মাত্রা চড়াইয়া দিলে, উভয়ে হাতাহাতি উপস্থিত হইল। ট্রেজারি গার্ডের দীর্ঘকায় হেড্ কনেষ্টবল দৌড়াইয়া আসে এবং "হুজুর-লোগ কেয়া কর্ত্তে হেঁ"—বলিয়া বন্ধুবরকে টানিয়া সরাইয়া দিবার সময় ভূপতিত সাহেবকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, তাহার প্রকাণ্ড জুতাশুদ্ধ পায়ে মাড়াইয়া ফেলে। [সাহেব পূর্ব্ব বৎসরে আসিয়া উহাদের অশ্বত্থতলায় স্থিত ১০।১২ বৎসরের অতীব ক্ষুদ্র তুলসী মঞ্চটী ভাঙ্গিয়া দিয়া যান এবং বলেন—'বিনা অনুমতিতে কেন সরকারী ইট গাঁথিলে?]' সে যাহা হউক, ইহার পর ইন্স্পেক্‌সন বাঙ্গালায় গিয়া সাহেব যে রিপোর্ট 'রাগের মাথায়' লেখেন তাহা একান্তই ভ্রমপূর্ণ এবং বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়।

সে সময় আর, চার্লস্ এলিয়ট্ ছোট লাট এবং খ্যাতনাম কটন, বোল্টন এবং এডগার সাহেব উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী। যদি ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের ব্যবহারের জন্য, সাধারণত সিভিলিয়ন দলের সহিত তাঁহার একটা মনোমালিন্য না থাকিত, তাহা হইলে বন্ধুবরের পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে কিন্তু ইহার পরই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব পেন্সউন লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। বোর্ড অফ্ রেভিনিউয়ে প্রবেশ করিতে পাইলেন না।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

---

* (১) একবার বার্ষিক রিপোর্টে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব লেখেন, "এ কপ্‌ল্ অফ্ কনষ্টেবলস্ আর মোর ইউস্‌ফুল দ্যান হাফ এ ডজন হাইকোর্ট জজেস্। দুই জন কনেষ্টবল আধ ডজন হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা অধিক উপকারী।

(২) আর একবারের রিপোর্টে নদীয়া জেলার জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরীর সম্বন্ধে সাহেবের ব্যবহৃত নটোরিয়স্ (দুষ্কর্ম্মে বিখ্যাত) শব্দ কলিকাতা গেজেটে ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়া যাওয়ার পর কালি দিয়া কাটিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

(৩) অপর এক সময়ে তিনি লেখেন যে মুনসেফ ও সদর আলারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরকে সম্মান দেখাইবার জন্য দেখা করিতে যান না সেটা ভাল নয়। ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্ট রেজিলিউসনে ছাপাইয়াছেন যে "সম্মানার্হকে লোকে স্বতঃই সম্মান দেখাইয়া থাকে।"

কোনও বয়স্থা কুমারীর ডায়েরি

(গল্প)

সেদিন সন্ধ্যার পর আমি ৺কালীঘাটে দেবী দর্শনে গিয়াছিলাম। আরতি দেখিয়া ফিরিবার সময় ট্রামে ধর্ম্মতলায় আসিয়া দেখিলাম, বাগবাজারের শেষ 'কার' চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা ট্যাক্‌সি লইতে হইল। গাড়ী কিয়দ্দূর আসিলে দেখিতে পাইলাম, বসিবার সীটের কোণে একতাড়া কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। খুলিয়া দেখি, বাঙ্গালায় কি সব লেখা। বাড়ী আসিয়া, সেগুলি পড়িলাম। স্ত্রীলোকের লেখা, ডায়েরির কিয়দংশ মাত্র। কিন্তু নাম ধামের কোনও সন্ধান পাইলাম না। পড়িয়া বড় দুঃখ হইল। আমি, হিন্দুসমাজের প্রথানুমোদিত কন্যার অল্প বয়সে অভিভাবক-নির্ব্বাচিত পাত্রের সহিত বিবাহেরই পক্ষপাতী। এই ডায়েরি আমার মতের সমর্থক, তাই ইহা নিম্নে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলাম। কেবল নায়িকা ও নায়কগণের নামগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছি।

———

কাল যে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তাতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, একবাক্যে আমাকে সহানুভূতি দেখিয়ে অমল বাবুকে নিন্দে করছেন। তাঁরা খুব ঘটা করেই সিদ্ধান্ত করছেন যে মানুষের উপর একটুও বিশ্বাস করা যায় না। আশাভঙ্গের যন্ত্রণার উপর এ আপ্‌শোষের প্রলেপ, কাল মন্দ লাগে নি। কিন্তু এত অবিশ্রান্ত ভাবে চল্‌ছে যে মাত্র এই চব্বিশ ঘণ্টাতেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

বারো থেকে এই আঠারো বছর বয়েস পর্য্যন্ত অনেক দিনের অনেক কথাই মনে পড়্‌ছে।

বাল্যের সঙ্গে জড়িত সেই দত্ত বাড়ীর নগেন। কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে প্রথম চোখ মেলে দৃষ্টি পড়ল—তার দারিদ্র্য। আমার বসন্ত উদ্যানে সেদিন যে সুরে কাকলী বেজেছিল, তার সঙ্গে তার সুর মেলেনি।

তার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ মনে মনে জমিয়ে তুলেছিলাম, তাকে সেদিন বাইরে প্রকাশ করলাম—সে একটা বিশেষ ঘটনার সাহায্য নিয়ে। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, যে দুর্ণাম অসঙ্কোচে তার মাথায় তুলে দিয়েছিলাম, অতিবড় শক্রকেও কেউ তা দিতে পারে না। তবে আমার সান্ত্বনার কথা, কথাটা কেউই তেমন জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করলে না। সেদিন এই জন্যেই খুব রাগ হয়েছিল। আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সে যদি আমার দেওয়া সেই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে যেত, তাহলে আমার দুঃখ রাখবার আজ জায়গা থাকতো না।

হিমাংশু বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। বাবার কাছে কাছে শুন্‌তাম তিনি কলেজে একজন নামকরা ছাত্র; মার কাছে শুন্‌তাম তাঁরা খুব বড়লোক। এটা, তাঁর সাজ পোষাক দেখে আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। নগেনের সঙ্গে যখন বেশ আড়াআড়ি চল্‌ছে, তখন হিমাংশু বাবুর সঙ্গে পরিচয় হওয়া দেবতার আশীর্ব্বাদ বলেই মনে হয়েছিল; সেই জোরেই তাকে আমি অমন করে অপমান করতে [illegible]িলাম। দেবতা তখন অলক্ষ্যে হাস্‌ছিলেন।

হিমাংশু বাবুর সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে গেল দেখে, বাবা-মা বেশ আশ্বস্ত হলেন। প্রায় রোজ বিকেলের দিকেই তিনি আমাদের বাড়ী আস্‌তেন—হাসি-ঠাট্টা-গল্পে আমাদের সময় কাটতো।

সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্য করে মা আমাকে নিয়ে তাঁদের বাড়ী বেড়াতে গেলেন—তাঁদের পরিবারের মাঝে আমার ভবিষ্যৎ স্থানটার ভিত্তি স্থাপন করতে।

সেদিন আমাকে বেশী ক'রে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল তাঁর বৌদির গহনা আর জামা কাপড়ের বাক্‌স। তাতে কি আনন্দ হয়েছিল! আমিও একদিন এই বাড়ীতে আস্‌বো। দরিদ্র নগেন সাজ অলঙ্কারের চিরদিন অপক্ষপাতী—হবেই ত। যার গৃহে অন্ন নেই, সে ত উপবাসের মাহাত্ম্য প্রচার কর্‌বেই।

হিমাংশু বাবুর সঙ্গে সে সম্পর্কের সম্ভাবনা সকলেই আনন্দের সঙ্গে পোষণ করছিলাম, নগেনের আবাল্যের ভালবাসা পাছে তাতে কোন শিথিলতা এনে দেয়, এই ভেবেই বোধ হয় সে বিদেয় হয়ে গেল। আমি এতে, খুব একটা কৃতিত্বের গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম।

হিমাংশু বাবু খুব গান ভালবাস্‌তেন তাই, বিকেলে যখন তাঁর আস্‌বার সময় হ'ত,আমারও তখন এক পুলক-ভরা চিন্তা আস্‌ত, কোন্ গানটার সুরে কোন্ একটা বিশেষ ভঙ্গী দিয়ে শোনাব। বড় দুঃখ হত এমন দুই একটা গান অন্ততঃ কেন জানিনে যা শুনিয়ে তাঁকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিতে পারি।

একদিন তিনি কথায় কথায় Wordsworthএর Reaper থেকে Reaping and singing by herself, তার পর Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain লাইন কয়টি আবৃত্তি করতে করতে বল্লেন—গানের মাঝে music তখনই সত্যি ক'রে ফুটে ওঠে যখন অন্তর-নিহিত ভাবমাধুর্য্য বিনাচেষ্টায় স্বতঃই উৎসারিত হয়। সংসার যাত্রার নিতান্ত তুচ্ছ দশ কাযের মাঝে যে গান আপনা আপনি বেজে ওঠে সেই হচ্চে আসল গান। তান লয় দিয়ে তাকে গড়ে তোলা যায় না। কৃষকবালা যে গান গাইছে, সঙ্গীত ব্যবসায়ীর মতে তার সুরতালে হয়ত অনেক গলদ রয়ে গিয়েছে। কিন্তু বালিকা তখন যে অজ্ঞাতসারে তার সমস্ত মনপ্রাণ এতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে, সে তা জানে না। তারই জন্যে কবি বল্‌তে পেরেছেন the music in my heart I bore, Long after it was heard no more. সেই দিন থেকে যখন তখন খেতে, মুখ ধুতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে, নামতে পড়্‌তে পড়্‌তে, বারান্দায় বা ছাদে পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে, স্নানের ঘরে—আমারও এ ও সে গানের এক আধ লাইন গাওয়া আরম্ভ হ'ল - যদি আমারও দশ কাযের মাঝের বিশৃঙ্খল গান হঠাৎ এসে শুনতে পেয়ে, তিনি একে আপনি বেজে ওঠা সঙ্গীত মনে করেন।

তাঁর পূরো নাম ছিল হিমাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'মোহন কুমার' প্রভৃতি কথাগুলো নিতান্ত সেকেলে, তাই মাত্র লিখ্‌তেন হিমাংশু বন্দ্যো। আমার নীহারবালা নামটাও সেই দেখাদেখি সংক্ষেপে নীহার চট্টো হল। হায়রে, এ যুগে হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষেপ করা দরকার হয়ে পড়েছে। অনেক সেকেলে জায়গায় এ-কেলে এসে পড়েছে। কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রাণ-স্পন্দনের সূচনা, দেহের প্রতি অণু পরমাণু নিহিত যে আকাঙ্ক্ষা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে চাচ্ছে তাকে ত সংক্ষেপ করা যায় না; কোন নূতনই সে আদি-পুরাতনকে বরখাস্ত কর্‌তে পারেনি। শুধু মুখের গানে সে মুগ্ধ হয় না, বাইরের রঙীন শাড়ীতে সে রঙীন হয় না; দু' চার খানা গহনা পেলেই তার চাওয়া চুপ মানে না। তাকে ফাঁকি দিয়ে বোঝান যায় না।

বিকাল বেলায় তিনি এলে, মা উদ্‌যোগী হয়ে আমাদের আসর জমিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে, আমাকে দিয়ে, তাঁর জন্যে চা, জলখাবারও করাতেন। কোন কারণে যদি দু'দিন না আস্‌তেন,আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তাম—তাঁর বাড়ীতে খবর যেত। আমাদের কতকগুলো কাযে, তাঁকে না হ'লে আর চলেই না। আজ বটানিকল গার্ডনে বেড়াতে যাব—হিমাংশু বাবুর কাছে চিঠি গেল তাঁকে সঙ্গে যেতে হবে। কাল বায়স্কোপে যাব, তিনি না নিয়ে গেলে যাওয়া হয় না। এমন কি Ladies' Parkএও তিনি যদি পৌঁছে দিয়ে এবং ফিরিয়ে নিয়ে না আসেন, তাহলে একটু বিশুদ্ধ হাওয়া খাওয়া পর্য্যন্ত আমার চলত না। বাড়ীতে কোন বিশেষ একটা খাবার তৈরী হলে আগে তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ যেত।

একদিন শেষে জানলাম, আমাদের আশা দুরাশা। আমার ক্লাসেরই একটী মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে অনেক

দিন থেকে ঠিক হয়ে আছে। তিনি ছিলেন মিশুক লোক; যেখানে যেতেন সেখানেই মজলিস জমিয়ে নিতেন। আমরা যে তাঁর সম্বন্ধে অন্য রকম ভেবে এসেছি, তার জন্যে অন্ততঃ আমি তাঁকে দায়ী করতে পারিনে।

হিমাংশু বাবুর সম্বন্ধে কথাটা নিঃসন্দেহে চুকে গেলেও, আমার সম্বন্ধে একটা মস্ত সত্য দীপ্ত হয়ে রইল যে, আমার বয়েস ষোল পার হয়। আধুনিক সমাজে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া কুপ্রথা; কিন্তু যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা বেশই জানেন যে, সতেরো আঠারোতে যে মেয়ের ভাগ্য ঠিক না হয়ে গেল, তার ভাগ্য সম্বন্ধে মস্ত একটা সন্দেহ এসে পড়লো।

এর পরে এলেন অমল বাবু। সে আর এক দীর্ঘ ইতিহাস।

তাঁর বাবা ছিলেন পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। হঠাৎ যখন তিনি হৃদ্‌রোগে মারা যান, অমল বাবুর মেডিকেল কলেজে পড়া তখনও শেষ হয়নি। আমার বাবা তাঁর বাবার নাকি সহপাঠী ছিলেন; এই সূত্রে এখন থেকে বাবাই হলেন তাঁদের অভিভাবক।

হিমাংশু বাবুর সম্বন্ধে অতখানি নিরাশ হয়ে বাবা মা দুজনেরই বড়লোকের দিকে ঝোঁক কমে গিয়েছিল। এমন কি তাঁরা ঠিক করেছিলেন, পড়াশুনোর দিকে কতকটা ভাল এমন কোন ছেলে পেলে তাঁরা তাকে খরচপত্র দিয়ে পড়িয়ে শুনিয়ে আমার জন্যে মানুষ করে নিতে প্রস্তুত।

বাবা একদিন বিকেলে অমল বাবুকে আমাদের বাসায় নিয়ে এলেন। মা তাঁর কাছে বসে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শেষে বললেন, "বাবা অমল, আমাকেও তোমার মা বলে মনে কোরো।"

আমি সেদিন তাঁর সামনে যাই নি। মা তাঁকে নিয়ে যে ঘরে বসে কথা বলছিলেন, তার পাশের বারান্দা দিয়ে একখানা বই হাতে করে এধার ওধার যাওয়া আসা করছিলাম। এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন বই পড়াটাই আমার সর্ব্বস্ব, আর কেউ যে কোথাও আছে তা মোটেই লক্ষ্যের মাঝে আসছে না। মা-ও সেদিন আমাকে ডাকলেন না।

তার পর, তাঁর সঙ্গে পরিচয় ত হলই, এমন কি হিমাংশু বাবুর মত তাঁকে না হ'লে আমাদের কোন কাযই চলে না, এমন ভাবে আমাদের বাড়ীতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

মনে পড়ে তাঁকে নিয়ে বাগান ভোজে যাবার কথা। সমস্ত দিন বাগানময় ঘোরাঘুরি, ফুল তোলা, ফুলপাড়া নিয়ে ছুটোপুটি করে সন্ধ্যের আগে বাসায় ফিরে এলাম। মা তাঁকে চা খেয়ে যেতে বললেন—ইঙ্গিতে চা করবার ভার পড়ল আমার উপর। আমি নীচে নেমে গেলাম। মনে পড়ল হিমাংশু বাবুর জন্যে চা করবার কথা। ক্ষণিকের জন্য একটা ধিক্কার এল—এমনি করে, আজ একজনের জন্যে, কাল আর একজনের জন্যে চা করেই কি আমার দিন যাবে?

আমাদের ঘরে জন্মদিনের উৎসব কোন কালেই ছিল না। সাতাশে মাঘ যে আমার জন্মদিন বাবা মা হঠাৎ যেন তা খুব বেশী করে মনে করলেন। এটা আমার খুব স্মরণীয় দিন যে সেদিন অমল বাবু আমাকে একখান শাড়ী উপহার দেন। তিনি বললেন শাড়ীখানা তাঁর মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা কিন্তু সকলেই ধরে নিলাম, শুধু একটা সঙ্কোচের জন্যেই তিনি ওটা তাঁর মার নামে বেনামী করছেন। তাঁর এ সঙ্কোচে আমার বুকখানা সেদিন খুবই ভরে উঠেছিল।

হিমাংশু বাবু তখনও মাঝে মাঝে আসতেন; তবে আসর আর জমত না। আমিও তাঁকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম। মনে হ'ত তাঁর সঙ্গে মিশলে সে মেশার অর্থ অন্য রকম ভেবে অমল বাবু হয়ত সরে দাঁড়াতে পারেন—হায় দুরাশা!

ক্লাসের বন্ধুদের কাণে কথাটা উঠল। যাদের কাছে এক সময় হিমাংশু বাবু সম্বন্ধে কথা বলেছি, তাদের কাছেই বলতে লাগলাম, "তিনি ত' খুব ঘোরাঘুরি করছিলেন, আমি কোন দিনই আমল দিই নি, যে বাবু!"

প্রায় দুই বছরের এত আয়োজনের পর, দিনের পর দিন সেই এক আশা এত ক'রে পোষণ করার পর, কা'ল শোনা গেছে কোন্ এক এটর্ণির মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পাকাদেখা হয়ে গেল। শ্বশুর তাঁকে ডাক্তারী পড়্তে বিলাত পাঠাবেন।

কেবল অমল বাবু বা হিমাংশু বাবুর কথা বল্‌লে আমার জীবনের অতি সামান্যই বলা হয়। এই আঠারো বছরের শেষ চার-পাঁচটা বছরের মাঝে, কত জনের দিকেই যে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছি, আর কতজনকে যে চাহনি, চালচলন, সাজসজ্জা দিয়ে আকর্ষণ কর্‌তে চেয়েছি, তা বল্‌তে চাইনে। যদি সঙ্কোচের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে সত্য কথাটা প্রকাশ কর্‌তে পারি তবে বল্‌তে হয়, মুহূর্ত্তের জন্যও যাদের কাছে আস্‌তে পেরেছি, তাদের মাঝে যার সম্বন্ধে একটুও সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, তার কাউকেই বাদ দিতে পারিনি। জানি না কতদিন আর এমন ক'রে অভিশপ্ত কাঙালের মত একদ্বার হ'তে আর এক দ্বারে হাত পেতে বেড়াতে হবে।

ডায়েরি এইখানেই শেষ হইয়াছে। ব্যাপারটা আমি একটি সামাজিক সমস্যা বলিয়াই মনে করি। সমাজপতিরা এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ।

ভিক্ষুক ও কৃপণ ধনী

(উভয় ভূমিকায় শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন)

ভিক্ষুক। আজ দুদিন আমার ঘরে হাঁড়ি চড়ে নি। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে অনাহারে আছে, আমায় কিছু ভিক্ষা দিন বাবা
কৃপণ ধনী। পরিবার প্রতিপালন করতে পারবে না ত বিয়ে করেছিলে কেন? যাও যাও এখানে কিছু হবে না।

প্রবাসীর পত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুক্রবার, ৫ই আগষ্ট—

ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও মহারাণা কচকে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কথা উত্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে কোন সুফলই হয় নাই শুনিলাম। উপনিবেশ-প্রতিনিধিগণের দৌরাত্ম্যে উপনিবেশ-সমাগত ছাত্রগণের বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের প্রতি দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে ভারতবাসীর মন উত্তেজিত হইতেছে। ভারতের অর্থ-কৃচ্ছতা অপনোদন জন্য বিলাতী ধুতি-শাড়ীর উপর সামান্য যে টেক্স ধার্য্য হইয়াছে, তাহা লইয়া কাল হাউস অব্ কমন্সে মহাপ্রশ্নের উত্থাপন হইল। যাহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া রাজা-প্রজার মঙ্গলচিন্তা করিতেছে, তাহাদের কার্য্য ক্রমশঃ বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইবার উপক্রম—এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য এখানে আমাদের "মডারেট" সভার যে ডেপুটেশন হইবার কথা ছিল, তাহা স্থগিত রহিল। কোন কার্য্যই অগ্রসর হইতেছে না।

কাল দেখিলাম, হাউস অব্ কমন্সের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। মেম্বর সংখ্যা বাড়িয়াছে বলিয়া দোতালাতেও মেম্বরদের মধ্যে যাঁহারা বক্তৃতা করেন না, তাঁহাদের বসিবার আসন হইয়াছে। Naval Budgetএর কিয়দংশ কাল আলোচনা হইল। Qustion Timeএ যে হাসি, তামাসা, গণ্ডগোল দেখিলাম, তাহা আমাদের Indian Legislative Assemblyতে কখনই হয় না। বক্তৃতাও যে খুব উচ্চশ্রেণীর শুনিলাম তাহা নয়। কাযেই পার্লামেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর হোয়াইট্ সাহেব আমাদের অ্যাসেম্ব্লির সভাপতি স্বরূপে অ্যাসেম্ব্লির যে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, তাহা আদৌ অত্যুক্তি নয়। কালই সার উলিয়াম পিটার্সন নামে একজন প্রসিদ্ধ জাহাজের মালিক, কচ মহারাণার ভোজ-সভায় বিলাতপ্রবাসী বাঙ্গালীর eloquenceএর (বাগ্মীতার) তারিফ করিলেন। আমার লম্বা আচ্‌কান চোগা দেখিয়া আমাকে "বিশপ্" বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

কমন্স সভায় কেহ টুপি মাথায় দিয়াই, কেহ টেবিলের উপর পা তুলিয়াই বসিয়া আছেন। কারণে অকারণে হৈ হৈ করিয়া মহা চীৎকার ও কোলাহল করিতেছেন। এগুলা মহাসভার বড় মর্য্যাদাজনক চিহ্ন মনে হইল না। আমাদের অ্যাসেম্ব্লি সভার আর কিছু থাকুক না থাকুক, অন্ততঃ গাম্ভীর্য্যটা আছে।

লয়েড জর্জ্জ ও ব্যালফুর ছাড়া মহারথীদের মধ্যে অনেককেই দেখিলাম। উইন্‌ষ্টন চার্চ্চহিল, স্যর হ্যামার গ্রীণউড, কর্ণেল এম্‌রি, ডাক্তার ম্যাকনাম্যারা, স্যর এলফ্রেড মণ্ড, ফিসার অ্যাসকুইথ, রীজ, ম্যাঁকলেন, লর্ড উইলিয়ম ক্যার্ভেণ্ডিস, ভাইকাউণ্ট কার্জ্জন, শ্রমজীবী সর্দ্দার রোজ ও ক্লাইনস্, অষ্টিন চেম্বারলেন প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যগণ অনেকেই বক্তৃতা করিলেন।

রাত্রে মহারাণা কচ কার্লটন হোটেলে ভোজ দিলেন। সেখানে স্যর উইলিয়ম পিটারসন, মিষ্টার রাইফ, টাইমস পত্রিকার মিষ্টার ব্রাউন প্রভৃতি অনেকের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ ও নানা কথাবার্ত্তা হইল।

শনিবার, ৬ই আগষ্ট—

ন্যাশন্যাল লিবারেল ক্লাব, লণ্ডন।

স্যর বি, সি, মিত্র এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতেছেন। শরীর ভাল নাই, দীর্ঘকাল বিশ্রাম প্রয়োজন বলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভাল লাগিতেছে না বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ব্যারিষ্টার পি, এল, রায়

মহাশয়ও অসুস্থ শরীরে আসিয়া এই ক্লাবেই আছেন। তাঁহারও ভাল লাগিতেছে না বলিয়া যাই যাই করিতেছেন।

কাযে কর্ম্মে বিশেষভাবে নিযুক্ত না থাকিলে, কিংবা ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গী না পাইলে এখানে ভারতীয় কাহারও ভাল লাগে না, এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতেছি। সংসারের নিয়ম দেখিতে পাই যে, যে যেখানে আছে, সেখান তাহার ভাল লাগে না। "এখানকার" লোক "সেখানে" যাইতে ব্যস্ত, আবার "সেখানকার" লোক "এখানে" আসিতে ব্যস্ত। আবার "এখানে" আসিলেই "সেখানে" যাইতে ইচ্ছা হয়; "সেখানে" গেলেই "এখানে" আসিতে ইচ্ছা হয়। বোধ হয় "এখানে সেখানে যাতায়াত" অথবা "তাঁত বোনাবুনির" নামই জগৎ। "যাওয়া আসা—আসা যাওয়া" ইহাই ত জগতের কাষ। চলেইছি ত চলেইছি—নিত্য এই চলাতেই মানুষের আনন্দ; আর ইহাই জীবনের লক্ষণ। ছেলে বুড়ার একই অবস্থা। দেশ ছাড়িয়া দূরে আসিয়াও "বায়ু পরিবর্ত্তনের" জন্য "সপ্তাহ শেষে" ও "ছুটীর সময়" কাটাইবার উপায় অভাবে আমরাও বিব্রত হইয়া পড়ি। প্রায় সেদিনকার ব্যাঙ্ক হলিডের ব্যাপারের মত দৌড়াদৌড়ি নিত্য করা হইতেছে। অথচ গত শনিবার বাহিরে কোথাও যাওয়া হয় নাই; এ শনিবারও কোথাও যাওয়া হইল না বলিয়া প্রাণ যেন "আনচান" করিতেছে এই কথা সর্ব্বত্র সকলের মুখে শুনিয়াছি।

গত বৃহস্পতিবার হাউস অব্ কমন্সে "স্পীকার" অথবা সভাপতি রাইট্ অনারেব্‌ল হুটলীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সভাগৃহের পার্শ্বে টেমস্ নদীর ধারেই তাঁহার বাড়ী। গভর্ণমেণ্ট, প্রাসাদ-তুল্য এই বাড়ী স্পীকারের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব স্পীকার মিঃ লাউথার বিশেষ লোকপ্রিয় ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হুটলীও কম নহেন। সৌম্যমূর্ত্তি উদারপ্রকৃতি পণ্ডিত মহাপ্রাণ হুটলী সাহেবের সহিত পরিচয় ও কথাবার্ত্তায় বিশেষ প্রীতিলাভ হইল। পার্লামেণ্টের লাইব্রেরীর মধ্য দিয়া তাঁহার মহলে যাইতে হয়। দুই দিকের দেওয়াল মহাসভার অধিবেশনের "দপ্তরে" (Records) পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে প্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত অনেক সুন্দর চিত্রে প্রাচীন কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে। পাশে পাশে মেম্বরদিগের লেখাপড়ার, আহারের, ধূমপানের ও বিশ্রামের ঘর, এবং ছোট বড় কমিটী রুম আছে। এ সমস্ত ঘরের সাজসজ্জাও সুন্দর।

বর্ত্তমান স্পীকারের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী কর্ণেল ভার্ণে পূর্ব্বে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন। পার্লামেণ্ট গৃহে সাধারণের প্রবেশ-অধিকার এখন নিষিদ্ধ হইলেও, আমার যখন প্রয়োজন, তখনই মহাসভার অধিবেশনে যাইতে পারি, এ কথা কর্ণেল ভার্ণে ও স্পীকার মহাশয় নিজে বলিয়া দিলেন।

স্পীকারের বাড়ীতে সোণালী গিল্‌টী করা পিতলের ঝকঝকে রেলিংওয়ালা সিঁড়ির উপর সুন্দর নরম লাল কার্পেট পাতা। রাজা রাজড়ার প্রাসাদের সিঁড়িরও এত শোভা দেখি নাই। স্পীকারের নিজের লাইব্রেরীর সৌষ্ঠব ও প্রাচুর্য্যের কথা বলা যায় না। মহাসভার সভাপতির সম্মান প্রায় রাজসম্মানের তুল্য করিয়া এই মহাজাতি জাতীয় মহাসভার গৌরবেরই পরিচয় দিতেছে এবং পদের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে।

আমাদের অ্যাসেম্ব্লীর সভাপতি মিঃ হোয়াইট আমার বিষয় স্পীকারকে বিশেষ ভাবে লিখিয়াছেন বলিলেন। সেই জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ যত্ন, অনুগ্রহের পরিচয় ও আপ্যায়ন পাইলাম। মহাসভার কার্য্য-নিয়ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতন পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক বিষয়ে বহুতর আলোচনা হইল। ভারতবর্ষের নূতন ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য এখানকার লোকের মনোযোগ যথেষ্ট আকর্ষণ করিয়াছে। সে কার্য্য সন্তোষজনক ও ভাবী মঙ্গলের সূচক এই ভাবের নিদর্শন স্বরূপ পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ কোন প্রীতিচিহ্ন শীঘ্র ভারতবর্ষে পাঠাইবার কল্পনা হইতেছে, একথা স্পীকার আমায় বলিলেন। কথাটা এখনও গোপনে আছে, শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

হাউস অব্ কমন্সের টেবিলের পার্শ্বে রাজশক্তির নিদর্শন স্বরূপ রাজমুকুট-সংযুক্ত এক প্রকাণ্ড "আসা" (Mace) থাকে। সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে যখন স্পীকার নিজে সভাপতিত্বে আসীন থাকেন, তখন এই "মেস" (Mace) টেবিলের উপর থাকে। (দায়রা মোকর্দ্দমার সময় হাইকোর্টের টেবিলে যেমন Mace থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ।) স্পীকার উঠিয়া যাইবার পর কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইলেই Sergeant at arms অগ্রসর হইয়া maceটীকে নমস্কার করে এবং টেবিলের উপর হইতে নামাইয়া টেবিলে পায়ার গায়ে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলাইয়া দেয়।

প্রস্তাব হইয়াছে যে প্রীতি নিদর্শন স্বরূপ এইরূপ একটি Mace আমাদের অ্যাসেম্ব্লীকে উপহার দেওয়া হইবে। অন্য সময়ে বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহের সহিত এই সংবাদ সাধারণে গ্রহণ করিত। এখন সকল বিষয়েই হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা।

স্পীকারের চেয়ারের অনুকরণে নির্ম্মিত এক চেয়ার Canadaর পার্লামেণ্টে উপহার দেওয়া হইয়াছে। মহাসমারোহের সহিত সেই চেয়ার ভূতপূর্ব্ব স্পীকার স্বয়ং মিঃ (অধুনা লর্ড) লাউথার যাইয়া ক্যানাডা পার্লামেণ্ট প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

পার্লামেণ্ট পদ্ধতি (Parliamentary Procedure) সম্বন্ধে আধুনিক প্রামাণিক গ্রন্থ Dr. Redlick নামে এক অষ্ট্রিয়ান ইহুদী জর্ম্মাণ ভাষায় লিখিয়াছেন। Sir Cantrey Ilbert তাহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ও ইংরাজীতে তাহা অনূদিত হইয়া এ বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেই ইহার রচনা ও অনুবাদ শেষ হয়। ইংলণ্ডের মহাসভার শ্রেষ্ঠ মর্ম্ম ও তথ্য প্রচার কোন ইংরাজের দ্বারা সম্পন্ন হইল না। একজন অষ্ট্রিয়ান পণ্ডিত জার্ম্মাণ ভাষায় তাহা লিখিলেন এবং ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া তাহাই প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইল, ইহা ভাবিবার এবং ভাবিয়া স্তব্ধ হইবার কথা। Sir Erskin Mayর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রাচীন বলিয়া এখন Classics-এর মধ্যে পরিগণিত। জার্ম্মাণ ভাষায় জার্ম্মাণ প্রথায় যাহা হইয়াছে, তাহাই নিপুণ ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া হইয়াছে—ইলবার্ট এ গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা বলিয়াছেন। ইহার অধিক প্রশংসা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন।

স্পীকার মহাশয় এই গ্রন্থখানি আমায় পড়িতে অনুরোধ করিয়া, নিজে যত্ন করিয়া আমার ক্লাবে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার পর লর্ড হ্যালডেনের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণে যাইলাম। তিনি এখন প্রিভি কাউন্সিল আদালতের সভাপতি মাত্র। "জার্ম্মাণ বন্ধু" এই সন্দেহে তাঁহার অন্যান্য সম্মান গৌরব তিরোহিত। তিনি War Secretary থাকিবার সময় সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যুদ্ধের যথেষ্ট আয়োজন করেন নাই, এইরূপ গুরুতর অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে হইয়াছিল। ক্ষোভে তিনি পদত্যাগ করেন। লর্ড চ্যান্সেলর ছিলেন, সে পদও ত্যাগ করেন। এখন দর্শন ও আইন চর্চ্চাতেই ব্যস্ত। আমায় বলিলেন যে, এই পদত্যাগই তাঁহার মঙ্গল ও শান্তির কারণ হইয়াছে। Relativity সম্বন্ধে Einstein যে মহা আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান জগতে নিউটনের তুল্য পদবীর অধিকারী হইয়াছেন, সেই Relativityর দার্শনিক আলোচনা করিয়া লর্ড হ্যালডেন অতি সুন্দর এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রীতি-নিদর্শন স্বরূপ তাহার একখণ্ড আমায় উপহার দিলেন।

তিনি আজই "ছুটী" উপলক্ষে জার্ম্মাণি যাইতেছেন। প্রিভি কাউন্সিলের কর্ম্মপ্রণালী, ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত চূড়ান্ত আপীল আদালত ও বিলাতে না আসিয়া ভারতবাসীর ভারতবর্ষে বসিয়াই ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার সম্বন্ধে এবং "মায়াবাদ" প্রভৃতি সম্বন্ধে অতি বিস্তারিত আলোচনা হইল। ব্যারিষ্টার হইতে ভারতবাসীকে এখানে আসিতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ মত। কিন্তু চূড়ান্ত আপীল আদালত ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়া প্রিভি কাউন্সিলের ক্ষমতা খর্ব্ব হওয়া তাঁহার মত নয়। বরং শ্রেষ্ঠ দুইজন ভারতবাসী আসিয়া প্রিভি কাউন্সিলে

বসেন এবং সমস্ত উপনিবেশের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে তাঁহাদের বসিবার অধিকার হয়, ইহাই তাঁহার মত। তাহাতে সাম্রাজ্যগৌরব বাড়িবে এবং কার্য্যেরও সুবিধা হইবে, ইহাও তাঁহার মত। হিন্দু আইনকে Codification এর শৃঙ্খলে বাঁধা সম্ভব কিংবা উচিত, তাহা তিনি মনে করেন না।

Relativity ও মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা উভয় পক্ষেরই বিশেষ প্রীতিপদ হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় লইলাম। পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার জন্ম বারম্বার অনুরোধ করিলেন।

সেখান হইতে একবার বাজারের দিকে যাইতে হইল। কারণ, কিছু কাপড় চোপড় জুতা কেনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমার দরজী Growcotte একজন পণ্ডিত লোক। এদেশে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তিনি পুরাতন Huguenot বংশসম্ভূত। পুরাতন লণ্ডনের অনেক সংবাদ রাখেন। তাঁহার সাহায্যে Cheapside, Bowchurch, New Gate, Old Bailey প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জায়গাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হইল। এ সকল স্থানের মধ্য দিয়া ব্যসে অথবা মোটরে যাতায়াত করিয়াছি অনেক বার। কিন্তু এরূপ ভাবে তন্ন তন্ন করিয়া দেখার অবকাশ ঘটে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লণ্ডন একটা সহর নয়, একটা দেশ নয়, একটা রাজ্য নয়—ইহাকে একটা মহাদেশ মহাসাম্রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লণ্ডনের বাসীন্দা লোকেই ইহার সম্পূর্ণ তথ্য জানে না, বাহিরের লোকের ত কথাই নাই। ইহাতে কি আছে কি নাই, না জানিয়া না দেখিয়া না বুঝিয়া অনেকে লণ্ডন হইতে পালাই পালাই করেন।

বাজারের কায সারিয়া হাউস অব্ কমন্সে যাইলাম। তখন বজেট সংক্রান্ত কমিটির অধিবেশন হইতেছিল। শ্রমজীবীদিগের কষ্ট নিবারণ ও শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ও সময়ে সময়ে অবান্তর কথা বক্তাগণের মুখে শুনিলাম। একজনের বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে দশজন বলিবার জন্ম দাঁড়াইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ভাগ্যক্রমে যিনি স্পীকার (অথবা কমিটীর সভাপতির) চোখে পড়েন (catches the Speaker's eye) তাঁহারই বলিবার অধিকার হয়। লেডি অ্যাষ্টর (Lady Astor) পার্লামেণ্টের প্রথম ও একমাত্র "রমণী সভ্য"। তাঁহার স্বামী লর্ড অ্যাষ্টর লর্ড সভার সভ্য। সেদিন লর্ড লিটন লর্ড সভায় তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন। সুরাপান নিবারণ সম্বন্ধে সেদিন লর্ড সভায় তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছিলাম। রমণী শ্রমজীবিগণের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে তাঁহার স্ত্রীর বক্তৃতা আজ কমন্স সভায় শুনিলাম। স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর বক্তৃতাশক্তি বেশী মনে হইল। অনেক বক্তা অপেক্ষা লেডি অ্যাষ্টর বলিলেন ভাল। আজ বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইল যে, ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের অপেক্ষা দুর্দ্দশা বুঝি পৃথিবীতে আর কোথাও কাহারও নাই। অথচ বিলাস ঐশ্বর্য্য আজ কাল শ্রমজীবিগণের মধ্যে যত বাড়িয়াছে, সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণের মধ্যেও ততটা নয়। অবস্থান্তরে তাহাদের অনেক নাম ও গৌরবজনক নাম হইয়াছে যথা—নবীন দরিদ্র—New poor।

শুক্রবার মধ্যাহ্নে লর্ড লিটন, গ্রোভ্নর হোটেলে আমাদের ভোজ দিলেন। তাহাতে কোনও কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদকেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। আহারান্তে আমাদের কমিটির কায সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা হইল। সাধারণ জ্ঞাতব্য কথা প্রচার ও প্রকাশিত না হওয়াতে কমিটির কাযের ক্ষতি হইয়াছে। সে বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির হইল।

সোমবার, ৮ই আগষ্ট—

এ দুইদিন লণ্ডনের নানা স্থানে নানা ভাবে ঘুরিয়া কাটিয়াছে। সময় এক রকম বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। সময় কাটাইবার জন্ম দৌড়াদৌড়ি করিয়া জলের মত পয়সা খরচ করিয়া সব সময়ে বাহিরে না যাইলেও চলে, তাহার পরিচয় এ দুই দিনে পাইয়াছি।

লণ্ডন হইতে হ্যাম্পষ্টেড্ হিদ্, সেখান হইতে হ্যামারস্মিথ ইত্যাদি ব্যসে চড়িয়া যাতায়াতে পূর্ব্বে লণ্ডনের যে

সকল রাস্তাঘাট ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, তাহা অনেক দেখা হইয়াছে। কত শত ক্রোশ এই লণ্ডনের রাস্তা, তাহা বলিতে পারি না। মনে হয়, উপর্য্যুপরি মাসাবধি সমস্ত দিন ব্যসে বেড়াইলেও বোধ হয় সমস্ত রাস্তা শুধু ঘুরিয়া বেড়ান শেষ করা যায় না—তন্ন তন্ন করিয়া দেখা ত দূরের কথা। টিউব বা রেলওয়ে কিংবা মোটরে ও ট্রামের ভিতরে বসিয়া সব দেখা যায় না। ব্যসের ছাদের উপর হইতে বসিয়া দেখাই লণ্ডন দেখিবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। একথা গ্ল্যাডষ্টোন কেন বলিয়াছিলেন, তাহা কয়দিন ঘুরিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তখন ঘোড়ায় টানা ব্যস ছিল, এখন তাহার স্থানে মোটর ব্যস হইয়াছে। সুবিধাই হইয়াছে, শীঘ্র যাওয়া যায়, এবং অল্প সময়ে বেশী যায়গা দেখাও যায়।

কয়দিন গরমের পর বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে; সময়ে সময়ে অল্প অল্প শীত পর্য্যন্ত করিতেছে। কিন্তু বেড়াইবার অসুবিধা নাই। হ্যামারস্মিথে লিরিক থিয়েটারে Beggar's Opera নাটক অভিনয় দেখিয়া শনিবার রাত্রি ১১টার পর বাড়ী ফিরিতে শীতে ও আনুষঙ্গিক অনাহারে কষ্টও হইয়াছিল। আহার অভাবে কষ্ট আমার পক্ষে নূতন ব্যাপার। কারণ আহার কমাইয়াই আমার কায কর্ম্ম ও ঘোরাঘুরির সুবিধা। এখন দেখিতেছি, এই আজব সহরে ঘোরাঘুরি করিতে হইলে সময়ে সময়ে রীতিমত আহারের প্রয়োজন।

এই "বেগারস্ অপেরা" নূতন ধরণের পুরাতন নাটক। ১৭২৩ সালে Gay কবির রচিত এই অদ্ভুত নাটক খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এখনও নূতন ধরণে তাহার পুনরভিনয় হইয়া প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে।

"How happy could I be with either,
Were the other dear charmer away.

বচনটা ইংরাজীতে স্থায়ী স্থান পাইয়াছে। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না ইহা Gay's Beggar's Opera হইতে উদ্ধৃত। ঘুস নেওয়াটার একাল সেকালে সমান প্রতিপত্তি, তাই গে গাহিয়াছিলেন—

If you at an office solicit your due
And would not have matters neglected,
You must quicken the clerk
with perquisites too
To do what his duty directed.

আধুনিক Munition Board Case হইতে ছোট বড় অনেক সরকারী আমলা এই "মহাসত্যের" সাক্ষ্য দিতেছে। তবে ব্যাপারটা ভারতবর্ষে কিংবা কোন দেশবিশেষে কোন কালেই আবদ্ধ নহে।

"গে"র আইন-ব্যবসায়ীদের উপর রাগও যথেষ্ট—

It ever was decreed, sir,
If Lawyer's hand is fee'd, sir,
He steals your whole estate.

কবি চোরের মুখ দিয়া একথা বাহির করিয়াছেন বটে। কিন্তু কথাটা এ যুগেও খাটে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

যত চোর, ডাকাত এই Beggar's Operaর নায়ক নায়িকা। যে ভিখারী-সমাজকে কবি এই চিত্রে আঁকিয়াছিলেন, তাহা ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। সেই জন্যই বোধ হয় এই পুরাতন পালা ঝাড়িয়া মুছিয়া, ঝালিয়া বাহির করাতে ইহার এত সমাদর হইয়াছে। উপর্য্যুপরি পাঁচ শত রাত্রি এই অদ্ভুত নাটকের অভিনয় চলিয়াছে, তথাপি ইহার আদর কমে নাই। প্রতি গান দুইবার তিনবার গাহিয়াও অভিনেতারা পরিত্রাণ পায় না। প্রতি রাত্রেই রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য। ফাঁসী কাঠে উঠিবার সময়ও চোরের সর্দ্দার ম্যাকহিদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নাচিতেছে হাসিতেছে আর গাহিতেছে—The wretch of today may be happy tomorrow। আমোদপ্রিয় সমাজ এই আশায় বুক বাঁধিয়াই বাঁচিয়া আছে।

রবিবার নটিংহাম গেট ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাতে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের একটী গান বড় তৃপ্তি দিল। আমার দুর্ব্বুদ্ধিতে আমি যদি হৃদয়দ্বার বন্ধ

করিয়া রাখি, হে আমার চিরদিনের রাজা, তুমি আমায় ফেলিয়া যাইও না। হৃদয়রাজকে হৃদয়রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতেছি। অথচ তাঁহাকে হৃদয়দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, এ আবদার যথার্থ বৈষ্ণবেই করিতে পারে। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র আচার্য্যের কায করিতেছিলেন। উপসনান্তর তাঁহাকে এই মহান্ বৈষ্ণবতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

হেরম্ববাবু, নীলরতন বাবু ইত্যাদি উপস্থিত দেশবৎসল বন্ধুগণকে বলিলাম যে, তাঁহারা ও ভারতের গণ্যমান্য অনেক সুসন্তান এখন নানা কারণে বিলাতে উপস্থিত। সকলে পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া ভারতমঙ্গল জন্য ব্যবস্থার চেষ্টা করা উচিত। এই সকল বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া একটা বৈঠকের চেষ্টা অনেকদিন করিতেছি। যে যার নিজ নিজ কাযে বিশেষ ব্যস্ত বলিয়া তাহা নানা চেষ্টাতেও ঘটিয়া উঠিতেছে না।

টেমস্ নদী আজ বড় সুন্দর দেখাইতেছে। জাহাজে করিয়া Kew Gardens ও Richmond পর্য্যন্ত গিয়া, আসিবার সময়ে ব্যসে ফিরিয়া লণ্ডনের অনেক নূতন দৃশ্য চক্ষে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী জীবনের নৈতিক অবনতি ও পাশব প্রবৃত্তির পরিচয়ও অনেক পাইলাম। এই সমস্ত ছুটীর দিনে রিচ্মণ্ড প্রভৃতি স্থানে নানাশ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়াতে সামাজিক "আলো ও ছায়া"র অনেক নমুনা দেখা যায়। নীলরতন বাবু সঙ্গে ছিলেন। এ সকল বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত অনেক আলোচনা হইল। রিচমণ্ডের Bridge House Old Garden বলিয়া যে সরাই-এ চা খাওয়া গেল, তাহাতে কবে Queen Anne চা খাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে শুধু চা খাইতে দুই শিলিং করিয়া দিতে হইল। ইংরাজী ব্যবসায়-বুদ্ধির বাহাদুরী আছে। এই রিচমণ্ড তখনকার রাজা-প্রজার "বাগান বাড়ী"র সামিল ছিল, অনেক কুকীর্ত্তির কাহিনী ইহার বুকে লুকান আছে। ব্যসে ফিরিবার সময় আলবার্ট মেমোরিয়াল, আলবার্ট হল, কেন্সিংটন প্যালেস, কেন্সিংটন প্যালেস গার্ডেন্স, হাইড পার্ক প্রভৃতি দেখা গেল।

আজ কমিটিতে যাইবার পূর্ব্বে স্যর হ্যাভলক্ চার্লস-এর সঙ্গে দেখা করিতে ইণ্ডিয়া আপিসে যাইলাম। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎক ছিলেন। এখন চিকিৎসা-বিভাগ সম্বন্ধে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের পরামর্শদাতা। সুরেশের অকালমৃত্যুতে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এদেশে ভারতবাসী-দিগের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপায়ের পথ-প্রদর্শনের কথায় বিশেষ ঔদাস্য দেখিলাম। লণ্ডন হাঁসপাতালে ভারতবাসীদিগের শিক্ষার উপায় ইঁহাদের দ্বারা কিছুই হইতেছে না; বরং অন্তরায় অনেক বাড়িতেছে। এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া বিশেষ কোন ফল পাইলাম না।

গত শনিবার ইণ্ডিয়া আপিসের "পণ্ডিত" লাইব্রেরীয়ান টমাস্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সম্প্রতি ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইতিহাস ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটী বক্তৃতাও দিয়া আসিয়াছেন। ইণ্ডিয়া আপিসে ভারতবর্ষীয় আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তর পুঁথিপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উদ্ধারের কোনও উপায়ই দেখিতেছি না। সে বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারা যাইতেছে না। অনেক কথা এখনও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা নাই বলিয়া বোধ হয় এ সকল ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশিত হইতেছে না। ভারতবর্ষের দুই তিন জন ছাত্র এ বিষয়ে বিশিষ্ট গবেষণার জন্য প্রস্তুত। চেষ্টা করিয়াও তাহাদের জন্য কোন সুবিধা করিতে পারিতেছি না। সকল বিষয়েই বিঘ্ন বিপত্তি বাধা। টমাস সাহেবের সহিত এ বিষয়ে নানা কথা হইল।

আজ কমিটির কায শেষ হইবার পর ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখিতে গেলাম। রীডিং রুমের ঐশ্বর্য্য ও বন্দোবস্ত, ক্যাটালগের বাহুল্য ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা গতবারে অনেক হইয়াছে। পুরাতন ইতিহাস (গ্রীক, রোম,

ইজিপ্ট, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতির) প্রস্তর মূর্ত্তি, প্রস্তরফলক, হস্তলিখিত (Manuscript) পুঁথী ও অন্যান্য উপাদানে সমৃদ্ধিশালী "আজব" ঘর পৃথিবীতে এমনটি আর কোথাও নাই। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সহায়ক রত্নরাজি সুকৌশলে সজ্জিত হওয়ায় আধুনিক গবেষণার পথ কত পরিষ্কার হইয়াছে। যুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে ভাল ভাল জিনিষ সরাইয়া মাটীর নীচের ঘরে রাখা হইয়াছিল, এখনও তাহা সব যথাস্থানে ফিরাইয়া আনা হয় নাই।

সংবাদপত্র সম্পাদন সম্বন্ধে সম্যক্ শিক্ষা দিবার জন্য ম্যাক্স পেম্বারটন নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক খ্যাতনামা নানা সম্পাদকের ও সংবাদপত্র-অধিকারীর সাহায্য লইয়া London School of Journalism স্থাপন করিয়াছেন। London Business Collegeএ নামে সাধারণ কাযকর্ম্ম শিখাইবার উদ্দেশ্যে এক বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। এ দুই বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। এ সকল বিদ্যা অর্জ্জনের জন্যও ভারতীয় ছাত্র অনেক আসে বটে, কিন্তু এই বিদ্যালয় দ্বারা বিশেষ কায কিছু হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

বুধবার ১০ই আগষ্ট—

কাল এডুকেশন মিনিষ্টার মিঃ ফিসার ও শিক্ষা-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী সেল্বী বিগ্স-এর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সময়াভাবে উক্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী অরেঞ্জ টৌইণ্টিম্যান (Orange Twentyman) প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। Primary, Secondary, Female, Industrial, Montessori প্রভৃতি শিক্ষার সকল বিভাগের কায ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় তাঁহাদের সহিত দেখা হওয়া প্রয়োজন। নূতন ভাবে বিস্তারিতভাবে সার্ব্বজনীনভাবে এই সকল বিভাগের কায এখন ফিসার মহোদয়ের কর্ত্তৃত্বে হইতেছে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আইন নানা স্থানে ছড়ান রহিয়াছে। তাহাদের একত্র করিয়া আরও তেজের সহিত নূতন কাযের চেষ্টা ফিসার করিতেছেন; এবং Education Acts Consolidationএর জন্য পার্লামেণ্টে প্রস্তাব উঠিয়াছে। আমাদের দেশে এ সকল কায যে পরিমাণে হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতের আশা বড়ই কম। টাকার অভাবে চেষ্টা সর্ব্বত্রই বিফল হইতেছে। কাযেই ইউনিভার্সিটি শিক্ষার প্রসারণ চেষ্টাও বিফল হইতেছে। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া যথেষ্ট ফললাভ করিতে হইলে আধুনিকভাবে শিক্ষার বিশেষ প্রসার ও বিস্তার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ফিসার মহাশয়ের নিকট অনেক সারগর্ভ পরামর্শ পাইলাম। তিনি একজন দক্ষ কর্ম্মচারী সঙ্গে দিয়া ছুটীর পরেই আমার সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন-ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিলেন।

আজ কমিটির নিকট কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্যর ডেনিসন রস (এক্ষণে Director of Oriental School, London) সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গলা, আরবী, পারসী, পালি, ইত্যাদি ভারতবর্ষের ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীর চর্চ্চার জন্য এই নূতন বিদ্যালয় ওরিএন্ট্যাল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে তাহার সঙ্গে ছাত্রাবাস স্থাপিত করিয়া অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি শ্রেণীর কায আধুনিক প্রণালী মত লণ্ডন সহরের মধ্যেই যাহাতে সহজে হইতে পারে, আমি একথা অনেক দিন তুলিয়াছি। রস সাহেব সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। সাধারণ মত এ প্রস্তাবের বিশেষ বিরুদ্ধে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। কমিটির কাযের পর রস্ সাহেব তাঁহার বাসায় লইয়া গিয়া আমার আদর আপ্যায়ন এবং এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। পরে স্যর নীলরতন সরকার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিতও এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইল। কিন্তু আসল কায কিছুই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

বিকালে ১৭৫নং পিকাডেলি Round Table Officeএ মিষ্টার Lionel Curtisএর সহিত দেখা

করিতে যাইলাম। "দ্বৈত শাসনতন্ত্র" সম্বন্ধে Lionel Curtis বহুদিন চেষ্টা করিতেছেন—Empire ideal যাহাতে বজায় থাকে, তাঁহার চেষ্টা। ডনক্যান হল, আর্ণেষ্ট ল প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থকার ও দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারাল স্মাটস্ ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের মন্ত্রীদল এখন ইম্পিরিয়েল আইডিয়ালের বিরোধী। কমনওয়েলথ্ অথবা সাধারণ লোকতন্ত্রপ্রণালীর তাঁহারা পক্ষপাতী। ভারতবর্ষেও এ আলোচনা যথেষ্ট চলিয়াছে। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভারতবাসীর এখনও যে দুর্দ্দশা চলিয়াছে, তাহা না কমিলে শুধু নামে সাম্রাজ্যের গৌরবে ভারতবাসী চিরদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, পারিবে না, এ কথা কার্টিসকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। বাস্তবিক এ সকল বিষয়ে স্পষ্ট বোঝাপড়ার সময় আসিয়াছে। বিনা-সঙ্কোচে একথা ষ্টেট সেক্রেটারী, পার্লামেন্টের মেম্বর ও সাধারণ প্রতিনিধিগণকে যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। ফল কি হইতেছে, ভগবানই জানেন।

লর্ড লিটন প্রভৃতি প্রায় আহারাদির নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। লর্ড লিটন প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু লইয়া আজ ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলাম। আহারান্তে নানা কথার মধ্যে ভারতীয় পুরাতন যোগপ্রণালীতে চিকিৎসক-গুরু যে নিয়মে চিকিৎসা করিয়া মানসব্যাধির উপশম করিতেন, তাহারই ছায়া লইয়া আজকাল Psycho analysis of Auto suggestion ইত্যাদি নাম দিয়া চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টা হইতেছে তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা লর্ড লিটনের সহিত হইল। ভারতবর্ষের পুরাতন তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ আছে। সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে এই সকল আলোচনা চলিতেছে। এ সকল বিষয়ে তাঁহার পাঠোপযোগী গ্রন্থ আমি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

বৈকালে আজ পুনরায় হাউস অব্ কমন্সে যাইলাম। জার্ম্মাণেরা সন্ধিস্থাপনের পর নিজ শিল্প বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ইংরাজ-শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি করিতে উদ্যোগী এবং বিলাতের লোকের অন্নে ধূলা পড়িবার তাহাতে সম্ভাবনা এই আশঙ্কা করিয়া পার্লামেণ্টে এক বিল দাখিল করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন মত বিদেশী সকল জিনিষেরই উপর টাকায় ।/৫ ট্যাক্স বসাইয়া ইংরাজ নিজ বাণিজ্যশিল্প-রক্ষা করিতে পারিবে। অনেকে এ প্রণালীতে বাণিজ্য-শিল্প রক্ষার বিশেষ বিরোধী। কারণ এতদিন মিল, কবডেন, ব্রাইট যাহা করিয়া গিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে তাহার লোপের সম্ভাবনা। "জোসেফ" চেম্বার্লেন ট্যাক্সের বেড়া দিয়া ইংরাজী বাণিজ্য শিল্প রক্ষার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এতদিন পার্লামেণ্টে গ্রাহ্য হয় নাই। এখন "অষ্টেন" চেম্বারলেন প্রমুখ অর্থনীতিবিশারদগণ তাহা রূপান্তরে গ্রাহ্য করিতে বসিয়াছেন। ওদিকে কিন্তু দেউলিয়া হইবার ভয়ে, অনেক ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ম্যান্চেষ্টারের তুলার জিনিষের উপর সামান্য কর বসানতে ল্যাঙ্কাসায়ারের সূতা ও কাপড়ের সওদাগরগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের উপর ঝাল ঝাড়িবার দরকার হইলেই এই কথা খবরের কাগজে ও পার্লামেণ্টে প্রকাশ্য ভাবে উঠে। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ এইরূপে নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য বিলাতী সকল জিনিষের উপর উচ্চ কর বসাইলে উভয়পক্ষে সদ্ভাব রক্ষা দুরূহ হইবে। একেই ত এখানে কোন শিল্প কিংবা বাণিজ্য শিক্ষা সূত্রে ভারতীয় ছাত্র স্থানই পায় না। পাছে নিজের বাণিজ্য-রহস্য (Trade Secret) প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ওজরে ভারতীয় ছাত্রদিগের এই সকল স্থানে প্রবেশের ও সুবিধা পাইবার অধিকার নাই। এই উভয় বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করা চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রের পক্ষেই বড় কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

বৌদ্ধযুগের মথুরা

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মথুরা নগরীতে কৃষ্ণলীলা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে সকল মূর্ত্তি বা মন্দিরাদি আজিকা'ল দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই আধুনিক ও কৃত্রিম। এখানে মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়ের মন্দির বা ভবনাদি আছে কি না সন্দেহ। তবে এখানে নানা স্থান খনন করিয়া যে সমস্ত জৈন ও বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়েছে তাহার কোন কোনট দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক পুরাতন। মথুরার কঙ্কালী টিলা নামক স্থান হইতে কেবল জৈন্‌দিগের শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের নিদর্শন সকল মিলিতেছে। তদ্‌ভিন্ন অপরাপর নানা টিলা ও স্থান হইতে বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ (relics) পাওয়া যাইতেছে। বুদ্ধদেবের, জীবনী মধ্যে কোন্ সময়ে তিনি মথুরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না থাকিলেও চৈনিক পরিব্রাজকেরা, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, এখানকার উপগুপ্ত বিহারে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখ রক্ষিত ছিল। ২০ সঙ্ঘারামের মধ্যে সাতটি স্তূপ বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নামে পরিচিত ছিল। ঐ সকল সঙ্ঘারামে বৌদ্ধ শাস্ত্রের সকল শাখাগুলির শিক্ষা ও আলোচনা হইত। বুদ্ধদেবের উপদেশ দিবার স্থান, পাদচারণ স্থান, এমন কি পাদচিহ্নগুলি পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে ফাহিয়ান এখানে কোন ব্রাহ্মণ্য দেবালয়ের কথা উল্লেখ করেন নাই। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিয়ন্থ-সাঙ এখানে পাঁচটি মাত্র হিন্দু দেবালয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এই উভয় সময়ের মধ্যে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের অধিকার কালে মথুরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সহজে অনুমান হয়। সে যাহা হউক, আমরা বুদ্ধদেবের জীবনী হইতে আরম্ভ করিয়া অশোক কনিষ্ক প্রভৃতি যাঁহারা মথুরার সহিত সংসৃষ্ট তাঁহাদের ইতিহাস ও চৈনিক পরিব্রাজকদিগের লিখিত বিবরণ সময়ানুক্রমে পরে পরে দিয়া যাইব। মথুরায় প্রাপ্ত বৌদ্ধযুগের কতকগুলি মূর্ত্তির চিত্র পাঠকগণকে দেখাইব। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কোন-কোনওটিতে দাতার নাম, বংশ পরিচয়, কোন্ রাজার সময়ে স্থাপিত, তাহা পর্য্যন্ত তৎকাল-প্রচলিত লিপিতে খোদিত আছে।

বুদ্ধদেবের জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তিনি ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বৈশাখমাসে পূর্ণিমাতিথিতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এবং ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে শালতরুমূলে বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে. পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহাঁর জীবিত কালেই, ত্রিপীটক নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে তাঁহার পুত্রের নাম দিয়া রাহুলসূত্র বলে। ত্রিপীটকের অর্থ তিনটি পেটরা। সূত্র পীটক, বিনয় পীটক ও অভিধর্ম্ম পীটক, এই তিনটি লইয়া ত্রিপীটক রচিত হইয়াছে। (১) সূত্র পীটকে বুদ্ধদেবের বচনাবলী প্রকটিত আছে, ইহাই মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। (২) বিনয় পীটকে নানা ধর্ম্মোপদেশ আছে। (৩) অভিধর্ম্ম পীটকে বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্র। বুদ্ধদেব কখনও মথুরায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন কি না তাহা তাঁহার জীবনচরিত হইতে সুস্পষ্ট জানা যায় না। তিনি ধর্ম্মপ্রচার জন্য ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গে কেবল কয়েকজনমাত্র শিষ্য থাকিত, সেজন্য বুদ্ধচরিত-লেখকেরা সকল স্থানের সকল সংবাদ দিতে পারেন নাই।

তবে চৈনিক পর্য্যটকেরা সে বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা পরে শুনাইব। বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের

পূর্ব্বরাত্রে, সুভদ্রনামে একজন বিদেশী লোক আসিয়া তাঁহার শেষ শিষ্য হইয়াছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে, বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবীণ, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে সুভদ্র মথুরার লোক। মথুরা! বুদ্ধদেবের গতিবিধি না থাকিলে সুভদ্র কখনই মথুরা হইতে দূরদেশে কুশীনগরে আসিয়া শিষ্য হইতেন না। বৌদ্ধ মহাস্থবির যশ, সনবাস (অর্থ লোহিত বসন) এবং উপগুপ্ত, ইঁহারা সকলেই মথুরার লোক।

১। পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। মথুরায় একটি কূপমধ্যে প্রাপ্ত।

বৌদ্ধমতের সারাংশ এই :—ইহাঁরা কোমৎ মিল স্পেন্সরের ন্যায়, অধোক্ষয (ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত) অপ্রমেয় (unknown and unknowable) অবাঙ্‌মনসোগোচর ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই নীরব। ইহাঁদের মতে ব্রাহ্মণাদি কোনও বিশেষ জাতির ধর্ম্মাধিকার নাই— অর্থাৎ জাতিভেদ স্বীকার করেন না। মনুষ্যমাত্রেরই ইহাদের নীতির ধর্ম্মে সমান অধিকার। বৌদ্ধমতে কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী; এবং ইঁহারা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। মনোবৃত্তি বা কামনা বিসর্জ্জন ভিন্ন জীবের শান্তি নাই। ধর্ম্ম মনোগত,—আচারগত নহে। নির্ব্বাণই পরমা শান্তি। যে অবস্থায় আত্মার অস্তিত্বমাত্র থাকে, অথচ চিন্তা, কামনা, সুখদুঃখানুভূতি থাকে না, তাহাই 'নির্ব্বাণ' বা শান্তি। ইঁহাদের মতে "মনোনিবৃত্তিঃ, পরমোপশান্তিঃ।"

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যেরা, পূর্ব্ববর্ণিত জীবহিংসা-বহুল ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিপক্ষে, সর্ব্বজনে বুঝিতে পারে এরূপ প্রচলিত সরলভাষায় ভারতের গ্রামে গ্রামে ও দ্বারে দ্বারে নিজ ধর্ম্মমত ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, কনিষ্ক ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি সম্রাটেরা ও অসংখ্য রাজারা এই সরল ও হৃদয়গ্রাহী ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। অনতিকালমধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া এসিয়া মহাদেশের প্রায় সমস্ত ভাগেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আজিও পৃথিবীর শতকরা ৪০ জন লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম পালন করিতেছে। সেই জন্যই বুঝি আর্ণল্ড্-সাহেব তাঁহাকে "প্রাচ্যজ্যোতি" (Light of Asia) আখ্যা দিয়াছেন। এসিয়াখণ্ড দূরে থাক, ইউরোপ ও আমেরিকার মহামহা পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নামে মুগ্ধ। রীজ ডেভিড্‌স বলিয়াছেন—

"Gautama's whole training was Brahmanism. He probably deemed himself to be the most correct exponent of the spirit as distinct from the letter of ancient faith, and it can only be claimed for him that he was the greatest, wisest and best of the Hindus."

ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার অপরাপর সম্প্রদায় তাঁহার উপর এত বিরক্ত যে তাঁহাকে নাস্তিক ও চোর প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়া, বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের মধ্যেও তাঁহার নিন্দা

করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীরামচন্দ্র জাবালী মুনিকে বলিতেছেন :—

"যথা হি চৌরঃ স তথা হি বুদ্ধতথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজামাং, স নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।"

অর্থ :—চোর যেরূপ দণ্ডার্হ, বুদ্ধমতানুযায়ী তথাগত নাস্তিককেও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ জানিবেন। প্রজাগণের বুদ্ধিপরিশুদ্ধির জন্য নাস্তিককে দণ্ডিত করা রাজার কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তি নাস্তিকের সহিত আলাপ করেন না। ইতি অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯সর্গ, ৩৪ শ্লোক দেখুন।

আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রামায়ণে উত্তর কাণ্ডে শ্রীরাম ও তাঁহার ভ্রাতারা, আপন আপন উত্তরাধিকারিগণকে, যে সকল নগরের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা। যথা :—রামচন্দ্রের পুত্র কুশকে, 'কুশাবতী' বা কুশাগ্রপুর, অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের বর্ত্তমান রাজগৃহ; লবকে 'শরাবতী'—বৌদ্ধদিগের শ্রাবস্তী; ভরতপুত্র তক্ষকে গান্ধারের তক্ষশীলা এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবতী বা আধুনিক 'পেশোয়ার'; লক্ষ্মণ পুত্র অঙ্গদকে কারাপথ বা অঙ্গদীয়া (কারাপথ প্রয়াগ হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, এখানে অনেক বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে) ও চন্দ্রকেতুকে চন্দ্রকান্তা (মল্লভূমিতে অবস্থিত)। এটী কোন স্থান ঠিক জানা যায় নাই। কেহ কেহ ইহাকে লক্ষণাবতী (লক্ষ্ণৌ) বলেন। (লক্ষ্ণৌয়ে লক্ষণ টিলা, হনুমান টিলা প্রভৃতি টিলাগুলি বৌদ্ধ স্তূপ কি না তাহা বলিতে পারি না।) শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহুকে মথুরা ও শত্রুঘাতীকে বিদিশা বা অবন্তী—বর্ত্তমান উজ্জয়িনী। এমন কি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রসিদ্ধ অযোধ্যানগরীর বৌদ্ধনাম 'সাকেত' বা 'বিশাখা।"

চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থ্ সাং ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে কোশাম্বী হইতে এই বিশাখা বা অযোধ্যায় আসিয়া ২০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও তিন সহস্র শ্রমণ দেখেন এবং রাজধানীর উত্তরদিকে রাজপথের পার্শ্বে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামে, তিনি ধর্ম্মপাল নামে একজন বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎলাভ করেন। ইহার অল্পদূরে

২। উপদেশ মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি।

বিশাখা নামক সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত নির্ম্মাল্য পুষ্প হইতে সমুৎপন্ন, একটী ৭ ফুট উচ্চ বৃক্ষ দেখিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাহেব অযোধ্যা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, অযোধ্যার পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিত রামকোট দুর্গ, মনি পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত, প্রভৃতি স্তূপগুলি এক সময়ে বৌদ্ধস্তূপ ছিল। অধুনা তাহাদের হিন্দুনাম হইয়াছে। আমাদের এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে বারানসী, মগধ, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক হিন্দু তীর্থে বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষের উপর হয় মুসলমান নতুবা ইংরাজ আমলেই ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা স্থাপিত হইয়াছেন।

অনেক অভিজ্ঞ খৃষ্টানেরাও বলিয়া থাকেন যে তাঁহা-

দের বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটী প্রত্যাদেশ (Ten Commandments:) বৌদ্ধদিগের দশ-শীল হইতে সংগৃহীত; এবং তাঁহাদের ক্যাথলিক ধর্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধদেবকেই সাধু জোশেফৎ (Saint Josaphat) নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবি জয়দেব যাঁহার কারুণ্য গুণে মুগ্ধ হইয়া

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতং।

সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং॥"

বলিয়া স্তব করিয়াছেন, তাঁহারই উদ্দেশে আবার স্কন্দ পুরাণের কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া মোহধর্ম্ম প্রচার করাতে দেবতারা কাশী ত্যাগ করেন।" এই উক্তি হইতে মনে হয় পুরাণকার বোধ হয় শৈব,—বৌদ্ধমতের বিরোধী ছিলেন।

আরও এ নিন্দাটাও প্রচলিত আছে যে—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে।" বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক মায়াবাদে, ব্রহ্ম স্বীকার থাকিলেও সে ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় উপরিউক্ত প্রবাদ রটিয়াছে। বৈষ্ণব বৈদান্তিকেরা বলেন, ব্রহ্ম অনন্ত শক্তিময়। মূলে মতের এইরূপ প্রভেদ থাকিলেও বৈষ্ণবগণের অনেক আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, এমন কি পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত যে বৌদ্ধশ্রমণগণের অবিকল অনুকরণ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

৩। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অঙ্কিত একটি আবাগপট।

বৌদ্ধ শ্রমণেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবদের মস্তকে কেবল একটী শিখা ভিন্ন অপর সমস্ত অংশই মুণ্ডিত। শ্রমণেরা ত্রি-চীবর অর্থাৎ তিনখানি মাত্র বসন অঙ্গে ধারণ করিতেন। যথা:—

১ম—অন্তর্বাস—অর্থাৎ কৌপীন,

২য়—তদুপরি সঙ্ঘটী, দ্বিরাবৃত্ত পরিচ্ছদ, অর্থাৎ দোফেরা বহির্ব্বাস,

৩য়—উত্তরাসঙ্গ অর্থাৎ উড়ানি॥ কেবল বসনের মধ্যে প্রভেদ এই যে শ্রমণেরা পীতবর্ণ বসন পরিতেন, বৈষ্ণবদিগের বসন শ্বেত বা গৈরিক বর্ণের হইয়া থাকে। শ্রমণদিগের হস্তে ভিক্ষাভাজন থাকিত; তৎপরিবর্ত্তে বৈষ্ণবদিগের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি বিলম্বিত।

কোন কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু, বাউলদিগের মত 'অগ্রপদীন'—মাথা বা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বিত জামাও ব্যবহার করিতেন।

বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানিতেন না। ভক্তমাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ মালায় শ্রীগুহরাজার চরিত্রে দেখিতে পাই:—

"বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি যেই জন করে।
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে॥
বৈষ্ণবেরে নীচ জাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয়॥"

ঐ গ্রন্থের ষোড়শ মালায় শ্রীরুইদাসের চরিতে পাওয়া যায়:—

"ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচ জাতি হরি ভক্তে কি না লভ্য হয়॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ জাতি কুলেতে জন্মায়॥"

এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত বৈষ্ণবেরা জাতিভেদের পক্ষপাতী নহেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেব বারাণসীধামে সনাতনকে নিম্নলিখিত রূপ বৈষ্ণব লক্ষণ বলিতেছেন:—

"এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় করি দিগ্‌ দর্শন॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সার মন।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্‌ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের অনন্ত গুণময় ব্রহ্ম—"কৃষ্ণৈকশরণ" শব্দের স্থানে 'অহিংসা পরায়ণ' শব্দ থাকিলে শ্রমণ-লক্ষণের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়।

আবার বৈষ্ণবদিগের নিষ্কাম কর্ম্ম বা ঈশ্বরে কর্ম্ম ফল সমর্পণের সহিত বৌদ্ধদিগের 'কামনা নিবৃত্তি'র কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

তবে এ কথাটা আমরা বলিতে বাধ্য যে বৌদ্ধ শ্রমণেরা জৈনদিগের মত একেবারেই নিরামিশাষী ছিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে বৌদ্ধ শ্রমণেরা, স্বহস্তে জীব হত্যা না করিয়া, আধুনিক কোন কোন বাঙ্গালী গোস্বামী বা বৈষ্ণবদিগের মত অপর জন কর্ত্তৃক নিহত মৎস্য-মাংসাদি উদরসাৎ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবম অবতার। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কল্কি পর্য্যন্ত বিষ্ণু বা তাঁহার দশ অবতারের যে কোন মূর্ত্তির উপাসককেই 'বৈষ্ণব' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং বৌদ্ধগণকে 'বৈষ্ণব' আখ্যা দিলে অসঙ্গত হয় না। তথাপি বৌদ্ধেরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৌদ্ধদিগের উপর বিরূপ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন।

চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ ভ্রমণ কালে এক বৌদ্ধমঠে যাইয়া বৌদ্ধগণের মাথায় লাথি মারিলে "পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া॥"

চরিতামৃতের মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণদেশে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন ত্রিপদী ত্রিমল্লে পৌঁছিবার পূর্ব্বে,

৪। বৌদ্ধস্তূপের আয়াগপট। ভূমি খননকালে মথুরার হোলি দরজার নিকট প্রাপ্ত।

একটী বৌদ্ধমঠে উপস্থিত হন। তথাকার মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত মহাপ্রভুর অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। তাহারা পরাস্ত হইয়া, মহাপ্রভুকে বিষ্ণুর প্রসাদ বলিয়া অমেধ্য খাদ্য আনিয়া দিয়াছিল। এমন সময়ে, অকস্মাৎ কোথা হইতে একটি বৃহৎ পক্ষী আসিয়া, থালিটা মুখে লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথার উপর এত প্রবল বেগে ফেলিয়া দিয়াছিল যে,

বৌদ্ধাচার্য্য তাহার আঘাতে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে কৃষ্ণনাম শুনিয়া তাঁহার চেতনা লাভ হয়। এই সকল হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের সময়েও ভারতের কোন কোন স্থানে বৌদ্ধমঠ বিদ্যমান ছিল। আজিও নেপাল, ভুটান, দার্জ্জিলিং, সিকিম্‌ প্রভৃতি স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে প্রকাশ্য বৌদ্ধমঠ আছে কিনা জানি না। তবে অনেক বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও আচার ব্যবহার হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।

পুরাণগুলির মধ্যে যেমন শিব-ভক্তেরা শিবের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রভাব খাটো করিয়া দিয়াছেন, এবং বিষ্ণু ভক্তেরা যেমন বিষ্ণুকে "শিব বিরিঞ্চিনুতং" বলিয়া বাড়াইয়া থাকেন, বৌদ্ধ পুঁথিতেও সেইরূপ, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র বুদ্ধদেবের সাহচর্য্য করিতেন বলা হইয়াছে। কোথাও ব্রহ্মা বা ইন্দ্র

অভয় বা উপদেশ মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি।

আসিয়া বুদ্ধদেবের মাথায় ছাতা ধরিতেছেন, কোথাও বা ইন্দ্র ঐরাবত হইতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। কলিকাতার যাদুঘরে এইরূপ ভাবের প্রস্তরাঙ্কিত দুইচারিখানা প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বৌদ্ধ গ্রন্থে বিষ্ণু ও শিবের কোনরূপ উল্লেখ আছে কি না জানি না।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাঁহারা স্থবিরবাদী (রক্ষণশীল সম্প্রদায়,) তাঁহারা (১) দীপঙ্কর, (২) কৌণ্ডিল্য (৩) মঙ্গল (৪) সুমনস (৫) রেবত (৬) শোভিত (৭) অনেকদর্শী (৮) পদ্ম (৯) নারদ (১০) পদ্মোত্তর (১১) সুমেধাঃ (১২) সুজাত (১৩) প্রিয়দর্শী (১৪) অর্থদর্শী (১৫) ধর্ম্মদর্শী (১৬) সিদ্ধার্থ (১৭) তিষ্য (১৮) পুষ্য (১৯) বিপশ্চী (২০) শিখী (২১) বিশ্বভূ (২২) ক্রকুচ্ছন্দ (২৩) কনক মুনি ও (২৪) কাশ্যপ নামে ২৪ জন মাত্র বুদ্ধ মানেন। এবং যাঁহারা মহাসাত্বিক অথবা উদার মতাবলম্বী, তাঁহারা অসংখ্য বুদ্ধাবতার মানেন।

বোধিসত্বের মুখ্য অর্থ,যে জীব বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য আগ্রহশীল। সিদ্ধার্থ পূর্ব্বজন্মে বোধিসত্ব ছিলেন ও বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহার বোধিসত্ব আখ্যা ছিল। অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, সমস্ত ভদ্র, মারীচি, বজ্রপাণি, মৈত্রেয় প্রভৃতি কয়েকটি বোধিসত্বের নাম ইহাঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বোধিসত্বগণের মূর্ত্তিগুলি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ উপাসকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—১ম—শ্রমণ ইহাঁরা শিক্ষার্থী—২য় ভিক্ষু—ইহাঁরা সাধন মার্গে অগ্রসর ;—৩য় অর্হৎ যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—মুক্ত পুরুষ।

স্তূপ বলিলে বুদ্ধদেব বা কোন বৌদ্ধ সাধুর দেহাবশিষ্ট বা শরীর ধাতুর উপর, মৃত্তিকা বা পাষাণ নির্ম্মিত, অর্দ্ধগোলাকার, বা কোনরূপ কোণ বিশিষ্ট উচ্চ টিলা বুঝায়। কোন কোন স্মরণযোগ্য পবিত্র স্থানের উপরও স্তূপ নির্ম্মিত হইত। এইরূপ স্তূপ নির্ম্মাণ বৌদ্ধগণের একটী পুণ্য কর্ম্ম। কতকগুলি স্তূপ অর্দ্ধগোলাকার, তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া পরিক্রমা পথ থাকিত। এবং তৎপার্শ্বে চারিদিকে কারুকার্য্য যুক্ত ঘেরা থাকিত ও পরিক্রমা পথে প্রবেশের জন্য চারিটা উচ্চ তোরণ থাকিত। কোন কোন স্তূপ চতুষ্কোণ বা অষ্টকোণ হইত। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গীমধ্যে পূর্ব্বদিকে অক্ষোভ্য মূর্ত্তি, পশ্চিমে অমিতাভ মূর্ত্তি, দক্ষিণে রত্নসম্ভব মূর্ত্তি, ও উত্তরে অমোঘসিদ্ধি মূর্ত্তি থাকিত। মধ্যস্থানে ধ্যানী বুদ্ধ, বা বিরোচন মূর্ত্তি থাকিত। বৌদ্ধদিগের শীতলাদেবীর নাম—হারীতি।

সঙ্ঘারাম বলিলে বৌদ্ধদিগের সমগ্র দেবকুল বা দেবালয় (Monastic establishment) বুঝায়। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের মন্দির, শরীর ধাতু রক্ষার বা কোন পবিত্র ঘটনার স্মৃতিস্তূপ, অর্হৎ,ভিক্ষু ও শ্রমণগণের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠুরী থাকিত। তৎসঙ্গে অতিথি অভ্যাগতের জন্য ধর্ম্মশালাও দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহার সহিত আরাম বা ফলপুষ্পের উদ্যান রচিত হইত। চৈত্য অর্থে—ক্ষুদ্র পূজাস্থান বা যথায় চিতাভস্ম প্রোথিত থাকে। বৌদ্ধদিগের অনুকরণে মথুরা প্রদেশের অনেক বৈষ্ণবেরা চিতাদগ্ধ অস্থি বা দেহ ধাতু, নানা দেবস্থানে, বা কুঞ্জে আজিকার দিনেও প্রোথিত করিয়া থাকেন। তদুপরি কেহ তুলসীমঞ্চ, কেহ বা রাধাকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন স্থাপিত রাখেন। এগুলির নাম এখন সমাজ বা সমাধি—যেমন বৃন্দাবনে চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ।

বৌদ্ধেরা হিন্দু ও জৈনদিগের মত নির্দ্দিষ্ট তিথিতে উপোষথ বা উপবাস করিতেন।

বৈষ্ণবের মতে "যেই গুরু সেই কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।" বৌদ্ধেরা আদৌ শূন্যবাদী হইয়াও গুরুকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণবদিগের মত শিষ্যেরা ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজ দেহ পর্য্যন্ত গুরুর সেবার জন্য অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা প্রথমে বুদ্ধদেবকে, পরে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের পূজায় প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে বৌদ্ধেরা হিন্দুগণের দেখাদেখি, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, হারীতি, মারীচি, জম্ভলা,

প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবতার কল্পনা করিয়া পূজা করিতেন।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে হীনযান ও মহাযান নামে দুইটী সম্প্রদায় হইয়াছিল। হীনযানেরা শূন্যবাদী ও আপনার আত্মার মঙ্গলেচ্ছু। মহাযানেরা বুদ্ধদেবকেই মুক্তিদাতা মনে করিয়া স্তবস্তুতি পূজা করিতেন। ইঁহারা "সর্ব্বসত্ত্বানাং হিতে রতাঃ।" পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজ যান, কালচক্র যান প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। যান শব্দে পন্থা বুঝায়।

হীনযানেরা পালি ভাষায় জাতক নাম দিয়া ৫৫৫খানি গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্ম-বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মহাযানের লোকেরা ঐ সকল জাতকের উপর ততটা আস্থা স্থাপন করেন না। ইহাঁদের গ্রন্থের নাম—'অবদান অ খৃষ্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস নামক একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ললিত-বিস্তর নামক বুদ্ধ-চরিতখানি সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন অশোকাবদান সুগতজন্মাবদান, মহাবস্তু অবদান প্রভৃতি অনেকগুলি অবদান গ্রন্থ আছে।

এই সকল জাতক ও অবদান গ্রন্থগুলির মধ্যে, আমাদের পুরাণাদির ন্যায় অনেক অলৌকিক অনৈসর্গিক ও অতিরঞ্জিত আখ্যান আছে। সেকালের লোকেরা, বিশেষত অশিক্ষিত সমাজে, অলৌকিক ক্রিয়া (miracle) ভিন্ন, কোন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি করিত না। আজিকার দিনেও, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত নরনারী-সমাজে সে দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কার ঘুচিয়াছে কি?

চিত্রপরিচয়।

ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রীতির জন্য বিচিত্রাকারে অঙ্গুলি পরিচালনা করিয়া ছত্র, মৎস্য, সংহার প্রভৃতি 'মুদ্রা' প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুদ্রা শব্দের আসল অর্থ অঙ্গুলি-পরিচালনা। পরবর্ত্তী কালে মুদ্রা অর্থে কতকটা 'ভঙ্গি' বা ধাঁচা বুঝায়।

জৈন তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তিগুলি তিন প্রকার মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ধ্যান মুদ্রা; ২য়, উভয় বাহু বিলম্বিত করিয়া দণ্ডায়মান—কায়োৎসর্গ মুদ্রা; ৩য়, একটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের চারিদিকে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান, সর্ব্বতোভদ্রিকা মুদ্রা। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলি কিন্তু নানাবিধ মুদ্রায় গঠিত হইত। ১ম পদ্মাসনে উপবিষ্ট—ধ্যান মুদ্রা। ২য়, দক্ষিণ হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট—ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। ৩য়, একটী চক্রে উভয় হস্ত দিয়া উপবিষ্ট, ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন মুদ্রা। ৪র্থ, দক্ষিণ হস্ত বা করতল স্কন্ধ পর্য্যন্ত উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান্ বা উপবিষ্ট, অভয় বা উপদেশ মুদ্রা। ৫ম, বামকরের কিঞ্চিৎ উপরে দক্ষিণ হস্ত বক্ষের নিকট স্থাপিত—বিতর্ক মুদ্রা। ৬ষ্ঠ, দক্ষিণ পদ অগ্রে স্থাপিত দণ্ডায়মান, গতি মুদ্রা। ৭ম, দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বভাবে শয়ান—পরি-নির্ব্বাণ মুদ্রা। কলিকাতার যাদুঘরে মথুরা হইতে আনীত এই সকল মুদ্রায় কয়েকটী পাষাণে খোদিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

১ম চিত্র। এ মূর্ত্তিটী প্রায় দুই ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চ। পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। বামহস্ত জানুর উপর রক্ষিত। দক্ষিণ হস্তটী অভয় মুদ্রায় উত্তোলিত। করতল চক্রচিহ্নে ভূষিত। দক্ষিণ স্কন্ধ ও বক্ষের কিয়দংশ অনাচ্ছাদিত। বাম স্কন্ধ হইতে কাপড়ের ভাঁজগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মুখখানি যেন করুণা মাখান। কেশদাম শিরোপরি গ্রন্থিবদ্ধ। পশ্চাতে কিরণ ছটা; তদুপরি বোধিদ্রুমের শাখা দেখা যাইতেছে। উপরে আকাশ হইতে দুইটী দিব্য পুরুষ পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন। উভয় পার্শ্বে দুইজন ভক্ত বা শিষ্য ব্যজন করিতেছে। তিনটী সিংহের শিরোপরি যে আসন রহিয়াছে, তাহারই গাত্রে 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে যাহা লিখিত আছে তাহার অর্থ—

"বুদ্ধরক্ষিতার জননী আমহাসি তাঁহার জনক জননীর সহিত মিলিয়া সর্ব্বপ্রাণিগণের সুখ ও হিত-কামনায়, এই বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিকে তাঁহাদের নিজ-বিহারে স্থাপিত করিলেন।" এই সর্ব্বপ্রাণিহিত কামনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এটী মহাযান সম্প্রদায়ের স্থাপিত

মূর্ত্তি, এবং তৎকালের মথুরার লোকেরা যে আপনাদের জন্য পৃথক পৃথক বিহার বা দেবালয় স্থাপন করিত তাহা নিজ বিহার (private temple) শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে। একটী পুরাতন কূপের মধ্য হইতে, একজন চৌবে ব্রাহ্মণ এই মূর্ত্তিটি পাইয়াছিলেন। তিনি এটীকে সিন্দুর চন্দনে বিভূষিত করিয়া, মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিটীকে বিশ্বামিত্র ঋষি ও পার্শ্ববর্ত্তী মূর্ত্তি চারিটিকে রম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, পরিচয় দিয়া, যাত্রিগণের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এখন এটীকে ক্রয় করিয়া মথুরায় যাদুঘরে আনা হইয়াছে।

২য় চিত্র। এটী একটী উপদেশ মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি। মুখখানি যেন হাস্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল। বামহস্তে বসন প্রান্ত ধরিয়া, দক্ষিণহস্ত তুলিয়া যেন কতই উপদেশ দিতেছেন। নীচের অংশটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বসনের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ মূর্ত্তিটী মথুরায় প্রাপ্ত। এখন যাদুঘরে রহিয়াছে। এটির শিল্প নৈপুণ্য দেখিলে কুশান সম্রাটগণের সময়ে গঠিত বলিয়া অনুমান হয়।

৩য় চিত্র। এটী বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অঙ্কিত একখানি আযাগ-পট (Tablet of Homage) ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত কয়েকখানি চিত্র, পরে পরে অঙ্কিত রহিয়াছে। এখানি মথুরা রাজঘাটে পাইয়া মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

৪র্থ চিত্র। এটী একখানি বৌদ্ধস্তূপের সম্পূর্ণ আযাগপট। কেহ কেহ এটীকে জৈন স্তূপও বলেন। ইহাতে তিনটী পরিক্রমা পথ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সর্ব্বোপরি ছত্র রহিয়াছে। এখানি ভূমি খনন কালে মথুরার হোলি দরজার নিকট পাওয়া গিয়াছিল॥

৫ম চিত্র। ইহাও অভয় বা উপদেশ মুদ্রায় সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। পদতলে চক্র ও ত্রিরত্ন চিহ্ন আছে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট অন্নকূট গ্রামে একখানি পাওয়া গিয়াছে। কেবল মস্তকটি নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

আলোচনা

"রবীন্দ্রনাথ ও বস্তুপন্থা"

শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠের 'মানসী'তে উল্লিখিত প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি।

আমার সমগ্র প্রবন্ধের নাম ছিল "রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে বস্তুপন্থা।" তারই ভূমিকাটি মানসী সম্পাদক মহাশয় আলাদা প্রবন্ধ ভাবে ছাপিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রবন্ধের ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ শেষ হয় অগ্রহায়ণে, প্রতিবাদ বাহির হয় মাঘে—কাজেই 'মুনি'-দের পক্ষেও এই মতিভ্রম স্বাভাবিক ছিল যে সমগ্র প্রবন্ধটিই প্রতিবাদকারী পড়িয়া লইয়াছেন। তা নওয়া হইলে গোলমাল অন্ততঃ কতকটা চুকিয়া যাইত বলিয়া মনে হয়। এখন দেখিতেছি তা হয় নাই।

সেবার বিমলবাবু সমগ্র প্রবন্ধ পড়েন নাই, কারণ তখন তিনি ঝাঁসি প্রভৃতি জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব-পিপাসায় বাহির হইয়াছিলেন। এবার তিনি দেশেই আছেন। তবে তিনি এমন কথা লিখিলেন কি করিয়া—"আর মাইকেলের নাম করিয়া আমি প্রবন্ধে 'প্রহসনের সৃষ্টি' করিয়াছি।" মাইকেলের নাম করিয়া তিনি অন্যত্র কোথাও প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছেন কি না এবং অন্য কাহারও বিদ্রূপের কারণ হইয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। 'মাইকেল' ও প্রহসন এই দুইটি শব্দ যদি কোনও বাক্যে আমি একত্র ব্যবহার করিয়া থাকি তবে সে বাক্য এই—"মাইকেলের কাব্যের কথা না বলিয়া প্রবন্ধে প্রহসনের উল্লেখ কেন করা হইল তাও তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?" (মাঃ ও মঃ—চৈত্র ১৩২৮)

সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও শ্রেণী-বিভাগ কল্পনা না করিয়াও

আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে 'প্রাচীন' বলায় তাহার কোনও ভুল হইয়াছে বলিয়া তো আমি মনে করিতে পারি না।

সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যকে "বস্তুপন্থী রসের ভাণ্ডার" বলিয়া, সেই বাক্যের মধ্যেই এক লাইন পরেই "বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বত্র বস্তুপন্থী রসের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অভাব নাই" বলাটা বিমল বাবুর পক্ষে কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

বস্তুপন্থা বলিতে বিমল বাবু "অস্বাভাবিক কিছু" বুঝেন নাই সত্য, কিন্তু আমার প্রবন্ধে তাহা যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তিনি যে ঠিক বুঝেন নাই—অন্ততঃ সে সম্বন্ধে তাঁর যে কোনও পরিষ্কার ধারণা নাই—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

১। ভবভূতির শ্লোক উদ্ধার। (মাঃ ও মঃ ১৩২৮ মাঘ) (পুনরুক্তি করিতে হইতেছে—সুখ দুঃখের নিবিড় অনুভূতির প্রকাশ রীতিকে ব্যাপক ভাবে বস্তুপন্থা বলা চলে, কিন্তু সেই অর্থে বস্তুপন্থা কথাটি আমি ব্যবহার করি নাই। তা করিলে এই শ্লোক উদ্ধার সার্থক হইত। এখানে উত্তররামচরিত নয়, মৃচ্ছকটিক মুদ্রারাক্ষস দশকুমার প্রভৃতির কোনও সমাজচিত্র কিংবা নিম্ন মানব চরিত্রের উল্লেখ তাঁর কাযে আসিত।

(২) "বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন রস মাধুর্য্য" "আশ্চর্য্য কৌশলে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে" (মাঘ)। কাযেই বৈষ্ণব সাহিত্য বস্তুপন্থার ভাণ্ডার। চমৎকার যুক্তি, চমৎকার বস্তুপন্থার বোধ!

(৩) দীনবন্ধুর রচনায় সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল আছে ইহা দেখাইয়া তিনি ভবিষ্যতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে তাহাতে বস্তুপন্থার বিকাশ হইয়াছে। বিমল বাবুকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে যাহারও রচনায় সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল থাকিলে তাঁহাকে শ্রেয়ঃপন্থী (idealistic) বলা হয়, বস্তুপন্থী (realistic) নয়। বস্তুপন্থী সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে না তাহা নয়, কিন্তু সৌন্দর্য্য নহে, শক্তিই তাহার প্রধান লক্ষণ। মঙ্গলের সঙ্গে তো খাঁটী বস্তুপন্থী সাহিত্যের একরূপ অহি-নকুল সম্বন্ধ বলিলেই চলে।

কাহারও লেখায় বস্তুপন্থার বিকাশ দেখাইতে হইলে বরং সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল তাহাতে কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে অনেক জায়গায় (অবশ্য সর্ব্বত্র নহে) তাহাই বলিতে হয়। দীনবন্ধুর বস্তুপন্থার limitation দেখাইতে গিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে তিনি মানব-স্বভাবকে ডিঙাইয়া গিয়াছেন। (পৃ ১১৯) তার পরেই লিখিয়াছিলাম, "সেখানে না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে মঙ্গল।" আমি হয়ত শ্রেষ্ঠতর (শ্রেয়ঃপন্থী) সাহিত্যরসের কথা ভাবিয়া সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু বস্তুপন্থার আলোচনায় এই উল্লেখ আমার মোটেই সুষ্ঠু হয় নাই। আমার এই অসাবধান অথবা ভুল প্রয়োগকে বিমল বাবু দেখিতেছি নির্ব্বিচারে হজম করিয়াছেন; আর মজা এই, তাহারই উপর তাঁর মনঃকল্পিত বস্তুপন্থার আসন পাতিতে চাহিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

(৪) এই বস্তুপন্থার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য বিমল বাবুর চোখের সামনে ছিল না। এবং তিনি নিজেও তাহাই বলেন (মাঃ ও মঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯)—"রবীন্দ্র সাহিত্য" বলিতে তবে তিনি কি বুঝিয়াছেন? পরিস্কারই বুঝিয়াছেন—"তাঁহার কবিতা ও গান" যাহা রচনা করিতে বৈষ্ণব সাহিত্য তাঁহাকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে, (মাঃ ও মঃ মাঘ ১৩২৮)। সেই সংখ্যাতেই একটু পরে আছে—"যদিও × × × হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রেষ্ঠ"—ইহাতেও বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাই তাঁর মনের সামনে আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের "বস্তুপন্থী রস যে সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহা" তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তবেই হইল রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের বস্তুপন্থী রস সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন অর্থাৎ বিমল বাবুর মতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান বস্তুপন্থায় মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্য, মাইকেল দীনবন্ধুর নাটক প্রহসন টেকচাঁদ বঙ্কিম তারকনাথ প্রভৃতির কথাগ্রন্থ সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক; কিন্তু ইঙ্গিতে সব জায়গায় কায চলে না, চোখে আঙ্গুল দিতে হয়। আমি নাকি রবীন্দ্রনাথের অতিরিক্ত প্রশংসা করি, কিন্তু "হেরড"কে ডিঙাইয়া যান এমন লোকও দেখি দুই একজন আছেন। আমি এই মিথ্যা প্রশংসা দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানকে খাটো করিতে চাহি না। তাহাদের শ্রেষ্ঠতা অন্য জায়গায় আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধার করিয়াছি তাঁর বস্তুপন্থার উদাহরণ স্বরূপ নয়। পরন্তু তাঁর বস্তুপন্থার ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস দেখাইবার জন্যই, তাঁর মধ্যে বস্তুপন্থা বিকাশের পথকে সূচিত করিয়া দিতেছে সেই ভাবেই। আমার গন্তব্য স্থান যে রবিবাবুর গল্প তাহা যে কোনো বিবেচক ও মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। রবি বাবুর কবিতা ও গানই নাকি বাংলা সাহিত্যে বস্তুপন্থার শ্রেষ্ঠ নমুনা। বস্তুপন্থা সম্বন্ধে বিমল বাবুর পরিষ্কার ধারণার শ্রেষ্ঠতর নমুনা আর কি হইতে পারে?

কিন্তু ইহা হইতেও বিস্ময়কর (পুনরুক্তির ভয়ে হাস্যকর বলিলাম না) উক্তিও আছে।

(৫) বিমল বাবু লিখিয়াছেন—"তাহাতেও (সারদামঙ্গলেও) বস্তুপন্থী রসের অভাব নাই"—(মাঃ ও মঃ মাঘ ১৩২৮)। ঠিকই তো। যে সারদাকে কবি "মানস মরালী মম আনন্দরূপিণী" বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, যার "করে ইন্দ্রধনু বালা", "গলায় তারার মালা" "সীমন্তে" যার "নক্ষত্র জ্বলে," তার উপর যে কাব্য লেখা হইয়াছে তাতে বস্তুপন্থার অভাব হইলে চলিবে কেন? ধন্য বিমল বাবুর সারদামঙ্গল পাঠ। ধন্য তাঁর বস্তুপন্থার বোধ। এর উপরও যে কিছু থাকিতে পারে তাহা ধারণায় আসে না, কিন্তু আছে।

(৬) "তিনি (অর্থাৎ আমি) কয়েকজন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের উদ্ভট নামের তালিকাও দিয়াছিলেন। এবং সকলের সম্বন্ধে প্রায় একই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই।" (মাঃ ও মঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে কোনও সাহিত্যরস নাই এই কথা আমার পক্ষে বলা সম্ভব আমার প্রবন্ধ পড়িয়াও যিনি তাহা মনে করেন,তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। বিমল বাবু হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিতে পারেন—"ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই'র অর্থ ইহাদের মধ্যে বস্তুপন্থার কিছুই নাই।" মানিয়া লইলাম। তা সত্ত্বেও আমাকে বলিতে হইতেছে, একটি ছোট কথার মধ্যে এমন মানস ও সাহিত্যনৈতিক অপরাধের দৃষ্টান্ত বিচার বিতর্কের সাহিত্যেও কদাচিৎ মিলে। আমিই না বলিয়াছিলাম পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণা পাইয়াই বাংলা সাহিত্যে বস্তুপন্থার বিকাশ হইয়াছে। এ বিষয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের তথা রবীন্দ্রনাথের ঋণ ও শিষ্যত্বের কথায় তিনিই না আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কাজেই তিনি অনুমান করিয়াছেন ভারতবর্ষ রাতারাতি ইউরোপের সস্তা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হইয়াছে।" বস্তুপন্থা সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র বোধ থাকিলে, আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকিলে আমার দ্বারা এমন কথা বলা সম্ভব একথা তিনি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেন না। এ কথার প্রতিবাদ আমার প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।

ভাবিয়া দেখিলাম বিমল বাবুর সহিত আমার মতের অমিল সামান্যই। বিমল বাবু স্বীকার করেন বস্তুপন্থাটা বিশেষ করিয়া আধুনিক গণতন্ত্রী সাহিত্যেরই জিনিষ; তিনি স্বীকার করেন রবীন্দ্র সাহিত্যে (যদিও ঠিক তাঁর কবিতা ও গানে নয়) তাহা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অমিলটা তবে কোন জায়গায়? সংস্কৃত সাহিত্যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে (ইহার মধ্যে ইদানীং আবার তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যেও জুড়িয়া দিয়াছেন) বস্তুপন্থাটা কি পরিমাণে আছে সেই নিয়া তিনি বলেন,'প্রাচীন সাহিত্যে যা আছে তা নিতান্ত তুচ্ছ নয়।' নিতান্ত তুচ্ছ তা আমি কোথাও বলি নাই। তিনি বলেন আমি নাকি বলিয়াছি নাই নাই, ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। যিনি আমার প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন এবং যদি আমার কথা বিকৃত করিয়া দশ জনের সামনে উপস্থিত করিতে চাহেন না, তিনিই স্বীকার করিবেন যে বাংলা সাহিত্যের বৌদ্ধযুগ ও লৌকিক ধর্ম্মশাখার যুগের (বস্তুপন্থা সম্বন্ধে) প্রাপ্য গৌরব আমি দিয়াছি। মুকুন্দরামকে তো প্রাণ খুলিয়া প্রশংসাই করিয়াছি। বস্তুপন্থায় মাইকেল দীনবন্ধুর অনুষ্ঠিত কার্য্য স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু তাঁদের limitation কোথায় তাহা দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হই নাই। বঙ্কিম সম্বন্ধে বলিয়াছি—"বঙ্কিম সেই অবসরকে (বস্তু চিত্র অঙ্কনের) প্রথম তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা, তাঁহার আশ্চর্য্য সাহিত্য নৈপুণ্যের সহিত কাযে খাটাইয়াছেন।" স্বর্ণলতার প্রশংসাও যথেষ্ট করিয়াছি। অথচ বিমল বাবু বলেন আমি নাকি বলিয়াছি নাই নাই, ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য যেন একটু অস্বাভাবিকরূপে বেশী বলিয়াই বোধ হইতেছে। তাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, "ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতায় খাঁটী বস্তুরস থাকিলেও, প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়া কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।" ঈশ্বর গুপ্তে বস্তুরস নাই এ কথা কোথায় বলা হইয়াছে? শ্রেষ্ঠতর বস্তুরস নাই এটুকু বলা হইতে পারে। বিমলবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন, ঈশ্বর গুপ্তে শ্রেষ্ঠতর বস্তুরস আছে মুকুন্দরামের সহিত তুলনা করিয়া তাহা তিনি ভবিষ্যতে দেখাইয়া দিবেন। তার আগে, শ্রেষ্ঠতর বস্তুরসটা কি, একবার ভাবিয়া লইবেন আশা করি। ছাড়া ছাড়া ভাবে বস্তুপন্থার নিদর্শন থাকিলেও,মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের ও বৈষ্ণব সাহিত্যের লক্ষণ নয় এই কথা বলিলে কাহারও সাহিত্যবোধে যে আঘাত লাগিতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না।

মোট কথা প্রশংসা সত্ত্বেও আমি সকলেরই limitation দেখাইয়াছি। এমন কি বঙ্কিমেও এই বস্তুপন্থা বিকাশের বাধাটা কোন জায়গায় ছিল তাহা বলিয়াছি। বঙ্কিমের বাধা রবীন্দ্রে না থাকিলেও, তাঁরও যে limitation আছে তাহার আভাস আমার এই প্রবন্ধেই মিলিবে। ভবিষ্যতে যথাস্থানে ইহার আলোচনা করিতে চাহি কি না বলিতে চাই না—বিমল বাবু তাহাকে দোষ ক্ষালনের চেষ্টা বলিয়া মনে করিতে পারেন, তবে অতীতে যে

তাহা করিয়াছি,এই মানসীর পৃষ্ঠাতেই করিয়াছি, মানসী-সম্পাদক তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

আসল কথা বিমল বাবু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এই মনে করিয়া যে, আমি পূর্ব্বসূরিগণের অগৌরব প্রচার করিয়াছি। প্রাচীন সাহিত্য-সূরিগণের প্রতি বিমল বাবুর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাঁর এই ক্ষুণ্ণ হওয়ার একটা মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর আমি যদি বাস্তবিকই তাঁদের অগৌরব করিয়া থাকি, কিংবা রবীন্দ্র সাহিত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাঁদের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত দেখাইয়া থাকি, তবে আমার উচিত তাহা স্বীকার করা। কিন্তু বিমল বাবু আমার সেই ক্রটী দেখাইতে পারেন নাই। দেখাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া বিদেশ বাস,পুস্তকাভাব, সুযোগের অভাব ইত্যাদির দোহাই দিয়াছেন, ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং যে সব যুক্তি নিক্ষেপ করিয়াছেন, আলোর মতন তাহা সত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় নাই; ধূলিজালের মত তাহাকে আচ্ছন্নই করিয়াছে। বিমল বাবু তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে সব অর্থহীন অসতর্ক কথার চোরাগর্ত্তে পা ফেলিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর কোনও সজ্ঞান উপলব্ধি হইল কি না এবং হইয়া থাকিলেও তাহা তিনি স্বীকার করিবেন কি না জানি না। কোনও লেখকের মধ্যে বস্তুপন্থা নাই বা কম আছে বলিলেই যে তাকে ছোট করা হয়, বিমল বাবুর এই ধারণাই তাঁর সব চেয়ে বড় ভুল এবং ইহাই এই বিতর্কের গোড়াকার কথা। রবীন্দ্রের কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থা বিস্তৃততর হইলেও বঙ্কিমের কথাসাহিত্যে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। রবীন্দ্রের বস্তুপন্থা তাঁর দুই একজন কথাসাহিত্যিক উত্তরাধিকারীর হাতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে এই কথা লিখিয়া একদিন আমি রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও আসন্ন ভক্তের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলাম। কিন্তু এই সব কথাসাহিত্যিক উত্তরাধিকারীদিগের শ্রেষ্ঠতর কিংবা সমকক্ষ লেখক বলিয়া তো আমি মনে করি না। রবি বাবুর কাব্য সাহিত্যের ক্ষীণ বস্তুধারাকে মৃতকবি সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যের বস্তু বিষয় এবং ভাষা ছন্দের দিক দিয়া বিস্তৃততর করিয়া গিয়াছেন ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু ইহার জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ হইতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতর ইহা বলিবার নির্ব্বুদ্ধিতা কাহারও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিমল বাবুর এই ক্ষুদ্র দুইটি আলোচনার মধ্যে বার কয়েক পুস্তকাভাব, সুযোগাভাবের উল্লেখ ও ভবিষ্যতের উপর বরাত আছে। সেই সুযোগ যতদিন না আসে, ততদিন প্রতিবাদ করিবার বালসুলভ অধৈর্য্যকে থামা চাপা দিয়া রাখিলে, খেলাইবার সাপ আসিয়া খেলোয়াড়কেই কামড়াইয়া বসিত না।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

পুরন্দর দুর্গ

পুণা ফীল্ড কন্‌ট্রোলারের আফিসে আমার অস্থায়ী কেরাণী, তাই পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যেও ছুটীর প্রর্থনা গ্রাহ্য হইত না। শিবাজীর কীর্ত্তিস্থান পুণায় আসিয়া সিংহগড়, পুরন্দর দুর্গ ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থানগুলি না দেখিলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে এই ভাবিয়া আমরা কয়েক বন্ধু সংকল্প করিলাম, ১১ই জানুয়ারী রবিবার পুরন্দর দুর্গ দেখিতে যাইব। পুরন্দর দুর্গ পুণা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরে। প্রশস্ত পাকা সরল রাস্তা, যাইবার অনুকূল।

শনিবার রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আমরা সাত জন শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া মেস্ হইতে বাহির হইলাম। অন্ধকার রাত্রি; আমাদের সঙ্গে আলো নাই বলিলেই চলে; সাইক্ল ল্যাম্প পুলিশের মানরক্ষা ভিন্ন কোনরূপ প্রকৃত সাহায্য করে না। কাণ্টনমেণ্টে বিদ্যুত বাতির দরুণ আলোর অভাব তেমন বোধ হইল না; কিন্তু দুই মাইল পরে যখন সহরের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম তখন নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ ক্ষতি ছিল না যদি রাস্তাটী গোরুরগাড়ীশূন্য থাকিত। এক কাতারে প্রায় ৬০।৭০টা গোশকট আমাদের বিপরীত দিকে চলিতেছে; সবগুলিই প্রায় আমাদের মত আলোক-বিবর্জ্জিত। যাহা হউক, অতি সন্তর্পণে কতক্ষণ চলিয়া, গোরুর গাড়ীর তলে পড়িয়া "পাঁচ টাকা জরিমানা"

দিবার আশঙ্কা দূর হইল। খোলা মঠের ভিতর রাস্তা, বেশ একটু শীত অনুভব হইতে লাগিল। শরীর গরম করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ব্যায়াম। এক্ষেত্রে জোরে সাইক্ল চালাইলে একগুলিতে দুই পাখী মারা হইবে ভাবিয়া আমরা জোরে চলিতে লাগিলাম। এরূপে প্রায় একঘণ্টা চলিবার পর সকলের মনে যুগপৎ সন্দেহ হইল আমরা পুরন্দরের রাস্তায় আসিয়াছি কিনা। তখন চারিদিক প্রায় পরিষ্কার। অদূরে বৃষবাহণে এক মহারাষ্ট্রীয়কে দেখিয়া সকলে সাইক্ল হইতে অবতরণ করিলাম এবং পাহাড়ের কোলে মেঘের শোভা দেখিবার ছলে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ৫।৬ মিনিটের ভিতরেই সে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কারণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মহারাষ্ট্র দেশের খর্ব্বাকার গোরুগুলি পৃষ্ঠে আরোহী লইয়া অনেক সময় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর অশ্বকেও ক্ষিপ্রতায় পরাজিত করিয়া দেয়।

সেই লোকটিকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে যাহা বলিল, তাহাতে হতাশ না হইলেও সকলেরই উদ্যম একটু নিবিয়া আসিল। আমরা পুরন্দরের রাস্তা প্রায় ৫ মাইল পিছে ফেলিয়া আসিয়াছি। "গতস্য শোচনা নাস্তি"; পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে নিতান্ত কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে। কতক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর স্থির হইল, যাহাই হউক পুরন্দর যাওয়া চাইই। এতদূর ভ্রমণ করিতে আসিয়া যদি একটা অ্যাডভেঞ্চরই না হইল তাহা হইলে আর বীরত্ব কি? উৎসাহ দিগুণ বেগে ফিরিয়া আসিল। আমরা সাইক্লে আবার ছুটিলাম।

এবার ঠিক রাস্তায় চলিয়াছি; আমরা রাস্তায় যাকেই দেখি তাহাকেই পুরন্দরের কথা জিজ্ঞাসা করি এবং উপর্য্যুপরি "হাঁ" উত্তর পাইয়া নিঃসংশয় হৃদয়ে চলিলাম। দুইপাশে দেখিবার মত কিছুই নাই। বাস্তবিক রাজপুতনা ভিন্ন এরূপ প্রাকৃতিক শোভাশূন্য দ্বিতীয় প্রদেশ ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। সম্মুখে বিপুলকায় দিবাঘাট; ইহাকে পার হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে। রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্বে দিবাঘাট পার হইতে পারিব বলিয়া মন একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু পাহাড় বড় বিশ্বাসঘাতক, ইহা স্বপ্নের মত "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি"। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পাহাড়ও যেন আমাদের ভিতর দূরত্বের সমতা রক্ষা করিয়া ছুটিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার পর আমরা দিবাঘাটের পাদদেশে পৌঁছিলাম। একটু বিশ্রাম করা শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সাইক্ল রাখিয়া বসিলাম। আবার নূতন বিপদ। আমর ছিলাম সাত জন, পৌঁছিয়াছি ছয় জন; প্র—বাবু নিরুদ্দেশ। তাঁর মত জমকাল জোয়ান লোক যে ছত্রভঙ্গ দিবে তাতো ভাবিতেই পারা যায় না। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, তখন তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমরা হাঁটিয়া রওনা হইলাম। এই প্রদেশের অন্যান্য পাহাড়ের মত দিবাঘাটও বৃক্ষলতাদি শূন্য কালো পাথরের সমষ্টি মাত্র। পাহাড়ের গা চিরিয়া রাস্তা বাহির করা হইয়াছে। একদিকে অভ্রভেদী পাহাড়, অন্যদিকে গভীর গহ্বর। পাহাড়ে দেখিবার কিছুই নাই, এমন কি বিশ্রাম করিবার মত একটু পরিষ্কার জায়গা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিম্নে সমতলভূমির দৃশ্য অতি মনোহর। শস্যশোভিত ক্ষেত্রগুলিকে গালিচার মত দেখায় এবং দূরের কুয়াসা-পরিবেষ্টিত ছোট ছোট পাহাড়, সাগর বক্ষে উর্ম্মিমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

দিবাঘাট পার হইয়া আবার সমতল ভূমিতে পড়িলাম। এস্থান হইতে পুরন্দর পর্য্যন্ত রাস্তা অতি পরিষ্কার এবং ছায়াচ্ছন্ন। মৃদু মধুর বাতাসে ক্লান্তি দূর হইল। প্রায় চারি মাইল পরে আমরা এক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামবাসিগণ আমাদের দেখিয়া একটু গোলমালে পড়িয়া গেল, কারণ বেশভূষা দেখিয়া বলিবার যো নাই আমরা কোন দেশী জানোয়ার। হাফ্‌প্যাণ্ট, কোট, নেকটাই শোভিত কৃষ্ণবর্ণ সাহেব, অথচ মস্তক অনাবৃত। অতি কষ্টে বুঝাইয়া দিলাম আমরা আধুনিক বাঙ্গালী। স্বদেশী যুগকে এবং

আনুসঙ্গিক তোমাকে ধন্যবাদ, আজকাল বাঙ্গালী বলিলে সব জায়গায়—অন্ততঃ মহারাষ্ট্রদেশে—একটু সম্মান সম্ভ্রম পাওয়া যায়।

এই গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট। গ্রামের মধ্য দিয়া একটী ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য নদী (নালা বলিলেই সঙ্গত হয়) প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই জলে স্নান পান গো-মহিষাদির গাত্রমার্জ্জন ইত্যাদি সকল কার্য্যই নির্ব্বাহিত হয়। আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, জলকষ্টের ধারণা করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। তাই ইতিহাসে শিবাজীর প্রজারঞ্জনের উদাহরণ স্বরূপ যখন পড়িতাম তিনি গ্রামে গ্রামে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। এখন প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া সেই মহাত্মার উদ্দেশে শির নত করিয়া ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইলাম।

গ্রাম হইতে পুরন্দরের প্রাচীর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন উৎসাহে অনির্ব্বচনীয় স্বদেশানুরাগে মাতিয়া চলিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে পুরন্দর পাহাড়ের তলদেশে পৌছিলাম। তখন বেলা ১০টা। অ—বাবু পাকা গৃহিণীর মত নানা প্রকার মুখরোচক খাদ্য সাইক্ল ব্যাগে ভরিয়া আনিয়াছিলেন—বৃক্ষতলে বসিয়া সেগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। সাইক্ল রাখিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম, এবং প্রায় আধ ঘণ্টায় ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পুরন্দর কাণ্টনমেণ্টে উপস্থিত হইলাম। ইহা স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া পরিগণিত এবং 6th (Poona) Division এর আরোগ্য-শিবির। সৈন্য ব্যতীত অন্য অধিবাসী খুব কম—নাই বলিলেই চলে। একটা রেষ্টোরাঁ আছে, তাহাতে সোডা ও মদ্য ব্যতীত আর কিছু মিলে না।

নি—বাবু তাঁহার আফিসের এক বন্ধুর নিকট হইতে এখানে Regimental Clerk এর নিকট একখানি পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন। রেষ্টোরায় তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি আমাদিগকে তাঁহারই বাসায় লইয়া গেলেন। বিলাতী কায়দা অনুসারে সকলকেই মদ্যপান করিতে আহ্বান করিলেন। দুই জন ছাড়া আমরা আর সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিলাম। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া উঠিলাম এবং সাহেবের ভৃত্যকে গাইড স্বরূপ সঙ্গে লইয়া দুর্গাভিমুখে চলিলাম।

দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটী দ্বার, একটীর পর আর একটী। চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পুরন্দরের উপর হইতে সিংহগড়, লোহগড়, রায়গড় প্রভৃতি দুর্গ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং দূরে মাননীয় আগা খাঁ মহাশয়ের শ্বেতপ্রাসাদ রৌদ্রালোকে মার্ব্বেলের মত প্রতীয়মান হয়। চারিদিকের দৃশ্য অতি কঠোর। পাহাড়ের পর পাহাড়, মধ্যে মধ্যে মসীরেখার মত বৃক্ষরাজি আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোমলতার লেশমাত্র নাই, বড় কঠোর সৌন্দর্য্য। পার্ব্বত্য দেশকে কেন স্বাধীনতার লীলাভূমি বলা হয় তাহা এরূপ স্থানে আসিলে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রকৃতির উগ্র গম্ভীর মূর্ত্তি হৃদয়ে একাগ্রতা, স্বাধীনতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি পুরুষোচিত গুণনিচয় ফুটাইয়া তোলে; বঙ্গদেশের চিরশ্যামল বসুন্ধরা রত্নালঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় বাঙ্গালীকে "প্রেমের স্বপ্ন" দেখিতে শিখায়। যদি দেশপ্রীতি, যদি স্বাধীন ভাব মনে জাগাইয়া তুলিতে হয়, তবে "স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" এরূপ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন যতদূর কার্য্যকর হইবে এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে শত বক্তৃতা শুনিলে যাহা না হয়, কেবল মাত্র এই স্থানগুলি দেখিলে এবং দেখিতে দেখিতে চিরস্মরণীয় বীরপুরুষদের কার্য্যকলাপ শ্রবণ অথবা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, বুক বল ও আশায় ভরিয়া উঠিবে এবং কেবলই মনে পড়িবে "আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা নহি ত মেষ।"

সু-বাবু সুগায়ক। মহাদেওর মন্দিরের ভিতর বসিয়া তিনি "মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর" গানটী গাহিতে লাগিলেন। আমরা নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিলাম। মহাশ্মশানের ন্যায় এস্থানে আসিলেও হৃদয় ভয়শূন্য এবং নীচ

প্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়। আমরা প্রায় ২৷৷০টার সময় দুর্গ হইতে অবতরণ করি সাহেবের বাসায় আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে রুটি মাখন উদরস্থ করিয়া সুস্থির হইলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া রওনা হইতে হইল, কারণ অতিমাত্রায় সাইক্ল চালানোর দরুণ গ—বাবুর পা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সাহেবকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা পুরন্দর পরিত্যাগ করিলাম।

পুরন্দর হইতে পুণা সব রাস্তাটাই "উৎরাই"। বিনা আয়াসে সাইক্ল ঝড়ের মত ছুটিল এবং আসিবার সময় যেখানে এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল, ফিরিবার সময় ১৫ মিনিটের বেশী লাগিল না। দিবা ঘাটের নিকট আসিয়া সকলেই নামিলাম। তর্ক বাধিল ইহা হাঁটিয়া পার হইব না সাইক্লেই এই চলিব। হাঁটিয়া পার হইলে অনেক রাত্রি হইবে, কিন্তু সাইক্লে পার হওয়ায় দুঃসাহসিকতার কার্য্য। অনেক আলোচনার পর ঠিক হইল সাইক্লেই পার হইব। শ্রীদুর্গা বলিয়া সাইক্লে উঠিলাম এবং দৃঢ়মুষ্টিতে ব্রেক চাপিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই দিনের কথা মনে পড়িলে আজও বুক কাঁপিয়া উঠে। সাইক্ল তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। ভ্রমক্রমেও নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। হঠাৎ সাইক্ল ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা ব্রেক নষ্ট হইয়া গেলে যে কি অবস্থা হইত তাহা ভাবিবার নয়; বোধ হয় একখানি অস্থিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। যাহা হউক, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমতলভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাচিলাম এবং কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দিবাঘাটের দিকে চাহিয়া আমাদের দুঃসাহসিকতার পরিমাণ ভাবিতে লাগিলাম।

শ্রীসরোজানন্দ মিত্র।

নূতন চীন পরিব্রাজক

(ফরাসী হইতে)

আজ যে চীন পরিব্রাজকের কথা বলিব, তিনি "নূতন" এই হিসাবে যে আমাদের অনেকের কাছে তিনি নূতন। তাঁর নাম—Ki Ye (কি ঈ)। তিনি সেই সুদূর চীনদেশ হইতে পাহাড় পর্ব্বত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কেন? কিসের জন্য? কেবল ধর্ম্মের প্রেরণায়। কেবল তিনি কেন, তাঁহার পূর্ব্বেও বহু চীনা এদেশে অনেক যন্ত্রণা অত্যাচার সহ্য করিয়া, বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দেখিতে, সেখানে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন।

৯৬৪ সালে কি ঈ এদেশে আসিবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে এক বিরাট দল ছিল। সে দলে তিন শত লোক ছিল। প্রায় ১২ বৎসর পরে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান (৯৭৬ সাল)। এ কয় বৎসরে তিনি সারা আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হুয়েনসাং বা ফাহিয়ানের মত তেমন বিস্তৃত না হইলেও, ইহাতে আমরা সেই সময়কার দেশের অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থার কথা জানিতে পারি। সেই সময় কোথায় কোথায় বৌদ্ধ তীর্থ ছিল তাহাও আমরা এই বিবরণ হইতে জানিতে পারি।

কিঈ যখন ভারত হইতে ফিরিয়া যান, তখন সঙ্গে একখানি পুঁথি লইয়া যান, সেখানির নাম—"নির্ব্বাণ সূত্র।" ইহা মোট ৪২ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই বইটীর প্রতি অধ্যায়ের শেষে কি-ঈ তাঁর ভ্রমণের এক এক পর্ব্ব লিখিয়া রখিয়াছিলেন।

চীনদেশ হইতে যাত্রা করিয়া আমাদের পরিব্রাজক খাসগড়, খোটান ও পূর্ব্বতুর্কীস্থানের নানা প্রদেশ পার হইয়া ভারতের পশ্চিমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাহাড়গুলি অতিক্রম করিয়া তিনি কাশ্মীরে আসেন।

সেখানে তিনি একটি পাহাড় দেখেন, সে পাহাড়ে নাকি রাজা সর্ব্বদ একটি ব্যাঘ্রের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি গান্ধারে উপস্থিত হন। তখন গান্ধার ও কাশ্মীর পৃথক্ রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে তিনি জলন্ধর রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আরও একটু দক্ষিণপূর্ব্বে কাণ্যকুব্জ দেখিতে পান। এখানে তিনি গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কাণ্যকুব্জের দক্ষিণে যমুনা ও উত্তরে গঙ্গা নদী। আরও কিছু পূর্ব্বে আসিয়া তিনি বারাণসী পাইলেন। কাণ্যকুব্জের স্তূপ ও মন্দিরের কথা তিনি বলিয়াছেন। বারাণসী ও কাণ্যকুব্জের মধ্যের দূরত্ব নাকি মাত্র ৫ লি, কিন্তু বোধ হয় এটী ভুল, ৫০ লি হইবে। বারাণসীর দক্ষিণে গঙ্গা নদী প্রবাহিতা। এখান হইতে ১০ লি গিয়া, তিনি মৃগদাবে পৌঁছিলেন। এখানে নাকি অনেক মন্দির, স্তূপ ছিল। তিনি একবার গণনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু গণনা ঠিক রাখিতে পারেন নাই।

আরও কিন্তু পূর্ব্ব দিকে আসিয়া তিনি মগধ দেশে পৌঁছিলেন। সেখানে অনেক ভিক্ষু ও ছাত্রের গমনাগমন ছিল। এখানে তিনি দুইটী পাহাড় দেখিতে পান, একটী—যষ্টিগিরি, আর একটী কুক্কুটগিরি।

সেখানে নাকি কাশ্যপ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তার পর তিনি বোধিস্থানে আসেন, সেখানে বজ্রাসন ছিল। এখান হইতে ১০০ লি আসিয়া তিনি বুদ্ধের তপস্যার ক্ষেত্রে পৌঁছিলেন। বজ্রাসনের নিকট একটী মঠ ছিল, তাহা সিংহলের লোকেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেখান হইতে ৫ লি উত্তরে, গয়া সহর ও ১০ লি উত্তরে গয়ার পাহাড়। এখানেই নাকি বুদ্ধদেব "রত্নমেঘ-সূত্র" বর্ণনা করিয়াছিলেন। বজ্রাসন হইতে ১০ লি উত্তর পূর্ব্বে, তিনি প্রাগ্‌বোধি পর্ব্বত দেখিতে পান।

তাহার পর তিনি রাজগৃহ নগরে পৌঁছেন। ইহার উত্তরে যে পাহাড় আছে, তাহাতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। সেইখানে নাকি বুদ্ধদেব "সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক সূত্র" ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

সে সময় নালন্দার মঠ বিখ্যাত ছিল। তিনিও মঠের গৌরবের কথা শুনিয়া মঠটী দেখিতে যান। নালান্দার মঠকে চীনারা "না-লন্-তো" বলিত। এই নামেই নালন্দা চীনা সাহিত্যে পরিচিত। নালন্দার অবস্থান সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এটী নূতন রাজগৃহের ১১লি উত্তরে। এই মঠের দক্ষিণে ও উত্তরে প্রায় ১০।১১টী মঠ ছিল, ইহাদের সকলেরই দ্বার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত।

ইহার ৫লি দক্ষিণ পশ্চিমে তিনি একটী অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে পান। এখান হইতে ১০লি দূরে তিনি দুটী মঠ দেখেন, একটী কশ্মীরের লোকেরা ও অপরটী চীনের লোকেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

তার পর তিনি কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে গমন করেন। এখান হইতে নদী পার হইয়া তিনি বৈশালীতে যান, সেখানে বিমলকীর্ত্তির মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান। তথা হইতে তিনি কুশীনগর গমন করেন।

এইরূপে সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিবার মানস করেন। সেই অভিপ্রায়ে তিনি নেপালে গিয়া, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পুরাতন রাস্তা ধরিয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। তখন ৯৭৬ খৃঃ অঃ। ভারত হইতে ফিরিতে তাঁহার ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহাতে তাঁহাকে কত কষ্ট কত যন্ত্রনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আমাদের যাত্রীরা বদরিকাশ্রমে বা সেতুবন্ধে মুসলমান আমলে যাইতেই কাতর হইত; মরুভূমি ও পাহাড় অতিক্রম করা বোধ হয় তাহাদের দ্বারা ঘটিয়া উঠিত না।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অভিভাবক।

তিন মাস সময়ের মধ্যে অশ্রুকুমারের পৈতৃক জমীদারী প্রায় সমুদয় উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। অশ্রুকুমারেরা আবার রঙ্গণঘাটের জমীদার হইল। তাহাদের বাটীর 'জমীদার বাড়ী' নাম সার্থক হইল। অশ্রুকুমারের মাতা শ্যামার মাকে লইয়া, রঙ্গণঘাটে আসিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বে এই আখ্যায়িকার কোন স্থলে বলিয়াছি যে রঙ্গণঘাটে একটি টোল ছিল; কিন্তু টোলের জন্য উপযুক্ত গৃহ ছিল না। অশ্রুকুমার মাতাকে রঙ্গণঘাটে রাখিবার জন্য আসিয়া, প্রথমেই সেই অভাব দূর করিল। সে তাহার মাতার নিকটে আসিয়া কহিল, "মা, আমাদের বারবাড়ীর ঘরগুলো কেবল অকারণ খালি পড়ে থাকে। কেতাব রাখার ঘর, আর আর একটা ঘর আমাদের ব্যবহারের জন্য রেখে, বাকি ঘরগুলো টোলের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলে হয় না? তারা আমাদের বাড়ীতে বাস করলে, তোমার খুব সুবিধা হবে। ব্রত নিয়মের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের দরকার হলে, সহজে বাড়ীতেই ব্রাহ্মণ পাবে।"

অশ্রুকুমারের প্রস্তাবে মাতা আনন্দিতা হইয়া কহিলেন, "বেশ ত। আর টোলটাও আমাদের পূজোর দালানে উঠে এলে ভাল হয়। আর এক কায করতে হবে, অশ্রু। সদর দরজার বাইরে যেখানে সেই কাঁটাল গাছটা ছিল, সেই খানে একটা পাকা রান্নাঘর করে দিতে হবে। আমি বাড়ী থেকে রোজ সিধা দেবো, ছাত্রেরা সেইখানে রেঁধে খাবে। আর টোলের ভট্‌চায্‌ মশায়কে বলে যাবে যে তিনি যেন আমাদের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু বৃত্তি গ্রহণ করেন।"

মাতার আজ্ঞা পাইয়া, অল্পকাল মধ্যে সমস্ত উদ্যোগ সমাধা করিয়া, অশ্রুকুমার বাটীতে টোল স্থাপন করিল। তাহার পর, গ্রামের নানাবিধ উন্নতির দিকে সে মনোনিবেশ করিল। গ্রামে প্রবেশ করিবার কর্দ্দমময় পথটি, ইষ্টকাচ্ছাদিত করিয়া পাকা করিয়া দিল। দীর্ঘিকাটি আরও বৃহৎ করিয়া কাটাইয়া, ঐ মৃত্তিকার দ্বারা গ্রাম-মধ্যস্থিত কয়েকটি অপরিস্কৃত পল্বল পূর্ণ করিয়া দিল। আবর্জ্জনাপূর্ণ হট্টচত্বরটি উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া, লৌহপত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ বেদী সকল প্রস্তুত করিয়া দিল। গ্রাম হইতে বৃষ্টির জল যাহাতে সহজে পার্শ্বস্থ নিম্ন ভূমিতে বহিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত জনপ্রণালী সকল প্রস্তুত করিয়া দিল। রাত্রে গ্রামের মধ্যে দীপ জ্বালিবার জন্য স্থানে স্থানে দীপস্তম্ভ সকল স্থাপিত করিল। একটা পতিত কণ্টকবনাবৃত বৃহৎ ভূমিখণ্ড সমতল ও বৃক্ষশূন্য করিয়া, গোচারণের মাঠ করিয়া দিল। হাটের চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিত, তাহার জন্য পৃথক বাটী প্রস্তুত করাইল। এইরূপে রঙ্গণঘাটের নানা উন্নতি সাধন করিয়া অশ্রুকুমার কলিকাতায় ফিরিল।

সেখানে আগ্রহপূর্ণ নেত্রে সৌদামিনী অশ্রুকুমারের পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। অশ্রুকুমারকে পুনরাগত দেখিয়া, সে কহিল, "এখন কিছু দিন তুমি অন্য কোনও খানে যেতে পাবে না।"

অশ্রুকুমার কহিল, "আচ্ছা, তোমার অনুরোধে আমি কিছুদিন কলকাতায় থাকবো, তার পর কিন্তু আমাকে একবার কোটালিগ্রামে যেতে হবে; সেখানে অনেক কায আছে।"

সৌদামিনী কহিল, "আমার কাকার সন্ধান করবে; আর কি কায আছে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তোমার কাকার সন্ধান নেওয়াই প্রধান কায বটে; কিন্তু তা ছাড়া, আরও কায আছে।

তুমি ত জান যে তোমার ঠাকুরদাদা মশায়ের সমস্ত জমীদারী কেনা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই জমীদারী একবার দেখে নিতে হবে। দেখতে হবে, কোন গ্রামে কি করলে প্রজার উন্নতি হয়; কি করলে, প্রজারা নিরাপদে সুখে স্বচ্ছন্দে গ্রামে বাস করতে পারে।"

উপরিউক্ত বাক্যানুযায়ী অশ্রুকুমার কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া, খুল্লশ্বশুর কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসন্ধানে কোটালিগ্রামে গমন করিল। সেখানে সৌদামিনীর নামে, তাহার পিতামহের সমুদয় জমীদারী ক্রয় করা হইয়াছিল; অশ্রুকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জমীদারী পর্য্যবেক্ষণ করিল, প্রজাগণের অভাব অভিযোগের কথা শুনিল। তাহার পর, আবার কোটালিগ্রামে ফিরিয়া আসিল। সেখানে সৌদামিনীর পিতামহের বৃহৎ অট্টালিকার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না; কৃষ্ণচন্দ্র দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সেই অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া, তাহার ইষ্টক ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়াছিলেন; সে স্থান শ্বাপদবাসোপযোগী কণ্টকবনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে অশ্রুকুমার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, সেখানে সুন্দর নূতন [illegible] প্রস্তুত করাইতেছিল; সৌদামিনী বলিয়াছিল যে [illegible]হইলে, সে সেখানে এক আতুরালয় স্থাপন করিবে।

কিন্তু কোটালিগ্রামে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইল না। অশ্রুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের কোন সন্ধানই পাইল না। কেবল জনশ্রুতি শুনিল যে কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতার কোন নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া, সামান্য চাকুরির দ্বারা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা গ্রামের লোক কেহ বলিতে পারিল না।

কোটালিগ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, অশ্রুকুমার এক দিন সকালে পার্ক ষ্ট্রীটে ডাক্তার দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর সে যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে পারিত, তখন মাঝে মাঝে ডাক্তার দত্তের সহিত দেখা করিতে যাইত; কিন্তু ইদানিং প্রায় আলেক্জান্দ্রার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিত না; সে ডাক্তার দত্তের বাটীতে যাইয়া প্রায় শুনিত যে আলেক্জান্দ্রা প্রাতর্ভ্রমণে বা সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অশ্রুকুমার এ যাবৎ তাহার সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা আলেক্জান্দ্রাকে বা ডাক্তার দত্তকে জানায় নাই। কিন্তু ডাক্তার দত্ত তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিরূপে জানিয়াছিলেন তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আজ ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই, অশ্রুকুমার সম্মুখে আলেক্জান্দ্রাকে দেখিতে পাইল। দেখিল, আলেক্জান্দ্রার চিরপ্রফুল্ল মুখে চিন্তার একটা কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে; সে বিষণ্ণ মুখে অশ্রুকুমারকে অভিনন্দন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই বিষণ্ণতার কারণানুসন্ধানে উৎসুক হইয়া অশ্রুকুমার আলেক্জান্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে? তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "আজ তুমি এসেছ, বড় ভাল হয়েছে। আজ ডাক্তার দত্তের অসুখ বড় বেড়েছে।"

অশ্রুকুমার কহিল, "কৈ ডাক্তার দত্তের অসুখের কথা ত আমি আগে শুনিনি, তাঁর কি অসুখ হয়েছে?"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "তুমি ক' দিন আমাদের বাড়ীতে আসনি, তাই তাঁর অসুখের কথা জানতে পারনি। তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে; ডাক্তারেরা বলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। তিনি নিজে কাল রাত্রি থেকে বলছেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়েছেন। আমি মনে করছিলাম, চিঠি লিখে তোমার কাছে লোক পাঠাব। কিন্তু তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।"

অশ্রুকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন কেন? কিছু দরকার আছে কি?"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "কি দরকার তা তিনি আমাকে বলেন নি। চল, তুমি তাঁর কাছে চল। আমি একলা কদিন ভাবনায় অস্থির হয়েছিলাম; তোমাকে দেখে আমার মনে একটু সাহস হল।"

অশ্রুকুমার আলেক্জান্দ্রাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলে ডাক্তার দত্ত নয়নোন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিলেন; তাহার পর ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এস, অশ্রুকুমার; কদিন আমি তোমাকে খুব আগ্রহের সঙ্গে খুঁজেছিলাম।"

অশ্রুকুমার কহিল, "দুঃখের বিষয়, যে আমি ক'দিন আপনাদের বাড়ীতে আসিনি, এ জন্যে আপনার অসুখের কথা জান্তে পারিনি।"

ডাক্তার দত্ত কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "এখন তোমার দেখা পেয়েছি; এখন তোমাকে আমার কথাগুলো বল্‌তে পারবো। একখানা চেয়ার নিয়ে তুমি আমার কাছে বস। আলেক্, তুমিও বস; আমি অশ্রুকুমারকে যে কথা বলবো, তা তোমাকেও শুনতে হবে।"

আলেক্‌জান্দ্রা বিস্মিত নয়নে অশ্রুকুমারের মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তার দত্ত ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ, এই যে আমি রোগশয্যায় শুয়েছি, এ থেকে আমি আর কখনও উঠব না। কলকাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে তাঁদের সমবেত চেষ্টাতেও আমার এ জীবন রক্ষা পাবে না। আমি বেশ বুঝেছি যে আমি আর বেশী দিন এই পৃথিবীতে থাকব না। আমার মৃত্যুর পর, যাতে আমার স্ত্রীর কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধা ভোগ করতে না হয়, তার একটা উপায় স্থির করতে হবে। তাই তোমার পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্যে তোমাকে আমি খুঁজেছিলাম অশ্রুকুমার।"

আলেক্‌জান্দ্রা বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "তবুও এটা সত্য কথা আলেক্, যে তোমারই জন্যে আমি এই মৃত্যুকালে সব চেয়ে বেশী চিন্তান্বিত। তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনই যদি থাক্‌তে, তাহলে আমি তোমার জন্যে ভাবতাম না। কিন্তু এখন ত তুমি আগেকার মত নেই। কি জানি কেন, গতবার পাঁচ মাসে তোমার ভিতর একটা আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন এসেছে। তোমার অন্তরে একটা ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। এখন আমি বুঝেছি যে তুমি আমাদের সমাজের কোন কোনও বিধবার ন্যায় আবার একটা বিয়ে করে, আপনার অভিভাবক সংগ্রহ করবে না। বুঝেছি যে, আপনার স্বার্থের দিকে লক্ষ্যশূন্য হয়ে, তুমি ব্রতচারিণী হিন্দু বিধবার ন্যায় ধর্ম্মাচরণে সারা জীবনটা অতিবাহিত করবে। তখন তোমার অভিভাবক হয়ে কে তোমার সম্পত্তি রক্ষা করবে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "কেন, মিসেস্ দত্ত তাঁর পিতার কাছে থাকবেন।"

ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধবা অবস্থায় তুমি তোমার বাবার কাছে থাকবে কি?"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "না, আমি আমার বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না। আর তোমার পরিত্যক্ত অর্থও আমার বাবার নিকট গচ্ছিত রাখব না।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "এই কয়েক মাসে তোমার কার্য্য কলাপ দেখে আমিও তাই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম যে তুমি আমার বাড়ী ও কুল ত্যাগ করে আপন পিতার আশ্রয়েও বাস করবে না। বুঝেছিলাম যে আমার পরিত্যক্ত অর্থ অপরের হস্তগত হলে, তোমার ইচ্ছামত, তুমি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করবার সুবিধা পাবে না। কিন্তু তোমার অর্থ তোমার কাছে থাকলেও অভিভাবকশূন্য অবস্থায় তুমি দুষ্ট লোকের হাত থেকে তা রক্ষা করতে পারবে না। এ জন্যে কয়েক দিন চিন্তার পরে আমি স্থির করেছি যে, তোমার একজন অভিভাবক নিযুক্ত করে', তারই হাতে আমার সমুদয় অর্থ রেখে যাব।"

অশ্রুকুমার কহিল, "আলেক্‌জান্দ্রা দেবীর ভাইয়েরা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "আমার শ্বশুরকুলের কোনও সম্পত্তি আমার পিতৃকুলের হাতে যায়, তা আমার ইচ্ছা নয়।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "আমিও তা জানি। এ জন্যে আমি স্থির করেছি যে এই ভার আমি অশ্রুকুমারের হাতে সমর্পণ করবো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে অশ্রুকুমার অপেক্ষা এ ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত লোক আর নেই।"

ডাক্তার দত্তের প্রস্তাব শুনিয়া, আলেক্‌জান্দ্রা বিস্মিত হইল, কিন্তু সে আপন জিহ্বাকে বিশ্বাস করিয়া কথা কহিতে সাহস করিল না।

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করতে হবে?"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "সে কথা পরে বলবো। আপাততঃ আমার স্ত্রীকে আমি তোমার যথার্থ পরিচয় দেব। তুমি আমাকে ক্ষমা করো; আমি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার বিশেষ পরিচয় নিয়েছি। তুমি যে কত ধনী তা আমার স্ত্রী এখনও পর্য্যন্ত জানতে পারেন নি। তুমি সে পরিচয় কখন আমাদিকে দাও নি; সামান্য দরিদ্র বেশে এসে আমাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছ। আমার স্ত্রীকে তুমি ঠকিয়েছ বটে, কিন্তু আমাকে তুমি ঠকাতে পারনি। আমি গোপনে তোমার সকল সন্ধানই নিয়েছি। প্রায় এক মাস আগে, আমি মোটরে শেয়ালদা থেকে বাড়ী ফিরছিলাম। দেখ্‌লাম, তুমি একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী আপনি চালিয়ে, একটা বাগানওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের ভিতর ঢুক্‌লে। তুমি আমাকে দেখলে না; কিন্তু আমি তোমাকে দেখ্‌লাম। দেখে, আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে উঠল। ভাবলাম, কি উদ্দেশ্যে তুমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করলে তা জান্‌তে হবে। এই ভেবে, তুমি বাগানের ভিতর অদৃশ্য হবার পর, আমি সেই ফটকের কাছে গিয়ে, আমার গাড়ী থেকে নামলাম। নেমে দেখলাম, ফটকের এক স্তম্ভে তোমার নাম লেখা রয়েছে, অন্য স্তম্ভে লেখা রয়েছে 'কেদারভবন।' বুঝলাম, সেই প্রকাণ্ড বাড়ী তোমারই। বুঝলাম, যে সেই রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করে, যে তেমন মূল্যবান মোটর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সে দীনহীন দরিদ্র নয়। তারপর থেকে, আমি তোমার সম্বন্ধে নানা গোপন সন্ধান নিয়েছি। জেনেছি, যে কলকাতায় তোমার মত দাতা আর কেউ নেই;—দুঃখী দেখ্‌লেই অর্থদ্বারা তুমি তার সাহায্য কর। অশ্রুকুমারের দানও নূতন রকমের দান; এ দান পাবার জন্যে কারও প্রার্থনা করতে হয় না; কার কি অভাব আছে, আপনি তাদ সন্ধান সংগ্রহ করে, অশ্রুকুমার কৌশলে তার সেই অভাব পূর্ণ করে। আমি সত্য বলছি, আলেক্‌ নানা কারণে আমি অশ্রুকুমারকে যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা আমি জীবনে আর কাকেও করি নি। তুমি আলেক্‌, তুমি অশ্রুকুমারকে ভাল চিনলে, তুমিও ওঁকে আমার ন্যায় ভক্তি করবে।"

আলেকজান্দ্রা মনে ভাবিল, ধনহীন দীন হীন মনে করিয়াও অশ্রুকুমারকে সে যে আপনার মাথার মুকুট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ত পৃথিবীর লোক বুঝিতে পারে না; তাহার প্রস্ফুটিত হৃদয়কুঞ্জের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত লালিত্য সে যে অশ্রুকুমারের চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা ত পৃথিবীর লোক দেখিতে পায় না; তাহার হৃদয়নিকুঞ্জে অহরহ যে কেবলমাত্র অশ্রুকুমারের নাম গুঞ্জরিত হইতেছে, তাহা ত কেহ শুনিতে পায় না।

ডাক্তার দত্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অশ্রুকুমারের মত আমি কলকাতায় কাকেও দেখিনি। এজন্যে আমি মনে করেছি যে আমার মৃত্যুর আগে, আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ওঁরই হাতে গচ্ছিত রেখে যাব। অশ্রুকুমার তোমার ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন; উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করবেন। অশ্রুকুমার, তুমি আলেক্‌জান্দ্রার এই ভার গ্রহণ করতে অসম্মত হ'য়ো না।"

অশ্রুকুমার বিষণ্ণমুখে কহিল, "আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "আলেক্‌, তোমার ভবিষ্যৎ ভালর দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি অশ্রুকুমারকে তোমার অভিভাবক নিযুক্ত করলাম। যতদিন বাঁচবে, তুমি ওঁর উপদেশমত কায কোরো। অশ্রুকুমার, আমি আজই আমার সমস্ত অর্থ বেঙ্গলব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা দেব। তুমি তুমি মাসে মাসে যে টাকাটা দান কর, দেখবে, আমার আমার বাৎসরিক স্থায়ী আয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু, মনে হয়, তা হতে আমার স্ত্রীর জন্যে খরচ ক'রেও বছর বছর কিছু টাকা বাঁচবে। ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে একটি দরিদ্র পরিবারের কিছু উপকার হলেও আমার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করবে। দেখ, সারাজীবন ধরে যে কায করেছি তাতে কখনও সুখলাভ করতে পারিনি; আর, যে আমার সংস্রবে এসেছে, তাকেও অসুখী করেছি। আলেক্‌ তুমি আমার পরিত্যক্ত অর্থে দেশের লোকের উপকার কোরো। আর, আলেক আমি যদি তোমার প্রতি কোনও কর্ত্তব্যের ত্রুটি করে থাকি, তবে আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

আলেকজান্ড্রা ডাক্তার দত্তের শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া জলভারাক্রান্ত চক্ষু লইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিল, তুমি আমার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যে চিরদিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছ; এই রোগশয্যায় শুয়ে, তুমি আমারই ভবিষ্যতের কথা ভাবছ। বরং আমিই তোমার প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করতে পারিনি। কেবল তোমার পরিশ্রমলব্ধ অর্থের অপব্যয় করে, বিলাসিতায় গা ভাসিয়েছি। অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠা আমি বুঝিনি যে মণিমুক্তা বা বসনভূষণের মধ্যে সুখ নেই; বুঝিনি যে আত্মাদরে সুখ নেই; সুখ আছে আত্মবলিদানে—আত্মবিস্মৃতিতে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন আপনাকে ভুলে পরের কথা ভাবতে শিখি।"

ডাক্তার দত্ত কিছু বিচলিত হইয়া কহিলেন, "আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন পৃথিবীতে থেকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করতে পার। আমার পুত্রকন্যা নেই; তোমারই পুণ্যে যেন আমার পূর্ব্বপুরুষের মুখ উজ্জল হয়।"

অশ্রুকুমার দেখিল যে স্বামীস্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে একজন আগন্তুকের উপস্থিত থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব সে কহিল, "আপনারা অনুমতি করলে আমি বাড়ী ফিরতে পারি। কাল আবার আসব।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "যতদিন বেঁচে থাকি, রোজ এসে একবার করে দেখা দিয়ে যেও।"

ডাক্তার দত্তের মর্ম্মস্পর্শী কথায় অশ্রুকুমারে হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, এজন্য সে তাঁহার কথার উত্তরে কোনও কথা কহিতে পারিল না; বিষাদছায়াচ্ছন্ন মুখ লইয়া, নিঃশব্দ পদক্ষেপে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

অশ্রুকুমার চলিয়া যাইবার পর, ডাক্তার দত্ত পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই অশ্রুকুমারকে তুমি আজীবন ভক্তি কোরো। আমার মনে হয়, ওঁরই পবিত্র পুণ্যপ্রভাবে, তোমার আর আমার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আগে, আমি কখনও ভাবিনি যে আমার জীবনের শেষ চার পাঁচ মাস এত সুখে অতিবাহিত হবে; ভাবিনি যে তোমাকে আমার প্রাণের এত নিকটে পাব।"

আলেকজান্ড্রা কথা কহিল না; নীরবে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার কোমল স্নিগ্ধ করতল রোগঘ্ন প্রলেপের ন্যায়, আতুরের সর্ব্বাঙ্গে অনুলিপ্ত করিয়া দিল। তাহার সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি মরণোন্মুখের সম্মুখে ধরিয়া ডাক্তার দত্তের পরলোকের পথ আলোকিত করিয়া রাখিল। ডাক্তার দত্ত কখনও বুঝিলেন না যে ইহা প্রেমময়ীর প্রেম নহে; ইহা কেবল কর্ত্তব্যময়ীর কর্ত্তব্য—করুণাময়ীর করুণা।

অশ্রুকুমারের হাতে তাঁহার সমুদয় অর্থ সমর্পণ করিয়া, অহরহ পত্নীর অপরিমিত সেবালাভ করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় মনোমধ্যে পরমা শান্তি লাভ করিয়া, সাতদিন পরে, ডাক্তার দত্ত পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

আলেকজান্ড্রার পিতা মাতা স্বামিহীনা দুঃখিনী আলেক্জান্ড্রার মনে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য ছুটিয়া কন্যার বাটীতে আসিয়া বাস করিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাস করিয়া যখন বুঝিলেন যে তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, নষ্টবুদ্ধি নীচমনা জামাতাটি, তাঁহাদের দুঃখিনী কন্যাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, আপনার সর্ব্বস্ব অন্যের হাতে—পৌত্তলিক হিন্দুর হাতে—সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, যখন বুঝিলেন যে ঐ পরহস্তগত অর্থ আর কখনও হস্তগত হইবার আশা নাই, তখন তাঁহাদের মনে একটুও শান্তি রহিল না। কন্যাকে শান্তি দিতে আসিয়া, তাঁহারা নিজেরাই অশান্তি লাভ করিলেন; সেই অশান্তি লইয়া আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কেবলমাত্র, আলেক্জান্ড্রার ছোট ভাই আলেক্জান্ড্রার বাটীতে বাস করিল।

অশ্রুকুমার মাঝে মাঝে আলেক্জান্ড্রার নিকটে আসিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য আবশ্যক অর্থ প্রদান করিত।

আলেক্জান্ড্রার মনে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য, অশ্রুকুমার তাহাকে পরে পরে এক একটা দানকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি, অশ্রুকুমার দরিদ্রগণের অনুসন্ধান করিয়া, মাসে মাসে প্রায় পঞ্চাশ ষাট-হাজার টাকা দান করিত। এই দানকার্য্যে তাহার একটা অভাব এই ছিল যে, সে দরিদ্রা অন্তঃপুরিকাদের কথা জানিতে পাইত না। সৌদামিনী গৃহকার্য্য করিয়া অবসর

পাইত না, বিশেষতঃ সে অত্যন্ত বালিকা, এজন্য অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে নিযুক্ত করিতে পারে নাই। এক্ষণে আলেক্‌জান্দ্রার দ্বারা তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইল। আলেক্‌জান্দ্রা দরিদ্র গৃহস্থের সহিত আলাপ করিয়া, তাদের অভাবের কথা জানিয়া, অশ্রুকুমারে অর্থে ও আপনার অর্থে কৌশলে তাহাদের অভাব দূর করিতে লাগিল।

একমাস পরে একদিন অশ্রুকুমার দেখিল যে আলেক্‌জান্দ্রা, বিদেশী আদর্শে যে কৃষ্ণ শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায়, শুভ্র কর্কশ বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। দেখিয়া অশ্রুকুমার কহিল, "হাঁ, এই ঠিক হয়েছে। যে সকল লোকের মধ্যে তোমায় কায করতে হবে, তাদের মত কাপড় পড়াই তোমার উচিত। আজ এই নির্ম্মল সাদা কাপড়ে তোমাকে পূজার ফুলটীর মত দেখাচ্ছে।"

অশ্রুকুমারের কথা শুনিয়া, আলেক্‌জান্দ্রা একটু হাসিল; কহিল, "এই পূজার ফুলে, কোনও ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করতে পারব কি না জানিনে; কিন্তু রাস্তার কুকুরগুলোকে বোধ হয় সন্তুষ্ট করতে পারব। গাড়ী থেকে নেমে, কোন গলির মধ্যে ঢুক্‌লেই, পাড়ার কুকুরগুলো আমার অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখে, আমাকে পেত্নী মনে করে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতো; এখন বোধ হয় সেটা বন্ধ হবে।"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৺রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)। পঞ্চিকা

১। পঞ্চসমা—

আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।

—১৯, গীতাঞ্জলি।

২। পঞ্চ-বিলম্বিতা—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল যে যেথা আছ ভাই
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই।

—স্রোত, প্রভাত সঙ্গীত।

[ইহাও চতুর্দ্দশাক্ষরী, কিন্তু যতি-বৈচিত্র্যে, একটি নূতন ছন্দ।]

৩। নব-ত্রিপদী—

মনেতে সাধ যেদিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব,
দেখিব শুধু— দেখিব শুধু
কথাটি নাহি ক'ব।

—চেয়ে থাকা, প্রভাত সঙ্গীত।

[যেমন লঘুত্রিপদী ছয়-ছয়-আট এবং দীর্ঘত্রিপদী আট-আট দশ, তেমনি পাঁচ-পাঁচ-সাতে এই নব-ত্রিপদী।]

৪ মুখর-পঞ্চিকা—

অরুণময়ী তরুণ উষা
জাগায়ে দিল গান
পূরব মেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি

অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
　　বিকশি উঠে প্রাণ।
　　　　—সাধ, প্রভাত সঙ্গীত।

৫। মঞ্জরিণী—

আবার মোরে পগেল করে
　　দিবে কে
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
　　বিরাগভরা বিবেকে।
　　　　— শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, মানসী।

৬। লঘু পঙ্ক্তিকা—

(ক)　একদা রাতে নবীন যৌবনে
　　স্বপ্ন হ'তে উঠিনু চমকিয়া,
　　বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
　　ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
　　　　—নিদ্রিত, সোনার তরী।

(খ)　পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি,
　　　　এখন এ যে গভীর ঘোরনিশা!
　　নদীর পারে তমাল-বন-ভূমি
　　　　গহনঘন অন্ধকারে মিশা!
　　　　—পথিক, খেয়া।

(গ)　কহিলা হবু, "শুনগো গবুরায়
　　কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র
　　মলিন ধুলা লাগিবে কেন পায়
　　ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র?
　　　　—জুতা আবিষ্কার, কথা।

[দ্বিতীয় ও চতুর্থচরণের শেষাক্ষর যুক্ত হওয়াতে, ছন্দের একটি গিট্‌কারী শোনা যায়।]

(ঘ)　রচিয়াছিনু দেউল একখানি
　　অনেক দিনে অনেক দুঃখ মানি।
　　রাখিনি তার জানালা দ্বার
　　সকল দিক্ অন্ধকার
　　ভূধর হ'তে পাষাণভার
　　　　যতনে বহে আনি;
　　রচিয়াছিনু দেউল একখানি।
　　　　—দেউল, সোনার তরী।

৭। বিলাসিনী—

অমন দীন নয়নে তুমি
　　চেয়োনা।
অমন সুধাকরুণ সুরে
　　গেয়োনা।
সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝ
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
　　যেয়োনা,
অমন দীন নয়নে তুমি
　　চেয়োনা!
　　　　—প্রত্যাখ্যান, সোনার তরী।

৮। পঞ্চম-যোড়শিকা

একদা প্রভাতে কুঞ্জতলে
　　অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
　　পুষ্প মালিকা।
　　　　—নারীর দান, চিত্রা।

৯। দীর্ঘ-পঙ্ক্তিকা—

(ক) দিবস যদি সাঙ্গ হ'ল, না যদি গাহে পাখী,
　　ক্লান্তবায়ু যদি না আর চলে,
এবার তবে গভীর করে' ফেলগো মোরে ঢাকি
　　অতি নিবিড় ঘনতিমির তলে।
　　　　—১৫৭, গীতাঞ্জলি।

(খ) একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা
কুসুম-রথে মকরকেতু উড়িত মধু পবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা !
মদনভস্মের পূর্ব্বে, কল্পনা।

[প্রথম ও তৃতীয় ছত্রের অক্ষর সংখ্যা অষ্টাদশ, কিন্তু যতি-বৈচিত্র্যে অষ্টাদশী নহে।]

(গ) জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপাতরণী
লইবে মোরে ভবসাগর কিনারে,
করিনা ভয়, তোমারি জয়, গাহিয়া যাব' চলিয়া
দাঁড়াব আমি তব অমৃত দুয়ারে।
—পরিণাম, কল্পনা।

(ঘ) পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছে একি সন্ন্যাসি,
বিশ্বময় দিয়াছে তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
— মদনভস্মেরর পরে, কল্পনা।

[ভারতচন্দ্রের কাব্যেও শেষোক্ত ছন্দদ্বয় দৃষ্ট হয়। জয়দেবের

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং—

ছন্দের সহিত শেষোক্তটি সমমাত্রিক।]

(ঙ) বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপ ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
—৪,গীতাঞ্জলি।

(চ) আরঙ্‌জেব ভারত যবে
করিতেছিল খান্ খান্
মারবপতি কহিলা আসি,
করব প্রভু অবধান !
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর্ যারে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহী পতি সুরতান্ ;
কি অভিলাষ তাহার পরে'
আদেশ মোরে কর দান !
—মানী, কথা।

(৮) ত্রিপদী

১। লঘু-ত্রিপদী

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্ত্তি
বলে—"আর পারিনাকো'
রহিল তোমার এঘর দুয়ার,
কেষ্টারে নিয়ে থাকো !"
—পুরাতন ভৃত্য, চিত্রা।

২। নব মৃণালিনী

নিদাঘের শেষ গোলাপকুসুম
একা বন আলো করিয়া
রূপসী তাহার সহচরীগণ
শুকায়ে পড়িছে ঝরিয়া।
—অনুবাদ, কড়ি ও কোমল।

৩। দীর্ঘদলপদ্ম।

(ক) এমনি যেন রে কেটে যায় দিন
কারো যেন কোন কায নাই,
অসম্ভব যেন সকলি সম্ভব
পেতেছে যেন রে যাহা যাই।
— গ্রামে, ছবি ও গান।

(খ) আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়,

ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়।
—আকাঙ্ক্ষা, কড়ি ও কোমল।

(গ) আজি কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত ?
তব চরণকমল-রতন-রেণুকা—
অন্তরে আছে সঞ্চিত !
—প্রার্থনা, চৈতালি।

(ঘ) দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বস' হে হৃদয়নাথ,
কল্যাণ করে মঙ্গল ডোরে
বাঁধিয়া রাখহে দোঁহার হাত !
বিবাহ মঙ্গল, কল্পনা।

[এই ছন্দ হেমচন্দ্রের মধ্যেও বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।]

(ঙ) দেখিনু যে এক আশার স্বপন
শুধু তা' স্বপন, স্বপনময়
স্বপন বই সে কিছুই নয়।
—অনুবাদ, কড়ি ও কোমল।

(চ) আমি, বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে !
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে'।
—২, গীতাঞ্জলি।

৪। খণ্ডত্রিপদী

কাব্যের কথা বাঁধা পড়ে যথা
ছন্দের বাঁধনে,
পরাণে তোমারে ধরিয়া রাখিব
সেই মত সাধনে।
—৮, নৈবেদ্য।

৫। উপলাহত।

অন্তর মম বিকশিত কর
অন্তরতর হে,
নির্ম্মল কর উজ্জ্বল কর
সুন্দর কর হে,
জাগ্রত কর উদ্যত কর,
নির্ভয় কর হে।
—৫, গীতাঞ্জলি।

৬। সমত্রয়ী ত্রিপদী

(ক) তোমার বীণায় সব তার বাজে
ওহে বীণ্‌কার,
তারি মাঝে কেন নীরব কেবল
একখানি তার ?
—নীরব তন্ত্রী, চিত্রা।

(খ) একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী,
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি !
—তুলনায় সমালোচনা, সোনার তরী।

৭। ললিত ত্রিপদী

কেন, বাজাও কাঁকণ কনকন কত
ছলভরে ?
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনক কলসে
জল ভরে !
—লীলা, কল্পনা।

৮ নিপুণিকা

আজি, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?
কেন, নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে ?

এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুম মালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-
শয়নে।
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে?
—ব্যর্থ যৌবন, সোনার তরী।

৯। **অন্তর্ভঙ্গিতা**

(ক) আমার হৃদয়ভূমি মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল সমান
একটি অচল স্মৃতি!
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী
আসিছে যেতেছে ফিরি।
—অচল স্মৃতি, সোনার তরী।

(আগামী কার্ত্তিক সংখ্যায় সমাপ্য)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সামুগড়ের মুক্তপ্রান্তরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দারা যে রজনীতে আগ্রানগরী ত্যাগ করিয়া দিল্লীর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে রজনী তাঁহার কিরূপে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানিতেন, এবং আর জানিতেন সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্। সমগ্র ভারতভূমির ভাবী সম্রাট্ তাঁহার সকল আশা ভরসা চিন্বা নদীর বালুকাস্তীর্ণ তীরতটে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণভয়ে এবং বন্দী হইবার আশঙ্কায় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, অপ্রাপ্তবয়স্ক একমাত্র বালক পুত্র সিপার-সেকোকে সঙ্গে লইয়া আবাল্যের আনন্দ-নিকেতন আগ্রা রাজধানীতে যখন আসিলেন, তখন দেখিলেন, আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গ এবং স্নেহময় পিতৃক্রোড়ও তাঁহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না। বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের বজ্রনাদী কামানের কর্ণবিদারী ধ্বনি ক্রমশঃ আগ্রার নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং চরমুখে বার্ত্তা আসিল যে যুদ্ধান্তে ঔরঙ্গজীব বিশ্রামার্থ সামুগড়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অগ্রগামী সেনাভাগ পলায়মান রাজকুমারকে বন্দী করিবার জন্য সেই রাত্রেই আগ্রার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে এবং সেই অগ্রগামী 'নাসীর' সৈন্যের শতঘ্নীর বজ্রনিনাদ মুহুর্মুহু শুনা যাইতেছে। পিতা শাজাহানের নির্ব্বন্ধাতিশয্য যখন তাঁহাকে আগ্রায় আবদ্ধ রাখিতে পারিল না, তখন শাজাহান দারাকে দিল্লীর পথে যাইতে বলিলেন, এবং তথা হইতে অন্য কোথাও না গিয়া সেইখানেই পুনরায় রণসজ্জা করিতে অনুরোধ করিলেন। তথাকার রাজভাণ্ডার হইতে মুক্তহস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিবার জন্য দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারীর উপর আদেশ গেল। তথাকার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর দারাকে সর্ব্বপ্রকার সমরোদ্যোগ করিবার সাহায্য করিতেও হুকুম প্রচারিত হইল।

দারা যখন সামুগড়ের সমরশেষে তাঁহার আবাস-ভবন হইতে দ্রুতহস্তে যাত্রার সকল আয়োজন শেষ করিয়া জন্মের মত আগ্রার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তখন নিতান্ত আপনার জনের মধ্যে দারার সঙ্গে যাত্রা করিলেন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী পরভেজনন্দিনী নাদীরাবানু বেগম, এবং তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক পুত্র

সিপার। তাঁহার সমভিব্যাহারে ধ্বংসাবশিষ্ট বাহিনীর ভগ্নাংশ চলিল বটে, রাজকুমারের এবং কুমারপত্নী নাদিরার দাসদাসীবর্গের মধ্যে অনেকে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার সুখদুঃখের জীবন মৃত্যুর সমান অংশ গ্রহণ করিবার মত কেবলমাত্র দুইটী প্রাণীই সঙ্গে চলিল।

রাজকুমার দারা দিল্লী নগরীতে পঁহুছামাত্র দিল্লীর রাজভাণ্ডার তাঁহার নিকট সম্রাটের আদেশে মুক্ত হইল। দিল্লী এবং তাহার চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমে সৈন্য সামন্তও আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ বিধাতা কাহার অদৃষ্টে লিখিয়াছেন ইহাই জানিবার জন্য আর একবার ঔরঙ্গজীবের সহিত রণক্ষেত্রে বল-পরীক্ষার আয়োজন চলিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে দারাসেকো দাউদ খাঁ নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে বিপাশা তীরে সসৈন্যে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহাতে ঔরঙ্গজীব লাহোরের দিকে অগ্রসর হইতে না পারেন। এখন দারা সেই পথে দিল্লী হইতে লাহোরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইচ্ছা, লাহোরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমান সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিবে এবং সেই যুক্ত বাহিনীর সাহায্যে রণচণ্ডীর প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ তরবারি আর একবার সূর্য্য কিরণে ঝলসিয়া উঠিবে। দৈব বিমুখ হইলে সহস্র সাধনাও বিফল হইয়া যায়; দারার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।

যেমন সৈনাপত্যগুণে ঔরঙ্গজীব দারা অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা জাল চাতুরী এ সকল ব্যাপারেও ঔরঙ্গজীব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সরল উদার মহৎ দারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সকল নীচতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না; কিন্তু ঔরঙ্গজীবের ইহাতে দ্বিধাবোধ ছিল না। রণপাণ্ডিত্য অপেক্ষাও এই সকল ব্যাপারে 'পাণ্ডিত্য' তাঁহার অধিক ছিল এবং ভারত সিংহাসনের জন্য প্রতিযোগিতায় ঔরঙ্গজীব যে সফলকাম হইয়াছিলেন, সে সাফল্যের মূলেও এই প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা। দারা লাহোরে বসিয়া সমরোদ্যোগ করিতেছেন, বিপাশার তীরভূমি প্রভুভক্ত কর্ম্মপটু দাউদ খাঁ বীরবিক্রমে রক্ষা করিতেছে, তাহাকে পরাভূত করিয়া দারার পশ্চাদ্ধাবন ঔরঙ্গজীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে একথা বুঝিতে পারিয়া ছলবিশারদ ঔরঙ্গজীব এক অপূর্ব্ব প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দাউদের নামে এক মিথ্যা পত্রের মুসবিদা করা হইল। তাহাতে লিখিত হইল, "তুমি আমার শুভানুধ্যায়ী তোমার পত্রে এ কথা জানিতে পারিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। তুমি যে উপায়ে সপরিবারে দারাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ, উহা অতিশয় সদুপায়। ঐরূপে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গেলে আর শ্রমসাধ্য যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং দারাকে বন্দী করিয়া পরে তোমার অভিলষিত পুরস্কারে তোমাকে যে বহুরূপে পুরস্কৃত করিব একথা বলাই বাহুল্য।" ইত্যাদি। সুচতুর ঔরঙ্গজীব এ পত্র দাউদের নিমিত্ত লেখেন নাই; তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা কোনও ক্রমে দারার হস্তগত হইলে দারা দাউদকে অবিশ্বাস করিবেন; প্রভুভক্ত দাউদ নিদারুণ মনঃপীড়ায় দারার পক্ষ ত্যাগ করিবে; এইরূপে জয় সিংহ, যশোবন্ত, দিলীর খাঁ প্রভৃতি সুযোগ্য সেনাপতিগণের ন্যায় আর একজন কর্ম্মক্ষম সেনাপতিকে দারা হারাইয়া অপেক্ষাকৃত হীনবল হইবেন, এবং বিপাশার পথ মুক্ত হইয়া গেলে দারার পশ্চাদ্ধাবন অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে সাধিত হইতে পারিবে।

পত্র এরূপ ভাবে প্রেরিত হইল, যাহাতে উহা দারার হস্তগত হয়। পত্র পাঠ করিয়া দারা স্তম্ভিত হইলেন। ধরমৎ এবং সামুগড়ের প্রান্তরে দারার তরবারি যখন জয়যুক্ত হইতে পারিল না, তখন দারার পক্ষাবলম্বী বহু সৈন্য ও সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ঔরঙ্গজীবকে আশ্রয় করিয়াছে, দাউদের পক্ষেও উহা করা অসম্ভব নহে; বিশেষতঃ যখন বিধাতা বিমুখ হন, দৈব প্রতিকূল হয়, তখন মানুষও বিরুদ্ধাচারণ করিয়া থাকে, একান্ত বিশ্বাসী আপনার জনও পর হইয়া যায়, পুত্র কলত্র পর্য্যন্ত বৈরিতাচরণ করে ইতিহাসে

তাহার প্রমাণ প্রচুর। বর্ত্তমানে দারার প্রতি বিধাতা বিমুখ, নতুবা যশোবন্তের ন্যায় রণবিশারদ রাজপুত ধরমতের ক্ষেত্রে পরাভূত হইবে কেন, ছত্রশাল হাদা এবং রুস্তম খাঁর ন্যায় অশ্বসেনার দুর্দ্ধর্ষ অধিনায়কগণ সামুগড়ের প্রান্তরে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে কেন? এবং রোহিলা রাজপুত মোগল ও তুর্কী বীর পুরুষগণ চির জীবনের অন্নদাতা শাহানশাহা বাদশাহ শাজাহানের জেষ্ঠপুত্র লোকপ্রিয় দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া চির-বিশ্বাসের মস্তকে পদাঘাত করতঃ ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বন করিবে কেন? এই সকল চিন্তায় দারার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল, মনে সন্দেহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া দাউদের প্রতি আন্তরিক অবিশ্বাস জন্মাইল। কনিষ্ঠ পুত্র সিপারকে দাউদের নিকট হইতে নিজের নিকটে ডাকিয়া লইলেন। দাউদ যখন যুদ্ধ ব্যাপারে পরামর্শ জন্য প্রভুর সমীপবর্ত্তী হইল, তখন দেখিল দারার ব্যবহার অন্যরূপ হইয়াছে; তিনি রণদক্ষ কর্ম্মপটু সেবাপরায়ণ ভক্ত ভৃত্যকে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়ের পরামর্শ তাহার সহিত করিতেছেন না। অবিশ্বাসের শেলাঘাতে দাউদের মন ভাঙ্গিয়া গেল, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে সহযোগিতা আর রহিল না। এরূপ ক্ষেত্রে ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। যে প্রীতি ও বিশ্বাসের বন্ধন সেব্য-সেবককে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল সে বন্ধন শিথিল হইল; উভয়ের নৈকট্য বিদূরিত হইয়া অবিশ্বাস এবং অভিমানের দুস্তর সাগর তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে পুনর্ম্মিলনের সুগভীর অন্তরায় সৃজন করিল। দারা দাউদকে একরূপ হরাইলেন। এক্ষেত্রে কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। চতুর্দ্দিক হইতে অবিশ্বাসের ভুরিভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়া দারা কাহাকেও এক্ষণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। অপর পক্ষে দাউদ যথার্থই বিশ্বাসের পাত্র; অকারণে কাহারও প্রতি অবিশ্বাস দেখাইলে তাহার অন্তরে ক্লেশ উপস্থিত হয় এবং সে ব্যক্তি আর পূর্ব্ববৎ প্রভুর সেবা প্রাণপণে করিতে পারে না; উভয়ের বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করিলে যেরূপ কার্য্যহানি হয়, বিশ্বাসী জনকে অকারণে অবিশ্বাস করিলেও তাহাকে হারাইতে হয় ইহা সুনিশ্চিত সত্য।

দাউদ খাঁকে হারাইবার পর বিপাশার তীরভূমি রক্ষা করিবার জন্য আর কেহই রহিল না; আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গ অবরোধের সময় হইতে খলিলুল্লা খাঁ ঔরঙ্গজীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল এবং ঔরঙ্গজীব সেই খলিলুল্লাকে দারার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিলের সঙ্গে সৈন্যসংখ্যা কম ছিল। বিপাশার পথ মুক্ত হইবার পর ঔরঙ্গজীব জয়সিংহ, বাহাদুর খাঁ এবং দিলীর খাঁকে খলিলের সহায়তায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং সফ্‌সিকন খাঁকে গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক রূপে এই যুক্ত বাহিনীর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন, স্বয়ং ঔরঙ্গজীব রহিলেন পশ্চাতে। বহুযুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতিগণ শত শতঘ্নীর বলে বলীয়ান্ বিপুল বাহিনী সঙ্গে লইয়া যখন লাহোরের দিকে দারার পশ্চাদ্ধাবন করিল, দারার পক্ষে লাহোরে অবস্থান তখন বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল, অগত্যা তাঁহাকে লাহোর ত্যাগ করিতে হইল। পিতার আদেশক্রমে সোলেমান তাহার ভগ্ন বাহিনী সহ লাহোরে আসিয়া পিতার সহিত যোগ দিতে পারিল না, ঔরঙ্গজীবের সৈন্য তাহার পথরোধ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সোলেমান অগত্যা হরিদ্বার হইয়া গাড়োয়ালের দিকে চলিয়াছে। এদিকে দারার পক্ষে লাহোরে থাকিয়া ঔরঙ্গজীবের বিপুল বাহিনীর সহিত সম্মুখযুদ্ধ তখন অসম্ভব, পরাজয় সুনিশ্চিত, সুতরাং লাহোর হইতে পলায়ন ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় নাই। জয়সিংহ, বাহাদুর খাঁ, খলিলুল্লা এবং সফ্‌সিকন্ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এরূপ রণদক্ষ সেনাপতি দারার অধীনে তৎকালে কেহ ছিল না; যাহারা ছিল, তাহারা মুষ্টিমেয় সৈন্যের সহায়ে ঔরঙ্গজীবের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে দারাকে পরামর্শ দিল না। তখন দারা দিল্লীর রাজকোষ হইতে গৃহীত ধনরত্ন এবং লাহোরের সঞ্চিত অর্থরাশি সাকুল্যে ক্রোরাধিক স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, দিল্লী এবং লাহোরে সদ্য সংগৃহীত সৈন্য এবং কতিপয় সেনাপতি সহ মূলতানের পথে যাত্রা করিলেন।

দারার এই মূলতানের পথে যাত্রাই শেষ যাত্রা হইয়াছিল। একস্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত হইতে হইতে কত বালুকাস্তীর্ণ মরুভূমি, কত লবণাক্ত জলরাশি পরিপূর্ণ হ্রদ এবং উপসাগর কত দুঃখে তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে, কত অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, কত বিনিদ্র বিভাবরী তাঁহাকে ভীত চকিত ত্রস্ত হইয়া কাটাইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুত্রের সে সকল দুঃখ-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে কোন মানুষই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে না। প্রবঞ্চনা এবং চাতুরীদ্বারা ঔরঙ্গজীব যদি দারার সহিত দাউদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রাতৃ-বিরোধের ইতিহাস কিরূপে লিখিত হইত. তাহা বলা যায় না। কারণ, দাউদ খাঁ কেবলমাত্র প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিলেন তাহাই নহে, তিনি রণপণ্ডিত সেনাপতি ছিলেন. বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন; সামুগড় ক্ষেত্রের দারার বিজিত বাহিনীর সৈন্যগণ এবং দিল্লী ও লাহোরের সদ্য সমাহৃত যোদ্ধৃগণ দাউদকে অপরাজেয় বীর সেনাপতি বলিয়া মনে করিত, তাঁহারই নিকট হইতে সমরোৎসাহ পাইয়া তাহারা ঔরঙ্গজীবের বিজয়ী বীরগণের সহিত আর একবার শস্ত্রচালনপটুত্বের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিপাশার খরতরঙ্গ সম্মুখে রাখিয়া লাহোরের দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে পুনরপি ভাগ্য পরীক্ষা আরম্ভ হইলে, দাউদের ন্যায় প্রভুভক্ত বীরাগ্রগণ্যের পরিচালনায় সে পরীক্ষার ফল কিরূপ হইত, ভাগ্যলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী কাহার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিতেন, রণচণ্ডী সহাস্য বদনে কাহার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিতেন, তাহা এতকাল পরে আজ বলা সুকঠিন। সে দিনের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিকগণও সাহস করিয়া সে কথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই। ঔরঙ্গজীবের প্রতারণা-প্রসূত জালপত্র দারা বুঝিতে পারিলেন না। দাউদের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল, অভিমানে দাউদ একরূপ দূরে দূরেই রহিল, পরাজিত এবং বন্দী হইবার ভয়ে দারা সপরিবারে মুলতান অভিমুখে যাত্রা করিলেন, প্রতিকূল বিধাতার রোষকটাক্ষ তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। "প্রতিকূলতা মুপগতে হি বিধৌ, বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা"—দারার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, বিধাতা বাম হইয়া তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। যদিও দাউদ তখনও দারার পক্ষ একেবারে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার সঙ্গেই রহিয়াছেন, কিন্তু অবিশ্বাসের অভিমানে আর প্রাণপণ চেষ্টা করিবার ইচ্ছা এবং শক্তি তাঁহার ছিল না। একান্ত প্রভু-পরায়ণতা তখনও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই, তাই তিনি দারাকে এই বিষম দুঃসময়ে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। প্রভূত অর্থ দারার সঙ্গে ছিল, লাহোরের রাজ ভাণ্ডারের মণিমুক্তা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, সেই সকলের লোভে অনেক লোক দারার সঙ্গ লইয়াছিল; সেগুলি দস্যু তস্করে অপহরণ না করিতে পারে, সে জন্য দাউদ খাঁ চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত রাজকুমারের রক্ষার্থ তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। নৌকাযোগে বিপাশা উত্তীর্ণ হইয়া দাউদ খাঁ সে সকল তরণী নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন—শত্রুপক্ষ সে সকল নৌকার সাহায্যে শীঘ্র নদী পার হইতে না পারে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। দারা ধন রত্ন সকলের কিয়দংশ তাঁহার সঙ্গে রাখিলেন, অধিকাংশ স্বর্ণমুদ্রা এবং মণিমুক্তা উপযুক্ত রক্ষিবর্গের প্রহরায় নৌকাযোগে সিন্ধুনদের পথে মুলতানাভিমুখে প্রেরিত হইল। মুলতানে পৌঁছিয়া দারা সংবাদ পাইলেন যে, ঔরঙ্গজীবের অগ্রগামী সেনা তাঁহার লাহোর ত্যাগের অল্প পরেই আসিয়া সহর হস্তগত করিয়াছে, এবং খলিলুল্লা খাঁ সমরকুশল দ্রুতগামী বাহিনী সঙ্গে লইয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করতঃ মুলতানে পৌঁছিবার জন্য প্রতিদিন দীর্ঘপথ অতিবাহন করিতেছে, মুলতানে পঁহুছিতে তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। দারার ইচ্ছা ছিল, মুলতানে কিছু বিশ্রাম করিয়া, যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই স্থানেই দুর্গাশ্রয়ে ভ্রাতার সহিত বল-পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। কিন্তু তাহা হইল না; কেবলমাত্র খলিলুল্লা নহে, জয়সিংহ, দিলীর খাঁ প্রভৃতি রণদুর্ম্মদ সেনাপতিগণ খলিলের বলবৃদ্ধির জন্য তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। সর্ব্বশেষে ঔরঙ্গজীব স্বয়ং বিপুল বাহিনীর সহিত লাহোরে

আসিয়া বিশ্রামার্থ স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছেন। মুলতানে দারা আশ্রয় পাইলেন না, বিশ্রাম ঘটিল না, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অবসর হইল না, সেস্থান হইতে অবিলম্বে তাঁহাকে যাত্রা করিতে হইল, তিনি সসৈন্যে সেস্থান ত্যাগ করিয়া ভাক্কর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অপরিমিত ধনরত্ন দারার সঙ্গে ছিল, বীরপ্রসবিনী পঞ্চনদ-ভূমির বীরবৃন্দ তাঁহার পতাকানিম্নে সমবেত হইতেছিল, কিন্তু এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও সামুগড়ে ঔরঙ্গজীবের রণ-ধীরতা, সৈন্য চালনার কৌশল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং নির্ভীকতা প্রভৃতি দেখিয়া দারার অন্তরে একপ্রকার ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই জন্য সহসা ঔরঙ্গজীবের বাহিনীর সম্মুখীন হইতে তিনি ভরসা পাইতেছিলেন না। খলিলুল্লা খাঁ যখন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল, তখন তাহাকে আক্রমণ করিলে খলিলের বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, দারার স্বপক্ষের সৈন্যগণ বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইত, তাহাদের সাহসবৃদ্ধি হইত, ভবিষ্যতে ঔরঙ্গজীবের বৃহত্তর বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের মনে কোনরূপ শঙ্কার উদয় হইত না। কিন্তু দারার নিজের অন্তরের ত্রাস তাঁহার সৈন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ যাহার মুখ চাহিয়া বুক বাঁধিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিবে, তিনি স্বয়ংই যদি ভীত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইতে থাকেন, তবে কিসের বলে কাহার জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য মাতিয়া উঠিবে? দারা বাদশাহ শাহজাহানের আনন্দ দুলাল নয়ন-পুত্তলী ছিলেন, কোন কালেই বাদশাহ তাঁহাকে বিপদসঙ্কুল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ ধরিয়া যাইতে দিতে পারেন নাই। সুতরাং রণক্ষেত্রে যে চিত্তবল, সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন, দারার সে সকল গুণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তদুপরি ধরমত ক্ষেত্রে যশোবন্তের এবং সামুগড়ে তাঁহার নিজের পরাজয়ে তাঁহার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, ঔরঙ্গজীব অজেয় এই ধারণা তাঁহার বলবৎ হইয়াছিল, সেই জন্য ঔরঙ্গজীবের সম্মুখীন হইতে তাঁহার ইতস্তত উপস্থিত হইতেছিল। পলায়নই কর্ত্তব্যবোধে তিনি সসৈন্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছিলেন। সৈন্য, সেনানায়ক এবং অর্থ থাকিতেও সে সকল কোন কাযেই লাগিল না। এদিকে ঔরঙ্গজীব নির্ভীক; দারা যখন লাহোর হইতে মুলতানে যাত্রা করিলেন, তখন সংবাদ রটিল যে মুলতানে দারা ঔরঙ্গজীবের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিবেন, এবং সেইখানেই আর একবার ময়ূর তক্তের জন্য মহামারি উপস্থিত হইবে। এ সংবাদে ঔরঙ্গজীব ভীত না হইয়া তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ তাম্বু প্রভৃতি দুর্ব্বহ গুরুভার বস্তু পশ্চাতে রাখিয়া, আবশ্যক লঘুভার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন ২০।২২ মাইল কুচ করিয়া তিনি স্বয়ং দারার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অপর সেনাপতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য পাওয়া যাইবে না, যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলেও দারাকে বন্দী করিতে বা সম্মুখ সংগ্রামে তাঁহাকে বধ করিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিতে পারে; করতলগত পাইয়াও দারাকে তাহারা পলায়নের অবসর দিতে পারে এই সকল আশঙ্কায় ঔরঙ্গজীব যুদ্ধার্থ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একদিকে সভয়ে পলায়ন, অপর দিকে সগর্ব্বে সোৎসাহে যুদ্ধার্থ পশ্চাদ্ধাবন, ইহার ফল একরূপ সুনিশ্চিত; দারার দুরদৃষ্টে অবশেষে সেই সুনিশ্চিত ফলই ফলিয়াছিল।

দারা ভাক্করে পৌছিলে ঔরঙ্গজীব মুলতানের সন্নিহিত স্থানে আসিয়া দারার মুলতান ত্যাগ করিবার সংবাদ পাইলেন। আরও সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বাঙ্গলার সুবাদার শাহসুজা সসৈন্যে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দারা পলায়নপর, বর্ত্তমানে দারা কর্ত্তৃক বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, কিন্তু বঙ্গদেশের নৌবলে বলীয়ান্, বাঙ্গলার বিপুল ধনে ধনী, সৈন্যচালনপটু দুর্দ্ধর্ষ রণদক্ষ বীর শাহসুজা হইতে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা। তাই ঔরঙ্গজীব দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন মানসে মুলতান হইতেই ফিরিলেন, দারার পশ্চাদ্ধাবন জন্য সাফসিকন্ খাঁ প্রভৃতি কতিপয় সেনাপতিকেই যথোপযুক্ত উপদেশ এবং প্রভূত অর্থ দিয়া আসিলেন।

ঔরঙ্গজীব-প্রেরিত সৈন্যদল এবং সেনাপতিগণের

দারার পশ্চাদ্ধাবনে কিঞ্চিন্মাত্র শিথিলতা হয় নাই, সুতরাং দারার পলায়নেরও বিরাম ছিল না। ভাক্করে আসিয়া দারা যখন শুনিলেন, অনুসরণকারিগণ মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তখন তিনি ভাক্কর ত্যাগ করিয়া সক্করের দিকে চলিলেন। তাঁহার অনেক ধনরত্ন দাসদাসী এবং বেগমগণের মধ্যে অনেককে তিনি ভাক্করের দুর্গে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং খোজাগণের প্রহরায় রাখিয়া গেলেন। নিরন্তর পলায়নের পথশ্রমে পরিশ্রান্ত দারার সৈন্য এবং সেনাপতিগণ নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিতাড়িত কুক্কুরের ন্যায় নিয়ত পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া যথার্থ বীরের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, সেই কারণে দারার বহু সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ এই নিষ্ফল নিয়ত পলায়নের শ্রান্তি ক্লেশ এবং লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য, কেহ কেহ ফৌজের সহিত কুচ করিতে অস্বীকৃত হইয়া, নিজ নিজ জায়গীরে চলিয়া যাইতে লাগিল, কেহ বা ঔরঙ্গজীবের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিজয়োৎসাহে উৎফুল্ল সেনাদলের সহিত যোগদান করতঃ দারারই বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল।

লাহোর হইতে পলায়নের সময়ে চতুর্দ্দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা দারার সঙ্গে ছিল। এতদ্ব্যতীত বহু পদাতি, হস্তী, বন্দুকধারী সেনা ও বরকন্দাজ সৈন্য তাঁহার ছিল। ভারবাহী বহু উষ্ট্র ও খচ্চর ছিল, এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও মানুসী-প্রমুখ ইউরোপীয় গোলন্দাজ সেনাপতিগণের অধীনে বহু গোলন্দাজ সৈন্য এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহু তোপ তাঁহার ছিল। কিন্তু প্রতিদিনের পথবাহনের ক্লেশে, এবং পলায়নের লাঞ্ছনা ও লজ্জায় দিনে দিনে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল। দারার সমভিব্যাহারী সেনাগণ মনে করিয়াছিল যে সক্করের দুর্ভেদ্য দুর্গের আশ্রয়ে থাকিয়া দারা ঔরঙ্গজীবের ফৌজের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল দারা তাহা করিলেন না, সে স্থান হইতেও পলায়নের ব্যবস্থাই হইতেছে, তখন তাঁহার বাহিনীর ভগ্নাংশ আরও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। বহুসংখ্যক সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ রোষে ক্ষোভে লজ্জায় এবং অপমানে সক্কর হইতেই বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল।

প্রভুভক্ত দাউদ তখনও দারার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। প্রভু নিতান্তই তাঁহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহার প্রতি বিশেষ কার্য্যভার নাই, তথাপি এই অসামান্য আফ্‌গান বীরপুরুষ দারার দুঃসময়ে সকল অপমান এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, ভবিষ্যতে প্রভুর যদি কোনও উপকারে আসিতে পারেন এই আশায়, দারাকে অপরের ন্যায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্নী ও উপপত্নীগণের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পাছে তিনি দারার সঙ্গী হইতে না পারেন, সেই জন্য প্রভুর কার্য্যের অন্তরায় স্বরূপ নিজ প্রিয়তমা নারীবর্গকে দাউদ স্বহস্তে হত্যা করিয়া, স্বচ্ছন্দে প্রভুর অনুগমন করিবার পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। এরূপ প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি প্রভু যদি অবিশ্বাস পোষণ করেন, তবে সে আঘাত ভৃত্যের মনে যে কি বেদনা দেয়, তাহা বর্ণন করিবার বিষয় নহে, অন্তর দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী। যাহার জন্য নিজের সকল প্রিয়জনকে ত্যাগ করিয়াছি, হত্যা করিয়াছি, অবশেষে যদি তাহাকে এমন করিয়া হারাইতে হয়, তবে সে বেদনা যে অসহ্য হইয়া উঠে! দাউদ অবশেষে অবিশ্বাসের এই বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি দারার জন্য কি নৃশংস অমানুষিক কার্য্য করিয়াছেন তাহা সবিস্তারে দারাকে জানাইলেন। পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন যে, কায়মনোবাক্যে দারার কেশাগ্রের অনুমাত্র অনিষ্টকর কোন কার্য্য তিনি কোনও দিন করেন নাই, এবং করিবেনও না; তাঁহার একমাত্র কামনা যে একবার ঔরঙ্গজীবের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের অবসর পাইলে হয়, তিনি সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রভুর অন্নঋণ পরিশোধ করিবেন, অথবা কৃতকার্য্য হইলে, হিন্দুস্থানের ময়ূর সিংহাসনে দারাকে সগৌরবে উপবিষ্ট দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবেন; কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভু-

দ্রোহিতা তাঁহার ধমনী প্রবাহিত আফগান শোণিতে নাই এবং থাকিতেও পারে না।

ভারত-সিংহাসনের জন্ম মোগল রাজকুমারগণের ভ্রাতৃবিরোধের কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দুই শতাব্দীর অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তৎকাল-লিখিত সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, দাউদের ন্যায় প্রভুপরায়ণ সেবক দারার আর একজনও ছিল না। প্রভুর কার্য্যে কি জানি অন্তরায় ঘটে, এই জন্য নিজের প্রিয়তমা পত্নী এবং প্রণয়িনীগণের বধসাধন হয়ত দাউদ ভিন্ন আর কেহ কাহারও জন্য করিয়াছে কিনা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ ইতিহাসে আর দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যাইবে না,—অন্ততঃ মোগল ইতিহাসে আছে বলিয়া বর্ত্তমান লেখকের জানা নাই।

দাউদের শত আবেদন নিবেদন নির্ব্বন্ধাতিশয্য সকলই ব্যর্থ হইল। অবিশ্বাসের যে বীজ দুষ্ট ঔরঙ্গজীবের জাল পত্র দারার মনে বপন করিয়াছিল, তাহা আর অপসারিত হইল না; দারা দাউদকে আর বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দাউদের কোন অনিষ্ট করিলেন না সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরের যে কামনা, প্রভুর কল্যাণার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার যে ইচ্ছা, তাহা পূর্ণ করিবার অবসর তাঁহাকে দিলেন না। দারার আদেশে দাউদকে সেই স্থান হইতেই বিদায় লইতে হইল, এবং সেই বিদায়ই প্রভুভৃত্যের শেষ বিদায় হইল। দাউদ সজল নয়নে বারংবার আভূমি প্রণত হইয়া রাজকুমারকে "কুর্ণিশ" করিতে করিতে বিদায় হইলেন। দারার দুঃসময়ে তিনি যে অমূল্য রত্ন হারাইলেন, যে স্থান শূন্য করিয়া দাউদ চলিয়া গেলেন, তাহা আর পরিপূর্ণ হইল না; হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস জগতে দুর্লভ; আর যে প্রভুপ্রীতি, যে ভক্তি, যে একান্ত নিষ্ঠা দাউদ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা ইহসংসারে দুর্লভতম। একান্ত ভাগ্যবান্ না হইলে তাদৃশ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী সেবক কেহ পায় না। রাজপুত্র যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা ভাগ্যবলেই পাইয়াছিলেন—এবং যাহা হারাইলেন, তাহা নিতান্ত দুর্ভাগ্যের ফলেই হারাইলেন। একান্ত প্রভুপরায়ণ ভক্ত ভৃত্যের হৃদয়সিংহাসন হইতে যে-দিন দারা স্বেচ্ছায় অপসৃত হইলেন, সেই দিনেই ময়ূর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ তিনি স্বহস্তে ঘটাইলেন। যথার্থ মণিকার রত্নকে অন্বেষণ করিয়া থাকে, রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না। যে মহামণি দারার কণ্ঠ-বিচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, ঔরঙ্গজীব কালবিলম্ব না করিয়া তাহা কুড়াইয়া লইলেন। দারার শ্রেষ্ঠতম সমর-সহায়, ঔরঙ্গজীবের সিংহাসন সমীপে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিচিত্র বর্ণবিভবে সমুজ্জ্বল শিখিপুচ্ছ ময়ূর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহাতে ক্ষতি যাহা হইবার তাহা নির্ব্বোধ ময়ূরেরই হয়—মানুষ তাহা কুড়াইয়া লইয়া গৃহদেবতা গোপালের চূড়ায় স্থাপন করিয়া থাকে। দারার ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা এবং ভীরুতার ফলে তাঁহার বাহিনীর বহু সংখ্যক সেনা এবং সেনাপতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল যে, নিতান্ত অনুগতজন ব্যতীত আর কেহই রহিল না। কর্ম্মক্ষম বীর সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল; সর্ব্বশেষে দাউদ খাঁ যখন দারাকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেন, তখন ওমরাহগণের বাকী আর কেহ থাকিল না—অপেক্ষাকৃত হীনপদস্থ ওমরাহ রহিল, আর রহিল দাসদাসী, খোজা এবং বেগমেরা—যাহারা এই দুঃসময়ে কোন কর্ম্মের সহায় হইতে পারিবে না, কেবল ভারবৃদ্ধি করিয়া দারার দ্রুতগমনে সর্ব্বপ্রকার বাধা জন্মাইবে।

সক্কর হইতে দারা সিহিস্থানে পঁহুছিলেন। সেখান হইতে আনুমানিক পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে এমন একস্থানে তিনি আসিলেন, যে স্থান হইতে দুইদিকে যাইবার দুই পথ ছিল—গুজরাটে যাইবার পথ, অপর পথ কান্দাহারের। দারা মনে করিলেন, কান্দাহারের পথেই যাত্রা করিবেন, কান্দাহার হইতে কাবুলে গিয়া সেই স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করতঃ তাঁহার

অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বাবরের ন্যায় ভারতবর্ষের দিকে সমরাভিযান করিবেন, এবং ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলে হয়ত বাবরেরই মত কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে "তক্তে তাউস" বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমভিব্যাহারিণী রমণীগণ কান্দাহারের পথে যাইতে স্বীকার করিল না; তাহাদের ভয় হইল, অল্প সংখ্যক সৈন্য-সহায়ে দারা তাঁহার ধন রত্ন এবং স্বর্ণ রৌপ্যের বিবিধ সামগ্রী দুর্বৃত্ত বেলুচিগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না;—হয়ত তাঁহার সমভিব্যাহারিণী সুন্দরী যুবতীগণের দেহের সম্মান পর্য্যন্ত অসভ্য বর্ব্বরগণের হস্তে বিনষ্ট হইবে।

দারার সহধর্ম্মিণী পরভেজ-নন্দিনী নাদিরাবানু পর্য্যন্ত কান্দাহারের পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ দারাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ পথক্লেশে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমান সেকোর বিচ্ছেদে নাদিরা বেগমের দেহ মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার পরমায়ুর আর অধিক অবশেষ নাই, এই ধারণায় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বর্ব্বরভুমি কান্দাহারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার দারার নিতান্ত আপনার জনের মধ্যে অবশিষ্ট রহিয়াছে কেবল নাদিরা, আর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপার সেকো। প্রথম যৌবনারম্ভে যে নাদিরার শ্রীসৌন্দর্য্য দারার মনোহরণ করিয়াছিল, দারার সকলগুলি পুত্র কন্যার জননী সেই নাদিরা, দারার বড় প্রিয় সামগ্রী। এহেন নাদিরার আন্তরিক ইচ্ছার প্রতি সম্মান না দেখাইয়া দারা পারিলেন না। কান্দাহারের পথ পরিত্যাগ করিয়া টাট্টানগরে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থান হইতে কচ্ছদেশের লবণাম্বু পরিপূর্ণ সমুদ্রবৎ বিপুল হ্রদ পার হইয়া কচ্ছের রাজধানীতে উপস্থিত হইবার উদ্যম করিতে লাগিলেন। এই পানীয়-জলহীন সমুদ্র সদৃশ সুবিশাল লবণাম্বুরাশি উত্তীর্ণ হওয়া সুকঠিন ব্যাপার; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কোন প্রকার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত উহার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করে না। ইহার বিস্তৃতি শত যোজন এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে "চোরাবালি" এরূপ ভাবে গুপ্ত রহিয়াছে, যাহা চক্ষে দেখিয়া নিরূপিত হইতে পারে না, কিন্তু দ্বিপদ বা চতুষ্পদ প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত লঘুকায় পক্ষী পর্যন্ত তাহার উপর বসিলে ডুবিয়া যায়, কোন ক্রমে সে বালুকা-সমাধি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করিতে পারে না। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, খচ্চর প্রভৃতি গুরুভার পশু এবং সুবৃহৎ কামান প্রভৃতি লইয়া সেই পথে দীর্ঘযাত্রা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু দারার সে সঙ্কট সময়ে ভাবিবার অবসর কোথায়? এবং অন্য পথে যাইবার অন্য স্থানই বা কোথায়? সেই পানীয়হীন সুদুস্তর লবণাম্বুরাশি পার হইয়া তাঁহাকে যাইতেই হইবে, গত্যন্তর নাই। তিনি সেই পথেই যাত্রা করিলেন। জলহীন দীর্ঘপথে গ্রীষ্মের দিনে নিদারুণ তৃষ্ণায় কত সৈন্য যে পথে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল, কত হস্তী অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতির মৃতদেহ স্তূপীভূত হইয়া পথে ভীষণ দৃশ্যের সৃজন করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি প্রাণী লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশই সেই লবণ মরুর মধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিল। দারা যে পুত্র এবং কলত্র সহ প্রাণে প্রাণে কচ্ছের রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেবল পরিণামে নৃশংসতর মৃত্যু তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া, নতুবা দারার ন্যায় ভোগৈশ্বর্য্য-লালিত রাজাধিরাজের আনন্দ দুলালের পক্ষে সেই অনন্ত দুঃখময় অফুরন্ত পথ অতিবাহন অসম্ভবাপেক্ষাও অসম্ভব ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

দিদি

(গল্প)

শিশুপুত্র মোহনকে বিধবা তারাসুন্দরীর হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া বিমাতা বলিলেন, "আজ দুলালের পাশে ওকে একটু ঠাঁই দিয়ো মা, অভাগার আর কেউ নেই। তুমিই এখন হতে ওর মা।" তারা ছোট ভাইটীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আজ থেকে আমিই ওর মা হব, আমার প্রাণ থাকতে ওকে আমি কখনও ছাড়ব না।" বিমাতা নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিলেন, শ্রাদ্ধশান্তির পর তারা তাহার শ্বশুরগৃহে ফিরিয়া গেল।

মোহনকে কোলে করিয়া তারা যখন গাড়ী হইতে নামিল তখন দেবর ভাসুর শ্বাশুড়ী সকলেই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, —"আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে! মাগী বেঁচে থাকতে এক পয়সা দিয়ে কখনো উপকার করলে না; আবার, মরবার সময় একটা বোঝা চাপিয়ে গেল। কে এ ঝক্কি বয় বাপু?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা নীরবে সব শুনিয়া গেল। সে ত এ জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে—মান অভিমান সে ত তার শাঁখা সিঁদুরের সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়াছে। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেল।

মাস দুই কাটিয়া গেল। অনাদর উপেক্ষা বিদ্রূপ তারা অম্লান মুখে সহ্য করিতে লাগিল। অসহ্য হইলে সে মোহনকে বুকে চাপিয়া ধরিত। বৃদ্ধকালে বংশলোপের আশঙ্কায় তারার পিতা বিবাহ করিয়াছিলেন, তারপর মোহন দু'মাস ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরপারে যাত্রা করিলেন; মা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনিও ফেলিয়া গেলেন। হত-ভাগ্য! এই হিংসা বিদ্রূপের মাঝে তোমায় মানুষ হইতে হইবে। শ্বাশুড়ী বলেন ছেলেটা অভিশপ্ত। না মা, এ সুন্দর মুখের অধিকারী শিশু কি অভিশপ্ত হইতে পারে? মা নাই দিদি ত আছে, সেও ত সন্তানের জননী, সেকি এই ভাইটাকে মাতৃস্নেহ দিতে পারিবে না? খুব পারিবে।

একদিন সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া দুলালের সর্দ্দিজ্বর হইল এবং তিন দিন বাদে মায়ের কোল শূন্য করিয়া সে চলিয়া গেল। তারা আহত পক্ষীর মত লুটাইয়া পড়িল—"ওরে আমি তোকে যত্ন করতে পারিনি, তাই কি অভিমান করে চলে গেলি? ওরে দুলাল রে! ওরে অন্ধের যষ্টি! বিধবার সম্বল রে!" মোহন পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!" তারা মোহনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আবার মা বলে ডাক্ মোহন! আজ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, আর সহ্য করতে পারি নে, ভগবান! কেন এমন করে আমার জীবনের শেষ সম্বল কেড়ে নিলে?" পার্শ্বের কক্ষ হইতে শ্বাশুড়ীর চীৎকার শোনা গেল—"ওরে এমন সর্ব্বনেশে ছেলেকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেম রে; আমার সোণার বাছাকে গিলে খেলে রে! ওরে দুলাল ধন রে!" তারা চমকিয়া কাণে দুহাত চাপিয়া লুটাইয়া পড়িল।

২

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তারা মোহনকে লইয়া পিতার গৃহেই বাস করিতেছে। মোহন এখন গ্রাম্য স্কুলে পড়িতেছে। তারাকে আর সে তারা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। তাহার মুখে যে শোকের চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে তাহা মুছিবার নয়; অতীতকে সে প্রাণপণ যত্নে ভুলিবার জন্য জীবনের স্নেহটুকু নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া ভাইটীকে মানুষ করিতেছে।

যেদিন মোহন প্রথম প্রাইজ পাইয়া গর্ব্ব-প্রফুল্ল মুখে তারাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দিদি, আমি অঙ্কে ইংরাজীতে প্রথম হয়ে এই ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েছি।" তারা গভীর স্নেহে ভাইটীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "পাবে বৈ কি ভাই, তুমি যে লক্ষ্মী ছেলে! বাবা লেখাপড়া খুব ভাল-বাসতেন। মনু এস ভাই, খাবার দি, মুখ শুকিয়ে গেছে!"

অপরাহ্ন বেলায় দেয়ালে ঠেস্ দিয়া তারা রোয়াকে বসিয়া ছিল, অতীতের স্মৃতিগুলা তাহার মনে জাগিতেছিল। কলসী কক্ষে সিক্ত বস্ত্রে ঠানদি ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন,

"হ্যালা তারি! তোর ভাই নাকি পেখম পেরাইজ পেয়েছে ওদের সিধু বল্‌ছিল?" ঈষৎ চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া তারা কহিল, "হ্যাঁ ঠানদি, প্রথম প্রাইজ পেয়েছে, ইংরাজী আর অঙ্কে মনুই সব চেয়ে ভাল হয়েছে।" —"হ্যাঁ শুন্‌ছিলেম সিধু বল্লে বটে ইন্‌জিরী আর আঁক ও সব চেয়ে ভাল জানে। আহা আজ যদি দুলাল থাকত দিদি! নাতজামাই আমার অত পাশ করা ছিল, তার ছেলে আজ কত বড় বিদ্বান হতে পারতো; সবই কপাল ভাই।" তারা কহিল, "সে অনেক দিন চুকে গেছে ঠান্‌দি, কি আর হবে; আমার বরাত। এখন আশীর্ব্বাদ কর মোহন মানুষ হোক।" তারা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিল, ঠান্‌দি দুঃখসূচক স্বরে বলিলেন, "তা বৈকি ভাই, মানুষ হবে বৈকি, যে যত্নে মানুষ কচ্চিস্‌, কে বলবে সৎ ভাই, যেন নিজের ছেলেটী।" তারার হাসি পাইল—"সৎ ভাই!" হায়, ইহারা জানে না মোহন তাহার শূন্য বুকের কত-খানি পূর্ণ করিয়া আছে।

উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করিয়া ঠান্‌দি কহিলেন, "আজ আসি ভাই।" তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এসো ঠান্‌দি! মোহন পাশ হয়েছে, ছেলেদের আমি খাওয়াব; কাল তোমার বাড়ী গিয়ে পরামর্শ সব ঠিক করব কেমন?" "হ্যাঁ করবে বৈকি ভাই, করবে বৈকি," বলিতে বলিতে ঠানদি বাহির হইয়া গেলেন।

৩

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; মোহন এখন আইন কলেজের ছাত্র, এখন আর তাহাকে দিদির আঁচল ধরা পাঁড়া-গেঁয়ে মোহন বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। মাথার চুল হইতে পায়ের জুতা শুদ্ধ যে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে। পড়া-শুনায় কিন্তু সে খুব ভাল, প্রতি বৎসর জলপানি পাইয়াছে, এজন্য তাহার দিদির আনন্দের ও গৌরবের সীমা নাই। হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা লিলির সহিত তাহার শুভ পরিণয় হইয়া গিয়াছে। বধূ পিতৃগৃহেই আছে, উকিল মহাশয় তাঁহার উচ্চশিক্ষিতা আশৈশব সুখে পালিতা কন্যাকে পাড়াগাঁয়ে মাটীর ঘর নিকাইতে পাঠান নাই। তারা দুবার বধূ আনিতে পাঠাইয়াছিল, উকিল মহাশয় সে লোককে এই বলিয়া ফিরাইয়া দেন যে জামতার সৎবোনের নিকট তিনি মেয়ে পাঠাইতে পারেন না এবং তিনি সেই পাড়াগাঁয়ে মেয়েকে পাঠাবার জন্য বিবাহ দেন নাই। মোহন যতদিন না ওকালতীতে পসার করিতে পারে ততদিন কন্যা তাঁহার নিকট থাকিবে, পরে মোহন স্বতন্ত্র বাড়ী করিয়া বউ লইয়া যাইবে।

তারা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'সেই "মোহনের শ্বশুর, যে পায় ধরিয়া কন্যা দান করিয়াছে, আমার সম্মতির জন্য বিশবার এই পাড়াগাঁয়ে হাঁটাহাটি করিয়াছে! মোহন ত একথা শুনিয়াও কোন প্রতিকার করিল না; দিদির এ অপমান যে অনায়াসে সহ্য করিল? না না, মোহনের দোষ কি? আমি ত দেখিয়া শুনিয়া গৃহলক্ষ্মী আনিয়াছি।"

মোহন কথাটা শুনিয়াছিল। প্রতীকার কিছু খুঁজিয়া পায় নাই। শ্বশুরবাড়ী গিয়া একদিন আমতা আমতা করিয়া কথাটা তুলিয়াছিল। উকিল মহাশয় তাহাকে থামাইয়া দিয়া এমন সব নজির দেখাইলেন যাহাতে মোহনের আর বলিবার কিছু রহিল না।

মোহন এতদিন গ্রাম হইতেই কলেজ করিতেছিল। তারা তাহাকে চোখের আড়াল করিতে নারাজ ছিল বলিয়া হষ্টেলে কিংবা মেসে তাহাকে থাকিতে দেয় নাই। প্রতিদিনের মত সেদিনও তারা মোহনকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া ছিল। অন্যমনস্ক ভাবে দু'চার গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া মোহন সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "দিদি, একটা কথা বলব?" "কি কথা ভাই?"—তারা মুখ তুলিয়া ভাইটীর সঙ্কোচ দেখিয়া বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল। মোহন লজ্জিত মুখে বলিল, "এখান থেকে কলেজ করতে বড় অসুবিধা হয়, তাই শ্বশুর মশাই বল্লেন"—

তারা উদ্‌গ্রীব স্বরে কহিল, "কি বল্লেন?"

দিদির মুখ দেখিয়া মোহন কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "বল্লেন ঐখান থেকেই কলেজ করতে। আর, দুদিন বাদে ওকালতী করতে হবে, সেটা ওখান থেকেই সুবিধা। তা তুমি যা বল—তোমার যা মত।"

উকীল হইতে মোহনের এখনও দেড় বৎসর বিলম্ব ছিল।

তারা অভিমানে ফুলিয়া উঠিল। বুঝিল শেষের কথাগুলি মোহন তাহার উদ্বিগ্ন স্বর শুনিয়া যোগ করিয়া দিয়াছে; ছি ছিঃ! যেখানে তাহার কোন মূল্য নাই সেখানে কেন সে নিজে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে গেল? আত্মদমন করিয়া তারা গম্ভীর মুখে কহিল, "অসুবিধা যদি হয় মোহন, তবে ওখান থেকেই কলেজ কোরো। আমার আর মতামত কি ভাই! তুমি বসে খাও, আমার কেমন অসুখ কচ্চে একটু শুয়ে পড়ি।"

অব্যক্ত যন্ত্রণায় তারা মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। এই কি তাহার সেই মোহন, যাহাকে সে দুলালের অপেক্ষাও স্নেহ যত্নে মানুষ করিয়াছে, যাহার জন্য জীবনের মান অপমান সমান করিয়াছিল, শোক দুঃখকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিল? আজ যদি তাহার দুলাল থাকিত, সেকি এমন করিয়া তার মাকে অবহেলা করিতে পারিত?

সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতেছেন। তারা সিক্ত বস্ত্রে কলসী কক্ষে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিতেছিল, পিছন হইতে ঠান্‌দি কহিলেন, "হ্যাঁলা তারি, এত সন্ধ্যেবেলা হন হন করে কোথা যাচ্ছিস?" তারা মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল, "আজ ঘাটে যেতে দেরী হয়েছিল ঠান্‌দি! এখন বাড়ী যাচ্ছি।"

"ওমা এত দেরী কল্লি কেন?"

"মোহন আজ কলকাতায় আসতে গেল কিনা!"

ঠানদি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "সেত ওবেলা লো!" এত বেলা কি কচ্ছিলি?" তারা চুপ করিয়া রহিল; আজ সারা দিন সে শুইয়া ছিল, খায় নাই। মোহন কাল হইতে আর আসিবে না। কবে আসিবে তাহারও ঠিক নাই। অভিমানে তারাও কিছু বলে নাই। সে যে তাহার কতখানি হৃদয় জুড়িয়া আছে, একথা মোহন যদি এতদিন ধরিয়া দিদির কাছে মানুষ হইয়াও না জানে, তবে তারা আর কিছু বলিবে না—মোহন যাহাতে সুখী হয় হউক।

ঠান্‌দি তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "মোহন নাকি শ্বশুরের ওখান থেকে কলেজ করবে?" কথাটা তারার কানে অপরের মুখ হইতে এমন কর্কশ শুনাইল যে সে চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "তুমি কোথা শুনলে ঠান্‌দি?"

"ক্যানে, ইষ্টিশেনে তার সঙ্গে সিধুর দেখা হয়েছিল। সিধু জিজ্ঞাসা কল্লে মোহন আজ এত দেরী হল? তাতেই মোহন সব বল্লে।"

মোহন কি বলিল তাহা শুনিতে তারার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না তাই সে চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিল। ঠান্‌দি সহানুভূতির স্বরে কহিলেন, "তাই আমরা বলাবলি করি, মোহনকে তুমি কি করেই মানুষ করেছ! মোহন এখন ফিরে দেখলে না! শ্বশুরবাড়ী সোয়ামীর ঘর তুমি মোহনের জন্যে ত্যাগ করেছ—ঘোর কলি! ঘোর কলি!" তারা কথা কহিল না দেখিয়া ঠান্‌দি তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শীত লেগেছে দিদি, কাঁপছো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাড়ী গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলগে।"

তারা দ্রুতপদে চলিয়া গেল; এ শীত তাহার বাহিরের নয়, অন্তরের। তাহার কাণে সপ্তসুরে বাজিতেছিল—শ্বশুর-বাড়ী সোয়ামীর ঘর মোহনের জন্য ত্যাগ করেছ!

৪

রোয়াকে বসিয়া তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আজ দুমাস মোহন কলিকাতায় গিয়াছে, ইহার ভিতর একটীবার মাত্র সে আসিয়াছিল। তাও তাহার নিজের গরজে। বহুদিন পরে তারা ভাইটিকে কাছে পাইয়া নিজের কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময় মোহন বলিয়া উঠিল "কলকাতায় একখানা বাড়ী কচ্ছি দিদি।" বিস্মিত ভাবে তারা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বেশ করেছ ভাই, কবে বাড়ী হল আমিও কিছু জানি নে।" মোহন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তোমাকে তাড়াতাড়িতে জানাতে পারি নি দিদি। শ্বশুর মশাই সব ঠিক করে দিলেন—কিন্তু সে বাড়ীও আর থাকে না দিদি!" মোহনের কথা শুনিতে শুনিতে তারা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "কেন কেন ভাই, বাড়ী থাকবে না কেন?"

"টাকা কম পড়েছে দিদি! বাড়ী বেচে ফেলতে হবে!" মোহনের কথা শুনিয়া তারার মন আর্দ্র হইয়া উঠিল।

একটু গর্ব্বও হইল—আর ভাবনা নাই, মোহন ত মানুষের মত মানুষ হইয়াছে। পিতার বংশধরকে সে ত বংশ উজ্জ্বল করিবার উপযুক্ত করিয়া গিয়াছে। একটু থামিয়া তারা বলিল, "কত টাকার দরকার?"

"হাজার তিন চাই।"

"ধার পেলিনা?"

"শুধু হাতে কে ধার দেবে দিদি?"—তারা ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। তিন হাজার টাকার জন্য বাড়ীখানা যাইবে? নিজের বাড়ী না হইলে মোহন ওকালতীতে পসার করিবে কি করিয়া? একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, তাহার শ্বশুর সব দেখাশুনা করিতেছেন, আর তিন হাজার টাকা দিতে পারিলেন না? কিন্তু তাহা বলিল না।

একটু চুপ করিয়া তারা কহিল, "কবে টাকা চাই? আমি দিন সাতেকের ভিতর দেবো।"

"টাকা তুমি কোথা পাবে দিদি?"

"আমি পাবরে পাব, তোর ভয় নেই টাকা আমি ঠিক দেবো।"

"তোমার গহনা বেচে দিও না দিদি, সে আমি নিতে পারবো না।"

সেই দিনই মোহন কলিকাতায় ফিরিল। সারা গাড়ীতে সে এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছিল, ছিঃ সে কি মানুষ? সে কি জানে না যে বাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা পাওয়া যায়। তবে সে কেন শ্বশুরের প্ররোচনায় দিদির কাছে টাকা আনিতে গিয়াছিল? তাহার এই স্নেহের উদারতার ক্ষমা ও বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি দিদির ভাই হইয়া, অপত্যস্নেহে তাঁহার কাছে পালিত হইয়া, এত ছোট মন সে পাইল কোথা হইতে?

তারা সিধুকে ডাকিয়া চুপি চুপি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিল। সিধু ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মোহনের শ্বশুর টাকা লইলেন, মোহন ঘর হইতে বাহির হয় নাই। দেখা করিতে চাহিয়াছিল, মোহন দরওয়ানের হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল—"আমার শরীর ভাল নয়, টাকা শ্বশুরের হাতে দাও।"

তারা কাঠের মতন বসিয়া ছিল। কথা শেষ করিয়া সিধু কহিল, "ভারী ছোটলোক, দিদি; মোহনের শ্বশুরটা টাকা হাতে কোরে যখন দাঁত বের করে বোলতে লাগল, 'দেবেন বৈকি, মোহনের দিদি টাকা দেবেন বৈকি, বাড়ী হলেই মোহন দিদিকে নিয়ে আসবে, তাইত মোহনকে আর লীলাকে বলি তোমাদের বহু ভাগ্য তাই এমন দিদি পেয়েছ!' আমার তখন ইচ্ছা হচ্ছিল ভণ্ডটাকে কিছু ভদ্রতা শিক্ষা দিই। তোমার বারণ মনে করে কিছু বল্লাম না। আর মোহন এখন বড়লোক হয়ে গেছে, আমাদের মত গরীবের সঙ্গে কথা কওয়া দরকার মনে করে না।

তারা চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সিধু একটু অপ্রস্তুত ভাবে প্রস্থান করিল। তারা ঘরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল—এ অপমান কাকে কল্লি, কেন করলি মোহন? মোহন যে লজ্জায় ক্ষোভে সিধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই, তারার অভিমান ক্ষুব্ধ-মন তাহা বুঝিতে পারিল না।

তার পর চারি মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই চারিমাস ধরিয়া তারা জ্বরে ভুগিতেছে। ইহার ভিতর মোহন একবারও আসে নাই বা কোন পত্রাদি লেখে নাই। তারাও কোন সংবাদ লয় নাই। পর যে কখনও আপন হয় না ইহাই সে এই কয়মাস ধরিয়া ভাবিতেছে। ইহাতেও কৈ মন ত বুঝে না, তাই আবার সিধুকে ডাকিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়াছে, তাহারই প্রতীক্ষায় আজ বহুদিন বাদে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছে। সিধু এই আসে এই আসে করিয়া বেলা গড়াইয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তারা উঠিয়া পড়িল—আজ আর সিধু খবর দিতে আসিল না। এমন সময় সিধু ডাকিল দিদি!"

তারা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মোহন ভাল আছে?" সিধু ভগ্নস্বরে কহিল, "মোহনের বড় অসুখ দিদি।"

তারা বসিয়া পড়িল। "অসুখ? এ্যাঁ, কি অসুখ? আমাকে নিয়ে চল্ সিধু, সে নিশ্চয় আমাকে খুঁজছে।"

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, সিধু মনে মনে কহিল - হা দুর্ভাগিনী পতিপুত্রহীনা নারী! তোমার অন্তরের ক্ষুধিত স্নেহ সব যে ঢেলেছ দিদি, সে তো তোমার মর্ম্ম কিছুই বুঝলে না!

তারা চোখ মুছিয়া কহিল, "মোহনের শ্বশুর কি আমাকে

বাড়ী ঢুকতে দেবে না সিধু? হাতে পায়ে ধরে যদি আমি মোহনের কাছে থাকতে চাই?"

সিধু ম্লান হাসিয়া বলিল, "তার শ্বশুর টশুর কেউ নেই সেখানে দিদি। আধা তৈরী বাড়ীর ভেতর মোহন একলা আছে। গায়ে বসন্ত দেখা দিতেই তারা মোহনকে ফেলে চলে গেছে। মেয়েটাকে শুদ্ধ নিয়ে গেছে, ব্যাটা শুধু বোঝে পয়সা। শুনলাম বাড়ী তৈরীর নাম করে মোহনের অনেক টাকা মেরেছে। একজন ডাক্তার তার কাছে আছেন, তাঁর কাছেই শুনলাম। ডাক্তার নাকি মোহনের শ্বশুরকে গিয়ে বলেছিলেন, 'মশাই আপনার মেয়েকে পাঠিয়ে দিন সেবার জন্যে, বিশেষ রোগীর কাছে একজন আপনার লোক থাকা ভাল। তা বল্লে, জামাই ত মরবেই, মেয়েকে পাঠাই কেন? আমার আদরের মেয়ে রুগীর সেবা করতেও পারবেনা। পয়সা থাকে নার্শ রাখুক নয়ত দেশে খবর দাও সেখানে ওর দিদি আছে।"

তারার মাথা বন বন করিয়া ঘুরিতেছিল। সামনের দেওয়াল ধরিয়া কোন মতে কহিল, "আমাকে আজই নিয়ে চল ভাই!"

সিধু ম্লান হাস্যে কহিল, "অত করে কেন বলছ দিদি! আমি আজই এখুনি তোমায় নিয়ে যাব। একবার বাড়ীতে বলে আসি।"

"হ্যাঁ ভাই বলে এসো।" বলিয়া তারা ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া লুটাইয়া পড়িল। সেখানে মাথা কুটিতে কুটিতে অশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল—"আমার প্রাণ নিয়ে আমার মোহনকে বাঁচাও ঠাকুর। আমি যেন মোহনের দিদি হয়ে যেতে পারি। আমার এসাধে বাদ সেধোনা। আমার মুখ রক্ষা কর হরি, দয়াময় নামে কলঙ্ক তুলোনা।"

৫

তারা কলিকাতায় গিয়া ভাইয়ের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে মোহনের জীবন নিরাপদ বলিয়া ডাক্তার মত প্রকাশ করিলেন।

এমন সময়, তারার গায়ে দুই একটি স্ফোটক দেখা দিল। দেখিয়া সেই দিনই তারা ভাইকে রাখিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। মোহনের সংবাদ আনিবার জন্য প্রত্যহ সিধুকে কলিকাতায় পাঠাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। তারা কষ্টের সহিত চোখ খুলিয়া বলিল, "সিধু তো এলোনা ঠানদি?" প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া ঠান্‌দি কহিলেন, "এই এলো বলে। মোহন ত ভাল আছে দিদি কাল খবর এসেছে।"

"না না ঠান্‌দি তোমার দুটী পায়ে পড়ি, সিধুর কাছে গিয়ে মোহন কেমন আছে খবরটা আনো। আর বাঁচবো না ঠান্‌দি, মরবার সময় মোহনের খবরটা শুনে যাই।"

"ষাট বালাই, ভাল হয়ে যাবে, ওকি কথা দিদি? মোহনের খবর আমি এনে দিচ্ছি।" বলিয়া ঠান্‌দি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তারা চক্ষু মুদ্রিত করিল। মুখে তাহার একটা তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, মরবার সময় যদি মোহনকে দেখে যেতে পারতাম! না না, তাকে কাছে এনে কায নেই, সে সুস্থ হয়ে উঠুক। মোহনের দিদি হয়ে যেতে পারছি এই আমার যথেষ্ট!"

দরজা ঠেলিয়া অস্থির ভাবে কে ঢুকিল। তারা মুদ্রিত চক্ষে কহিল, "মোহন কেমন আছে সিধু?"

"দিদি!"

তারা দুবাহু বাড়াইয়া মোহনকে ধরিয়া কহিল, "ভাই এসেছিস? তোর অপেক্ষা করেই আছি।" পরক্ষণে কহিল, "এই অসুখের মধ্যে কেন এলি মনু? এখনও তোর শরীর ত মোটেই সারেনি!"

মোহন শিশুটীর মত লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "দিদি আজ তোমায় একি দেখছি? আমি কি আগে অন্ধ ছিলাম? কি বলে সান্ত্বনা পাব দিদি?" তারা চোখের জল সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমাকে হাসতে হাসতে যেতে দে ভাই! আজ আমি মোহনের দিদি হয়ে যাচ্ছি। ওরে মোহন তুই আমার দুলাল, আমি তোকে তাই যে ভাবি ভাই!"

"তার খুব প্রতিফল আমি তোমায় দিয়েছি দিদি!"

পরম স্নেহের সহিত তারা শীর্ণ হাত খানি তুলিয়া

মোহনের মাথায় বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "কেঁদনা মোহন, আজ আমি পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে যাচ্ছি। শেষ সাধ ছিল তোকে চোখে দেখে যাব, তোর হাতের আগুন পাব। ভগবান আমায় সে সাধ পূর্ণ করেছেন। একটু জল দে ভাই, ওখানে গঙ্গাজল আছে।"

মোহন উঠিয়া গিয়া সাবধানে দিদির মুখে জল ঢালিয়া দিল।

"আঃ বাঁচলাম ভাই, কাছে আয়, আশীর্ব্বাদ করি।"

মোহন সরিয়া দিদির কোলের কাছে বসিল। তারা দুর্ব্বল হাতখানি মোহনের মাথায় রাখিয়া জড়ানো স্বরে শেষ নিশ্বাস টানিয়া কহিল, "দীর্ঘজীবি হও, সুখী হও।" অবশ হাতখানি মোহন ধরিয়া ফেলিল

পল্লীর সেই ঝিল্লীমুখর নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া মোহনের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন উঠিল—"দিদি—দিদি, মাগো!"

শ্রীমানসা চৌধুরী।

বেদনা-মণি

(গান)

একটি শুধু বেদ্‌না মাণিক আমার মনের মণি-কোঠায়।
সেই ত আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়॥
সেই মাণিকের রক্ত আলো
ভুলালো মোর মন ভুলালো গো!
সেই মাণিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়॥

আজ রিক্ত আমি কান্নাহাসির দাবী দাওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে,
ঐ বেদ্‌না মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে।
এ কাল্ ফণী অনেক খুঁজি
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো!
আমার চোখের জলে ঐ মণিদীপ আগুন-হাসির ফিনিক্ ফোটায়॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

বঙ্গসাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ

অল্পক্ষণের অতিথি, বড়ই সোহাগের ধন। যাহা রাখিয়া যায়, তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে, এবং সত্যরূপে তাহা গ্রহণ করিতে, আমাদের অনেক দিন লাগে। আমরা বুঝি নিয়তির বিধান, কিন্তু তথাপি মনে হয়, অকালেই যেন ঝরিয়া গেল—অসময়েই যেন চলিয়া গেল। অনেক পাইয়াছি; কিন্তু, তথাপি মনে হয়, আরও যেন অনেক পাইতাম। এই প্রকারের অনেক দূত জগতে আসিয়াছেন, আমাদের বাঙ্গলা দেশও বঞ্চিত নহে। এই ত মোটে সেদিন, চিরবসন্তের কোকিল রজনীকান্তের কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল; বেশী দিনের কথা নহে, বিবেকানন্দের প্রতিভাজ্যোতিঃ মধ্যগগনে উঠিবার আগে, অকস্মাৎ নিবিয়া গেল, দ্বিজেন্দ্রলালের রণ-ভেরীও হঠাৎ থামিয়া গেল। সবাই যেন অসময়ে চলিয়া যায়। মনে হয়, হতভাগ্য আমরা, অযোগ্য আমরা, তাই বিধাতার এ বঞ্চনা। আবার মনে হয়, তাহারা ত আমাদের নহে। আমাদের এই কর্ম্মভোগের বন্ধনে তাহারা বদ্ধ নয়। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রই, তাহাদের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র নয়।

তাহারা, কোন্ উন্নততর অমল রাজ্যের অধিবাসী। জাগরণের গান গাহিয়া, কোন্ রাজরাজেশ্বরের আদেশে, ইহারা লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করে। ইহাদের পথ আমাদের নিকট অস্পষ্ট—ইহারা কোন্ অলোক পথের যাত্রী।

অধিকার থাকুক বা না থাকুক্, সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের প্রিয় সুহৃদ্। সুহৃদের বেশে তিনি আসিয়াছিলেন, ভালবাসার সিংহাসনখানি দখল করিয়াছিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার সেই প্রেমের মূর্ত্তি আজ কেবল স্মরণ করিতেছি।

নব্যবঙ্গের ভাব-জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেই স্থান নির্দ্ধারণ করা, ভবিষ্যতের কার্য্য। তবে, আজ সে সম্বন্ধে দু'টি কথা না বলিলে আমার যেন কর্ত্তব্যই পালিত হইবে না, তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নব্যবঙ্গের ভাব-জীবনের ইতিহাসে, 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ। আর এই সভা ও এই পত্রিকা যাহা করিয়াছেন, সেই কার্য্য-সাধনে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সভার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার মত ছিলেন। অক্ষয়কুমার, তাঁহার সহিত অনেক সংগ্রাম করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি এই দেবতারই প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমারের পৌত্র। কেবল দেহের জীবনে নহে, মানস জীবনেও এই উত্তরাধিকার তিনি প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। এই উত্তরাধিকারিত্বের ধারার মধ্য দিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝিলে, আমরা যে কেবল সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝিব তাহা নহে, নব্য-বঙ্গের গতিশীল ভাব-জীবনের যাহা স্বাস্থ্যকর ও বাঞ্ছনীয় ক্রমবিকাশ, তাহারও পরিচয় পাইব। রবীন্দ্রনাথ যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তপস্যারই ফল, তেমনই সত্যেন্দ্রনাথও অক্ষয়কুমারেই সাধনার পরিণতি।

মানুষের ভিতর দুইটি বৃত্তি আছে। কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ইহাদের নাম দিয়াছেন বুদ্ধি ও বোধি; কেহ কেহ বলেন মন ও হৃদয়। ইংরাজীতে প্রথমটিকে বলা হয় intellect দ্বিতীয়টিকে বলা হয় intuition। এই দুইটির মিলন আবশ্যক। একটা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন গড়িয়া তুলিতে, এই দুইটি বৃত্তির মিলন যেমন আবশ্যক, একটা জাতিকে সমষ্টিভাবে তাহার পরমার্থ-সাধন করিতে হইলেও, এই দুইটি বৃত্তির সামঞ্জস্যময় মিলনও তেমনি আবশ্যক। ইহারা পাখীর দুইটি পাখা একসঙ্গে সমানভাবে দুইটির ক্রিয়া না হইলে পাখী উড়িতে পারে না

অক্ষয়কুমার যখন সাধন ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর জড়তা। আমাদের এই প্রাচীন দেশের নরনারী নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কারের শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, একবারে জড়বৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে বিশাল ও বিচিত্র জগৎ, চারিদিকে উন্নতিশীল নানা জাতির বিচিত্র সাধনা ও উদ্যম; কিন্তু আমরা একবারে অসাড় ও নিঃস্পন্দ। সেদিন যে আমাদের হৃদয় ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু গতিহীন ও নিঃস্পন্দ বুদ্ধির বাহনে বসিয়া, বোধিও নিষ্ফলতায় ম্রিয়মাণ ছিলেন। আমাদের এই বুদ্ধি বা Intellectকে নিগড়মুক্ত করিয়া স্বাধীন চিন্তায় দীক্ষিত করাই অক্ষয়-কুমারের জীবনের সাধনা ছিল। ইউরোপ বা নব্যজগৎ তাহার নবীন উদ্যম লইয়া প্রাচীন ভারতের দুয়ারে সেদিন উপস্থিত। ভারতবর্ষ, এই নবসাধনার চাপে নিষ্পেষিত হইয়া আত্মঘাতী হইবে, কিংবা জাগিয়া উঠিয়া এই নব সাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, ইহাই সেদিনের সমস্যা ছিল। 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা' ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু নবযুগের ধর্ম্ম ঠিক্ প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম নহে—অক্ষয়কুমার ইহা বুঝিতেন এবং অক্ষয়কুমারের নেতৃত্বাধীনে, ইউরোপের সমুদয় বিদ্যাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা এই 'তত্ত্ববোধিনী'র মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালীর ছেলেদের মধ্যে ইংরাজী ভাব প্রবেশ করানো, সর্ব্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বারা সাধিত হয়।" সে সময়ের একজন বড় অধ্যাপক Rev. John Anderson বলিয়াছিলেন, "Akshoykumar is Indianising European Science." অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন তোমরা চিন্তা-রাজ্যে স্বাধীন হও এবং এই প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে আদর করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। আজ, এই বিশ্ববেদ

তোমাদের গ্রহণীয়। প্রাচীন বেদের প্রতি অযথা অনুরাগ, আমাদের সাধন শক্তিকে পঙ্গু করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। পূজা ও প্রার্থনা প্রভৃতির ভাবুকতা অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অকর্ম্মণ্য করিয়াছে বলিয়া অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক দেবেন্দ্রনাথকেও, বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ক ধারণা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অমিত সাহসের সহিত প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন।

স্বাধীন চিন্তার পরিণাম কি? সংস্কারমুক্ত বুদ্ধি মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে? স্বাধীন চিন্তার নাম শুনিলে অনেকেই ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন। স্বাধীন চিন্তার সহিত নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিজাতীয় ভাবানুকরণ ও স্বদেশদ্রোহিতার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে, এই স্বাধীন চিন্তার ও সংস্কারমুক্ত গবেষণার একটা প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার স্বাস্থ্যকর পরিণতি কি? অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের ভিতর আমরা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইব।

স্বদেশ প্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথ, প্রার্থনাশীল সত্যেন্দ্রনাথ, বৈদিক ঋষির সাধন-সম্পদের রসাস্বাদনের আকুলতায় বিনম্র হৃদয় সত্যেন্দ্রনাথ, নিজের জাতীয় সাধনার ভূমিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, মহামানবের মানস-সুন্দরীর অভিষেক গীতি গাহিয়াছেন এবং 'সর্ব্বভূমে বরণীয় সার্ব্বভৌম গণের' শান্তিমন্ত্র নিজের বীণায়, নিজের সুরে গাহিয়া, বাঙ্গালীর হৃদয় প্রসারিত ও সরল করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ, কবি। অক্ষয়কুমার বুদ্ধি, আর সত্যেন্দ্রনাথ বোধি। নির্ম্মল হৃদয়ের সহজ স্পন্দন, সত্যেন্দ্রনাথের সাধক জীবনের প্রেরণা। রসাস্বাদন, তাঁহার অভীষ্ট। কিন্তু নিশ্চেষ্টতার সুষুপ্তির ভিতর এই রসাস্বাদন হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ কবি; কিন্তু কেবলমাত্র নিজের ভাব-জগতে অবরুদ্ধ কবি নহেন। তিনি কবি ও ভাব-জীবনের অধ্যবসায়শীল কর্ম্মী। অক্ষয়কুমার যেমন জ্ঞান আহরণের জন্য বিশ্বমানবের সাধন-মন্দিরে অক্লান্ত উদ্যমে বিচরণ করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি বিশ্বমানবের ভাবোদ্যানে মধু সংগ্রহের জন্য সমগ্র জীবন অমিত উৎসাহে পর্য্যটন করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ, তাঁহার পিতামহের ন্যায় কি বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন, কত পড়িয়াছেন, কত ভাবিয়াছেন, কত শিখিয়াছেন! এবং এই শ্রমলব্ধ মধু, কত যত্নে নিজের দেশবাসিগণের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ কবি বলিলে, যেমন একটি অলস উদাসীন ভাবসর্ব্বস্ব ও নিশ্চেষ্ট জীবন আমাদের মনে জাগিয়া উঠে, সত্যেন্দ্রনাথ সে শ্রেণীর কবি ছিলেন না। তিনি সাধক কবি; আর এই সাধনা কত কঠোর, তাহা যাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথকে জানিতেন, তাঁহারাই জানেন। জ্ঞান আহরণের উন্মাদনায়, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অক্ষয়কুমার শিররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কে বলিবে যে এই অমিত পরিশ্রমের উত্তরাধিকারিত্বই, সত্যেন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণের পার্থিব হেতু নহে?

সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিষ্য। ইহাঁরা ভাবুক কবি (mystic) কিন্তু ইহাঁরা নির্ম্মল হৃদয়ের সহজ স্পন্দনের প্রেরণায় স্বাধীন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকী সাধনা, ইঁহাদের নিকট অবজ্ঞাত নহে, পরন্তু পরিণতি প্রাপ্ত। কাযেই বলিতে হয় যে বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া জ্ঞানের যে জগৎ, বাঙ্গালীর মানস নেত্রের পুরোবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই জগৎকে, আত্মস্থ করিয়া তাহার রসাস্বাদনের মত্ততা সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এ যুগের কবি যাঁহারা, ইহাই তাঁহাদের স্বাভাবিক পথ।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার মূল প্রেরণা স্বদেশপ্রেম। প্রত্যক্ষকে যথার্থরূপে গ্রহণ ও মানবতা, ইহার প্রধান সুর। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ প্রেম, এ কালের প্রতীচ্য জগতের কিপ্লিং প্রভৃতি বহু কবির ন্যায়, একটা সঙ্কীর্ণ দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা বিশ্বমানবের মহামিলনের ছন্দে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে ব্যাকুল।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক 'বেণু ও বীণা'। বাঙ্গলা ১৩০০ হইতে ১৩১৩ সাল পর্য্যন্ত লিখিত কবিতাগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০৭ সালের আশ্বিন মাসে ভয়ানক বর্ষা হইয়াছিল; 'দুর্য্যোগ' নামক কবিতাটি সেই বর্ষার সময় লিখিত বলিয়া মনে হয়। তখন কবির বয়ঃক্রম

সতের বৎসর। স্বদেশের দুর্দ্দশা চিন্তা করিয়া কবির হৃদয় কিরূপ ব্যথিত, এই কবিতায় তাহা বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তখন কবির আশা করিবার বিশেষ কিছু ছিল না। স্বদেশ প্রীতি যেন একটা হৃদয়বেদনা মাত্র—

তাপহীন দীপ্তিহীন এমনি চলেছে দিন ;
বঙ্গের এ দুর্য্যোগের নাহি বুঝি শেষ !
এ জল ফুরাবে নারে, এ আঁখি শুখাবে নারে ;
ঘুচিবে না বুঝি আর এ মলিন বেশ।

ইহার পাঁচ বৎসর পরে বাঙ্গলায় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাঙ্গালীর নিরাশ হৃদয়ে সে এক অপূর্ব্ব জাগরণ। 'বেণু ও বীণা' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রচনার তারিখ না থাকিলেও সেগুলি যে ঐ সময়ের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কবিতাগুলিতে আশা ও উৎসাহের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে—

বঙ্গ সাগরে করি' আজি স্নান
গাহিছে সমীর প্রভাতেরি গান
জুড়ায় নয়ান জুড়ায় পরাণ
হাস রে জগৎ হাস !
টুটেছে তন্দ্রা গিয়েছে স্বপন
ওই শোন শোন কল আলাপন
উঠিবে অচিরে উজল তপন
নাহি রে নাহি ত্রাস।

তাঁহার 'কোন্ দেশে' কবিতাটিও এই সময়ের—

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দ'লতে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

স্বদেশের দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় লইয়া কবি সাধন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। স্বদেশীর যুগে এক আশার আলোক তাঁহাকে মুগ্ধ ও উল্লসিত করিয়াছিল। কিন্তু এই যে মোহ এবং উল্লাস, ইহা কঠোর সাধনার বিষয়। কেবল মুখের কথা বা সাময়িক উত্তেজনায় ইহা হইবার নহে। স্বদেশের কল্যাণ ব্রতে আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রথম যৌবনের স্বপ্ন ও উল্লাস লইয়া যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহারা যদি সাধনার প্রকৃত পথ না পায়, তাহা হইলে হিতে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। কবি ইহা বুঝিয়াছিলেন। আমরা যে আমাদের ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের একটা বিশিষ্টতা আছে ইহা অতি সত্য। সেই বিশিষ্টতার গৌরব-পতাকা বহন করিয়া বিশ্বমানবের সভাতলে আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই বিশিষ্টতার পরিচয় কৈ ? আমরা যে একেবারেই আত্মবিস্মৃত। অন্ধ ভক্তিতে কার্য্য হইবে না, কেবল গোলযোগ ও বিপত্তি হইবে। চক্ষুষ্মতী ভক্তির প্রয়োজন। কিন্তু আজ ইহা সাধন-সাপেক্ষ। সেই সাধনার আয়োজনের জন্য কবি 'হোমশিখা' প্রজ্জ্বলিত করিলেন।

এই গ্রন্থ ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল মন্ত্র—আত্মানং বিদ্ধি। ইহা কবি গ্রন্থের ললাটে নিজেই লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি অক্ষয়কুমারের সাধনা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া একটা পরিণতির অন্বেষণ করিয়াছে। কবি নিজেই তাঁহার পিতামহের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে বলিয়া গিয়াছেন

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী ! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর ; গরুড় সে জ্ঞান পিপাসায়।

অক্ষয়কুমার, বেদের অভ্রান্ততা খণ্ডন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক সাধনার মধ্যেই যে আমাদের ভারতীয় সাধনার ও জাতীয় বিশিষ্টতার মূল রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং, বেদকে আমরা গ্রহণ করিব, তবে ত্রিবেদী ঠাকুরের মত, চন্দনে ও সিন্দূরে বেদের অক্ষরগুলি ঢাকিয়া, কেবল পূজা করিয়া ভক্তি দেখাইলে হইবে না।

'হোমশিখা' গ্রন্থের সমুদয় কবিতাগুলিই, বৈদিক ঋষির সাধনাকে আমাদের জীবনে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান উপেক্ষণীয় নহে, পরন্তু, বিশেষরূপে গ্রহণীয়। এ যুগের কবির ভাবুকতা কেবলমাত্র কল্পনার অলস-পক্ষে ভর দিয়া এক অনির্দ্দেশ্য স্বপ্নরাজ্যের অভিমুখী হইবে না, বৈজ্ঞানিকী সাধনার রসপানে পুষ্ট হইয়া দেবলোকের দ্যুতি আহরণ পূর্ব্বক, এই বাস্তব জীবনকে সুষমা-মণ্ডিত করিতে হইবে। বাস্তবের করুণ আহ্বান, সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া আজ অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এ আহ্বান যাহার কর্ণে পঁহুছে নাই, এ আহ্বানে যাহার হৃদয় গলে নাই, তাহাকে যুগবাণীর প্রচারক বলা যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ, দুঃস্থ ও অত্যাচার পীড়িত মানবের এই করুণ আর্ত্তনাদ বিশেষ করিয়াই শুনিয়াছিলেন। মানবের উপরে তাঁহার বিশ্বাসও ছিল। 'বেণু ও বীণা' গ্রন্থে, 'ধর্ম্মবট', 'অন্ধশিশু', 'অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী', 'বিকলাঙ্গী' প্রভৃতি কবিতা এই ভাবের দ্যোতক। সুতরাং তিনি, মানবতার যথার্থ কবি। এই মানবতা ও বৈজ্ঞানিকতা, 'সবিতা' নামক কবিতার মর্ম্মবাণী। আর্য্য ঋষির সূর্য্য উপাসনা, ভারতের গায়ত্রী-মন্ত্রে বুদ্ধি-বিধাতার উপাসনা কোন অতীতের কথা। আজ সেই উপাসনা নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নব্যভারতে উপস্থিত।

সত্যেন্দ্রনাথ, এই উপাসনার মর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশবাসীকে এই উপাসনায় দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। এই সে ভারতবর্ষ—

হেথায় মানব-মনে প্রথম বিকাশ
সৌন্দর্য্য—কবিতা—মধুগান ;
হেথায় শিথিল নর জ্ঞানের আদর,
সভ্যতার প্রথম সোপান।
জগতের ইতিহাসে,
স্বর্ণাক্ষরে পুরোদেশে
লিখে রাখ ভারতের নাম,
জগতের জ্ঞান-গুরু পুণ্যময় ধাম !

কিন্তু, আজ আর সেদিন নাই। ভারতের আলোকে গ্রীস চীন মিসর রোম পারস্য আলোকিত ও গৌরবান্বিত হইল ;—কিন্তু ভারতের সে আলো ভারতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সত্যেন্দ্রনাথের 'সবিতা'র আরাধনা বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানান্বেষণ। ভারতবর্ষে আজ এই জ্ঞান-পিপাসা আবশ্যক।

'হোমশিখা' গ্রন্থে কবি আত্মস্থ হইয়া সঠিক আত্মজ্ঞানের ভূমিতে আসন পাতিয়া আমাদিগকে জ্ঞানান্বেষণে উদ্বোধিত করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলেন। ইহাই স্বদেশ প্রেমের প্রকৃত সাধন—সাধন ব্যতীত সিদ্ধি হইবে না।

এইবার সত্যেন্দ্রনাথের সাধন জীবনের তৃতীয় স্তর। আজ বিশ্বমানবের মহামিলনের দিন। কোনও জাতি কোনও সমাজ কোনও ধর্ম্ম আর একক থাকিবে না। প্রত্যেককেই নিজের বিশিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং সেই বিশিষ্টতা লইয়া সকলের সঙ্গে মিত্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরের ঐক্যতানে যোগ দিতে হইবে। সুতরাং যেমন আপনাকে জানিব, সাধনার দ্বারায় আপনাকে দৃঢ় ও পুষ্ট করিব, তেমনই বিশ্বমানবের বৈচিত্র্যময় সাধন কাননের যাহা কিছু মূল্যবান,স্বাস্থ্যকর,—বিচার পূর্ব্বক তাহাও আদরে গ্রহণ করিব।

'হোমশিখার' পর সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থসলিল' ও 'তীর্থ রেণু' প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থ 'মণিমঞ্জুষা।' গদ্য গ্রন্থ 'চীনের ধূপ' ও উপন্যাস 'জন্মদুঃখী' এক শ্রেণীর গ্রন্থ। তিনি কত দেশের কত কবির কত সাধু ও কত মহাপুরুষের গ্রন্থ কেবল যে পাঠ করিয়াছেন তাহা নহে, কিরূপ স্বাভাবিক ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয়। সাহিত্য সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সরল ও সহজ হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।" অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর ভ্রান্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা শিল্প কার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টি কার্য্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে তোমার এই অনুবাদগুলি প্রবাসী নহে, ইহাঁরা অধিবাসীর সমস্ত অধিকারই পাইয়াছে, ইহাদের পূর্ব্ব নিবাসের পাস্ দেখাইয়া চলিতে হইবে না।"

'তীর্থ সলিলের' মুখবন্ধ কবিতায় কবি লিখিয়াছেন—

বিশ্ববাণীর বারতা এনেছি বঙ্গের সভাতলে,
ভ'রেছি আমার সোনার কলস নানা তীর্থের জলে ;
ওগো তোরা আয় আয়।
নিখিল কবির সঙ্গীত ওঠে বঙ্গের বন ছায় !

* * * *

নানাদেশে যাঁ'রা ছিল গো ছিন্ন, ছিল নানা মত ভাষা—
নানা কালে যাঁ'রা ছিল বিভিন্ন, না ছিল মিলন আশা,
তা'রা আজি এক ঠাঁই !
আকুল হৃদয়ে করে কোলাকুলি পুলকের সীমা নাই।

বঙ্গের সাধন-ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের এই মহামিলন সকলে সফল হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যুগবাণীর প্রচারক রূপে আমরা সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব ও সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিলাম। যে অংশকে তাঁহার খাঁটি কবিত্ব বলা যায়, সে অংশের বিস্তৃত আলোচনা, বর্ত্তমান সময়ে না করাই সঙ্গত। ভবিষ্যৎ সে বিষয়ে আলোচনা করিবে। তাঁহার ছন্দ, ভাষা, মানবজীবনের, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের রসস্বাদন-বৈচিত্র্য প্রভৃতি, সে আলোচনার বিষীভূত হইবে।

বঙ্গের আদিম প্রকৃত কবিতা—বৈষ্ণব কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায়, চিরকৈশোরের বসন্তোৎসবের মাধুরী আস্বাদনের বিহ্বলতা ও মত্ততা বড়ই সুন্দর। তাহার পর সুদীর্ঘকাল বঙ্গের কবিত্ব সাধনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরস-গন্ধময়ী এই প্রকৃতি ও সুখদুঃখ এবং আশানৈরাশ্যময় এই বাস্তবজীবন—এই জীবনের বিচিত্র সম্বন্ধ সমূহ এবং অবাধ্য মানবহৃদয় এড় একটা স্থান পায় নাই। আমরা, শুষ্ক বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই ধুলার জগৎকে মায়িক প্রপঞ্চ বলিয়া যেন ঘৃণা করিয়া, কোন্ অজ্ঞাতরাজ্যে চলিয়া যাইতেছিলাম।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা কবিতা সাধারণতঃ, সেই সন্ন্যাস-পন্থার প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার ভাব, সকল কবিতে সমানরূপে দেখা না গেলেও, ইহা যে সাধারণ ভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাকে আমরা, বৈষ্ণবীয় সাধনার পুনরভ্যুদয় বলিতে পারি। স্বর্গের অপ্সরী অভিশপ্তা হইয়া, মর্ত্তলোকে আসিয়া থাকে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ, এই অভিশাপকে অভিশাপ বলিয়া বিবেচনা করেন না—ইহা শাপে বর। অপ্সরীরা ইচ্ছা করিয়াই যেন নাচিতে নাচিতে তালভঙ্গ করে এবং এই অভিশাপ পাইয়া আনন্দিত চিত্তে মর্ত্তে আসিয়া থাকে। আমাদের এই মর্ত্ত্যজীবনে একটা পূর্ণতা নাই সত্য—সুখের সহিত দুঃখ, জীবনের সহিত মরণ—সর্ব্বত্রই মিশিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া মর্ত্তের ধূলি কি ঘৃণা করিবার বস্তু ? এ যুগের কবি বলিয়াছেন, তাহা ঘৃণা করিবার বস্তু ত নহেই, বরং আদরের বস্তু—

আমি পরী অপ্সরী
বিদ্যুৎপর্ণা—
মন্দার কেশে পরি
পারিজাত-কর্ণা ;
নেমে এনু ধরণীতে
ধূলিময় সরণীতে
ক্ষণিকের ফুল নিতে
কাঞ্চন-বর্ণা।
মোরা খুসী নই শুধু
দেবতার অর্ঘ্যে,
কোনমতে রই বঁধু,
স্বর্গের বর্গে।
চির চঞ্চল মন
ছল খোঁজে অগণন,
তাল কাটে অকারণ
খেয়ালের খড়্‌গে।

('তুলির লিখন')

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার আর একটী বিশিষ্টতার উল্লেখ করিলাই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের পৌরাণিক-সাহিত্য অতীব বিশাল। সত্যেন্দ্রনাথ, আমাদের এই পৌরাণিক সাহিত্য বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার রসও আস্বাদ করিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে আখ্যায়িকা ও চিত্র সমূহ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ঠিক্ তাহাদের তাৎপর্য্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবহার, সর্ব্বত্র উপভোগ্য এবং কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালা

শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যো, কার্ত্তিক দাশগুপ্ত, শিবরত্তন মিত্র ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ (পুস্তক হতে)
(১৯০৮ সালের গৃহীত ফটো হইতে)

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাস। বাঙ্গালাদেশের অসংখ্য কিশোর ও বালক বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। এদিকে আনন্দ-ময়ীর উৎসববাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। সেই সময়, সত্যেন্দ্র-নাথের 'গিরিরাণী' কবিতা প্রকাশিত হয়। সহৃদয়তার সহিত সে সময়ে যাঁহারা এই কবিতা পাঠ করিছেন, এই কবিতার মূল্য তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

বছর পরে আস্‌ছে উমা বাজ্‌লো না মোর শাঁক,
উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈণাক ?

এইপ্রকারে কবি ও সাধক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। চির-তারুণ্যের কবি তাঁহার অঞ্জলি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

এই নে আমার অঞ্জলি গো, এই নে আমার অঞ্জলি,
মানস-মরাল জাগ্‌ল আবার উঠল অগাধ হিল্লোলি !
এই নে অশোক, এই নে বকুল
এই নে গো ফুল এই নে মুকুল
মক্তালতার বন যে হল মনের বনের সব গলি।

আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আছে। বর্ষে বর্ষে সাহিত্য-সম্মিলন হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ আছে, গৌড়ীয় বিদ্যা আয়তন আছে। কিন্তু আমাদের যে সমুদয় সাহিত্য-সাধক চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সহিত দেশের পরিচয় করাইবার বিশেষ কোন চেষ্টা নাই। আমরা মফঃস্বল সহরে বসিয়া দেখিতেছি, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিমুখী গতির সহিত দেশের লোকের যেন কোনই সম্বন্ধই নাই। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। এমন এক দল সাহিত্যপ্রচারক কি গড়িয়া তোলা যায় না, এমন একদল সাহিত্য-প্রচারককে কি প্রতি-পালন করা যায় না, যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের নূতন জাতীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন? এই প্রকারের সাহিত্য প্রচার বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ আবশ্যক।

শ্রীশিবরত্তন মিত্র।

ভাদরে

আজ ভাদরের দিবস শেষে শুধু
উদাস প্রাণে আকাশ পানে চাই,
কত তিয়াষ মিটল্‌নাক ভাবি,
কত আশাই, হায়রে, পূরে নাই !
হৃৎ-কাননের কত কলিই হায়
দগ্ধ হলো দৈন্য কুয়াসায়,
কত মুকুল হেসেই ঝরে' গেল
ফল্‌লনাক, হায়রে, কোনোটাই।

চোখের অঝোর অশ্রু ঝরে' ঝরে'
শুক্‌নো মাটী আজকে পাঁকে ঢাকা,
সেই পাঁকে হায় আট্‌কে রয়ে গেল
কত শতই মনোরথের চাকা।
কল্পনারা ছট্‌ফটিয়ে মলো,
পক্ষাঘাতে পক্ষ অবশ হলে',
উড়তে গিয়ে পড়্‌ল ভুঁয়ে লুটে
দিলনাক আকাশ তাদের ঠাঁই।

আজকে জাগে কত মধুর মুখ,
কত আঁখিই পড়ছে আজি মনে !
বৃষ্টিধারার চিকের আড়ে কেউ,
কেউ বা জাগে মেঘের বাতাষনে !
ছিল তারা আমায় ঘিরে ঘিরে
ঘেঁষাঘেঁষি সংসারের এ নীড়ে
তাদের সাথে কত আশাই গেল,
ধুঁকৃছি আমি হেথায় একেলাই !

কতজনে বন্ধ্যা আশাই কত
দিয়েছিল হায় এ হতভাগা,
প্রিয়ায় কত মিথ্যা প্রলোভন,
বন্ধুজনের বুকে কতই দাগা।
বিত্ত, যশের দ্বারে আঘাত হানি
শুধুই অসাড় অবশ হলো পাণি –
আজ ভাদরের ঘনমেঘের মত
ব্যর্থতাতে ভরল জীবন তাই।

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

দেবীর দুয়ারে (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 'মানসী' প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ১৷৹

বহিখানিতে আটটি গল্প আছে—দেবীর দুয়ারে, তেজারতী, গরীবের মেয়ে, ভা'য়ের কোলে, অরুণা, সকলহারা, সোণা ভুমী এবং ঘরের লক্ষ্মী।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে লেখক বেশ একটু কবিত্ব-শক্তি লইয়া উপন্যাসক্ষেত্রে নামিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব এত বেশী যে অনেক সময় তাহা গল্পের প্রবাহ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যেখানে তিনি প্রেমের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে রং এত বেশী পড়িয়াছে যে চরিত্র ও ঘটনার রেখাগুলি কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কতকটা অবাস্তবতার রাজ্যে তিনি আমা-দিগকে লইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু যেখানে প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাংসারিক বিষয় লইয়া তিনি নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অসংযম ও ভাবের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তাঁর চলিয়া গিয়াছে। সাদাসিধে রচনায় তাঁর বেশ কথায় বাঁধুনী হয়, এবং গল্পের আখ্যানবস্তুও বেশ আঁটসাঁট হইয়া কৌতুহলোদ্দীপক হইয়া উঠে। আর তখন তাঁর দু'চারি ছত্রে যে কবিত্ব থেকে তাহা পাঠকচিত্তে মুক্তার মত এক

একটা উজ্জ্বল দাগ রাখিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল লাগিয়াছে, "ভৈজারস্তি" গল্পটি। শিশু ভোলাকে তিনি মাঝে দুই এক ছত্রে যেরূপ আঁকিয়াছেন, সেরূপ চিত্র বঙ্গীয় শিশু-সাহিত্যে বিরল। এই তিন বছরের ছেলেটি হঠাৎ ডোবার জলে পড়িয়া গিয়া গা-ময় কাদা মাখিয় মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ের ভর্ৎসনায় কর্ণপাত না করিয়া সে কৈফিয়ৎস্বরূপ একটিমাত্র জবাব দিল—"আমি ত পা ধুতে গেছলুম।" ইহার পর ভোলাকে আমরা তার বাপের কাছে দেখিতে পাই "ভোলা মাথার কাছে বসে একটা হলদে চাদর নিয়ে তার বাবার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিচ্ছে, একবার বাঁধছে, একবার খুলছে।" তার বাবার সঙ্গে একজন সম্মানিত বৃদ্ধ (বড় কর্ত্তা) দেখা করিতে আসিয়াছেন। তখন লেখক আবার দুটি ছত্রে ভোলাকে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন—"ভোলা বেগতিক দেখে বড়কর্ত্তার লাঠিটি নিয়ে রান্নাঘরে তার মার কাছে গিয়ে বসে রইল।" মায়ের এক সই সেই বাড়ীতে আসিয়া ভোলাকে দেখিলেন। "বা রে ছেলে।" বলে মাসীমা আস্তে আস্তে তার কুট কুটে কাণ দুটি ম'লে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন।" আর একদিন দেখা গেল "ভোলা একটা কাটি নিয়ে তার বাবার কাণে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।"

এইরূপ অনাড়ম্বর ও সহজ চিত্র আঁকিবার রসময় বাবুর বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। এবং এই জন্যই আমার মনে হয়, উপন্যাসক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্য তাঁর নিকট অনেকটা প্রত্যাশা করিবে। মাঝে মাঝে এক আধটি টানে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য ছবির মতন আঁকিয়া ফেলেন,—"প্রাচীরের গায়ে একটা পেঁপে গাছ, সূর্য্যদেব সেই পেঁপে গাছের উপর উঠতে না উঠতেই নির্ম্মলা স্নান করে এসেছে।" এইরূপ ছোট ছোট কথায় এক একটা আলোকচিত্র খাড়া করিবার পরিচয় আমরা পুস্তকখানির অনেক জায়গায় পাইয়াছি।

কিন্তু এ ছাড়াও রসময় বাবুর উচ্চতর অন্তর্দৃষ্টি কয়েক জায়গায় ধরা পড়িয়াছে। যখন শিশু ভোলা সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত, তখন তার দরিদ্র পিতামাতার কথা বলিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, রোগীর পার্শ্বে তাঁরা বসিয়া আছেন—"তাঁরা বড় লোক না গরীব সে কথা আর তাদের মনে নাই।" এই একটা কথায় তাদের উৎকণ্ঠা কেমন পূর্ণভাবে দেখান হইয়াছে। "সোনার তরী"তে দেয়ালের গায়ে ঝুলানো একটা ছবি রাসবিহারীর মনে কর্ম্মের প্রেরণা দিয়া গেল, "একটা কাঠুরে মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে বনের মাঝে কাট কাটছে. একটা ভল্লুক ঘোঁত ঘোঁত করে পাশ দিয়ে চলে গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; এই দেখে রাসবিহারী কেমন হয়ে গেল, মেঝের উপর পাচালি করতে মনে মনে বলতে লাগল—"খাটব, প্রাণ দোব।"

এক বন্ধু অতি দুর্দ্দিনে এক বিপন্ন পরিবারকে কিছু টাকা পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, বড় অসময়ে সেই দান পাওয়া গেল। লেখক এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"হে দেবতার গুপ্তচর। বিপদের অন্ধকারে মাঝে মাঝে তোমাদের দেখা পাই।" এই সকল লেখায় রসময় বাবু যখন প্রকৃতির রহস্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তখন গল্প ভুলিয়া আমরা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবুক হইয়া পড়ি। 'ঘরের লক্ষ্মী' গল্পটিতে তিনি পাঠকে কাঁদাইয়া ছাড়িবেন, একথা নিশ্চিত বলিতে পারি। পাঠকগণও ঔপন্যাসিকদের হাতে অনেক সময় এই শাস্তিই চান।

মোট কথা এই লেখকের প্রকৃত গুণপনা যদি আমাদের আকর্ষণ না করিত, তবে তাঁর স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনের বাহুল্য সত্ত্বেও আমরা তৎসম্বন্ধে এতগুলি কথা লিখিতাম না, তিনি আমাদিগের চিত্তে যে আশার উদ্রেক করিয়াছেন. আমরা অনেক ক্ষণ তার পূরণের আশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সাহিত্য-সমাচার

ঢাকা পশ্চিমপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন দাস (গ্রাহক নং ৫৯১৭) লিখিয়াছেন :—

বিগত আষাঢ় সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত অনন্তলাল সান্যাল মহাশয় লিখিত "মেবার পতনের সমস্যা ও মীমাংসা" প্রবন্ধে তিনি "অমর সিংহ"-এর স্থানে "সমরসিংহ" ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতনে" সমরসিংহ নামক কোন নায়কের উল্লেখ নাই। সমর ও অমরে যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। অমর সিংহ হইলেন মেবারের রাণা বীরপুঙ্গব প্রতাপসিংহের তনয়, আর সমরসিংহ হইলেন

চিতোরের মহারাণা, দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দুরাজা মহাবীর পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি। কান্যকুব্জের জয়চন্দ্রের আহ্বানে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি শ্যালকের সঙ্গে যোগদান করিয়া আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিবার প্রয়াস পান। নারায়ণ (বা তিরাওরি) নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রের দুই যুদ্ধেই ইনি শ্যালকের সাহার্য্যার্থ উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বারের যুদ্ধে ইঁহারই শৌর্য্যপ্রভাবে ও অপূর্ব্ব রণকৌশলে মহম্মদ ঘোরীর পরাজয় ঘটে। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে ইনি পৃথ্বীরাজের সহিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (১১৯৩)।"

(মন্তব্য—অনন্ত বাবু ভুল করেন নাই—ছাপার ভুলেই ওরূপ হইয়াছে। মঃ মঃ সঃ।)

হাওড়া শিবপুর হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন :—

"মানসী ও মর্ম্মবাণীর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার "প্রবাসীর পত্রে" লিখিয়াছেন, "King-maker Warwick সময় বুঝিয়া Cromwellএর সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের দিন কিনিয়া ছিলেন।" কিন্তু Warwick the King-maker ত Cromwellএর সমসাময়িক নহেন। King-maker Warwick, Henry VI ও Edward IV এর সমসাময়িক ছিলেন। Cromwellএর আবির্ভাব তাহার বহুকাল পরে। Shakespeareএর Henry VI (3d pt.) নাটকে এই Warwickএর উল্লেখ আছে।"

শান্তিপুর বান্ধব নাট্যসমাজ আগামী বার্ষিক উৎসব সম্মিলনী উপলক্ষে রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদকগুলি বিতরণ করিবেন। রচনাগুলি আগামী ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে সম্পাদকের নিকট পৌঁছান দরকার।

১। স্বর্ণ পদক—বিষয়—'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'।

২। রৌপ্য পদক—বিষয়—'ধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবা'

৩। রৌপ্য পদক—বিষয় 'মানব জীবনের সার্থকতা'

শেষোক্ত বিষয়টী কেবল স্কুলের ছাত্রগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমুকুন্দকৃষ্ণ বানার্জ্জী বি, এ
সম্পাদক, বান্ধব নাট্য সমাজ, শান্তিপুর (নদীয়া)।

"নীতিশিক্ষা প্রদায়িনী সভা ও সুহৃদ্ লাইব্রেরী বর্ত্তমান বর্ষে রচনার প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুরস্কার-ঘোষণা করিয়াছেন—

১। দয়াল স্মৃতি পদক (সুবর্ণ)

বিষয়—বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে হাস্যরস।

২। কানাই-স্মৃতি পদক (স্বর্ণগর্ভ)

বিষয়—সমাজ সংস্কারে দ্বিজেন্দ্রলাল।

৩। প্রকাশচন্দ্র স্মৃতি পদক (রৌপ্য)

বিষয়—এষা কাব্যে অক্ষয়কুমারের পরিচয়।

৪। কৃষ্ণদাস পাল রৌপ্য পদক।

বিষয়—The Economic Condition of Bengal in the 17th Century."

৫। ব্রজদুলাল স্মৃতি পদক (রৌপ্য)

বিষয়—The practical way of imparting Commercial Education in Bengal.

(৪র্থ ও ৫ম সংখ্যক প্রবন্ধ দুইটী ইংরাজীতে লিখিতে হইবে।)

৬। স্বর্ণমণি রৌপ্য পদক।

বিষয়—একটী ছোট গল্পে বর্ত্তমান পল্লীজীবনের একটী নিখুঁত চিত্র।

৭। নন্দরাণী স্মৃতি পদক (রৌপ্য)

বিষয়—গৃহশিল্পে নারী জাতির প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা।

প্রবন্ধগুলি ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে ১২নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
২য় খণ্ড

আশ্বিন, ১৩২৯

২য় খণ্ড
৩য় সংখ্যা

বঙ্কিমবাবুর কথা

আমি যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি, তখন একদিন শুনিলাম যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা নীচের ক্লাসগুলিতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের অলঙ্কার বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার ভগিনীপতি ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্বের কথা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম; বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী পড়িয়াছিলাম। তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দেখিতে গেলাম। যেখানে জিমন্যাষ্টিক হইত তথায় তিনজনকে দেখিলাম; বেশভূষার খুব পরিপাট্য। আমার এক বন্ধু বলিল, "ওরা বড়লোক; সকলের সহিত কথা কহে না।" আমি অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিচয় দিলাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বড়টী শ্রীশ (বঙ্কিমবাবুর জ্যেষ্ঠ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র), দ্বিতীয়টী জ্যোতিষ (মেজ ভাই ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) এবং ছোটটী বিপিন (কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র)। আমার পিসতুতো ভাইয়ের সহিত শ্রীশের অল্প দিনেই খুব ভাব হইল। আমিও তাহার সহিত কয়েকবার কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিলাম এবং একবার বঙ্কিমবাবুকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালেশ্বরে এবং মেদিনীপুরে নিমক মহলে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। যাদব বাবু চারিজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতা—এবং রায় বাহাদুর, দোল দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত করিতেন। তাঁহার বাটীতে সবই বড়মানুষী কায়দা এবং ব্যবস্থা দেখিলাম।

যখন বঙ্কিমবাবু হুগলীতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, তখন কলিকাতার একটা থিয়েটর (গ্রেট ন্যাশন্যাল ?) চুঁচুড়ায় খালি বারিকে আসিয়া অভিনয় করিল। তখন শুনিয়া-

ছিলাম যে অভিনেত্রী গোলাপীর অভিনয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্কিমবাবু তাহাকে একছড়া চেনহার পুরস্কার দিয়াছিলেন। বড়মানুষী কায়দার সহিত ইহার মিল থাইতে পারে তাহা তখন জানিতাম না বলিয়া, ব্যাপারটা ভাল লাগে নাই। আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত শ্রেণীর পবিত্র (পিউরিটানিক) ধরণ অনেকটা রক্ষিত থাকায় আমার মনে আইসে নাই যে রাজা রাজড়ার ও বড়মানুষদের নিকট "কীর্ত্তনী"রা শাল বক্‌শিস্ পায়; পরে শুনিলাম যে বড়লাট লিটন সার্কাসের মিস্ ভিক্টোরিয়া কুককে "এম্প্রেস অব্ দি এরীনা" উপাধিযুক্ত একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য দিল্লীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া" পদবী গ্রহণের পরেই ঘটে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় শিষ্টাচার কি বলে তাহা অবশ্য আমি আজিও অবগত নহি।

বঙ্কিমবাবুকে পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনিও হুগলীতে থাকিতে প্রায় প্রত্যহই আসিয়া পিতৃদেবের নিকট বসিতেন। হুগলী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ৺ গোপালচন্দ্র গুপ্ত এবং নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরা উহাঁদের সহিত মিলিয়া সংস্কৃত কাব্য নাটক এবং স্তবাদির সৌন্দর্য্য এবং গভীরতার আলোচনা করিতেন। "আজ বঙ্কিম আইসে নাই, আজ আমাদের তেমন সুখ হইল না"—দুই একদিন এরূপ কথা পিতৃদেবকে বলিতে শুনিয়াছি।

আমার যখন নওয়াখালিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে নিয়োগের সংবাদ আসিল (অক্টোবর ১৮৮০), তখন একদিন বঙ্কিমবাবু আমাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত হুগলী কাছারীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মোকদ্দমা কিরূপে হয়, সাক্ষী কোথায় দাঁড়াইয়া বলে, জেরা কিরূপ ব্যাপার, কিরূপে জবানবন্দী লিখিতে হয় এ সমস্তই কাছে বসাইয়া দেখাইলেন। তাহার পর আফিসে লইয়া গিয়া, কিরূপ চিঠিপত্রের উপর কিরূপ হুকুম দেওয়া হয় এবং তদনুসারে আফিস হইতে কিরূপে মুসাবিদা হইয়া আইসে, তাহা কিরূপে সংশোধন হয় এবং নকল হইয়া বাহির হইয়া যায়, কতটা সময়ের মধ্যে এ সমস্ত সাধরণতঃ হইয়া যাওয়া উচিত—তাহা বুঝাইলেন। রোডসেস্ আফিসে গিয়া, কালেক্টারির নথি সম্বন্ধে কি করিতে হয় তাহাও কিছু দেখাইলেন। ফিরিবার সময় গাড়ীতে বলিলেন, "তোমার পিতা বলিয়াছিলেন, 'বাড়ী হইতে এক মাইল মাত্র দূরে কাছারী; কিন্তু ও কখনও এত বয়সেও কাছারীর সময় তথায় যায় নাই; একেবারে অপরিচিত স্থানে গিয়া অজ্ঞাত কার্য্য করিতে, ভিতরে একটু ভয় পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি কাছারীর একটু দেখাইয়া সাহস দিও।' এখন সাহস পাইতেছ কি? গিয়া কতকগুলি পুরাতন নথি পড়িও। পুরাতন চিঠিপত্র আফিসে পড়িও। ধারণটা সহজেই বুঝিতে পারিবে।" সর্ব্বদিগ্‌দর্শী কৃপাময় পিতৃদেব যে কিরূপে হৃদয়ের সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিতেন, তাহা এ ক্ষেত্রেও দেখিলাম এবং বঙ্কিমবাবুর সমস্ত দিনের যত্নে বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম। পিতৃদেব বলিলেন, "এই চাকরীর সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কারের কাছে তোমার নূতন কার্য্য সম্বন্ধে হাতে খড়ি দেওয়াইলাম।"

যখন (১৮৮২) নওয়াখালিতে চাকরীর পর হাওড়ায় বদলী হইয়া আসিলাম, তখন বঙ্কিমবাবু হওড়ায়। মিঃ সি, ই, বকল্যাণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। শুনিলাম উভয়ে বনিতেছে না। তখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চে একজন করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি (প্রেসিডেণ্ট) থাকিতেন। বকল্যাণ্ড সাহেব হুকুম দিলেন যে, কোন মোকদ্দমায় এক টাকার কম জরিমানা করা হইবে না। ঐ সাধারণ হুকুম পাইয়া, বঙ্কিমবাবু চটিয়া গিয়া, ফুটপাথে বোঝা নামান, বেলাইনে ঘোড়ার গাড়ি রাখা, অজ্ঞলোকের রাস্তার ধারে প্রস্রাব প্রভৃতি মোকদ্দমায় চারি আনা বা আট আনার পরিবর্ত্তে সেদিন নাকি দুই আনাও জরিমানা করিয়াছিলেন; এবং একটা মিউনিসিপালিটীর মোকদ্দমার নোটিসে কদর্য্য আদালতী বাঙ্গলায় লিখিত "জলনীয়" শব্দের অশুদ্ধি ধরিয়া আসামী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

বকল্যাণ্ড সাহেব রাগের মাথায় নথির গায়ে লিখিলেন, 'ইনসফারেবল্ পেডাণ্ট্রি' (অসহনীয় বিদ্যাফলান্)। * বঙ্কিমবাবু তাঁহার রায়ের গায়ে আমলাদের দেখাইয়া ওরূপ মন্তব্য লেখার প্রতিবাদ করিলেন; এবং হয় উহা কাটিয়া দেওয়া হউক, না হয় কমিশনর সাহেবের হুকুম জন্য সকল কাগজ পত্র পাঠান হউক এরূপ জিদ করিলেন। কমিশনর বীম্‌স্ সাহেব বঙ্কিমবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শেষে টিপ্পনীটীর প্রত্যাহারই হয়।

অল্পদিন মধ্যেই আমার উপর মিউনিসিপ্যাল বেঞ্চে বসার হুকুম হইল। বঙ্কিমবাবুর সহিত আর সর্ব্বদা খিট্‌মিটির কারণ না থাকায় তাঁহার সহিত বকল্যাণ্ড সাহেবের চটাচটি একটু কমিয়া আসিল। বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল অণ্ডার দি লেফটেনেণ্ট গভরর্ণস্" পুস্তকে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসাই করিয়াছিলেন। নওয়াখালিতে থাকিতেই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মোকর্দ্দমার সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহাতে চটিতে নাই; মনে করিতে হয় যে তখন সাহেব তাঁহার পুলিসের কর্ত্তার (হেড অব্ দি পুলিস) বা সরকারী উকিলের (পাবলিক প্রসিকিউটারের) উপরওয়ালার 'মূর্ত্তিতে' আবির্ভূত; তাঁহার কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, তাহার পর ঠিক যাহা উচিত তাহাই করিতে হয়; কিছুতেই একটু বেশীও নয় একটু কমও নয়।" সুতরাং অমি বকল্যাণ্ড সাহেবের সার্কুলার সত্ত্বেও চারি আনা আট আনা যথাযোগ্য জরিমানাই করিলাম। সাহেবের "শ্লিপ" আসিল—"আমার অমুক তারিখের সার্কুলর দেখ। এক টাকার কম জরিমানা অসঙ্গত।" সেই কাগজেই আমি বিচারকের স্বাধীনতা এবং লোকের অবস্থার বিভিন্নতা সম্বন্ধে দুই লাইন কস কস করিয়া লিখিয়া ফেলিতেই মনে হইল যে, উচ্চতর কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে যে বিনীত ধরণ সর্ব্বদা রক্ষার প্রয়োজন, শব্দ নির্ব্বাচনে যেরূপ ঘটিতেছে না; "ঝাঁজ" প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং ন্যায়পক্ষে থাকিয়াও, অন্যায্য 'ধরণ' জন্য অনর্থক হারিয়া যাইব। তখন আর কিছু না লিখিয়া, পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট গিয়া কাগজটা দেখাইলাম। তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালী যখন বলে 'রাগের মাথায় করিয়া ফেলিয়াছিলাম', আহার অর্থ এই যে, তখন মাথা বা মস্তিষ্ক প্রকৃতাবস্থায় ছিল না, বুদ্ধি বিচলিত ছিল এবং সে জন্য তখনকার কার্য্যে এখন সে লজ্জিত। বঙ্কিম একজন প্রকৃত বড়লোক; তিনিও রাগের মাথায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন—জিদে দুই আনা জরিমানা করিতেছিলেন, অথচ ঝগড়ার পূর্ব্বে চারি আনার কম করেন নাই। তুমিও ভুল করিতে যাইতেছিলে। রাগের মাথায় আফিসের কাগজে কিছু লিখিতে নাই; অপর কাগজে কিছু লিখিয়া, এক রাত্রি নিদ্রা গিয়া, তাহার পর সেই লেখাটার [নিজেই একটু বিরূপ বিদেশী উপরওয়ালা সাজিয়া] ভাষার এবং ধরণের খুঁৎ অনুসন্ধান করিতে হয় এবং নিখুঁৎভাবে সংশোধন করিতে হয়; তাহার পর 'চিত্রগুপ্তের' চক্ষে উহার বিষয়টা ন্যায়ের পথে ঠিক আছে কি না পুনর্ব্বার দেখিয়া লইতে হয়, যেন ভাষার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া আসলে ত্রুটি না হয়, সত্য পথ ঠিক থাকে। কাজটা নিখুঁৎ এবং ধরণ বিনীত - ইহাই ত ভদ্রলোকের পক্ষে সঙ্গত। এক্ষেত্রে কিছুই লেখার প্রয়োজন ছিল না, তবে সার্কুলারের কথা যখন জানিতে, তখন প্রথম দিনেই রায়টা সাবহিত এবং বিস্তারিত ভাবে লেখা একান্তই উচিত ছিল। তাহা হইলে হয়ত শ্লিপ আসিত না। 'দোষ স্বীকার করাতে চারি আনা জরিমানা' এরূপ অলস ভাবের রায় ঐ সার্কুলারের পর আর চলে

---

* "বঙ্কিম জীবনী" নামক সুলিখিত পুস্তকে আছে যে, কোনও বুড়ার গোলপাতায় চাল সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটির নোটিসে 'কম্বষ্টিবল' শব্দের অনুবাদে "জলীয়" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল, বঙ্কিমবাবু নোটিসের ভাষায় এই অশুদ্ধি জন্য বুড়াকে খালাস দিয়াছিলেন; তাহাতে বকল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রাজ্ ভ্যানিটি ইন্ দি নলেজ অব্ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ হ্যাজ মিস্‌লেড হিজ জজমেণ্ট।' আমি স্বচক্ষে সে নোটিশ বা বকল্যাণ্ড সাহেবের টিপ্পনী দেখি নাই; কিন্তু অল্পদিন পরেই হাওড়ায় আসিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই উপরে লিখিলাম। ঘটনার সহিত উভয় বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নাই।

না। লিখিতে হইবে—'রাস্তার ধারে প্রস্রাব করা স্বীকার করিতেছে; কলের কুলি; রোজ আট আনা রোজগার করে; আজ কাছারী আসিতে হওয়ায় এবং কল্য আটক হওয়ায় যে ক্ষতি ও কষ্ট পাইল তাহাতে আর এরূপ করার ইচ্ছা উহার পক্ষে সম্ভব নয়; চারি আনা জরিমানাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।' বিভিন্ন মোকদ্দমায় এইরূপ ভাবে বিস্তারিত লিখিতে গিয়া যেখানে দেখিবে জরিমানা একটাকা বা অধিকই ন্যায্য—যেমন ভদ্রলোকের মাতলামি প্রভৃতি—তথায় অবশ্য তাহাও করিবে।"

সাহেবের স্লিপে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া তুলিয়া, তাহার উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া শুধু 'দেখিলাম' (সীন) এই কথাই লিখিলাম। পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন, "সাহেব বেশ বুঝিতে পারিবেন যে চটিয়া কি সব লিখিয়াছিলে; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। সংযমের ভিতরে তেজকে শ্রদ্ধা করিতে হয়; এক পক্ষের অসংযমেই প্রতিপক্ষের সুবিধা।"

লোকে আজকাল বলে, গুরুর কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত মোটা কথাও ত মনে হয় না! পিতৃদেবের কথায় নিখুঁত ভাবে কর্ত্তব্য বুঝিলাম এবং পরবর্ত্তী বেঞ্চে সেই রূপেই কার্য্য করিলাম। বকল্যাণ্ড সাহেব ।০ আনা ॥০ আনা জরিমানা হইয়াছে রেজেষ্টারী হইতে দেখিয়া, চটিয়া নথি তলব করিলেন। পেস্কারের নিকট শুনিলাম যে আমার সকল রায়গুলি পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তিন হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন—এবং শেষে বলিয়াছিলেন "হি ইজ ক্লেভার" (বুদ্ধিমান বটে)। আর কখনও ঐ সার্কুলারের কথা হাওড়ায় কাহারও সম্বন্ধে উঠে নাই। সাহেব পূর্ব্ব হইতেই আমার উপর একটু অনুকূল ছিলেন।

হাওড়ায় কলকারখানা, ডক, রেলওয়েতে সহস্র সহস্র লোক কাজ করে। দুর্ঘটনা, হাত পা 'কাটিয়া যাওয়া লাগিয়াই থাকে। বঙ্কিমবাবুর উপরই 'ডাইয়িং ডিক্লারেশন' [মৃত্যুকালীন উক্তি] লেখার ভার পড়িয়াছিল। রাত্রে শীতকালে হঠাৎ ডাকমত দূরস্থ হাঁসপাতালে যাওয়ার কষ্ট তাঁহার হইত। তাঁহার চাপরাসীকে আমি বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে বেশী রাত্রে ওরূপ কাগজ আসিলে তাহা যেন আমার কাছে লইয়া আইসে, আমি কাজ করিয়া দিব। বার তিনেক ঐরূপ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার অধিক বয়সে কিন্তু তোমার জন্য এরূপ কেহ করিবে এ আশা করিও না।" আমি বলিয়াছিলাম, "ক্রমেই দেশের লোক খারাপ হইবে এই কথা বলিতেছেন? আমরা ভোগে পাপের ক্ষয় করিয়া ঝাড়িয়া উঠিতে পারিব, এ আশাটাও করিব না?" বঙ্কিমবাবুর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, "ব্যক্তিগত আশাভঙ্গের ও ক্ষোভের কথা বলিতেছিলাম। দেশের জন্য আশা করিবে বই কি!"

বকল্যাণ্ড সাহেব তিন মাসের জন্য গয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনেকটা নিকট পর্য্যন্ত গাড়ী যাইতে পারে এরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার অনুরোধে গয়ালীরা বিনামূল্যে জমি দিয়াছিল। আর্মষ্ট্রং সাহেব হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন। সেই সময় আমার নিকট একটী আবগারীর মোকদ্দমা হয়। কলিকাতা এবং হাওড়ার আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইগলটন্ সাহেব বাদী। তিনি বলিলেন যে আধুলিতে ছুরি দ্বারা "হ" চিহ্ন করিয়া গোয়েন্দাকে দিয়াছিলেন, গোয়েন্দা আসামীর নিকট হইতে সেই আধুলি দিয়া গাঁজা কিনিয়া আনিয়া দেয়; তিনি অল্প দূরেই ছিলেন। অবিলম্বে গিয়া খানাতলাসী করিলেন, তাঁহার দাগ দেওয়া আধুলি দোকানির জলখাবারের দোকানে পাওয়া গেল।—তাঁহাকে আসামীর পক্ষ হইতে ভাল উকিলে খুবই জেরা করিতে লাগিলেন। শিয়ালদহে, কলিকাতায় এবং হাওড়ায় কত আবগারী মোকদ্দমায় তাঁহার এবং ঐ গোয়েন্দার আসামী ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার তালিকা উকীলের হস্তে প্রস্তুত ছিল; সেই সকল প্রশ্ন হইল। সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনতিদূরবর্ত্তী দোকানে গিয়া সাহেবের বর্ণনার সহিত ঘটনার স্থান মিলাইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত পড়িল। গাড়ী করিয়া সকলে তথায় গিয়া, একজনকে দিয়া নক্সা প্রস্তু

করাইয়া লইলাম এবং তাহাকে হলফ দিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম যে নক্সা ঠিক। ইগলটন সাহেবকে বলা হইল যে নক্সা দেখিয়া কোথাও কিছু বেঠিক থাকিলে ঐ সরেজমিনের সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন। সাহেব নক্সাটা স্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন এবং বলিলেন যে জেরা করিবেন না। বস্তুতঃ সাহেব কাছারীতে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, স্থানটা তাহা হইতে একান্তই বিভিন্নরূপ দেখা গেল। থানাতল্লাসীর সময় সাহেব এবং গোয়েন্দা, নিরপেক্ষ সাক্ষীর নিকট নিজেদের অঙ্গতালাসি না দিয়াই দোকানে ঢুকিয়াছিলেন, ইহাও প্রমাণিত হইল। আমি আসামী খালাস দিলাম। অপ্রতিভ হইয়া সাহেব আমার উপরেও চটিয়া গেলেন। তিনি অন্যান্য মোকদ্দমার ফল সম্বন্ধে জেরা থামাইয়া দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন—আমি তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই। ইগলটন সাহেব কলিকাতার কলেক্টরের নিকট দরখাস্তে লিখিলেন যে, তিনি হাওড়ায় আমার এজলাসে বড়ই অপমানিত হইয়াছেন; হাওড়ায় আর মোকদ্দমা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আদালতের নিকট রক্ষার সাহায্য (প্রোটেকশন্ অব্ দি কোর্ট) প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা আর কোথাও কখনও হয় নাই, ইত্যাদি। কলিকাতার কলেক্টর ঐ দরখাস্ত নিজের বক্তব্য সহ প্রেসিডেন্সি কমিশনরকে পাঠাইলেন; তিনি উহা বৰ্দ্ধমানের কমিশনরের নিকট পাঠাইলেন। বৰ্দ্ধমানের কমিশনর উহা হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইয়া আমার কৈফিয়ৎ লইতে বলিলেন। আফিসে কাগজটা পাইয়াই আমি বঙ্কিমবাবুকে খুঁজিলাম। শুনিলাম বঙ্কিমবাবু তখন প্রবীণ ডেপুটী এবং পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের এজলাসে বসিয়া আছেন। তথায় গিয়া দেখিলাম কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই; লোকজনও বিশেষ নাই। উহাঁদের উভয়কে ঐ কাগজপত্র পড়িতে দিলাম। ঈশ্বর বাবু বলিলেন, "লিখিয়া দাও ওরূপ আর হইবে না; আমার এই দুই বৎসরের চাকরী, বহুজ্ঞতা হয় নাই।" পরামর্শটা বেশ মনে লাগিল না। নিজের আফিসে কার্য্য করিতে গেলাম। একটু পরেই বঙ্কিম বাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপরে তাঁহার ঘরে গেলে বলিলেন, "ঈশ্বর বাবুর পরামর্শ ঠিক নয়; ওরূপ করিতে নাই। তুমি সুবিচার জন্য পরিশ্রম করিয়াছ; দোষ কিছু কর নাই; শুধু শুধু দোষ স্বীকার কিসের?" আমি বলিলাম, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।" তখন বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "জাতীয় প্রকৃতি অনুসারেই সকল ব্যবস্থা হয়। আমরা মনে ভাবি, আসামী দোষ স্বীকার করিতেছে, অনুতপ্ত হইয়াছে, আহা একটু কম সাজা দেওয়া যাউক। কিন্তু ইংরাজের মন কঠিনতর। ইংরাজ বলিবে, 'নিজেই স্বীকার করিতেছে' (হি ইজ কনভিক্‌টেড্ আউট অব হিজ ওন্ মাউথ্) এবং আনন্দে ফাঁসির হুকুম দিবে; অপরাধ স্বীকার জন্য দ্বীপান্তরের হুকুম দিবে না। উহাদের ব্যবস্থাও উপযুক্ত ধরণের। ইংরাজ অপরাধী বলিবে, আমি নির্দ্দোষ [নট্ গিল্‌টি]; তুমি প্রমাণ করিতে পার ত কর; আমি তোমাকে সেজন্য সাহায্য করিতে যাইতেছি না—তোমার চক্ষু অভিশপ্ত হউক! [প্রুভ্ ইফ্ ইউ ক্যান; আই অ্যাম্ নট্ গোইং টু হেল্প ইউ; ড্যাম ইয়োর আইজ্!]

আমি বাড়ী গিয়া পিতৃদেবকে সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর ভুল ভাবিয়াছে; বঙ্কিমের কথাই ঠিক। একটা মুসাবিদা করিয়া ফেল এবং বঙ্কিমকে দেখাইয়া লও।"

আমার মুসাবিদা বঙ্কিমবাবুর কাটকুটে দাঁড়াইল:—"ইংরাজের আইনের পরম গৌরবই এই যে, প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ মনে করিতে হয় এবং জেরা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপায়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সম্পূর্ণ সুবিধা তাহাকে দিতে হয়। ইহা কল্পনারও অতীত যে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক এরূপ পাতলা চামড়ার হইবেন যে আসামীকে ঐরূপ সঙ্গত সুবিধা [ফেয়ার অপর্চুনিটী] দেওয়া হইতেছে দেখিয়া প্রকৃতই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতে পারেন। বস্তুতঃ 'প্রতিপক্ষ সাক্ষীর কথাই বিশ্বাস করুন, তিনি বড়লোক; মিথ্যা বলিতে পারেন না; ভুল করিতে পারেন না,' এরূপ সকল কথা আসামীর পক্ষ

হইতে বলানর জন্য কোন বিচারককে চেষ্টা করিতে হইবে এরূপ আবদার সুস্পষ্টই অসঙ্গত। এই সঙ্গে নথি দাখিল করিতেছি; জেরা অসঙ্গত হইয়াছিল অথবা সাহেবকে অবমাননা করিবার জন্য প্রশ্ন হইয়াছিল কিনা উহাতেই প্রকাশিত হইবে।” ঐরূপ কৈফিয়ৎ দাখিল করিলে মাজিষ্ট্রেট আর্মষ্টং সাহেব লেখেন, “এই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হওয়ায় উহাকে সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমাই বিচার করিতে অসঙ্কোচে দিতেছিলাম। কিন্তু এখন আর আবগারী মোকদ্দমা উহাঁকে দিব না। কৈফিয়ৎ সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক নয়।” বঙ্কিম বাবুকে ঐ সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, “মনিবটী আমাদের সুপণ্ডিত বটে! উহাঁর সিদ্ধান্তে মোটকথা এই যে, পরীক্ষায় নম্বর বেশী রাখিয়া তুমি উহাঁকে না ‘ঠকাইলে’ উনি ও মোকদ্দমাটা তোমাকে দিতেনই না, সুতরাং এ সকল জ্বালা ঘটিত না!” বীম্‌স্ সাহেব কমিশনর কাগজপত্র পাইয়া লিখিলেন, “এই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিনি; [আমার বাড়ী চুঁচুড়ায়; আধ পোয়া পথ দূরে কমিশনরের কুঠী; নওয়াখালি হইতে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত তিনবার দেখা করিয়াছিলাম।] তিনি খুব সুযোগ্য ব্যক্তি; উহাঁর পিতা গবর্ণমেণ্টের সুবিশ্বস্ত উচ্চ কর্ম্মচারী। ইগলটনকে আমি কখনও দেখি নাই; শুনিয়াছি আদালতে উহার ব্যবহার সুসঙ্গত নহে।” আমার স্বপক্ষে হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, এ বিচারপ্রণালীও অপূর্ব্ব! যখন একদিকে “জানাশুনা” এবং অপর দিকে “কখনও দেখেন নাই”* তখন আর কথা কি? বঙ্কিমবাবুকে সংবাদ দিলাম। তিনি কলেক্টর এবং কমিশনরের উভয়েরই হুকুম সম্বন্ধে বলিলেন, “কত অল্প বুদ্ধিমত্তার সহিত পৃথিবীর শাসন চলিতেছে! [উইথ হাউ লিটল উইজডম্ ইজ দি ওয়ার্লড্ গভার্ণড্]।”

এই ঘটনা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সুন্দর উক্তিগুলি আমি অনেককে বলিয়াছি এবং তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে নিজ মুখে স্বীকারের [কনভিক্‌টেড্ আউট অফ্ হিজ ওন মাউথ] কথাটী অপরকে বলার সময়ে প্রায়ই বলিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবু নিজে কিন্তু ‘মৃণালিনী’তে নায়কের উপর ইংরাজী মেজাজের আরোপ করিয়া বলিয়াছেন—“পাপীয়সী, নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি!” বঙ্কিমবাবুর সহিত কথার সময়েই ইহা আমার মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু সে সময়ে পাছে ঠিক গুছাইয়া তাঁহাকে সঙ্গতভাবে বলিতে না পারি, এই ভয়ে উল্লেখ করি নাই। যদি করিতাম, তবে তাহা শুনিয়া তিনি যে খুবই হাসিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে নায়কের এক তীরে হস্তী মারিয়া ফেলার কথা বঙ্কিমবাবু পরে বাদ দিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, “প্রথমে মনে ছিল হেমচন্দ্র খুব লড়াই করিবে; কিন্তু সে সব ত হইল না! তাই ওটা উঠাইয়া দিলাম।”

যখন ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হাওড়ায় আসিলেন, তখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বেঙ্গলী সংবাদপত্রে জষ্টিস্ নরিস্‌কে ‘জজ-জেফ্রিস’এর সহিত তুলনা জন্য দুই মাস কয়েদ হইয়াছেন।

---

* আমি পেন্সন লইয়া ৺কাশীধামে আসিলে একদিন (১৯১৫) আনন্দবাগে শ্রীমৎ মৈথিল স্বামীজির সমক্ষে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্যাপটিষ্ট মিসনরি জনসন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি পরিচয় করিয়া দিলে পাদরী সাহেব বলিলেন—এইবার যীশু খৃষ্টকে ভজ।’ [বোধ হয় ইঁহারা শপথ করিয়া আসেন যে খৃষ্টের নাম সকলকেই অন্ততঃ একবার শুনাইবেন; নচেৎ আমার ন্যায় কাশীবাস করিতে আসা বৃদ্ধ হিন্দুকে ভজাইতে পারার সম্ভাবনার কোন লক্ষণই তিনি দেখিতে পান নাই।] আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহাতে সুবিধা?” পাদ্রি সাহেব বলিলেন, “শেষ বিচারের দিন যীশু তোমায় সুবিধা করিয়া দিবেন।” আমি বলিলাম, “আমি ত একটা অতি হীন মনুষ্য, কিন্তু যখন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন বিচারে কখনও চেনা অচেনার পার্থক্য করি নাই। আর যীশু ঐ কার্য্য করিবেন? আমরা হিন্দু, আমরা জানি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। ভগবৎ-স্মরণের ফলও পাইব, দুষ্কৃতির ফলও ভুগিব; নিষ্কাম কর্ম্মেরই ফল ভুগিতে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম করা কতটুকু ঘটে?”

জষ্টিস্ নরিস্ আদালতে শালগ্রাম শিলা তলব করাতে ঐ মোকদ্দমাকে আমরা "নারায়ণের মোকদ্দমা" বলিতাম। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জন্য নানাস্থানে সভাসমিতি এবং বক্তৃতা হইতেছিল। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাওড়াতেও সভা ও বক্তৃতা হইবে। কে কি বলে শুনিয়া নোট করিয়া লইয়া আমাকে সংবাদ দিও।"

আমি 'হাঁ না' কিছু না বলিয়া, চাকরীকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া, বঙ্কিমবাবুর নিকট গিয়া সমস্ত বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অত বিষণ্ণ হইবার মত কিছু হয় নাই। তোমাকে স্পাইং (গোয়েন্দাগিরি) করিতে হইবে না। প্রকাশ্যভাবে সংবাদ সকলন এবং প্রদান [ওপ্‌ন ইন্‌কোয়ারি অ্যাণ্ড রিপোর্টিং] হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। চাপরাস বাঁধা আর্দালি সঙ্গে লইয়া গিয়া, উপস্থিত সকলকেই শুনাইয়া বলিবে—'আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বারা সভার নোট লিখিয়া রিপোর্ট করিতে নিযুক্ত। আমার একটু বসিবার এবং শুনিয়া লিখিবার সুবিধা আপনার করিয়া দিলে উপকৃত হইব।' তাহার পর যাহা লিখিবে ও রিপোর্ট করিবে, তাহা এক্‌জিকিউটিড অফিসারের কার্য্য হইবে, তাহাতে কোন দোষ নাই। আর এক কায কর, দুইজন কনষ্টেবল চাও। ডেপুটীর পশ্চাতে লালপাগড়ী সকলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।" কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বঙ্কিকবাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, আমার শোক-সন্বিগ্ন মানসে শান্তি আনিয়া দিয়াছিলেন। চীফ ইনস্পেক্টর সামুয়েলকে কনষ্টেবলের জন্য লিখিয়া পাঠাইলাম যে সভাসমিতির রিপোর্ট লিখিবার সময় উহারা আমার সঙ্গে থাকিবে। সামুয়েল তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের চিরকুট (শ্লিপ) আসিল যে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাকে সভা সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে না।

হাওড়ার সাব ট্রেজরির কার্য্যের ভার আমার উপর ছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের জল খাওয়ার বা বসিবার জন্য পৃথক কোন ঘর ছিল না। বেলা ২টার সময় ট্রেজরির তালা খুলিয়া তাহাতেই আমরা জলযোগ করিতাম। বঙ্কিমবাবুর, আমার এবং ৺ গৌরদাস বসাক [পিতৃদেবের সহপাঠী] মহাশয়ের বাটী হইতে জলখাবার আসিত। একদিন বঙ্কিম বলিলেন, খাবার একত্র করিয়া তিনভাগে পরিবেষণ কর। তাহাই করা হইল। বাড়ীর প্রস্তুত জলখাবার, ভীমনাগের সন্দেশ এবং ফজলি আম প্রভৃতি প্রত্যেকেই খাইলাম। দুইটা আলবোলায় উহাঁদের ভাল তামাক আসিল। কথায় কথায় দেশের শোষণ, অনেক ইংরাজের দম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন: "আমরা কি প্রকৃতপক্ষেই এ মুহূর্ত্তে অন্তরের অন্তস্তলে কোনও দুঃখ বোধ করিতেছি? তিনজনে গড়ে মাসিক ছয় শত টাকা বেতন পাই; যেরূপ জলযোগ করিলাম, তাহা করিতে পাইলে কি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়? কোনও ইংরাজ আসিয়া যদি 'এখানে কি হইতেছে' বলিয়া আমাদের হঠাৎ লাথি মারিতে আরম্ভ করে, এবং বাসার ভিতর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়, তবেই সেখানে ফিরিয়া মারিতে পারি—ক্রোধ 'কার্য্যে' প্রকট হয়।"

সাঁত্রাগাছীতে 'রানরাজা'র মেলা হয়। একরাত্রে গোপালবাবু নাজীর এবং বাবু রামদাস মৈত্রেয় উকীল ভাড়াটে গাড়ীতে তথায় যাইতেছিলেন; হঠাৎ একজন কনষ্টেবল গাড়ীর পিছনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফৌজদারী আদালতের নাজীর এবং উকীল গাড়ীতে থাকায় গাড়োয়ানের সাহস হইয়াছিল; সে কনষ্টেবলকে নামিতে বলিল, কিন্তু গালি শুনাই তাহার সার হইল। গোলযোগ শুনিয়া নাজির বাবু গাড়ী থামাইতে এবং কনষ্টেবলকে নামিতে বলিলেন। কিন্তু কনষ্টেবল এরূপ উদ্ধত ভাবে নামিতে অস্বীকার করিল যে, নাজীর বাবু ছড়ির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। তখন কনষ্টেবল নামিয়া আসিয়া দুই বাবুকেই ডাণ্ডার দ্বারা প্রহার করিতে করিতে 'জুড়িদার'কে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিল। দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া পড়িল। তাহারা লোক চিনিয়া বলিল, "করিয়াছস্ কি? কাছারীর নাজীর ও উকীল বাবুকে মারিয়া কপালে দাগ করিয়াছিস্?" তখন সেই কনষ্টেবল তাড়াতাড়ি গাড়ীর আলো দুইটা নিবাইয়া

দল এবং রাস্তা হইতে একটা খোয়া তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় আঘাত করিয়া বলিল, "বিনা আলোয় গাড়ী লইয়া যাইতেছিল; আটক করায় বাবুরা আমাকে মারিয়াছেন!" পরদিন কনেষ্টবলের মোকদ্দমা দায়ের হইল। একদফা বাবুর উপর সরকারী কার্য্যে বাধা দেওয়া, আর একদফা গাড়োয়ানের উপর বিনা আলোতে গাড়ী হাঁকানো। তখন কাজেই বাবুদেরও মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইল। বঙ্কিমবাবুর কাছে বিচারে সে মোকদ্দমায় কনেষ্টবলের তিনমাস কয়েদ হয়। জজ সাহেবের কাছে আপীলে সাজা খুব কম হইয়াছিল; তিনি কনষ্টেবলের ও গাড়োয়ানের ঝগড়ার মধ্যে নাজীর বাবুর হস্তক্ষেপ করিয়া ছড়ি চালানোর দোষেই তাঁহার মার খাইতে হওয়ার উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কাছে কতই মোকদ্দমা হইয়াছে। এটীর উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে, মোকদ্দমা যাহাতে উহাঁর কাছে না হয় এজন্য নাকি পুলিশের বিশেষ চেষ্টা ছিল; এবং মোকদ্দমাটী ঐ সময়ে—লোকমুখে 'রামরাজার মামলা' এই অদ্ভুত নাম পাইয়াছিল।

হাওড়া ছাড়ার পর আর আমার বঙ্কিমবাবুর সহিত অধিক দেখা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার মনোমধ্যে মুদ্রিত আছে। এ জীবনে আমি যে তাঁহার মত ভাল এবং বড় লোকের দর্শন লাভ করিয়াছি, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

বিফল

হায়রে, আমার ধরার জীবন
চারিদিকেই বিফল হলো।
এ ছার অসার জীবনের ভার
হিঁচড়ে টেনে কি ফল বলো?
জ্ঞানের মহাসিন্ধুকূলে
ঝিনুক নিয়ে রইনু ভুলে,
অনন্তের ত আভাস প্রাণে
পেলামনাক একটা পলও!

মিট্‌লনাক প্রেমের পিয়াস,
ঘুচলনাক প্রাণের ক্ষুধা,
ওষ্ঠে রসের পাত্র ধরে'
কেড়ে নিল এই বসুধা।

জীবন সমরক্ষেত্রোপরি
লক্ষ্যহারা সকল শরই,
পদাতিদের মেলার মাঝে
হাতের অসি হাতেই র'লো।

গাইতে গিয়ে, প্রাণের বাণী
আট্‌কে গেল কণ্ঠতলে।
আঁকতে গিয়ে, তুলির লিখন
ধুয়ে গেল অশ্রুজলে!
গাঁথ্‌তে গিয়ে ছন্দোহারে
সূত্র হারাই অন্ধকারে
মরার আগেই সত্তা আমার
হীন জনতায় ডুবেই মলো।

শ্রীকালিদাস রায়।

ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য

সঙ্কলন

সম্প্রতি ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর, উপরোক্ত নামে একখানি আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকের অনেক স্থলই সুপাঠ্য। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"এই পুস্তকে বহু লোক সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়াছি।...কিন্তু আমার বিচারশক্তি অল্প, এ জন্য ভ্রমবশতঃ যদি কাহারও মনে ব্যথা দিয়া থাকি, তাঁহার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।...যেখানে আত্ম-প্রশংসার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য যদি চাবুক খাইতে হয়, তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইব।...ছাপা ও বানানের ভুল এত হইয়াছে যে, তাহা একেবারে অমার্জ্জনীয়।"

যে বালক এণ্ট্রান্স ও এফ্-এ পরীক্ষা অনেক কষ্টে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বি-এ পাস করিয়াই অর্থাভাবে যাঁহাকে হবিগঞ্জ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হয়, যৌবনের অর্দ্ধেক ভাগ যাঁহাকে দুশ্চিকিৎস্য রোগে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছে, কি করিয়া তিনি প্রৌঢ় বয়সে "History of Bengali Language and Literature"-প্রণেতা সাহিত্যাচার্য্য দীনেশচন্দ্রে পরিণত হইলেন, তাহার বিবরণ আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহা প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দীনেশ বাবু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ, আত্মীয় স্বজন এবং সমসাময়িক অর্দ্ধশতাধিক ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি কিরূপ হৃদয়গ্রাহী, নিম্নোদ্ধৃত কয়েক স্থল হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর।

১৮৯১ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কোন কাজ পাই কি না, এই চেষ্টায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বাদুড়বাগানের বাড়ীতে মাঝের একটা দ্বিতল ঘরে, চারিদিকে পুস্তকের আলমারির মধ্যে একটি টেবিল, তার পাশে খানকতক চেয়ার। বিদ্যাসাগর তার একটিতে বসিয়া কি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আমি ও আমার মামাত ভাই মতিলাল দুজনে গিয়াছিলাম।...আমরা তরুণ যুবক, তাঁহার মুখে "তুই" সম্বোধন মিষ্ট লাগিল। বলিলেন, "কি চাস্?" আমি চাকুরী প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বাড়ী কোথায়?" ঢাকা জেলায় বাড়ী শুনিয়া বলিলেন, "তাই তো, তুই যে বাঙ্গাল তাতো তোর কথার টানেই বুঝিতে পারিয়াছি। এখানকার ছাত্র তোর ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয়, যে তুই অনার পাশ শুনিয়া চম্‌কে উঠবে। এখানে বড় বড় ওস্তাদ শিক্ষকেরা ঘাল হইয়া যায়, তারা ক্লাস সাম্‌লিয়ে উঠতে পারে না, তুই বাঙ্গাল, তোকে ত একদিনে পাগল করে ছাড়বে।"

আমি বলিলাম, "ক্লাস পড়াতে দিয়া দেখুন না, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙ্গালকে কি করে ঘাল করতে পারে?"

বিদ্যাসাগর—"তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙ্গালের কর্ম্ম নয়; যাহোক তুই যখন চাচ্ছিস, আজ শনিবার—তুই সোমবার দিন ১১টার সময় মেট্রপলিটান স্কুলে যাস—আমি সেই সময় যাব, তোকে ক্লাস পড়াতে দেব।" (২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা)

শিবনাথ শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ। তাঁহার মত উদার, মনস্বী, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি আমি দেখি নাই। কুসংস্কারাপন্ন বুড় বাপ মায়ের কথা বলিতে যাইয়া কোন্ ব্রাহ্ম শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়া-

ছেন! তাঁহাদিগকে যে তিনি ত্যাগ করিয়া কষ্ট দিয়াছেন সে কথা শেলের মত তাঁহার হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল। তাঁহার মাতা যে তাঁর শৈশবে পীড়া হওয়ার দরুণ ঠাকুর দেবতার কাছে ধন্না দিয়া বুকের উপরে গরম ধুনচি রাখিয়া ফোস্কা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই কুসংস্কারের চরম কাহিনী বলিতে গিয়া আর কোন্ ব্রাহ্ম অশ্রুসিক্ত হইতে পারিতেন! রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বলিতেন,—জুয়োলজিকাল গার্ডেনে সিংহ দেখিতে যাইবেন—মায়ের বাহন সিংহ দেখিবেন, শিশুর মতন পরমহংসদেব সেই কথা বলিতে বলিতে 'মা মা' বলিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইলেন—এরূপ শ্রদ্ধার সহিত কোন্ ব্রাহ্ম এই সকল কুসংস্কারের পায় অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত হইবেন? ব্রাহ্ম মন্দিরে মেয়েদিগের বাহুল্য দেখিয়া পরমহংসদেব শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "তোরা এ সকল কি করেছিস? চারাগাছ পুঁতেই ছাগল লাগিয়েছিস্, ধর্ম্মটা যে একেবারে সাবাড় হয়ে যাবে!" এই কথা বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া খুন হইতেন—কোন্ ব্রাহ্মের এ কথা বলিতে গিয়া মুখ রাগে রাঙ্গিয়া না উঠিবে? এইটি ছিল তাঁর বিশেষত্ব—তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছিলেন কিন্তু উদারতাটি ছাড়েন নাই। [৪১১-৪১২ পৃষ্ঠা]

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ।

বোলপুরে গিয়া আমার ফিটের পীড়া হইল। কতকটা সময় অজ্ঞান হইয়া রহিলাম—জ্ঞানলাভের পর দেখিলাম, মহারাজ জগদিন্দ্র শিয়রে বসিয়া। তিনি রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে একটা নূতন মজার ফন্দী পাকাইতেছিলেন। কতকগুলি নূতন কাপড় আনিয়া ছোপ দিয়া গেরুয়া রং ধরাইলেন, একতারা ও খঞ্জনীর ব্যবস্থা হইল। মতলবটা এই হইল, মহারাজা গেরুয়া পরিয়া গুরু সাজিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন, রবিবাবু ও শিবধন বিদ্যার্ণব চেলা সাজিয়া, একজন খঞ্জনী ও অপরে একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিবেন। শিবধনের বয়স ছিল ত্রিশ এবং তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন। কোন একটা গাছতলায় মৌনী বাবা বসিয়া থাকিবেন, আর চেলারা পল্লীতে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা আনিবেন তাহা শিবধন রাঁধিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গুপ্তভাবে একখানা গো-শকট অপেক্ষা করিতে থাকিবে। চার পাঁচ পল্লী পর্য্যটন করিবার পর ঐ গোযানে আরোহণ করিয়া মহাপুরুষেরা আবার অন্য এক কেন্দ্রে গমন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। এই অভিযানে মোট পনের দিন ব্যয় করিয়া তাঁহারা বোলপুরে ফিরিবেন।…কিন্তু সে যাত্রা এই মতলব টিকিল না। রবীন্দ্র বাবু অসুখ করিয়া বসিলেন।

মহারাজা কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে বৈষ্ণব সাজিয়া গিয়া, নিজের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া, রাণী মহাশয়াকে গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য যতী বোস প্রভৃতি বন্ধুরাই পুরোভাগে ছিলেন—তাঁহারা দুটা করিয়া তিলক কাটিয়া, গুম্ফ কামাইয়া, তুলসীর মালা ধারণ পূর্ব্বক, ছদ্মবেশটার ভূমিকা খুব উৎকৃষ্টভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণববেশী মহারাজও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাড়ীর কেউ মহারাজকে এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই। [৩৫৩-৩৫৪ পৃষ্ঠা]

মল্লবীর শ্যামাকান্ত।

সুবিখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন সোহং স্বামী) আগে ত্রিপুরা-সরকারে কাজ করিতেন। তারপর বাঘ ভালুক পোষ মানাইয়া সার্কাস করিয়া বেড়াইতেন। উইলসনের সার্কাসে তিনি ১৮০০৲ মাসিক বেতনে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আগরতলায় আসিয়া আমাকে বলিলেন—তুমি এখানে কত দিন? আমি বলিলাম, "এই পনের দিন; রাজার সাক্ষাৎ পাচ্ছি না। অতিশয় ভদ্রতা সহ তিনি ক্রমাগত দিন পিছাইয়া দিতেছেন। তোমাকেও ভাই কিছুকাল থাকতে হবে, আজ এসেই কি দেখা পাবে?"

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বল্লেন, "তুমি পাগল—আমি তোমার মত বসে থাক্‌ব নাকি?"

আমি বলিলাম, "সাহেবরা এসেও যে সহজে দেখা পান না!" শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "সে দেখা

যাবে।" তারপর তিনি কোথায় বাসা করিয়া আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তাঁহার অভ্যস্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন,—"ভাই, আমি পরের বাসায় উঠে কতকগুলি ভাত, ডাল আর মিষ্টি খেয়ে লম্বোদর হয়ে বসে থাক্‌বার ছেলে নই, বিশেষ, সঙ্গে একটা বাঘ আছে। আমার কাছে আসার পূর্ব্বে সে নরমাংস খেয়ে জীবনযাত্রা চালাত—তাহার আতিথ্য করবে কে? আমি তাঁবু খাটিয়ে আছি, রোজ বড় দেখে একটা ছাগল কিনে আনি, তার অর্দ্ধেকটা বাঘকে খাওয়াই, আর অর্দ্ধেকটা উনুনে আধসিদ্ধ করে নিজে খাই। শাক সর্বজির মত দুটো ভাত, খেলেও চলে, না খেলেও চলে।"

তার পর দিন শুনিলাম, মহারাজার নিকট হইতে ২০০০ ৲ আদায় করিয়া শ্যামাকান্ত চলিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটা হইল এইরূপঃ—মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে মণিপুরী সৈন্য সঙ্গীন লইয়া পাহারা দেয়। শ্যামাকান্ত তাহার ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়। রাধারমণ বাবু (প্রাইভেট সেক্রেটারি) বলিলেন, "মহারাজার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না।" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে কুকুর সহ সিঁড়িতে উঠিতে থাকে। মণিপুরী সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বাধা দেয়। তখন তাহাদের দুই তিন জনের সঙ্গীন কাড়িয়া লইয়া সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বাধাইয়া দেয়। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই অশ্রুতপূর্ব্ব কলরবে প্রাসাদের সকলে শঙ্কিত হইয়া উঠে। মহারাজ কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন, তখন রাধারমণ বাবুকে বলিলেন—"ওর ভয়ে আমি সর্ব্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন ঠেকিয়ে রাখলে, আসতে দাও।"

শ্যামাকান্ত যাইয়া মহারাজকে বলিল, "মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরিয়া আনিতে শিখিয়াছি, নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহারাজকে খেলা দেখাইব—আদেশ করুন।" মহারাজ বলিলেন, "তুমি কি চাও বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্মহত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই। তুমি কি হলে আমায় ছাড়বে তাই বল।" শ্যামাকান্ত বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনাকে খেলা দেখাব বলিয়া এতদূর আসিয়াছি। সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তবে আমার এই থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া দিন, ইহাতে হাজার দুই টাকা ধরিতে পারে।" মহারাজ তখনই দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। [২৪৭—২৪৯ পৃষ্ঠা]

গৌরদাস কীর্ত্তনিয়া।

কীর্ত্তন গায়কের রাজা গৌরদাস। গৌরদাস রাত্রি নয়টার সময় জপ করিতে বসে, রাত্রি তিনটার সময় জপ শেষ হয়—সমস্ত সময়ই প্রায় কাঁদিতে থাকে। পার্শ্বে তাহার যুবতী স্ত্রী ঘুমাইয়া থাকে, শুনিয়াছি গৌরদাস তাঁহার দিকে দৃকপাতও করে না। তাহার জপমালা একটা গোখরা সাপের মত, এত বড় তুলসীর মালা আমি দেখি নাই। এই গৌরদাসের মতন লোককে যেদিন শিক্ষিত সমাজ চিনিবেন, সেই দিন তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বাঙ্গালা দেশের সভ্যতার সার, যাহা সাত আট হাজার বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কতক কতক বৈষ্ণবদিগের সহজ সম্প্রদায়ের পুস্তকে আছে। বটতলা কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখিয়াছে। যাহাদিগকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলি, তাহারাই এই পুস্তকগুলির পাঠক। মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি তন্ত্রের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া, কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, যাহা শুনিলে য়ুরোপীয় দার্শনিকের বিস্ময় জন্মিবে, তাহার বোদ্ধা আমাদের জন-সাধারণ।......চণ্ডীদাসাদির যে টীকা রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃতে পদামৃত-সমুদ্রে করিয়াছেন—তাহা হইতে উৎকৃষ্ট টীকা গায়কেরা করিয়াছেন, তাহা গানে গানে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে—সেই টীকার নাম আখর। গৌরদাস এই আখরের রাজা।...এই একরূপ নিরক্ষর বৈষ্ণব ভিখারী কেমন করিয়া হিন্দুর দার্শনিক তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি এরূপ মন ভুলানো গানে পরিণত করিয়া ফেলিল—তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। আখর-

গুলির কতক সে পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ আখর সে জপের নিকট পাইয়াছে, কৃষ্ণ-ভক্তিতে ভরপুর তাহার স্বীয় নয়নাশ্রুর নিকট পাইয়াছে। [৩২৫—৩২৭ পৃষ্ঠা]

রবীন্দ্রনাথ।

রবি বাবুর বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধ-পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন [২০শে বৈশাখ, ১৩০৯]:—

"পত্রে আপনি যে কথার আভাস মাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখক-জাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজেকেই সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষ্টার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবন প্রদীপের তেল ত খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব?" [৩৪৭—৩৪৮ পৃষ্ঠা]

ভগিনী নিবেদিতা।

নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন।…আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতে হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন। রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত কহিতেন—"দীনেশবাবু ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে, আমি আপনার সঙ্গে ও সম্বন্ধে কথা বলিব না।"…

তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পুস্তকের ["History of Bengali Language and Literture"] পাণ্ডুলিপি পড়িতে লাগিলেন। ইংরাজীর সংশোধন পুস্তকে অল্পই হইয়াছে, বেশীর ভাগ ভাব-সংশোধন। কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্য পুরাণের শিব সম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে—"শিব তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও? ভিক্ষা বড় হীনবৃত্তি, কোন দিন কিছু জোটে, আর কোন দিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস। তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তা হলেই তোমার এ কষ্ট দূর হবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে? যদি কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর, তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে!" এই ভাবসম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীর কোন অপূর্ব্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো আমার মনেই হয় নাই। কিন্তু তিনি ঐ স্থানটী পড়িয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য" এই কথাটী বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিষ পেয়েছেন যে, দীনদরিদ্র হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয় আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন।" নিবেদিতা সেই কবিতাটী হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া, এক হাত দিয়া অপর হাত চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্ব্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ও দীনেশ বাবু, এটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ।" আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা মেয়ের মাথায় যেন কি হয়েছে। সেই সময়ে সেখানে আর একজন মেমসাহেব ছিলেন। পর দিন তাঁহাকে নিরালা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নিবেদিতা এই শিবের কবিতায় এমন আশ্চর্য্য কি পাইয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি শুনিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "শুনেছি। সাধারণ ভক্ত ও উপাসক তাঁহাদের দেবতার নিকটে সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর আমায় ধন দিন, যশ দিন, মান দিন, স্বাস্থ্য দিন'—তাঁহারা কত কি বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঐ কবিতায় ভক্ত তাঁর উপাস্যের প্রতি

অনুরক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন, নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই; ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয় তাহাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।”…

যেদিন আমার নিকট তিনি শুনিলেন, খড়দহে একদা ১২০০নেড়া ও ১০০০ নেড়ী বীরভদ্রের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে খড়দহে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। এই নেড়া নেড়ীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী।…এই পতিতের দলটিকে বীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দান করেন।…খড়দহে যাওয়ার দিন তাঁর কি আনন্দ! আমাকে বলিলেন, “ও জায়গাটার নাম আমি কি দিয়াছি জানেন? ওটা হচ্চে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্র।” [৩৬৬—৩৭৪ পৃষ্ঠা]।

গ্রন্থকারের সর্পভীতি।

কয়েক রাত্রি চোখ বুজিতে পারি নাই, যতবার চোখ বুজিতে চেষ্টা করিয়াছি মনে হইয়াছে পায়ের কাছে সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে, চোখ বুজিলেই কামড়াইবে। …এই উৎকট যন্ত্রণা প্রায় পনের দিন ছিল।…একদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা, কালীর মত কালো সাপ আমার পা দুটি জড়াইয়া আছে। “আমার কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।…আমার একটু তন্দ্রা আসিল, তখন কে যেন আমাকে ডাকিল। সে স্বর আমার এখনও মনে আছে। স্পষ্ট শুনিলাম, “তুই মনসাদেবীকে গালাগালি করেছিস; জানিস না যারা কুঁড়ে ঘরে থেকে সাপের ভয়ে অস্থির হয়, তারা ভয়ে ‘মা মা’ বলে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া মনসাদেবীর শরণ নেয়…তুই স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতার সহিত তাঁহাকে ব্যঙ্গ করেছিস।” ঠিক এই কথাগুলি না হতে পারে, কিন্তু এ ভাবের কথা। সেই তীব্র ভর্ৎসনার সুরেও মনে ভক্তি হইল। জাগিয়া দেখিলাম কেউ নাই, কেবল আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে ও মুখে মা মা ডাক উচ্চারিত হইতেছে। …জাগিয়া অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে আমার মেয়ে মাখনকে বলিলাম, একটা মোম বাতি জ্বালিতে, ও আমার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” বইখানি দিতে। তখন যেখানে যেখানে মনসাদেবীর নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত কাটিয়া দিলাম।…আমি “বেহুলা” বই লিখিয়াছিলাম, তিন চার বছরের মধ্যে তাহার কুড়ি বাইশ হাজার কপি কাটিয়া গিয়াছিল। আমার মন, এই পুস্তকলব্ধ অর্থ মনসাদেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। [২৯১—২৯৩ পৃষ্ঠা]

শ্রীগৌরহরি সেন।

প্রতিবাদ

(গল্প)

পীড়িত পিতার শিয়রে বসিয়া উৎকণ্ঠিত পুত্র কহিল, “বাবা এখন একটু দুধ খান; আনতে বলি?”

“আর কতবার দুধ খেতে বলিস মোহন? এই একটু আগেই কি-যেন খেলাম?”

“সেটুকু বেদানার রস বাবা; আপনি যে কাহিল হয়ে পড়েছেন, দুধ খেতে আপত্তি করলে শরীর সারবে কেমন করে?”

পুত্র মোহনলালের কথায় পিতা ব্রজলালের শীর্ণ অধরে নিরাশার ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। কোটরগত চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইল। নিয়মিত ঔষধ সেবনে ও

ঘণ্টায় দুইবার দুগ্ধপানে মরণপথের যাত্রী কি ফিরিতে পারে! পুত্র কন্যার প্রাণান্ত সেবা যত্ন, হৃদয়ের অসীম আকুলতা, আত্মীয় পরিজনদের ঐকান্তিক মঙ্গলকামনা, রূপরসময়ী শ্যামলা ধরণীর বুকে পড়িয়া থাকিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, এ সমস্ত অপেক্ষা নিয়তির নিষ্মম বাহুবল যে অনেক প্রবল।

রবিকরতপ্ত নীলাম্বরতল, শান্ত শোভায় শোভিত ফলপুষ্পময়ী বসুন্ধরা, পাখী ডাকা ছায়া ঢাকা পুণ্যভবন, সন্তানের ভক্তি ভালবাসা, বান্ধবের প্রীতি এসব ফেলিয়া চিরতরে কে যাইতে চাহে? কিন্তু বিধাতার বিধান যে অখণ্ডনীয়!

ব্রজলাল কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "আচ্ছা ছোট বৌমাকে দুধ আনতে বল্; খুব অল্প করে আনে যেন।"

দ্বারের সম্মুখে মাটীতে বসিয়া ডুরে শাড়ী পরা একটি ছয় সাত বছরের বালিকা কতকগুলি পুতুল লইয়া খেলা করিতেছিল। মোহন সেইদিকে চাহিয়া ডাকিল, "মিছরী, বাবার জন্যে দুধ গরম করে দিয়ে যেতে বল্।"

বালিকা রান্নাঘরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"মা, শীগ্গির দাদুর দুধ গরম করে দিয়ে যাও। দাদুর ক্ষিধে পেয়েছে। কত বেলা হয়ে গেচে তাতো দেখতে পাচ্চ না মা; আমিই ক্ষিধেয় মরচি, দাদু তো রোগামানুষ।"

"ক্ষিধে পেয়েচে, খাও না কেন দিদি, এত কষ্ট পাওয়া কেন? এস আমার কাছে এস।" কহিয়া ব্রজলাল স্নেহপূর্ণ নেত্রে নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিস্কুটের টিনের মধ্যে অতি যত্নের সহিত পুতুলগুলি সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে মিছরী উত্তর করিল, "আসছি দাদু, এইবার তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব; পকোচুল তুলে দেব। এগুলোর জন্যে কি আমার কোন কায করবার অবসর আছে! কত কান্না কাটার পর এই এতক্ষণে সবার চোখে ঘুম এল। এমন দুষ্টু ও মানুষের কপালে হয়!"

নাতিনীর গম্ভীর মুখ দেখিয়া, মধুর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ দাদামহাশয় হাহা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। মেয়ের কথায় মোহন সহাস্যমুখ অবনত করিল।

ক্ষণকাল এর একটী কাঁসার পদ্মকাটা বাটিতে খানিকটা গরম দুধ লইয়া বধূ অন্নদা গৃহে প্রবেশ করিল। মোহন স্ত্রীর হাত হইতে দুধের বাটিটা লইয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিতেই ব্রজলাল কহিলেন, "আমায় একটু ধরে তোল মোহন, শুয়ে শুয়ে খেতে আর ভাল লাগে না।"

"না বাবা, এখন আপনাকে নাড়াচাড়া করতে কবরেজ মশায় বারণ করে গেচেন। আর দু'তিনদিন পরে একটু সুস্থ হলে তখন উঠে বসবেন।"

বৃদ্ধ আপত্তি করিলেন না। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পুত্রের হাত হইতে দুধের বাটি লইয়া, পানান্তে বধূকে ডাকিয়া কহিলেন, "রান্নার কত দেরী মা? মিছরীকে খেতে দাওগে।"

শ্বশুরের নিকটে সরিয়া গিয়া বধূ অনুচ্চস্বরে কহিল, "রান্না হয়ে গেছে বাবা, এখুনি মিছরীকে খেতে দেবো। আপনি একটু ঘুমুন।"

"হ্যাঁ, ঘুমুতে চেষ্টা করি মা। তোমরা খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে এসগে। মোহন, স্নান করতে যাও।"

"মিছরী খেয়ে এসে আপনার কাছে বসুক, তার পর আমি স্নান করতে যাই বাবা। বেলা খুব বেশী হয় নি, মোটে দশটা বেজেছে।" বলিয়া মোহন স্ত্রীকে ইঙ্গিতে মিছরীকে তাড়াতাড়ি ভাত দিবার কথা বলিল। অন্নদা রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ব্রজলাল নীরবে মুদ্রিত নয়নে বিছানায় পড়িয়া নিদ্রার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মোহন চিন্তাক্লিষ্ট বদনে তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পড়ে বৃদ্ধ চক্ষু মেলিলেন। কয়েকবার কাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "আজ তো ভুবনের আসার সময় চলে গেল; কাল যদি আসে। দুলালকে সঙ্গে আন্তে লিখেছিস মোহন?"

"দুলালকে বৌদিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দাদাকে লিখেচি বাবা; কিন্তু দুলাল না এলে

বিশ্বাস নেই। তার পরীক্ষার বছর—বৌদি হয় তো আস্‌তেই দেবেন না।"

"ঠিক বলেছিস মোহন, বড় বৌমার জিদের কথা আমার মনেই ছিল না। দুলাল আমার চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকুক; বংশের নাম উজ্জ্বল করুক। তার পরীক্ষার বছর অনেকবার আস্‌বে, কিন্তু এখন দেখা না হ'লে আমার সঙ্গে যে জীবনে কখনো দেখা হ'বে না, এটাও কি ওরা বুঝ্‌বে না?"

মোহন কথা কহিল না, রুগ্ন পিতাকে মিথ্যা আশা আশ্বাসের কথা বলিতে তাহার মন সরিল না। কারণ বড়বধূ বিজলীর স্বভাব চরিত্রের কথা তাহার বিলক্ষণ রূপেই জানা ছিল। দাদার দুর্ব্বলতাও তাহার নিকটে অপ্রকাশিত ছিল না। মোহনের নীরবতায় বৃদ্ধ মনে মনে ব্যথিত হইলেন। মা-বেরে সুকোমল অন্তঃকরণ অনেক সময় কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে কত আশার বাণী আনন্দের বারতা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। না শুনিলে হৃদয় অবসাদ-ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে,—হতাশার তীব্র বেদনায় বক্ষস্থল আলোড়িত হইতে থাকে।

ব্রজলাল মর্ম্মাহত চিত্তে চুপ করিয়া অনেক কালের পর সেই বহুবর্ষ অতীতের স্মৃতির ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন। মনে পড়িল পত্নীবিয়োগের সকরুণ কাহিনী, তাহার পর কত ব্যথায় কত হর্ষে জেষ্ঠপুত্রের বিবাহ ব্যাপার। তিনি সাধ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বিজলীকে ঘরে আনিয়াছিলেন। আশা ছিল, তাঁহার গৃহিনীশূন্য গৃহে বিজলী লক্ষ্মীরূপে বিরাজিত হইয়া শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিবে। কিন্তু তাঁহার ভুল ধারণা তিরোহিত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই না। দূর হইতে অনেক দ্রব্যই রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ বালয়া মনে হয়; কিন্তু অধিকারের মধ্যে আসিলে বিশ্ব সংসারের অধিকাংশ জিনিষই বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত হইয়া উঠে না। বন্ধুদের পরামর্শ কাণে না তুলিয়া ব্রজলাল সুন্দরী ডাগর বধূটীকে ঘরে আনিয়া, নিজের ভুল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন। বিজলী তাঁহার অভিযোগের ধারও ধারিল না। অধিকন্তু কিছুদিনের মধ্যে স্বামীটিকে নিজের একান্ত দাসানুদাস করিয়া লইল। দুইবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া ভুবনলাল কলিকাতায় কয়েকটি উকীলের মুহুরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল; কাযেই বিদ্যার অভাব হইলেও প্রখর বুদ্ধিবলে তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের ত্রুটী হইত না। উকীলদের পকেট পূর্ণই হোক অথবা শূন্যই থাকুক, ভুবনের কিন্তু পসার প্রতিপত্তি দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। তিনি এক পক্ষের নিকটে টাকা লইয়া অপর পক্ষকে গোপনে কাগজ দেখাইয়া, কখনো জাল করিয়া, কখনো দালালী করিয়া, কখনো বা পল্লীগ্রামের নিরক্ষর নিরীহ লোকদিগকে কলিকাতা দেখাইবার প্রলোভনে টানিয়া আনিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন। চার পাঁচ বছরের মধ্যেই বাপ ভাইয়ের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, শ্যালকদের বাসার মধ্যে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বালক পুত্র দুলাল ও স্ত্রীকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন।

মোহন গ্রাম্য স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া কলিকাতায় দাদার বাসায় থাকিয়া পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ব্রজলাল সম্মত হইলেন না। কলিকাতার অধিবাসী হইয়া এক ছেলে বাপের কথা ভুলিয়া গিয়াছে, গ্রামের কথা বিস্মৃত হইয়াছে, আবার ছোট ছেলেটিও কি সেই পথেরই পথিক হইবে! মোহনই যে পত্নীহারা বৃদ্ধের অন্ধের যষ্টি—জীবনের সান্ত্বনা; ইহাকে কি তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন? একবার ঠকিয়াছেন বলিয়া কি বারবার ঠকিতে হইবে? বৃদ্ধ শূন্য ঘর পূর্ণ করিবার মানসে এবার গরীব ঘরের একটি শ্যামবর্ণা মেয়েকে মোহনের সহিত বিবাহ দিয়া গৃহে আনিলেন। গৌরবর্ণের প্রতি তাঁহার নিতান্তই বিরাগ জন্মিয়াছিল। শ্যামবর্ণা কিন্তু শ্যামবর্ণের অমর্য্যাদা করিল না।

অন্নদার শরীরটি যেমন শ্যামল দীপ্তিভরা ছিল; হৃদয়টি ততোধিক স্নিগ্ধ ও মধুর। যেন শিশিরসিক্ত শ্যামল তৃণদল দিয়া বিধাতা তাহাকে গঠন করিয়াছিলেন।

বিবাহের চারিটি বছর পরে সেই মূর্ত্তিমতী শ্যামার কোলে যখন নবঘন শ্যামলা মিছরী আবির্ভূত হইল তখন আর ব্রজলালের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি হর্ষে, বিষাদে হাসিয়া কাঁদিয়া মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত ছলা চাতুরী বিস্তার করিয়া মায়াবিনী বালিকা দাদা মহাশয়ের সমগ্র হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিল। আহারে মিছরী, ভ্রমণে মিছরী, বৃদ্ধের নিকটে জগৎ মিছরীময় হইয়া গেল।

নানারূপ অনিয়ম নৈরাশ্যে পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। মোহনের ভক্তি ভালবাসায়, অন্নদার সেবা যত্নে তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া আসিল না। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ক্রমে ক্রমে শয্যাতলে আশ্রয় লইলেন।

২

অনেক সময় মানুষ হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে অতি সংগোপনে যে আশা পোষণ করিয়া থাকে, কার্য্যতঃ তাহার ফল হয় বিপরীত। ব্রজলাল ভাবিয়াছিলেন ভুবনলাল দুলালকে নিশ্চয়ই সাথে করিয়া আনিবেন। কিন্তু পরের দিন প্রাতঃকালে আগত জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্র-বধূর সহিত দুলালকে না দেখিয়া তিনি প্রাণে নিরতিশয় আঘাত পাইলেন। অভিমানে ভুবনের সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিলেন না। দুলাল তাহাদের ছেলে হইলেও তাঁর কি কেহই নহে? দাদা মহাশয়কে শেষ দেখার চেয়ে পরীক্ষার পড়াটাই কি বেশী হইল?

পিতার মনোভাব মোহনের নিকটে গোপন রহিল না। সে অপরাধীর মত বধূঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, "দুলালকে না এনে বড় অন্যায় করেছেন বৌদিদি। বাবা সর্ব্বদা দুলালকেই দেখতে চান; দেখলে হয়তো মনটা ভাল হয়ে শরীরটাও ভাল হত।"

বিজলী মুখ নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া উত্তর করিল, "আমার ছেলে, তার ভাল মন্দ আমিই বুঝবো, তোমা-দের তো ইচ্ছে ছেলেটা লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে বাড়ী এসে তোমাদেরই দোসর হয়ে বসে। তুমি জান কি ঠাকুরপো, দুলালের পরীক্ষার ফলের দিকে কত লোক চেয়ে রয়েছে। ষোল বছরে ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া তোমাদের বংশাবলীর মধ্যে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তোমাদের কথাতেই কি মা হয়ে আমি তার ভবিষ্যৎ মাটী করবো? আমায় তেমন বুদ্ধিহীনা মূর্খ মা পাও নি। আর বাবার অসুখ অসুখ বলছ, এমন অসুখ বুড়ো বয়সে সকলেরি হয়। এ কি মরবার রোগ হয়েচে? আমাদেরই তো আসা হত না—তা উনি বাড়ীর একটা ব্যবস্থা করতে এসেছেন বৈত নয়।"

মোহন ভীত হইয়া কহিল, "বাড়ীর ব্যবস্থা কেমন?"

"ব্যবস্থা হচ্ছে, ছুটির ভিতর দুলাল বাড়ী আসতে বড্ড জেদ করে, কিন্তু বাড়ী এসে শোবে কোথায়? খড়ের মেটে ঘরে আমি আমার একমাত্র শিবরাত্তিরের সলতেটুকুকে রাখতে ভরসা পাই নে ভাই, তাই ভাবচি আমি বাগান কেটে ওইখানে গোটাদুই কুঠারী করবো।"

মোহন বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিজলীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দাদা যে অনেক উপার্জ্জন করেন এটা তাহাদের বিলক্ষণ রূপেই জানা ছিল। প্রবাসগত গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরিয়া সরল ধর্ম্মভীরু ব্রজলালের নিকটে ভুবনের অন্যায় উপার্জ্জনের অনেক গল্পই করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ যে এত বেশী ইহা মোহন কিংবা ব্রজলাল কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন নাই।

দ্বিপ্রহর বেলা আহারাদির পর ভুবন পিতার নিকটে বসিয়া যখন পাকা ঘর করিবার প্রস্তাব করিলেন, তাহা শুনিয়া ব্রজলাল আনন্দিত হইতে পারিলেন না। তিনি সেকালের মানুষ, অর্থের পরিবর্ত্তে রসহীন ধর্ম্মই অধিক ভালবাসিতেন। ছেলে যে অর্থের প্রলোভনে অধর্ম্মের কায করিয়া, অন্যায় করিয়া বড়লোক হইতেছে, একথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিতেছিল। স্নেহ মমতা ভরা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজলাল কহিলেন, "তোমার সঙ্গতি হলে তুমি কোঠা দেবে এতো আমার সুখের কথা ভুবন। কিন্তু বাবা

আমার একটা অনুরোধ মনে রেখো। কখনো পরের সর্ব্বনাশ করে ধনী হতে চেষ্টা কোরো না। একজনার কায করে উপকার করে পয়সা নেওয়া অন্যায় নয়। তোমার আরো উন্নতি হোক, ভাল হোক, আমি আশীর্ব্বাদ করি। আমার আর দেখে যাবার সময় হবে না।"

আবেগে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, গণ্ড বহিয়া দুটিফোঁটা অশ্রু উপাধানে ঝরিয়া পড়িল। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "তোমাকে আরো একটা কথা আমার বলবার আছে ভুবন। তোমরা মনে করচ আমি সেরে উঠব, তা নয়। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি অভাবে তুমিই মোহনের পিতৃস্থানীয়। আমাকে দেখবার শোনবার জন্যেই ওকে বাড়ীতে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম বেশী লেখাপড়াও শিখতে পারে নি। তুমি কৃতি, মোহন তোমার প্রতিপাল্য। নিজে এক মুঠা খেলে ওকেও আধ মুঠা দিয়ে খেয়ো।"

ঘরের কোণে বসিয়া বিজলী কিসের একটা সেলাই করিতেছিল, শ্বশুরের শেষের কথা শুনিয়া মনে মনে উত্তর করিল, "হ্যাঁ তা নয় তো কি! একজনা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়া গুষ্টিশুদ্ধকে বসাইয়া খাওয়াইবে! একচখো বুড়োর মরণকালেও বিপরীত বুদ্ধি।--একচোকো বুড়ো আর যাহাই হোক, অন্তর্য্যামী নয়, তাই বধুর মনের কথা শুনিতে না পাইয়া আপনার মনেই কহিতে লাগিলেন, "এখন শীগ্‌গির তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারিলেই বাঁচি ভুবন; তবে একটা দুঃখ যে দুলালকে দেখতে পেলাম না। কদিন পড়া কামাই করে দুলাল আমার একটীবার দেখতেও এল না। সে এখন এমনিই হয়ে গেচে!"

ভুবনলাল মাথা চুলকাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তাকে ত আপনার অসুখের কথা জানানো হয় নি বাবা, সে শুন্‌লে কি আর সেখানে থাকতো!"

"আহা তাই বল ভুবন; দুলাল আমার তেমন হৃদয়হীন নয়। সে কতবার বলেছে 'আমি সকলের চেয়ে তোমাকেই বেশী ভালবাসি দাদামশায়!' আমার ব্যারাম শুনে সে কি স্থির থাকতে পারে? আমি আশীর্ব্বাদ করি, দুলাল আমার বেঁচে থাকুক, সুখে থাকুক।" ব্রজলালের মুখের সন্দেহের ছায়া অপসারিত হইয়া আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি যে এতক্ষণ দুলালের প্রতি অভিমান করিয়া তাহার প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত উত্থাপন করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের পরতে পরতে মিছরী ভরা থাকিলেও, দুলালের জন্য স্থানের অভাব ছিল না। দুলালকে কাছে না পাইয়া তাঁহার অপরিসীম বাৎসল্য অতুলনীয় মমতার প্রস্রবণ মিছরীর দিকেই প্রবাহিত হইত। কিন্তু সেটা দুলালকে বিস্মৃত হইবার জন্য নহে; তাহারই উদ্দেশে। দুলাল যে তাঁহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, এ খবর আর কেহ না জানিলেও মোহন ভালরূপেই জানিত। মোহন একবার ইতস্ততঃ করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা দাদা, দুলালকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলে হয় না? অন্ততঃ দুদিনের জন্যে এসে বাবাকে একবার দেখে যেত?"

দাদা কথা বলিবার পূর্ব্বেই বিজলী ঘোমটার মধ্য হইতে ফোঁস করিয়া উঠিল—"না তা হতে পারে না; এখানে এলে যদি তার ম্যালেরিয়া ধরে, তখন পরীক্ষার কি হবে?"

বলা বাহুল্য বিজলীর কথার প্রতিবাদ করিবার মত সাহস বা শক্তি সে ঘরের একটি প্রাণীরও ছিল না। বিজলী নির্লজ্জ ছোট বধূর মত শ্বশুরের সঙ্গে কথা কহিত না; বা ন্যাকামী করিয়া বাবা বলিয়া ডাকিত না। তাই সে শ্বশুরের নিকটে ঘোমটার আড়ালটুকু রাখিয়াছিল।

৩

সেদিন সমস্ত দিন ভুবনলালের সহিত বাক্যালাপ করিয়া রাত্রে পুনরায় ব্রজলালের প্রবল জ্বর দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কাসিও বাড়িয়া উঠিল। দুদিনের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যেও সে জ্বরের বিরাম হইল না। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃদ্ধ চক্ষু মেলিলেন; তাঁহার

লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু সে জ্ঞান সে চেতনা, ক্ষণিকের জন্য মাত্র—প্রদীপ নিবিবার পূর্ব্বাবস্থা!

গভীর রজনীতে ব্রজলাল পুত্রদের মুখে হরিনাম শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে মোহন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল শীঘ্রই তিনি আরাম হইয়া নিজেই উঠিয়া বসিতে পারিবেন। হায়, মানবের ক্ষণভঙ্গুর দেহ, তুচ্ছ আশার আশ্বাস!

পিতৃশোকে মোহন আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িল। বাল্যকাল হইতে সে পিতার বুকেই মানুষ হইয়া মাতৃবিয়োগজনিত ব্যথার আস্বাদ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। সেই স্নেহময় করুণাময় পিতা আজ কোথায় চলিয়া গেলেন? শ্বশুরের শোকে অন্নদাও ধরাশয্যায় লুটাইয়া তাঁহার স্নেহ মমতার কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সরলা বালিকা মিছরীর প্রশ্নে সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিত না। নিদ্রিতা মিছরী রাত্রিশেষে তাহার দাদামহাশয়কে লইয়া যাওয়া জানিতে পারে নাই। তাই সে ঘরে ঘরে তাহার আদরের দাদামহাশয়কে খুঁজিয়া না পাইয়া, দুইখানি কুসুমপেলব বাহুতে মায়ের গলাটি জড়াইয়া মিনতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "আমার দাদু কোথায় গেচে মা? আমায় বলে দাও না। দাদুর কথা না বল্লে আমি কখ্‌খনো ভাত খাব না। বার্লতির জলে খুব করে চান করবো।"

এত বড় শাসন বাক্যেও মা যখন কথা বলেন না, তখন আর ক্ষুদ্র বালিকা কি করিতে পারে? বেণীবদ্ধ ঝাঁকড়া চুলগুলি খুলিয়া, হাতের বালা দুইগাছি মায়ের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া পা ছড়াইয়া কান্না আরম্ভ করে।— "দাদু তুমি কোথায় লুকিয়ে রয়েচ একটিবার টু দিলেই আমি তোমায় খুঁজে বের করবো। কথা বল লক্ষ্মী আমার সোণার দাদু আমার।"

মা ব্যথিতা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লন। কথায় ভুলাইবার ভাষা তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না।

ব্রজলালের মৃত্যুতে সকলেই শোকে ম্রিয়মান, কেবল শোক করিবার অবসর ছিল না বিজলীর। তাহার যে অনেক কায। শ্বশুর তাহাকে কোনদিন প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না এটা সে বিলক্ষণরূপেই জানিত। সেই জন্যই কখনও আপনার ইচ্ছায় বাড়ী ঘরে আসিত না। শ্বশুরের উপর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়াই এতদিন সে সংসার হইতে দূরে দূরেই কাটাইয়াছে। এখন আর কোন বাধাই নাই। নূতন ঘর দ্বার করিয়া সাজাইয়া গোছাইয়া নিজের ঐশ্বর্য্য দরিদ্র পল্লীবাসিনীদের দেখাইবার ইচ্ছা আজকাল তাহার মনের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। সাবান মাখা, কাপড় কোঁচান, বাক্স সাজানো ছাড়া তাহার অনেক কায বাড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীর প্রত্যেক জিনিসের ফর্দ্দ তৈরি হইতেছিল। ক'খানা শয়নের খাট, বালিস, থালা ঘটীর হিসাব পর্য্যন্ত বিজলীর মরক্কো বাঁধান লাল খাতা খানার বুকে অক্ষরের পর অক্ষরের মালায় ভরিয়া উঠিতেছিল। শ্বাশুড়ীর অবশিষ্ট গহনা, শ্বশুরের টাকা সিকেটা প্রখর বুদ্ধিশালিনী বড়বধুর বাক্সে স্থান পাইয়া ধন্য হইতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অন্নদা গিয়া স্বামীকে বলিল, "বাবার বাক্সে মার যে কখানা গয়না দুলালের বৌয়ের জন্যে আর মিছরীর জন্যে ছিল, সেগুলো দিদি বার করে নিয়েছেন। আর সব জিনিসের ফর্দ্দ করছেন।"

একটু ভাবিয়া মোহন উত্তর করিল, "শ্রাদ্ধে লোক-জনের গোলমালে হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনা আছে তাই বোধ হয় বৌদি সব লিখে রাখচেন। মার গহনাগুলো বৌদির কাছে থাকাই ভাল।"

যথাসময় কয়েকটি জ্ঞাতি বন্ধু নিমন্ত্রণ করিয়া ভুবন-লাল পিতার শ্রাদ্ধব্যাপার নির্ব্বাহ করিলেন। যিনি কোঠা দিবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি পিতার শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে পারিলেন না; ইহাতে গ্রামবাসীরা মনে মনে খুবই রুষ্ট হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে সাহস করিল না। কি জানি আপদে-বিপদের সময় ইহারই নিকট যদি হাত পাতিতে হয়। অর্থশালী লোককে অসন্তুষ্ট করা বুদ্ধিমানের কায নয়।

কয়েকদিন পর বাড়ীর সম্মুখস্থ আম বাগান কাটা-

ইয়া দালানের ভিত্তি গাড়িয়া ভুবনলাল সস্ত্রীক কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঘর তৈয়ারীর সমস্ত ভারই মোহনের উপর ন্যস্ত রহিল।

৪

প্রতিবেশীদের বিস্ময় ও ঈর্ষার মধ্যে ভুবনের কোঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা নূতন খবর, একখানি সংবাদপত্রে পল্লীর ঘরে ঘরে সেদিন নববার্ত্তা বহন করিয়া অনেকের হৃদয়ে হর্ষের পরিবর্ত্তে বিষাদের সৃষ্টি করিল। বিরূপা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যাহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, বীণাপাণির তাহারই প্রতি এত পক্ষপাত ইতিপূর্ব্বে গ্রামের বুড়ো হারু ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত দেখেন নাই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন।

অভিনব সংবাদটি আর কিছুই নয়—দুলালের কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়া পরীক্ষার পাশের খবর। দুলালের কৃতিত্বে মোহন ও অন্নদা আনন্দে দিশাহারা হইল। আজ এ আনন্দের দিনে পিতা নাই ভাবিয়া দম্পতীর হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিতেছিল। অন্নদা জয়দুর্গার মণ্ডপে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল, মনসাতলায় দুগ্ধ চিনি দিয়া পূজা পাঠাইল। এমন আশাতীত গৌরব—ইহা যে দেবতার অসীম করুণা। তাহাদের হর্ষোচ্ছ্বাস প্রশমিত হইতে না হইতে সেদিন শারদরৌদ্রে উদ্ভাসিত প্রভাতে অতর্কিত অপ্রত্যাশিতভাবে দুলাল পিতামাতার সহিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "কাকাবাবু কোথায় আপনি? কাকীমা, দেখে যাও আমরা এসেচি।"

মোহন বাড়ী ছিল না। মিছরী পাড়ায় খেলিতে গিয়াছিল। অন্নদা ঠাকুরঘরে বসিয়া শিব গড়িতেছিল, বাহিরে আসিয়া দুলালকে সম্মুখে দেখিয়া অন্নদার কালো চক্ষু দুটী আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রণত দুলালের মস্তকটি স্নেহভরে চুম্বন করিয়া সে বিজলীকে প্রণাম করিল।

কিয়ৎকাল পরে মোহন বাড়ী ঢুকিয়া দুলালকে দেখিতে পাইয়া আবেগভরে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। দুলাল তাহার বড়ই স্নেহাস্পদ, প্রাণাধিকতুল্য। আজ প্রায় দুইটি বছর পর দশের মধ্যে এক হইয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়া সে ঘরে ফিরিয়াছে; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি দুলালের আশাপথ চাহিয়া ছিলেন, তিনি আজ কোথায়?

বাল্যকাল হইতেই দুলাল কাকা কাকীমার অতিশয় অনুরক্ত। এটা বিজলীর ভাল লাগিত না। তিনি আশা করিয়াছিলেন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুলাল আপন পর বুঝিয়া চলিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা না দেখিয়া বিজলীর মনস্তাপের পরিসীমা রহিল না।

সমস্ত দিন দুলাল কাকার সহিত ছায়ার মত হাটে, বাজারে, শীর্ণধারা নদীর কূলে ঘুরিয়া বেড়ানো আরম্ভ করিল। সন্ধ্যায় কাকীমার রন্ধনশালা দুলালের প্রাণ-খোলা সরল হাসিগল্পের মূর্চ্ছনায় মুখরিত হইতে লাগিল। কাকীমা কলিকাতার ন্যায় আজব সহর দেখেন নাই; ভাসুরপো বর্ণনাচ্ছলে পল্লীবাসিনীকে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিত।

সেদিন কথায় কথায় দুলাল কহিল, "কাকীমা, একটা মজার কথা শুনেচ? আমার বন্ধু হীরুর মা খুব ভাল রান্না করতে পারেন কি না, তাই খাওয়াতে সে একদিন তাদের বাড়ী আমায় নেমন্তন্ন করেছিল—খাওয়ার পর হীরুর মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন রান্না খেলে দুলাল?' আমি বল্লাম, 'আপনি খুব সুন্দর রান্না করেন, বেশ খেলাম; কিন্তু আমার কাকীমার মত রান্না আমি আর কোথাও খাই নি!' তাই শুনে হীরু পূজোর ছুটীতে তোমার রান্না খেতে এখানে আস্‌তে চেয়েছে। সে এলে অনেক রকম রান্না করে কিন্তু তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার হাতের রান্না কেমন।"

অন্নদা অবনত মুখে আনন্দাশ্রু মুছিতে লাগিল। বারান্দায় বসিয়া বিজলী কুটনো কুটিতেছিল, ছেলের কথা শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে সুমধুর প্রীতিরস উছলিয়া উঠিল না ইহা বলাই বাহুল্য। সে অন্ধকার শয়ন-কক্ষের কোণে বসিয়া মনে মনে একটা নূতন ফন্দী পাকাইয়া তুলিল।

এবার ভুবনলাল কলিকাতা হইতে আসিবার সময় এমন একটা কায করিয়া আসিয়াছিলেন, যাহাতে ২।১ বছরের ভিতর তাঁহার আর সে পথে ফিরিবার উপায় ছিল না। সে কাযে প্রাণের ভয় না থাকিলেও শ্রীঘর বাসের ভয় সাড়ে ষোল আনাই ছিল। যে জন্য এ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আর কিছুই নয়—অনেক গুলি শুভ্র রৌপ্য চাকতি। বিজলী ভাবিয়া দেখিল, সেগুলি অধিক সুদে খাটাইলে তাহাদের অন্ন বস্ত্রের জন্য স্বামীর অন্য অবলম্বন না করিলেও চলিবে। দুলাল মামাদের বাসায় থাকিয়া বৃত্তির টাকাতেই পড়াশুনা করিবে। ভুবনলাল বাড়ী বসিয়া জোতজমা যাহা আছে তাহার তদ্বির করিলে অনর্থক তিনটী প্রাণীর ভরণ পোষণের দায় হইতে অব্যহতি পাওয়া যাইবে।

সমারন্তরে স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া ভুবনলাল একটু দুঃখিত হইলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। বিশেষত বিজলী যখন তাঁহাকে বুঝাইল ইহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও দোষ নাই। ঠাকুরপো নিজেই চাকুরীর চেষ্টায় ব্যাকুল। সে এবং তার স্ত্রী যখন তখন বলিয়া থাকে "পরের অন্ন খাওয়া বিষতুল্য" ইত্যাদি। কতকটা রাগে কতটা দুঃখের সহিত ভুবন কহিল, "আমি তার পর—এতদিনে যখন সে কথাটা মনে হয়েছে তখন—আর কি করতে পারি। তাদের যা খুসী করুকগে।"

বিজলী প্রসন্ন চিত্তে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল কেমন করিয়া ঘরের শত্রু বিদায় করিবে!

৫

সেদিন অপরাহ্ণে মোহন প্রাঙ্গণে বসিয়া দুলালের জন্য বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া মাছ ধরিবার ছিপ তৈয়ার করিতেছিল; অন্নদা বিছানা পাতিয়া ঘর ঝাড় দিয়া মিছরীর চুল বাঁধিতে বসিয়াছিল। আজ দুলাল ঘরে ছিল না, গ্রামান্তরে মাসীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল।

বিজলী এমন সুযোগ অবহেলা করিতে পারিল না। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "একটা কথা তোমায় বলতে এসেছি ঠাকুরপো, কথাটা অপ্রিয় হলেও আমার না বলে উপায় নেই। তোমার দাদা তো কাযকর্ম্ম ছেড়ে চলে এলেন, এখন চলবে কেমন করে তাই আমাদের ভাবনা হয়েছে। তিনি বলছিলেন তোমাদের নিজের পথ দেখতে। তোমরা একটা আধটা প্রাণী নয়, তিন জনা; আমরাও তাই; বাড়ী বসে থাকলে চলবে কেমন করে?"

মোহন এমন অসম্ভাবিত অভাবিত কথা শুনিবার আশা করে নাই, সে আকাশ হইতে পড়িল। বিহ্বল নেত্র মেলিয়া অনেকক্ষণ বধূঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পর বিজলীর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল। অভিমানে কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল। উন্নত দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া মোহন উত্তর দিল, "দাদাকে বল্‌বেন বৌদি, আমি কালই নিজের পথ দেখবো।"

এত সহজেই যে কার্য্যোদ্ধার হইবে ইহা বিজলী কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার চেষ্টার সাফল্যে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া সে আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

অন্নদা স্বামীকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রাগ দেখিয়ে বল্লে কালই চলে যাবে; কোথায় যাবে বল তো? যাঁরা খেতে দেবেন তাঁদের কথা সয়েই থাকতে হয়।"

"আমরা ত পাড়াপরশীর খাই না, অনু, যার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কৃষাণের সঙ্গে মাঠে মাঠে চায আবাদ করে, নিজে কৃষাণ হয়ে মুটে হয়ে, পাঁচটা লোকের খাটুনী খেটে খাই। এ তো কুঁড়েমীর খাওয়া নয়। তবু দাদা আমায় ভার মনে করচেন। দুলাল অক্ষম হলে কি তাই মনে করতেন? আমি তাঁর কাছে ত দুলালের মতই।" একটু থামিয়া মোহন পুনরায় কহিল, "কোথায় যাব জিজ্ঞেস করচ? তোমায় সীতাপুর মার কাছে রেখে, আমি কাযের চেষ্টায় বেরুবো। পরের গোলামীর অভ্যেস নেই, তা পেরে উঠবো না; তোমার গয়না কখানা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকার যোগাড় করে যা হয় একটা কিছু করতে হবে।

অন্য কিছু না পারি একটা মুদীর দোকানই করবো। আজই আমি চলে যেতাম, কিন্তু দুলালকে না দেখে যাওয়া হবে না। কাল দুলাল বাড়ী ফিরলে আমরা বিকেল বেলাই রওনা হব। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো।” বিনা বাক্যব্যয়ে অন্নদা চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

সমস্ত রাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটাইয়া প্রভাতে মোহন ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ হৃদয়ে পাড়ায় যাইয়া গোরুর গাড়ী ঠিক করিয়া আসিল। নিজেদের জামা কাপড়গুলি বাক্সে সাজাইয়া বিছানা বাঁধিয়া রাখিল।

প্রতিদিনের মত আজও প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ণ আসিল, মোহনের অবর্ণনীয় হৃদয়ভার দেখিয়া বা অন্নদার অসীম আকুলতায় অপরাহ্ণ আসিতে এতটুকুও বিলম্ব করিল না। যথাসময় গো-শকট আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। নূতন জায়গায় যাইবার আনন্দে চঞ্চলা মিছরী নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া তাহার বড় আদরের পুতুলের বাক্সটি কোলে লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

অন্নদা আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া স্বর্গীয় শ্বশুরের কথা স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল। এই গ্রাম বাড়ী ঘরের সহিত তাহার যে কি স্নেহের বন্ধন ছিল, আজ তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। এখানকার ক্ষুদ্র তৃণগাছির প্রতিও যে তাহার কত মমতা—ইহা ফেলিয়া সে কেমন করিয়া চিরতরে অন্যত্র চলিয়া যাইবে?

যাত্রার সময় মোহন ক্ষুব্ধ অন্তরে দাদাকে প্রণাম করিতেই, তিনি কি যেন বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াই মস্তক অবনত করিলেন। মোহন সেখান হইতে ধীরে ধীরে বৌদিদির ঘরে গিয়া দেখিল, পাড়ার রাঙাপিসী সেখানে বসিয়া বিজলীর স্বহস্তে প্রস্তুত কার্পেটের উপর ময়ূর ও তার সংযোগে পুঁতি দিয়া তৈয়ার কুকুরের শত মুখে সুখ্যাতি করিতেছেন। অবশ্য তাঁহার একটা উদ্দেশ্য ছিল; এ প্রশংসা ভূমিকামাত্র।

মাসীর বাড়ী হইতে সদ্য প্রত্যাগত দুলাল মাদুরে শুইয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতেছিল। অস্ফুট কাতর স্বরে মোহন কহিল, “আমরা যাচ্ছি বৌদি, এস প্রণাম করি।”

বৌদি সরিয়া গিয়া দেবর ও যায়ের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। সকরুণ দৃষ্টি একটিবার দুলালের দিকে প্রসারিত করিয়া মোহন সস্ত্রীক বিদায় লইল। মিছরী পূর্ব্বেই গাড়ীতে গিয়া বসিয়া ছিল।

দুলাল ভিতরের কথা কিছুই জানিত না। মায়ের নিকটে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সে যাহা জানিল, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার হৃদয়বীণার কোমল তারগুলি যেন কাহার কঠিন স্পর্শে ছিঁড়িয়া গেল। ক্ষিপ্রপদে গাড়ীর নিকটে ছুটিয়া গিয়া দুলাল ডাকিল, “কাকাবাবু কোথায় যাচ্চেন? কাকীমা, নেমে এস।”

অন্নদা এ মধুর স্নেহসম্বোধন সহিতে পারিল না, চক্ষে অঞ্চল দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মোহন আস্তে আস্তে কহিল, “আমি কাযের চেষ্টায় যাচ্চি দুলাল, তুই ঘরে ফিরে যা, আবার দেখা হবে।”

দুলালের পশ্চাৎ হইতে বিজলী কহিল, “ওদের দরকারে ওরা যাচ্চে; তুই বাধা দিচ্চিস কেন? ফিরে আয়।”

দুলাল কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল, “আমি ফিরে যাব না মা। এ বাড়ীতে কাকাবাবুর স্থান না হলে আমারও হবে না।”—বলিয়া সে গোরুর গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিল।

তখন ভারি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। বিজলীর চীৎকার ও ক্রন্দনে, পাড়ার লোক ছুটিয়া দেখিতে আসিল। হঠাৎ ভুবনলাল রাস্তার পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। সব শুনিয়া, ভ্রাতার হাতখানা টানিয়া লইয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে কহিলেন, “দাদার সব দোষ ভুলে গিয়ে ফিরে চল্ ভাই। বাড়ী ঘর জোত জমা তোর চেষ্টায় তোর যত্নেই সব—তুই চলে গেলে দুদিনেই সমস্ত শশ্মান হয়ে যাবে। আমার দুর্ব্বলতা একটি বারের জন্য ক্ষমা কর্ মোহন।”

মোহন আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া দাদার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"বাবা চলে গেছেন, এখন তুমিই আমার সব, দাদা! আমার ক্ষণিকের অভিমান তুমিও মাপ কর।"

গাড়ী বিদায় দিয়া সকলে বাড়ী ফিরিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে ছুইটি হৃদয় বিপুল বেদনাভার বহিয়া পথে বাহির হইয়াছিল, সেই ছুইটি হৃদয়ই অনির্ব্বচনীয় হর্ষোচ্ছ্বাস বক্ষে লইয়া আপনাদের শান্তিভরা সুখভরা চিরন্তন গৃহের মাঝে ফিরিয়া আসিল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

স্বপ্নময়ী

(গল্প)

আনন্দচন্দ্রের কথা।

বলরামবাটী মস্ত গ্রাম। সেখানে এক্‌জন মস্ত দুর্দ্দান্ত জমীদার ছিলেন, তাঁহার এত প্রতাপ যে তাঁহার ভয়ে তাঁহার জমীদারীর মধ্যে কোনও স্থানে চোরে চুরি করিতে পারিত না, ডাকাতে ডাকাতি করিতে পারিত না। লোকে এমনও সন্দেহ করিত যে তাহারা জমীদার বাবুর "মাসতুতো ভাই" হওয়ায় তাঁহাকে এবং তাঁহার জমীদারীকে অব্যাহতি প্রদান করিত।

এই বলরামবাটীর পর ক্রোশব্যাপী ধান্যক্ষেত্র। এই ধান্যক্ষেত্রের অপর প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণপুর নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। এই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র এক কুটীরে আমাদের বাস। আমি কিন্তু গ্রামে বাস করিতাম না; মাঝে মাঝে আসিতাম মাত্র। গ্রামের কুটীরে বাস করিতেন আমারে চিরদুঃখিনী বিধবা মাতাঠাকুরাণী। আমি বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় থাকিতাম।

কলিকাতায় আমার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। তিনি এক কাঠের গোলায় সরকারের কায করিতেন। তাঁহার বাসের জন্য ঐ গোলার উপরিভাগে খোলার ছাদবিশিষ্ট এবং তক্তার দ্বারা বেষ্টিত একটি অপূর্ব্ব স্থান রচিত ছিল। আমি সেই স্থানে সেই আত্মীয়ের সহিত বাস করিতাম। তিনি যে অন্ন রাঁধিতেন আমাকে তাহার ভাগ দিতেন; এবং যে আলোকের সাহায্যে তিনি সন্ধ্যার পর হিসাবপত্র লিখিতেন, আমি তাহারই সাহায্যে অধ্যয়ন করিতাম। বাস আহার ও আলোকের জন্য আমি তাঁহাকে মাসিক টাকা মাত্র প্রদান করিতাম।

আমাদের পল্লীগ্রামের ভগ্ন কুটীরটি রক্ষা করিবার জন্য, দুঃখিনী মাতার এক বেলার আহার সংগ্রহের জন্য, উপরিউক্ত বাসা খরচের জন্য, কলেজের মাহিনা এবং অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহ জন্য দ্বারে দ্বারে প্রাইভেট টিউসানি করিয়া আমার দিবাভাগটা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাহার পর ইংরাজিতে এম্‌এ পরীক্ষা দিবার জন্য অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিতে করিতে, আমায় ছিন্ন মাদুরের উপর বাহু উপাধানে অবসন্ন মস্তক রক্ষা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম!

একদিন সেইরূপ অবস্থায় ঘুমাইয়া আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম।

সেই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার পর, আমি মনে মনে একটা প্রকাণ্ড এবং অখণ্ডনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যদি কখনও সেই স্বপ্নদৃষ্টা দেবীকে মানবীমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে দেখিতে পাই, তাহা হইলে, সেই দেবীর রক্তোৎপল পদে সদ্যোবিকশিত শতদলের ন্যায়, আপ হৃদয়ের প্রস্ফুট প্রেম উপহার দিব।

আমি প্রাইভেট টিউসানি করিতাম,—কিন্তু প্রচলি

ছোট গল্পের টুটারের মত কখনও আমার ছাত্রীগণকে অথবা ছাত্রগণের প্রেমিকা আত্মীয়াগণকে আমার প্রেমের পাত্রী করি নাই; তাহারাও আমার এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবয়বের দিকে প্রেমনয়নে চাহে নাই। আমার প্রেমের পাত্রী স্বপ্নের আলোকময়, সৌরভময়, পুষ্পময় পথে বিচরণ করিয়া কেবলমাত্র একবার আমাকে দেখা দিয়াছিল, কেবলমাত্র আমার প্রতি একবার প্রেমপরিপূর্ণ নয়নে চাহিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর, দেবতাগণকে সাক্ষ্য রাখিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাকে ব্যতীত জীবনে আর কাহাকেও জীবনসঙ্গিনী করিব না।

২

আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। জানিলাম, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। সে শুভসংবাদ নিজমুখে মাতাকে জানাইবার জন্য আমি আমার ছাত্রগণের নিকট কয়েকদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমাদের পল্লীগ্রামের জীর্ণ কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার আনন্দচন্দ্র মিত্র নাম সংক্ষেপ করিয়া মাতা আমাকে 'আনা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদিন মাতা বলিলেন, "আনা শোন্। ওপাড়ার হরঠাকুরুণ আজ সকালে তোর বিয়ের একটা সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিলেন।"

আমাদের গ্রামে এক পুরোহিত গোষ্ঠী বাস করিতেন, তাঁহারা আমাদের গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে কায়স্থগণের বাটীতে পৌরোহিত্য করিতেন। হরঠাকুরুণ সেই গোষ্ঠীর একজন বর্ষীয়সী বিধবা; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংবাদ বহন করা তাহার একটা অতি প্রীতিকর কর্ম্ম ছিল।

বিবাহের কথা শুনিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি কহিলাম, "না, মা, ওসব বিষয় সম্বন্ধে তুমি এখন কাণ দিও না। আমরাই খেতে পাই নে; এখন বাড়ীতে লোক বাড়লে তাকে খাওয়াবে কি? আর আমাদের এই একখানি ভাঙ্গা চালা, অন্য লোক এলে দাঁড়াবে কোথায়?"

মাতা হাসিয়া বলিলেন, "সে ভাবনা তোর ভাবতে হবে না। সে মেয়েটী বলরামবাটীর বোসেদের মেয়ে। হৃদয় বোসের নাম শুনেছিস ত?—তাঁরই মেয়ে।"

আমাদের এ অঞ্চলে বলরামবাটীর দুর্দ্দান্ত জমীদার হৃদয়নাথ বসুকে কে না জানিত? তাঁহার নিযুক্ত ভীমকল্প লাঠিয়ালগণকে কে না শঙ্কিত নয়নে অবলোকন করিত? তাহাদের হুঙ্কার শুনিলে কাহার হৃদয় না দুরু দুরু শব্দে কাঁপিয়া উঠিত। আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "সর্ব্বনাশ! মা, তুমি সেই ডাকাত জমীদারের মেয়েকে আমাদের এই ভাঙ্গা কুড়ে ঘরে আনতে সাহস কর?"

মাতা যুক্তি দেখাইলেন "তাঁরা কি বলেছেন, জানিস্? তাঁরা বলেছেন যে বিয়ের পর তোর মাসহারা বরাদ্দ করে দেবেন; আর তোকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ঘরজামাই করে রাখবেন। তা হলে তোর নিজের ভাবনাও ভাবতে হবে না, পরিবার প্রতিপালনের ভাবনাও ভাবতে হবে না।"

মাতার বাক্য শুনিয়া, দরিদ্রের প্রতি ধনাঢ্যের এই স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত আগ্নেয় গিরির জলন্ত ধাতুস্রাবের ন্যায় প্রবাহিত হইল। যদি আমি কখনও আমার সেই দেবীকে স্বপ্নপথে দেখিয়া সেই স্বপ্নময়ীকে বিবাহ করিবার জন্য দেবতাকে সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা না করিতাম, তাহা হইলেও আমি এই হীন ঘৃণ্য বিবাহে সম্মত হইতে পারিতাম না। আমার মানসিক ঘৃণা মনোমধ্যে কতকটা প্রশমিত করিয়া কহিলাম, "মা, তুমি আমাকে জমীদারের—ডাকাত জমীদারের—ঘর জামাই হতে বল? আমি জমীদার বাড়ীতে জামাই বাবু সেজে তেতালায় বসে ক্ষীর দুধ খাব, আর তুমি আমার মা, তুমি এই ভাঙা চালাতে বসে, বর্ষার জলের সঙ্গে চোখের জল মেশাবে, আর মশা মাছি তাড়িয়ে শাক আর পান্তাভাত খাবে? ছি ছি! এই জন্যেই কি তুমি আমাকে পেটে ধরেছিলে? এই জন্যেই এত কষ্ট করে সর্ব্বস্ব নষ্ট করে আমাকে বাঁচিয়ে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে? মা, তুমি তোমার গর্ভের সন্তানকে এতটা নীচ হতে বল?"

আমার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া জননী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কিয়ৎক্ষকাল নীরবে বসিয়া পুত্রস্নেহের আনন্দটা উপভোগ করিয়া লইলেন; তাহার পর ধীরে কহিলেন, "তা, তোর যদি ঘরজামাই হয়ে শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে আপত্তি থাকে আনা, তা হলে আগে লেখা-পড়া শেষ করে টাকাকড়ি রোজগার কর, ভাল করে বাড়ী তৈরী কর, তার পর বিয়ে করিস্ আর বৌকে ঘরে নিয়ে আসিস্।"

আমি সেইরূপ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলাম, "আর তিন বছর দেরী কর মা, তার পর সব হবে।" তখন আমার মনে হইয়াছিল যে এই দীর্ঘ তিন বৎসরকাল মধ্যে আমি অনায়াসেই আমার স্বপ্নময়ীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব; এবং তাহাকে পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া আমার নবনির্ম্মিত বাটীতে লইয়া আসিব।

আপাততঃ মাতাঠাকুরাণী আর বিবাহের কথার উত্থাপন করিলেন না।

এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আমি দুইদিন পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তখনও আইন কলেজ খুলিবার বিলম্ব ছিল। এই সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইবার মানসে আমি একটা অস্থায়ী কার্য্য পাইবার জন্য নানা স্থানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।

৩

একদিন অস্থায়ী চাকুরীর সন্ধানে সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া আমি সন্ধ্যার পর আমার আবাসে ফিরিয়া আসিলাম। একটী কেরাসিন দীপের ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে দেখিলাম, কে এক ব্যক্তি আমার ছিন্ন মাদুরের উপর বসিয়া রহিয়াছেন।

আমি দীপটী হস্তে লইয়া, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম "কে আপনি?"

তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষৌরাচরিত সুন্দর মুখখানি আমার দিকে ফিরাইয়া, তাঁহার বৃহৎ নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা আমাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আপনার—এই তোমার নামই কি আনন্দচন্দ্র মিত্র?"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নাম কি? আমি ত আপনাকে চিন্‌তে পারছিনে।"

তিনি তাঁহার মার্জ্জিত মুক্তাশ্রেণী সদৃশ শুভ্র ও সুন্দর দন্ত সকল ঈষৎ বিকশিত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি—এই তুমি বোধ হয় আগে কখনও আমাকে দেখনি? তুমি বসো আমি পরিচয় দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি আমার মাদুরের একপার্শ্বে বসিয়া আমার বসিবার স্থান করিয়া দিলেন।

আমি আমার হস্তস্থিত টিনের দীপটী আমার আম কাঠের বাক্সের উপর রাখিয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে উত্তমরূপে দেখিলাম। আহা কি শান্ত, কি সরস, অথচ জ্ঞানের দীপ্তিপূর্ণ মুখশ্রী! কি শুভ্র, কি নির্ম্মল, অথচ সম্পূর্ণ আড়ম্বর বিবর্জ্জিত পরিধেয় বসন!

তিনি সস্মিত মুখে অতি মধুর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি তোমাদের দেশের শ্রীকৃষ্ণপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তোমার মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি নিয়ে, আর তাঁরই কাছ থেকে তোমার ঠিকানা জেনে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তুমি বাড়ী ছিলে না, তাই আমি তোমার অপেক্ষায়, তোমার বিছানায় প্রায় দু'ঘণ্টা বসে আছি।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "এই গরমে, এই অন্ধকারে দু'ঘণ্টা বসে থাক্‌তে আপনার না জানি কত কষ্ট হয়েছে!"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। বরং নির্জ্জনে বসে থাকার সুযোগ ঘটায়, আমি নিশ্চিন্ত মনে একটু চিন্তা করবার অবসর পেয়েছিলাম।"

আমার ঘর্ম্মসিক্ত মলিন পিরানের পকেটে চারি আনা পয়সা ছিল। আমি মনে করিলাম, এমন একটা ভদ্রলোকের প্রতি, এই চারি আনা পয়সা ব্যয় করিয়া একটু শিষ্টাচার দেখাই। অতএব আমি তাঁহাকে

কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশাই যদি অনুমতি করেন, একটু জলযোগের উদ্যোগ করি?"

তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, ও সব কিছু করবেন না।"

আমি। পাণ? সিগারেট?

তিনি হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "না, না, আমি সিগারেট কখনও খাইনি; আমার বাবাও কখনও খান্‌নি। আর পাণও বড় একটা খাইনে। আমি দিনে একবার আহার করি; আহারের পর, একটা পাণ খাই। থাক্, ও সব কথা এখন থাক্। যে কাযের জন্যে তোমার কাছে এসেছি, আগে তাই শোন।"

আমি। আপনার পরিচয় এখনও পাইনি।

তিনি। আমি বলরামবাটী থেকে এসেছি। আমার নাম, হৃদয়নাথ দাস বসু।

তন্মুহূর্ত্তে গুম্ফ আস্ফালন করিয়া জার্ম্মাণির কাইজার, অথবা পাশহস্তে স্বয়ং যমরাজ যদি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন, তাহা হইলেও আমি অধিকতর বিচলিত হইতাম কিনা সন্দেহ। এই শান্ত, এই শিষ্ট, এই সুন্দর, এই হাস্যময় ভদ্রলোকটিই বলরামবাটীর দুর্দ্দান্ত ডাকাত জমীদার হৃদয়নাথ বসু! বিপুল বিস্ময়ে আমার বাক্যরোধ হইয়া গেল; আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার প্রসন্ন প্রশস্ত ললাটের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে ঐ প্রসন্ন ললাটতলে দুষ্ট বুদ্ধি সকল, পুষ্পমধ্যে বিষধরের ন্যায়, লুক্কাইত থাকিতে পারে।

আমাকে তুষ্ণীম্ভাবাপন্ন দেখিয়া হৃদয় বাবু তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন,—"আমার একটি মেয়ে আছে; তুমি বোধ হয় তা শুনেছ, তোমার মা সে কথা তোমাকে বলেছেন। তোমার সঙ্গে আমি সেই মেয়েটির বিয়ে দিতে চাই। তোমার একটা আপত্তি আছে শুনলাম;—তুমি ঘর জামাই হয়ে থাক্‌তে চাও না। ঘর-জামাই হয়ে থাক্‌বার কথা যিনি তোমাদের বলেছিলেন, তিনি আমাদের কথাটা, বোধ হয় ভাল বুঝতে পারেন নি। ঘরজামাইয়ের মত হেয় লোকের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমার নিজের ত আপত্তি আছেই,—তাতে আমার মেয়েরও খুব আপত্তি আছে। সে তার সমবয়সীদের কাছে বলেছে যে, সে বাপের বাড়ীতে বাস করে' একটা পোষা ঘরজামাই বর নিয়ে কখনও সুখী হতে পারবে না। সে চায় স্বামী, বাপের অন্নভিখারী চায় না। প্রতিভা—আমার মেয়ের নাম প্রতিভাময়ী—প্রতিভা অন্য মেয়ের মত নয়। সে কি বলে জান? সে বলে যে, স্ত্রীর অনুশাসিত স্বামী উৎকৃষ্ট ভৃত্য বটে, কিন্তু তাকে স্বামী বলা চলে না; স্বামী হবেন শাসনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা; তবে ত তাঁকে স্বামী বলে মানতে ইচ্ছা করবে। আমার স্ত্রী লোকমুখে তার এই সব কথা শুনে আমার কাছে এসে বলেছিলেন।"

আমি তাঁহার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া কহিলাম, "আপনি বোধ হয় জানেন না যে আমি কপর্দ্দকশূন্য, হীন দরিদ্র। তার উপর—"

তিনি বলিলেন, "দরিদ্রতাকে আমি গুণহীনতা মনে করিনে। ওটা দোষও নয়, পাপও নয়। যে ধন-হীন হয়ে ধনহীনতার সঙ্গে লড়াই করতে পারে নি, সে মানুষ মানুষই হয় নি। যদি ধনহীন রাজ্যহীন হয়ে মহাভারতের পাণ্ডবগণ দুঃখে কষ্টে বনে বনে বিচরণ করতে না পারতেন, তাহলে, আমার মতে, তাঁরা পাণ্ডবই হতেন না। অর্জ্জুন যখন চীরধারী হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তখনই তিনি নরশ্রেষ্ঠ হতে পেরেছিলেন; জটাবল্কল ধারী রামচন্দ্র যখন ধনুক হাতে ক'রে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করেছিলেন, তখনই তিনি মানুষের চোখে ভগবান হয়ে উঠেছিলেন। এই আধুনিক পৃথিবীতেও আমি বার বার দেখেছি যে, দরিদ্রতা আর মহত্ব চিরকাল একই সূতায় বাঁধা থাকে। যে দেশে দক্ষকন্যা গরীব শিবের ঘর করে সতীশ্রেষ্ঠ হ'তে পেরেছিলেন, যে দেশে রাজকুমারী সাবিত্রী বনবাসী অর্থহীন সত্যবানকে স্বেচ্ছায় বরমাল্য প্রদান করে-ছিলেন, যে দেশে রাজনন্দিনী, রাজবধূ সীতা বনে বনে বল্কলধারী স্বামীর অনুগমন করেছিলেন, সেই পুণ্য দেশে আমার মেয়েও জন্মেছে—রাজকন্যা হয়ে জন্মায়।

আমার মত তুচ্ছ লোকের মেয়ে হয়ে জন্মেছে; সে অনায়াসে দরিদ্রতাকে বরণ করে নিতে পারবে।”

হৃদয় বাবুর আশ্চর্য্য বাক্যের মধুর ও বেগবান স্রোতে আমার প্রতিজ্ঞা কেন ভাসিয়া যায় নাই, তাহা আমিই বলিতে পারি না। এমন স্ত্রী লাভ করিবার এমন সহজ উপায় থাকিতেও আমি আমার প্রতিজ্ঞাটা কিরূপে অটল রাখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় স্বয়ং বিধাতাও বলিতে পারেন না।—অথবা, বোধ হয়, বিধাতার অভিপ্রায়ই ছিল যে, আমার মত চিরদুঃখী যেন কখনও সুখের মুখ দেখিতে না পায়—এই অন্ধকার জীবন যেন চিরদিনই অন্ধকার থাকিয়া যায়।

আমি আবার তাঁহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া কহিলাম, “মশাই, আমি যে কতটা অর্থহীন, তা, বোধ হয়, আপনি ধারণা করতে পারছেন না। স্ত্রীর মোটা ভাত কাপড় সংগ্রহ করবার সাধ্যও আমার নেই। এ জন্যে আমি ঠিক করে রেখেছি যে যত দিন টাকা রোজগার করতে না পারবো, তত দিন কোনও মতে বিয়ে করবো না। তা ছাড়া, উপার্জ্জনক্ষম হয়ে, আমার নিজের পছন্দ মত সুন্দরীকেই আমি বিয়ে করবো।”

হৃদয় বাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন, “আমার মেয়েও খুব সুন্দরী; তুমি যদি তাকে একবার দেখ্‌তে!”

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। যে স্নেহময় চক্ষু দিয়া তিনি আপন কন্যাকে সুন্দর দেখিয়াছেন, সেই চক্ষুর সম্মুখে যদি আমি কখনও আমার স্বপ্নদৃষ্টা দেবীকে রক্তমাংসের জীবন্ত শরীরে আনিতে পারিতাম, সেই অপূর্ব্বাকে যদি দেখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে, তাঁহার স্নেহের মোহ এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইত; তিনি আর কখনও আপন কন্যাকে সুন্দরী বলিতেন না। কিন্তু আমি আমার প্রিয়তমার সৌন্দর্য্যের কথা আমার মনোমধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল মাত্র বলিলাম, “কিন্তু আমার কথা ত আমি মশায়কে বলেছি। যতদিন না নিজে উপার্জ্জন করে পরিবার প্রতিপালন করতে পারবো, ততদিন আমি কোনও মতেই বিয়ে করতে পারবো না। আপন স্ত্রীর ভরণ পোষণের ভার অপরের স্কন্ধে চাপানোটা কি আপনি কাপুরুষের কায মনে করেন না?”

তিনি হাসিমুখে বলিলেন, “তোমার কথা শুনে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। যদি আমাদের সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ না হত, তা হলে, আমি আরও তিন চার বছর অপেক্ষা করে, তোমারই সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে চিরসুখী করতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়। তার বয়স এখনই চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়েছে। তার বিয়ে দিতে আর দেরী করা চলবে না; এই মাসের মধ্যেই দিতে হবে।”

৫

পূর্ব্বকথিত ঘটনার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রায় এক বৎসর কাল নানা প্রকার চাকুরী দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, জেলা আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। এজন্য জেলার সহরে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া লইতে হইয়াছিল; এবং ভোজন কার্য্যের সুবিধার জন্য, মাতাঠাকুরাণীকে পল্লীগ্রামের কুটীর হইতে সেখানে লইয়া আসিয়াছিলাম। একটা টেবিল, দুই চারিখানা ভাঙ্গা চেয়ার এবং খানকতক পুরাতন আইনের বইও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু একটি মক্কেলরত্নেরও করুণ দৃষ্টি এ দরিদ্রের উপর পতিত হয় নাই।

মক্কেলগণকে আক্কেলহীন দেখিয়া, এবং আমার সংগৃহীত অর্থ ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইতে থাকায়, আমি বুঝিলাম যে আমাকে অবিলম্বে ওকালতীর দোকান বন্ধ করিতে হইবে। বন্ধ ত করিতে হইবেই,—কিন্তু কি উপায়ে জীবন ধারণ করিব, কেমন করিয়া বাঁচিব?

কয়েক দিন মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, কোন স্থানে একটা সুবিধামত চাকুরী

গ্রহণ করিয়া আপাততঃ জীবিকা নির্ব্বাহ ও অর্থ সঞ্চয় করিবে, পরে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইলে, আবার ওকালতির চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি চাকুরী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেও, কেহ আমাকে তাহা দিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইল না। আমি দ্বার হইতে দ্বারান্তরে বিতাড়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমার মুখ রৌদ্রে রৌদ্রে মলিন হইয়া গেল; পরিধেয় বস্ত্র পথের ধূলায় ধূসরিত হইয়া উঠিল; তালি দেওয়া জুতা ছিঁড়িয়া যেন জিহ্বা বাহির করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু বিরূপ বিধাতার রাজ্যে চাকুরী নামক মহা সম্পদ কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। দুইমাস নিরাশায় অতিবাহিত করিয়া করিয়া, একদিন সহসা আমি একটু আশার আলোক দেখিতে পাইলাম।

মেদিনীপুর জেলায় গড়বাথান নামক একটা গ্রাম আছে। সেখানে এক জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার জমিদারীর জন্য চারিশত টাকা বেতনে একজন এম-এ, বি-এল্, ম্যানেজারের আবশ্যক হইয়াছিল। আমি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সেই কাযের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। দশদিন পরেই আমার আবেদনের উত্তর আসিয়াছিল। জমিদার বাবু আদেশ করিয়াছিলেন যে আমি গড়বাথানে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আমাকে ম্যানেজারি কার্য্য দেওয়া হইবে কি না তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। ঐ আদেশ পত্রে ইহাও উল্লিখিত ছিল যে আমাকে ঐ পদে পদস্থ করা না হইলে, জমিদার সরকার আমার যাতায়াতের ব্যয় বহন করিবেন।

আমি দুই দিন পরিশ্রম করিয়া, এবং দুই আনা মূল্যের সাবান খরচ করিয়া আমার ওকালতির সজ্জা এবং লজ্জা নিবারক পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিস্কৃত করিয়া লইলাম। এবং তৃতীয় দিনে গড়বাথান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে গড়বাথানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি আসিবার দিন স্থির করিয়া পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলাম, এজন্য আমার বাসস্থান পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল। জলযোগ ও আহারের বন্দোবস্ত ছিল। আমি আমার বাসস্থানে যাইয়া আগমন ক্লান্তি বিদূরিত করিলাম, জলযোগ করিলাম, আহার করিলাম। কিন্তু সে দিন আর জমিদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। শুনিলাম সন্ধ্যার পর তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

পরদিন মুখ হাত ধুইয়া, আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া ছিলাম, একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে জমীদার বাবু কাছারি বাড়ীতে আসিয়াছেন এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছেন।

আমি আমার ওকালতির পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আমার ভাবী প্রভুর শুভসন্দর্শন লালসায় এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া কাছারী বাটীতে গিয়া দেখা দিলাম। এবং যে সুন্দর ব্যক্তিকে সম্মানের সহিত ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহাকে জমিদার অনুমান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম।

আমার অনুমান বৃথা হয় নাই। তিনিই গড়বাথানের জমীদার। তাঁহার দেহ কিছু স্থূল হইয়া না পড়িলে তাঁহাকে অত্যন্ত সুপুরুষ বলা যাইতে পারিত; তাহার বয়স, ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক হইবে না। বিশেষ কারণবশতঃ আমি তাঁহার নামটা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না।

তিনি আমাকে প্রসন্নমুখে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন করিতে বলিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি শেষে বলিলেন, "আমরা আজ থেকেই আপনাকে কাযে নিযুক্ত করলাম। আপনি আপাততঃ মাসিক চার শ' টাকা হিসাবে বেতন পাবেন, সদরে থাকবার জন্যে একটা সরকারি বাড়ী পাবেন, মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াবার জন্যে একখানা ডাউলে পাবেন, আর তা ছাড়া ৬'জন সরকারি চাকর পাবেন। যতদিন মফঃস্বলে

থাকবেন, তত দিন রোজ চারি টাকা হিসাব খোরাকী পাবেন।”

আমি কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। আমার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে, তেমন সুবিধাজনক চারিশত টাকা বেতনের চাকুরী!—সে যে কি আনন্দ, তাহা তোমরা বাঙ্গালী, তোমাদিগকে কি বুঝাইয়া দিতে হইবে? বাঙ্গালী বীর চাকুরী লাভ করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, মহাবীর আলেক্জাণ্ডার পৃথিবী জয় করিয়া সেইরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি? আমি আমার বাসাবাটীতে ফিরিয়াই পত্র লিখিয়া মাতাকে আমার আনন্দের সংবাদ প্রদান করিলাম।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! তিন দিন অতিবাহিত হইতে না হইতে, আমি বুঝিলাম যে বিধাতা আমার ভাগ্যে সে আনন্দের উপভোগ লিখেন নাই।

আমার চাকুরী জীবনের তৃতীয় দিনে জমীদারী কার্য্যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আমার বাসা বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার প্রভু শ্রীযুক্ত জমীদার বাবু মহাশয় আদেশ করিয়াছিলেন যে, যতদিন না আমি অনুসন্ধান করিয়া একটি পাচক পাইয়া তাহাকে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি, তত দিন জমীদার বাটী হইতেই আমার খাদ্যদ্রব্য আসিবে। তদনুযায়ী একজন ব্রাহ্মণ, জমীদার বাটী হইতে জলখাবার আনিয়া আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছিল। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মুখ হাত ধুইয়া, জল খাবারের স্থালী হাতে তুলিয়া লইলাম।

ঐ স্থালীতে চারিটী বরফি সন্দেশ ও কিছু ফলমূল ছিল। চারিটী সন্দেশের উপর চারিটী প্রচলিত বাক্য ছাপা ছিল, যথা 'মিষ্টিমুখ', 'মনে রেখ,' 'ভুলো না', 'তোমারই'। সন্দেশগুলি এমন ভাবে সজ্জিত ছিল যে, কথাগুলি যেমন লিখিলাম, তেমনই পরে পরে পড়িতে পারা যায়। আমি পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক, সুতরাং এ বাক্যগুলি পরে পরে পাঠ করিয়া, আমি যেন কোনও গুপ্ত প্রেমিকার প্রচ্ছন্ন প্রেমের গন্ধ পাইলাম। সে যেন তাহার 'মিষ্টি 'মুখখানি 'মনে রাখিয়া' তাহা 'ভুলিতে' বারণ করিয়াছে, আর সে যেন 'আমারই'। কিন্তু সেই দীর্ঘ তিন বৎসর পরেও আমি আমার স্বপ্নময়ীকে ভুলি নাই; তখনও তাহারই প্রেমে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া ছিল। অন্যার প্রেমের কথা আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

কিন্তু 'মনে রেখ' সন্দেশটী ভাঙ্গিবা মাত্র আর এক নূতন রহস্য বাহির হইয়া পড়িল। আমি তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ দেখিতে পাইলাম। ঐ কাগজে লেখা ছিল,—

'বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাগানের দিকের
খিড়কির দরজা খোলা রাখিও। প্রভুপত্নী।'

এই লেখন পাঠ করিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; রহস্যটা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। কিন্তু এই নিগূঢ় রহস্যের নিরাকরণ জন্য আমি স্থির করিলাম যে রাত্রে, অন্যের অলক্ষ্যে, বাগানের দিকের দরজার অর্গল খোলা রাখিব। বলা বাহুল্য, দীপ্ত যৌবনে কেহই বিপদের আশঙ্কা করে না বা প্রবীণের সতর্কতা অবলম্বন করে না।—রাত্রে নয়টার পর ভৃত্যের অগোচরে সেই দরজার অর্গল অপসারিত করিয়া রাখিয়া দিলাম। এবং আপন শয্যায় শয়ন করিয়া বিনিদ্র অবস্থায়, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত একটী কৌতুককর অভিনয় দেখিবার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। বিস্ময়ে আমার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি? ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি? তিন বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আজ সত্যই কি তাহাকে বাস্তব মানব মূর্ত্তিতে আমার শয্যাপার্শ্বে দেখিতেছি? অথবা দিল্লীর খিলিজি বাদশাহ আলাউদ্দিন যেমন মুকুরে পদ্মিনীর মুখপদ্ম প্রতিবিম্বিত দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন, আমিও তেমনই কেবল একটা প্রতিবিম্বমাত্র দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম? আমার কথা কহিতে সাহস হইতেছিল না;—সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত সুন্দর জলবিম্বটী বায়ুর সামান্য ফুৎকারে যেমন মিলাইয়া যায়, আমার মনে হইতেছিল, বুঝিবা আমার বাক্যবায়ুর সামান্য বেগে সেই দীপালোকিত সুন্দর প্রতিকৃতিটি

রাত্রের অন্ধকার তেমনই মিলাইয়া যাইবে; আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইব না।

আমাকে বিস্মিত ও নির্ব্বাক দেখিয়া, আমার স্বপ্নময়ী মানুষের ভাষায় কথা কহিল; সে মৃদু-হাস্য-তরঙ্গিত সুধামুখে কহিল, "তুমি কি দেখছ? আমাকে? আমাকে কি তুমি আগে দেখেছিলে?"

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে আমি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছি না, সত্যই জাগিয়া আছি; সত্যই আমার স্বপ্নময়ী, শরীরিণী দেবীর মূর্ত্তিতে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, "আমি তিন বছর আগে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। তার পর, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না।"

সে আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাহার অতিসুন্দর মুখ আমার মুখের উপর অবনত করিয়া কহিল, "বল, আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

আমি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলাম, "আমি ত বলেছি যে তিন বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে ছাড়া এ জীবনে আর কাউকে বিয়ে করবো না। এখনও আমি আমার সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিনি।"

সে তাহার জ্যোতির্ম্ময় মুখ ঈষৎ মলিন করিয়া কহিল, "কিন্তু তিন বছর আগে বাবা যখন তোমাকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, তখন যদি আমাকে বিয়ে করতে তাহলে আমাকে আর দ্বিচারিণী হতে হত না; তোমাকে মনে মনে বরণ করে অন্যকে বিয়ে করতে হত না।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে তুমি? তোমার বাবার নাম কি?"

সে কহিল, "আমি প্রতিভাময়ী; বলরামবাটীর হৃদয়নাথ বসুর মেয়ে।"

আমার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন তপ্ত লৌহ শলাকার দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দিল। হায় হায়! আমি হতভাগা, আমি স্বেচ্ছায় এই পার্থিব রত্ন হারাইয়াছি; করতল গত সুধা হেলায় অন্যের মুখে তুলিয়া দিয়াছি!

সে আমাকে চিন্তিত দেখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ?"

আমার দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া আমি ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, "আমার অদৃষ্টের কথা ভাবছি।"

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তার সঙ্গে আমারও অদৃষ্টের কথা ভাবছ না কেন?"

আমি কহিলাম, "তোমার সম্বন্ধে ভাববার কিছুই নেই; তুমি ধনী সুরূপ স্বামীর হাতে পড়েছ; তুমি সুখে আছ।"

সে কহিল, "না, সুখে নেই। দ্বিচারিণী হয়ে কোন রমণীই সুখে থাকতে পারে না। মনে মনে একজনকে পূজা করে' বাইরে আর একজনের স্ত্রী হয়ে থাকা দ্বিচারিণীর কায। এ দ্বিচারিণীর জীবন আমার অসহ্য হয়েছে। তাই তোমাকে এখানে ম্যানেজার করে এনেছি; তাই তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এসেছি। আজ তোমার কাছে সকল কথা বলবো।"

আমি তাহার সকল কথা শুনিলাম। ছি, ছি! সে সকল কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না। আমার স্বপ্নময়ী দেবীকে নরকের কলঙ্ক মাখাইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত করিব না। সব শুনিয়া আমি বলিলাম, "আজ তুমি চলে যাও। আমাকে একদিন ভাবতে দাও। কাল ঠিক এই সময় আমার উত্তর জানতে পারবে।"

সে চলিয়া গেল। আমি সারারাত বিনিদ্র থাকিয়া চিন্তা করিলাম। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া কাছারী বাটীতে আসিয়া, আমার জরুরী খরচের তহবিল খাতাঞ্চী বাবুকে বুঝাইয়া দিলাম, চাবিগুলিও তাঁহারই জিম্মায় রাখিলাম, এবং জমীদার বাবুর জন্য একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখিলাম। তাহার পর, আমার ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া ধীরে ধীরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

প্রতিভাময়ীর কথা।

আমি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী; এবং তোমরা শুনিয়াছ কি না জানি না, আমি রূপসী। তাহার

উপর আমি সুশিক্ষিতা। আমি কবিতা লিখিতে পারি, মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে পারি, উপন্যাস পড়িয়া, তাহার পাত্রপাত্রীর চরিত্রের বিচার করি, কোন্ লেখিকা বা লেখক কি কি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, এবং কোন্ উপন্যাসে কোথায় কোন্ প্রেম-মধুরতা প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বলিতে পারি। তা' ছাড়া, আমি প্রেমিকা;—আমার ধনবান ও রূপবান স্বামী তোমাদের দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি কখন কখনও তাঁহাকে কিছু কিছু প্রেম বিতরণ করিয়া থাকি।

কিন্তু আমি পতিকে আমার সমস্ত হৃদয় দান করিয়া কখনও হৃদয়শূন্য হই নাই। উচ্চ শ্রেণীর মাসিকে সুশিক্ষিতা লেখিকাগণের সুচিন্তিত ও সুরচিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া আমি মনে মনে বুঝিয়াছিলাম যে, হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দান করিয়া, নিতান্ত পরাধীনার মত পতিপদতলে বিলুণ্ঠিতা হইলে, স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবনের মহা গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং আমি আমার অগাধ প্রেমের কিঞ্চিন্মাত্র স্বামীকে দান করিয়া, বাকী আবশ্যক মত সদ্ব্যয় জন্য, হৃদয় মধ্যে সঞ্চিত রাখিতাম।

তোমরা পুরুষ জাতি, তোমরা চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিবে, লক্ষ্মী মেয়েটির মত স্বামীকেই সমস্ত প্রেম দান করা উচিত। কিন্তু কেন বল দেখি, আমাদের ঔচিত্যটা তোমরা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে? কোন অধিকারে তোমরা উপদেষ্টার উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে নিম্নে রাখিবে? কিসে আমরা কম, যে তোমাদের অধীন হইয়া আমাদের স্বাধীন জীবন ব্যর্থ করিয়া দিব? হাঃ হাঃ হাঃ! তোমাদের ঐ তালের মত মাথাটায় কি, এমন সুকৃষ্ণ—কৃষ্ণসাগরের ঊর্ম্মির মত তরঙ্গায়িত কেশদাম আছে? তোমাদের চক্ষু দুইটা দর্শনেন্দ্রিয় মাত্র; তাহাতে কি আমাদের ললিত নয়নের কটাক্ষের ন্যায়—আলোক প্রতিফলিত হীরক রশ্মির ন্যায়—কটাক্ষ আছে? তোমাদের নাসিকা কেবল মাত্র "নাক ডাকের" জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাতে কি আমাদের মত হাসনুহানা-নিন্দিত সৌরভ-পবন প্রবাহিত হয়? তোমাদের দাঁত দাঁত নয়, দংষ্ট্রা; আর আমরা একটু হাসিয়া আমাদের নধর অধরের কোলে যে দাঁত দেখাই, তাহা দন্ত—দশনরুচি কৌমুদী। থাক্ আর অধিক বলিব না।

তোমরা বলিবে যে, গুণে স্বামী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহাকেই হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দান করিয়া, তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়া উচিত। না, তাঁহার মানসিক বা শারীরিক কোনও শ্রেষ্ঠতাই আমি স্বীকার করি না; যাহা যুক্তিহীন, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব?

তাঁহার মস্তিষ্কে যতগুলি সেল্ (cell) আছে, তোমরা অ্যানাটমি (Anatomy) পড়িয়া দেখ, আমারও মস্তিষ্কে ঠিক ততগুলি সেল্ আছে; তাহা হইলে আমার বুদ্ধিবৃত্তি হীন হইবে কেন? কেবল কর্কশতা ও স্থূলতাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইত, তাহা হইলে গাড়ী টানা মহিষগুলাকে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব বলা যাইতে পারিত। আমার এই ললিত দেহে, তাঁহার কর্কশ দেহের সকল গুণই বর্ত্তমান আছে।

মনের এই ভাব লইয়া আমি জীবন পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম। হঠাৎ একদিন আমার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। যে পুরুষজাতি অপেক্ষা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে ও আভ্যন্তরীণ গুণে আমি আপনাকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিতাম, তাহারই একজন হঠাৎ আমার গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া, কর্ত্তব্যের কঠিন পথ দেখাইয়া দিয়া, বুদ্ধিহীন সামান্য শিষ্যার ন্যায় আমাকে স্তম্ভিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

২

আমার মেসো মহাশয়ের বাটী কলিকাতায়। তাঁহার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলাম।

তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর;—বাঙ্গালীর মেয়ের

পক্ষে সম্পূর্ণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে চৌদ্দ নিতান্ত কম বয়স নহে। তাহার উপর বাবার অত্যধিক আদরে, এবং গৃহজাত দুগ্ধ ঘৃতাদির সাহায্যে আমার পূর্ণতা অতি দ্রুতগতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যৌবন রসে দেহ যেমন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, প্রেম রসে আমার মনও তেমনই সরস হইয়া উঠিতেছিল আমার সরস হৃদয়োদ্যানে প্রেমের ফুল ফুটিতেছিল।—আমি ভাবিতেছিলাম, এই ফুলগুলি কোন্ দেবতার পূজায় লাগিবে? এমন সময় হঠাৎ মেসো মহাশয়ের ---বাটীতে আমার দেবত আবির্ভূত হইয়া পড়িলেন।

যে দিন আমরা কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তাহার পরদিন সকালে হঠাৎ আমার অষ্টম বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ মাসতুত ভাইটি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল; এবং "মাষ্টার মশাই এসেছেন, মাষ্টার মশাই এসেছেন," বলিয়া বাটীর মধ্যে একটা তুমুল কোলাহল তুলিয়া ছুটিয়া বহির্বাটীতে গেল। আমার সেই মাসতুত ভাইটীর নাম মন্মথনাথ, কিন্তু সকলে তাহাকে সংক্ষেপে মনুবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। মনুবাবু পূর্ব্বদিনই, আমরা তাহাদের বাটীতে পৌঁছিবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার সহিত অত্যন্ত ভাব করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং আমাকে অন্যের অগোচরে বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার পড়িবার ঘরটী দেখাইয়া রাখিয়াছিল। সেই ঘরটি অন্দর মহলের দ্বিতলের এক কক্ষ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত।

অন্যান্য বালিকাগণের ন্যায়, কোনও অভ্যাগত আগন্তুক দেখিবার কৌতুহল আমার মনোমধ্যে কিছু অধিক মাত্রাতেই স্থান লাভ করিত। অতএব মনুবাবুর মাষ্টার মশাই জীবটি কি অপূর্ব্ব উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য আমি ছুটিয়া দ্বিতলের সেই কক্ষে উঠিলাম। এবং পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এবং অতি সুন্দর যুবাপুরুষ, তাহার সৌন্দর্য্যের দীপ্তি কোনওক্রমে মলিন পরিধেয় দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বিষণ্ণ আননে ঊর্দ্ধ নয়নে বসিয়া রহিয়াছে, আর মনুবাবু শ্লেটখানিকে আপন উৎসঙ্গে গ্রহণ করিয়া একাগ্র মনে অঙ্ক কষিতেছে।

আমি মাষ্টার মহাশয়ের বিষণ্ণ মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। চাহিয়া চাহিয়া, আমার নবীন বক্ষটা কি একটা অভিনব বিষাদে ভরিয়া গেল; মনে হইল, আমার বসনাঞ্চল দ্বারা সেই সুন্দর মুখের বিষণ্ণতা মুছিয়া দিই; তাহার সেই মলিন বস্ত্রের মলিনতা আপন নয়ন জলে ধুইয়া ফেলি; আমার সরস হৃদয়োদ্যানের আশু বিকশিত প্রেমপুষ্পগুলি তাহার পায়ের ধূলায় লুটাইয়া দিই!

পড়িতে পড়িতে, দুগ্ধপান করিবার অছিলায় মনুবাবু একবার বাটীর মধ্যে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে নিভৃতে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মাষ্টার মশায়ের নাম কি, মনুবাবু?"

মনুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল, "আনন্দ বাবু—বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র—এম্-এ, পড়েন—এবার এম-এ, এগ্‌জামিন দেবেন—তার আর দেরী নেই—শুনেছি, সমস্ত রাত জেগে পড়েন।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ী কোথায়?"

মনুবাবু পূর্ব্ববৎ দ্রুত গতিতে বলিয়া গেল, "কোন্ পাড়াগাঁয়ে বাড়ী—নামটা মনে পড়ছে না—কলকাতা থেকে বেশী দূর নয় - রেল গাড়ীতে দু'ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায়। এখানে থাকেন বৌবাজারে—একটা কাঠের গোলার ওপর একটা টোঙ্ আছে - বুঝেছ?—তাইতে। বড্ড গরীব কি না, ঘর ভাড়া করতে পারেন না।"

আমার অভিলাষ জন্মিল যে, তখনই আমার গাত্রালঙ্কার বিক্রয় করিয়া, তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করিয়া দিই। কিন্তু তখন আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার সুযোগ ছিল না। আমি কেবলমাত্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, "মনুবাবু, তোমার মাষ্টার মশায়ের বাড়ী কোন গ্রামে, আর কোন জেলায়, তা জেনে এসে আজই আমায় বোলো। বলবে?"

মনুবাবু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া ছুটিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেল। এবং পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাটীতে আসিয়া আমাকে সকল সংবাদ প্রদান করিল।

ইতিপূর্ব্বে মনুবাবুর মাষ্টার মহাশয়ের নাম শুনিয়া, তাঁহাকে আমাদেরই স্বজাতি জানিয়া আমি মনে মনে

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে আমাদের গ্রামেরই নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী জানিয়া আমার আনন্দটা আরও বাড়িয়া গেল। মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম যে বাবাকে কোনও উপায়ে কথাটা জানাইয়া যেমন করিয়া হউক, উহাঁকে বিবাহ করিবই। কিন্তু—কিন্তু উহাঁর যদি পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়া থাকে? এই সন্দেহটা মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র আমার মন বলিয়া দিল, না কখনই তাহার বিবাহ হয় নাই;—যাহার হৃদয় রমণীপ্রেমে পূর্ণ, তাহার মুখ কখনও অমন বিষণ্ণ থাকিতে পারে?

৩

বলরামবাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, আমার মনোবাঞ্ছা আমার এক গ্রাম্য সহচরীর নিকট প্রকাশ করিলাম। সে ক্রমে তাহা আমার মাতাকে জানাইল। মাতা, পিতার নিকট সে কথা উত্থাপন করিলেন। পিতা অনুসন্ধান লইয়া বলিলেন, "হাঁ, পাত্রটি সর্ব্বাংশে সুপাত্র বটে, কিন্তু অতিশয় দরিদ্র। তা আপাতত আমাদের এখানে এসে বাস করলে কিংবা আমাদের অর্থ:সাহায্য নিলে, এর পরে উপার্জ্জনক্ষম হলে আর অর্থকষ্ট থাকবে না।"

মাতা সেই শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের হরঠাকরুণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হরঠাকরুণ 'ঘরজামাই' থাকিবার অপমানজনক কথা বলিয়া, সব মাটী করিয়া ফেলিয়া ছল। হাঁগা! সেই দীপ্ত পুরুষসিংহ কি শ্বশুরের অন্নদাস হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে? তাহার মহাতেজস্বিতা দেখিয়া তাহার প্রতি আমার ভক্তি শতগুণ বাড়িয়া গেল; মনে হইল, এই তেজস্বী পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হইতে পারিলে, আমার জীবন ধন্য হইবে।

তাঁহার প্রতি বাবারও শ্রদ্ধা বোধ হয় বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ হরঠাকরুণের চেষ্টা বিফল হইলে, তিনি নিজেই কলিকাতায় যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল।

তাঁহার সহিত বাবার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বাব তাহা আনুপূর্ব্বিক মাতার নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন আমি অন্তরালে থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া আমার মনের মধ্যে একটা মহা অভিমানের সৃষ্টি হইল। এই সময় গড়বাথানের জমীদারের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। আমার মন তখন অভিমানে পূর্ণ ছিল; আমি এ বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করিলাম না। অভিমানভরে মনে করিলাম, ঐশ্বর্য্যবান ও রূপবান স্বামীর গৃহে বাস করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারিব।

কিন্তু পারিলাম কৈ? আমার তেমন স্বামী! কিন্তু আমি ত তাঁহাকে আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেমদান করিতে পারিলাম না; আমার হৃদয়ের কোণে কোণে কাহার বিষাদতমসাচ্ছন্ন প্রতিভান্বিত মুখখানি উকি মারিতে লাগিল; কাহার করুণ বিষাদ গীতি আমার হৃদয়বীণায় বারবার ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; আমার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কাহার দারিদ্র্যদুঃখ প্রকট হইয়া উঠিল! আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। অতি পাপ আকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী আমার মনোবিনোদন জন্য আমাকে যে সকল আধুনিক উপন্যাসাদি আনিয়া দিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা, নিষ্পেষিতপুচ্ছ বিষধরের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, রমণীর সতীত্ব জিনিষটা, নিতান্ত তুচ্ছ না হইলেও, তাহা রক্ষার প্রয়াস একটা কুসংস্কার বৈ আর কিছুই নহে। বুঝিলাম, মন্ত্রপড়া বিবাহ জিনিষটা কিছুই নহে;—তাহা স্বচ্ছন্দে লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই দেহ মন সমর্পণ করাই যথার্থ নারীত্বের আদর্শ। আমি আমার হৃদয়দেবতাকে পাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম।

যে পুণ্য চায়, বিধাতা তাহাকে পুণ্যের সুযোগ আনিয়া দেন, আর যে পাপ চায়, বিধাতা তাহাকে পাপের পথে অগ্রসর করিয়া দেন। আমিও বিধাতার কৃপায় সহজে পাপের এক সুগম পথ দেখিতে পাইলাম।

স্বামীর জমীদারীর অতি বৃদ্ধ ম্যানেজারটি

দিন তাঁহার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিলেন; পরিপক্ক টি যেন বৃক্ষ হইতে হঠাৎ খসিয়া পড়িল। নূতন নেজার নিযুক্ত করিবার জন্য স্বামী আমার সৎপরামর্শ ণ করিয়া, (তিনি আমাকে স্বর্গীয় বৃহস্পতি বা পার্থিব মোর্ক অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান মনে করিতেন) সংবাদ র: সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেক দরখাস্ত সিল। তখন স্বামী আমার রূপসাগরে হাবুডুবু খাইতে-লেন। তিনি আমারই হস্তে আবেদনপত্রগুলি সমর্পণ রিয়া, আমাকে ম্যানেজার নির্ব্বাচনের ভার প্রদান রিলেন।

আমি আবেদনপত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম, মার শিকলকাটা পাখীটি আমারই জালে ধরা পড়ি-ছে। এখন তাহাকে ধরিয়া আমার হৃদয় পিঞ্জরে রতে পারিলেই হয়।

৪

কিন্তু তাহাকে ত ধরিতে পারিলাম না।

আমি তাহার আবাস বাটীর পশ্চাৎ দিকের অনর্গলিত রপথে আসিয়া রাত্রের নির্জ্জনতায় তাহাকে দেখা দিয়া-লাম; তাহার বিস্মিত ও কামনাময় নয়নের সম্মুখে মার রূপের আগুন জ্বালিয়াছিলাম; তাহাকে অক্ষয় প্রমের, অক্লান্ত সেবার, উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যের দ্বন্দ্বহীন অধি-রী করিতে চাহিয়াছিলাম এবং পরিবর্ত্তে তাহার দতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া, এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু াদর চাহিয়াছিলাম। সে স্বীকার করিয়াছিল যে ামার মত রূপসী সে পৃথিবীতে আর কখনও দেখে াই, এবং স্বপ্নে আমার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আমাকেই বাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিল; তবু স আমার প্রার্থিত সেই সামান্য আদরটুকু আমাকে দেয় াই। শিলানির্ম্মিত দেবতার ন্যায় নির্ম্মম ও অটল হইয়া াড়াইয়া, আমাকে তাহার কক্ষ ত্যাগ করিতে বলিয়া-ছল।

তাহার নির্ম্মম আদেশ আমি অমান্য করিতে সাহস করি নাই, আমি তাহার কক্ষ তখনই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আশা করিয়াছিলাম, পরদিন আবার আসিয়া, আবার তাহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া আবার তাহার করুণা ভিক্ষা করিব। কিন্তু সে উপায়ও সে রাখে নাই।

পরদিন বেলা এক প্রহরের সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, নূতন ম্যানেজার বাবু কায ছাড়িয়া দিয়া আজ সকালে চলিয়া গিয়াছেন; এবং যাইবার সময় বাবু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও যান নাই। কেন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বজ্রাঘাতের মত কথাটা আমি নীরবে বসিয়া শুনিলাম; আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় উঠিয়াছিল, বাহিরে কেহ তাহার চিহ্ন দেখিল না।

প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী আহারের সময় স্বামী অন্দর মহলে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "নূতন ম্যানেজার বাবু নাকি চলে গেছেন?"

স্বামী কহিলেন, "হ্যাঁ। তহবিল, চাবি, কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে, আর আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে চলে গেছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চিঠিতে কি লিখে রেখে গেছেন?"

স্বামী কহিলেন, "লিখেছেন যে, এই ম্যানেজারী কায তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হওয়ায়, তিনি আপনাকে নিতান্ত অক্ষম মনে করে' বাধ্য হয়ে চাকরী ছেড়ে দিলেন। আর, বেলা সাতটার পর দেশে ফেরবার আর সুবিধা-মত গাড়ী পাবেন না বলে, আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন; আর, আমরা তাঁকে ভাল কায দিয়েছিলাম বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। লোকটি অতিশয় ভদ্র। তিনি নিজে আপনাকে অক্ষম বল্লেও, আমি কিন্তু তাঁর মত কার্য্যক্ষম লোক আগে কখনও দেখি নি। শুনেছি তিনি একবারে অর্থহীন হয়ে আমাদের এই চাকরী নিয়েছিলেন; এরকম গরীব লোকের পক্ষে কেবলমাত্র অক্ষমতার ওজর নিজে উত্থাপন করে' চারশ টাকা মাইনের চাকরী ছেড়ে যাওয়াতে বেশ একটু মহত্ব আছে, তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ?"

আমি ছোট্ট একটি হুঁ বলিয়া নীরব হইলাম; আর আমার বাক্‌শক্তিকে বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। মহত্ব!—তার মহত্ব যে কত মহৎ, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। কিন্তু আমি মহাপাপিনী, আমিই সেই মহৎকে ঘৃণ্য কামনার বশীভূত হইয়া, কষ্টকর দারিদ্র্য-দুঃখে নিক্ষেপ করিলাম। আমার এ মহাপাপ ভগবান কি কখনও ক্ষমা করিবেন?

৫

আমাদের অন্দর বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটি সুদৃশ্য সরোবরের চারিদিকে সুরম্য পুষ্পোদ্যান বিরচিত ছিল। এই পুষ্পোদ্যান অতিক্রম করিলে একটা বৃহৎ আম্র কানন পাওয়া যাইত। এই আম্রকাননের দূরবর্ত্তী প্রান্তে রাজপথ। এই রাজপথের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাই নব নিযুক্ত ম্যানেজার বাবুর বাসাবাটীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বলাবাহুল্য আমারই কৌশলে স্বামী এই ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আম্রকানন ও পুষ্পোদ্যান মধ্যে একটা উচ্চ প্রাচীর ছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে একবার আশ্বিন মাসের প্রবল ঝড়ে একটা তালগাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ঐ প্রাচীরের উপর পতিত হওয়ায় উহার একস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি একদিন কৌতূহলবশে প্রাচীরের ঐ ভগ্নস্থান দিয়া আম্রকাননে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন দেখিয়াছিলাম যে আম্রকানন জনমানব শূন্য; আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমি উপরিউক্ত বাটীর পশ্চাৎ দিকের দ্বারটি দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। নূতন ম্যানেজারের বাসা নির্দ্দেশের সময় সে কথা আমার মনে ছিল।

আমি দুঃসাহসিনী উন্মাদিনী সেই নির্জ্জন কাননপথ বিচরণ করিয়া পূর্ব্বরাত্রে একাকিনী সেই দ্বার প্রাপ্ত হইলাম, এবং বাটীতে প্রবেশলাভও করিলাম, আমার কামনাপূর্ণ দীন প্রেম তাহাকে দান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

আজ আহারের পর বিশ্রামের জন্য স্বামী আপন শয়নকক্ষে প্রস্থান করিলে, আমি আহার না করিয়াই, অন্যের সম্পূর্ণ অগোচরে সেই আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। মধ্যাহ্ন রৌদ্রতপ্ত বৃক্ষের পবনান্দোলিত শাখাগুলি যেন আমারই মনোব্যথায় কাতর হইয়া তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল; পল্লবান্তরাল হইতে রৌদ্রখণ্ডগুলি বিধাতার বিদ্রূপের হাসির মত আমার বিচরণ পথে লুটাইয়া পড়িল; আমারই মর্ম্মান্তিক মর্ম্মবেদনার অনুকরণ করিয়া আমার পদতলবিমর্দ্দিত শুষ্ক পত্রগুলির মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। আমি সেই পশ্চাদ্দ্বারের নিকট আসিলাম। তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া বুঝিলাম এ যাবত কেহ তাহা অর্গল বদ্ধ করে নাই; পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় অনর্গলিত অবস্থায় বদ্ধ আছে।

সেই দ্বার পথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে গেলাম। দেখিলাম, তাহার পরিত্যক্ত শয্যাটি একটা বিস্তৃত হাহাকারের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়া আমার কণ্ঠতালু শ্মশানের ভস্মের মত শুষ্ক হইয়া গেল। আমার ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, লিখনোপকরণের দ্বারা সজ্জিত টেবিলটি একটা চতুষ্পদের নিশ্চল মৃতদেহের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই টেবিলের পার্শ্বে নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, একখণ্ড চিঠির কাগজ কে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি উহা তুলিয়া লইয়া, টেবিলের উপর বিস্তার করিয়া বুঝিলাম যে আমারই উদ্দেশে একখানা পত্র উহাতে আরম্ভ করা হইয়াছিল; পরে কি ভাবিয়া তিন ছত্র মাত্র লিখিয়া কাগজখানি মর্দ্দিত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

ঐ অসমাপ্ত পত্রে ঐ দুই ছত্রে লিখিত ছিল,—

"কল্যাণীয়াসু, পবিত্র প্রেমের নামে পাপ আচরণীয় নহে। এতদিন তুমি আমার চক্ষে স্বপ্নময়ী দেবী ছিলে, তাহাই থাকিও। তোমাকে কলঙ্কিনী দেখিলে—"

ঐ তিন ছত্র লিখন পাঠ করিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, দেবতা, দেবতা!—এতদিন তুমি আমার কামনা-কলুষিত চক্ষে প্রেমময় মাত্র ছিলে, আজ তুমি দেবত্ব লাভ করিয়া চির আরাধনার সামগ্রী হইলে। আমি আমার দেবতার শেষ আদেশ লঙ্ঘন করিব না;—

র অশাসিত চিত্তকে দমন করিব ; এবং আর কখনও বিত্র প্রেমের নামে পাপ পথে বিচরণ করিতে যাইব ।

সেই দিন আমি আমার অন্তরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত য়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

সেইদিন হইতে আমি স্বামীর সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়া, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছি। ইহাতে কেবল মাত্র তাঁহাকেই পরিতুষ্ট করি নাই, নিজেও ধন্য হইয়াছি।

আমার কথা শুনিয়া যদি আমার ন্যায় পথভ্রান্তা কোনও ভগিনী কিছু সতর্ক হইতে পারে, সেই আশায় স্ত্রীলোক হইয়াও নিজের কলঙ্ককাহিনী নিজেই বিবৃত করিলাম।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৭. কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর রাজবংশের ়০ সংখ্যক ভূপতি। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ শানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রৈপুরী ১২৭২ অব্দের ১৬ই বণ [১৮৬২ খ্রীঃ ৪ঠা আগষ্ট] তারিখের রোবকারী ল ইহাঁকে ত্রিপুর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী র্ব্বাচন করিয়া, তৎপর দিবস লোকান্তর গমন করেন। ৎপর মহারাজ বীরচন্দ্র "মাণিক্য" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক পুরার রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। তিনি ৩১ বৎসর াল রাজত্ব করিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। াহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট অনেক মনস্বী ক্তিকেও নতশির হইতে দেখা গিয়াছে। একমাত্র তীক্ষ্ণ প্রতিভা বলেই তিনি সিংহাসনের অধিকারী ইয়াছিলেন।

মহারাজের রাজনীতিক প্রতিভার দৃষ্টান্ত বিস্তর াছে, এবং তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার াসনকালে রাজ্য ও রাজকার্য্য বিশিষ্টরূপে উন্নীত ও ঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বৃটিশ রাজ্যে দাস বিক্রয় সতীদাহ ইত্যাদি কুপ্রথা নিবারিত হইবার পরেও াপুররাজ্যে সেই সকল প্রথা অনেককাল প্রচলিত ছিল। হারাজ বীরচন্দ্র সেই সকল দুর্নীতি দমন করিয়া রাজ্যের শেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন ; প্রকৃতিপুঞ্জের সামান্য দুঃখ দর্শনেও তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আবার দুষ্টের দমনার্থ সেই কোমল হৃদয় বজ্রাপেক্ষা অধিক কঠোর হইতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার রাজনীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু এস্থলে তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক।

মহারাজ বিবিধ-কলা-বিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে সঙ্গীত-কলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং সুগায়ক এবং বহুবিধ যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতের তদানীন্তন সঙ্গীতশাস্ত্র-পারদর্শী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই তাঁহার দরবারে সাদরে স্থান পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারত বিখ্যাত রবাব বাদক [তান সেনের বংশসম্ভূত] কাশেম আলী খাঁ, সুরবীণ বাদক নিসার হোসেন, এসরাজ বাদক হাইদর খাঁ, সেতার বাদক নবীনচাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক কেশব মিত্র, পঞ্চানন মিত্র [পাঁচুবাবু] ও রামকুমার বসাক, গায়ক ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ও যদুনাথ ভট্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ব্যক্তি কেবল গায়ক ছিলেন এমন নহে, তিনি সুকবিও ছিলেন ; তাঁহার রচিত অনেক দরবারী সঙ্গীত আগরতলায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে। গুণমুগ্ধ মহারাজ বাহাদুর, ইহাঁকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত

আরও অনেক খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক সর্ব্বদা দরবারে যাতায়াত করিতেন। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবার ব্যতীত অন্য কোনও স্থলে এরূপ সমগ্র ভারতের সঙ্গীত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাবেশের কথা শুনা যায় না।

রাজার অনুকরণ প্রজা-সাধারণের ধর্ম্ম। এই সময় আগরতলার ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র, সকলেরই গৃহে সঙ্গীত চর্চ্চা হইতেছিল। তাহার সুফল বর্ত্তমান কালেও সেখানে পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপরিবার ও ঠাকুর পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের প্রায় সকলেই সঙ্গীতে এবং বিবিধ যন্ত্র বাদনে বিশেষ অভ্যস্ত। গান করিতে বা দুই একটী যন্ত্র বাজাইতে না জানে, প্রজা সাধারণের মধ্যেও এরূপ লোক অতি বিরল। ইহা একমাত্র মহারাজ বাহাদুরের সঙ্গীত চর্চ্চার শুভফল বলা যাইতে পারে।

চিত্রকলায় মহারাজের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। জল রং চিত্র [Water colour painting], তৈল রং চিত্র [oil paintng] ও ফটোগ্রাফের কার্য্য লইয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কতিপয় দেশীয় ও ইয়ুরোপীয় সুনিপুণ চিত্রকর দরবারে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজের এই কার্য্যের ফলও রাজপরিবারের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে। সাধারণের মধ্যেও ইহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার এবং তাহার দোষ গুণ যথাযথ রূপে বিচার করিবার ক্ষমতা আগরতলাবাসী প্রায় সকল ব্যক্তিরই আছে। মহারাজ বাহাদুরের প্রযত্নে প্রতিবৎসর রাজপ্রাসাদে চিত্র প্রদর্শনী হইত। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের এবং সাধারণের চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ বৃদ্ধি করাই এই প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

মহারাজ কেবল সঙ্গীত ও চিত্রকলায় পারদর্শী ছিলেন এমন নহে, তিনি আরও বহু গুণের আধার ছিলেন। সেই সকল গুণের কথাও অদ্যকার আলোচ্য নহে। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা এবং সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে আলোচনা করাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বঙ্গভাষার উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করা ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের চিরপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। (১) মহারাজ বীরচন্দ্র সেই সমুজ্জল কীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত অসাধারণ যত্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। আবহমান কাল ত্রিপুরার রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহারাজ বীরচন্দ্রের শাসনকালে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ করেন। মহারাজ দেখিলেন, রাজ্যের চিরপ্রচলিত একটী নিয়ম কর্ম্মচারিগণের দ্বারা বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাতে বঙ্গভাষা পোষণের সদুদ্দেশ্যটীও ব্যর্থ হইতেছে। এই অনভিপ্রেত কার্য্য নিবারণকল্পে তিনি ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে এক আইন প্রচলন করেন; বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন রাজকার্য্যে বঙ্গভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার প্রয়োগ নিবারণ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। উক্ত আইন ত্রিপুর রাজ্যে অদ্যাপি প্রবল আছে। এই কার্য্যের দ্বারা বঙ্গভাষার প্রতি মহারাজের অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইবে। (২)

কেবল রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার দেখিয়াই মহারাজ তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি স্বয়ং বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক এবং সুকবি ছিলেন। সাহিত্য সেবায় তাঁহার একান্ত পরিশ্রমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাৎকালীন দীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষাকে অনেক সঙ্গীত ও কবিতারূপ অমূল্য রত্নে অলঙ্কৃতা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার এবং অনেক সদ্গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় প্রদান ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারাও ভাষার বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব মহাজন শ্রীশ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী (ঘনশ্যাম

---

(১) মল্লিখিত "ত্রিপুরা রাজ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (ভারতবর্ষ—১৩২৪ সন।)

(২) ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিগণ ত্রিপুর-শাসনের এই মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা নিবারণকল্পে স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এবং বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরও সময় সময় উপরিউক্ত মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দাস) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "গীত-চন্দ্রোদয়" নামক সুবৃহৎ পদাবলী গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ নাই, এবং ইহা অনেক খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যসেবীর দৃষ্টিগোচরও হয় নাই। মহারাজ বাহাদুর বিস্তর চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে একখণ্ড বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় "অষ্টকাল রাগানুরাগ" খণ্ড মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রয়েল ১২ পেইজ ফর্ম্মার ৩৮৮ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড শেষ হইয়াছে। দুঃখের কথা, তিনি গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ প্রচার করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন বিশেষ, তাই মহারাজ্ বাহাদুর আগ্রহের সহিত ইহার প্রচারকার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বিবিধ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের প্রচার ও বিতরণ-কার্য্য মহারাজ বাহাদুরের এক অম্লান কীর্ত্তি। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক বহরমপুর হইতে এই বিরাট গ্রন্থ প্রচারিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। রাজভাণ্ডারের অর্থে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা আরও অনেক প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যের দ্বারা বঙ্গভাষা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

মহারাজ বাল্যকালে শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালোচিত নিয়মে বাঙ্গালা ও উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষাতেও কিয়ৎ পরিমাণে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মণিপুরী, ত্রিপুরা এবং উর্দ্দূ ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় অনায়াসে আলাপাদি করিতে পারিতেন।

সন্তানগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহাদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতা রচনা শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। এবং এই কার্য্যে অর্থ-ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কুমারগণের সাহিত্য-চর্চ্চার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল; তাঁহাদের কৃত রচনাবলী সেই সভায় পঠিত ও আলোচিত হইয়া, গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইত। মহারাজ বাহাদুর সময় সময় কুমারগণকে বলিতেন,—"আমরা শিক্ষা জীবনে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় বটতলার ছাপা শিশুবোধক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশী-রামের মহাভারত এবং শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক আমরা পাই নাই! পঞ্জিকার ছবি এবং কালীঘাটের আঁকা পট ব্যতীত চিত্রের অন্য আদর্শ দেখি নাই। বর্ত্তমান কালে তোমরা বহুবিধ সারবান গ্রন্থ এবং চিত্রের অসংখ্য মূল্যবান আদর্শ পাইতেছ। শিক্ষার সুবিধাও কম পাইতেছ না। এরূপ সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া যদি তোমরা শিক্ষা-লাভে অসমর্থ হও, সে দোষ তোমাদের, অভিভাবকের বা সময়ের দোষ দিতে পারিবে না।" সুখের কথা এই যে, মহারাজের প্রায় সমস্ত গুণই কুমার এবং কুমারীগণের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছে। রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণও সেই সমস্ত গুণের অংশ লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

মহারাজ বীরচন্দ্র সুকবি ছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যশের প্রত্যাশী ছিলেন না বলিয়াই তাঁহার সুললিত কবিতাবলী জনসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি স্বরচিত কবিতানিচয় কৃপণের ধনের ন্যায় সঙ্গোপনে রক্ষা করিতেন। মহারাজের খাস মুদ্রাযন্ত্রে অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ যখন মুদ্রিত হইত, তৎ-কালে যন্ত্রালয়ে সাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকিত না। গ্রন্থগুলি বিবিধ বর্ণের কালীতে পরিপাটি রূপে মুদ্রিত এবং উত্তম বাঁধাই হইত। তাহা একান্ত প্রিয় ও অনুগ্রহের পাত্র ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি প্রদান করিতেন না। এতদ্বিষয়ে পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন;—

"মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তিনি একজন সুকবি। তৎপ্রণীত দুইখানা কবিতা পুস্তক আমরা দর্শন করিয়াছি। * * তাঁহাদের ভাব সরল,

। ও মর্ম্মস্পর্শী। তাঁহার সমস্ত গীতি কবিতাই মের কাকলী পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক ভাবের পাতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল সুন্দর কবিতা-কুসুমের সৌরভ আগরতলার । অতিক্রম করিয়া কদাচিৎ কাহাকেও আকুলিত য়া থাকে। সেগুলি প্রকাশ করিতে মহারাজ ান্ত অনিচ্ছুক; কিন্তু প্রকাশিত হইলে তিনি বঙ্গীয় -সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন সন্দেহ নাই।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা—২য় ভাগ; ১৩শ অঃ। ইহা মহারাজা বাহাদুরের জীবিত কালের কথা। ার পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র স্বর্গীয় মহারাজ লচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুর স্বরচিত "গোপবালা" ব্যর উৎসর্গ পত্রে স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশ্যে বলিয়া- ;—

"এনেছিলে বাণী হ'তে—
অমর-বাঞ্ছিত ধন,
কবিত্বের বীণা;
একাকী বিরলে বসি,
বাজাইয়া মন-সাধে,
ভুলিতে আপনা!
মধুর ঝঙ্কার তার
শুনিবার যোগ্য নহে
মরতের জীব,
তাই সঙ্গোপনে বুঝি
নিয়ে গেলে সঙ্গে করি—
মোহিতে ত্রিদিব!" ইত্যাদি।

কবি তাঁহার কবিতার ন্যায় সঙ্গীতগুলি সঙ্গোপনে াতে পারেন নাই। তাহা নিজে পড়িয়া—নিজে য়া তৃপ্ত হইতে পারিতেন না; তাই গায়কগণের প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। সেই সকল ত সর্ব্বদা কীর্ত্তনে ও মজলিসে, সুনিপুণ গায়ক ক গীত হইত, তদ্ধেতু তাহাদের বহুল প্রচার হইয়া- । আমরা কতিপয় সঙ্গীত দ্বারা মহারাজের কবিত্বের প্রথম পরিচয় প্রদান করিব। তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভক্ত বৈষ্ণব-জনোচিত অনেক সুললিত সঙ্গীত ও পদাবলী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার একটী সঙ্গীত বড়ই মধুর হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে তাহাই সাহিত্যামোদিগণকে সাদরে উপহার প্রদান করিতেছি—

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাপ।

নীল নব-জলদ রুচি, রুচি রুচির সুন্দর,
পীত-ধটি কটিতটে সু-সাজে।
মুকুট 'পরি খচিত শিখি-পুচ্ছে নব-মল্লিকা,
বক্ষে বনমালা বিরাজে॥
অধর 'পর বেণু তঁহি মিলিত মুখ মোদনে,
মধু মধু মধুর মোহ-তানে।
শুনই পশু পাখিকুল, শাখিকুল পুলকিত,
তপন-তনয়া বহে উজানে॥ (৩)
শ্রবণ-যুগে মণি-মকর গণ্ডে করু ঝলমল,
মেহ'পর (৪) বিজরি যনু হাসে।
সহজ দৃক্-অঞ্চল (৫) জিনিয়া সরসীরুহ,—
তাহে কত কুসুম-শর ভাসে॥
কেলি-কদমকি তলে সুললিত ত্রিভঙ্গিয়া,
নব-অরুণ চরণ-অরবিন্দ।
গোকুল-কুল-রমণীক মনসিজ সু-মূর্ত্তিময়,
পেখব কি ললিত (৬) মতিমন্দ॥

অতঃপর তদ্রচিত শ্রীরাধিকার রূপ-বর্ণনা উপহার দেওয়া যাইতেছে:—

(৩) এই অংশ পাঠ করিলে বিদ্যাপতির নিম্নোক্ত পদটী মনে পড়ে।—

"মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত,
কালিন্দী বহয়ে উজান॥

(৪) মেহ'পর,=মেঘের উপর।

(৫) দৃক্-অঞ্চল=নয়নপ্রদেশ।

(৬) "ললিতচন্দ্র" মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের নামান্তর।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাপ।

জয় জগত-বন্দিনী
হরি-হৃদয়-রঞ্জিনী,
ব্রজ-রমণী মুকুট-মণি—
রাধিকে শ্রীরাধিকে।

ঘন-জঘন সোহিনী,
গজহুবর গামিনী,
চরণ-রুচি তরুণ
অরুণাধিকে শ্রীরাধিকে॥

মৃদু মধুর হাসিনী,
রসময়-সুভাষিণী,
বদন কত ইন্দু শত-
নিন্দিতে শ্রীরাধিকে।

শ্যাম-মনোমোহিনী,
কান্তি জিনি দামিনী,
রসিক ব্রজনাগর—
বিমোহিতে শ্রীরাধিকে॥

সরস-রস-রঙ্গিনী,
নিধুবন বিলাসিনী,
শ্যাম সুখ-সাধ সব
সাধিকে শ্রীরাধিকে।

চটুলতর চাহনী,
মদন-মুরছায়নী,
ঘন-বরণ-হৃদয়মণি
মালিকে শ্রীরাধিকে॥

শ্যাম-পট-পিঁধনে
শ্যাম-চিত-বন্ধনে,
শ্যাম-ঘন-অঞ্জন হি
লোচনে শ্রীরাধিকে।

জয় কৃষ্ণ-ভামিনী,
জয় কৃষ্ণ সোহিনী
রচহুঁ বীরচন্দ্র নিতি
আননে শ্রীরাধিকে॥

এই দুইটী পদ, যে-কোন উৎকৃষ্ট প্রাচীন মহাজনী পদের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাব-গাম্ভীর্য্যে, অনুপ্রাস-মাধুর্য্যে এবং শব্দ-সম্পদে পদ দুইটী অতুলনীয় হইয়াছে। যিনি একবার মাত্র আগরতলার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, সুগায়ক কর্ত্তৃক সুর তাল-যোগে গীত হইলে এই দুইটী পদ ভক্তহৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে!

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মতিথির উৎসবোপলক্ষে মাণিক্য বাহাদুর কর্ত্তৃক একটী সঙ্গীত রচিত এবং উৎসবমণ্ডপে গীত যইয়াছিল। তদবধি আগরতলায় গানটী বিশেষ-ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। গানটী এই :—

রাগিনী কাফি—তাল ঝাপ।

পুণ্যময় আজি ঋতু সুরভি-শুভ খনিয়া।
পুণ্যময় আজি কলি নিখিল ধনিধনিয়া॥ (৭)
পুণ্যময় রাতি নব প্রেম-মণি খনিয়া।
পুণ্যময় রাহুমুখ-কলিত-নিশি-মণিয়া॥ (৮)
পুণ্যময় কিরতন পতিতজন-তরণীয়া।
পুণ্যময় হরি হরি ধ্বনি কলুষ-হরণীয়া॥
পুণ্যময় শান্তিপুর ভকত-জন সাধিয়া।
পুণ্যময় পুণ্যময় পুণ্যময় নদীয়া॥
গৌরহরি অবতরণ কনক-বিধু-কাঁতিয়া।
বীরচন্দ্র তছু চরণ ভজহু দিন রাতিয়া॥

এবম্বিধ অনেক সুললিত বৈষ্ণব পদাবলী মহারাজ রচনা করিয়াছিলেন। এবং অনেক প্রাচীন সুন্দর সুন্দর পদে রাগ রাগিণী সংযোগ করিয়া সেই সকল পদের মাধুর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এমন

---

(৭) ধনি ধনিয়া—ধন্য ধন্য।

(৮) মহাপ্রভুর জন্মকালে চন্দ্রগ্রহণ ছিল, এই পংক্তিতে তাহাই বলা হইয়াছে।

তাঁহার রচিত খেয়াল এবং টপ্পাও অনেক
। এস্থলে নিদর্শন স্বরূপ বসন্ত বর্ণনের একটীমাত্র
হইল ;—

রাগ বসন্ত—একতালা।
মন্দ মন্দ বহত পবন,
বিরহিণী জন হৃদয় দহন,
পিয়াকি কারণ ঝুরত নয়নে,
মাহেরি ফাগুন আয়েরি।
ফুট রহি ফুল মাধবী মালতী,
গেন্ধি গোলাপ উজর শেঁওতি,
আওর বকুল চম্পক যূথি,
আলিয়গণ গুঞ্জরী॥
মত্ত ময়ূর নাচত শোভন
হেরতবরজ যুবতিগণ
কোহেলা কোহেলি মধুকর গান
দাস বীরচন্দ্র গায়েরি॥

আলোচনা-যোগ্য আরও অনেক সুললিত সঙ্গীত
হ। অধিক গান উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের আয়তন
য়বরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না, সুতরাং এস্থলেই
বৈষয়ে নিরস্ত হইতে হইল। অতঃপর কবির রচিত
নিচয়ের স্থূল বিবরণ প্রদান পক্ষে চেষ্টা করিব।
আমরা বহু চেষ্টায় মহারাজের কৃত ছয়খানি কবিতা
ক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার দুইখানি
ঙব ধর্ম্ম সঙ্গীত গীতাবলী—"হোরি" ও "ঝুলন"।
পুস্তিকাদ্বয়ে লিখিত গানগুলি বৈষ্ণব পর্ব্বোপলক্ষে
-অন্তঃপুরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক গীত হয়। বাহিরেও
সকল গানের যথেষ্ট প্রচলন আছে; মণিপুরী
জে ইহার আদর অত্যন্ত বেশী। অবশিষ্ট গ্রন্থ-
গর প্রায় সমস্তই কবির আত্মজীবনে সংঘটিত ঘটনা-
ার আবেশমাখা, প্রেমিকের মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত
দুঃখের কাকলী! এই সামান্য প্রবন্ধে সেই সকল
হ্যাস পূর্ণ গ্রন্থের আলোচনা করা অসম্ভব, অথচ
লোচনার লোভ সম্বরণ করাও অসাধ্য। এস্থলে
গ্রন্থ সমূহের নামোল্লেখ এবং সামান্য পরিচয় মাত্র প্রদান
করা হইবে।

১। হোরি ;—ইহা দোল পূর্ণিমা [হোরি উৎসব]
উপলক্ষ্যে রচিত গীতিকাব্য। এই পুস্তিকায় দোল লীলার
শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সুললিত ৩৪টী হোরির গান
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবৎসর হোরি উৎসবোপলক্ষে
এই সকল সঙ্গীত গীত হয়। তাহার একটী মাত্র গান
এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আঁচল সঞে ফাগু লেই কুঁয়রি॥
হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে,
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে॥
চতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী,
মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী॥
দেয়ল ফাগু নাহ লোচন যোড়,
মুদল ধনী দুহুঁ নয়ন চকোর॥
ইহ অবসরে কত চুম্বই কাণ,
বীরচন্দ্র রস দুহুঁ রস গান॥

২। ঝুলন ;—এই পুস্তিকায় ৫০ টী ঝুলন গীতি
সন্নিবিষ্ট এবং স্বর্গীয়া রাজমহিষী ভানুমতী দেবীর উদ্দেশে
তাহা উপহৃত হইয়াছে। ইহা কবির "শোক সন্তপ্ত
হৃদয়ের শান্তিদায়ক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উপরি
উক্ত মহারাণীর পরলোক গমনের অল্পকাল পরেই ইহা
রচিত হইয়াছিল। মহাজন পদাবলীর ছায়া অবলম্বনে
এই গ্রন্থের পদগুলি রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী
পদ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

বিনোদ হিল্লোলে বিনোদ নাগর,
বিনোদিনী সহ দোলে,
চারি দিকে মিলি বিনোদিনী দল,
নাচয়ে বিনোদ তালে॥
বিনোদ বিনোদ বাজিছে নূপুর,
ঝুনু রুণু রুণু নাদে,
মুরজ মুরলী বীণা মুরচঙ্গ,
বাইছে প্রমোদ মদে॥

তাক্বতি তাক্বতি ক্বতি থৈ থৈ,
মধুর মুরজ বোলে,
মন্থর গতি পদকি চাল,
সঘন মঞ্জরী রোলে ॥
গাইছে কিশোরী, মুরলীর সহ
মিশায়ে মধুর স্বর,
মুরলী থুইয়া চিবুক ধরিয়া
চুম্বয়ে নাগরবর ॥
কমলে মধুপ যৈছন শোভত,
দুহুঁ মুখ শোভা তায়,
পরাণ ভরিয়া দাস বীরচন্দ্র,
ও রস মাধুরী গায় ॥

পুস্তকের সমগ্র ভাগ এরূপ বৃন্দাবান-লীলামৃত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার নিম্নোক্ত "শেষ প্রার্থনা" গাহিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন ;—

ওহে রাধা শ্যাম, —
আজি কি সুখের দিন ঝুলন মঙ্গল হে,
ভাব মাখা সরস চাহনি,
যুগল অধরে হাসি, শ্রীঅঙ্গে পুলক নাথ,
মন সহ ঝুলন দোলনী ॥
আগে এ সুখের দিনে অভাগিয়া কত হে,
পূজিয়াছি ওই রাঙ্গা পায়,
দু'নয়নে সুখ-ধারা বহিত হিলোলে নাথ,
প্রেম-ঢেউ খেলিত হিয়ায় ॥
বিধাতা ব্যাধের মত আসি চুপি চুপি হে,
সাতনালা বাড়ায়ে বাড়ায়ে,
দারুণ সন্ধান তার, শূন্য সব দিক নাথ,
এবে একা আঁধারে দাঁড়ায়ে ॥
বাসনা বাঁশরী তানে বিধি নিরদয় হে—
পরাণ কুরঙ্গে ভুলাইল,
আনি বিষয়ের দেশে পুন বেড়া-জালে নাথ
ঘেরি বাণ মরমে হানিল ॥
পাঁজরে বিষের জ্বালা, হিয়ায় অনল হে—
ঝলকে ঝলকে উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,
বিষয়ের বিষম শিকলে ॥
কাটি এ করম ডোর বজরের বাঁধ হে—
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায়,
যে ক'দিন বাঁচি আর, শ্রীবৃন্দা-বিপিনে নাথ,
থাকি যেন যুগল-সেবায় ॥

ইহা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের আন্তরিক প্রার্থনা। বৈষ্ণবগণ নির্ব্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষী নহেন, জন্মে জন্মে ভগবানের সেবাব্রতে রত থাকাই তাঁহাদের প্রার্থনীয়। তাই, মহিষীর বিরহ কাতর বৈষ্ণব কবি স্বীয় উপাস্য দেবতার পদপ্রান্তে দারুণ মর্ম্মবেদনা জানাইয়া, সংসার-বন্ধন ছেদন ও সেবার অধিকার পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন!

(৩) প্রেম-মরীচিকা; পূর্ব্বোক্তা মহারাণীর পরলোক গমনের পর, কবির বিরহ-কাতর হৃদয়ে যে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহাই কবিতারূপে স্ফুরিত হইয়া এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কবি ব্যথিত অন্তরে গাহিয়াছেন ;—

"সে মধু বাতাসে যেন উঠিছে বাজিয়া,
জীবনের নিদ্রিত বাঁশীটী ;
আজি ভালবাসা যেন সাথীহারা পাখী,
কাঁদিছে গাইছে একেলাটী !
র'য়ে র'য়ে এখনো কি উঠিস্ রে ডে'কে,
সাড়া দিবে কেবা আর আছে ?
যা ছিল সকলি গেছে, এবে একা আমি,
কেন রে আসিস্ মোর কাছে ?"

শোক সন্তপ্ত দীর্ণ হৃদয়ে কত কথা কত ভাব উত্থিত ও লীন হয় তাহার সীমা সংখ্যা কে করিবে! কবি ব্যাকুল প্রাণে আবার গাহিয়াছেন ;

"আলোক ডুবিয়া গেল দারুণ আঁধারে,
সে আঁধারে দেখিলাম,
প্রেমময়ী প্রতিমায়—
শ্বাসহীন স্তিমিত নয়ন ;
হুঁ হুঁ করি চারিধারে, ঘেরিল স-ধূমানল,
এ হৃদয়ে জ্বালিল শ্মশান!

গ্রন্থের সমগ্রভাগে এবংবিধ মর্ম্ম বেদনার উষ্ণশ্বাস অনুভূত হইবে। বিরহীর শোকগাথা ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই নাই ; কিন্তু শোকগীতি হইলেও তাহার মাধুর্য্য অতুলনীয়। প্রভাত-বর্ণন করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন ;—

"শোভিল অটবী, শোভিল মাধবী,
কুসুম ভূষণ পরা ;
উঠিল মালতী ছাড়িয়া শয়ন,
কুয়াসার জলে পাখালি নয়ন,
অলি যেন তায় কাজল ভরা !"

ইহার পর কবির সন্তপ্ত জীবনের আর এক নূতন যবনিকা উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তুষারজাল-সমাচ্ছন্ন হতশ্রী বিটপীদল বসন্ত-সমাগমে যেরূপ নব-মুকুল-সম্পদে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ মহারাজের শোকাকুলিত হৃদয় মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর সংস্পর্শে আবার নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। নিদাঘতপ্ত মরুভূমি আবার নন্দন কাননের শোভা ধারণ করিয়াছিল! কবির এই অবস্থায় রচিত তিনখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।—

(৪) উচ্ছ্বাস ;—ইহা উচ্ছ্বসিত প্রেমিক হৃদয়ের মধুর তরঙ্গ হিল্লোল। রাজমহিষী মনোমোহিনী দেবীর উপহারের নিমিত্ত গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল। এই সময় কবির হৃদয় সুখ ও দুঃখের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। নব মহিষীর প্রতি কবি যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে ;—

"সখি রে,—
উঠিছে পড়িছে আজি কত,
দুঃখের সুখের কথা হৃদয় নিভৃতে মোর,
আধ আধ আব্‌ছায়া মত !
আধদুঃখ আধসুখ ছিল আবরিয়া,
কি যেন মেঘের কোলে জোছনা রাখিয়া॥"

* * *

"বিষাদ মাখান কত গান,
যেতেছিল মিশি মিশি, নিশার আশায় ভাসি,
মিলাইয়া পরাণের তান !
দুখময় সে দিনের দুখ স্মৃতিগুলি,
দিতেছে মরমে যেন কত সুখ তুলি।"

* * *

"সুখে দুখে গিয়াছে ডুবিয়া,
দুঃখের হৃদয়ে আজি নেশার আধেক ঘোরে,
বহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া !
নয়নে ভাসিছে কত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন !" ইত্যাদি।

কবি এই গ্রন্থের মলাটে বিদ্যাপতির একটী পদ 'মটো' করিয়াছেন ; তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, তিনি দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগের পর আবার শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পদটী এই ;—

"আজি মঝু গেহ গেহ করি মানমু,
আজুমঝু দেহ ভেল দেহা ;
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা।"

(৫) অকাল কুসুম ;—এই গ্রন্থ খানিও প্রেমিক কবির হৃদয়োত্থিত প্রেমের উৎসে পরিপূর্ণ। ইহাও মহারাণী মনোমোহিনী দেবীর কথা লইয়াই রচিত এবং তাঁহাকেই উপহৃত হইয়াছে। উপহারে কবি বলিয়াছেন ;—

"প্রেয়সি রে,—
গেঁথেছি তোমার লাগি বিরলে বসি। আমি,
যে সাধের মালা,
উজ্জল মাণিক নহে, নহে যুঁই নহে বেলী,
রূপে গন্ধে নাহি করে আলা।
ভাল মন্দ নাহি জানি, গাঁথিয়া পেয়েছি সুখ,
রূপে গুণে তোমারি মতন,
তাই এত করেছি যতন !" ইত্যাদি।

"রূপে গুণে তোমারি মতন" এই ইঙ্গিত দ্বারা কবি, কবিতা এবং স্বীয় প্রিয়তমা, এতদুভয়ের প্রতি যে সাধারণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, সহস্র কথা

বলিয়া তাহার একটী কণাও ব্যক্ত করা যায় না। ইহা প্রাণের ইঙ্গিত-- প্রাণে প্রাণে বুঝিবার কথা, ভাষায় ফুটিবার নহে। কবিতাকে রূপে গুণে আপন প্রাণতুল্যা মহিষীর তুল্য জ্ঞানে, কবি তদ্গত চিত্তে কবিতাহার গ্রন্থন করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, সেই তৃপ্তির তুলনা নাই। মুগ্ধ কবির গ্রথিত উপহার ভাল কি মন্দ হইল, তাঁহার সেই বিচার করিবার অবসর ছিল না। ইহা গেল প্রেমমুগ্ধ মহারাজের অসাধারণ অনুরাগের পরিচায়ক। আর একটী কবিতায় রাজমহিষীর হৃদয়ের অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে; তিনি কবিকে বলিয়াছিলেন,

"চিতার আগুনে যবে দগধ হইব,
বুক চিরে দেখিও তখন,
তোমার মুরতি আঁকি হৃদয় মাঝারে,
কত সাধে করেছি সাধন।"

ইহা মহারাণীর প্রাণের কথা। রাজার সম্মুখে চিতারোহণ করিবার সৌভাগ্য না ঘটিয়া থাকিলেও, তাঁহার বাক্যের প্রত্যেক বর্ণ যে সত্য, কার্য্যদ্বারা তাহা স্পষ্টতররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। পতির প্রচারিত আইনের ফলে তিনি সহমৃতা হইতে না পারিলেও, অনুমৃতা হইয়াছিলেন। মহারাজের পরলোক গমনের পর তিনি যে কাল জীবিতা ছিলেন, তাহাকে জীবিতাবস্থা না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বৈধব্য দশায় অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল আহার, তৃণ শয্যায় শয়ন, গৈরিক বসন পরিধান এবং রুক্ষ কেশ ধারণ করিয়াছিলেন। পতির প্রতিকৃতি এবং পাদুকা ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই। যে কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করা সামান্যা

পরলোক গত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর

গৃহস্থ মহিলার পক্ষেও দুঃসাধ্য, তিনি রাজমহিষী হইয়াও অকাতরে তাহা পালন করিয়াছিলেন। পরলোকে স্বর্গগত পতির পবিত্র সঙ্গলাভ ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে অন্য বাসনা স্থান পায় নাই। এমন কি, একমাত্র প্রাণতুল্য পুত্রের প্রতিও তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ ছিল না। এজন্যই বলিতেছিলাম, পূর্ব্বোক্ত পদটী মহারাণীর কেবল মুখের কথা নহে,--তাঁহার প্রাণের ভাষা আরাধ্য দেবতাকে জানাইয়াছিলেন। এজন্যই বাক্যটী বিশেষ মূল্যবান জ্ঞানে উদ্ধৃত করা হইল।

(৬) সোহাগ;--ইহাও মনোমোহিনী দেবীকে

উপলক্ষ্য করিয়া রচিত এবং তাঁহাকেই উপহার দেওয়া হইয়াছে। কবি উপহারে লিখিয়াছেন ;—

"নয়নে সুধার লীলা প্রেয়সী তোমার,
পরাণ জুড়ান ধন হৃদি ফুল হার!
মধুর মুরতি তোর,
সদা হৃদে জাগে মোর,
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জীবনে ভুলিতে রে পারিব না আর,
প্রিয়ে সোহাগী আমার প্রিয়ে সোহাগী আমার!"

প্রেমিক কবি নবীন প্রেমের স্বরূপ অতি অল্প কথায় স্পষ্টতররূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি বলেন ;—

"মানবের নব প্রথম পীরিতি
তরুণ নূতন কুসুম মত,
চিরকাল মনে রহে জাগরিত,—
পরের পীরিতি রহে না তত।
"সেই সুখময় নবীন পীরিতি,
জনমে নবীন যৌবন সনে ;
তাই চিরদিন পীরিতি মুরতি,
দেবতার মত জাগয়ে মনে।"

লেখক ভুক্তভোগী ভাবুক কবি। তাঁহারই এই কবিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, নব-মহিষী লাভে তাঁহার হৃদয়ের দারুণ ক্ষত প্রলেপ-লিপ্ত হইয়া ছিল সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রথম যৌবন-লব্ধ নবীন প্রেমের চিত্তোন্মাদক প্রথমচ্ছটা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আরাধ্য দেবতার ন্যায় সেই সুপবিত্র প্রেম-স্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিত।

প্রেমের বাজারে ধনী দরিদ্রে ইতর বিশেষ নাই; এই সাম্যের জগতে রাজা প্রজা সকলেই সমান। যিনি প্রেমের মহাজন, এই ক্ষেত্রে তিনিই রাজা! তাই বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি অবনত শিরে বলিতেছেন ;

"রাজা হয়ে যবে প্রেম সিংহাসনে
বসলো যতনে আদরে সেবি,
ভকতি সাধনে পূজিলো তোমায়,
তুমি যবে হও প্রেমের দেবী।
ভাবের চন্দন আদরে মাখিয়া,
কবিতা কুসুমে গাঁথিয়া হার,
প্রেম-উপহার দিলাম তোমায়,
এ দীনের আছে কি ধন আর।"

রাজভাণ্ডারের অগণিত ধনরত্ন এবং অতুল রাজ্যসম্পদ তুচ্ছ করিয়া এবং বিপুল রাজসম্মান ভুলিয়া কবি নিজকে দীন সেবক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন; এবং প্রেমের দেবতাকে হৃদয়-নিঃসৃত কবিতারত্ন উপহার দিয়া বলিতেছেন—"এ দীনের আছে কি ধন আর।" প্রেমের ইহাই ধর্ম্ম, বৈষ্ণবগণ বলেন—"কাম থাকিতে প্রেম জন্মে না।"

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রেমোচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতাগুলি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না।

এতদ্ব্যতীত মহারাজের রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ এবং অনেক কবিতা ছিল, তাহা বর্ত্তমানকালে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। যে সকল গ্রন্থ ও সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে, প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হইল। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার অধিক আলোচনা করাও অসম্ভব। এই সকল কারণে অতৃপ্ত হৃদয়ে এই স্থলেই আলোচনা শেষ করিতে হইল।

উপসংহারে একটি কথার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় ত্রিপুর রাজ্যে সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যার ন্যায় সাহিত্য চর্চ্চা, বিশেষতঃ কবিতারচনার প্রয়াস, রাজ্যব্যাপী হইয়াছিল। রাজ পরিবার, ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি শিক্ষিত সমাজের কথা এস্থলে উল্লেখ করিব না, তাঁহাদের গবেষণার কথা অনেকেই অবগত আছেন এবং উপরে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করিব, তাহা রাজার 'ণ অনুকরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

পার্ব্বত্য সমাজে কুকিগণ সর্ব্বাপেক্ষা বর্ব্বর ও হিংস্রক এ কথা বোধ হয় কাহারও অগোচর নহে। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রযত্নে এই নিরক্ষর জাতির অনেকেই কিয়ৎ পরিমাণে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছে। আনন্দের কথা এই যে, সেই নরখাদক নগ্ন সমাজেও কবিত্বের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। উক্ত মহারাজের পরলোক গমনের পর, ত্রিপুরার সামন্ত কুকিরাজা বাণ থামপুই, "দুঃখগান" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে শব্দ মাধুর্য্য অথবা ভাব গাম্ভীর্য্য না থাকিলেও, ইহা অসভ্য ও কর্কশ-হৃদয় কুকির রচিত বলিয়া আদরের জিনিস। ইহা একটি বর্ব্বর জাতির প্রথম স্ফুরিত কবিতা বিধায়, রত্নাকরের মুখনিঃসৃত প্রথম শ্লোকের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। কবিতাটি পূর্ব্বে একবার প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া এ স্থলে প্রদান করা হইল না। (৯) এতদ্দারা বুঝা যাইবে, মহারাজের কবিত্ব-প্রতিভা রাজ্যমধ্যে কেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল!

কমলা ও ভারতীর অপূর্ব্ব সম্মিলনে সেকালে ত্রিপুরার ভাগ্যে যে শুভদিন ঘটাইয়াছিল, সে সৌভাগ্যের দিন আবার আসিবে কি না, ভগবান জানেন। আমরা দেখিতেছি, ত্রিপুররাজ্য বঙ্গভাষার চির আশ্রয়স্থল, সেখানে বিবিধ উপচারে ভাষার অর্চ্চনা হইতেছে। এখনও রাজ্য হইতে সাহিত্য সেবা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় তথায় পুনর্ব্বার সাহিত্যরথী আবির্ভূত হইয়া রাজ্যের ও মাতৃভাষার গরিমা বৃদ্ধি করিবে, এরূপ আশা করা আমরা দুরাশা বলিয়া মনে করি না। ত্রিপুরার সিংহাসন অটল হউক, এবং সেই সিংহাসন আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা জয়যুক্ত হউক, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা। *

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

৯। মল্লিখিত "কুকির কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, (নব্যভারত—১৩০৪ সন)

* দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গাল

(গল্প)

"ভাল চাওতো দশ পয়সা ফিরাইয়া ত্থাও। ব্যাটা পাউরের ধাউর! তঞ্চকের তঞ্চক! অ্যাক বোতল লেমনেড্ পানি। ব্যাটা বলে কিনা দাম চাইর আনা। নারায়ণগঞ্জের ডেভিড্ কোম্পানীর শীতল লক্ষার জলের লেমনেড্ এক বোতল ছয় পয়সা, আর ব্যাটার ছাগলের "—" দাম চাইর আনা! খাইবার আগে বল্লা না ক্যান্? ব্যাটা কলকাত্তার চোট্টা—চোট্টামির আর জাগা পাইলা না। ঢাকার বাঙ্গালের সঙ্গে চোট্টামি করতে আইছ—"

কথাটা হইতেছিল চৌরঙ্গীর মোড়ে, একটী সুদৃশ্য রেষ্টোরাঁ বা খাবারের দোকানের যে ঘষা কাচের অর্দ্ধ দরজায় mineral waters লেখা ছিল সেই দরজার ভিতরের দিকে। বক্তার এক হাতে একটী মলিন কেম্বিসের ব্যাগ্। তাহার সঙ্গে একটী মলিন গামছা এবং একটী ক্ষুদ্র হুঁকা বাঁধা। অন্য হাতে একটী জীর্ণ ছাতা। মাথার কম্ফর্টার জড়ান। গায়ে একখানা সাদা রামপুরী আলোয়ান। পায়ে কাপড়ের জুতা।

উপরিউক্ত কথার উত্তর স্বরূপ, একটা চাপকান-পরা চাপরাস-আঁটা, মাথায় পাগড়ী খানসামা বক্তাকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া, আয়নার কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

এমন সময় গৌরবর্ণ, মাথায় তেরী কাটা, গায়ে কাল আলপাকার কোট, পায়ে পামসু, এক

াাক ফুটপাত দিয়া যাইতেছিল। বক্তা তাহাকে ল—

"দেখেনতো মশয়! কি জুয়াচোরি! ব্যাটার লর "—" মত লেমনেড। দাম চাইর আনা! শ্যাষে মাইরা বাহির করিয়া দিছে; ব্যাটা আসল কাত্তইয়া জুয়াচোর।"

ভদ্রবেশী লোকটি থামিল। বলিল, "সব কল্‌কাতার ক জোচ্চোর নয়। সবাইকে আপনার গালাগল য়া অন্যায়। তবে এ দোকানের লোকাগুলো চ্চোরই বটে। ওরা সবাইকে ঠকায়, তা কল্‌কাতার কই হোক বা অন্য জায়গার লোকই হোক। মশায়ের স কোথায় জানতে পারি কি?"

বক্তা। আজ্ঞা আমার বাড়ী ঢাকা জিলার সুধন্যপুর ম।

ভদ্রবেশী। তা বেশ। মশাইয়ের কবে কলকাতা া হল? কি মনে করে আসা? মশাইয়ের নাম?

বক্তা। আমার নাম সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। এই আইজ লে গোয়ালনন্দের মেলে আইসা পউচ্‌ছি। একটা গ্রজারীর মোকদ্দমা ছিল। আমাদের হ্যাশের হ.রন্দ্র উকীলের নাম শোনেন নাই? তিনিই চিঠি ছেন যে ডিগ্রির টাকা আরাই হাজার আদায় ছ, আইসা লইয়া যাইবেন। সেই টাকা নিতে ছি। শিয়ালদ ইষ্টশনের থাকিয়া ট্রামে কইরা ঙ্গী আইছি। গারীতে ভাল কইরা ঘুমাইতে পারি। আইসা গ্যাখলাম ভবানীপুরের ট্রামের দেরী আছে। করলাম এক বোতল লেমনেড খাইলে শরীরটা টু ভাল লাগবে। তারপর কলকাত্তাইয়া চোট্টাদের কাণ্ড রে মশয় এই কাণ্ড!"

ভদ্রবেশী। মশাই ব্রাহ্মণ? প্রণাম! আপনার হয় কল্‌কাতায় তেমন জানা শোনা লোক নেই। াটা নিয়ে আসুন। আজ আমার ওখানেই আহারাদি বেন। তারপর রাত্রে গোয়ালন্দের গাড়ীতে চড়িয়ে। আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পাচক আছে। কোন ার অসুবিধে হবে না। আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, সব কল্‌কাতার লোক যে জোচ্চোর নয় তার প্রমাণ দেওয়া। আমরা অনেক পুরুষ কল্‌কাতায় আছি। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ। বাসা নেবুতলায় 4।।A বাবু রামশীল লেনে।

২

বহির্ব্বাটীর প্রকোষ্ঠটী ক্ষুদ্র কিন্তু সাজানো। সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা ব্যাগটী শিয়রে দিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। একটা গোল টেবিলের চারিধারে চারিখানি চেয়ার। উপরিউক্ত ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট। অন্য দুইখানি চেয়ারে আরও দুইজন লোক।

প্রথমে ভদ্রবেশী বলিল, "আজ একটা বড় রকমের শীকার পাওয়া গেছে। আড়াই হাজার টাকা। তবে জোর করলে কিছু হবার যো নেই। ব্যাটা ঢাকার বাঙ্গাল। শেষে পুলিশ ফুলিশ নিয়ে এসে একটা হাঙ্গামা বাঁধাবে। তার চেয়ে একটা ভাল বন্দোবস্ত করা যাক্ কি বল?"

অন্য দুই জন সম্মত হইল। তারপরে তিন জনে মিলিয়া অনুচ্চস্বরে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মধ্যে মধ্যে 'হুইস্কি' কথাটা শোনা গেল।

হঠাৎ সর্ব্বানন্দ শর্ম্মার নাক ডাকা বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "মশয় কয়টা বাজছে?"

সুরেন্দ্র। যা হোক খুব ঘুমুলেন। একটার সময় শুয়েছেন—এখন পাঁচটা।

সর্ব্বা। বলেন কি—পাচ টা? তবে আর যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা দেখা হইল না। মুর্গীহাট্টার থাইকা মাইয়ার লাইগা একটা তোরঙ্গ নিমু মনে করছিলাম, তাও আর হইল না। ভাগ্যে মা কালীর মন্দিরটা বেহান বেলা দেইখা আইছি।

সুরেন্দ্র। তা আজ না হয় নাই গেলেন। এক দিন থেকেই যান। কাল সব দেখতে ও কিনতে পারবেন। আপনার কোন অসুবিধে তো হচ্ছে না? খাওয়া

দাওয়া তেমন সুবিধে হয় নি বুঝি? একেতো উড়ে বামুন, তারপর আমরা লঙ্কাটা একটু কম খাই।

সর্ব্বা। বিলক্ষণ! কিছু অসুবিধা হয় নাই। আপনারা মনে করেন আমরা বুঝি খুব মরিচ খাই। আমরা আপনাদের থিকা বড় বেশী খাই না। তবে চাটগায়ের লোক খায় সত্য—কিন্তু ঢাকা তো আর চাটগা নয়। ঢাকার থাইকা রেলে নারায়ণগঞ্জ দুই আনা; নারায়ণগঞ্জ থাইকা চাদপুর জাহাজে দশ আনা, চাদপুর থাইকা চাটগা রেলে পোনে দুই টাকা—মোট মাট আরাই টাকা। কলকাত্তার ভাড়া তিন টাকা। যাক্ এখন তামাক টামাক খাইয়া আহ্নিকটা করতে হবে।

সুরেন্দ্র। এঁরা আমার বন্ধু—ইনি হরেন বাবু আর ইনি নরেন। ব্রাহ্মণ—প্রণাম কর।

উভয়ে। প্রাতঃপ্রণাম।

সর্ব্বা। জয় হউক। একটু তামাক হুকুম করুন সুরেন্দ্র বাবু।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞে একটা চুরুট ইচ্ছা করুন। আমাদের ঠিকা চাকর এখনও আসে নি।

সর্ব্বা। আরে মশয় হাভানা মাভানায় আমাদের সানায় না। কড়া তামুক না হইলে প্যাটৃ খোলে না।

এই বলিয়া ব্যাগটা খুলিয়া একটা ক্ষুদ্র কৌটা হইতে তামাক ও টিকা বাহির করিয়া নিজেই তামাক সাজিয়া খাইতে লাগিলেন। ব্যাগের তালাটা বন্ধ করিলেন না। ব্যাগের মধ্যে নোটের তোড়া তিন বন্ধুতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এবং তাহাদের দৃষ্টি ক্ষুধিত হিংস্র জন্তুর মত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৩

সর্ব্বানন্দ অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে তামাক টানিতে লাগিলেন। খানিক পরে ব্যাগটী বন্ধ করিয়া চাবি কোমরে বাঁধিয়া, স্নানের ঘরের দিকে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তিন বন্ধু তিন তাস খেলার আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। সর্ব্বানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "তবে আজ থাকাই ঠিক। আসুন একটু খেলা টেলা যাক—তিন তাস মশাইর আসে কি?"

সর্ব্বা। জুয়া সক্করথম আসে। তবে তিন তাস ঠিক কি জিনিষ জানি না।

সুরেন্দ্র। জুয়া—আপনি কি তবে বাজি রেখে খেলেন না কি? আপনি খুব রসজ্ঞ দেখছি। আমরা কখন কখন বাজি ধরে খেলি বটে, তবে সে খুব কম। তিন তাস জিনিষটা খুব সহজ। এই দেখুন তিনটী তাস—ইস্কাবনের টেক্কা, চিড়িতনের নহলা, হরতনের বিবি। এই আমি তাসগুলি রাখলুম। আপনাকে হরতনের বিবি বের করে দিতে হবে। যদি বের করতে পারেন তবে আপনি জিতলেন। আর যদি বের করতে না পারেন আপনার হার হল।

এই বলিয়া তাস তিন খানিকে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া, রাখিল। সর্ব্বানন্দকে হরতনের বিবি বাহির করিতে বলিল। সর্ব্বানন্দ তাহার নিকট তম তাসখানি তুলিলেন। দেখিলেন হরতনের বিবি। তখন সুরেন্দ্র বলিল—

"আপনি দেখি খুব হুঁসিয়ার লোক। প্রথম বারেই হরতনের বিবি বের করেছেন। আপনার সঙ্গে পারা যাবে না। তবে আসুন খেলা যাক্। জুয়া খেলায় বাকি চলে না সব নগদ।" এই বলিয়া সে পাঁচশ টাকার নোটের এক তোড়া বাহির করিল। হরেন ও নরেনও বাহির করিল। অগত্যা সর্ব্বানন্দও ব্যাগ হইতে পাঁচশ টাকার নোটের তাড়া বাহির করিল। তখন খেলা আরম্ভ হইল। সর্ব্বানন্দ জিতিলই বেশীবার। প্রায় আট ঘণ্টা পরে নরেন বাবু বলিলেন—"গলাটা শুকিয়ে আসছে। সর্ব্বানন্দ বাবু মাপ করবেন। শুকনো গলায় এসব খেলা চলে না। একটু হুইস্কি টুইস্কি চলে কি?"

সর্ব্বা। আর মশয় হুচ্‌কি! হুচ্‌কি চলে, ব্রাণ্ডি চলে, রম চলে, জিন চলে, সেরি চলে, শ্যাম্পেন চলে, পোর্ট চলে, বিয়ার চলে,—ধাউনা মদ পর্য্যন্ত চলে।

সুরেন্দ্র তক্তপোষ চাপড়াইয়া বলিল, "আরে উনি রসজ্ঞ ব্যক্তি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করছ কেন!"

এই বলিয়া সুরেন এক বোতল হুইস্কি এবং চারিটী াস বাহির করিল। সোডার বোতল বাহির ়রিল। সকলে পান করিতে লাগিল, আর খেলা লিল।

এবার সর্ব্বানন্দ হারিতে লাগিল। যতই হারিতে াগিল, ততই বাজির দর বাড়াইতে লাগিল। শেষে ্রায় পাঁচশ টাকাই হার হইল।

সর্ব্বানন্দ তখন ঢুলিতে লাগিল। এমন সময় "অবাক জলপান" "অবাক জলপান" ফেরিওয়ালার হাঁক ডাক ুনা গেল।

হরেন্দ্র বলিল, "মদের মুখে অবাক জলপানটা লাগবে ়াল। সুরেন যাওতো ভাই, দু' আনার অবাক লপান নিয়ে আস।

সুরেন দুই মিনিটের মধ্যে অবাক জলপান কিনিয়া ানিল। তখন সর্ব্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু ্াবেন কি?"

সর্ব্বানন্দ। আরে! রাম রাম! আমি ব্রাহ্মণ! ামি যার তার তৈয়ারী জিনিষ খাইতে পারি? ামার ব্যাগে কাব্লিমটর ভাজা আছে। আমার মাইয়া ঙ্গে ভাইজা দিছিল। তার কাছে কোথায় লাগে আপনার অবাক জলপান? খাইয়া দেখবেন?

বলিয়া ব্যাগ হইতে একটী ক্ষুদ্র পুটুলী বাহির করিল। পুটুলী খুলিতে দেখা গেল, অল্প অল্প গুড়ে াখা বড় মটর ভাজা। পুটুলী খুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিল। বলিল, "মশয় একবার স্নানের ঘর হইতে আসি।" বলিয়া, স্নানের ঘরের দিকে গেল।

বন্ধুত্রয় দেখিল, ব্যাগের তালা খোলা রহিয়াছে। অমনি সুরেন্দ্র উঠিয়া ব্যাগ হইতে অবশিষ্ট নোটগুলি লইয়া পকেটস্থ করিল। যখন সর্ব্বানন্দের ফিরিবার আওয়াজ শুনা গেল তখন তিন জনে তাহাকে দেখাইয়া গুড়মাখা মটর ভাজা খাইতে লাগিল। হরেন্দ্র বলিল, "মশাইয়ের মেয়েটী দেখছি গুণবতী—খেতে যেন অমৃত। মেয়েটীর বিয়ে হয়েচে কি?

সর্ব্বানন্দ বলিল, "টাকার অভাবে এত দিন বিয়া দিতে পারি নাই। এইবার টাকার জোগারটা—"

এমন সময় হরেন্দ্র অজ্ঞান হইয়া চেয়ার হইতে মেঝেতে পড়িয়া গেল। নরেন্দ্র কি হইল কি হইল বলিয়া হরেন্দ্রকে উঠাইতে গিয়া, নিজে আর উঠিল না। তখন সুরেন্দ্রের চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিয়াছে। ধুতুরার বীজের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে—বুঝিতে বাকী রহিল না। হঠাৎ সে পৈশাচিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল গুপ্ত পকেট হইতে ছোরা বাহির করিয়া সর্ব্বানন্দকে লক্ষ্য করিয়া হাত উঠাইল। কিন্তু হাত আর নামাইতে পারিল না। হাত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। সেও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন সর্ব্বানন্দ তীব্র বিদ্রূপের ভরে তিন জনের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। পরে উহাদের পকেট হইতে সমস্ত নোটগুলি সংগ্রহ করিয়া ব্যাগে পুরিল। পার্শ্ববর্ত্তী দোকানের ঘড়িতে দেখিল, রাত্রি তখন লোকাল নয়টা চল্লিশ মিনিট। নিম্নস্বরে বলিল, "নচ্ছাড়েরা গারী ভারাটা লাগাইল!" বলিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাশের গাড়ী চড়িয়া কোচম্যানকে ষ্টেশনে যাও বলিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল। তৎপরে একটী চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাবা নমস্কার! কল্‌কাত্তায় যেন কেহ কোন দিন না আসে —"

* * * * *

পরদিন সন্ধ্যাকালে মেডিকেল কলেজের হাঁসপাতালে যখন তিনজনের জ্ঞান হইল, ঢাকা জিলার সুধন্যপুর গ্রামে সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা তখন সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া মনে মনে ভাবিল—"মনিবের কাযে কলকাত্তা গিয়া, মাইয়া বিয়ার যোগার হইল। আর তাও কম নয়—একেবারে দের হাজার টাকা।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস।

হিসাবের খাতা

(গল্প)

"ও গো!"

প্রাতর্ভ্রমণের পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ঘর্ম্মসিক্ত পাঞ্জাবীটি খুলিয়া সযত্নে রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া প্রফুল্ল তাহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ওগো!"

প্রথম ডাকে সাড়া মিলিল না। কারণ তাহার স্ত্রী সুহাসিনী প্রাভাতিক গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে ভৃত্যকে বাজারে পাঠাইয়া, নিশ্চিন্তমনে স্থানীয় লাইব্রেরী হইতে আনীত একখানি নব প্রকাশিত উপন্যাস নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতেছিল।

প্রফুল্ল বাবুর বয়স ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর মাত্র। সম্প্রতি সে দিল্লীতে একটি চাকুরী পাইয়া স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে লইয়া আসিয়াছে। কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজে পড়িতেছে, সুতরাং মাতাঠাকুরাণীকে কর্ম্মস্থলে আনিতে পারে নাই। স্ত্রী সুহাসিনী অল্পবয়স্কা হইলেও বুদ্ধিমতী এবং নূতন 'সংসার' পাতিয়া বেশ গৃহিনীপনা দেখাইতেছে। কিন্তু কিছুদিন হইতে প্রফুল্লর মনে হইতেছে যে অল্পবয়স্কা গৃহিনী কিছু অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিতেছে। যে দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রয়োজন। নানা চিন্তা করিয়াও কোন কূল না পাইয়া প্রফুল্ল আজ প্রাতে সহকর্ম্মী রাম বাবুর পরামর্শ লইবার জন্য তাঁহার বাসায় গিয়াছিল;—ইহার ফলে যে সিদ্ধান্তে সে উপনীত হইয়াছিল, স্ত্রীকে অবিলম্বে তাহা জ্ঞাত করাইবার জন্য কিছু অধীর ভাবেই প্রফুল্ল আবার ডাকিল—"ওগো, ও সব ছাইপাঁশ নবেলগুলো একটু রেখে একটা কাযের কথা শুনে যাও না।"

পরিচ্ছেদের মধ্যস্থলে এইরূপে রসভঙ্গ হওয়ায় কিছু বিরক্ত হইয়া সুহাসিনী আসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কি বলছ?"

প্রফুল্ল কিয়ৎক্ষণ তাহার সন্তঃস্নাতা সুন্দরী পত্নীর লাবণ্যময় মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল। যে কথা বলিবার জন্য সে উগ্রীব হইয়াছিল তাহা মুখ হইতে নিঃসরণ করিতে ইতস্তত করিতে লাগিল।

সুহাসিনী আবার বলিল, "হাঁ করে দেখ্‌ছ কি? কি জন্যে ডাক্‌ছিলে তা বলনা!"

প্রফুল্ল তাহার প্রেমময়ী পত্নীর অভিমানে যাহাতে কোনও মতে আঘাত না লাগে এইরূপ সুরে, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "এই আজ রাম বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম। আমাদের খরচপত্র যে রকম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে কি করা উচিত সে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রাম বাবু বলেন কি যে আমাদের একটা—একটা হিসেবের খাতা—রাখা উচিত।"

সুহাসিনীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

প্রফুল্ল পুনরায় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "দেখ, রামবাবুর বাসাতেও যে ক'জন লোক, আমাদেরও তাই। স্বামী স্ত্রী, একটি ছেলে, একজন চাকর, একজন বামুন ও একজন দাই। কিন্তু তাঁরা হিসেবের খাতা রাখেন, মাঝে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করেন, কোনও মাসে অকুলান হয় না।"

সুহাসিনী এইবার উত্তর দিল, "কেন আমিও ত হিসেবের খাতা রাখি। রাম বাবু কি হিসাবের খাতা বলে জিনিষটা নূতন আবিষ্কার করেছেন না কি? বরঞ্চ তাঁর টেরি কাটার ফ্যাশনটায় তাঁর কিছু মৌলিকতা দেখিয়েছেন বলে বোধ হয়।"

প্রফুল্ল তাহার নানাবিধ কঠিন সমস্যার সহজ মীমাংসা-কর্ত্তা রামবাবুর প্রতি স্ত্রীর এই অবজ্ঞা দেখিয়া কিছু উষ্ণ হইয়া উঠিল এবং কোনও রূপ কুণ্ঠাপ্রকাশ না করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "হিসাবের খাতা তুমি রাখ বটে, কিন্তু রামবাবু বলেন, খাতাটা আমাদের উভয়ের রাখা উচিত—অর্থাৎ অন্ততঃ সপ্তাহে একবার

করে'—খাতাটা আমার পরীক্ষা করে' দেখা উচিত।"

স্ত্রীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে স্বামী সন্দেহ প্রকাশ করিলে কয়জন স্ত্রী স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু সুহাসিনী কোন কথা না বলিয়া গৃহের এককোণে নীরবে বসিয়া, হস্তস্থিত উপন্যাসপাঠে পুনরায় মনঃসংযোগ করিল।

"তোমার হিসেবের খাতাটা কোথায়? আচ্ছা—থাক্—থাক্—" বলিয়া টেবিলের উপর হইতে প্রফুল্ল একখানা রুলকাটা বাঁধন 'এক্সারসাইজ বুক' তুলিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে বসিল।

"রামবাবু বলেন তাঁহার গিন্নীটি খুব পাকা। চাকরদের সাধ্য নেই যে চার আনার জিনিষটা এনে ছ' আনার হিসেব লেখায়।"

সুহাসিনী উপন্যাস হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "তা ঐ রকম একটা বে কল্লেই পার্ত্তে। আমার—"

"সব তাতে তুমি অত চট কেন? কাযের কথায় ওসব ছেলেমানুষী ঠাট্টা ভাল লাগে না। একি! এইবার ধরা পড়েছ! এই যে এখানে চিঠির কাগজে দিদিকে চিঠি লিখ্ছ—'এ মাসে যে কটা টাকা বেঁচেছে তাতে একটা জিনিষ কিন্‌তেই হবে।' যাক্ আর পাতা উল্টে চিঠিটা সব পড়ে তোমায় লজ্জা দিতে চাই না। যা কিছু মাসের শেষে বাঁচ্‌বে তা যদি বাজে জিনিষ কিনে খরচ করবে, তা' হলে কোন কালে এক পয়সা জম্‌বে তার সম্ভাবনা নেই।"

সুহাসিনী নীরবে গম্ভীরভাবে গ্রন্থপাঠ করিতে লাগিল। প্রফুল্ল আবার হিসাবের খাতা খুলিল।

"এ কি! গয়লা—২০৲? ঐ ত জলো দুধ। এ মাসে মাসে না খেলেই নয়? খোকার জন্যে একটু নিলেই হয়। মোটা চাউল—১৫৲। তুমি জান না, লোকজনেরা অর্দ্ধেক চা'ল চুরী করে অর্দ্ধেক খায়। এসব বিষয়ে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। ঘি—৩০৲ কেন? গরীব কেরাণীর অত জলখাবার খাওয়া চলে না। তুমি জান না এদেশের মানুষগুলো ঘি ভয়ানক চুরী করে। অড়র ডাল, ঘি—এই ওদের খাওয়ার প্রধান উপকরণ। রাম বাবু বলেন, মাসে দশটাকার ঘিতেই তাঁদের চলে যায়।"

হিসাবের খাতার এইরূপ সমালোচনা করিতে করিতে এবং পত্নীকে সদুপদেশ দিতে দিতে যখন প্রফুল্ল ক্লান্ত হইয়া থড়িল, তখন সহসা গৃহে বৃদ্ধা দাই প্রবেশ করিল এবং সুহাসিনীকে কি বলিল।

সুহাসিনী উঠিয়া আসিয়া প্রফুল্লের হাত হইতে হিসাবের খাতাখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "মশাই, ওখানি রামবাবুর স্ত্রীর সাংসারিক খরচের খাতা, আমার নয়। এখন তিনি খাতাখানি চেয়ে পাঠিয়েছেন, ফেরত দিতে পারি বোধ হয়? রামবাবুর বাড়ী থেকে এ মাসের 'মানসী'খানা চেয়ে পাঠিয়েছিলুম, খোকা ভুল করে তার মার হিসেবের খাতাটা দাইয়ের হাতে দিয়েছিল। আমার হিসেবের খাতাটা দেখ্‌তে চাও ত দিচ্ছি।"

দাই খাতা লইয়া প্রস্থান করিল। প্রফুল্ল হতভম্ব হইয়া বলিল, "না, আমি আর কোনও হিসেবের খাতা দেখ্‌তে চাই নে।"

"না, তোমাকে দেখ্‌তেই হবে। আর দিদিকে যে চিঠিটা লিখ্‌ছিলুম, তারও পাতা উল্‌টে শেষ দিক্‌টা পড়্‌তে হবে,—পড়—"

প্রফুল্ল পড়িল—"এ মাসে যে ক'টা টাকা বেঁচেছে তাতে দু' একটা জিনিষ কিন্‌তেই হবে। খোকার একটা ফ্ল্যানেলের সুট আর ওঁর একটা ফ্ল্যানেল সার্ট না কিন্‌লেই নয়। আজকাল সন্ধ্যার সময় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। এখানের চেয়ে কলকাতায় অনেক সস্তা, যখন তোমার মাস্‌তুতো দেওর এখানে আসবেন তখন তাঁর হাতে পাঠালে মাশুল লাগবে না। আজকাল জিনিষ পত্রের দাম এত বেড়েছে যে এই কটা টাকা মাহিনায় আর চলে না। ওঁদের আফিসে রামবাবু বলে একটি ভদ্রলোক কায করেন। তিনিও ঐ মাইনে পান। তাঁর স্ত্রী সেদিন বলছিলেন, তাঁর ভাই মধ্যে মধ্যে টাকা ও ছেলেকে গরম কাপড় প্রভৃতি কিনে পাঠান তাই রক্ষে, তা নইলে সংসার চলা দুর্ঘট হত। তবুও কোন কোন মাসে ধার করতে হয়। আমার সৌভাগ্য

আমাকে এখনও তাঁর মত অবস্থায় পড়্‌তে হয় নি, এবং যৎসামান্য কিছু কিছু জমাতে পার্‌ছি।"

গৃহ পুনরায় নিস্তব্ধ হইল। এবার অভিমানভরে সুহাসিনীর বাক্‌রোধ হয় নাই। অনুতপ্ত স্বামীর অজস্র চুম্বনধারায় অভিসিক্ত হইলে কোন্‌ রমণীর অভিমান টিকিয়া থাকিতে পারে?

শ্রীবিভাবতী ঘোষ।

মহারাষ্ট্রে বিজয়া দশমী

বাঙ্গালা দেশে বিজয়ার সঙ্গীত বড় করুণ। বিয়োগ-বিধুর ক্ষত হৃদয় সেদিন শ্বশুরগৃহবাসিনী কন্যার দুঃখে কাঁদিয়া ওঠে। বাঙ্গালীর গৃহ সেদিন আলিঙ্গনের আড়ম্বরের মধ্যেও অশ্রু প্রবাহিত হয়। মহারাষ্ট্রে বিজয়ার ব্যবস্থা অন্যরূপ। বাঙ্গালী যখন কাঁদিতে বসে, তখন যোদ্ধার জাতি মারাঠা'রা সীমোল্লঙ্ঘনে যায়।

শিবাজীর সেনাদলে নিয়ম ছিল, বর্ষার কয় মাস সমস্ত সেনা স্বদেশে স্বরাজ্যে সেনা-নিবাসে অথবা পল্লীগৃহে বিশ্রাম করিবে, কারণ বর্ষাকাল যুদ্ধ অভিযানের উপযোগী নহে। সমস্ত সেনাপতি শরদাগমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেন। তাঁহারা রাজ-দরবারে উপযুক্ত উপঢৌকন লইয়া বিজয় দশমীর দিন উপস্থিত হইতেন। তার পর দিকে দিকে রাজার নির্দ্দেশ মত দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আটমাস তাঁহারা পররাজ্যে অতিবাহিত করিতেন। আটমাস তাঁহারা পররাজ্যে লুণ্ঠনলব্ধ অর্থে সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, আর বর্ষা সমাগমে প্রচুর ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার লইয়া আবার রাজ-দরবারে ফিরিতেন। বিজয়ার প্রভাতে বাঙ্গালী যখন কাঁদিতে বসিত, মারাঠা তখন বাহির হইত বিজয়-যাত্রায়।

ইংরাজ ঐতিহাসিক স্কট ওয়ারিং বলিয়াছেন, বিজয়ার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত শিবাজীই করেন। কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। শরদাগমে দিগ্বিজয়-যাত্রার প্রথা ভারতবর্ষে পূর্ব্ব কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বর্ষা ঋতু সমরায়োজনের অনুকূল বলিয়া মুঘলের মুলুকগিরিও বোধ হয় শরতেই আরম্ভ হইত। কিন্তু শিবাজীর সময় হইতে পেশবাদিগের পতন কাল পর্য্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্যে বিজয়ার উৎসব চিরকালই জাঁকজমকের সহিত চলিয়া আসিয়াছে।

ভোসলা দিগের কুলদেবী ভবানী। সুতরাং শিবাজীর সময়ে যে এই দেবীর পূজা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? ছত্রপতি শাহু যতকাল জীবিত ছিলেন, সাতারায় ভবানীর পূজা হইত। শাহুর মৃত্যুর পরে পেশবারা পুণায় ভবানীর পূজা করিয়াছেন। বিজয়ার দিন পূর্ব্বরীতি অনুসারে পেশবাগণও দরবারে বসিতেন। পূর্ব্বরীতি অনুসারে তাঁহারাও সামন্তগণের নিকট হইতে এইদিন নজর লইতেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য বস্ত্র ও অস্ত্র উপহার দিতেন। সাতারার রাজার নিকট মহার্ঘ উপঢৌকন পাঠাইতেন। বিদেশী রাজ দূতেরাও এই দিন মহামূল্য উপহার পাইতেন। ইংরাজ দূত স্যার চর্লস ম্যালেট একবার বিজয় দশমী উপলক্ষ্যে পেশবার নিকট হইতে দুই শত টাকা মূল্যের একটি খেলাত পাইয়াছিলেন।

পেশবাদিগের আমলে দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার পূর্ব্বেই পেশবার নেতৃত্বে সমস্ত মারাঠা সামন্তগণ সসৈন্যে সীমোল্লঙ্ঘনে বাহির হইতেন। পুণা নগর হইতে সেদিন মারাঠা সাম্রাজ্যের পতাকা 'ভগবা ঝেণ্ডা' ও সুবর্ণ তার খচিত কেতন 'জরী পটকা' লইয়া পেশবা বাহির হই-

তেন। অগণিত সর্দ্দার তাহাদের নিজ নিজ পতাকা ও বিরাট বাহিনী লইয়া সঙ্গে চলিত। অশ্ব, গজ ও উষ্ট্র সেদিন মনোহর সজ্জায় সজ্জিত হইত। নব পরিস্কৃত অস্ত্রগুলি সেদিন সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইত। অসংখ্য নাগরিক সেদিন পেশবার বিরাট বাহিনীর সহিত পবিত্র শমী পত্র চয়ন করিতে যাইত। শমী বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইয়া পেশবা সর্ব্ব প্রথমে শমী-পত্র চয়ন করিতেন, আর অমনি সেই শুভ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কামান ও বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিত। তার পর নিকটস্থ শস্যক্ষেত্র হইতে পেশয়া এক গুচ্ছ বজরী লইতেন। আর সেই সঙ্গে সমস্ত মারাঠা সেনা তীর ছুড়িয়া বন্দুক দাগিয়া তলোয়ার ও বর্যা হাতে লইয়া সেই শস্যক্ষেত্র লুণ্ঠন করিতে ছুটিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে শস্যক্ষেত্র অশ্বপদতলে মর্দ্দিত হইত। শস্যশীর্ষ শস্য বিহীন হইত। কাহারও ভাগ্যে হয়ত সেদিন এক মুষ্টি বজরী জুটিয়া যাইত, কেহ হয়ত এক গুচ্ছের বেশী পাইত না। সমস্ত বৎসর পররাজ্যের পল্লীতে পল্লীতে শস্যক্ষেত্রে ও নগরে যে লুণ্ঠন চলিবে পুণা নগরোপান্তে বিজয়া দশমীর দিন তাহারই স্বল্প অভিনয় হইত।

সমস্ত দিন নানাবিধ উৎসবে অতিবাহিত হইত। উৎসৃষ্ট মেষ ও মহিষের রক্তে মারাঠা সাদীগণ সেদিন তাহাদের অশ্বগুলিকে অভিষিক্ত করিত। তার পর সত্য সত্যই সমরযাত্রা।

মাত্র এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্যার জন ম্যালকম্ মহা-রাষ্ট্রের বিজয়া দশমীর এই বিবরণ লিখিয়াছিলেন। মাত্র এক শতাব্দী—কিন্তু ইহার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এখনও মারাঠা যুবকেরা বিজয়া দশমীর দিন যে যেখানে থাকুক শমীপত্র চয়ন করিতে যায়। তাহাদের ভাষায় ইহার নাম সুবর্ণ লুণ্ঠন। সেকালে সত্য সত্যই শমীপত্র চয়নের অব্যবহিত পরে সুবর্ণ লুণ্ঠনের সুযোগ পাওয়া যাইত। এখন শমীপত্রই আছে, সুবর্ণের কণা মাত্রও পাইবার ভরসা নাই। সেকালের মত আজিও মহারাষ্ট্রের প্রতিগৃহে বিজয়ার প্রাতে অস্ত্র শস্ত্র পরিস্কৃত হয়, অশ্ব থাকিলে সুসজ্জিত হয়। পল্লী-প্রধানের গৃহ মঙ্গলবাদ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। অপরাহ্ণে সকলে মিলিয়া আজিও সীমোল্লঙ্ঘনে যায়। কিন্তু সে সীমোল্লঙ্ঘন বাস্তবিকই একটা ব্যর্থ অভিনয় মাত্র।

আজ কি বাঙ্গালীর মত মারাঠার হৃদয়ও বিজয়ার প্রদোষে কাঁদিয়া ওঠে না? বাঙ্গালী কাঁদে জগৎ-জননীকে কন্যা কল্পনা করিয়া তাহার বিরহে, মারাঠা কাঁদে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া। আজ বাঙ্গালায় ও মহারাষ্ট্রে সত্য সত্যই বিজয়ার দিন বড় শোকের দিন। কে জানে কবে এ মহাশোকের পরিসমাপ্তি হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

চিন্তামণি

(গল্প)

চিন্তামণির মত নিরীহ লোক আর দ্বিতীয় ছিল না। কেহ দুটো কড়া কথা শুনাইয়া দিলেও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না। তাহার রাগ কেহ কখনও দেখে নাই। পরের উপকার করিতে সে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা হউক আর অর্থ দ্বারাই হউক, পরের বিপদে সে সাহায্য করিত। অনেক সময় পরের উপকার করিতে গিয়া তাহাকে ঠকিতে হইয়াছে ও পরিজনবর্গের গঞ্জনা সহ্য করিতে

হইয়াছে। গ্রামের সকলে তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত।

সে খাইতে ও খাওয়াইতে বিশেষ আনন্দলাভ করিত। গ্রামের কোন সমারোহে বা বনভোজনে সে না আসিলে চলিত না। নিজে ভাল ভাল খাবার তৈয়ার করিতে পারিত। বেশভূষার দিকে তাহার একটু লক্ষ্য ছিল। তাহাকে ময়লা কাপড় পরিতে কেহ কখনও দেখে নাই। গান বাজনার দিকেও তার বেশ টান ছিল। নিজে গান বাজনা না জানিলেও, কোন আসরে সে অনুপস্থিত হইত না।

এক বিষয়ে তাহার বড় অশান্তি ছিল। ভগবান তাহাকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির স্ত্রী দিয়াছিলেন। মোক্ষদা তিলেকের জন্য চিন্তামণিকে শান্তি দেয় নাই। যখনই সে বাড়ী যাইত, মোক্ষদা বিনাকারণে বকিয়া ও চীৎকার করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিত। সক্রেটীসের জ্যান্থেপীও বোধ হয় তার চেয়ে বেশী কলহপ্রিয়া ছিল না। মোক্ষদার একটি মেয়ে হইয়াছিল। চিন্তামণির ভাইদের ছেলে ছিল। মোক্ষদা দেবরগণের সহিত ও তাহাদের পত্নীগণের সহিত সর্ব্বদা ঝগড়া করিত। চিন্তামণি তাহা ভালবাসিত না। সে ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে আদর করিত, মোক্ষদার তাহা মোটেই সহ্য হইত না।

মোক্ষদার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য চিন্তামণি যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত। যখন কোন উপলক্ষ্যে পরিবারস্থ কাহারও কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইত, চিন্তামণি ইচ্ছা করিয়া নিজে যাইত। তাহার ভাইয়েরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কোন ত্রুটী দেখিলে তাহারা যখন তাহাকে বকিত, তখন সে ছোট ভাইয়ের মত সব সহ্য করিত।

২

একবার পূজার বাজার করিবার জন্য চিন্তামণি কলিকাতা যাইতেছিল। যে গাড়ীতে সে উঠিয়াছিল, সে গাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক এবং এক কোণে আড়ষ্টভাবে এক স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। ভদ্রলোকগণ একে একে নামিয়া গেলেন। রহিল কেবল চিন্তামণি ও সেই স্ত্রীলোকটি। চিন্তামণির এক একবার মনে হইতে লাগিল, স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় যাইবে; কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ে কি মনে করিবে এই ভাবিয়া পারিতেছিল না। স্ত্রীলোকটি কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া চিন্তামণির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

অবশেষে চিন্তামণি কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া বলিল, "তুমি কোথায় যাবে গো?"

স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ পরে বলিল, "কল্‌কাতা।"

"সেখানে কে আছে?"

"কেউ নেই।"

চিন্তামণি বিস্মিত হইয়া বলিল, "তবে?"

স্ত্রীলোকটি কথা কহিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চিন্তামণি বলিল, "কথা কইচ না যে?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সেখানে কাযকর্ম্ম করবার জন্যে যাব।"

"কি কাজকর্ম্ম?"

"কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একটা দাসীবৃত্তি কি জুটিয়ে নিতে পারবো না?"

"কখনও কল্‌কাতায় গিয়েছ?"

"না।"

"তবেই হয়েছে! কল্‌কাতা পাড়াগাঁ নয়, ও রকম অসহায় অবস্থায় গেলে বিপদে পড়বে।"

স্ত্রীলোকটির মুখ চূণ হইয়া গেল। সে কিছু বলিল না, কিন্তু চিন্তামণির প্রতি একান্ত নির্ভরতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চিন্তামণি চিন্তিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বাড়ী থেকে রাগ ক'রে এসেছ তা বুঝতে পেরেছি। কল্‌কাতায় চল, তোমাদের ষ্টেসনের টিকিট কিনে দেব, বাড়ী ফিরে যাবে।"

স্ত্রীলোকটি দৃঢ়স্বরে বলিল, "ফেরবার জন্যে আসিনি, কেউ আমায় ফেরাতে পারবে না।"

চিন্তামণি অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

মার কে আছে? তোমার শরীরে সধবার চিহ্ ছ।"

স্ত্রীলোকটি যেন একটা ধাক্কা সামলাইয়া বলিল, ীর বাড়ী কখনো দেখি নি, স্বামী আছেন কিনা না। এক দূর সম্পর্কের ভাই আছে, তার কাছেই ান ছিলাম। আজ সে তাড়িয়ে দিলে।"

চিন্তামণি বলিল "তোমার ভাইয়ের কাছে ফিরে া উচিত।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "সেখানে আমার স্থান ।"

চিন্তামণি আর কিছু বলিল না। স্ত্রীলোকটি পুনরায় কে বলিল, "আপনি আমার একটা উপকার করতে বন?"

'কি?"

'আমাকে একটা কায দেখে দিতে পারবেন?"

চিন্তামণি বলিল, "সেটি পারব না। তোমার এই তোমাকে ঝিয়ের কাযে নিযুক্ত ক'রতে পারব

ীলোকটি ভীতা হইল। চিন্তামণি বিষণ্ণ মনে ক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

৩

াওড়ায় গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বে চিন্তামণি আর ার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে ঠিক করলে?"

ীলোকটি বলিল, "কোথায় যাব জানি নে।"

ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে চিন্তামণি স্ত্রীলোকটিকে , "আমার সঙ্গে যাবে?" সে কিছু না বলিয়া, নর বাহিরে আসিয়া চিন্তামণি এক ঘোড়ার গাড়ী করিল, এবং স্ত্রীলোকটিকে উঠিতে বলিল। উঠিলে, চিন্তামণি উঠিয়া অপর গদিটিতে বসিল। ম্যান হাঁকিল, "কোথায় যেতে হবে বাবু?" চিন্তা- লিল "বড়বাজার।"

চিন্তামণি বড়বাজারে তাহার এক পরিচিত দোকানে উঠিল। দোকানের মালিক ত স্ত্রীলোক দেখিয়া অবাক্। চিন্তামণি আপনা হইতেই বলিল—"ইনি আমাদের গ্রামের এক ভদ্র ঘরের মেয়ে। শ্যামবাজার এঁর এক আত্মীয় আছেন। সেখানে এঁকে পৌছে দিতে হবে। আপনাদের বাসায় একটু ব'সে থাক্‌বেন।"

দোকানের মালিক—বিশ্বাস করিল না, বিরক্ত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। চিন্তামণি স্ত্রীলোকটিকে দোকানীর বাসায় পৌছাইয়া দিয়া, বাহির হইয়া পড়িল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

বৈকালে চিন্তামণি এক গাড়ী লইয়া ফিরিল। স্ত্রীলোকটিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৪

চিন্তামণি এক বাসা ভাড়া করিয়াছিল। স্ত্রীলোক- টিকে সেখানে লইয়া গেল। বাসায় একখানি খোলার ঘর, তাহারই রোয়াকে রান্নার জায়গা। উঠানে জলের কল।

ঘরের ভিতর গিয়া চিন্তামণি অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি ঘর ঝাঁড় দিতে লাগিল। ঘর ঝাঁড় দেওয়া হইলে সে চিন্তামণিকে বলিল, "একবার উঠুন, বাজার থেকে রান্নার জোগাড় করে এনে দিন। সমস্তটা দিন আপনার খাওয়া হয় নি।"

চিন্তামণি বলিল, "আর কষ্ট ক'রতে হবে না। খাবার খেয়ে থাক্‌লেই চলবে।" স্ত্রীলোকটি বলিল "সে হবে না।" অগত্যা চিন্তামণি উঠিল, এবং দুই তিনবার গিয়া সমস্ত জিনিস আনিয়া দিল।

স্ত্রীলোকটি রান্না করিতেছে, এমন সময় চিন্তামণি একবার তামাক সাজিবার জন্য কলিকাটা লইল। স্ত্রীলোকটি কলিকা কাড়িয়া লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চিন্তামণি বড় প্রীত হইল। এ রকম সেবা তাহার জীবনে এই সে প্রথম পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নামটা কি?"

সে বলিল, "আমাকে সবাই নীলু বলে' ডাকে। আমার নাম লীলাময়ী।"

খাওয়া হইয়া গেলে নীলু ঘরের ভিতর চিন্তামণির বিছানা পাতিল।

চিন্তামণি বলিল, "তুমি কোথায় শোবে?"

নীলু বলিল, "বাইরে রোয়াকে।"

চিন্তামণি বলিল, "এই ঘরের এক কোণে থাকলেই ত হত!"

নীলু বলিল, "না, বাইরেই থাক্‌ব।"

চিন্তামণি আর কিছু বলিল না। দিবসের শ্রমের পর অচিরে নিদ্রাভিভূত হইল।

৫

চিন্তামণির কলিকাতার কায শেষ হইয়া গেল। কিন্তু সে বাড়ী যাইতে বিলম্ব করিতে লাগিল। নীলুকে সঙ্গে লইয়া যাইবে কি না তাহাই সে স্থির করিতে পারিতেছিল না।

একদিন বাজার হইতে একখানি ভাল শাড়ী ও একটী ভাল জামা আনিয়া চিন্তামণি নীলুকে দিল। নীলু বলিল, "এ কাপড় জামা কার?" চিন্তামণি হাসিয়া বলিল, "তোমার।" নীলু গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার কাপড়ের দরকার নাই।" চিন্তামণি বলিল "পূজোয় তোমাকে দিলাম।"—এই বলিয়া নীলুর গালে একটি টোকা মারিল।

নীলু দুইহাত পিছাইয়া গিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আপনি আমাকে কি ভাবেন? আপনার আশ্রয় নিয়েছি ব'লে কি যা মন হবে তাই করবেন? আমি এখনি চল্লাম। এখানে থাকার চেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করে খাব, অদৃষ্টে যা থাকে থাকবে।" —এই বলিয়া নিজের কাপড় দুইখানি লইয়া, যাইবার উদ্যম করিতে লাগিল।

চিন্তামণি এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, "মাপ করো নীলু, আমার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছিল বলতে পারিনে—এদুর্ব্বলতার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

নীলু কাপড় রাখিল, কাঁদিতে বসিল।

৬

এদিকে বাড়ী যাইবার জন্য চিন্তামণির ভাইদের তাগিদপত্র আসিতেছিল। সে একদিন নীলুকে বলিল, "নীলু, একটা কথা তোমাকে বলছিলাম।"

নীলু বলিল, "কি, বলুন।"

চিন্তামণি বলিল, "তোমার ভাইয়ের কাছে যেতে বলছিলাম। আমার বাড়ী ফিরে যাবার সময় হয়েছে।"

নীলু বলিল, "সেখানে আমার স্থান নেই। আপনি আমাকে এইখানেই কোনও বাড়ীতে একটা কায দেখে দিন।"

চিন্তামণি বলিল, "তা হ'লে চল, তোমাকে আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে যাব।"

নীলু বলিল, "না—আপনার সঙ্গে আমি কিছুতেই যেতে পারব না।"

চিন্তামণি বিস্মিত হইয়া বলিল "কেন? সেদিনের সেই কথা ভুলতে পার নি বুঝি?"

নীলু জিভ কাটিয়া বলিল, "ছি ছি, আমাকে কি এতই নীচ ভাবেন? সে আমি তখনই ভুলে গিয়েছি। আমি বলি যে, আমাকে নিয়ে গেলে, আপনাকে নানারকম নিন্দা কুৎসা শুন্‌তে হবে। আপনি অনেক অসুবিধায় পড়বেন। পাড়াগাঁয়ের সব খবরই আমি জানি ত! আপনি অমত করবেন না—অদৃষ্টে নির্ভর করে আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।"

চিন্তামণি বলিল, "সে আমি কিছুতেই ব'লতে পারব না। তবে যদি কথা না শুনে যাও, সে আলাদা কথা। আর, লোকে নানা কথা ব'লবে বলছ, আমি তার ভয় করি না। নিজে অধর্ম্ম না করলে ঠাকুর রাজি থাকবেন, তবে আর কিসের ভয়?"

নীলু আর কিছু বলিল না। চিন্তামণি বলিল, মন, যাবে ত? নীলু বলিল, "যাব।"

৭

এক যুবতীকে সঙ্গে করিয়া চিন্তামণি বাড়ী আসিল খিয়া গ্রামের সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার য়েরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না তাহাদের মানুষ দাদার একি কাণ্ড। মোক্ষদা ত তেলে গুনে জলিয়া উঠিল।

চিন্তামণি ভয়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রল না। সে তাহার মেয়েকে বলিল, "মিনু, এঁকে করিয়ে নিয়ে আয়।" মিনু পিতৃ-আজ্ঞা পালন ল। নীলু স্নান করিয়া আসিলে চিন্তামণি মিনুকে ল, "তোর কাকীমাদের বল্ এঁকে খেতে বন।"

সন্ধ্যার সময় চিন্তামণি জমা খরচ দেখিতেছিল, ব সময় তাহার ভাইয়েরা আসিয়া জুটিল। তাহা-কে দেখিয়া চিন্তামণি বলিল, "এসহে। আমার াতে দেরী হ'য়ে গিয়েছে, পূজার সব যোগাড় ছে ত?"

মধ্যম ভাই শিবু বলিল, "হ্যাঁ, সে সব ঠিক। ও লাকটি কে দাদা?"

চিন্তামণি বলিল, "উনি অনাথা, তাই আমি সঙ্গে । এনেছি।"

শিবু বলিল, "আমাদের বাড়ীতে থাকবে না ?"

চিন্তামণি বলিল, "তাই ব'লেই ত এনেছি ভাই। জন স্ত্রীলোককে দুটো খেতে দিতে কি পারব ? আর, উনি বাড়ীর কাযকর্ম্ম করবেন।"

শিবুর ছোট মধু বলিল, "তাতে কায নেই দাদা। ব আপদ কি জোটাতে আছে? এখনি পাঁচজনে কথা বলতে আরম্ভ করবে। কোথাকার কে, । জন্তে এত কেন?"

চিন্তামণি বলিল, "আমি প্রাণ থাকতে ওঁকে তাড়িয়ে দিতে পারব না।"

সকলের ছোট বিধু বলিল, "আপনি না পারেন, আমিই যেতে বলব।"

চিন্তামণি চটিয়া বলিল, "খবরদার বলছি, তা হলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবে।"

ভাইয়েরা চটিয়া গেল। ছোটর বড় নিধু বলিল, "বাড়ী ত আপনার একার নয় বড়দাদা, আমাদেরও অংশ আছে।" চিন্তামণি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "সে ত বটেই ভাই। তবে যত দিন ওঁর থাকবার জায়গা ক'রে দিতে না পারছি, ততদিন ওঁকে বাড়ীতে স্থান দিতেই হবে।" শিবু বলিল "ওর ঘর করবার খরচ আমরা দেব না কিন্তু।"

চিন্তামণি একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, "সে দিতে হবে না ভাই। আজ হ'তে সংসারের তহবিল রাখা ও খরচপত্র করা আমি ছেড়ে দিলাম। তোমরা কেউ সে কায ক'রবে। আমি চাষে ব্যবসায় খাটব। টাকা কড়ি নাড়ব না ছোঁব না।"

ভাইয়েরা কোন উত্তর দিল না।

মোক্ষদার সহিত চিন্তামণির দেখা হইলে মোক্ষদা তাহার সহিত কথা কহিল না।

৮

পরদিন চিন্তামণি নিজের আংটী বিক্রয় করিয়া, বাটী হইতে কিছু দূরে তাহাদের একখণ্ড জমির উপর এক ঘর আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েক দিনের মধ্যে বাঁশের বেড়ার ঘর তৈয়ারি হইয়া গেল। ভিতরে বাহিরে মাটী লেপা। ঘরের সম্মুখে খানিকটা জায়গা ঘিরিয়া চিন্তামণি উঠান তৈয়ারি করিয়া ফেলিল।

এ কয়দিন নীলুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। নীলু চিন্তামণির মেয়ের সঙ্গে স্নান করিয়া আসিত, এবং সে খাবার দিয়া গেলে খাইত। বাড়ীর মেয়েরা তাহার সঙ্গে মিশিবার চেষ্টা করিলেও সে মিশিত না।

চিন্তামণি কেবল খাইবার সময় বাড়ী ভিতর যাইত, রাত্রিতে বৈঠকখানায় থাকিত। যেদিন চিন্তামণি নীলুকে নূতন ঘরে লইয়া গেল, সেদিন নীলু তাহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমাকে চ'লে যেতে বলুন। আপনার এত লাঞ্ছনা আমি দেখতে পারছি না। আপনার কথা অমান্য ক'রে যেতে ভয় করে।"

চিন্তামণি একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "ছেলেমি ক'রোনা নীলু; লাঞ্ছনা আবার কি? নারায়ণ জানেন কোন অন্যায় কাজ ত করিনি।"

নীলুর রান্নার আয়োজন করিয়া দিয়া চিন্তামণি বলিল, "নীলু আজ তোমার কাছে খাব।"

নীলু বলিল, "ঐটে পারব না। আপনি বাড়ীতেই খাবেন। একবার ক'রে খোঁজ নিয়ে যাবেন। এখানে খেতে পাবেন না।"

চিন্তামণি একটু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

চিন্তামণি একে একে তাহার ভাল জামা, গায়ের কাপড় সব বিক্রয় করিল। সেই টাকায় সে নীলুর আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া দিল।

গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল, চিন্তামণি কলিকাতা হইতে এক বেশ্যা আনিয়া রাখিয়াছে। চারিদিকে ছি ছি পড়িয়া গেল।

৮

দেখিতে দেখিতে একবৎসর কাটিয়া গেল। নীলু প্রায়ই ঘরের বাহির হইত না, কেবল স্নান করিতে ঘাটে যাইত। মাটীর কলসীটী লইয়া সে ধীরে ধীরে ঘাটে যাইত। কোন দিকে চাহিত না, কাহারও সঙ্গে কথা কহিত না। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মেয়েরা কত ঠাট্টা করিত। সে কাহারও কথার উত্তর দিত না।

সে ঘুনসী ও ধূপকাটি তৈয়ারী করিয়া চিন্তামণির দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া দিত এবং দিন চার পাঁচ পয়সা রোজগার করিত। একবেলা ভাতেভাত রাঁধিয়া খাইত। চিন্তামণি কোন দ্রব্যাদি আনিয়া দিলে অত্যাবশ্যক দ্রব্য ব্যতীত সব ফেরত দিত। বাটীর প্রাঙ্গণস্থ তুলসীমূলে ও গৃহস্থিত রাধাকৃষ্ণের আলেখ্যের নিকট দুবেলা প্রণাম করিত। এই কঠোর সংযমে তাহাকে তপস্বিনীর ন্যায় দেখাইত। মনে হইত সে যেন একটি অগ্নিশিক্ষা। তাহার ললাটের সিন্দুর বিন্দু যেন জ্বলিত।

একটানা স্রোতে আরও দুইবৎসর চলিয়া গেল। চিন্তামণির সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। যে সকল কায সে করিত, তাহার ভাইয়ের দ্বারা তাহা হইত না। ব্যবসায়ে লোকসান হইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি কয়েকটা কন্যাদায়ে অনেক টাকা ঋণ হইয়া গেল। একদিন তাহার ভাইয়েরা বলিয়া বসিল তাহারা পৃথক হইবে। চিন্তামণি চমকিয়া উঠিল। চিরদিন সকলে মিলিয়া থাকিব এই আশাই সে করিত। সে বলিল, "ভাই, পৃথক হয় হ'য়ে কায নেই। ঋণ হ'য়েছে ত কি হ'য়েছে? সকলে মিলে শোধ করে ফেলব।"

ভাইরা শুনিল না। সকলে পৃথক হইয়া গেল। চিন্তামণি জিনিসপত্র ভাগের সময় কিছুই দেখিল না। মোক্ষদা সকল বুঝিয়া লইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় চিন্তামণি শুষ্কমুখে নীলুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। নীলু আহারান্তে ঘুনসী পাকাইতেছিল। চিন্তামণিকে শুষ্কমুখে আসিতে দেখিয়া বলিল, "এখনো আপনার স্নান খাওয়া হয় নি?"

চিন্তামণি বলিল, "কৈ আর হল।"

নীলু বলিল, "কেন?"

চিন্তামণি বলিল, "ভাইরা আজ পৃথক হ'লেন, তাই—"

নীলু তাড়াতাড়ি পুকুর ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিল এবং চিন্তামণিকে স্নান করাইল। তারপর তাহাকে গুড় ও জল দিয়া, ভাতে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না হইয়া গেলে কাছে বসিয়া চিন্তামণিকে খাওয়াইল। কলিকাতা হইতে আসা অবধি চিন্তামণি এই প্রথম নীলুর কাছে খাইল। আহারান্তে সে বলিল, "নীলু, তোমার যত্নে আমি ভাল থাকি। আমাকে এথেকে

আর বঞ্চিত ক'রোনা।" নীলু কিছু বলিল না।

সেই দিন হইতে চিন্তামণি নীলুর বাড়ীতেই অধিকাংশ সময় কাটাইতে লাগিল। তাহার কাছেই থাইত। মোক্ষদাকে আবশ্যক দ্রব্যাদি দিয়া আসিত। সন্ধ্যার পরই চিন্তামণিকে থাওয়াইয়া নীলু বাড়ী পাঠাইয়া দিত। কোনদিন সেথানে ঘুমাইবার ইচ্ছা করিলেও সে মৃদুভর্ৎসনার সহিত তাহা নিবারণ করিত, শিশুর মত চিন্তামণি তাহার বাধ্য হইয়া চলিত।

চিন্তামণি যে সম্পত্তি পাইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ঋণশোধ করিতে গেল। যাহা থাকিল তাহাতে চলা ভার, বড় কষ্টেই দিন চলিতে লাগিল

এদিকে সমাজ তাহার বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিল। সে বেশ্যার হাতে থায় এই অপরাধে তাহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার জামাতা, মিনুকে লইয়া গেল। যাইবার সময় শুনাইয়া গেল, "আর পাঠান হবে না।" মোক্ষদা নীলুর উদ্দেশে অজস্র গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

একদিন নীলু চিন্তামণির হাতে একটি টাকা দিয়া বলিল, "ঘি ময়দা ও সন্দেশ এনে দেন, ঠাকুরের ভোগ দিব।" চিন্তামণি কিছুই বুঝিতে পারিলনা। যন্ত্র চালিতের ন্যায় বাজারে গিয়া নীলুর বরাতমত জিনিষ আনিয়া দিল। টাকাটি নীলু বড় কষ্টেই জমাইয়াছিল।

নীলু লুচি ডাল তরকারি ও সন্দেশ থালায় সাজাইয়া চিন্তামণির সম্মুখে ধরিল। চিন্তামণি মৃদু হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি তোমার ঠাকুরকে দেওয়া।"

নীলু বলিল, "আপনিই আমার ঠাকুর। আপনাকে দেথলেই আমার তীর্থকরার ফল হয়।"

তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া চিন্তামণি বলিল, "নীলু খুব থাওয়ালে, অনেকদিন এমন থাইনি।" নীলুর চোথ ছল ছল করিয়া উঠিল।

আরও একবৎসর কাটিয়া গেল। চিন্তামণির অবশিষ্ট সম্পত্তিরও কিয়দংশ বিক্রীত হইয়া গেল। তাহার দিন পূর্ব্ববৎ কাটিত লাগিল। সে কাহারও সঙ্গে আলাপ করে না। মোক্ষদার সঙ্গে তাহার মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে মোক্ষদা তাহার সঙ্গে কথা কয় না।

একদিন সকাল বেলায় চিন্তামণি নীলুর বাড়ী গিয়া দেখে তাহার ঘরের দুয়ার খুলে নাই। অনেক ডাকার পর নীলু দুয়ার খুলিল, আবার টলিতে টলিতে বিছানায় শুইয়া পড়িল। চিন্তামণি তাহা কপালে হাত দিয়া দেথে, খুব জ্বর। তথনি তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিতে গেল। পথে ভাবিল, হাতে পয়সা নাই ডাক্তার আসিলে কি দিব? অনেক চেষ্টা করিয়া গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের নিকট হইতে একশিশি ঔষধ তৈয়ার করাইয়া আনিল।

নীলু ঔষধের শিশিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সে বলিল, "আমাকে ওষুধ দেবেন না। আমি কিছুতেই ওষুধ থাবনা। কয় বছর ধরে কেবল জ্বরকে ডাক্‌ছি, এতদিনে জ্বর এল। শেষকালে যেন আপনার পায়ের ধূলো পাই।" এই বলিয়া সে চিন্তামণির পায়ের ধূলা লইল।

বৈকালে চিন্তামণি হাতে পায়ে ধরিয়া ডাক্তারকে আনিল। ডাক্তার রোগিণীকে দেখিয়া মুথ ফিরাইলেন। চিন্তামণি শঙ্কিত হইল।

নীলু কিছুতেই ঔষধ থাইল না। চিন্তামণি তাহার শিয়রে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পর হইতে নীলুর সংজ্ঞালোপ হইল। চিন্তামণি তাহার শিয়রে বসিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিল। মধ্যরাত্রে একবার নীলু চোথ মেলিল, চিন্তামণির মুথের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি থেয়েছেন?" চিন্তামণি উত্তর দিলনা।

নীলু হায় হায় করিয়া, আবার অজ্ঞান হইল। তিনদিন তিনরাত্রি একরূপ অনাহারে অনিদ্রায় চিন্তামণি রোগিণীর শুশ্রূষা করিল; কিন্তু বাঁচাইতে পারিল না। চতুর্থ দিনে নীলুর সকল জ্বালা জুড়াইল।

কোন ভদ্রলোক না পাওয়াতে চিন্তামণি দুই তিন জন নীচ শ্রেণীর লোক সঙ্গে লইয়া নীলুর সৎকার করিয়া আসিল।

পর দিন নীলুর ঘরের যৎসামান্য তৈজসপত্র নিজের

বাড়ী লইয়া গেল। মাটীর কলসীটি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গেল না। নীলুর বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। ভাদ্রের মেঘাচ্ছন্ন সায়াহ্নে বাড়ী যেন হা হা করিতে লাগিল।

গ্রামের লোক চিন্তামণিকে দেখিয়া বলিল, "লোকটা পাগল হ'য়ে গিয়েছে। বেশ্যার ব্যবহার করা জিনিস পত্র বাড়ী নিয়ে গেল।"

নীলুর মৃত্যুর পর মোক্ষদা ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া সওয়া পাঁচ আনায় হরিলুট দিল।

নীলুর জিনিসপত্র স্বামী বাড়ী আনিতেছে দেখিয়া সে বলিল, "আমার লক্ষ্মীর ঘরে ওসব অলক্ষুণে জিনিস এনো না তোমার পায়ে পড়ি।" অনেক দিনের পর স্ত্রী তাহাকে এই প্রীতিসম্ভাষণ করিল।

চিন্তামণি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার বাড়ীটা পবিত্র করতে হবে, তাই এসব আনছি।" মোক্ষদা ভাবিল স্বামীর মাথা খারাপ হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

হারা

(গল্প)

দ্বিতলের দরদালানের একটা ধারে বেশ খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। লক্ষ্মী তাহার ভিজা চুলগুলি সেই রৌদ্রে ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ছিল। তাহার আশে পাশে তিনচারিটী ছেলে মেয়ে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে কেহ আসিয়া লক্ষ্মীর কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লজ্জা-মাখা অর্দ্ধস্ফুট হাসিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেহ তাহার একগোছা চুল ধরিয়া বিনাইয়া দিতেছিল, লক্ষ্মী আদর করিয়া তাহাকে কোলের উপর টানিয়া নিয়া ঘুম-পাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

লক্ষ্মীর বয়স বছর পনের ষোল হইবে। তাহার সেই শ্যামবর্ণ দেহখানির উপর যৌবনের জোয়ার আসিয়া ইহারই ভিতর কখন অকস্মাৎ ভাটার টানে শুষ্ক হইয়া গেছে তাহা বুঝিবার যো ছিল না। বর্ষণ-হীন শরতের প্রখর রৌদ্রে বর্ষার শ্যামল শ্রী যেন অকালেই শুকাইয়া উঠিয়াছে।

"ওমা! এরা বুঝি এম্‌নি করে' সেই থেকে তোমায় জ্বালাতন করচে! একটুও ঘুমুতে দেয়নি ত?"—বলিতে বলিতে হেমাঙ্গিনী লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

লক্ষ্মী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার ঘুম পায় নি তো দিদি!"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, "তা, এই হট্টগোলের ভিতর কি মানুষের ঘুম পায়? তুমি এদের কিছু বল্‌তে পারো নি? বাবা! সব যেন ধিঙ্গী হ'য়েচে!"

ছেলে মেয়েগুলি ততক্ষণে কিন্তু একেবারে শান্ত ও নির্ব্বাক হইয়া যে-যাহার জায়গাটীতে চুপ্‌টী করিয়া বসিয়াছিল। তিন বছরের ছোট ছেলেটী একেবারে আসিয়া লক্ষ্মীর কোলের ভিতর লুকাইয়াছিল।

হেমাঙ্গিনী হাতের পাখাখানি উল্টা করিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই পাজীরা! যা সব এখান থেকে। যে-যার ঐ ঘরে গিয়ে চুপ্‌টী করে শোও গে, নইলে এম্‌নি মারবো"—বলিয়া লক্ষ্মীর ক্রোড়স্থিত ছোট ছেলেটীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আর, তুমি তো দিব্যি এসে মাসীমার কোলের ভেতর ঢুকেচ গো!—যা' বল্‌চি—"

খোকা মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া বলিল, "আমি মাসীমার কোলে ঘুমুব মা!"—লক্ষ্মী তাহাকে আদর করিয়া আরও কোলের ভিতর চাপিয়া লইয়া বলিল, "আহা, থাক্ না দিদি!"

মায়ের নিকট ধমক খাইয়া অপর ছেলেমেয়েগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘরে চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী স্নিগ্ধস্বরে লক্ষ্মীকে বলিলেন, "তাহলে কি বল ভাই? আমার এখানে থাক্‌তে তোমার কোন কষ্ট হবে না ত? তুমি আমায় পর ভেবোনা। আমার ছোট বোন নেই, তুমি আমার ছোট বোন্। তোমার যখন যা-কিছু কষ্ট হবে, আমায় বলো। পর ভেবে যেন মুখ বুঁজে থেকো না।"

লক্ষ্মী একান্ত নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ক্রোড়স্থ খোকার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। হেমাঙ্গিনী গভীর সহানুভূতির স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর, এ তো শুধু আজ তোমার বলেই নয় ভাই। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবার এ দুর্দ্দশা চিরকালের। তার জন্যে মিছে মন খারাপ ক'রোনা। বল, আমায় সব কথা বল্‌বে ত?"

লক্ষ্মী শুধু মূকের মত ঘাড় নাড়িল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি পড়্‌তে জানো, আমার ঘরে রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে, আরও সব ভাল-ভাল বই আমি তোমার জন্যে আনিয়ে দেবো। যখন কোন কায না থাকে, সেই সব বই প'ড়ো। এখানে নিজের বাড়ী মনে ক'রেই থেকো। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন কষ্ট হ'তে দেবো না।"

লক্ষ্মীর দুটী চোখ কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভারী হইয়া আসিয়াছিল। মুখ তুলিয়া শুধু কাতরভাবে বলিল, "ও কথা বলোনা দিদি!"

২

হেমাঙ্গিনীর স্বামী কিশোরবাবু বেশ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। কলিকাতায় লোহার কারবারে তাঁহার যথেষ্ট আয়। ভবানীপুরের এই বাড়ীখানি তাঁহার নিজের উপায়ে প্রস্তুত। তা ছাড়া, প্রতি বৎসর পূজার সময় বিদেশে বেড়াইতে যাওয়া কিশোর বাবুর একটা বাঁধা নিয়মের মধ্যে ছিল বলিয়া, গিরিডির নিকট জগদীশপুরে একখানি বাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি বৎসরই প্রায় আশ্বিনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তিন চারিমাস সেখানে কাটাইয়া হেমাঙ্গিনী শীতের সময় ছেলেমেয়ে লইয়া আবার ভবানীপুরের বাটীতে ফিরিতেন।

এ বৎসরেও ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইতে প্রবাস-যাত্রার আয়োজন পড়িয়া গেল। কিশোর বাবু স্ত্রীকে বলিলেন, "লক্ষ্মীর ব্যবস্থা তাহ'লে কি কর্‌বে? ওকেও তো সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তা যাব বৈকি! নইলে এখানে ওকে কা'র কাছে রেখে যাবো? আর, এই দুটো মাসেই যা হয়েচে, তাতে ওকে আর কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে আমার মন টিক্‌বে না।" পরে একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "আহা, মেয়েটী যেন সত্যিই লক্ষ্মী! বিধাতা এই বয়সে কেন যে অমন করে ওকে অলক্ষ্মীর বেশে সাজালেন, তা তিনিই জানেন। এখনো একবছর হয় নি স্বামী হারিয়েচে, সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর ঘরের ভাতও উঠেচে। এক ছিল মা, তাকেও আবাগী সেদিন খেয়েচে। পাড়াগাঁ, একা ঐ চেটো মেয়ে,—মা তাই নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। আমার দেখে বড্ড মায়া হল, তাই ত সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।"

কিশোরবাবু নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, কাল একখানা বইয়ে পড়্‌ছিলুম—বিধবার বিয়ে দেওয়া। হাাঁগা, তাতেই কি কিছু ভাল হয়?"

কিশোরবাবু একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া নিয়া বলিলেন, "সেকি সহজে কিছু ঠিক করে বলা যায়? কারু মত, বিধবার বিয়ে দেওয়া উচিত, যখন এক হিন্দু ছাড়া অপর সকল সমাজেই তার চলন রয়েচে। আবার কারু মতে হিন্দুর এই বিশিষ্টতা নষ্ট হ'তে দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। তবে একথা ঠিক, যে কচি মেয়েটাকে আজীবন ব্রহ্মচার্য্য পালন করেই কাটাতে হবে, তাকে এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে শিক্ষা দেওয়াটাই সব চেয়ে শক্ত জিনিষ।"

হেমাঙ্গিনী চিন্তিত মুখে বসিয়া ছিলেন। বাহির হইতে কপাটের শিকল নড়িয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "যাই রে—"

কিশোরবাবু বলিলেন, "লক্ষ্মী বুঝি! না, তোমরা এই ঘরেই থাক, আমার নীচে একটু কায আছে।" বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মী একখানি মোটা বই হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কৈ, রামায়ণ শুন্‌বে না দিদি ?

"এই যে, শুনব। একটা কথা, আমরা তো ও মাসের প্রথমেই বেড়াতে যাচ্ছি লক্ষ্মী—"

লক্ষ্মী হঠাৎ তাহার মলিন মুখখানি তুলিয়া বলিল, "কোথায়—কোথায় যাবে? আমি কার কাছে থাকব?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "জগদীশপুরে যাবো। জগদীশপুর জানিস্ নে, বেশ যায়গা। তুইও আমার সঙ্গে যাবি, কেমন?" বলিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন, লক্ষ্মীর সারা মুখখানি অকস্মাৎ যেন নিতান্তই পাণ্ডুর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দুটী চোখ হেমাঙ্গিনীর মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ, কিন্তু সে শূন্যদৃষ্টিতে কোন অর্থ ছিল না। সে তেম্‌নি ভাবেই বলিল, "কোথায় যাবে, জগদীশপুর? সেই যেখানে লোকে হাওয়া খেতে যায়, হ্যাঁ দিদি সেইখানে?"

"হ্যাঁ, তুই যাবি ত?"

এবার লক্ষ্মী মুখ নামাইল। হঠাৎ তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত যেন একটা প্রবল বিদ্যুৎ-শিখায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বুকের স্পন্দন খুব বেশী বাড়িয়া গেল। তাহার প্রত্যেকটীর সঙ্গে সঙ্গে মাথার রক্ত পর্য্যন্ত কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিতে লাগিল। একটা আকস্মিক আগ্রহে সে মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "হাঁ দিদি যাবো; তুমি আমায় নিয়ে যাবে তো?"

হেমাঙ্গিনী গভীর আদরে তাহার কপালের উড়ো চুলগুলি সরাইয়া দিতে-দিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোকে নিয়ে যাবো বৈ কি বোন্! এখন তিন মাস আমরা সেইখানে থাক্‌ব, তারপর আবার এখানে ফিরে আস্‌ব, কেমন?"

লক্ষ্মী যেন অনেক কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া শুষ্কের মত রহিল। হেমাঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কৈ, এবার রামায়ণ পড় শুনি।"

সুপ্তোত্থিতার মত লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বইখানি তুলিয়া লইল। কিন্তু কোন স্থানটা সে পড়িতেছিল, তাহা সমস্ত বইখানা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়াও ঠিক করিতে পারিল না। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "কি হ'ল, পাতা খুঁজে পাচ্চিস্ নি? আমায় দে। কোন্ পর্ব্বটা পড়ছিলি বল্ ত?"

লক্ষ্মীর মনের ভিতর যে কি এক তুফান বহিতে সুরু করিয়াছিল, তাহারই উদ্দাম দাপটে সে কোন ক্রমেই নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "তা তো জানিনে দিদি!"

হেমাঙ্গিনী হাসিতে গিয়া হঠাৎ তাহার এই অস্বাভাবিক গলার স্বরে চমকিয়া উঠিলেন। সন্দিগ্ধ হইয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওকি, তুই কাঁদচিস্ নাকি লক্ষ্মী?"

সত্য সত্যই লক্ষ্মীর চোখের জল তখন তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

৩

দিন পনেরো পরে কিশোরবাবু ইহাদের লইয়া একদিন কলিকাতা হইতে রওনা হইলেন। জগদীশপুর পৌছিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারের ভিতর লক্ষ্মী এই নূতন জায়গাটা বড় একটা কিছুই দেখিতে পাইল না; তবু যেন কিসের একটা অপরিস্ফুট উন্মাদনায় সে একান্ত তৃষিত নেত্র এই স্থানটার পথের দুই পাশে তাকাইতে তাকাইতে যাইতেছিল। যেন সেই বিরাট জমাট অন্ধকারের ভিতর হইতে সে কোন্ এক মহামূল্য রত্নের সন্ধানে অন্ধের মত ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে। হেমাঙ্গিনী তাহার এই আগ্রহ দেখিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "আজ রাত্রি হ'য়ে গেছে, আজ তো আর কিছু দেখ্‌তে পাবিনা। কাল সকালে সব দেখাব,' কেমন?"

লক্ষ্মী যেন নিতান্ত অপরাধীটির মত মাথা নামাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রি কোন রকমে একটা স্বপ্ন-জড়িত নিদ্রা ঘোরের ভিতর কাটাইয়া, ভোর হইতে না হইতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া মুখ হাত ধুইয়া সে একা বরাবর দ্বিতলের ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সমস্ত নগরীটি যেন একখানি ছবির মত দেখাইতেছে। দূরে, কি একটা পাহাড় ধূসর মেঘের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বাকাশের তোরণ হইতে দুই একটা বক্র-রেখা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, শারদপ্রাতের এই সৌম্য শ্রী লক্ষ্মীর মনের কোণে বোধ করি কোন অনুভূতিই জাগাইতে পারিতেছিল না। সে শুধু একান্তভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট বড় বাড়ীগুলির পানে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এই দেখার ভিতর উন্মাদনা কি ছিল কে জানে; কিন্তু কিসের যেন এক দুর্দ্দাম আর্কষণ তাহার চোখ দুইটিকে অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতেছিল। বারম্বার এদিক ওদিক তাকাইতে এই একটা কথাই সে কেবলি আপনার মনে বলিতে লাগিল, "এই জগদীশপুর—জগদীশ-পুর। এই সেই—"

সেদিন বিকালে হেমাঙ্গিনী লক্ষ্মী ও ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পুরানো চাকর বেহারী তাঁহার ছোট ছেলেটীকে কাঁধে লইয়া আগে আগে চলিয়াছিল। হেমাঙ্গিনী লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া গল্প করিতে করিতে আসিতেছিলেন। লক্ষ্মী বড় একটা কথার জবাব দিতেছিল না; ত্রস্তা হরিণীর মত সে শুধু পথের দুই পাশে তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চল দৃষ্টি ফিরাইতে ফিরাইতে কি যেন একটা আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়াই পথ চলিতেছিল। কেবল যখনই পথের দুইপাশে এক একখানি করিয়া বাড়ীগুলি চোখে পড়িতেছিল, অমনি সে নিতান্ত আগ্রহের সহিত হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "হ্যাঁ দিদি এ বাড়ীখানার কি নাম?"

হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ফটকের নিকট সরিয়া আসিয়া বলিতেছিলেন, "ঐ দ্যাখ্ লেখা রয়েচে।" লক্ষ্মী ফটকের ধারের ফলকের উপর লেখা নামগুলি পড়িতেছিল। এম্‌নি কত নূতন-নূতন কত বিচিত্র-মধুর নাম সে পড়িল; পড়িয়া পড়িয়া কি-জানি-কেন প্রতিবারেই একটা চাপা নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, "এ সব দেশের বাড়ীর নামগুলি বেশ, না? তোর ভারি ভাল লাগছে বুঝি?"

হঠাৎ লক্ষ্মীর মুখের ভাবটা কেমন হইয়া গেল। কোনক্রমে সে শুধু বলিল,—"হ্যাঁ।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "তাই লাগে বটে। আমিও যেবার প্রথম আসি, তখন রোজ বেড়াতে গিয়ে অম্‌নি করে বাড়ীর নাম মুখস্থ করতুম। তারপর এখন বছর বছর কত যে নতুন বাড়ী হচ্ছে, তর ঠিক নেই।"

পশ্চিমের একটা ঘন বনের মাথার উপর সোণালি মাখাইয়া দিয়া গরিমাময় সূর্য্যাস্ত হইতেছিল। পথের ধার দিয়া আরও কতকগুলি নরনারী গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল। সকলেরই মুখে একটা স্বচ্ছ নিশ্চিন্ততা ফুটিয়া রহিয়াছে, সকলেরই চোখে একটা উজ্জ্বল প্রাণময় দৃষ্টি। কিন্তু, লক্ষ্মীর মুখে ইহার কিছুই ছিল না। প্রকৃতির এই শ্যামল শারদশ্রী, শান্তির লীলাভূমি এই বিচিত্র নগরী কিছুই যেন তাহার এই প্রাণহীণ পাষাণ আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছিল না; শুধু মাঝে মাঝে যখন সে কোন একখানি বাড়ীর নাম জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তখন তাহার মুখে চোখে যে ভাব জাগিতেছিল, একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইত তাহা যেন এ বস্তুর জগতের নয়,—কোন্ স্বপ্নরাজ্যের একটা বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ মাত্র। হেমাঙ্গিনী অবশ্য অতটা না বুঝিলেও তাঁহার মনে কেমন সন্দেহ হইতেছিল; তাই তিনি হঠাৎ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ জায়গা বেশ ভাল লাগ্‌চে তো?"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া বলিল, "হ্যা। কেন দিদি ?"

"না, তাই বল্‌চি"—বলিয়া হেমাঙ্গিনী নিশ্চিন্ত মনে পথ চলিতে লাগিলেন।

একটা মাঠের উপর দিয়া তাঁহারা বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন। প্রকাণ্ড মাঠের স্থানে স্থানে খুব উঁচু নীচু। খানকয়েক ছোট বড় বাড়ীও ইহার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। লক্ষ্মী যতদুর পারিল, এগুলিরও নাম সংগ্রহ করিতে লাগিল।

একখানি ছোট বাড়ীর ফটকের একধারে একটা বড় শিউলি গাছে রাশি রাশি ফুলের কুঁড়ি যেন ফুটিবার আনন্দে মৃদুল সান্ধ্য বায়ুতে দুলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছে। বাড়ীখানি খালি পড়িয়া আছে। ফটকে চাবি নাই, সম্মুখস্থ ঘরের দরজার কপাটও খোলা রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে দুই একটা ফুলের গাছ, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী আগাছাও সেখানে নিশ্চিন্ত মনে বাড়িয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মী হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "এ কোন্ বাড়ী দিদি ?"

হেমাঙ্গিনী প্রস্তর ফলকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "সান্ধ্য-কুটীর। ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়চে। আহা! গেল বছরে এইখানেই একটী যোয়ান ছেলে কালা-জ্বরে মারা গিয়েছিল। এ বছর বাড়ীখানা এখনো ভাড়া হয় নি। মালীর ভরসায় বাড়ী, ঘরের দরজায় চাবিটা পর্য্যন্ত পড়ে নি।"

সেই সময় হঠাৎ তাঁর সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ও টুনু! এক্ষুনি পড়ে যাবি। ও বেহারী! দেখ বাছা, ছোঁড়া এখুনি পড়ে মর্‌বে।"

ছয় বৎসরের ছেলে টুনু তখন একটা খুব বড় ভাঙ্গনের ধারে আসিয়া একলাফে সেটা পার হওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপক্রম করিতেছিল। হেমাঙ্গিনীর ত্রস্তস্বরে বেহারী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অবাধ্য দুষ্ট ছেলেকে কতকগুলা বকিয়া-ঝকিয়া হেমাঙ্গিনী লক্ষ্মীর পানে চোখ ফিরাইয়াই হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর সারা মুখখানা মৃতের মত ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। একবিন্দু রক্তের চিহ্নও বুঝি তখন তাহার মুখে খুঁজিয়া পাইবার যো ছিল না। সে সেই সান্ধ্য-কুটীরের ফটকের সাম্‌নে একান্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কি, ওদিকে কি দেখ্‌চিস্ লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী তার দুই চোখ ধীরে ধীরে হেমাঙ্গিনীর মুখের উপর রাখিল, তারপর হঠাৎ এক ঝলক রক্ত তার সেই ফ্যাকাশে মুখখানা রাঙাইয়া দিয়া গেল। সে অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, "না না দিদি, কিচ্ছু না, কিচ্ছু তো দেখিনি। কৈ, চল, বাড়ী যাবে না ?"

"হ্যাঁ, চল্। ঐ যে আমাদের বাড়ী। কিন্তু তুই—"

হেমাঙ্গিনী তাঁর মনের সন্দেহ সবটুকু ব্যক্ত করিবার সময় পাইলেন না। লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া এমন একটা কম্পন বহিয়া যাইতেছিল যে, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই খুব বেশী লক্ষ্য করিয়া, দুই বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে হইল।

৯

ভোরের আলো তখন সবেমাত্র সোণার কাঠির স্পর্শে ধরণীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। দুই একটা পাখী সবেমাত্র নীড়ের বাহিরে আসিয়া ডানা-ঝাড়া দিতে-দিতে প্রাণ খুলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছিল।

সেই আলোক আঁধারে মেশা প্রত্যূষে কিশোর বাবুর বাটীর ফটক খুলিয়া লক্ষ্মী অতি সন্তর্পণে চোরের মত বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরণে সাদা ধবধবে ধুতি, মাথার এলোমেলো চুলের কয়েক গুচ্ছ আসিয়া তাহার ললাট ও গণ্ড ঢাকিয়া দিয়াছে।

সেই উঁচু নীচু মাঠের উপর দিয়া লক্ষ্মী ক্ষিপ্রগতিতে আগাইয়া চলিল। মাঝে মাঝে ছোট বড় পাথরে পা লাগিয়া তাহার হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবার মত

হইতে লাগিল। একটা স্থানে একটা ঘন শেওড়া ও ভ্যারাণ্ডার ঝোপে লাগিয়া তাহার বিত্রস্ত বস্ত্রাঞ্চলের খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লক্ষ্মী আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহার কেবল ঐ একটা ভয়ই হইতেছিল, পাছে কোন রকমে সে হেমাঙ্গিনীর নজরে পড়িয়া যায়।

সান্ধ্য-কুটীরের জনহীন প্রাঙ্গণের বুকের উপর প্রভাতের চঞ্চল বাতাসে শিশির-ভেজা শিউলি ফুলগুলি দলে দলে ঝরিয়া পড়িতেছিল। লক্ষ্মী ত্রস্ত চরণে আসিয়া ঠিক সেই গাছের তলায় থমকিয়া দাঁড়াইতেই মিষ্টগন্ধে তাহার নাসারন্ধ্র ভরিয়া গেল। লক্ষ্মী একবার সেইখানে দাঁড়াইয়া বাড়ীখানার এদিক-ওদিক দেখিয়া লইয়া, পরে আবার তেমনি ক্ষিপ্রতার সহিত সামনের দাওয়ায় উঠিয়া খোলা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরের ভিতর কোথাও কিছু নাই। কিন্তু তবু যেন লক্ষ্মী নিতান্ত কাঙালের মত ঘরের এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত কি-এক অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর সন্ধানে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা স্থানে কি-একটা কাগজ পড়িয়াছিল, লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়াইয়া নিয়া জানালার ধারে আলোয় আসিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কি লেখা ছিল, তাহার একবর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার একটা নূতন কিছুর সন্ধানে নিযুক্ত হইল।

পাশের ঘরখানায় একখানা বহুদিনের পুরাণো ভাঙ্গা তক্তা পাতা; তাহার নীচে একটা মাটির গামলা পড়িয়া আছে। লক্ষ্মী সেখানে আসিয়া কি ভাবিয়া স্তব্ধের মত দাঁড়াইল। তাহার চোখে পলকও বোধ করি পড়িতেছিল না। বুকের ভিতর যেন একটা গুমোট করিয়া তাহার নিজের নিশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে সেই খালি তক্তপোষখানার উপর বসিয়া পড়িল।

ও-দিকের একটা জানালা দিয়া খানিকটা ভোরের আলো সামনের দেওয়ালে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই নির্জ্জনতার মাঝখানে সমাধি গৃহের মত সেই জনহীন ঘরের ভিতর একা লক্ষ্মী। মাঝে মাঝে বাতাসের দুই একটা হিল্লোল তার কাণের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। লক্ষ্মী তাহাতেই চমকিয়া উঠিয়া ভাবিতেছিল, কে যেন তাহার কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিয়া গেল। হঠাৎ সেই আলোকিত দেওয়ালের গায়ে ও কি লেখা রহিয়াছে?

লক্ষ্মী কাছে আসিয়া লেখাটার উপর একবার মাত্র চক্ষু বুলাইয়াই, পাথরের মত হিম হইয়া গেল। দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে পেন্সিলে করিয়া একটি নাম লেখা,— শ্রীসুশীলকুমার দে। তখন লক্ষ্মীর বুকের স্পন্দন পর্য্যন্ত বোধ করি থামিয়া গিয়াছিল। এই নাম,— এই নাম যে লক্ষ্মীর দেহের প্রতি অণুতে-অণুতে বীজমন্ত্রের মত লেখা! আর ঐ অক্ষরগুলি, তাহার কাছে কতদিনের, কত যুগের, কত জন্মের পরিচিত! সে তার নিজের হস্তাক্ষর, এমন কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে,—কিন্তু, ঐ হস্তলিপির প্রতি রেখায়-রেখায় কি অগ্নিশিখা নিহিত নিহিত ছিল যে তাহার হৃদয়ের মাঝে বজ্রের মত অমরচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে!

একবার, দুইবার করিয়া কত-কতবার লক্ষ্মী সেই নামটী পড়িল। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশ হইতে যেন কি-একটা চঞ্চল প্রতিধ্বনি সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। বার কয়েক এইরূপ হওয়ায় লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, যেন কোন্ অশরীরী আত্মা সেই নির্জ্জন ঘরের ভিতর হইতেই কখন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া চাপাহাসি হাসিতেছে। লক্ষ্মী হঠাৎ অসহ্য বেদনায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল;— "ওগো, কৈ, কৈ? এই তো আমারি জন্যে এমন করে' তোমার নামটী লিখে রেখে গেছ, তবে কেন আসবে না, একটীবার তুমি কেন আসবে না?"

হঠাৎ তাহার নিজেরই এই কণ্ঠস্বর থামিয়া পড়িতে যেন লক্ষ্মীর মনে হইল,—কে তাহার কথার উত্তরে চাপা গলায় কি বলিল, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। আবার

সে সেই নামটার পানে চাহিতে গেল, কিন্তু, পারিল না। সে মুখ ফিরাইয়া নিয়া যেদিকে চাহিল, যেন সেই দিকেই দেখিল, একখানি শুষ্ক শীর্ণ অস্থিসার মুখের উপর মৃত্যুর করাল কাতরতা! আর সে দাঁড়াইতে পাড়িল না। চেতনা হারাইয়া সেই মাটীর মেঝের উপরই পড়িয়া গেল।

৫

দু'দিন ধরিয়া কিশোরবাবুর গৃহে একটা গাঢ় বিষাদ-কালিমা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মীর অবস্থা দেখিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখখানি সদাই মলিন, চিন্তাচ্ছন্ন। কিশোরবাবু গিরিডি হইতে ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন। তিনি এ দুইদিনের কোনরকমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলেন না। সকল কথা শুনিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া তিনি বলিয়াছেন, "বোধ হয় জ্ঞান আর ফিরবে না। যদিও ফেরে, তাতেও কোন সুফল হবার আশা নেই।"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর দুইচোখ ছাপাইয়া জল নামিল।

তৃতীয় দিন প্রাতে কিন্তু লক্ষ্মীর জ্ঞানসঞ্চারের লক্ষণ দেখা গেল। তাহারে রক্তহীন শীর্ণাধরে এক-ঝিনুক দুধ ঢালিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন, —"লক্ষ্মী, দিদি! একবার চোখ চেয়ে দেখ্।"

লক্ষ্মী চোখ মেলিল। বারকয়েক ঘরের এদিকে-ওদিকে কাহাকে যেন খুঁজিয়া শেষে হেমাঙ্গিনীর মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "ওঃ, দিদি!"

হেমাঙ্গিনী তাহাকে আরও খানিকটা দুধ দিয়া সজলচোখে বলিলেন, "লক্ষ্মী! কেন তুই একথা আগে আমায় বলিস্‌নি দিদি? তাহলে কি তোকে আমি জগদীশপুরে নিয়ে আস্‌তুম?"

স্বপ্নোত্থিতার মত লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "নিয়ে আস্‌তে না? কেন দিদি? এখানে না এলে যে"— বলিয়া সে-কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া বলিল, "আজ আমার কত সুখের দিন, না দিদি?"

হেমাঙ্গিনী চোখের জল মুছিলেন। লক্ষ্মী তেম্‌নি অস্ফুটস্বরে বলিল, "সান্ধ্য-কুটীর! বেশ নাম! হ্যাঁ দিদি, এখান থেকে সে বাড়ী দেখা যায় না?"

হেমাঙ্গিনী উঠিয়া পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বোন, ঐ সেই শিউলি গাছ!"

শরতের ঠাণ্ডা বাতাস লক্ষ্মীর মুখে-চোখে তার কোমল-স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ ঐ যে! আহা! ঐখানে—জানো দিদি,—ঐখানে তারা তাকে জোর করে নিয়ে এসেছিল। বল্লে, হাওয়া খেতে যাচ্ছে, ভাল হয়ে ফিরে আস্‌বে। কিন্তু, আর তো সে ফিরলো না। আমি সেখানে রোজ-রোজ কত ঠাকুদের পুজো মেনেচি, কত ডেকেচি, কিন্তু, কেউ আমার কথা শোনেনি! সকলে আমায় ফাঁকি দেবার জন্যে ফন্দি বেঁধেছিল।"

হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। লক্ষ্মী বলিল, "এখান থেকে ক'খানা আমায় চিঠি লিখেছিল। তাতে নিজের কথা সে কিছুই লিখ্‌তো না। জান্‌তো, দুদিন বাদে ফাঁকি দিয়ে চলে' যাবে, সে কথা আর কি লিখ্‌বে? কিন্তু ফাঁকি দিয়ে কতদিন থাক্‌বে? এবার তো আর ঠেল্‌তে পারবেনা! হ্যাঁ দিদি, বল তো, এবার সে কি করে ঠেল্‌বে?"

হেমাঙ্গিনীর মুখে কোন কথাই সরিল না। লক্ষ্মীর মুখের সেই বিদ্যুতের মত হাসিটুকু হঠাৎ দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "কথা কচ্চনা কেন দিদি? তুমি বল, একটীবার বল, এত কষ্ট সহ্য ক'রেও আমি তার কাছে যেতে পারব না?"

হেমাঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বারম্বার মুমূর্ষুর ললাট চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ দিদি হ্যাঁ, পারবি, পারবি বৈকি! তোর স্বামী যে তোকে সেই জন্যেই স্বর্গ থেকে এম্‌নি করে ডেকে নিয়েছে!"

এই পরম আশ্বাসবাক্যে লক্ষ্মীর দুই কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিল। তাহারই আবেশে সে বিভোর হইয়া গেল।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

শারদলক্ষ্মী

(ঋতুমঙ্গল)

[রচনা—শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর]

তব চরণ পরশে প্রাঙ্গণে জাগে স্বর্ণের আলিপনা ;
আলো করে দীপ তুলসীকুঞ্জ, কূজন ব্যাকুল কপোতপুঞ্জ,
শঙ্খ স্বননে ভবন অঙ্কে প্রাণে প্রাণে মূরছনা।
এস মা সারদা শারদলক্ষ্মী করি বরাভয় দান—
বিতরিয়া সুধা হরি' তৃষা ক্ষুধা তুষিয়া তাপিত প্রাণ ॥
তুমি নীলাকাশে নীল নয়ন মেলিলে আলোকে ভূলোক ভায় ;
শিথিল করিলে মুকুলিত মুঠি, কনক কমল উঠিল যে ফুটি',
তব কণ্ঠ কাঁপিলে তেয়াগি কুণ্ঠা লাখ লাখ পাখী গায়।
এস মা সারদা..............তুষিয়া তাপিত প্রাণ ॥
তব আঁচল লুটিলে হিরণ কিরণে নীহারে মাণিক জ্বলে ;
টুটিলে চিকণ চিকুরবন্ধ, দিকে দিকে ছুটে শ্যামলানন্দ,
কঙ্কনক্কনে কূলে কূলে লুটি কলকল নদী চলে।
তব হাস্যে প্রবাল মৌক্তিক ক্ষরে মরকত ঝরণায় ;
বুলাইলে পাণি তনু অনামর, কান্তি পুষ্টি লভে উপচয়,
আশীষ বরষে শালির শুভ্র নামিছে চুম্বি' পায়।
এস মা সারদা..............তুষিয়া তাপিত প্রাণ ॥

[সুর ও স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ইমন———একতালা।

আস্থায়ী

		০			১			২´			৩		
পক্ষা	পা II {	ধা	ধা	ধা ।	ধা	ধা	ধা I	র্সা	-া	র্সা ।	র্সা	পা	পা
ত০	ব	চ	র	ণ	প	র	শে	প্রা	ঙ্	গ	নে	জা	গে

০ ১ ২´ ৩
। পা -া ধধ । র্গা র্গা র্রা I -র্সা র্সা -া । -া -া -া ।
স্ব র্ ণের আ লি প ০ না ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্গা র্গা র্গা । র্গা র্রা -া I ধা ধা নর্সা । র্সা -া র্সা ।
আ লো ক রে দী প্ তু ল সী০ কু ঞ্ জ

০ ১ ২´ ৩
। না না না । ধা ধা ধা I পা পা জ্ঞপা । গা -া গা ।
কু জ ন ব্যা কু ল ক পো ত০ পু ঞ্ জ

০ ১ ২´ ৩
। সা -া রা । গা গা গা I জ্ঞা জ্ঞা গপা । পা -া পা ।
শ ঙ্ খ স্ব ন নে ভ ব ন০ অ ঙ্ কে

০ ১ ২´ ৩
। জ্ঞা ধা পা । না ধা না I (র্সা -া র্সা । -া পজ্ঞা পা
প্রা ণে প্রা ণে মু র ছ ০ না ০ "ত০ ব"

২ ৩
I র্সা -া র্সা । -া -া া । "এস মা সারদা............তাপিত প্রাণ্" II

অন্তরা

০ ১ ২ ৩
II পা ধা র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা
তু মি নী লা কা শে নী ০ ল ন য় ন

০ ১ ২´ ৩
র্সা র্রা র্রা । র্সা র্গা র্গা I র্রা র্সা র্সা । না -ধা -পা ।
মে লি লে আ লো কে ভূ লো ক ভা ০ য়

০ ১ ২´ ৩
। {পা ধা পা । র্সা র্সা র্সা I পা পা না । ধা পা পা
শি থি ল ক রি লে মু কু লি ত মু ঠি

০ ১ ২ ৩
না না না । ধা ধা ধা I পা পা জ্ঞপা । (গা গা গা)} ।
ক ন ক ক ম ল উ ঠি ল০ যে ফু টি

৩ ০ ১ ২´
। গা গগা পপা । সা -রা গা । গা গা রা I গা পা পা ।
যে ফুটি ত ব ক ন্ ঠ কাঁ পি লে তে য়া গি

৩ ০ ১ ২´
। ক্ষাপা -া পা । ক্ষা ধা পা । না ধা না I র্সা -া -া ।
কু০ ন্ ঠা লা খ লা খ পা খী গা ০ য়

৩
। -া -া া । "এস মা সারদা…………তাপিত প্রাণ্" II
০ ০ ০

সঞ্চারী

০ ১ ২ ৩
সা রা II{ গা গা গা । গা গা গা I গা গা গা । গা গা গা ।
ত ব আঁ চ ল লু টি লে হি র ণ কি র ণে

০ ১ ২´ ৩
। পা পা পা । গা গা গা I রা -সা সা । -া -া -া ।
নী হা রে মা ণি ক জ ০ লে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। সা গা রা । সা সা -ন্া I ধ্া ন্া ধ্া । ন্সা -া সা ।
টু টি লে চি ক ন্ চি কু র ব০ ন্ ধ

০ ১ ২´ ৩
। সা সা সা । সা সা সা I সা সা ন্সরা । রা -া রা ।
দি কে দি কে ছু টে শ্যা ম লা০০ ন ন্ দ

০ ১ ২´ ৩
। সা -া রা । গা গা গা I ক্ষা ক্ষা ক্ষা । পা পা পা ।
ক ং ক ন ক নে কূ লে কু লে লু টি

০ ১ ২´ ৩
। গা পা গা । গা রা গা I (রা -সা সা । -া সা রা) } ।
ক ল ক ল ন দী চ ০ লে ০ 'ত ব'

২´ ৩
I রা -সা সা । -া পা ধা ।
চ ০ লে ০ ত ব

আভোগ

০ ১ ২´ ৩
। {র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা I র্রর্রা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা ।
হা ০ স্যে প্র বা ল মোউ ক্ তি ক ক্ষ রে

০ ১ ২ ৩
। র্সা র্রা র্রা । র্রা র্সা র্রা র্গা -া -া । -া -া ।।
ম র ক ত ঝ র ণা ০ য় ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্পা র্পা র্গা । র্গা র্গা র্গা I র্রা র্গা র্রা । র্রা র্সা -া ।
বু লা ই লে পা নি ত নু অ না ম য়

০ ১ ২´ ৩
। র্সা -া র্সা । ধা -া ধা পা পা পা । গা গা -া ।
কা ন্ তি পু ষ্ টি ল ভে উ প চ য়

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I না ধা না । ধা -া ধা ।
আ শী ষ ব র ষে শা লি র গু ম ব

০ ১ ২´ ৩
। পা পা রা । গা -ধা ক্ষা I (পা -া -া । -া পা ধা) }।
না মি, ছে চু ম্ বি পা ০ য় ০ ‘ত ব’

২´ ৩
I পা -া -া । -া -া ।। ‘এস মা সারদা............তাপিত প্রাণ’ II II
পা ০ য় ০ ০ ০

ধুয়া। (ইহা আস্থায়ীর, অন্তরার এবং আভোগের শেষে গেয়)।

০ ১ ২´ ৩
। {র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সরা I না না না । ধা -া ধা ।
এ স মা সা র দা০ শা র দ ল ক্ষ্মী

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা পা । পা গা গা I র্গা -া -া । -া -া ।।
ক রি ব রা ভ য় দা ০ নে ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্রা গা। র্মা। র্মা র্গা র্গা I র্রা র্গা র্রা। র্রা র্সা র্সা।
বি ত রি য়া সু খ হ রি ত ষা ক্ষু ধা

০ ১ ২´
। না র্রা র্সা। না ধা পধা I (গা - -া। -া - া) } ।
তু ষি য়া তা পি ত০ প্রা ০ ণ্ ০ ০

২´ ৩
I গা -া -া। া পক্ষা পা II
প্রা ০ ণ্ ০ "ভ০ ব"

এ গানটিতে, স্বর্গীয় মহাত্মা ডিঃ এল্ রায় রচিত "সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি"………ইত্যাদি গানের সুরের ছায়ামাত্র অনুসরণ করিয়া, সুর সংযোজন করিয়াছি।—লেখিকা।

মিলনের বাঁশী

বেদনায় ভরা-গরলে এ ধরা
বেষ্টিত শুধু নয়,
চেয়ে দেখ মন, মহা আনন্দ
বিশ্বভুবনময়।
মেদুর করিয়া এরি হিয়াতল
জাগে যৌবন ঢল ঢল ঢল,
পুলক বিভল একি উচ্ছল
কল্লোল ধারা বয়!

তরুণীর মত ধরণীর বুকে
জাগে প্রেম-শিহরণ,
পেয়েছে সে আজ প্রবাসী বঁধুর
সুমধুর পরশন!
ছাপি ছল ছল হৃদয়-গাগরী
রস-নির্ঝর ঝরে ঝর্ঝরি,
লাবণ্য তার পড়িছে ঠিকরি
দিকে দিকে অনুখন।

বুকে বুকে চলে হোলি রস-কেলি,
চখে চখে হানে বাণ;
দুরু দুরু ওই পবনদোলায়
উড়ু উড়ু করে প্রাণ।
সহকার শাখে পড়ে লতা ঢলি,
ফুলদল হেসে উঠে খলখলি,
অসহ লাজের বন্ধন দলি
চলে প্রেম-অভিযান;

মিলনের সুর বাজিছে মধুর
জ্যোছনা-মদির-রাতে,
নব অনুরাগ সোহাগের ডোরে
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথে।
রূপ দিয়ে আজ রাঙিয়ে ভুবন
শোভিছে প্রেমের বিজয়-কেতন,—
এখনো মগন র'বি কিরে মন
নীরস পুঁথির পাতে?

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কাকজ্যোৎস্না

পিতা যে তাহার পাদরী ছিলেন,
ছিলেন নেটিভ খৃষ্টান ;
দেশীয়গণের গির্জ্জায় গুরু,
গির্জ্জাতেই অধিষ্ঠান।
একটি আদুরী কন্যা তাঁহার—
সিলভিয়া তার ডাক নাম,
বাড়ী আমাদের এক পাড়াতেই,
সিলভি বলেই ডাকতাম।
আঙ্গিনার পাশে ফুল বাগানেতে
আনমনে যবে ঘুরতো,
গোলাপ ফেলিয়া মৌমাছি দল
চৌদিকে তার উড়তো।

ফাগুন প্রাতের পাপিয়ার মত
মাতোয়ারা তার প্রাণটি
আমোদিত করে রাখিত নিয়ত
মায় সমাধির স্থানটী।
তাহাদের সাথে কত মেলামেশা
স্মরি ব্যথা আজ পাই রে।
মোরগ ফুলের বনের বেলি যে
বড় প্রিয় ছিল ভাই রে।
সিলভিয়া ছিল কনক পিঁজরে
যেন পোষা পানকৌড়ি,
মুক্তি ফৌজের উদ্ভট গানে
সুমধুর সুর-গৌরী ;

সুসমাচারের কেতাব মাঝারে
গঙ্গার স্তব হিন্দুর,
গির্জ্জার ঘন ধবলিময়া মাঝে
সেই ছিল শুভ সিন্দুর।

ভরা গোলাপের বন দিয়া দোঁহে
ভ্রমিতাম কত সন্ধ্যায়,
হেরিতাম হায় সমাধির গায়
দীপ দিত নিশিগন্ধায়।

সিলভিয়া আজ হয়েছে কিশোরী,
ডেকেছে রূপের বন্যা ;
পাদরী খোঁজেন যোগ্য পাত্র
অর্পিতে নিজ কন্যা।
বিলাত হইতে টেলর এলেন
সরল-যুবক সুন্দর,
সিলভিয়া মেয়ে রূপে গুণে তার
মোহিত করিল অন্তর।
এক গাছে হায় জড়ালো মাধবী
সুখে যাপে দিন নিত্য,
পরীর দেশের প্রবাসী তাহারা
ভাবনা-বিহীন চিত্ত।

তিনটী বরষ সুখেতে কেটেছে,
আর সুখ নাই মনটায়,
বিলাত হইতে ফেরেনা টেলর
দিন যায় উৎকণ্ঠায়।
পত্নী তনয়া লয়ে যাবে তার—
ধর্ম্মে ও ন্যায়ে বাধ্য,
অত ভালবাসা প্রাণের পিয়াসা
ভুলিবে কাহার সাধ্য ?
যত দিন যায়, শত-শঙ্কায়
ভয়ে উঠে তার বুকটী,
শীতের গোলাপ যেন হয়ে যায়
না হেরি কাহার মুখটী।

পিতা গেল মারা, ঘর যে পরের
থাকা চলিবে না আর ত,
বিপুল ধরণী অচেনা সকল
আর কেহ নাই তার ত।
সিলভিয়া হায় শুকাইয়া যায়,
সব আশা তার চূর্ণ,
দুখের পেয়ালা ধীরে ধীরে তার
ছাপালো হইয়া পূর্ণ।
শৈশব সখী অনাথিনী আজ,
সমুখে সাগর দুস্তর,
মোর প্রিয়া তার সংবাদ লয়,
আমি যে কঠিন প্রস্তর।

অনটন তার গোপনে ঘুচায়,
মুছায় নয়ন তার গো,
সেই তুলে নিল মোর বাল্যের
খেলার গলার হার গো।
হঠাৎ কে মোরে ডাকাডাকি করে
আজিকে গভীর রাত্রে,
প্রিয়তমা মোরে উঠাইয়া দিল
মৃদু ঠেলা দিয়া গাত্রে।
চলিনু দুজনে ভৃত্যের সনে,
সিলভি চেয়েছে দেখিতে,
হিম হয়ে গেছে হাত পা তাহার,
লেগেছে এখনি সেঁকিতে।

স্বরা গোলাপের বন দিয়ে মোরা
উঠিলাম তার কক্ষে,
দশ বরষের আগেকার স্মৃতি
ভাসিতে লাগিল চক্ষে।

সিলভি আমার প্রিয়ার কোলেতে
সঁপি দিল শিশুকন্যায়,
দুইটী নয়ন ভাসি গেল তার
অবাধ অশ্রু বন্যায়।
আস্তে বলিল, "জীবনে বড়ই
বেদনা পেলাম মর্ম্মে,
পেলেনাক প্রেম চাতকিনী হায়
অথাই প্রেমের ধর্ম্মে।

"জীবনের পথে করেছিনু বুঝি
কাক জোছনায় যাত্রা,
প্রভাতের আলো কোথায় রহিল,
মিলিল না তার বার্ত্তা।
দিশেহারা হয়ে কণ্টক বনে
ভ্রমিয়া হয়েছি শ্রান্ত।
তুষার আমার হবে যে অনল
হৃদয় কি তাহা জানতো?
কন্যারে আমি তোমাদের করে
সঁপে দিয়ে আজ যাই গো,
ধরমে করমে নামে ফিরে নিয়ো
শ্যামছায়ে দিয়ো ঠাঁই গো।"

প্রভাতকল্প রজনী আজিকে
চারিদিক নিস্তব্ধ,
সমীরে আসিছে হেনার গন্ধ
দূর বাঁশরীর শব্দ,
ঢুলে পড়ে চাঁদ, নিবে আসে আলো,
জোছনায় কাঁপে উইলো,
নিমীলিত প্রায় নয়নে কেবল
ক্রুশটী উজল রইলো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অনঙ্গের প্রতি

আমায় যদি ভৃঙ্গ ক'রে দাও তুমি অনঙ্গ,
তোমার মৃগয়াতে তবে নিই তোমার সঙ্গ।
মঞ্জুঘোষার কুঞ্জবনে
প্রবেশ করি সঙ্গোপনে,
পারিজাতের শাখায় আমি বাজাব সারঙ্গ,
ভৃঙ্গদেহ আমায় দেহ দেবতা অনঙ্গ।

অনঙ্গদেব আমায় যদি কর তোমার সঙ্গী,
নিত্য তোমার দৌত্য কর গিরি সাগর লঙ্ঘি।
মৃগমদের গন্ধ ধরি
বনব্যূহে প্রবেশ করি
ভুলাইয়া আনি যত অবোধ কুরঙ্গী,
দয়া করে' আমায় যদি কর তোমার সঙ্গী।

সঙ্গে যদি লওহে আমায় বনকুসুম কুঞ্জে,
মুকুলগুলি ফুটায়ে দিই ব্যাকুল কলগুঞ্জে,
মধু মাখা তোমার করে
ধনু যদি পিছলে পড়ে,
মেজে দিব আমার তনুর কেতক-পরাগ-পুঞ্জে
সঙ্গে তোমার গুঞ্জরিব বনকুসুম কুঞ্জে।

তোমার শাসন করব ঘোষণ নিখিলে কন্দর্প,
তোমার পায়ে লুটাইবে হিংসা ত্যজি সর্প।
অসি ফেলে দৈত্যদানব
ধরবে বেণু তন্ত্রী পণব,
সিংহ দ্বীপি ভুলবে ক্ষুধা ঘুচাব যমদর্প।
তোমায় আমি করব রাজা নিখিলে কন্দর্প।

গরবিনীর কর্ণ অলক কবরীতে ন্যস্ত,
কুসুমদামে রব আমি গুঞ্জরিতে ব্যস্ত,
ত্রস্ত হয়ে নাড়বে পাণি
স্রস্ত হবে নিচোল খানি
সেই সুযোগে ছুঁড়বে শায়ক তোমার অমোঘ হস্ত,
গর্ব-স্ফীত বুকটি তাহার করিবে বিধ্বস্ত।

তোমার শিকার লুকায় কোথায় বার্ত্তা তাহার আন্‌তে,
বাতায়নের পথে আমি পশিব শুদ্ধান্তে;
চূঁড়তে তোমার পূজার বলি,
ধরব বনের অলিগলি,
আনব তোমায় দেউল তলে পথ ভুলায়ে প্রান্তে,
কোথায় তোমার শিকার লুকায় পারবে সবি জানতে।

বীর দেহের বর্ম্ম মাঝে কোথায় আছে রন্ধ্র,
ঘোমটা ঢেকে লুকায় কোথায় নারীর মুখচন্দ্র,
গৃহের কোণে কিশোর হিয়া
উঠছে কোথা মঞ্জরিয়া
সে সব খবর দিতে তোমায় ঘুরিব অতন্দ্র,
খুঁজব কোথা সুড়ং আছে, কোথা আছে রন্ধ্র।

কোথা কে বিদ্রোহী আছে বলব তোমার কর্ণে,
স্বর্ণাকে পায়ে ঠেলে পূজে কে সুবর্ণে।
প্রেমের যারা নিন্দা করে,
গ্রন্থকীটের জীবন ধরে,
ভুলেও কভু দেয়না চুমা নারীর আঁখি পর্ণে,
তাদের কথা গুঞ্জরিয়া বলব তোমার কর্ণে।

একটী ঠায়ে কেবল আমায় চলবে না এ রঙ্গ
করতে আমি পারবনাক ঋষির তপোভঙ্গ।
তপোবনের ত্রি-সীমানায়
নাইক সাহস আনাগোনায়
কেন, তা'ত ভাল মতেই জান হে অনঙ্গ,
ঋষি যোগীর কাছে আমার চল্‌বেনা এ রঙ্গ।

শ্রীকালিদাস রায়

ভাবের অভিব্যক্তি

(শ্রীকালীপ্রসন্ন পাইন)

যন্ত্রণা

বিরক্তি

কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়

প্রেম

স্নেহ

শ্রদ্ধা, ভক্তিভাব
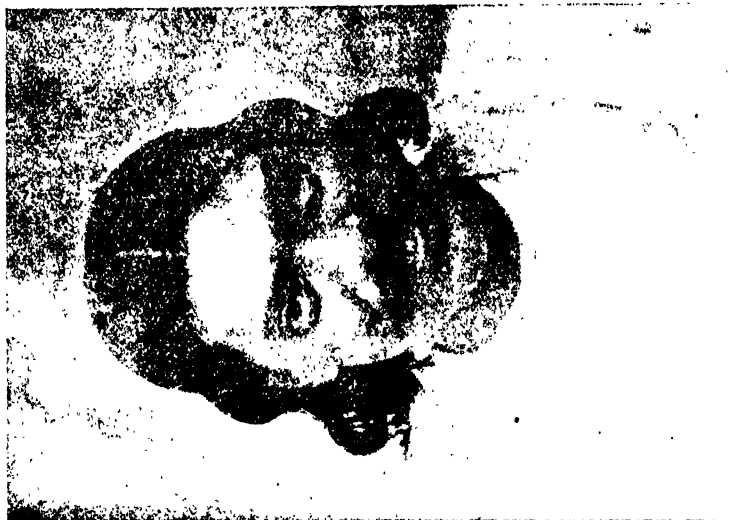
অচলা চঞ্চলা।

শৈশবে আমাদের ভৌগোলিক বিদ্যার্জ্জনের জন্য পণ্ডিত মহাশয় যখন সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, তখন আনন্দে আমরা আয়ত্ত করিলাম যে, "পৃথিবী গোলাকার, তাহার উত্তরে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা, ঠিক কমলা লেবুর আকার।" সে সময়ে বিদ্যা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না; তাহার পরে স্কুলে কলেজে, সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বহুল গ্রন্থের নিষ্পেষণে স্বয়ং মাতা ধরিত্রীই চক্ষুর অগোচরী-ভূতা হইবার উপক্রম করিলেন; তাঁহার গোল আকার নিরাকারে পরিণত হইবার অবস্থা প্রায় হয় হয় হইয়া উঠিল; তাঁহার গতিবিধি, তাঁহার আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্প্রকর্ষণ সম্বন্ধে গ্যালিলিও নিউটন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণমাত্র বিস্মৃতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষার "কমলা লেবু" এবং নিউটনের "আতা ফল" গলিয়া পিষিয়া প্রায় এক দশা প্রাপ্ত হইল। স্থির বুঝিয়া রাখিলাম কেবল এই যে, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি থাকে থাকুক, অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত তিনি আকর্ষণ বিকর্ষণে নিযুক্ত থাকেন থাকুন, বহু যুগযুগান্তর হইতে আমাদের অধ্যুষিত এই ধরণী স্থিরা অচলা অচঞ্চলা ও ধ্রুবা এবং তিনি অচলাই রহিবেন। কত গঙ্গা যমুনা সিন্ধু সরস্বতী ইঁহার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কত হিম বিন্ধ্য নীলাচল ইঁহার বক্ষের উপরে গর্ব্বোন্নত মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া কত কাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছে, কত প্রশান্ত, অতলান্ত, ভূমধ্য, লোহিত প্রভৃতি সাগরোপসাগর তাহাদের অতলস্পর্শ লবণাম্বু লইয়া এই সপ্তদ্বীপার বক্ষের উপর কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া উদ্বেলিত হইতেছে, শশিসূর্য্যতারকার গতি-রোধ করিয়া কত খাণ্ডব কত দণ্ডক আজও এই ধরিত্রীর উপরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মানবের চিরনির্ভর সেই শ্যামশস্পাস্তীর্ণা শ্যামা বসুন্ধরার বিজ্ঞানসম্মত কোন চাঞ্চল্য থাকে থাকুক, তাঁহার অঙ্কবিহারী মানবকের তাহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এই স্থির বিশ্বাস লইয়াই তরুণ জীবনের প্রারম্ভ হইতে সর্ব্বংসহার বক্ষে নির্ভয়ে বিচরণ আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে অচলা মেদিনী একটু আধটু যে সচলা না হইতেন তাহা নহে, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার কারণ নির্দ্দেশের জন্য বলিতেন যে, "এবারে বাসুকীর ফণাবিশেষ কম্পিত হইয়াছে, এবারে কূর্ম্মশুণ্ডের আকুঞ্চন বা প্রসারণ হইয়াছে; এবারে দিগ্‌বারণের রোমাঞ্চ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার হেতু কিছুই নাই—মাভৈঃ!" তাহাই হইত, পুরাঙ্গনা-গণের বিম্বাধরস্পৃষ্ট শঙ্খস্বননের সঙ্গে সঙ্গে কূর্ম্ম বারণ বাসুকীর চাঞ্চল্য নিবারিত হইত; সচলা মেদিনীও পুনরায় অচলা হইতেন। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি 'রায় গুণাকর' মেদময়ীর মৃণ্ময়ী হইবার এবং "অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া" উঠিবার কারণান্তর নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; নিতম্বিনীগণের বিম্ব-বিনিন্দিত অধরস্পর্শ-জনিত সুমধুর শঙ্খস্বননের সঙ্গে সঙ্গেই যখন বসুন্ধরার বেপথুটুকু নিবৃত্ত হইত, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার কবি-শ্রেষ্ঠের নির্দ্দিষ্ট কারণের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কি না, কাব্যামোদিগণই তাহার বিচার করিবার উপযুক্ত পাত্র, সাধারণে নহে, সুতরাং রায় গুণাকরের ন্যায় রসশাস্ত্রবিদ্‌গণের উপরেই সে ভার রহিল।

কেবল ভূতত্ত্ব বা ভূগোলতত্ত্ব নহে, সর্ব্ব তত্ত্বের সর্ব্ব-শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারের সমস্ত পুস্তকই একরূপ বন্ধ করিয়া বিদ্যাপীঠের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ দ্বাবিং-শতি বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া গেল। সংসারের সুখ দুঃখ একত্র করিয়া সমষ্টিতে সময় একরূপ ভালই কাটিতেছিল—তরুণ জীবনের দিন-

গুল স্রগ্ধরা ছন্দে আনন্দে নৃত্য করিয়াই চলিয়াছিল। প্রাবৃটের নব নীরদ মেদুরাম্বরে সুচিক্কণ স্নিগ্ধ নীলিমা সেদিনে নয়নে কি অমৃতাঞ্জন প্রলেপই দিয়া যাইত, বসন্তের বর্ণবৈচিত্র্য বনানীর হরিতাঞ্চলে কি মনোহর ইন্দ্রধনুই সেদিনে রচনা করিত; মেঘ নির্ম্মুক্ত শারদ দিনের "রৌদ্র পীত হিরণ্য অঞ্চলে" সুন্দরী বসুন্ধরার প্রৌঢ় সৌন্দর্য্য কি অপূর্ব্ব শোভায় সেদিনে মনোহরণ করিত; দূর প্রসারী সরসীর সুনির্ম্মল বক্ষে অগণিত অরবিন্দের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য অন্তরে কি অন্তহীন আনন্দের উৎস সেদিনে উৎসারিত করিয়া দিত তাহা আজ এই রোগনিপীড়িত বিয়োগবেদনাতুর জীবনের শেষ যামে বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইয়া বর্ণন করিয়া বুঝাইবার শক্তি কি আমার আছে? "তে কেঽপি দিবসা গতাঃ!" সেদিন কি দিনই গিয়াছে!

এ যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিনে ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংলণ্ড ইটালী আমেরিকা প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে অভিজ্ঞ ভদ্রসম্প্রদায়ের হৃদয় মধ্যে দেশ হিতৈষণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে ভারতবাসীর রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে পটুতা প্রতিপন্ন করিয়া রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যাপারের ক্ষমতালাভের স্পৃহা ভারতবাসীর অন্তরকে অভিনব আবেগে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছিল; হিউম, কেইন, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি ভারতপ্রেমিক কতিপয় ইংরাজ এবং ভারতের শিক্ষিত জননায়কগণের একান্ত চেষ্টা এবং অদম্য উদ্যমের ফলে 'কংগ্রেস' নামক জাতীয় মহাসভা সেদিনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই সুমহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া যে শিক্ষিত ব্যক্তি অনুষ্ঠিত দেশহিতকর কর্ম্মে যোগদান না করিয়াছে, কংগ্রেসপ্রদর্শিত পথে যে ব্যক্তি রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই, তাহার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই বৃথা, সেদিনে সকল শিক্ষিত জনগণের মনেই এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে কাল পাত্র রুচি এবং মনোভাব অনুসারে রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিবার পথ বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকলে এক পথে একত্রে আজ চলিতে পারিতেছে না; এবং নানা কারণে সকলগুলি পথও নিরাপদও নহে; সঙ্কটসঙ্কুল পথে যাত্রা করিতে আজ মানুষের মনে দ্বিধা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হইতেছে। সেদিনের যাত্রা অপেক্ষাকৃত নির্ভয় এবং সহজ ছিল। মতভেদ, বাদ বিতণ্ডা, তর্ক ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কোন বালাই সেদিনে ছিল না, সুতরাং যুবা বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই এক পথে একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে পারিত এবং করিত; কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিশেষ কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইত না, তাঁহাদের রোষকষায়িত রক্ত নেত্রের এবং শাসন যন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণের ভয়ে কাহাকেও সন্ত্রস্ত হইতে হইত না।

কলেজের পাঠ সমাপনান্তে বাড়ী আসিয়াছি। নামে মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু সাংসারিক সকল কর্ম্মের গুরুভার তখনও আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপে নাই। দিন রাত্রির মধ্যে অবসর সুপ্রচুর; অল্পবিস্তর পড়াশুনা, একটু আধটু গানবাজনা শিক্ষার চেষ্টা, আহার উপবেশন শয়ন ব্যায়ামে কোনরূপে সময় কাটিতেছে, এমন সময়ে সংবাদ পাওয়া গেল, কি একটা রাজনীতি বিষয়ের বক্তৃতা দিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবু (অধুনা স্যর সুরেন্দ্রনাথ) রাজসাহী হইয়া নাটোরে আসিবেন। কি আনন্দের কথা! যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের ছাত্র মণ্ডলীর জীবন্ত দেবতা, ছাত্র-জীবনে যাঁহার কারাবাস কালে হাতে বুকে 'কালো ফিতা' বাঁধিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছি, নাটোরে বসিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে! তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত নাটোরবাসী শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসমাজ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল; তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য একান্ত ঔৎসুক্যে দিন গণনা করিতে লাগিল। তিনি আসিয়া আমাদের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন; বক্তৃতার স্থানও আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণেই স্থির করা গেল। তিনি আসিলেন প্রাতে, মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্নে বক্তৃতা করিবেন স্থির হইল। কিন্তু সেদিন বেলা ৩টার সময়ে প্রচণ্ড "কাল বৈশাখী" ঝড়ে এবং অবিরল বৃষ্টিপাতের উৎপাতে যথসময়ে বক্তৃতা হইতে পারিল না;

সন্ধ্যার সময়ে সভা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাওয়ায় বহুদূর হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবুর মোহকারী বাক্‌শক্তির প্রভাবে সহস্র সহস্র লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দুই ঘণ্টা কাল নিশ্চল হইয়া রহিল; ইংরাজী ভাষা যাহারা বুঝিল, এবং যাহারা বুঝিল না, সকলেই "চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে"। তৎপূর্ব্বে এবং তৎপরে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা বহুস্থানে বহুবার বহু উপলক্ষ্যে শুনিয়াছি, কিন্তু বিপুল জনসংঘকে ঐরূপে নীরব নিশ্চল ও নিমেষহীন করিয়া রাখিতে অধিক দেখি নাই। তিনি নাটোর হইতে বিদায় হইবার সময়ে আমাকে বলিয়া গেলেন, "আজ তোমার রাষ্ট্রনীতি ব্যাপারে হাতে খড়ি দিয়া গেলাম। আগামী কংগ্রেসের সময়ে তোমাকে যাইতে হইবে, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যোগ দিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে। আমিই সমস্ত শিখাইয়া পড়াইয়া লইব।" সেদিনে ভাবিলাম উহা সুরেন্দ্র বাবুর "বাত কি বাত"—কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নহে। নানা কারণে বাধ্য হইয়া যখন কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলাম, সুরেন্দ্র বাবু তখন তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্‌-বিস্তারের জাল দিয়া আমাকে টানিয়া কংগ্রেসে লইয়া গেলেন। কেবলমাত্র কলিকাতায় কংগ্রেস সভায় নহে, তাঁহার সঙ্গে পুণা, মাদ্রাজ,বোম্বাই,অমরাবতী, বহু স্থানের কংগ্রেস সভায় গিয়াছি, এবং আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি সাধ্যে যাহা কুলায়, তদ্রূপ কার্য্যভারও সময়ে সময়ে লইতে হইয়াছে। এইরূপে বঙ্গের রাজনীতি ব্যাপারের পথপ্রদর্শক আদিগুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া শিক্ষা চলিতে লাগিল। অনেকেই জানেন যে, সুরেন্দ্র বাবুর নিকট একবার ধরা পড়িলে তাহার অব্যাহতি শীঘ্র হয় না; আমারও তাহা হইয়াছিল।

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার বাৎসরিক অধিবেশন রাজসাহীতে হইবার কথা। দেশমাতার সুসন্তান অদ্বিতীয় শক্তিধর পরম বৈষ্ণব নির্ভীক জননায়ক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্র বাবু স্বয়ং এবং অন্যান্য দেশনায়কগণ স্থির করিলেন, রাজসাহীতে রেল না থাকায় গমনাগমনের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হয়, সেই জন্য প্রাদেশিক সভা রাজসাহীর পরিবর্ত্তে নাটোরে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাজসাহী এসেসিয়েসনের সভাপতি, সম্পাদক এবং রাজসাহীর সহরবাসী সমস্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের উপরে এই অধিবেশনের কর্ত্তব্য যথানিয়মে সম্পন্ন কবিবার ভার পড়িল। যদিও ইহা সমস্ত জেলার ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলেরই কর্ত্তব্য, তথাপি নাটোরে অধিবেশনের স্থান স্থির হওয়ায় নাটোরবাসী লোকের উপরই আবাহন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করিবার ভার দেওয়া হইল।

নাটোর প্রাচীন স্থান হইলেও সেখানে টাউন হল প্রভৃতি এমন কোন সুবৃহৎ গৃহ নাই যে, সেখানে তাদৃশ মহতী সভার অধিবেশন হইতে পারে। সুতরাং কংগ্রেস সভার নিমিত্ত যেমন সুবৃহৎ 'পাণ্ডাল' নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ করিবার ব্যবস্থা হইল এবং সেই সভার কার্য্যে যোগ দিবার জন্য সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণ এবং রাজনীতি ব্যাপারের নায়ক মণ্ডলী সকলেই আহূত হইলেন। বাঙ্গালার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিক হইতেই নাটোরে গতায়াতের অসুবিধা নাই বলিয়া সভার প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যায় প্রচুর হইবেন এবং দর্শকের সংখ্যাও কম হইবে না বিবেচনায় "পাণ্ডালে" তিন সহস্র পরিমিত লোকের স্থান করিবার ব্যবস্থা হইল। সভাগৃহ দেখিয়া মনে হইল যে, এই গৃহে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে পারিত।

নানা দিগ্দেশ হইতে প্রতিনিধি আসিলেন পঞ্চশতেরও অধিক, এবং নায়কবর্গের মধ্যে ডাব্লিউ, সি,বানার্জ্জি, সুরেন্দ্র বাবু, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ ব্যানার্জ্জি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেহই বাদ যান নাই। রাজনীতি ব্যাপারে বঙ্গের জমিদারবর্গ তাদৃশ উৎসাহ তৎপূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু নাটোরের সেই কন্‌ফারেন্স রাজসাহী বিভাগের প্রায় সমস্ত জমীদারগণই যোগদান করিয়াছিলেন। যে সকল অন্তঃপুরচারিণী জমিদার-মহিলার সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইবার অন্তরায় আছে, তাঁহারাও প্রতিনিধি পাঠাইয়া সভার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিবস পূর্ব্বে রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন্ গ্রহণ করতঃ বোম্বাই প্রদেশ হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাপতি হইবার জন্য আমি সনির্ব্বন্ধে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। এই অকিঞ্চন লেখকের প্রতি তাঁহার চিরন্তন স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশধর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তান, স্বয়ং প্রগাঢ় পণ্ডিত, সিবিল সার্ব্বিসের অবসর-প্রাপ্ত দক্ষ কর্ম্মচারী সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র রাজসাহী ধন্য হইয়া গেল, এবং বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী পেন্‌সন্ প্রাপ্ত জজ বাহাদুরকে রাজনীতি ক্ষেত্রে পাইয়া দেশের জননায়কগণও নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়া নাটোরে যাইতেছেন, সেই উপলক্ষ্যে আমরা জগৎকবি রবীন্দ্রনাথকেও পাকড়াও করিলাম। তিনিও সেই সময়ে অল্প কালের জন্য তাঁহার কুহকিনী কল্পনাকে বিশ্রাম দিয়া রাষ্ট্রনীতির ধূলিমলিন ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে অঙ্গীকার করিলেন। রবীন্দ্র বাবুর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে আমরা পাইলাম, এবং আমার সোদর-প্রতিম অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিপেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ীর সকলকেই সেই সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে নাটোরে যাইতে সম্মত হইলেন। সে যে কি আনন্দ-সম্মিলনের প্রতীক্ষায় নাটোরবাসী আমরা সকলে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলাম, আজ তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। হরিপুরের চৌধুরী পরিবারের সহিত নাটোরের বহুকালের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ। উৎসবে ব্যসনে তাঁহারা নাটোর রাজপরিবারের নিত্য বন্ধু। স্যর আশুতোষ এবং তাঁহার সকলগুলি ভ্রাতাই কেবল যে সভার অধিবেশন কালে উপস্থিত ছিলেন, তাহা নহে, নাটোরবাসীর সহিত একত্রে তাঁহারা এই মিলনযজ্ঞের উদ্যোগ অনুষ্ঠানে নিয়ত শ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলের, এবং বিশেষতঃ 'বীরবল' প্রমথনাথের সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা না পাইলে এই বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্গহানি হইয়া ইহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নাটোরে কোন কিছুর উদ্যোগ অনুষ্ঠান হইলে দিঘাপতিয়ার রাজদরবারের সহায়তা ব্যতীত তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সমাপন হইতে পারে না, স্মরণাতীত কাল হইতে লোকে ইহাই জানিয়া আসিতেছে। এই কন্‌ফারেন্সের সাফল্যকল্পে দিঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুর প্রমদানাথ এবং তাহার কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা যে কি অকাতর পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। সে দিনের যাঁহারা আজও জীবিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, রাজা বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যবর্গের অকাতর শ্রম ব্যতিরেকে এই বিপুল ব্যাপারের সমাধান একান্তই অসম্ভব ছিল। যে সকল মহামান্য অতিথিগণ নাটোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অর্দ্ধেকেরও অধিক সংখ্যকের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন দিঘাপতিয়ার রাজা। রাজপ্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দিঘাপতিয়ার স্কুল গৃহ, কাছারী বাড়ী প্রভৃতি সকল স্থানেই অভ্যাগতগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, রাজা স্বয়ং সেই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে পট্টাবাসে (তাম্বুতে) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ব্যাপারের সাফল্য জন্য রাজার এই অজস্র অর্থব্যয়, এবং অকাতর শ্রম ও হাস্যমুখে ক্লেশ স্বীকার, উত্তরপুরুষগণের সম্মুখে চিরন্তন আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল। প্রতিনিধিগণ নির্দ্ধারিত দিনে যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া ও সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রাজসাহী কলেজের এবং নাটোর ও দীঘাপতিয়ার স্কুলের ছাত্রবৃন্দ এবং শিক্ষক মহাশয়গণ। এই সকল স্বেচ্ছাসেবকগণের অপরিসীম কায়িক পরিশ্রমের কথা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। তরুণ বিদ্যার্থিবৃন্দ এবং পরিণত বয়স্ক অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ আহার নিদ্রার অবসরমাত্র পান নাই, আয়েস আরাম ত দূরের কথা। কিন্তু এত ক্লেশের

মধ্যেও তাঁহাদের মুখ মলিন দেখি নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলাম আমি, সুতরাং সকল প্রকার আদেশ উপদেশের জন্য তাহারা আমার নিকটই উপস্থিত হইত। যখনই তাহাদের উপর আমার চক্ষু পড়িয়াছে, তখনই দেখিয়াছি উৎসাহ-প্রদীপ্ত হাস্যমণ্ডিত তাহাদের তরুণ মুখমণ্ডল যেন বিকশিত অরবিন্দের শোভায় নিত্য ঢল ঢল করিতেছে।

প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। সভামণ্ডপে চারি সহস্র লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারিত। নানাস্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিবর্গ এবং জন-নায়কগণের সংখ্যা একত্র করিলে এক সহস্র হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকবৃন্দের পরিমাণ এতই অধিক হইয়াছিল যে, সভামণ্ডপে আর তিল ধারণের স্থান ছিল না। চতুষ্পার্শ্বে আরও সহস্র সহস্র লোক স্থানাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোন ব্যবস্থা করিবারই আমাদের আর সাধ্য ছিল না। জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ রৌদ্রতাপে উন্মুক্ত আকাশ তলে শিরস্ত্রাণ-বিহীন বাঙ্গালী যার পর নাই ক্লেশ পাইতেছে—অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য আমরা, উপায়হীন হইয়া বসিয়া আছি। বলিলাম, "আগামী কল্যের অধিবেশনে কোনরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, আজ তোমরা ফিরিয়া যাও।" কিন্তু কে কাহার কথায় কর্ণপাত করে? বাহির হইতে যথাসম্ভব চীৎকার করিয়া, আতপ-তাপ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিবার প্রয়াস তাহারা পাইতে লাগিল।

এদিকে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে সঙ্গীত হইল। তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির স্বাগত সম্ভাষণ হইয়া গেলে সভাপতির অভিভাষণ আরম্ভ হইল। সুদীর্ঘ অভিভাসণ শেষ হইতে প্রায় দুইঘণ্টা সময় লাগিল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে অভিভাষণের তাৎপর্য্য বাঙ্গলায় বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে ভার পড়িল বঙ্গসরস্বতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের উপরে; - বস্তুতঃ তিনি উপস্থিত থাকিতে সে ভার অপরে কে আর গ্রহণ করিবে? এবং তৎক্ষণাৎ বিনাপ্রয়াসে সুচিন্তিত সুদীর্ঘ ইংরাজী অভিভাষণের সুললিত বাঙ্গালা করিবার যোগ্যতাই বা কাহার আছে? রবীন্দ্রবাবু ইংরাজী অভিভাষণ খানি হাতে লইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেদিনের মধুনিষ্যন্দিভাষায় তিনি কি অমৃতবর্ষণ যে করিয়া গেলেন, তাহা যাহারা শুনিয়াছে তাহারাই জানে; সে কথা বুঝাইবার শক্তি কাহারই নাই।

প্রথম দিবসের কার্য্য শেষ হইলে সভাভঙ্গের পর সকলে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থলে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যার অবসর পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আপ্যায়নে এবং রবীন্দ্রবাবুর মধুকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বেলা ১১টার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। মধ্যাহ্নের ভোজনাদি একটু শীঘ্রই সমাধা করিয়া, সভাপতির সহিত সকলে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। সভাপতি স্বয়ং এবং ঠাকুর-বংশের সকলে এবং চৌধুরী মহাশয়গণ নাটোরে ছিলেন, সুতরাং সভাস্থলে উপস্থিত হইতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই। ডব্লিউ, সি, বনার্জ্জি, সুরেন্দ্রবাবু, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণবাবু প্রমুখ অন্যান্য নায়কগণ দীঘাপতিয়ার রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের উপস্থিত হইতে অল্প বিলম্ব হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে কার্য্য আরম্ভ হইল। ইতঃপূর্ব্বে রাজনীতি বিষয়ের সভাসমিতির কার্য্য ইংরাজী: ভাষাতেই নিষ্পন্ন হইত; ইহার বিপরীতে কেহ কোন দিন কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং বক্তৃতা: প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ইংরাজীতে হইত। নাটোরের এই অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া শুনাইবার পর যেন সকলেই বঙ্গভাষার লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং রাজনীতি ক্ষেত্রের কার্য্যকলাপ যে বাঙ্গলায় নিষ্পন্ন হইতে পারে, বঙ্গভাষার যে তদ্রূপ শক্তি আছে, ইহাই যেন সেই দিনই প্রথম সকলে উপলব্ধি করিলেন। কেবল মাত্র দর্শক নহে,—প্রতিনিধিগণ এবং নায়কবর্গ সকলেই

বাঙ্গালায় সভার কার্য্য হইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহাই স্থির হইল। ডাব্লিউ, সি, বনার্জ্জি, লালমোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় ধুরন্ধরগণও বাঙ্গলায় সভার কার্য্য হইতে কিছুমাত্র বাধা দেন নাই, বরং উৎসাহের সহিত সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। রাজসাহীর স্বনামধন্য উকিল, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, বাগ্মিবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বাঙ্গলায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার লালিত্যে এবং মাধুর্য্যে সকলেই একান্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; সে ধ্বনি আজও আমার কর্ণে যেন বাজিতেছে। রাজনীতি আলোচনার জন্য যে সকল প্রাদেশিক সভা আহূত হয়, তাহার কার্য্যাবলী তত্তৎ প্রদেশের ভাষায় নির্ব্বাহিত হওয়াই সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং বোধ করি এই ধারণা সকলেরই অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় ছিল; তাই রবীন্দ্রবাবু তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতার বলে সুচিন্তিত সুদীর্ঘ ইংরাজী অভিভাষণ যখন নিমেষ মধ্যে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইলেন, তখন উপস্থিত সুধীবৃন্দের অন্তরের সুপ্তভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং মাতৃভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা সকলকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তদবধি আজ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সভার কার্য্য প্রায় সর্ব্বত্র মাতৃভাষাতেই নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এবং শুনিয়াছি, বর্ত্তমান শাসন পরিষদে পর্য্যন্ত নিজ নিজ মাতৃভাষায় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা সরকার হইতেও দেওয়া হইয়াছে; এবং বাঙ্গলার বিদ্যাপীঠে (Calcutta University.) বঙ্গের সুসন্তান,-ভারতের উজ্জলরত্ন, বহুবিদ্যাবিশারদ, স্বদেশবৎসল আশুতোষ সরস্বতীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অপরিসীম যত্নে বাঙ্গালা ভাষায় এম.-এ. পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইয়াছে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত।

অক্ষয়কুমারের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া পর পর সকলগুলি বক্তাই বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্র বাবু, ডাব্লিউ, সি, বনার্জ্জি, লালমোহন কেহই বাদ গেলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনভ্যস্ত হইয়াও কেহই কোন অসুবিধা বোধ করিলেন না; মনে হইল যেন চিরকাল এই সকল বাগ্মী পুরুষেরা বাঙ্গালা ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়া আসিতেছেন; ইহাই যেন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, ইংরাজীর অনর্গল বাক্যস্রোত যেন তাঁহাদের চেষ্টাপ্রসূত, এবং স্থান কাল বিষয়ের অনুপযোগী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সেদিন দুঃসহ গ্রীষ্ম। যাঁহাদের উপরে কার্য্যভার রহিয়াছে তাঁহাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সভামণ্ডপে বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কায করিতেই হইবে, মণ্ডপের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে শ্বাস ফেলিতে যাইবার পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবসর নাই। আমাদের উপরে যে কার্য্যভার ছিল তাহা পূর্ব্ব দিনের অধিবেশনের সময়েই সমাধা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইচ্ছামত পাণ্ডালে গমনাগমনের স্বাধীনতা আমাদের ছিল। বহুলোকের স্থান সঙ্কুলানের জন্য বিস্তীর্ণ একটী প্রান্তরে পাণ্ডাল নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডালের সন্নিকটে জল পানের ব্যবস্থার জন্য অনেকগুলি তাম্বু খাটানো হইয়াছিল। সভামণ্ডপের রুদ্ধ বায়ু গ্রীষ্মতাপে এবং বিপুল জনতার শ্বাস প্রশ্বাসে এমন উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, বহুক্ষণ সেখানে একভাবে বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, বিশেষতঃ কোন কায না থাকায় সভাগৃহের গ্রীষ্মতাপ যেন উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। বন্ধুবর গগনেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ, আমি এবং "বীরবল" প্রমথনাথ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু যুক্তিপূর্ব্বক সভামণ্ডপ ত্যাগ করিয়া, জলযোগের তাম্বুর সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া মুক্ত বায়ুর সুখ সম্ভোগ করিতেছিলাম, এবং সদ্য আহরিত কচি ডাবের সদ্ব্যবহার করিবার উদ্যোগে ছিলাম। রবীন্দ্র বাবু এবং আশুবাবুকে ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ, সুতরাং বালচাপল্যে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া সেই দুঃসহ গ্রীষ্মতাপতপ্ত সভাগৃহে বসিয়া একমনে বক্তৃতাই শুনিতেছিলেন। কথা ছিল সভাপতির শেষ ভাষণ হইয়া গেলে রবীন্দ্র

বাবু একটী বক্তৃতা করিবেন। আমরা স্থির করিয়াছি সেই সময়ে সন্ধ্যাও প্রায় সমাগত হইবে, গ্রীষ্মতাপ সান্ধ্যসমীরণে সহনীয় হইয়া আসিলে রবীন্দ্রের অভিভাষণ শুনিবার জন্য মণ্ডপে প্রবেশ করিব, ততক্ষণ নারিকেলোদক এবং নাটোরের নানাবিধ সন্দেশ ও মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করা যাউক। আমরা কয় বন্ধু কেহ বা সুকোমল দর্ভাঙ্কুরাস্তৃতা ভূমির উপরে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায়, কেহ বা পট্টাবাসের রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া নারিকেলের স্নিগ্ধোদকের প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি—এমন সময়ে এক অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত মেঘমন্দ্রের ন্যায় বিশাল ধ্বনি মৃত্তিকার তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেঘহীন আকাশে গর্জ্জন, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার?"

প্রায় দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে আর একবার উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বিশাল ভূমিকম্প হইয়াছিল। তখন আমরা কলেজের ছাত্র, সুতরাং ঐ শব্দ আমার একান্ত অপরিচিত নহে। আমি কথা কহিতে যাইতেছি এমন সময়ে পদতলে মেদিনী কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া উঠিলেন। আর কাহাকেও কাহারও উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না। সকলেই একসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম যে, উহা সেই দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বের ভূমিকম্পের পুনরাবৃত্তি, এবং ইহার বেগ তদপেক্ষা সমধিক। কূর্ম্মপৃষ্ঠ কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হইয়া, হস্তিশুণ্ড কথঞ্চিৎ আস্ফালিত হইয়া, বাসুকীফণা অল্প সঞ্চালিত হইয়াই যে, সকল ভূমিকম্প হইয়া থাকে, বুঝিলাম ইহা সত্য নহে; শত বাসুকী সহস্র কূর্ম্ম এবং লক্ষ বারণ একত্রে তাহাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজোরে সঞ্চালিত করিতে করিতে রসাতল দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারম্বার "ঘোড়দৌড়" না করিলে মাতা ধরিত্রী এরূপভাবে অধীরা হইতেন না। পাণ্ডালখানি কাঠের খুঁটির উপরে খড়ের ছাউনি চাল, ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা ঘর নহে, তথাপি উহা এরূপ ভাবে দুলিতে লাগিল যে, মনে হইল উহা ভূমিশায়ী হইতে আর বিলম্ব নাই। সমস্ত লোক পাণ্ডাল হইতে একসঙ্গে বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায়, বহুলোক অপ্রশস্ত দ্বারপথে বিমর্দ্দিত হইয়া আহত হইল। পদতলস্থ ভূমির আন্দোলনে নিরালম্ব অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য কাহারই ছিল না। যে যেখানে পারিল বসিয়া পড়িল। অনেকে আন্দোলন বেশী সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রপীড়ায় পীড়িতলোকের ন্যায় এমন সকল কার্য্য করিতে লাগিল, যাহা লিখিলে শালীনতা রক্ষা হইবে না—"বুঝ লোক যে জান সন্ধান"। সভা উপলক্ষ্যে বহু হস্তী অশ্ব শকটাদি সভা-মণ্ডপের বহির্ভাগে সসজ্জ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সকল বৃহৎকায় পশু, মহাপ্রলয় সন্নিকট ভাবিয়া উর্দ্ধশ্বাসে কে কোথায় পলাইতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই। সভামণ্ডপের বহির্ভাগস্থ বিশাল জনসঙ্ঘ বিপুলকায় হস্তিদ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়া প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। মোহনপ্রসাদ নামক রাজধানীর একটি বিপুলদেহ দন্তল হস্তী, চঞ্চলা ধরণীর পৃষ্ঠে তাহার চতুষ্পদে ভর দিয়াও দাঁড়াইতে না পারিয়া, তাহার দন্তদ্বয় ভূপ্রোথিত করিয়া বসিয়া বসিয়া সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে স্থান শান্তি এবং শোভার আধার ছিল, নিমেষে তাহা মৃত্যু-বিভীষিকায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পশুপক্ষী এবং মনুষ্যের ভয়ার্ত্ত চীৎকারে মনে হইতে লাগিল, মহাপ্রলয় সন্নিকট। পদতলে ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণজল এবং বালুকা উঠিতে লাগিল, পতিত অট্টালিকার ধূলিরাশি শূন্যে উড়িয়া চিতাধূমের অনুকরণ করিতে লাগিল; যে দিকে চক্ষু ফিরানো যায়, মনে হয় শরীরী মৃত্যু মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে মহাকালের আজ্ঞায় তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে!

প্রান্তরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া হঠাৎ একবার চক্ষু আমাদের বাড়ীর দিকে গেল। দেখিলাম, আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া চূর্ণীকৃত অট্টালিকার ধূলিরাশি উড়িয়াছে। মন্দিরচূড়া, সৌধশীর্ষ, তোরণদ্বার আর কিছুই দেখা যায় না, চক্ষুর সম্মুখে কেবল ধূলি, ধূলি, ধূলি! তখনও পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তখনও নিরালম্ব অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য কাহারও নাই। আবাস গৃহের

চিহ্নমাত্র যখন দেখিতে পাইলাম না, তখন ভূকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎকম্পও উপস্থিত হইল। আমি ভূকম্পনে বিদীর্ণ, ভূগর্ভস্থ উৎক্ষিপ্ত বালুকাস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর বসিয়া পড়িলাম। আমাদের বৈঠকখানা বাড়ীটি সাধারণ ইমারত গৃহ অপেক্ষা অনেক উচ্চ; তাহার গুম্বজটি আরও উচ্চ। সেই গুম্বজের নীচে একটি ঘর আছে, উহা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ থাকে; আমার এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক একটি পুত্রসন্তান তখন জ্বরে কাতর ছিল, তাহার ধাত্রীর সহিত তাহাকে ঐ ঘরে রাখিয়া আমরা সভামণ্ডপে আসিয়াছিলাম। মনে হইল, আসন্ন মহাপ্রলয়ের ভয়ে সন্ত্রস্তা ধাত্রী বালককে হয়ত বাহিরে আনিবার সময় পায় নাই, বিশাল গুম্বজের নিম্নে বালকের জীবন্ত সমাধি হইয়া গিয়াছে। আমার মাতা, ভগিনী এবং আমার স্ত্রী সকলেই অন্দরে ছিলেন, সেখানেও পাকা ঘর। যখন কোন গৃহেরই চিহ্নমাত্র দেখিতেছি না, তখন সম্ভবতঃ সকলেই ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপের নিম্নে সমভাবে সমাধিস্থ হইয়াছেন! এইরূপ ভাবনা অন্তরে উদয় হইলে, একমুহূর্ত্তে পরিবারস্থ সকলগুলি প্রাণীর অস্বাভাবিক অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এই চিন্তা মানুষের মনে আসিলে, তাহার কি অবস্থা হয় তাহা মন দিয়া বুঝিবার কথা, লিখিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে।

আমি প্রায় হতচেতন হইয়া বসিয়া পড়িয়াছি। বাহ্যজ্ঞান আমার প্রায় নাই বলিলেই হয়,—এমন সময় অনুভব করিলাম, কে যেন আমার দুইহস্ত ধরিয়া টানিয়া খাড়া করিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, রবীন্দ্রবাবু এবং প্রমথ আমার দুই হাত ধরিয়াছেন। এবং আশুতোষ চৌধুরী আমার কক্ষের নীচে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের মুখের দিকে মূকের ন্যায় চাহিয়া রহিলাম, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রবীন্দ্রবাবু কহিলেন, "রাজন্, (তিনি আমাকে রাজন্ বলিয়া ডাকিয়া থাকেন) আসুন বাড়ীর দিকে যাই, কি হইল দেখি। আপনি এত অধীর হইবেন না, সম্ভবতঃ সকলে ভালই আছেন, ভগবান্ কোন অকল্যাণ করেন নাই।" কথাকয়টী কাণে গেল। বিপদের সময় আশ্বাসবাণী বড় মধুর বোধ হয়। আমি নীরবে চলিলাম, রবীন্দ্রবাবুরা আমার হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রান্তর ত্যাগ করিয়া যখন রাস্তায় উঠিয়াছি, তখন আমাদের বাড়ীর একজন ঘোড় সওয়ার ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, আমার মাতা এবং স্ত্রী উভয়ে ঘরচাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন—আর কেহ জীবিত আছে কি না সে সংবাদ সে জানে না।

আমার চলৎ শক্তি রহিত হইয়া গেল, চক্ষুর নিকটে সমস্ত ধোঁয়া ধোঁয়া বোধ হইল, কাণে কোন শব্দ আর যায় না, চৈতন্য প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ আমাকে একরূপ কোলে করিয়া লইয়া পথ দিয়া চলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বাড়ীর তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখা গেল, বৃহৎ তোরণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—উহা ডিঙ্গাইয়া পার না হইলে বাটী-প্রবেশের উপায় নাই। সেই সময়ে আমার অল্প অল্প জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা কয়জনে পরস্পরের সাহায্যে সেই ভগ্নস্তূপ পার হইতেছি, এমন সময় বন্ধুবর অক্ষয়কুমার বাটীর দিক হইতে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, "খবর সব ভাল। যে ব্যক্তি মৃত্যুসংবাদ লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানে না, এক শুনিতে আর শুনিয়া মিথ্যাসংবাদ রটনা করিয়াছে।"

অক্ষয়কুমার যেন স্বর্গের দূতরূপে আসিয়া আমাদিগকে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, অক্ষয়, প্রমথ, এবং আমি—এই পাঁচজনে পথের মাঝখানে একরূপ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এই শুভ সংবাদের পরমানন্দ কিয়ৎক্ষণ উপভোগ করিলাম। তাহার পরে ত্বরিতপদে গিয়া দেখি, ধাত্রীর ক্রোড়ে আমার শিশুসন্তান নিরাপদে আছে। অন্দরের প্রবেশের পথে মা দাঁড়াইয়া আছেন। অবিলম্বে আমাকে দেখা দিয়া নিশ্চিন্ত করিবেন, সেই জন্যই প্রবেশ পথেই মা দাঁড়াইয়া ছিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশাল ভূমিকম্পের

জন্য ভয় পাইয়া আমার স্ত্রীর সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল, সেই সংবাদ বিকৃত হইয়া আমার মাতা এবং স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদরূপে আমার নিকট পৌঁছিয়াছিল। রাজ-বাড়ীর কোন্ ঘোড়সোয়ার এই মিথ্যা সংবাদ রটনা করিয়াছিল অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করা গেল না—কেহই স্বীকার করিল না ; কে যে সেই সংবাদদাতা এবং কাহার নিকট হইতে শুনিয়া এই 'শুভ' সংবাদ ঘোড়া দৌড়াইয়া আমাদিগকে শুনাইতে গিয়াছিল তাহার কোন সন্ধান আজ পর্য্যন্ত মিলে নাই।

একবারমাত্র কাঁপিয়াই যে ধরিত্রী সেদিন শান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে ; প্রথম বেগ উপশমিত হইবার পরে মহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই একটী পাকা ঘর দাঁড়াইয়া ছিল তাহাতে সাহস করিয়া আর কেহ প্রবেশ করিতে চাহিল না। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীতে খড়ের দুইখানি আটচালা এবং একটী তাম্বু খাটান ছিল, তাহারই মধ্যে কোনপ্রকারে আমরা সকলে অতিথিগণ সহ আশ্রয় লইলাম। কেবল সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ঘরে ছিলেন তাহা ত্যাগ করিলেন না—কহিলেন, "প্রথম কম্পনে যে গৃহ ভূমিসাৎ হয় নাই, তাহা মৃদু আন্দোলনে পড়িবার নহে, চিন্তা করিও না।" তাঁহারা কিছুতেই সে গৃহ ছাড়িলেন না। নিরুপায় হইয়া আমরা পর্ণশালায় আশ্রয় লইলাম।

দিঘাপতিয়ার যে প্রাসাদে মনামান্য অতিথিগণ ছিলেন, তাহা ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে ভূমিকম্প হইলে জননায়কগণের এক প্রাণীও রক্ষা পাইতেন কি না সন্দেহ। দিবাভাগে হওয়ায় এবং সেই সময় সকলেই সভাগৃহে থাকায় কাহারও প্রাণাত্যয় ঘটিতে পারে নাই। ভূমিকম্পের বেগে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল—কোনও স্থান হইতেই কোন সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের এবং কলিকাতার যে সকল ভদ্রসন্তান নাটোরে কন্‌ফারেন্স উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীর অবস্থা জানিবার জন্য তার করা হইয়াছিল। সংবাদ কোথাও হইতে আইসে না—সকলেরই বিষম চিন্তার কারণ হইল, কিন্তু উপায় নাই। গগনেন্দ্র, দ্বিপেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুর বাটীর যাঁহারা সেখানে ছিলেন, সেই তাঁহাদের প্রথম প্রবাস যাত্রা, এবং সেই প্রথম যাত্রাতেই এই বিষম বিভ্রাট। বাড়ীর সংবাদ না পাইয়া সকলেই অতিশয় চিন্তান্বিত, কোন প্রকার প্রবোধ বাক্যেই তাঁহাদের মন শান্ত হইতেছিল না। বহরমপুরের স্বনামধন্য বৈকুণ্ঠনাথ আমাদের বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি যদিও নিজ বাড়ীর কোন সংবাদ পান নাই, তথাপি শান্তভাবে বসিয়া সংবাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এবং আমার পরম বন্ধু দ্বিপুদাদাকে শান্ত করিবার জন্য তিনি নবাবী আমলের প্রাচীন ঐতিহাসিক গল্প আরম্ভ করিলেন। মুহুর্মুহু ভূমিকম্পের নিয়ত আন্দোলনে ধরণীমাতা চঞ্চলা হইলেও, বৈকুণ্ঠের চাঞ্চল্য ছিল না এবং নবাবী আমলের বাদশাহী কেচ্ছারও বিরাম হয় নাই।

পর দিবস সকল স্থল হইতেই মঙ্গলময় সংবাদ আসিল। অতিথিগণকে বিদায় দিবার সময়ে যখন নাটোর সহরের মধ্য দিয়া আমরা রেল ষ্টেশনের দিকে চলিলাম, তখন নগরের যে দৃশ্য আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহাকে মহাপ্রলয় না বলিলেও, খণ্ডপ্রলয় বলিতে কোন বাধা ছিল না, এবং এট্‌না বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাৎকে এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্পের বর্ণনাকে বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া তখন সকলেরই বিশ্বাস হইল।

প্রাচীন গণৎকারগণের কূর্ম্ম বারণ বাসুকীর চাঞ্চল্য ছিল ভাল—যাহা নিতম্বিনীগণের শঙ্খ চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যাইত। কিন্তু জীবনে দুইবার যাহা দেখিয়াছি, তাহা গণৎকারগণের সর্ব্ব গণনার অতীত এবং নিতম্বিনীগণের শঙ্খস্বননেরও সাধ্যায়ত্ত নহে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

অলকা

(গল্প)

কলিকাতার কোনও ছাত্রাবাসের একটী কক্ষে একদিন অপরাহ্ণকালে বিনোদবিহারী নামক একটী যুবক তাহার কেওড়া কাঠের তক্তপোষ খানির উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কড়িকাঠ গণনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের ঘড়িতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিল। ভৃত্য আসিয়া ঘরে ঘরে বাবুদের নিকট হইতে জলখাবারের ফরমাস ও পয়সা লইতে লাগিল; কিন্তু বিনোদের নিকট সে আসল না; কারণ মাসখানেক হইতে, "অম্বল" হওয়ার অজুহাতে বাজারের খাবার খাওয়া বিনোদ ছাড়িয়া দিয়াছে।

সাড়ে চারিটা বাজিলে ভৃত্য খাবার লইয়া আসিল। অন্যান্য ছাত্রেরা খাবার খাইতে লাগিল; কেহ কেহ তদুপরি চা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। "পাণ নিয়ে আয়," "সোরাইয়ে জল রাখিস্‌নি!" প্রভৃতি শব্দে বাসা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদ সেই ভাবেই শুইয়া আছে। শুইয়া শুইয়া সে কেবল আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছে।

বেচারী বিনোদ বড়ই বিপন্ন। তাহার বাড়ী কুমিল্লা জেলার কোনও গ্রামে। আজ প্রায় দুইমাস কাল তাহার বাড়ী হইতে না আসিয়াছে টাকাকড়ি, না কোনও চিঠি-পত্র। মা বাপ বাঁচিয়া নাই, খুড়া মহাশয় বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে নায়েবী কর্ম্ম করেন, অবস্থা ভালই। টাকাকড়ি এতদিন নিয়মিত ভাবেই ত তিনি পাঠাইতেন, হঠাৎ এ কি হইল? পূজার ছুটি হইতে আর দুই সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব আছে! কলেজের বেতন দুইমাস বাকী পড়িয়াছে, আগামী কল্য তাহা দাখিল করিবার শেষ দিন,—না পারিলে, সে 'ডিফল্টার' হইয়া যাইবে, লেকচারে উপস্থিত থাকিলেও প্রতিদিন তাহাকে 'অ্যাবসেণ্ট' করিবে, হয়ত পার্সেণ্টেজ নষ্ট হইয়া যাইবে—একটা বৎসরই মাটি! মেসের টাকার জন্য ম্যানেজার বাবু ত নিত্য অপমান করিতেছেন। এই দুইমাসে, বন্ধুগণের নিকট ১০।১২৲ ধার হইয়াছে। ছুটীতে তাহারা বাড়ী যাইবে, জিনিষপত্র কিনিবে, তাহারাও টাকার জন্য তাগাদা লাগাইয়াছে। বাড়ী নিকটে নয়, তথাপি টিকিট কিনিবার টাকা থাকিলে একবার না হয় গিয়া খোঁজ লইয়া আসিত যে ব্যাপারটা কি; তাহারও উপায় নাই। গ্রামস্থ দুইজন বন্ধুকেও বিনোদ পত্র লিখিয়াছে, তাহারাও কোনও জবাব দেয় নাই।

পাঁচটা বাজিল। অন্যান্য ছাত্রগণ কেহ বায়স্কোপ দেখিতে, কেহ গোলদীঘি বা গড়ের মাঠে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। বিনোদ তখন উঠিয়া, সোরাই হইতে জল ঢালিয়া মুখ হাত ধুইয়া, ঢকঢক্ করিয়া সেই জল খানিকটা খাইয়া জঠরানল নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর জামাটি গায়ে দিয়া, বাসা হইতে প্রাপ্য পাণ দুইটি মুখে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। বড় রাস্তায় পড়িয়া সে উত্তরদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গ্রামস্থ এক ভদ্রলোক গোয়াবাগানে থাকিয়া কবিরাজী করেন, বিনোদকে স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি যদি গোটা কতক টাকা ধার দেন তবে আগামী কল্য কলেজের বেতনটা সে দাখিল করিতে পারিবে। সেই আশাতেই বিনোদের এই অভিযান।

যথাসময়ে সে গোয়াবাগানে কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। দেখিল, বৈঠকখানা জনশূন্য। গামছা কাঁধে, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এক ভৃত্য-বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবিরাজ মশায় বাড়ী আছেন?

বালক বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি আঁশ্‌ফি গিয়েছেন

বিনোদ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাঁচি? রাঁচি কোথা রে? সেখানে কি জন্যে গেছেন?"

বালক বলিল, "উগী দেখতে গেছেন।"

বিনোদবলিল, "ওঃ, রুগী দেখতে রাঁচি গেছেন? ফিরবেন কবে?"

বালক বলিল, "আজ্ঞে, তা কিছু কয়ে যান নি।"

বিনোদ মনে মনে বলিল—"যাক্—এ দফায় তা হলে নিশ্চিন্দি!" একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৈঠকখানা হইতে নামিল। গলি পার হইয়া বীডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই হেদুয়া পুষ্করিণী। অন্যমনস্কভাবে, ধীর পদে, সে হেদুয়ার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।

২

হেদুয়া তীরস্থ বাগানখানির একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা বহুসংখ্যক পেন্সনপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর বৈকালিক বিচরণভূমি। এ সময়ে গোলদীঘির চারিটি ধার যেমন ক্ষিপ্রগামী কলেজের যুবকগণে ভরিয়া যায়, হেদুয়ার তীরদেশে তেমনি মন্থরচরণ বৃদ্ধগণেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এখানে ইহাঁরা কিয়ৎক্ষণ পাদচারণে ক্লান্ত হইলে, কাষ্ঠমঞ্চ নিম্নস্থ বেঞ্চগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া পড়েন। বসিয়া নানা প্রসঙ্গের আলোচনায়, নানাবিধ গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কোনও দিন বা কোনও দল, নিকটস্থ প্রসিদ্ধ তিনকড়ি মোদকের 'কস্তুরী' সন্দেশ আনাইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দে ভক্ষণ করেন।

বিনোদ কিয়ৎক্ষণ ক্লান্তপদে এদিক ওদিক একটু বেড়াইল। কিন্তু দেহেও বল নাই, মনেও উৎসাহ নাই;—সুতরাং শীঘ্রই সে একটি বেঞ্চের প্রান্তভাগ খালি পাইয়া বসিয়া পড়িল। সেই বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, চশমা চোখে দিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিলেন; বিনোদ এক নজর মাত্র তাঁহার পানে চাহিয়া, হেদুয়ার স্নিগ্ধশ্যামল জলরাশির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল।

দিবালোক ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। বিনোদ জলের পানে একদৃষ্টে সেইরূপ তাকাইয়া, আপন সঙ্কটের বিষয় চিন্তা করিতেছে। ক্রমে তাহার পরলোকগত মাতাপিতাকে মনে পড়িল। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে, আজ কখনও এমন ভাবে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইত না। পিতা আগে যান; তাহার পর, এই দুই বৎসর হইল মাতৃদেবীও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মার মৃত্যুশয্যায় বিনোদ উপস্থিত ছিল; সেই দৃশ্য মনে পড়িবামাত্র সে কিছুতেই আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল—সেই বৃদ্ধ বাবুটি কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিতেছেন—"ছোকরা!"

বিনোদ লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, ভারি গলায় বলিল, "আজ্ঞে!"

"কে তুমি, তোমার নাম কি?"

বিনোদ নাম বলিয়া, অবনত নেত্রে বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ অতি কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?"

বিনোদ কথা কহে না।

"বাড়ী কোথা তোমার?"

"কুমিল্লা জেলা।"

"এখানে কি কর? কোথা থাক?"

"ল কলেজে পড়ি। মেসে থাকি।"

"তোমার কি হয়েছে? আমি বুড়ো মানুষ, আমায় বলনা, তাতে লজ্জা কি বাবা!"

এইবার বিনোদ মুখ তুলিল। বাবুটির পানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল; তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না। উন্নতকায় গৌরবর্ণ পুরুষ, হাতের হাড়গুলি মোটা, বক্ষদেশ প্রশস্ত—ইনি যৌবনে একজন বলশালী লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। মাথার চুলগুলির অর্দ্ধেক শাদা হইয়া গিয়াছে। গুম্ফ শ্মশ্রু ক্ষৌরিত; গায়ে শাদা জিনের কোট, পরিধানে থান ধুতি, পায়ে প্যানেলার জুতা, পঠিত বহিখানির ভিতর

একটি আঙুল পুরিয়া, বহিখানি মুড়িয়া হাতে ধরিয়া আছেন। বিনোদ মলাটে সেখানির নাম দেখিল—"ভক্তিযোগ।"

বিনোদকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কুমিল্লা জেলায় বাড়ী বল্লে না? আমি এক সময় কুমিল্লায় ডেপুট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, বোধ হয় তখন তুমি জন্মাও নি। কুমিল্লা জেলায় অনেক স্থানেই আমি টুর করে বেড়িয়েছি। কোন্ জায়গায় তোমার বাড়ী বল দেখি?"

এই বৃদ্ধ পূর্ব্বে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শুনিয়া বিনোদের মনে একটু সম্ভ্রম উপস্থিত হইল। উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমাদের বাড়ী সুবর্ণগ্রামে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সুবর্ণগ্রাম! কৈ মনে করতে পারছিনে।"

অতঃপর তিনি বিনোদকে তাহার পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে এক আধটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার উপস্থিত সঙ্কটের বিষয় সমস্তই অবগত হইয়া বলিলেন, "এই জন্যে তুমি কাঁদছিলে?"

এবার বিনোদের আত্মাভমানে আঘাত লাগিল। সে একটু গর্ব্বিত ভাবেই বলিল "না, সে জন্যে আমি কাঁদিনি! আমার মাকে মনে পড়েছিল, তাই চোখে জল এসেছিল।"

এতক্ষণে দিবালোক প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল। বেঞ্চখানিতে স্থান রহিয়াছে দেখিয়া, অপর দুইটী লোক আসিয়া তথায় উপবেশন করিল। বৃদ্ধ দেখিলেন, সেখানে কথাবার্ত্তার আর সুবিধা হইবে না। বলিলেন, "আমার সঙ্গে তুমি আসবে? কাছেই আমার বাড়ী, বেশী দুর নয়। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যাইতে প্রথমে বিনোদের মনে একটু দ্বিধা উপস্থিত হইল। তার পর সে ভাবিল, "ইনি গুণ্ডাও নন, আমার কাছে টাকা কড়িও নেই—তবে আর ভয়টা কিসের?" বলিল—"বেশ ত, চলুন।"

বৃদ্ধ উঠিয়া ধীরপদে বাগানের বাহির হইলেন, বিনোদ তাঁহার অনুসরণ করিল।

পথে যাইতে যাইতে হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আমার পরিচয় তোমায় এখনও দিইনি। আমার নাম শ্রীকেদারনাথ সরকার—আমরাও কায়স্থ। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করতাম, বছর ৫।৬ হল পেন্সন নিয়েছি। দেশে শরীর ভাল থাকে না, তাই কলকাতাতেই থাকি।"

বিনোদ নীরবে কেদার বাবুর পশ্চাৎ মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া চলিয়া, ক্রমে একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুটি এক বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া, কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর বারান্দা হইতে তরুণী কণ্ঠে শব্দ হইল, "কে?" কেদার বাবু বলিলেন, "আমি, মা—দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

অর্দ্ধমিনিট পরে, দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হইল, "বাবা, আজ যে এত দেরী?" বিনোদ দেখিল লণ্ঠন হস্তে একটী মেয়ে; পিতার সহিত একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

"এই বাবুটির সঙ্গে কথা কইতে কইতে আজ একটু দেরী হয়ে গেল মা। এস হে বিনোদ।"—বলিয়া কেদার বাবু ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

বিনোদ প্রবেশ করিলে, কেদার বাবু দরজায় খিল বন্ধ করিলেন। মেয়েটি লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল, দুইজনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি উঠিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন—মেয়েটি অপর দিকে চলিয়া গেল। বিনোদ দেখিল কক্ষটি ক্ষুদ্র—তাহার এক পার্শ্বে একটা তক্তপোষের উপর ফরাস বিছানা পাতা, তাহার উপরে দুইটা তাকিয়া বালিস অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট দুইখানি চেয়ার। কেদার বাবু বিনোদকে সেই তক্তপোষের উপর বসাইয়া ডাকিলেন—"রাধে!"

বিনোদ মনে করিয়াছিল, যে মেয়েটি লণ্ঠন দেখাইয়া আনিয়াছিল তাহারই নাম বুঝি রাধে। কিন্তু দেখিল, সধবাবেশিনী গৌরবর্ণা নাতিস্থূলা এক রমণী, বয়স বোধ

হয় চল্লিশ হইবে, প্রবেশ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার বাবু বলিলেন, "রাধে, এঁর নাম বিনোদবাবু—বিনোদবিহারী দত্ত, আমাদেরই কায়স্থ। ল কলেজে পড়ছেন। আজ হেদোর ধারে আলাপ হল, তাই কথাবার্ত্তা কইবার জন্যে সঙ্গে করে এনেছি।" বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী।"

বিনোদ মনে করিল, "এ ত দেখছি ইংরাজি প্রথার ইন্‌ট্রোডক্‌শন্‌! পর্দ্দাটর্দ্দাও মানেন না বোধ হয়—ব্রাহ্ম না কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "বেশ। এখানেই কি আপনাদের বাড়ী?"

অপরিচিতা রমণীর সঙ্গে কথা কহিতে বিনোদের কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। মাথাটি নীচু করিয়া সে সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল।

কেদার বাবু বলিলেন, "রাধে, আমাদের একটু চা দিতে পার?—আর, এঁর জন্যে কিছু জলখাবার?"

রমণী বলিলেন, "চায়ের জল ত তৈরি নেই, চড়িয়ে দিই গে। জলখাবার আগে নিয়ে আসবো কি?"

কেদার বাবু বিনোদের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আগে খাবারটা খেয়ে নাও, কি বল? ততক্ষণ চা হোক্‌।"

বিনোদ তাড়াতাড়ি বলিল, "না না, জলখাবার আমার জন্যে দরকার নেই। শুধু এক পেয়ালা চা হলেই চলবে।"

কেদার বাবু বলিলেন, "তা কি হয়? গৃহস্থের বাড়ীতে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করলে তারা ছাড়বে কেন? চা—সে ত বিলিতী ফাঁকি, জলভাজা বৈ ত নয়!"—বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "যাও, কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও।"—রাধারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণেই পাশের ঘর হইতে ষ্টোভ জলিবার গোঁ গোঁ শব্দ উঠিল। তার পর সেই মেয়েটি একটি কাঁসার রেকাবীতে কয়েক টুকরা ফল এবং দুইটি বড় রসগোল্লা আনিয়া দাঁড়াইতেই কেদার বাবু বলিলেন, "রাখ মা, ঐ টেবিলের উপর রাখ।"

মেয়েটি খাবারের রেকাবী ও জলের গ্লাস টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, কেদার বাবু বলিলেন, "দাঁড়াও মা—এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। বিনোদবাবু, এইটি আমার মেয়ে অলকা। আর দেখ অলকা, ইনি খুব লেখাপড়া শিখেছেন। এম-এ পাস করেছেন, আইন পড়ছেন।"—বলিতেই মেয়েটি বিনোদের পানে চাহিয়া নমস্কার করিল। বিনোদও প্রতিনমস্কার করিয়া ভাবিল, ইহার মার সঙ্গে যে সময় সে পরিচিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাকে নমস্কার করা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা ত ভুল হইয়া গিয়াছে—ছিছি! কেদার বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার মেয়েটিও মুখ্যু নয় বিনোদ বাবু। আসছে বছর ম্যাট্রিক্‌ দেবে—হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ে পড়ে। বাপ হয়ে বলা উচিত নয়,—বেশ বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে।—আচ্ছা, যাও মা, দেখ দেখি চায়ের জল হল কি না। চল হে বিনোদ, খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নেবে চল। তার পর দুজনে একসঙ্গে চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।"

অলকা চলিয়া গেল। বৃদ্ধ বিনোদকে লইয়া গিয়া টেবিলের নিকট বসিলেন। খাবার খাইয়া, শীতল জল পান করিয়া বিনোদের দেহে যেন প্রাণ আসিল।

চা পান করিতে করিতে কেদার বাবু বলিলেন, "দেখ বিনোদ, তুমি যে বিশেষ রকম অর্থসঙ্কটে পড়েছ, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তোমার কলেজের দু মাসের মাইনে, মেসের পাওনা, আর, ধার শোধ করা, গোটা পঞ্চাশ টাকা এখনই তোমার প্রয়োজন। এ টাকা আমি এখনই তোমায় দিতে পারি। কিন্তু সেটা দানস্বরূপ হলে, তোমার তা কখনই ভাল লাগবে না। সেই জন্যে আমি প্রস্তাব করছি, তুমি আমার মেয়েটিকে দু'মাস পড়াও—তোমায় দু' মাসের বেতন স্বরূপ অগ্রিম ৫০৲ আমি তোমায় দিচ্ছি। কেমন, তুমি রাজি আছ?"

বিনোদ প্রায় একমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিয়া

ভাবিতে লাগিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ পড়াতে হবে? কখন?"

কেদার বাবু বলিলেন, "বিকেল বেলা একঘণ্টা। এই, চারটে থেকে পাঁচটা, কিম্বা পাঁচটা থেকে ছ'টা, যেমন তোমার সুবিধে হয়। তোমার কলেজ কখন?"

"সকাল বেলা। আর, এ ক'টা দিন পরে ত কলেজের ছুটিই হয়ে যাচ্চে।"

"তা হলে, তোমার মত কি বল।"

বিনোদ বলিল, "আপনি যখন এই সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করছেন—আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করলাম।"

"আচ্ছা বেশ। তা হলে কাল থেকেই এস। ইংরেজি সংস্কৃত আমি নিজেই ওকে পড়াই। এই সন্ধ্যের পর, চা খেয়ে ওকে নিয়ে রোজ বসি। বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত অঙ্কটা তুমি কষিও—অঙ্কে ও একটু কাঁচাই আছে। বস, টাকাটা আমি নিয়ে আসি।"—কয়েক মিনিট পরেই পাঁচখানি নোট আনিয়া তিনি বিনোদের সম্মুখে রাখিলেন।

বিনোদ টাকা কয়টি উঠাইয়া লইল। নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া, নমস্কারান্তে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌছিয়া দেখিল, দেশ হইতে তাহার এক বন্ধুর পত্র আসিয়াছে। যে জমিদারের এষ্টেটে তাহার খুড়া মহাশয় চাকরি করিতেন, সেই জমিদার কর্ত্তৃক আনীত তহবিল তছরুপের মোকর্দ্দমায় তাহার খুড়া মহাশয়ের দেড় বৎসর জেল হইয়া গিয়াছে। পত্র পড়িয়া বিনোদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল খুব সময়েই কেদার বাবুর ন্যায় দয়ালু পরোপকারী মহাত্মার দর্শন সে পাইয়াছিল, নহিলে ত তাহাকে অথই জলে পড়িতে হইত!

৩

পরদিন বিনোদ তাহার নূতন ছাত্রীকে পড়াইতে গেল। কেদার বাবু অধ্যাপনা সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া, তাঁহার নিয়মিত হেদুয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পাঁচটা বাজিলে, অলকার মা তাহাকে চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, অবশেষে জলযোগ সমাপনান্তে বিনোদ বাসায় ফিরিয়া আসিল।

এইরূপ দিনের পর দিন চলিতে লাগিল—এবং এ বয়সে এরূপ সান্নিধ্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিনোদের প্রথমে মনে হইল, তাহার ছাত্রীর স্বভাবটি বড় মধুর! তার পর মনে হইল তাহার দেহের গঠন—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি—বড়ই সুন্দর; মেয়েটি যেরূপ রূপবতী, বাঙ্গালীর ঘরে সেইরূপ সচরাচর দেখা যায় না। তার পর মনে হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বরটি বড় মিষ্ট, শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা করে। তার পর মনে হইতে লাগিল, এ মেয়ে যাহার গৃহলক্ষ্মী হইবে, তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ পুরুষ এ জগতে দুর্লভ। তাহার পর বিনোদ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসিল, অলকাকে সে অতিশয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কেন না, যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, তাহার চিন্তা এক দণ্ড মন হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহাকে ত চাই—নহিলে জীবনটা যে একান্ত বিস্বাদ হইয়া যাইবে। এখন উপায়? এ অবস্থা, পনেরো দিনের মধ্যেই উপস্থিত হইল।

এ পর্য্যন্ত কিন্তু সে অলকার কাছে নিজ মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করে নাই। পড়ার সময় অলকার মা প্রায়ই আসিয়া কাছে বসিতেন। কেদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ সবদিন তাহার হইত না; কারণ যে সময় সে অলকাকে পড়ায়, সেই সময়টা তাঁহার হেদুয়ায় ভ্রমণের সময়।

মাসখানেক পরে একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, অলকা বাড়ী নাই; তাহার পিতা তাহাকে একটা ইংরাজি থিয়েটরের বৈকালিক অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়াছেন।

অলকার মা আসিয়া, পড়িবার ঘরে বিনোদের কাছে বসিলেন। প্রথমে অলকার পড়াশুনার প্রসঙ্গেই কথাবার্ত্তা হইল; তার পর হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমার ত বয়স হল, বিয়ে থাওয়া করবে না?"

বিবাহের প্রসঙ্গে বিনোদের লজ্জা হইল। সে মাথাটি নীচু করিয়া বলিল, "আমার অবস্থা সবই ত জানেন।"

"অবস্থা কি চিরদিন মানুষের সমান থাকে? আজ বাদে কাল তুমি আইন পাস করবে—অবস্থার কি উন্নতি করতে পারবে না? আচ্ছা, আইন পাস করে' কোথায় তুমি প্র্যাকটিস করবে স্থির করেছ?"

"তা এখনও কিছু স্থির করি নি। প্র্যাকটিস্ করব কি না সন্দেহ। প্রথম দু চার বছর বসে খাবার সংস্থান ত আমার নেই। বোধ হয় আমাকে চাকরির চেষ্টাই করতে হবে।"

রাধারাণী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমাকে দেখে অবধি, একটা বাসনা আমার মনে উদয় হয়েছে। আমার ইচ্ছে হয়, তোমাকে আমার পুত্রস্থানীয় করি। তুমি আমার অলকাকে বিয়ে কর না কেন।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া, বিনোদ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। কিন্তু লজ্জায় তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। জড়িত স্বরে বলিল, "সে ত আমার আশাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু, এখন আমার অবস্থা কি তা তো আপনি জানেন। কেদার বাবু কি আমার মত একজন নিঃস্ব লোককে তাঁর জামাই করতে সম্মত হবেন?"

রাধারাণী হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি যদি রাজি থাক ত বল; কর্ত্তার সম্মতি আদায় করে' নেবার ভার আমার উপর রইল। তবে সব কথা তোমায় ভেঙ্গেই বলি বাবা, লুকোছাপির কোনও দরকার নেই। আমি এখন তোমার কাছে যে প্রস্তাব করলাম, তা ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি। ওঁরও খুব ইচ্ছে যে তোমার হাতে মেয়েটিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।"

বিনোদ অধোবদনে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল। পরে বলিল, "কিন্তু দেখুন, আর একটা কথা আছে। আমি উপার্জ্জনক্ষম না হলে ত—"

রাধারাণী বলিলেন, "কর্ত্তা পূর্ব্বে একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটি ছিলেন, তা বোধ হয় তুমি শুনেছ। র প্রথম পক্ষের তিনটি ছেলে, একটি ঢাকায় ওকালতী করছে, আর দুজন ভাল করে' লেখাপড়া শিখলে না, তারা দেশে থাকে, বিষয় সম্পত্তি দেখে। চীফ সেক্রেটারী সাহেব ওঁকে খুব ভালবাসেন। কর্ত্তা সেদিন বলছিলেন, সাহেবকে আমি বলে' রেখেছি ছেলেদের জন্যে আমি ত কিছু চাইলাম না, আমার যে জামাই হবে তাকে একটি ডেপুটিগিরি দিতে হবে। সাহেব বলেছেন, আচ্ছা। সেদিন সাহেবের সঙ্গে উনি দেখা করতে গিয়েছিলেন, সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মেয়ের বিয়ে হল? উনি বল্লেন, না, মেয়ে এখনও পড়ছে, আর কিছুদিন পরে বিয়ের চেষ্টা করবো। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মেয়ের কত বয়স হয়েছে? উনি বল্লেন, সতেরো শুনে সাহেব ভারী খুসী। বল্লেন, তুমি যে মূঢ় দেশাচারের ভয়ে অন্যান্য লোকের মত ছোট বয়সে মেয়ের বিয়ে দাও নি, লেখাপড়া শেখাচ্চ, এতে তোমার খুব সৎসাহস প্রকাশ পাচ্চে। তোমার যে জামাই হবে সে যদি বি-এ পাস হয়, তবে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, লাটসাহেবকে বলে' নিশ্চয় আমি তাকে ডেপুটি করে' দেবো। তাই আমি বলি কি বাবা, তুমি ত নিজেই নিজের কর্ত্তা, কারু মতামতের অপেক্ষা ত তোমায় রাখতে হবে না, আর বেশী দেরী না করে' এই সামনে অঘ্রাণ মাসেই শুভ কর্ম্মটা হয়ে যাক।"

বিনোদ মনে মনে ভাবিল, "একেই বলে, বিধাতা যখন মাপায়, তখন উপরোউপরি চাপায়। আধঘণ্টা আগে অলকাকে পাবার আশাই আমার পক্ষে, বামনের চন্দ্রস্পর্শের মত দুরাশা ছিল—আর এখন শুধু অলকা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটিগিরি ফাউ!"

বলা বাহুল্য বিনোদ সানন্দে সম্মতি জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রাধারাণীর বারম্বার অনুরোধসত্ত্বেও জলখাবার পর্য্যন্ত সে আজ খাইল না। ক্ষুধা বলিয়া কোন জিনিষ যে পৃথিবীতে আছে, তাহা আজ সে যেন অনুধাবন করিতেই পারিল না।

৪

কেদার বাবুর বাসা হইতে বাহির হইয়া বিনোদের

মনে হইল, চলিতে তাহার পা দুখানা যেন ধূলিমলিন রাজ-পথে মোটেই ঠেকিতেছে না—সে যেন হাওয়ার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার মাথার ভিতর হইতে যেন আগুন ছুটিতেছে। নিকটে হেদুয়া পুষ্করিণী পাইয়া, ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা একটু ঠিক করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে তত্তীরস্থ বাগানে প্রবেশ করিল। একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল; কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। উঠিয়া, দুই তিন বার হেদুয়াকে প্রদক্ষিণ করিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; একবার মনে হইল বাসায় যাই। কিন্তু ছুটিতে বাসা এখন খালি, একলা সেখানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকা অত্যন্ত অসহ্য হইবে; রাত্রে যে ঘুম হইবে এমন আশাও দেখা যাইতেছে না। আজ শনিবার, তার চেয়ে বরং কোনও থিয়েটরে গিয়া বসিলে, রাত্রি দুইটা অবধি একরকম করিয়া কাটিয়া যাইবে। পকেটে টাকা ছিল; বিনোদ বাহির হইয়া বীডন ষ্ট্রীটের এক থিয়েটরে গিয়া প্রবেশ করিল।

দুইটা অঙ্ক হইয়া গেলে, বিনোদ বিলক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করিল। বাহির হইয়া, একটা দোকানে লুচি ডিম ও চপ খাইয়া, হাত ধুইয়া চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় তাহার এক বন্ধু প্রকাশ বাবু সেখানে দর্শন দিলেন। ইনি একসময় বিনোদের সহপাঠী ছিলেন, বি-এ পাস করিয়া, শ্বশুরের সুপারিশে সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি চাকরি পাইয়াছেন। ইহাঁকে দেখিবামাত্র বিনোদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—প্রকাশকে স্বজাতীয় এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া তাহার মনে হইল। মনে মনে বলিল, "তুমিও শ্বশুরের কৃপায় ডেপুটি—আমিও তাই।"

অভিনয় শেষে বাহিরে আসিয়া উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ বলিল, "এত রাত্রে বাসায় গিয়ে কি করবে? কাছেই আমার শ্বশুরবাড়ী, সেইখানে কিছু খেয়ে, বৈঠকখানার শুয়ে থাকবে চল।" অনেক দিনের পর বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ, বিনোদ সহজেই সম্মত হইল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে, বৈঠকখানায় শয্যার উপর বসিয়া উভয় বন্ধুতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এ কথা সে কথার পর, প্রকাশ বলিল, "কার মেয়েকে পড়াচ্ছ বলছিলে? কেদার সরকার কে?"

"আগে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এখন পেন্সন নিয়েছেন।"

প্রকাশ বলিল, "ওঃ, ডেপুটি কেদার সরকার? তাই বল! তাঁকে ত আমি জানি—অর্থাৎ অন্যান্ত ডেপুটিদের কাছে তাঁর সব খবরই শুনেছি। তিনি একজন প্রথম গ্রেডের ডেপুটী ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন ত?"

বিনোদ বলিল, "হ্যাঁ, তিনি।"

প্রকাশ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই তিনি। তাঁর সেই অবিদ্যাটিকে নিয়ে এইখানেই আজকাল আছেন বুঝি?"

ইহা শুনিয়া বিনোদ চমকিয়া উঠিল। বলিল, "অবিদ্যা কি রকম?"

প্রকাশ বলিল, "কেন হে, অবিদ্যা শুনে তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? তুমি তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করবার মৎলব টৎলব করেছ না কি?" বলিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

বিনোদ নিজেকে কতকটা সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "না, তুমি বোধ হয় ঠিক জান না। তুমি যা বলছ, তাঁদের আচার ব্যবহারে সে রকম কোন লক্ষণই ত কোনও দিন দেখিনি আমি।"

প্রকাশ বলিল, "এখন আর কি লক্ষণ দেখবে? এ বয়সে কি আর ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচবে? এখন যে—তপস্বিনী!"

বিনোদ ক্ষীণভাবে বলিল, "তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ। আমার ত তা মনে হয় না।"

প্রকাশ বলিল, "না হে আমি খুব জানি। শুনেছি ওঁর স্ত্রী মারা গেছে অনেক দিন হল। সে যাক্—তুমি ও প্রাইভেট ট্যুসনি জোটালে কি রকম ক'রে বল দেখি?"

বিনোদ তখন তাহার ট্যুসনি জুটিবার ইতিহাসটুকু বলিল। গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহা গোপন রাখিল।

শুনিয়া প্রকাশ হাসিতে লাগিল। বলিল, "উঃ, বুড়ো কি কম চালাক! কেমন কৌশলটি করেছে দেখ। যুবতী মেয়েটা, তাকে পড়াবার জন্যে, চব্বিশ বছরের একজন অবিবাহিত যুবক ছাড়া আর অন্য মাষ্টার খুঁজেই পেলে না! শাস্ত্রের কথা ঘি আর আগুন—বেশ জানে, কিছুদিনেই দুজনে দুজনার প্রেমে হাবুডুবু খাবে; তখন তুমি বলবে ওকেই আমি বিয়ে করব,—জাত্-ফাৎ আমি ডোণ্টো কেয়ার করি। আচ্ছা, তোমায় গাঁথবার জন্যে মেয়েটাও বোধ হয় খুব উঠে পড়ে লেগেছে?"

তখন অলকার সরলতা মণ্ডিত শান্ত সংযত সুন্দর মুখখানি বিনোদের মনে পড়িল। একটু উষ্মার সহিতই সে বলিল, "ছিঃ—একমুহূর্ত্তের জন্যেও সে তা করে নি।"

প্রকাশ বলিল, "করে নি, করবে। এই ত সবে মাসখানেক যাতায়াত করছ বৈত নয়! আগে লোহা বেশ করে' লাল হোক, তখন ত পিটবে। সাধু সাবধান! আচ্ছা, রাত প্রায় পুইয়ে এল, এখন তুমি একটু শোও ভাই। আমিও কিঞ্চিৎ নিদ্রার চেষ্টা দেখি।" —বলিয়া প্রকাশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

৫

বাকী রাতটুকু বিনোদ ছটফট করিয়াই কাটাইল—নিদ্রাদেবীর কৃপালাভের জন্য সে একটুও ব্যস্ত ছিল না। আর একটু হইলেই ত না জানিয়া সে একজন ভ্রষ্টা রমণীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছিল! ছি ছি, তাহা হইলে কি কেলেঙ্কারিটাই হইত বল দেখি! কেদার বাবুর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

তিনি যে বাড়ী লইয়া গিয়া জলখাবার খাওয়াইয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিলেন, সেটা তবে দয়াধর্ম্মের অনুরোধ নহে, তাহা স্বার্থপরতা-প্রসূত একটা গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র! দেশ হইতে এখন খুড়িমা তাহাকে দুইমাসের টাকা পাঠাইয়াছেন। বিনোদ ভাবিল, কেদার বাবুর পঞ্চাশ টাকাই সে মণি অর্ডার যোগে তাঁহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে, এবং কুপনে লিখিয়া দিবে, সমস্তই সে জানিতে পারিয়াছে—ধর্ম্মভ্রষ্টার কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না—ডেপুটিগিরির লোভেও নয়।

কিন্তু অলকার মুখখানি মনে পড়িবামাত্র, তাহার বুকের মধ্যে দারুণ বেদনা বাজিয়া উঠিল। অলকার মা বাপের অপরাধ যতই গুরু হউক, অলকার কি দোষ? হয়ত সে জানেও না যে তাহার জনক জননীর সম্বন্ধটা অবৈধ—অপবিত্র। আর পাঁচজনের মা বাপ যেমন, তাহার মা বাপও তেমনি, ইহাই সম্ভবতঃ বালিকার বিশ্বাস। তবে, তাহার কি অপরাধ? অলকার মা যাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়—তাহা সত্যই ত! সে বিষয়ে বিনোদের মনে ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—তবে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যানে—এই অপমানে তাহার বুকটি কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না? একজনের অপরাধে আর একজন সম্পূর্ণ নিরীহ প্রাণীকে শাস্তি দেওয়া কি ঘোর অধর্ম্ম নহে? আর, শুধুই কি তাহাকে শাস্তি দেওয়া? নিজেকেও ত সেই শাস্তি চিরজীবন ভোগ করিতে হইবে। এই আত্মনির্য্যাতনই বা কিসের জন্য?

কিন্তু এ ভাব তাহার মনে বেশীক্ষণ আধিপত্য করিতে পারিল না। কেদার বাবুর উপর আবার তাহার বিষম রাগ হইতে লাগিল;—কেন তিনি এরূপ ভাবে তাহাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিলেন? তাঁহাকে মহদন্তঃকরণ লোক বলিয়াই ত ধারণা ছিল—কিন্তু তিনি এত নীচ—ছিছিছি!

বিনোদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"এইবার বুঝতে পেরেছি, হিন্দুঘরের অতবড় মেয়ের এতদিন বিবাহ হয়নি কেন।—এইবার বুঝতে পেরেছি, দেশে কেন বাবুর থাকা হয় না—ছেলেরাই বা অন্য যায়গায় থাকে কেন। বুড়ো মিন্সে—ছি ছি। আবার 'ভক্তিযোগ' পড়া হয়!"

এই মত নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোর হইয়া আসিল; কাক ডাকিতে লাগল। ভোরের শীতল বায়ু জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বিনোদকে তন্দ্রাতুর করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা হরণ করিল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাহিরে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে. প্রকাশ বিছানার পাশে বসিয়া তাহাকে জাগাইতেছে—"ওহে ওঠ ওঠ—বেলা হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে ফেল, চা তৈরি।"

৬

বন্ধুগৃহে চা পানান্তে বিনোদ তাহার মেসের বাসায় প্রবেশ করিবামাত্র ভৃত্যের নিকট শুনিল, এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে তাহার ঘরে বসিয়া তাহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। চেহারা ও পোষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যাহা উত্তর পাইল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল, কেদার বাবু আসিয়াছেন। মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল ভাবিল, "জোচ্চোর বেটা! এসেছেন বোধ হয় তাড়াতাড়ি একটা দিনস্থির করে ফেলাবার মৎলবে—শেষে আসল কথা প্রকাশ পেয়ে সব ফেঁসে না যায়! আচ্ছা করে' দুকথা শুনিয়ে দিচ্চি গিয়ে দাঁড়াও।"

হঠাৎ তাহার মনে এইরূপ বীররসের আবির্ভাব হওয়া ত, সিঁড়িগুলোকে সজোরে লাথি মারিতে মারিতে সে উপরে উঠিয়া গেল। দ্বিতলে নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া, কেদার বাবুর মূর্ত্তি দেখিবামাত্র তাহার বীরত্ব কিন্তু অনেকখানি উবিয়া গেল। কেদার বাবুর চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত প্রশান্ত মুখমণ্ডলে যেন কি একটা বেদনার স্পষ্ট ছায়া—দেখিয়া বিনোদ কতকটা থতমত খাইয়া গেল। সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনি!—আপনার শরীর কি ভাল নেই?"

কেদার বাবু বলিলেন, "না বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। বস। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

বিনোদ সংক্ষেপে বাসা হইতে গতরাত্রে তাহার অনুপস্থিতির কারণ বলিল।

কেদার বাবু বলিলেন, "আমি কাল বিকেলে অলকাকে এম্পায়ারে ম্যাকবেথ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে ত তুমি শুনেই এসেছ। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে, আমার স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনলাম।"

বিনোদ মনে মনে বলিল, "স্ত্রী! স্ত্রী বৈকি! ভণ্ডামি দেখে আর বাঁচিনে!"

কেদার বাবু বলিলেন, "সকল কথা শুনলাম। শুনে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। আমার স্ত্রী একটু অন্যায় করেছেন। তিনি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমার কাছে গোপন করেছেন। তাই দুশ্চিন্তায় সারারাত আমার ঘুম হয় নি। সেই বিষয়টি তোমায় জানাবার জন্যেই—"

বিনোদের মনে হইল, তবে ত প্রকাশ যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে। এই বৃদ্ধ লম্পট নিজ মুখে সে কথা স্বীকার করিতেও লজ্জানুভব করিতেছে না!

সে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, বৃথা আপনি কষ্ট করেছেন। আপনার বাড়ী থেকে চলে আসবার পর, ঘটনাক্রমে সে সকল কেচ্ছাই আমি জানতে পেরেছি। আপনার সেই মেয়েমানুষটিকে বলবেন—"

বৃদ্ধ হঠাৎ তীব্রবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, ঘূর্ণিতলোচনে বলিলেন, "খবর্দ্দার!"—বলিয়া তিনি রাগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

বিনোদ গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল, "কেন? মারবেন না কি? মশাই, আপনাকে আমি স্পষ্ট কথা বলি। আপনি আমায় ডেপুটীই করে দিন আর লাট সাহেবই করে দিন, আপনার ঐ মেয়েকে বিবাহ করে' আমি সমাজচ্যুত হতে প্রস্তুত নই।"

কেদার বাবু এবার অপেক্ষাকৃত সংযত স্বরে বলিলেন, "উত্তম কথা! কিন্তু এই কথাই তুমি ভদ্রভাবে বলতে পারতে। তুমিও জেনো, তোমার মত এমন অসভ্য দুর্ব্বিনীত চাষাকে মেয়ে দিতেও আমি প্রস্তুত নই।"—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

৭

কেদার বাবু চলিয়া গেলে, বিনোদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া রহিল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, দশটা বাজে, কলের জল চলিয়া যাইবে,

এইবেলা স্নান করিয়া লইলে হইত। বিনোদের মাথাটা ঘুরিতেছিল, একটু শীতল জলের আকাঙ্ক্ষায়, সে স্নান করিতে নামিয়া গেল। কলের নীচে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে স্নান করিল। স্নান করিয়া খাইতে বসিল, কিন্তু খাইতে পারিল না।

কাল প্রায় সারারাত অনিদ্রায় কাটায়াছে। শয্যায় গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল ন। কেবলই মনে হইতে লাগিল, "অলকাকে হারাইলাম। কি করিব, উপায় কি? এ অবস্থায় কেমন করিয়া তাহাকে বিবাহ করি? কিন্তু "কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্", "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলা-দপি"—আহরণ করিয়া লইতে দোষ নাই ইহাও প্রাচীন নীতিবচন। রাগের মাথায় বুড়াকে ওরূপভাবে অপমান করিয়া অন্যায় করিয়াছি। সেটা ভাল হয় নাই। নীতি ও ধর্ম্ম সকলের এক নয়—এমন হইতে পারে, ওরূপ কার্য্যকে তিনি কিছুমাত্র অন্যায় বা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না। শালগ্রাম শিলা সম্মুখে রাখিয়া মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হয় নাই বলিয়াই যে সে মিলন সর্ব্বদোষের সর্ব্বপাপের আকর, এমন নাও হইতে পারে। সে আকরে, অলকার ন্যায় সুপবিত্র শুভ্রসুন্দর ফুলটীর উদ্ভব হইয়াছে ত!—সে ফুল, বুকের কাছাকাছি পাইয়াও আমি হারাইলাম—আমার অদৃষ্টে ধিক্।"

তক্তপোষের উপর এ পাশ ও পাশ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তায় বিনোদ বেলা চারিটা অবধি কাটাইল। তখন উঠিয়া ভাবিল, হেদুয়ার ধারে এতক্ষণ কেদার বাবু বেড়াইতে আসিয়াছেন—যাই, ওবেলার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া আসি।

জামা পরিতে গিয়া, তক্তপোষের নিম্নে নজর পড়িল, একখানা ইংরাজি খবরের কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানি তুলিয়া লইয়া দেখিল, ১৯ বৎসর পূর্ব্বে লাহোর হইতে প্রকাশিত **Arya Patrika** সংবাদপত্র। কেদার বাবুর হাতে আজ সকালে একখানা খবরের কাগজ বিনোদ দেখিয়াছিল—তিনিই তবে এখানা ফেলিয়া গিয়াছেন। কৌতূহল বশতঃ কাগজের ভাঁজ খুলিতেই একটা সংবাদ তাহার চোখে পড়িল। সেটী আগাগোড়া বিনোদ পড়িল। পড়িয়া, জামা গায়ে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বড় রাস্তায় পড়িয়া, হেদুয়ার দিকে প্রায় ছুটীয়াই সে চলিতে লাগিল। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া, বাড়ীর দিকে চলিল। কেদার বাবুর বাড়ীতে পৌছিয়া, উপরের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি বসিয়া অলকাকে পড়াইতেছেন। বিনোদকে দেখিয়া অলকা তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কেদার বাবু সবিস্ময় বিরক্তিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বিনোদ সহসা কেদার বাবুর পা দুটী জড়াইয়া ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "আমায় মাফ্ করতে হবে। আজ সকাল বেলা আপনার প্রতি যে আচরণ আমি করেছি, তা নিতান্ত একটা ভুল সংবাদ শুনেই করেছিলাম। এই খবরের কাগজখানি আমার ঘরে আপনি ফেলে এসেছিলেন—এইটে পড়েই আমার সেই বিষম ভুল বুঝতে পারলাম আমায় আনায় পুত্রস্থানীয় বলে' গ্রহণ করুন আর না করুন, আমার অজ্ঞানকৃত সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।"

কেদার বাবু সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কেন, কেন? তুমি কি শুনেছিলে বল দেখি? কার কাছেই বা শুনলে?"

বিনোদ লজ্জায় অধোবদনে রহিল। তখন, প্রাতে বিনোদ কর্ত্তৃক উচ্চারিত একটা কথা কেদার বাবুর মনে পড়িয়া গেল। ব'ললেন, "ওঃ—বুঝতে পেরেছি। সব কথা শোন তা হলে। আমার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, ছেলেদের মামার বাড়ী পাঠিয়ে আমি ছ'মাসের ফার্লো নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। লাহোরে এসে, অলকার মার সঙ্গে আমার আলাপ হয়—উনি পাঞ্জাবী কায়স্থের মেয়ে ছিলেন। বাঙ্গালী কায়স্থে পাঞ্জাবী কায়স্থে বিবাহ বাঙ্গলা দেশের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অনুমোদন করবেন না জেনে, সেই দেশেই আর্য্যসমাজের আশ্রয়ে আমি ওঁকে বিবাহ করি। আর্য্য-সমাজীরাও হিন্দু, কারণ তাঁরা বেদকে অভ্রান্ত বলেই স্বীকার করেন। ছুটী ফুরালে, আমি যখন অলকার

মাকে নিয়ে কর্ম্মস্থানে ফিরে আসি, তখনও উনি বাঙ্গালা শেখেন না। ওঁকে অ-বাঙ্গালী দেখে, কুলোকে আমার নামে সে সময়ে মিথ্যা গুজব রটিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি কোনও দিন তা গ্রাহ্য করিনি। অলকার মা বাঙ্গালী কায়স্থ নন, আর আমাদের বিবাহে বাঙ্গালী ভট্টাচার্য্য পৌরোহিত্য করেন নি, এই কথাটা আমার স্ত্রীর উচিত ছিল কালই তোমায় জানানো। সমস্ত জেনে শুনে যদি তুমি অলকাকে বিবাহ কর ত করবে, নচেৎ তোমায় ঠকিয়ে জামাই করা আমি উচিত মনে করিনে। সেই কথা জানাতেই আজ আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম।'—তুমি একটু বস, অলকার মাকে সব কথা আমি বলে আসি; কারণ সকাল বেলাকার ঘটনা শুনে বাড়ীসুদ্ধ সবাইকের মন খারাপ হয়ে রয়েছে।"

সকলের মনই ভাল হইয়া গেল। বিনোদ ও অলকার মন, সকলের চেয়ে বেশী ভাল হইল। অগ্রহায়ণ মাসে, এই দুই জনের মন এত ভাল হইল যে, সোহাগে গলিয়া আদরে মিশিয়া দুইটী মন একটী হইয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মেঘের তরী

নীল আকাশে চল্‌ছে ভেসে
মেঘের তরীখানি,
উধাও হয়ে আপন মনে,
কোথায় নাহি জানি—
কোথায় গিয়ে ভিড়বে শেষে
কিসের আশে ধায়?

নাই কিনারা আপন হারা
চলেই শুধু যায়—
নাইকো পাল, নাইকো হাল,
চলছে দুলে দুলে,
কূল পাবে কি অসীম মাঝে
কোন সাগরের কূলে?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সাহিত্য-সমাচার

শোকসংবাদ

৺মতিলাল ঘোষ।

"অমৃতবাজার পাত্রিকা"র সম্পাদক বিখ্যাত মনস্বী ও তেজস্বী লেখক মতিলাল ঘোষ মহাশয় বিগত ১৯শে ভাদ্র তারিখে মঙ্গলবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই পীড়ায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র (৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) পীযূষকান্তি বাবুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মতি বাবু এখন কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায় পীযূষ বাবু বলিয়াছিলেন, "এখন অবস্থা একটু ভাল দেখা যায়; বোধ হয় এ যাত্রা কাকা মহাশয় সামলাইয়া উঠিলেন।" কিন্তু হায়, দুইটী দিন না যাইতেই আত্মীয় বন্ধুগণের বুকে শেল হানিয়া, দেশবাসীকে কাঁদাইয়া মতিলাল পরপারের যাত্রী হইলেন। তাঁহার ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। শুধু বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ আজ তাঁহার শোকে অভিভূত।

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লক্ষ্মী মেয়ে

(চিত্রকর—শ্রীসুনালচন্দ্র দত্ত)

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩২৯ | ২য় খণ্ড ৩য় সংখ্যা

১. নবদ্বীপ

(নদীয়া শাখা সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ)

স্নেহে মানুষ অন্ধ হয় এই প্রবাদবাক্য চিরকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা যে সত্য তাহার প্রমাণ আজ যেমন করিয়া পাইলাম, ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তেমন করিয়া পাই নাই। যে উচ্চাসনে আজ আমাকে আপনারা স্থাপিত করিয়াছেন, যোগ্যতা বিবেচনা করিলে আমি যে ঐ আসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। যে মুহূর্ত্তে আপনাদের আহ্বান আমার নিকটে পঁহুছিল তখন হইতেই চিন্তা করিতেছি, উপস্থিত কার্য্যের জন্য আমার ন্যায় অকিঞ্চনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল কেন। স্নেহ ভিন্ন অন্য কোন হেতুই খুঁজিয়া পাই নাই, পাইবার সম্ভাবনাও নাই, এক অহেতুকী প্রীতি ব্যতীত অন্য কোন কথাই মনে আসিল না। স্বীয় অযোগ্যতা জানিয়াও স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না তাই এখানে আসিয়াছি, নতুবা সাহিত্যযজ্ঞের পৌরোহিত্য করিবার মত কোন গুণই আমার নাই তাহা আমি জানি। এখানে আসিবার আরও একটি কারণ আছে। বহুশত বর্ষ ধরিয়া বহু বিদ্বজ্জন পরিসেবিত এই নদীয়া নগরী, কলিকাল-বাল্মীকি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া যাহার অন্তর্গত সেই নদীয়া নগরী, চৈতন্যচন্দ্রের চরণরেণু-পূত এই নদীয়া নগরী, যাহার প্রতি ধূলিকণা বৃন্দাবনের ব্রজ-রেণুর ন্যায় পবিত্র—সেই সর্ব্বজনপূজ্য নদীয়াকে জীবনসন্ধ্যায় আর একবার দেখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি নাই। বৈতরণীর তরণীতে চড়িয়া বসিবার সময় আসিয়াছে, কখন মহাকালের ভৈরব আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার স্থিরতা নাই, ভাবিলাম আজ এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলে জীবনে এরূপ শুভ সুযোগ আর না আসিতেও পারে। তাই নিজের সকল দৈন্য সকল অপূর্ণতা জানিয়াও তীর্থ দর্শন করিবার জন্য এখানে আজ আসিয়াছি। স্নেহে যাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহার পতন বিচ্যুতি ভ্রম

প্রমাদ আপনারা মার্জ্জনা করিবেন এ আশা আমার দুরাশা নহে, তাই এই দুঃসাহস আমার হইয়াছে—সেই জন্য করযোড়ে আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

নদীয়ার সাহিত্য-পরিষদ নূতন কথা নহে। একদিন ছিল যখন নদীয়াকে গৌতম কণাদের লীলাস্থলী মিথিলার মুখাপেক্ষা করিতে হইত, বেদ বেদান্ত তর্ক দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়ের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিতে হইলে নদীয়াবাসীর মিথিলার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। নবদ্বীপের বাসুদেব জীবন-পণ করিয়া যেদিন মিথিলা হইতে অমূল্যমণি "চিন্তামণি" আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই দিন বিদ্বজ্জন-পরিষদ্‌রূপ অভ্রভেদী বিশাল সৌধের শিলাবিন্যাস তিনিই করিয়া গিয়াছেন। সামান্য মণি চুরি করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া আনা যায়—যে "চিন্তামণি" বাসুদেব আহরণ করিয়াছিলেন তাহা কণ্ঠদ্বারা পুনরুচ্চারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার স্থান অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে; মনের উপরে, মস্তিষ্কের মধ্যে তাহা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত করিতে না পারিলে সে কার্য্য অসম্ভব। কি অসাধারণ মেধা, কি অনির্ব্বচনীয় স্মৃতিশক্তি, কি ক্ষুরধার বুদ্ধি, কি অলৌকিক দেশহিতৈষণা বাসুদেবের ছিল, যাহার বলে চিন্তামণি-চতুষ্টয় কণ্ঠস্থ করতঃ মহাপুরুষ স্বদেশে তাহার প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। নবদ্বীপের জ্ঞান গৌরবের এই সুবৃহৎ সূচনা।

তাহার পরে এই নদীয়ায় কল্পনাধিনাথ রঘুনাথের আবির্ভাব হয়। যে দিনে ভারতের জ্ঞানসিংহাসনে অজেয় জয়ধর বা পক্ষধর সগৌরবে সমাসীন, তরুণ বিদ্যার্থী রঘুনাথ সেদিনে তাঁহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া শ্লাঘার সহিত বলিয়াছিলেন :—

"সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ় ন্যায় গ্রহ গ্রন্থিলে,
তর্কে বা ভূশকর্কশে মন সমং লীলায়তে ভারতী।"

ইহার বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে অমর কবি ভবভূতি একদিন সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে"; সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত রঘুনাথ ভিন্ন আর এমন কথা এমন করিয়া কেহ বলিতে পারেন নাই।

তাহার পর কৃতবিদ্য রঘুনাথের সহিত তার্কিক-প্রধান পক্ষধরের তর্কসংগ্রাম আরম্ভ হইল, এ যেন হরধনুর্ভঙ্গের পরে সদ্য বিবাহিত কিশোর রামচন্দ্রের সহিত ক্ষত্রিয়ান্তক অমর ভার্গবের মহাসমর, কিংবা কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে সত্যাশ্রয়ী শিষ্য দেবব্রতের সহিত কাশীরাজ কন্যা অম্বার প্রতি কৃপাশীল পরশুরামের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। ফলে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন বিজয়ী রঘুনাথ নবদ্বীপে ন্যায়ের উপাধি প্রদানের ক্ষমতা লইয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন। যুগযুগান্ত স্থায়ী মিথিলার প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়া নবদ্বীপের মহিমা বর্দ্ধিত হইল, নদীয়ার মৌলিমণি ভট্টশিরোমনির কৃতিত্বে। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তুল্য, গৌতম কণাদের প্রতিমূর্ত্তি জয়ধরের পরাজয়, পক্ষধরের পক্ষশাতন কি অলৌকিক দৈব ক্ষমতা এবং অসামান্য প্রতিভার কার্য্য, চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পক্ষধরের সহিত রঘুনাথের তর্কসংগ্রামের পর এক শারদ পূর্ণিমার নিশীথ-সময়ে পক্ষধরগেহিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শরচ্চন্দ্রের মরীচি অপেক্ষা নির্ম্মলতর কোন পদার্থ জগতে আছে কি না। মিশ্রগুরু গৃহিণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, নবদ্বীপ হইতে সমাগত ছাত্র রঘুনাথের শাস্ত্রবুদ্ধি শারদচন্দ্রমার কিরণজাল অপেক্ষা সমধিক সমুজ্জল ও সুনির্ম্মল। যে শাস্ত্র যাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতেছি, সেই শাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকেই পরাজিত করিয়া, গুরুর নিকট হইতে এরূপ স্বেচ্ছাদত্ত প্রশংসা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? এবং পক্ষধরের ন্যায় শাস্ত্র-বিচার-মল্লকে পরাজিত করিবার ক্ষমতাই বা ভগবান্ কয়জনকে দিয়াছেন? রঘুনাথ বিচারে গুরুকে পরাস্ত করিয়াই সন্তুষ্ট মনে দিন যাপন করেন নাই, আজীবন কুমারব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার দূরপ্রসারিণী কল্পনার বলে তর্ক স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে মহার্হ রত্নরাজিরূপেই চিরদিন সমাদৃত হইতে থাকিবে।

একদা উজ্জয়িনীর রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীর স্বর্ণ সিংহাসন সমীপে বসিয়া সারস্বতকুঞ্জের কল-বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরলহরী দ্বারা সমগ্র ভারতকে যেমন মুগ্ধ করিত,

একদিন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের ছত্রচ্ছায়ায় সমাসীন জয়দেব, শরণ, ধোয়ী প্রভৃতির কোমল কান্তপদাবলীর উচ্ছ্বসিত ঝঙ্কারে দিগ্‌ দিগন্ত যেমন নিয়ত ঝঙ্কৃত হইত, শলাকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সার্ব্বভৌম এবং কুহকী কল্পনার যাদুকর রঘুনাথের মহিমায় এই নবদ্বীপে একদিন তেমনি শ্বেতাব্জবাসিনী বীণাপাণি দেবীর নিবাস নিকুঞ্জ রচিত হইয়াছিল, এবং সেই সারস্বত কুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় যে সকল বনবৈতালিক গান করিয়া গিয়াছেন, সে সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি আজও ভারতের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মনে হয় উজ্জয়িনীর নবরত্ন, লক্ষ্মণ সেনের গৌড়-সিংহাসন-ছায়াতল-বিহারী পঞ্চরত্ন, যেন জন্মান্তরে বহুরত্ন হইয়া এই নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং কেবল মাত্র নদীয়া নহে, সমগ্র ভারত ভূমিকে তাঁহারা ধন্য করিয়া গিয়াছেন। সকল দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ক্ষণজন্মা পুরুষ এক সময়ে অধিক জন্মগ্রহণ করে না, শত শত বৎসরের মধ্যে দুই চারিজন মহাপুরুষ জন্মিলেই সে দেশ ইতিহাস-বিশ্রুত হয়। কিন্তু আমাদের এই নদীয়া প্রায় একই সময়ে বহু ক্ষণজন্মা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ধাত্রী মাতা রূপে সমগ্র ভারতের পূজা লাভ করিয়াছে। মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর, রামনাথ, মাধব, শ্রীরাম, হরিরাম—কত নাম করিব? বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত শত শত মহামহোপাধ্যায়গণ এই নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে কোনও একজন কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করিলে, চিরদিনের জন্য জগদ্বাসী সম্ভ্রমে সে দেশের নামোল্লেখ করিত।

নবদ্বীপের পণ্ডিত্যখ্যাতি, ন্যায়ের প্রধান্য একদা যখন বঙ্গদেশ হইতে ভারতের সমুদ্রতরঙ্গাভিহত পশ্চিম এবং দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশ দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আসিত। যে দিনে রেলপথ বা ষ্টীমারের সুযোগ সুবিধা ছিল না, সে প্রাচীন কালে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে বিদ্যার্থীর আগমন সামান্য কথা নহে। সংস্কৃত নাটকে দেখিয়াছি উদ্‌গাথ বিদ্যা শিক্ষার্থ বাল্মীকির আশ্রম হইতে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল ভীষণ দণ্ডকারণ্য ভেদ করিয়া বিদ্যার্থী এবং বিদ্যার্থিনীগণ অগস্ত্যের আশ্রমে যাত্রা করিয়াছে। একালে কেবল নবদ্বীপ সে গৌরবে গৌরবান্বিত। সুদূর কেরল এবং পাণ্ড্য হইতে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের জন্মভূমি হইতে বিদ্যার্থিগণ এই নবদ্বীপে আসিয়া অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপের নব্যন্যায় আয়ত্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমার শুনা কথা নহে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে দেশভ্রমণ উপলক্ষে আমি কেরলে গিয়াছিলাম, তথাকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসাশ্রমী জগদ্‌গুরুর সহিত ঘটনাক্রমে আমার সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় তিনি কহিলেন যে বাঙ্গলাদেশ তাঁহার সুপরিচিত। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার বাঙ্গলায় আসিবার কারণ কি? তিনি কহিলেন, কাশীধামে বেদান্ত অধ্যয়নের পরে ন্যায়-শিক্ষার্থ তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন এবং একাদিক্রমে দশবৎসর কাল এখানে থাকিয়া মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছেন। নবদ্বীপের সে সকল কি মহিমান্বিত দিনই গিয়াছে, যে দিনে দিগ্‌ দিগন্তর দেশ দেশান্তর হইতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বিদ্যার্থী আসিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপকের চরণোপান্তে বসিয়া অন্তেবাসী রূপে বিদ্যার্জ্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে।

গদাধর ভট্টাচার্য্যের কাহিনী অপূর্ব্ব। অধ্যাপকের মৃত্যুকালে গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হয় নাই। মৃত্যুসময়ে অধ্যাপকের অন্য চিন্তা ছিল না—একমনে ভাবিতেছিলেন, তাঁহার দেহাবসানের পরে তাঁহার স্থানে অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ততম ছাত্র কে রহিল। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা পাঠ প্রায় সমাপ্ত করিয়াছিলেন, গুরুর বিবেচনায় তাঁহাদের কেহই টোলে অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত নহেন। জীবনান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, গদাধরকে যেন অধ্যাপকপদ দেওয়া হয়। তাঁহার শেষ ইচ্ছার সম্মান রক্ষার্থ তাহাই করা হইল। কিন্তু গদাধর তখনও কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং পাঠ সমাপনান্তে অধ্যাপকের নিকট হইতে কোন উপাধিও পান নাই, সেই কারণে ছাত্রগণ তাঁহার নিকট

পাঠ স্বীকার না করিয়া তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক জগদীশ তর্কালঙ্কারের টোলে পাঠ আরম্ভ করিয়া দিল। অসমাপ্তপাঠী গদাধর অধ্যাপকগণের গঙ্গাস্নানের পথে এক পুষ্পোত্থান রচনা করিয়া, সেই পুষ্পবাটিকার মধ্যে বসিয়া পুষ্পবৃক্ষ সমূহকে ছাত্র কল্পনা করতঃ, ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন কঠিন স্থানের অনুপম ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কথা অধ্যাপক পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল, অনেক ছাত্র গোপনে তাঁহার নিকট পাঠ লইয়া যাইতে লাগিল, জগদীশ পর্য্যন্ত সেই তরুণ বয়স্ক গদাধরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কৃত শব্দবিশেষের প্রমাদপূর্ণ ব্যাখ্যা কও 'ঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগদীশের ন্যায় প্রবীণ অধ্যাপক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের প্রখর বুদ্ধিকেও তর্কজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া প্রমাদপূর্ণ ব্যাখ্যাকে সুষ্ঠু বলিয়া অঙ্গীকার করানো অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা এবং অপরিসীম তর্কশক্তির দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, অপেক্ষাকৃত নব্যকালের আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে, নদীয়ায় বহু অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ জন্মগ্রহণ করতঃ শাস্ত্রের পঠন পাঠন করিয়া গিয়াছেন যাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার তুলনা সমগ্র জগতে দুর্ল্লভ।

অসমাপ্তপাঠী গদাধর যে প্রতিভা-বলে তৎকালে ন্যায়ের প্রধান রূপে সমগ্র বঙ্গদেশের পূজা লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিভা তাঁহার বংশে উত্তরাধিকার সূত্রে ভুবনমোহন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারকেশরী ভুবনমোহন যথার্থই ভুবনে অজেয় ছিলেন; তাঁহার বিচার পদ্ধতি, নিবেশ প্রবেশ এবং মুহূর্ত্তে সভা জয় করিবার ক্ষমতা ভুবনে অতুলনীয়ই ছিল—"ভুবনান্তো গদাধরঃ" এই বাক্যের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য সম্পাদন ভুবনমোহনই করিয়া গিয়াছেন।

নবদ্বীপের প্রতিভা কেবলমাত্র তর্কশাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল না; শ্বেত সরোজ সমাসন্না সরস্বতীর চরণসদ্ম-শতদল পদ্মের প্রতিদলে সেই অপূর্ব্ব প্রতিভার রশ্মিজাল আপতিত হইয়া তাহাকে অপরূপ শোভাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল; সেই প্রস্ফুটিত অরবিন্দের দূরবাহী মকরন্দলুব্ধ বিদ্যার্থী মধুপবৃন্দের অবিরাম ঝঙ্কারে এই নদীয়ার নব বাণীনিকুঞ্জ নিয়ত ঝঙ্কৃত হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রের সমন্বয়কারী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলে সমগ্র বঙ্গে বিধি বিধানের বিধাতারূপে আজও পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন। আবার বৌদ্ধযুগাবসানে তন্ত্রের ভ্রান্ত পথচারী বীরাচারিগণের অতি-আচার এবং কদাচারে দেশে যখন ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল, তখন তন্ত্রের সারোদ্ধারী "তন্ত্রসার"কারী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব এই নদীয়াতেই হইয়াছিল। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জল, কাব্য অলঙ্কার তন্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতি নিখিলশাস্ত্রের সর্ব্বত্র বিচরণশীল সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণ এই নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব প্রতিভার আলোকে সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। একে একে তাঁহাদের সকলের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা করিতে গেলে সম্বৎসরেও কুলাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, নদীয়ায় সাহিত্যপরিষৎ নূতন নহে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিদ্বজ্জনের যে বিপুল পরিষৎ এই নদীয়ায় বিরাজিত ছিল, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও ভারতের অন্য কুত্রাপি তাহা মিলিবে না। একস্থানে দীপ রক্ষা করিলে তাহার রশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হইয়া যেমন চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, তেমনি নবদ্বীপের শাস্ত্রানুশীলনের দৃষ্টান্তে পূর্ব্ববঙ্গ উত্তরবঙ্গ ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রচর্চ্চার প্রবল প্রচেষ্টা এক সময়ে হইয়া গিয়াছে; হলধর তর্কচূড়ামণি, রাখালদাস, তারাচরণ, রামধন, রামনাথ প্রভৃতি অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্যগণ মনে হয় নবদ্বীপের শাস্ত্রানুশীলনেরই গৌণ ফল।

যাহা ছিল তাহা আজ নাই। কালবশে বঙ্গের সারস্বত নিকুঞ্জের কলবিহঙ্গগণের কাকলি আজ প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দিবালোক শেষ হইয়াছে, যাহা আছে তাহা অস্তমিত সবিতার বিচ্ছুরিত আলোকরেখায় রঞ্জিত পশ্চিমদিকচক্রবালের ক্ষীয়মানা সান্ধ্যশোণিমা!

কেবল মাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের সর্ব্বাবয়বের আলোচনায়

নবদ্বীপ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে তাহাই নহে, যে মাতৃভাষার অনুশীলনকল্পে আজ বঙ্গের সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়াছে, যাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং পরিপুষ্টির জন্য সমগ্র দেশের একাগ্র সাধনা আজ নিয়োজিত হইয়াছে, বিদ্যার্থী বালকবৃন্দ, অধ্যাপক এবং অভিভাবকগণ যাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আজ একান্ত মনে যত্ন করিতেছেন, স্থানে স্থানে সভাসমিতি পরিষৎ প্রভৃতিদ্বারা যে মাতৃভাষার পর্য্যালোচন ও উন্নতিকল্পে অনুদিন আলস্যহীন চেষ্টা আজ চলিয়াছে, ন্যূনাধিক পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে সেই বঙ্গভাষার অনুশীলনের আরম্ভ এই নদীয়াতেই হইয়া গিয়াছে। শান্তিপুরের সন্নিকটে ফুলিয়া গ্রাম, মহাকালের জটাটবীবিহারিণী সুরধুনীর পূত ধারায় একদিন এই গ্রামপ্রান্ত বিধৌত হইয়াছিল। জহ্নুতনয়ার চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ আজ সুদূরে চলিয়া গিয়াছে, গ্রাম একরূপ জনমানবশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, তথাপি মহামুনি বাল্মীকির তপোভূমি অপেক্ষা বঙ্গবাসীর নিকট এই ফুলিয়া পবিত্রতর তীর্থ-ভূমি। জাহ্নবীর তীরতটে বসিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তিপ্রভামণ্ডিত কৃত্তিবাস ব্রহ্মসনাতন রামচন্দ্রের মহিমময় চরিতাখ্যান গান করিয়া গিয়াছেন। দেবভাষায় লিখিত মূল রামায়ণের অমৃতরস পানে তৃপ্তিলাভ করিবার শক্তি সকলের ছিল না, স্বর্গের মন্দাকিনী ধারার উপভোগের অধিকার দেবতারই আছে, মর্ত্ত্যজনের নাই। তাই ভগীরথ যেমন দুষ্কর তপশ্চরণের বলে ত্রিদিবের মন্দাকিনীকে মর্ত্তে আনিয়া ভস্মাবশেষ সগর সন্তানের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তেমনি এই বঙ্গের ভগীরথ আজন্ম তপশ্চর্য্যার প্রভাবে বাল্মীকির কল্পনা-ত্রিদিব হইতে কাব্যরসের মন্দাকিনী ধারা আনিয়া বঙ্গসাহিত্যের মরু প্রান্তরকে প্লাবিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয় ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্ব পিতামহগণেরই উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ভগীরথ এই কৃত্তিবাসের কৃপায় বঙ্গের সপ্তকোটি নরনারী উদ্ধার হইয়া গিয়াছে। এই অতুলনীয় কীর্ত্তি যে ভূমিতে বসিয়া কৃত্তিবাস অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা জাহ্নবীর জলধারাপূত এই নদীয়ারই পুণ্যভূমি।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিমল-পূর্ণচন্দ্র-কিরণ-সমুজ্জ্বলা এক নির্ম্মল নিশীথিনীতে শচীগর্ভসমুদ্র হইতে আর এক পূর্ণচন্দ্র জাহ্নবীর পবিত্র বীচিভঙ্গ বিধৌত এই নদীয়া নগরে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার চরণকমলের রেণুকণাস্পর্শে কেবল নদীয়া নহে, সমগ্র ভারতভূমি ধন্য ও পবিত্র হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া গৌবব নহে, ন্যায়শাস্ত্রের অপূর্ব্ব টীকা প্রণয়ন করিয়া তিনি পরার্থে তাহা অনায়াসে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন বলিয়া গৌরব নহে—এই নবদ্বীপে তাঁহার সময়ে এবং পরবর্ত্তী কালে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন। তন্ত্র প্রদর্শিত বীরাচারের প্রেম-ভক্তিহীন উন্মার্গগমনে দেশে যখন হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, সেই পরম প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে মহাপ্রভুর প্রাণ করুণায় বিগলিত হইয়া গেল, তাঁহার উদার বক্ষতলে অপরিসীম প্রেম সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়োত্থিত প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল ; ভক্তিরস বিহীন বঙ্গবাসীর হৃদয়-মরুতে বীরাচারের বজ্র দহনে একান্ত ম্রিয়মান প্রেমতরু অকস্মাৎ মঞ্জরিত হইয়া উঠিল, উষর মৃত্তিকার উপরে নন্দনের হরিচন্দন বৃক্ষ সংরোপিত হইল, অগ্নিদাহের দহন জ্বালার উপরে মহাপ্রভু স্বহস্তে শীতল সিতচন্দনের পঙ্ক বিলেপন করিয়া দিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে অজয়ের তীরতটে কেন্দুবিল্বে যে কোমল কান্ত পদাবলী জয়দেব কর্ত্তৃক রচিত হয় তাহা সংস্কৃত রচনা ; বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গভাষায় রচিত বলিয়া খ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে সকল পদাবলীর মধ্যে প্রচুর মৈথিলী শব্দ থাকায় তাহাকে প্রকৃত বাঙ্গলা বলা যায় কি না সে বিষয় মতভেদ রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদ খাঁটি বাঙ্গলায় রচিত এবং বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল মণি তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবাসের অঙ্গনে যে দিন হইতে চৈতন্যচন্দ্রের সং-কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে উহা স্মরণীয় দিন। এই প্রেমময় নামসংকীর্ত্তনের প্রভাবে সেই দিন

হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন পর পর্য্যন্ত অসংখ্য বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যে সংখ্যাহীন পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ধরণীর সাহিত্য ভণ্ডারে আর কোথাও তেমন রত্নরাজি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই সকল পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে বহু মহাজন এই নদীয়ায় জন্ম পরিগ্রহ করতঃ নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তিলেকের জন্য এস্থান ত্যাগ করেন নাই, এবং তাঁহাদের রচিত পদাবলী সমূহের সমগ্র কল্পনার অফুরন্ত উৎস এই নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। মহাপ্রভুর প্রেম মাহাত্ম্যে এই বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বহু পদকর্ত্তার আবির্ভাব হয়, সেই সকল মহাজনের মধ্যে অনেকেই নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা অন্যত্র জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনতুল্য পবিত্র এই তীর্থভূমি নদীয়ায় সমগ্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তা এবং পদকর্ত্তাগণের মধ্যে যিনি যেখানেই জন্মলাভ করুন, যেথান হইতেই বাঙ্গলার সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার প্রয়াস করুন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে যে ভাবেই হউক, এই নবদ্বীপ এবং নবদ্বীপের ক্ষয়হীন চিরপরিপূর্ণ চন্দ্রমা চৈতনচন্দ্রের প্রেমভক্তির ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, সুতরাং বঙ্গের বৈষ্ণব-সাহিত্যের অতুলনীয় গৌরব এই নবদ্বীপেরই গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইতেই ন্যূনাধিক দুইশত বৎসর ধরিয়া একদিকে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দ নিরুক্ত জ্যোতিষ প্রভৃতি ষড়ঙ্গবেদ এবং ন্যায় বেদান্ত সাংখ্য তন্ত্র মন্ত্র স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং অন্য দিকে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনায়, সুমধুর নাম সংকীর্ত্তনে, এবং মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রে এই নবদ্বীপের পুণ্যধাম নিত্য শব্দায়মান ছিল। কলকণ্ঠ বৈষ্ণব গায়কের কোকিলকণ্ঠে যখন মধুকান্ত-পদাবলী গীত হইত, তখন রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্যরসে অতি-বড় পাষাণ পাষণ্ডের হৃদয় মনও পরিপ্লুত হইয়া যাইত। চৈতন্যচন্দ্রের চরণরেণুর প্রভাবে নদীয়ার সামাজিক-দুষ্কৃতি যেমন বিদূরিত হইয়াছিল, ভক্তিহীন তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে যেমন প্রেমভক্তির তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিয়াছিল, তেমনি বঙ্গ-সাহিত্যের অপ্রশস্ত এবং অগভীর পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর রসধারা পূর্ণিমার কোটালের বানের মত প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কূলপ্লাবিনী তরঙ্গিণীর রূপ দান করিল, তাহার সকল দৈন্য দূর করিয়া দিয়া স্বাদু পানীয়ের প্রাচুর্য্যে সাহিত্য-রসপিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণের উপায় করিয়া দিল।

ইহার পরেই নবদ্বীপাধিপতি বৈদিক বাজপেয়-যজ্ঞযাজী অগ্নিহোত্রী, মহারাজাধিরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাজনীতি প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে যে সকল কীর্ত্তি-কলাপ রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের কোন উল্লেখ না করিলেও, কেবল নদীয়ার সারস্বত সমাজের হিতকল্পে এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি এবং পরিপুষ্টির জন্য যাহা করিয়াছেন, একমাত্র তাহাতেই তিনি সর্ব্বকালের জন্য অমর পদবী লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সভাসদ্ ভারত-চন্দ্র নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন নাই, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহাকে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছিল। গুণগ্রাহী মহারাজ, ভারতচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তি, পাণ্ডিত্য, রচনানৈপুণ্য এবং রসজ্ঞতার পরিচয় এক নিমেষেই পাইয়াছিলেন; সেইজন্য কেবলমাত্র আশ্রয়দান বা অর্থ সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; নিয়ত তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া তাঁহার সাহচর্য্যে অনুদিন আনন্দলাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ্ঞায় যে সকল গ্রন্থরাজি ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, আজ প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে তাহারা অমূল্যরত্নরূপে সাদরে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; যতদিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, বাঙ্গালার সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিবে, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ততকালই জীবিত থাকিবে, উহা অমর অবিনশ্বর। সময়োচিত রচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। যাহা বাঁচিবার নহে, তাহাকে সহস্র চেষ্টাতে, শত যত্নেও বাঁচাইয়া রাখা যায় না; কিন্তু ভারতচন্দ্রের মানসপুত্রগুলি, তাঁহার কল্পনার দুলাল দুলালী, অন্নপ্রাণ

হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই; রাজাশ্রয়ে, রাজপ্রাসাদের মণিকুট্টিমে লালিত হইয়াছে, রাজভোগে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া যে তাহারা দীর্ঘজীবী তাহা নহে, উহারা "অশ্বত্থমা বলি ব্যাস হনুমন্তো বিভীষণের" ন্যায় চারিযুগে অমর; অশ্বত্থামা, বলি ও মারুতির ন্যায় রণে বনে দুর্গমে যেখানে যে অবস্থাতেই পড়িত, উহাদের ধ্বংস অসম্ভব ছিল। রুচিবিকারগ্রস্ত কোন কোনও ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধির বশে গুণাকরের কোন কোন গ্রন্থের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় "পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি, তিক্তায়তে হংসকুলাবতংস।" কবিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল রুচি রুচি বলিয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিলে সংস্কৃতের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য, সেক্সপিয়ারের বহু উৎকৃষ্ট নাটক, বাইরণ এবং ড্রাইডেনের বহুগ্রন্থ সাগরের অতলসলিলে নিক্ষেপ করিতে হয়।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের কাব্যগ্রন্থে কেবল 'পয়ার' এবং 'নাচাড়ীর' প্রাধান্য ছিল, অন্য ছন্দ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। রায় গুণাকর তাঁহার অন্নদামঙ্গল এবং অপরাপর গ্রন্থে সংস্কৃতের অনুকরণে এবং স্বীয় কল্পনার বলে বহুবিধ নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়া ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যাহাতে আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কেবলমাত্র নূতনত্বের জন্য তিনি নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, সংস্কৃতের এমন সকল ছন্দ তিনি তাঁহার কাব্যের ভাবানুসারে বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা না করিলে কাব্যসৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হইত। স্থান বিশেষে ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃতছন্দ তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় এবং মনে হয় যেন বহুকাল হইতে এই সকল কঠিন সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে, এবং এ সকল যেন ঋণ নহে, বাঙ্গালা ভাষারই নিজস্ব বিশেষ বৈভব। ভারতচন্দ্র তাঁহার জীবনের অধিকাংশ এবং উৎকৃষ্টাংশ নবদ্বীপাধিপতির আশ্রয়ে কাটাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থরাজিও এই নদীয়ায় বসিয়াই রচিত হইয়াছে। তিনি যে স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন, তিনি এই নদীয়ারই পোষ্যপুত্র, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত জলগণ্ডূষ এবং পরমান্নের পিণ্ড তাঁহার ধাত্রীমাতা এই নদীয়ারই প্রাপ্য।

শুচি শুভ্র বিমল হাস্যরসের রসিক দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল, স্বদেশ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল এই নদীয়ারই দুলাল। সাহিত্যগগনে তাঁহার মধ্যলীলা শেষ না হইতে হইতেই তাঁহার জীবন-সূর্য্য অস্তশিখরীর পরপারে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল, ইহা নদীয়ার তথা সমগ্র বঙ্গের অতিবড় দুর্ভাগ্য। শিষ্টসম্প্রদায়সম্মত হাস্যরসের কবিতায় এবং গানে দ্বিজেন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কি না তাহা আমি জানি না, এবং অন্য কেহ যে তাদৃশ সাফল্য-লাভ করিতে পারেন নাই তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যাইতে পারে।

হাস্যরসের কবোষ্ণ সূর্য্যকিরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্গূঢ় ঘন বেদনার অশ্রুজলরাশি দ্বিজেন্দ্রের কবিতায় যেমন করিয়া জমাট বাঁধিত, তেমন অন্য কোথাও আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। যেখানে বেদনা, হাসিতে হাসিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সেইখানে আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু আঘাত করিয়া হাসেন নাই, আহতের সহিত সমবেদনায় তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন। নাট্য-রাজ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একপ্রকার যুগান্তর আনিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের দেশপ্রীতি তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া যেরূপ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। উষর মেবারের দগ্ধ গিরিশ্রেণীর ধূম্র বরণ তেমন প্রীতির চক্ষে আর কে দেখিয়াছে? বঙ্গের বিহঙ্গগীতি, জাহ্নবীর জল কলতান, মেঘান্তরালে ক্ষণপ্রভার হিরণ্ময়-জ্যোতিঃ, বাতকম্পিতশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের হরিৎ-শোভা, মেবার মরুবাসীর স্বদেশ-প্রেমে আত্মোৎসর্গের মহামহোৎসব তিনি যেমন করিয়া দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন,

শীঘ্র আর তেমন হইবে কি না কে জানে! তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জননী জন্মভূমির জন্য যে অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তি নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইত, তাহার পরিচয় আমরা দ্বিজেন্দ্রের রচিত অতুলনীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া পাইয়া থাকি :—

"ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

তাঁহার স্বদেশের নদীর তুষার শীতল জলধারা, তাঁহার দেশের ধূমায়মান গিরিশ্রেণী, ঘনকৃষ্ণ প্রাবৃট্ মেঘের বক্ষোবিহারিণী সৌদামিনী, মলয়-মারুত স্পর্শে আপক্ক শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত হরিৎ-শোভা তিনি কি চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন এবং কি স্নেহের সহিতই বর্ণন করিয়াছেন!

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে ?
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে!"

যে প্রেমে তিনি এই সকল সঙ্গীত লিখিয়াছিলেন, তাহা অন্তর দিয়া বুঝিবার সামগ্রী, বলিয়া বুঝাইবার নহে। দেশজননীকে সম্বোধন করিয়া যখন প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছেন :—

"ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।"

তখন আত্মসম্বরণ করিতে পারে এমন ব্যক্তি আমি অধিক দেখি নাই।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার মুক্তিকে সাহিত্যের পথে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে, বরণ করিয়া লইতে হইবে তাহা আমরা আজ বুঝিয়াছি। কিন্তু গদ্যসাহিত্যের সে পথ যখন প্রথমে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন উহা প্রশস্ত রাজপথ ছিল না, সে পথে আমাদের কোন আনন্দতীর্থে উত্তীর্ণ হইবার আশা ছিল না, উহা নিতান্ত গলিপথ ছিল—তাহার কারণও ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার জন্য সাহিত্য-সৃজনের ভার পড়িল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দিগের উপরে। ইহা তাঁহাদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য্য নহে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে নিতান্ত ফরমাইসে গড়া সাহিত্য সৃজনের কায। পণ্ডিত মহাশয়গণ সংস্কৃত ভাষার মণিহর্ম্ম্য প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাঙ্গলার পর্ণকুটীর প্রস্তুতে ব্রতী হইলেন এবং সেই লজ্জা যথাসম্ভব নিবারণকল্পে ক্ষীণা অপ্রাপ্তবয়া বঙ্গবধূটীর সংস্কৃত সমাসের অবগুণ্ঠনে বাহু বদন বক্ষ সমস্তই আবৃত করিয়া তাহাকে একপ্রাণহীন জড়পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ এবং অসংখ্য বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের প্রসাদে পদ্যসাহিত্যে নব নব ভাবসম্পদ নিত্য আহরিত হইতেছিল, কিন্তু গদ্য সাহিত্য পাঠশালার গুরু মহাশয়ের বেত্র-তাড়নায় শিক্ষণীয় উৎকট সাহিত্যরূপেই শতাব্দীকাল একভাবেই রহিল। কাব্যসাহিত্যে মিত্রছন্দের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মধুসূদন যে দিন অমিত্রাক্ষরের বিজয়-ভেরী বাজাইয়া দিলেন, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। ইহার অনতিকাল পরেই বঙ্গের গদ্যসাহিত্যের গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব কাল। চন্দ্র-কর স্পর্শে দেখিতে দেখিতে যেমন সমুদ্রের বারিরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, কোন দৈন্য কোন শূন্য কোথাও রহিল না; যেখানে স্তব্ধতা ছিল সেখানে নৃত্য আরম্ভ হইল, যেখানে নীরবতা ছিল সেখানে সঙ্গীত সুরু হইল। নিতান্ত ক্ষীণপ্রাণ, ম্রিয়মান, মুমূর্ষু শিশু গদ্য সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের লালনগুণে কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল; এই শিশুসন্তানটিকে পালন করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে রাজপুতনার মরুপ্রান্তরস্থিত রূপনগরের অন্তঃপুরে এবং মোগল বাদশাহের রংমহলে যাইতে হইয়াছে; অম্বরের রাজকুমারকে

মান্দারণকুমারীর জন্য বিষ্ণুপুরের প্রান্তরস্থিত শৈলেশ্বর মন্দিরে অসময়ে বৃষ্টি বাদল মাথায় করিয়া আনাইতে হইয়াছে, বীরভূমের বন জঙ্গলে বিষ্ণুমন্দির স্থাপনা করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীসঙ্ঘকে তরবারি ধরাইতে হইয়াছে, কূলপরিপ্লাবিনী ত্রিস্রোতার স্রোতের উপরে বঙ্গনারী প্রফুল্লকে ইংরাজ কাপ্তানের সহিত প্রগল্‌ভার ন্যায় কথাবার্ত্তা কহাইতে হইয়াছে। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ দেশান্তর হইতে আহরিত এই উপাদান-রাশি একত্র করিয়া যে সাহিত্যরস সৃজন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব এবং অমূল্য। শিশুপালন করিতে হইলে যেমন বিচিত্র আহার্য্য এবং পানীয় দ্বারা তাহার শরীরে রস রক্ত সঞ্চার করিয়া দিতে হয়, তেমনি রোগের বীজাণু শিশুশরীরে প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার আবাস ভূমিতে জঞ্জালজাল নির্ম্মুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। সব্য-সাচী ধনঞ্জয়ের ন্যায় তিনি এক হস্তে যেমন স্বদেশ বিদেশ এবং তাঁহার স্বীয় অপূর্ব্ব কল্পনা ক্ষেত্র হইতে নানাসামগ্রী আহরণ করিয়া সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন, তেমনি অক্ষম লেখকের প্রয়াসপ্রসূত অযোগ্য সাহিত্যের অপরিচ্ছন্ন মলিনতা অপর হস্তে সমালোচনার সম্মার্জ্জনী ধারণ করতঃ সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছেন, সৃজন এবং পালন উভয় কার্য্যই একাকী নিষ্পন্ন করিয়া সাহিত্যিকের দুষ্কর কর্ত্তব্য কেমন করিয়া পালন করিতে হয়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমলালিত শিশু সাহিত্য যখন যৌবন সমাগমের উদগ্র চাঞ্চল্যে আর অন্তঃপুরে ধাত্রীর অঞ্চলাচ্ছাদনের নিম্নে থাকিতে চাহিল না, সভ্য জগতের সাহিত্য সমাজে বাহির হইবার উপযোগী বস্ত্রাভরণ যোগাইবার ভার পড়িল দৈব প্রতিভাসম্পন্ন জগৎকবি ঋষি রবীন্দ্রনাথের উপরে। এই রাজোচিত রাজ সজ্জা যোগাইতে রবীন্দ্রনাথকে দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় নাই, তিনি এই বাঙ্গালাদেশের অরণ্য কান্তারে সাগরে ভূধরে যেখানে যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাহাই আহরণ করিয়া এই কিশোর-সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গের ঘন পল্লবিত আম্রকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসন্ত বৈতালিকের কুহু স্বর, উদগ্র তেজোদীপ্ত বৈশাখের তপঃক্লিষ্ট তাপস-মূর্ত্তি, হেমন্তের রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চলাচ্ছাদিত বসুন্ধ-রার সৌম্যমুখচ্ছবি—কিছুই তাঁহার কবিজনোচিত দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া থাকে নাই। সুরসভাতলে নৃত্যপরায়ণা উর্ব্বশীর নৃত্যের তালে তালে সাগরের তরঙ্গভঙ্গ কেমন করিয়া নাচিয়া উঠে, এবং শস্যশীর্ষে ধরার অঞ্চল কেমন করিয়া কাঁপিয়া উঠে, কবির অলৌকিক প্রতিভা সে সমস্তই আমাদিগকে প্রত্যক্ষবৎ দেখাইয়া দিয়াছে।

কিছু দিবস পূর্ব্বে যাহা উন্মাদ কল্পনারও অতীত ছিল, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এককালের বৃক্ষপল্লবী ব্রততী বিহীন ঊষর বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জে আজ নন্দনের সন্তানকে ও হরিচন্দন বৃক্ষে প্রফুল্ল কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার মধুগন্ধে চারিখণ্ড পৃথিবী আমোদিত করিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের রাজসভায় আমা-দের বঙ্গসাহিত্য সগৌরবে সমাসীন হইয়াছে। বঙ্গ সর-স্বতীর পদ্মবন প্রভাত সবিতার কিরণ সম্পাতে হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সারস্বত নিকুঞ্জের বিহঙ্গকুল জাগ্রত হইয়াছে, আর সাহিত্যের যে সিন্দূর চন্দনাঙ্কিত পাদপীঠ রচিত হইয়াছে, বঙ্গলক্ষ্মীর হাস্যসমুজ্জ্বলা কল্যাণ ছবিকে সেখানে চিরন্তনী করিয়া রাখিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্যিক-বর্গের সাধনাকে চিরজাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে, কারণ যেখানে আমাদের গৌরব, আমাদের দায়িত্বও সেখানে সমধিক একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানের সাহিত্যসাধনার সাধকবর্গ সেকথা বিস্মৃত হন নাই; কেবলমাত্র হিন্দু নহে, মুসলমান সাহিত্যিকগণও আজ বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে ক্লান্তিহীন তপশ্চরণে নিযুক্ত রহিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই নদীয়ারই লোক। এই সকল তাপসবর্গের মানসতপোবন-প্রসূতা শকুন্তলা যেদিন রূপ-মাহাত্ম্যে রাজপুরীর উদ্যানলতাকে দূরীকৃত করিবার ক্ষমতালাভ করিবে, সেদিনে

"রম্যান্তরঃ কমলিনী হরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥"

বলিয়া তাহার যাত্রাপথ নিরাময়ের জন্য স্বস্তিপাঠ করিবার দিন আসিবে।

এই সাহিত্যসাধনার প্রসঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় রামনাথের (যিনি বুনো রামনাথ নামে খ্যাত) একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথিত আছে একদা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শিবচন্দ্র, পণ্ডিতের সাংসারিক দুরবস্থার কথা শুনিয়া রামনাথের উটজপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইচ্ছা আর্থিক আনুকূল্যে তাঁহার সংসারের কষ্ট নিবারণ করিয়া দেন। রামনাথ শাস্ত্রের প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান একরূপ নাই; মহারাজ শিবচন্দ্র উপস্থিত, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রামনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই; অবশেষে মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কিছু অনুপপত্তি আপনার থাকিলে, আদেশ করুন, আমি তাহার সমাধান করিয়া দিই।" রামনাথ কেবলমাত্র এক শাস্ত্রেরই উপপত্তি অনুপপত্তি জানেন, সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান মাত্র নাই। তিনি উত্তর করিলেন, "মহারাজ, চারি চিন্তামণির কোন স্থানেই আমার অনুপপত্তি নাই, আমি শাস্ত্রীয় সকল প্রশ্নেরই সমাধান করিয়াছি।" কি অনির্ব্বচনীয় এই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের একাগ্রতা যে, মহারাজ শিবচন্দ্র কি বিষয়ের অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা তাঁহার অন্তরে প্রবেশলাভই করিতে পারিল না! আজীবন যাহার অনুশীলন করিতেছেন, তন্ময় হইয়া সেই চিন্তাতেই তিনি বিভোর, সাংসারিক সুখ দুঃখ সচ্ছলতা অসচ্ছলতার দিকে দৃক্‌পাত নাই। বহুক্ষণ পরে যখন উপলব্ধি হইল, তখন পণ্ডিত কহিলেন, "ব্রাহ্মণীকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কি বলিব মহারাজ? সংসারের কিছুই আমি অবগত নহি।" মহারাজ কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিতগেহিনীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা, আমি আপনাদের সংসার যাত্রার সৌকর্য্যার্থে কি করিতে পারি আপনি আদেশ করুন, আমি তাহা করিয়া কৃতার্থ হই।" ঐ পতিরই ত পত্নী! ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, "মহারাজ, ঐ পরিদৃশ্যমান তিন্তিড়ী বৃক্ষের পত্রে অম্বল হয়, এবং তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইয়া যায়; অর্থের প্রয়োজন নাই, অর্থে মানুষের শাস্ত্রচিন্তা এবং পরমার্থ উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়।" গৃহী হইয়া, সংসারী হইয়া, এইরূপ উদাসীন সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনাতিপাতের দৃষ্টান্ত জগতে অল্পই পাওয়া যায়। যাঁহারা সাহিত্যের সিংহদ্বারে থানা বাঁধিয়া উহার সৃজন পালন বর্দ্ধনের জন্য দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রামনাথের ন্যায় সতত জাগ্রত থাকিয়া অনন্যমনে একাগ্র সাধনায় নিযুক্ত রহিতে হইবে, নতুবা সাহিত্যের পথে, যে সিদ্ধির আলোকের দূরাগত রশ্মির আভাস আমরা পাইয়াছি, তাহা হারাইয়া ফেলিয়া আবার অন্ধকারে পড়িয়া যাইব, এবং আমাদের সকল আশা ভরসা সুদূরপরাহত হইবে।

বাঙ্গালাদেশের চিত্তের মধ্যে যেখানে ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভবিতব্যতাকে গোপনে সৃজন করিয়া তুলিতেছেন, সাহিত্যতপোবনের তাপসদিগকে সেইখানে প্রবেশ করিতে হইবে। তাঁহাদের চিত্তকে উদার করিতে হইবে, দৃষ্টিকে দূরগামিনী করিতে হইবে, চিন্তা অবরোধমুক্ত করিতে হইবে, এবং বাক্যকে সত্য করিতে হইবে, তবেই বাঙ্গালীর বাণী বিশ্বের বাণী হইবে, এবং বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বের সাহিত্য হইয়া যুগে যুগে অমর হইয়া থাকিবে।

আমাদের বেদ বেদান্ত কাব্য অলঙ্কার পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি গৌরব করিবার সমস্তই রহিয়াছে। সে গৌরবকে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে; তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিগত বৈভবের স্মরণীয় দিনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পয়োধি বেষ্টিত উপদ্বীপে বাস করিবার দিন আজ চলিয়া গিয়াছে; দেশ দেশান্তর হইতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। যে ভারতের দীপ্ত দীপা-

লোকে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ একদা আলোকিত হইয়াছিল, যে গুরুর উচ্চাসনে একদিন ভারত সমাসীন ছিল, সেই দীপ আবার প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, সেই আসনে পুনরায় উপবেশন করিয়া জগতের বরণীয় হইতে হইবে—ইহা যেন আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণের পবিত্র অগ্নিশিখার ন্যায় আমাদিগের অন্তরে নিয়ত জ্বলিতে থাকে। সে দায়িত্ব সে গুরুভার আমাদের ন্যায় সাহিত্যিকবর্গের স্কন্ধেই অর্পিত হইয়াছে, কারণ এই সাহিত্যের রাজপথ দিয়াই আমাদিগকে মুক্তির আনন্দালোকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে—

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বৈদিক যুগের কথা

একটা বহু পুরাতন কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভয় হয়। যে জিনিষটাকে আমরা চোখের সামনে দেখিতেও পাই, যার মধ্যে থাকিয়া জীবনের গতি, যার মধ্য দিয়া শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সে জিনিষটাকে চিনিতেও পারি, আর ইচ্ছা করিলে পাঁচজনের সামনে ধরিয়া দেখাইতেও পারি। কিন্তু কবে কোন্ অতীত যুগের ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটা ঘটনা স্রোত বহিয়া গিয়াছে, যার পিছনে পড়িয়া আছে কেবল একটা অপরিচিতের অনভ্যর্থিত মূর্ত্তি, তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও ভয় করে। বহুযুগ বিস্মৃত একটি জাতির অভ্যুত্থানের ইতিহাস, তার আচার ব্যবহার, সভ্যতা, সমৃদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা, রীতিনীতির কথা আজ একখানি অতি প্রাচীন কালে অঙ্কিত আলেখ্যের মত বিবর্ণ ও লুপ্তরেখা হইয়া সেই অতি উজ্জ্বল গৌরবময়ী স্মৃতিটীকেও মনের কোণ হইতে সরাইয়া ফেলিয়াছে। পুঁথির লেখার ভিতর দিয়াই আজ সেই বাস্তবের ছবিটি আঁকিবার চেষ্টা করি মাত্র।

একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন—"বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়?" আজও ইহার একটা সমীচীন অথবা অভ্রান্ত মীমাংসা হইল না! ভারতের ঋষিগণ, শাস্ত্রাচার্য্যবেদকে আবহমান কাল অপৌরুষেয় বলিয়াই মানিয়া আসিতেছেন; বৈজ্ঞানিক যুগের লোক আমরা, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিয়া কতই প্রতিকূল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতেছি। এত বড় একটা কথা ঝাঁ করিয়া মানিয়া লইতে আমাদের মন সরিতেছে না। অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আমাদের বুকের ভিতর বসিয়া গিয়াছে। আমরা ভাষার পরিপুষ্টির দিক দিয়া বিচার করিয়া মন্ত্ররাশি-রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণ করিতেছি। সূক্তের উপরে ঋষির নাম ও তাহাদের বহুত্ব দেখিয়া অপৌরুষেয়বাদকে আমরা ছুড়িয়া ফেলিতেছি। প্রাচীন আচার্য্যগণের যুক্তি তর্ক ও সিদ্ধান্ত আমাদের "অলৌকিক গবেষণার" সামনে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না! কিন্তু কোন্ পক্ষ সত্য আজও তাহা অনির্ণীত রহিয়া গেল।

পাশ্চাত্য যুক্তি তর্কই গ্রাহ্য; সে যুক্তির, সে সিদ্ধান্তের মূলে সত্য আছে কি না দেখিবার প্রয়াস আমাদের নাই। তাহাদের যুক্তিতর্ক দিয়াই আমরা প্রাচীন মত খণ্ডন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছি। হইতে পারে আমাদের ঋষিগণ ভ্রান্ত; হইতে পারে তাঁহাদের মত যুক্তিতর্ক সিদ্ধান্ত বহির্ভূত, কিন্তু তাঁহাদের (পূর্ব্বাচার্য্যগণের) মতের কোন সত্যতা আছে কি না, তাহা একবার বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে দোষ কি? কেবল পাশ্চাত্য মতের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতকে ভ্রমাত্মক বলিবার কারণ কি? যে মতের উপর

সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতকে দোষাঘ্রাত করি, সেই মতটা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত একবার কি সে কথাটা ভাবা উচিত নয়? ইহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রে কি আছে না আছে, ইহার যুক্তিতর্কগুলি ন্যায়সঙ্গত কিনা, একবার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া পরে দোষযুক্ত দেখিয়া ত্যাগ করিলে ভাল হয় না কি? পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি হওয়া কেমন একটা অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয়!

যাস্ক, জৈমিনি দাড়াইতে পারিলেন না, তাঁহারা গেলেন হটিয়া, তাঁহাদের যুক্তিতর্ক গেল ভাঙ্গিয়া। কেন? ইহার কি আর উত্তর আছে? বেদের অপৌরুষেয়ত্বের কথা ছাড়িয়া দিউন, ওকথাটা এযুগে একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের বেদের ব্যাখ্যায় পর্য্যন্ত ভুল বাহির হইতেছে, যাস্ক, সায়ণ প্রভৃতি মনীষিগণ বেদব্যাখ্যা করিবার যোগ্য নন; তাঁহাদের ব্যাখা পক্ষপাত-দোষদুষ্ট। মহোদয় ম্যাকডোনেল (Macdonell) তাঁর "History of Sanskrit Literature" নামক গ্রন্থে মনস্বী রোথের (Roth) কথা তুলিয়া এ বিষয়ে বলিয়াছেন "That a qualified European is better able to arrive at the true meaning of the Rigveda than a Brahman interpreter. The judgment of the former is unfettered by theological bias; he possesses the historical faculty and he has also a far wider intellectual horizon, equipped as he is with all the resources of scientific scholarship" বেশ কথা, পূর্ব্বাচার্য্যগণ অযোগ্য, তাই মনস্বী-রোথ স্বয়ং কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইহা অতি মঙ্গলের কথা, অতি উদারতার কথা। ইহার জন্য অবশ্যই রোথ মহোদয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিতে হইবে।

কিন্তু একটা তর্ক থাকিয়া যাইতেছে, মহর্ষি যাস্কের ভুল কোথায়? মহর্ষি যে ভাবে মন্ত্ররাশির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, সে ভাবটি "আজ কালকার" কোন গবেষণাকারীর পক্ষেও নিতান্ত দুর্লভ। তিনি যাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। তিনি সেই সময়ের যতটা নিকটবর্ত্তী ছিলেন, অন্য কেহই সেরূপ ছিলেন না। আর এক কথা—এবিষয়ে তিনিই প্রমাণ, অতঃপর যাহা কিছু হইয়াছে, সমস্ত তাঁহারই ব্যাখ্যা অবলম্বনে।

ভাষার রীতি বা Idiom তখন যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই, সে ভাষাও এখন চলিত নয়। তৎকালের প্রযুক্ত-শব্দের অর্থ বা import এখন আর নাই, ইহাই ত প্রথম সমস্যা; দ্বিতীয় সমস্যা নিজের ভাব দিয়া একটা অপরিচিত বহু প্রাচীন ভাষার হৃদয়ে প্রবেশ করা। সবই অসম্ভব, কারণ বেদ বুঝিতে হইবে বৈদিক যুগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, নিজের মনোমত পথ গড়িয়া লইলে চলিবে না। ব্রাহ্মণভাগ বাদ দিয়া মন্ত্রসমূহের ব্যাখা হইতে পারে না, কারণ ব্রাহ্মণগুলিই বেদের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা।

যাঁহারা অবলম্বন, যাহাদের গ্রন্থাদির অভাবে বেদার্থ "সাপের মন্ত্রের" মত অর্থহীন অবস্থাতেই থাকিয়া যাইত, তাঁহারা হইলেন ভ্রমাত্মক। "যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গব দাঁতের গোড়া।" অতি বিস্ময়ের বিষয় বলিয়াই মনে হয়।

"Theological bias" কথাটা নিরর্থক। এইকরম প্রত্যেকেরই আছে, যিনি ব্যাখ্যাকর্ত্তা তাঁরও আছে, আর যিনি ব্যাখ্যার খণ্ডনকর্ত্তা তাঁরও আছে; অবশ্য আপন আপন। ইহা যেন argumentum ex silentis হইয়া দাঁড়াইল। ধর্ম্মবিশ্বাস অতিগোপনে অন্তরের ভিতর লুকাইয়া থাকে, কোন ব্যক্তিই এই bias হইতে মুক্ত নয়, এবং আমরা মুখে যাই বলি না কেন, কাযের সময় ঐ বিশ্বাস অজীর্ণের মত গলাঠেলিয়া উঠে। Theologyকে বাদ দিয়া ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব।

তার পর Macdonell মহোদয় Context'এর কথা তুলিয়াছেন। Context মানে কি? মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা

করিতে গিয়া context খুঁজিতে হইবে কোথা হইতে? ইহাই ত প্রথমতঃ ভাবিবার কথা। তার পর নিরুক্ত পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, নিরুক্তকার context বা প্রকরণের কথা তুলিয়াছেন কি না? এবং এই contextই বেদব্যখ্যায় তাঁর মুখ্য উপজীব্য কি না? তিনিই ত বলিয়াছেন "নৈক পদানি নিব্রুয়াৎ"। তিনিই ত ধরিতে গেলে contextএর মধ্যে থাকিয়া তাঁর কর্ম্মপথ বিস্তৃত করিয়াছেন, আমরাই ত এখন context হারাইয়া বসিয়াছি। এ অন্ধকারের আলোক তিনিই।

আর এক কথা—যে সকল শব্দ "অনবগতস্বরসংস্কার" সেই সকল শব্দের ব্যাখ্যা মহর্ষি যাহা করিয়াছেন তাহার কোন প্রামাণ্য নাই, আর অন্যের কথার প্রামাণ্য আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি?

স্বর বা accentএর কথাটা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি; স্বরকে (accent) বাদ দিয়া বেদের ব্যাখ্যা হইতেই পারে না। স্বরই হইতেছে বেদ ব্যাখ্যার প্রাণ। বেদের ব্যাখ্যা করিতে যাইবার আগেই

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।"

ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া লেখনী সঞ্চালনের চেষ্টা করা উচিত। স্বর (accent) বৈদিক যুগের একটা মহা সম্পদ্, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগেই ইহার অস্তিত্ব, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগে ইহা লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদিকযুগে যে ইহার একটা বিশেষ উপযোগিতা ছিল তাহা একবার প্রাচীন শাস্ত্রাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। পদের নানারূপ আকৃতিগত পরিবর্ত্তন আজ আমরা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারি না, কারণ আমরা স্বরবিজ্ঞান শাস্ত্রে সকল রকমে অনভিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তন স্বর জন্যই হইয়া থাকে; বেদ, বিদুঃ, রাজন্, রাজ্ঞা, যজতে, ইজ্যাতে ইত্যাদি শব্দের আকৃতিগত বৈপরীত্য স্বর পরিবর্ত্তনের ফলেই ঘটিয়া থাকে।

উদাত্তাদি স্বর সন্নিবেশ ভেদে পদের অর্থেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সমস্ত পদ-সমূহে (Compounds) এই অর্থগত তারতম্য বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। বৈদিকযুগে মন্ত্রাদির উচ্চারণ স্বরসংযোগ পূর্ব্বকই হইত এবং তার ফলে মন্ত্রের প্রকৃত অর্থও প্রকাশ পাইত। এখন আর সেই স্বরসম্বলিত মন্ত্রোচারণও নাই, মন্ত্রার্থও অভিব্যক্ত হয় না, মন্ত্রের ফলবত্তাও দেখা যায় না।

এইরূপ আখ্যায়িকা আছে যে, বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বধসাধনের নিমিত্ত একটি যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে পুরোহিত "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" এই স্থলে তৎপুরুষ সমাসের স্বরের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসের স্বর উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই জন্য বৃত্র ইন্দ্রের শত্রু না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের শত্রু হইয়াছিলেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, স্বরের পরিবর্ত্তনে অর্থের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। স্বর সন্নিবেশ ক্রমানুসারেই বৈদিকযুগে পদের অর্থ করিয়া লইতে হইত। সায়ণাচার্য্যকৃত বেদ ভাষ্য একবার আলোচনা করিলেই এই কথার সত্যতা নির্ণীত হইয়া যায়। বেদের সমীচীন ও সুসঙ্গত অর্থ করিয়া লইবার জন্য স্বরজ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায়. অন্যথা মন্ত্ররাশি অবিদিতার্থই থাকিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বরের উপরেই অর্থ নির্ভর করিতেছে।

অতএব স্বর বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় এবং সে অর্থও সুসঙ্গত হইতে পারে না। কেবল প্রকরণ বা context পদ সংস্কার প্রভৃতির আলোচনাই মুখ্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বরভেদ বজায় রাখিয়া বৈদিক যুগের রীতি অনুসারে উচ্চারণ করা আজকাল সকলের পক্ষেই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। জিনিষটা যেন আজ স্বপ্নদৃষ্ট অবাস্তব পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে। এত জটিল বিষয়ে আজ একটা নূতনতর কিছু করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রাচীন পদ্ধতি সমূহ এখন স্মৃতি পথের অতীত হইয়া পড়িয়াছে; এখনকার ভাব, ভাষা, কল্পনা সবই

অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কাযে কাযেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদ্ধতির অনুসরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

আরও এক কথা, বেদ-ব্যাখ্যায় স্বরের উপযোগিতা না থাকিলে, পাণিনির স্বর-প্রকরণের কি প্রয়োজন থাকিত? স্বরজ্ঞান না থাকিলে বেদের ব্যাখ্যা যে অসম্ভব তা একবার স্বর প্রক্রিয়ার আলোচনায় মন দিলেই বুঝা যায়।

বর্ত্তমান কালে চীন দেশের ভাষায় উচ্চারণে নানারূপ স্বরভেদ লক্ষিত হয়। তাহাদের ভাষায় সংযুক্তবর্ণ একেবারে নাই, বর্ণের সংখ্যাও অতি কম, এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অর্থপ্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্বরভেদের (different pitch accentএর) সাহায্যে তাহাদের শব্দরাশি উচ্চারিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় উদাত্তের (pitch accentএর) ব্যবহার দেখা যাইত। আজ কাল আবার অন্যরূপ স্বরের ব্যবহার চলিতেছে, তাহার নাম stress accent। এই সকল স্বরভেদ অনুসারে অর্থ গ্রহণ করা অন্যের পক্ষে কি সম্ভব? যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারাই উহা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অর্থভেদ ধারণা করিতে পারেন।

আবার ভারতের কেহ কেহ বলেন, "যাস্কের ব্যাখ্যায় কোনরূপ তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না; সায়ণের ব্যাখ্যাও পরিস্ফুট নয়; স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যারও কোন মূল্যই নাই—এরূপ ব্যাখ্যা না করিলেই ভাল হইত।" তাঁহাদিগকে একবার জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কিসের বলে একথা বলেন? তাঁহাদের নবীন ব্যাখ্যার ভিত্তি কোথায়? নিজে নিজেই ব্যাখ্যা করিবেন কিরূপে? বর্ত্তমান যুগের ভাব, ভাষা, কল্পনা লইয়া দেবভাষার ব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারে? শব্দের সে অর্থ বা import আজ আর নাই। একটা "dead language"এর ব্যাখ্যা "living language"এর ভাব লইয়া হইতে পারে কি? কাযে কাযেই সবারই সেই গতি। আর স্বরের কথা ত আছেই।

তাই আমার বক্তব্য এই যে, যোগ্যের প্রতি সমাদর দানে কৃপণতা সম্পূর্ণ অনুচিত। পূজ্যপূজাব্যতিক্রম মঙ্গল-জনক নয়।

বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয় এরূপ গবেষণার প্রয়োজন আছে, বেদের অর্থ কি তাহাও জানিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিবাদ বা পাণ্ডিত্যের অভিমান করিবার প্রয়োজন নাই। পথ-প্রদর্শকের উপর দোষারোপ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। তাঁহার ব্যাখ্যার সত্যতা নির্ণয় করাই উচিত, তাঁহার ব্যাখ্যার অনুসরণ করাই উচিত। তাঁরা যেরূপ ভাবিতেন, আমরা সেরূপে ভাবিতে জানি না, তাঁদের ভাবের সঙ্গে তাঁদের জীবন যাপন প্রণালীর সঙ্গে আমাদের মিল হয় না, কাযে কাযেই তাঁদের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের ব্যাখ্যারও মিল থাকে না। এই অনৈক্যের জন্য প্রাচীন ব্যাখ্যা অর্থহীন ও অস্বাস্থ্যকর নয়, এই অনৈক্যের জন্য যাস্ক সায়ণ পরিত্যজ্য নয়। তাঁরা লৌহদুর্গ ভেদ করিয়া যে রত্ন আনিয়া দিয়াছেন, তাহা মাথায় ধারণ করিয়া লওয়া উচিত। বিচার করিয়া লইতে নিষেধ করি না, অন্ধের মত লইতে বলি না। কিন্তু বিচারটা ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া না হয় এই প্রার্থনা।

বেদের ভিতর দিয়াই আমাদের সমাজের পুষ্টি হইয়াছে, আমাদের সমাজের সঙ্গেই বেদের পূর্ণ সম্বন্ধ। আমাদের ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন এই বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, বেদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে জড়িত। বেদকে বাদ দিলে ভারতের, ভারতীয় সমাজের আর রহিল কি? প্রাণকে বাদ দিলে আর দেহের থাকে কি?

আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার—সবই বেদের ভিতর দিয়া; আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ—সবই বেদের মাঝে থাকিয়া, বেদের শাসনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া।

সেই বেদ আমাদের কি? তা বৈদেশিক জানিতে পারে না, আর তার সমীচীন ব্যাখ্যাও করিতে পারে না। বৈদেশিক ব্যাখ্যা করিবে বাহিরে দাঁড়াইয়া, আর যাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁর অন্তরে বাহিরে বেদকে জাগাইয়া তার মধ্যে থাকিয়া তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া।

তাঁদের কথা ছাড়িয়াই দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের ঘরের লোকের এ কি কথা! প্রাচীনকে অবমানিত করিয়া নিজের গৌরব-প্রতিষ্ঠা। অথচ সেখানে প্রাচীনই অভ্রান্ত, সত্য ও নির্ম্মল; প্রাচীনেরই স্থান সবার উপরে। দেশ, বিদেশের মনীষিগণ সেই প্রাচীনকে বরণ করিয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছে, আর আমরা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাই কেন?

লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিবার সময় আসিয়াছে; এখন নিজেদের মধ্যে দ্বেষ হিংসা ও পাণ্ডিত্যের অভিমান ত্যাগ করিয়া উদ্দেশ্যের অনুকূলে আমাদের গতিকে পরিচালিত করিতে হইবে। ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অতি সহজ কথা, কিন্তু সত্যের মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য শ্রম-স্বীকারে কৃতসংকল্প হওয়া বড়ই কঠিন। একটা অসম্ভব কল্পনাকে বাস্তবের মূর্ত্তি দিয়া ভুলিবার চেষ্টা কেন? আর সেরূপ করিবার উপাদান কৈ?

বৈদিক-ধর্ম্মের উপর সমাজের ভিত্তি গড়িয়া তোলাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। বৈদিক-ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্ম আমাদের সকল কাযের মূলে থাকিলে আপদ্ বালাই সব ঘুচিয়া যাইবে। সেই ধর্ম্মের মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা, তাহাতে প্রাণের সঞ্চার করা আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই কেন? সেই কর্ত্তব্য-পরিভ্রষ্ট হই কেন?

বৈদিক-যুগের কাহিনী এখন ঠানদিদির গল্পের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই ধর্ম্ম এখন ফল্গুর মত অন্তঃসলিল হইয়া চোখের আড়ালে আড়ালে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই সনাতন ধর্ম্ম অমর; অক্ষয় কবচে তার দেব-দেহ সুরক্ষিত। সে ধর্ম্ম আছে, ঘুমাইয়া আছে, আমাদের চোখের আড়ালে আছে, ভস্মাচ্ছাদিত মণির ন্যায় আবর্জ্জনার মধ্যে আত্মশরীর লুকাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইতে হইবে, চোখের সামনে আনিয়া ধরিতে হইবে, সাধনার জলে তার ভস্মমলিন দেহখানি ধুইয়া শ্রীসম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। এখন কি পাণ্ডিত্যের অভিমান সাজে, এখন কি দ্বেষ হিংসায় হৃদয়টাকে ভরিয়া ফেলিয়া মনের মাঝে একটা মলিনতার সৃষ্টি করা ভাল দেখায়?

বৈদিক ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলি কেন? সেই ধর্ম্মের উপর সমাজের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে আমরা চাই কেন? কারণ চোখের সামনেই পড়িয়া আছে, অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে না। এমন উদার ধর্ম্ম আর নাই, এরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মও আর নাই। যে ধর্ম্ম উদার, যে ধর্ম্ম মহান্ তাহাতেই সমাজের প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সঙ্কুচিত ভাব লইয়া যে ধর্ম্মের পরিপুষ্টি, অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে যে ধর্ম্মের জীবন-সঞ্চার, যাহাতে কোনরূপ উৎকর্ষ বা বিশিষ্টতা নাই—তাহা সমাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিরূপে গৃহীত হইতে পারে না। তাহা হেয় ও পরিত্যাজ্য বলিয়াই মনে করা উচিত। সেরূপ ধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। যে ধর্ম্ম বিশ্বকে চায়, যে ধর্ম্ম ব্যথিত আর্ত্তকে চায়, যে পতিতকে নিজের বুকের উপর তুলিয়া লয়, যে ধর্ম্মে মানুষ সমতার গণ্ডী ছাড়াইয়া আপনার মাথা উঁচু করিয়া দেখে না, যে ধর্ম্ম হৃদয়ের, যে ধর্ম্ম সমবেদনার, য ধর্ম্ম "শুনি চৈব শ্বপাকে চ সমদর্শী"—সেই ধর্ম্মই বৈদিক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম। ভিত্তি গড়িতে হইবে সমাজের সেই ধর্ম্মেই, জীবনের গতি পরিচালিত করিতে হইবে সেই ধর্ম্মেই, সকল চেষ্টা সকল সাধনার পরিসমাপ্তি হইবে সেই ধর্ম্মেই।

এই ধর্ম্মেই আত্মলাভ, এই ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠা, এই ধর্ম্মেই পর্য্যবসান যে সমাজের, সেই সমাজই স্থায়ী, সেই সমাজই পবিত্র, সেই সমাজই অনুকরণীয়।

বৈদিক-যুগের ধর্ম্মের বিশিষ্টতা অহিংসায়, সর্ব্বত্র প্রীতিতে। এই বিশিষ্টতা অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। গো-রক্ষার ব্যবস্থা অন্যত্র দুর্লভ, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে তাহার পালনই ধর্ম্ম; এই অহিংসার জন্য ইহা নির্ম্মল, পবিত্র ও কল্যাণজনক।

বেদের পঠন-পাঠন সমাজ হইতে বিদায় লইয়াছে; গৃহে গৃহে আর সে তপোবনের চিত্র দেখি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আর সেই উদার ভাব ব্যক্ত হয় না। এখন সংস্কৃতের

অধ্যয়ন উপেক্ষিত, অনাদৃত। এমন কয়টা চতুষ্পাঠী আজ ভারতে আছে যেখানে বেদের পঠন পাঠন হয়? বৈদিক ব্যাকরণ পাণিনি—তারও অধ্যয়ন প্রায় সর্ব্বত্রই লুপ্ত হইয়াছে। যে যে অঞ্চলে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অধ্যয়ন প্রচলিত আছে, সেখানেও আবার বৈদিক অংশটুকু বাদ দিয়া পড়ান হয়। কারণ কি? বৈদিক আলোচনার প্রতি এত অনাদর কেন? কাব্য নাটক লইয়াই সংস্কৃতের রাজ্য নয়, তাহা একটি ক্ষুদ্রতম অঙ্গমাত্র। কাব্য নাটক আর লৌকিক ব্যাকরণ পড়িয়া আমাদিগকে পণ্ডিত বলিতে পারি না। যাহাতে সকলের প্রতিষ্ঠা, যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সংস্কৃত কাব্য দর্শনাদি আত্মলাভ করিয়াছে, যাহাতে ভাষা তত্ত্বের পূর্ণ গবেষণার বীজ উপ্ত রহিয়াছে সেই সর্ব্বকামধুক্ বেদ শাস্ত্রের আলোচনা আজ কৈ? ইহা কি কম দুঃখের বিষয়!

আরও দুঃখের বিষয় এই যে এই বৈদিক আলোচনার অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল কিছুই হারাইতে বসিয়াছি।

কিন্তু আজ বুক ফুলাইয়া মাথা তুলিয়া একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি; আজিকার দিনে একটা বড় আশা ও আহ্লাদের কথা—এই "পোষ্ট গ্রেজুয়েট ক্লাস।" মহাপ্রাণ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বযত্ন-কল্পিত অমানুষিক পরিশ্রমের ফল, লোকহিতৈষণার পুণ্য প্রস্রবণ! এখানে বেদ বেদান্ত কাব্য দর্শন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অজস্র অর্থব্যয়ে, অত্যুদার লোক-কল্যাণ-কামনায় ও দৈবী প্রতিভার ফলে আজ আবার তিনি শূন্য ভারত-বক্ষে বহুযুগবিস্মৃত ঋষিতপোবনের পুণ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে এই মহাপুরুষের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

১৯২১ সালের Annual Convocationএ মহামান্য লর্ড রোনাল্‌ড্‌সে মহোদয় কি বলিয়াছিলেন?

"Surely you must be proud of the splendid attempt which is being made here to render to Indian civilization and culture the homage which is its due. Teaching of the highest order along with research work by Indian scholars of repute is being carried on in a number of branches of higher Sanskrit, which in themselves cover a wide field of ancient Indian learning."

কথাটা কত গৌরবের! কে এই গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছেন? তাঁর বরণীয় শীর্ষ কি দেবের বরমাল্যে মণ্ডিত নয়?

শ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্তিনাথ

মুক্তিনাথ স্থানটী কোথায় তাহা ভূগোলে পড়ি নাই, ম্যাপে এটলাসে দেখি নাই, অথবা "হিমালয়," "হিমাচল" কি "হিমারণ্য" ভ্রমণকারীদের লিখিত পুস্তকেও উল্লেখ পাই নাই। গত পূজার ছুটীতে (অক্টোবর ১৯২১) দার্জ্জিলিঙে অবস্থান কালে এক-জন নেপালী পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তাঁহারই নিকট প্রথমে মুক্তিনাথ, বা মুক্তিছত্রের নাম শুনিতে পাই।

আমি আগামী শিবরাত্রি (ফেব্রুয়ারী ১৯২২) উপ-লক্ষ্যে পশুপতিনাথ দর্শনে নেপাল যাইবার সংকল্প করিয়াছি শুনিয়া, পণ্ডিতজী আমাকে মুক্তিনাথ দর্শন করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন; এবং আমিও, যদি সম্ভব হয়, তবে দেখিয়া আসিব বলিয়া সংকল্প করিলাম।

মুক্তিনাথের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি কিনা, এই জন্য অনুসন্ধান করায় "Military Deparment" হইতে প্রকাশিত, "Gurkha," নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাইলাম:—

"Mastang pass is forty miles to East of Dhawlagiri and leads to a small principality of the same name. On the northern side of the pass on the high road to Mastang is Muktinath. Muktinath is 8 days journey from Mastang and 4 days from Beni shehar capital of Maliban."

নেপাল যাইবার জন্য কলিকাতা আসিয়া যখন বন্ধুগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন আমার বন্ধুর কনিষ্ঠা কন্যা একদিন একখানি বাঁধান পুস্তক আনিয়া বলিল, "কাকা, তুমি নেপাল যাবে, এই বইয়ে নেপালের অনেক সংবাদ আছে।" পুস্তকখানি ১৩২৪ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩২৫ এর শ্রাবণ পর্য্যন্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" একত্রে বাঁধান। প্রবন্ধটীর নাম "নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন।" ইহাতে কিন্তু "দর্শন" অতি অল্প, ইউরোপীয় লেখকের লেখার অনুবাদেই জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের প্রবন্ধ দুটী পরিপূর্ণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবন্ধের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় উপরিউক্ত ইংরেজী সংবাদের একটা বাঙ্গলা তর্জ্জমা পাইলাম:—

"২। মস্তং পথ। ধবলাগিরি হইতে ২০ ক্রোশ দূরে এই পথ। ধবলাগিরির পাদদেশে ঐ নামে একটী প্রদেশ আছে। তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চস্থানে মস্তং উপত্যকা অবস্থিত। ইহার রাজা নেপালকে কর দিয়া থাকেন। এই গিরিপথের উত্তর ভাগে প্রধান রাস্তার উপর মুক্তিনাথ তীর্থ। এখানে তিব্বতীয় লবণের ব্যবসায় আছে।"

ব্রহ্মচারীজী (মানসী ও মর্ম্মবাণীর প্রবন্ধ-লেখক) অনুবাদে একটু ভুল করিয়াছেন। মস্তাং উপত্যকা ধবলাগিরির পাদদেশে নহে, এবং মুক্তিনাথে তিব্বতীয় লবণেরও কোন কারবার নাই। মস্তাংএ তিব্বতীয় লবণের ব্যবসায় আছে।

তাঁহার অনুবাদে আরও একটী ভুল দেখিলাম। "গোসাই থান হইতে ৫৬ ক্রোশ পূর্ব্বে এভারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ।" মানসী, জ্যেষ্ঠ ১৩২৫, ৩৪৫ পৃঃ। এভারেষ্ট **বা** গৌরীশঙ্কর নহে। এভারেষ্ট **এবং** গৌরীশঙ্কর।

গৌরীশঙ্কর একটী শৃঙ্গ এবং এভারেষ্ট অপর একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ শৃঙ্গ। গৌরীশঙ্কর সমুদ্র বক্ষ হইতে ২৩৪৪০ ফিট, এবং এভারেষ্ট ২৯০০০ ফিট উচ্চ। গৌরী-শঙ্করের পূর্ব্বে এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে এভারেষ্টের সংস্থাপন। বর্ত্তমানে Everest Evpedition হইতেছে, গৌরীশঙ্কর Expedition নহে।

৩৪৯ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মচারীজী লিখিয়াছেন,"নেপালে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যুক বলার অপরাধে মেকলে সাহেবকে বোধ হয় আর কেহ ইহার পরে অপরাধী করিবেন না। ব্রহ্মচারীজীর নেপালে অবস্থিতি বড় জোর সাত দিন-এবং ইহার মধ্যেই ৫৪০০০ বর্গ মাইলব্যাপী এবং ৫৬০০০০০ অধিবাসী কর্ত্তৃক অধ্যুষিত নেপালের নৈতিক অবস্থা অবগত হইয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

যাক্ সব অবান্তর কথা। "গুর্খা" এবং "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পড়িয়া মুক্তিনাথের ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। নেপালে যাইয়া পথ ঠিক করিয়া পরে যাহা হয় করা যাইবে, এই ভরসায় ১০ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ত্যাগ করিয়া রক্সৌলের পথে নেপাল যাত্রা করিলাম।

টুণ্ডলায় রামলাল খালাসীকে কোনও সাহেব ড্রাইভার প্রহার করিয়াছে এই অভিযোগে তখন ই, আই, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। মোকামার পথে যাওয়া বিপজ্জনক না হইলেও, অসুবিধাজনক হইবে ভাবিয়া বৈকাল ২-৩ মিনিট সময় শিয়ালদহ ত্যাগ করিয়া রাত্রে লালগোলা ঘাটে পদ্মা পার হই, এবং ১৫ই প্রাতে কাটিহার পৌঁছি। ই, আই, রেলে ধর্ম্মঘট জন্য এ পথে অনেক যাত্রী। গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড়।

কাটীহরে ই, বি, আর লাইন ছাড়িয়া বি এণ্ড এন্ ডব্লিউ রেলওয়ে লাইনের গাড়ীতে উঠি। এই পথে প্রায় সমস্ত বড় বড় ষ্টেশনেই Non co-operation volunteerগণ খদ্দীতে সজ্জিত হইয়া "গান্ধীকী বাণী" "স্বরাজ" ইত্যাদি ছোট ছোট পুস্তিকা যাত্রীদিগের নিকট বিক্রয় জন্য গাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত নানা ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। কোন ষ্টেশনে বা সুকণ্ঠ অল্পবয়স্ক বালকেরা স্বদেশ সঙ্গীত গাহিতেছে। আবার অন্য কোন ষ্টেশনে অন্ধ ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া "কৈকেয়ীবাচা" রামায়ণ গাহিয়া ভিক্ষাপ্রার্থনা করিতেছে।

বেলা প্রায় দুইপ্রহরে বারুণী জংসনে পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী বদল করিয়া দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকিতে হইল।

বহুকাল "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল"এ ভোজনে অনভ্যস্থ। কলিকাতা হইতে যে খাদ্য আনিয়াছিলাম তাহা গত রাত্রেই নিঃশেষ করিয়াছি। অগত্যা ষ্টেসনের লাইসেন্স ভেণ্ডারের নিকট হইতে ক্রীত "হালুয়া পুরী" দ্বারা উদরতৃপ্তি করা গেল।

ষ্টেশনের বারান্দায় ব্যাগ ও বিছানা নিয়া বসিয়া আছি। খদ্দর পরিহিত একটী যুবা নিকটে আসিয়া, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি এইরূপ দুই একটী প্রশ্নের পর, বাঙ্গালায় non-co-operationএর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার উদ্যোগ করিলেন। আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় দেওয়াতে তিনি আর এ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর না হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সমস্তিপুরগামী গাড়ী আসাতে জিনিষ পত্র নিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা প্রায় ৫টার সময় সমস্তিপুর পৌছিলাম। এখানে আমাদিগকে আর গাড়ীর অপেক্ষায় থাকিতে হইল না—গাড়ীই অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় ছিল। গাড়ীতে উঠার কিছুক্ষণ পরে আমার কামরায় যাত্রী উঠা নিয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। একদল গাড়ীতে উঠিতে চায়—আর যাহারা পূর্ব্ব হইতে গাড়ীতে ছিল, তাহারা নবাগতদিগকে বাধা দেয়। এই গোলযোগে কেহ কেহ উঠিতে পারিল, কেহ কেহ ব্যর্থমনোরথ হইয়া অন্য কামরার সন্ধানে ছুটিল। গোলমাল নিবৃত্ত হইলে একজন প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তিরহুতীয়াকো ছোরাজ (স্বরাজ) কভি নেহি মিলেগা।" কথাটা কাণে যাওয়াতে আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি কথকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কথকও অন্যান্য সকলের মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ

বাবু সাহেব, এই তিরহুতীয়া লোক যেখানে দুইজন একত্র হইবে সেইখানেই ঝগড়া করিবে। একজন গোরা আদমী নিজের অসুবিধা করিয়াও আর পাঁচ জন গোরা আদমীর জায়গা করিয়া দেয়। আর এই তিরহুতীয়ারা নিজের একটু অসুবিধার জন্য সকলকে তাড়াইয়া দেয়। ভারতের সর্ব্বত্র স্বরাজ পাইলেও, ত্রিহুতে কিছুতেই স্বরাজ হইবে না।" বক্তা হিন্দুস্থানীতেই বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহার ভাব মাত্র দিতে পারিলাম।

দ্বারভাঙ্গা পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখানে গাড়ী এক ঘণ্টা থাকে। অধিকাংশ যাত্রীই এখানে নামিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া লইলেন। আমিও প্লাটফর্ম্মে পায়চারী আরম্ভ করিলাম। একখানা গাড়ীতে অনেক ভস্মলিপ্ত মুখ, জটাধারী গেরুয়া পরিহিত লোক দেখিয়া সেখানে গেলাম। পরিচয়ে জানা গেল তাঁহারা সকলেই পশুপতিনাথ যাত্রী। স্বর্ণলতার নীলকমলের যেমন একটা ধারণা ছিল যে ফিরিওয়ালারা বলিতে পারে কোথায় যাত্রাগান হইবে, আমারও কতকটা সেইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে এই তথাকথিত সন্ন্যাসীর দল হয়ত সমস্ত সংবাদ দিতে পারেন। দুই একজনকে মুক্তিনাথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে কেহ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তীর্থ-করা আমীর লোকের কার্য্য নহে।" কেহ কেহ বা যে সমস্ত উত্তর দিলেন তাহাতে এখন বুঝিতে পারিতেছি যে তিনি মুক্তিনাথ কখনও যান নাই, নামও শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উত্তরের নমুনা যথা—"মুক্তিনাথের পথে পাহাড়ীরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, যে কোন লোক দেখিলেই তাহাকে খুন করিয়া ফেলে। সেখানে গৃহী তো যাইতেই পারে না বৈষ্ণবেরাও যাইতে পারে না, কেবল সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ যাইতে পারে।" কাহারও উত্তর যে, পথ বড় দুর্গম, সাত দিন একাদিক্রমে বরফের উপর দিয়া চলিতে হয়। কোথাও বিশ্রাম স্থান নাই, লোকালয় তো দূরের কথা। যাহারা অন্ততঃ ৭।৮ দিন অনাহারে চলিতে পারে তাহাদেরই মুক্তিনাথ দর্শনের সম্ভাবনা।—মুক্তিনাথ সম্বন্ধে এইরূপ নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের গাড়ীতে আসিলাম। যথা সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ভোর ৩ টায় রক্‌সৌলে গাড়ী থামিল। তখন কুলী ডাকিয়া ব্যাগ বিছানা নামাইয়া ষ্টেসনের বাহিরে আসিলাম। ষ্টেসনটী ছোট, কুলীর সংখ্যা অধিক নহে। যে কুলী আমার জিনিষপত্র গাড়ী হইতে নামাইয়াছিল, সেই আমাকে রকসৌল বাজারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু সে গাড়ী হইতে আরও কয়েকটা মাল নামাইয়া আমাকে লইয়া যাইবে আশা দিয়া গাড়ীর দিকে ছুটিল।

ষ্টেশনের বাহিরে নিজের জিনিষপত্র আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে অনতিদূরে হ্যাট হাতে শাল গায়ে একটী মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইল। নিকটে যাইয়া আলাপে জানিলাম তিনি নেপাল কলেজের একজন অধ্যাপক।

কলিকাতা হইতে নেপাল যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই নেপাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার রায় চৌধুরী এম-এ, মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। এখন সুধীর বাবু ও তাঁহার সঙ্গী অন্য তিন জন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা সকলেই নেপাল যাত্রী, তবে তীর্থযাত্রী নহেন।

শিবরাত্রি ২৪শে ফেব্রুয়ারী, এখনও আট দিন বাকী। সাধারণতঃ যাত্রীদিগকে শিবরাত্রির ৪ দিন পূর্ব্বে নেপাল সীমানা পার হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। আমাকে হয়ত আরও ৪ দিন রকসৌলে অবস্থান করিতে হইবে এই বিবেচনায় আমি রকসৌল বাজারে গেলাম। সুধীর বাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ বীরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রকসৌল স্থানটী মতিহারী জেলার অন্তর্গত। এখানে একটী থানা (পুলিশ ষ্টেসন) আছে। আমি পূর্ব্বেই আমার আগমন বার্ত্তা থানার দারোগা বাবুকে জানাইয়া-ছিলাম। দারোগা বাবু একজন বিহারী ক্ষত্রির, থানাতে অবশিষ্ট রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। কিন্তু থানায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। থানার হাতা (Compound), চৌকীদারী ঘর, নিকটস্থ মাঠ সমস্তই লোকে পূর্ণ—ইহারা সকলেই নেপাল যাত্রী। দারোগা বাবুর নিকট জানিতে পারিলাম যে আমাকে আর রক্সৌল অপেক্ষা করিতে হইবে না, অদ্য হইতেই যাত্রী দিগকে নেপাল যাত্রার অনুমতি দিতে নেপাল দরবার হইতে হুকুম আসিয়াছে। সুধীর বাবুদের সঙ্গে এক সঙ্গে যাইতে পারিব মনে ভাবিয়া কতকটা আহ্লাদিত ও অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কুলীর মাথায় ব্যাগ ও বিছানা চাপাইয়া বীরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। দারোগা বাবু সঙ্গে একজন চৌকীদার দিলেন, সে বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

ব্রিটীশ ভারতবর্ষ ও নেপাল রাজ্যের মধ্যে সীমানা একটী ছোট খাল। নাম বোধ হয় সাধু ভাষায় ত্রিস্রোতা কি শ্রীস্রোতা হইবে। চৌকীদার বলিল "শ্রীসোয়া।"

এই অগভীর অপ্রশস্ত খাল পার হইয়া নেপাল সীমানায় পৌঁছিলাম। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় যাত্রীদল বীরগঞ্জ অভিমুখে ছুটিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বিহার ও বঙ্গদেশবাসী সাধু সন্ন্যাসী, অবধূত, গৃহী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন আশ্রম ও ধর্ম্মাবলম্বী সহস্র সহস্র লোক এক অথবা বিভিন্ন উদ্দেশে একস্থানে চলিয়াছে।

যেখানে যাত্রীদিগকে অনুমতি পত্র দেওয়া হয় ক্রমে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রকাণ্ড মাঠ, নিমন্ত্রণ ভোজীদের ন্যায় যাত্রিগণ পংক্তিতে বসিয়া গিয়াছে। যাহাতে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না হয় তাহার তত্ত্বাবধারণের জন্য উচ্চতম রাজ কর্ম্মচারী হইতে অনেকেই সেখানে উপস্থিত।

আমি যাত্রীদের পংক্তিতে না বসিয়া, যেখানে প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন চৌকীদারের নির্দ্দেশ মত সেখানে যাইয়া তাঁহাকে আমার নামের ছাপান কার্ড দিলাম। তিনি তখন "পণ্ডিতজী"কে ডাকিতে আদেশ দিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী রাণা বংশীয় ও কাঠমুণ্ডুর অধিবাসী। তাঁহার চেহারা ও পোষাক নেপালী। অন্য পণ্ডিতজী নেপাল তেরাইএর অধিবাসী, মুণ্ডিতমুখ, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের মত পরিধানে সাদা ধুতি গায়ে সাদা আংরাখা (অঙ্গরক্ষা) মাথায় সাদা টুপী। পণ্ডিতজী দূরে যাত্রীদিগকে "পাশ" বিতরণ করিতেছিলেন, প্রধান কর্ম্মচারীর আহ্বানে তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন ডাক্তার বাবু আর "পাশ" বাহক। ডাক্তার বাবুর খাঁটি ইউরোপিয়ান ড্রেস—ইনি বাঙ্গালী। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় আমাকে দেখাইয়া দিলে পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি একা, না সপরিবার? আমি বলিলাম আমি একা। তখন তিনি পাশ বাহকের মাথার প্রকাণ্ড ঝুড়ি হইতে কি ভাষায় ছাপ দেওয়া একটুকরা কাগজ আমার হাতে দিলেন। ডাক্তার বাবু একবার আমার ডান হাতের নাড়ী স্পর্শ করিলেন এবং আমি নেপাল যাত্রার কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ অথবা কোন সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত নই ইহা ঠিক করিলেন। যেখানে ৪ দিনে ত্রিশ সহস্র যাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হয় সেখানে ইহা অপেক্ষা অধিক আড়ম্বর অসম্ভব।

"অনুমতির" মাঠেই নেপালযাত্রী কুলী ঠিক হইল। যেমন যাত্রীর দল তেমন কুলী, কাণ্ডি বাহক, ডুলী বাহকের দল। শিবরাত্রির উৎসবই এই জাতীয় পরিশ্রমকারীদিগের উপার্জ্জনের একটী সময়। কাণ্ডিবাহক কি ডুলীওয়ালা তাহারা আমাকে বহন করিয়া কিছু উপার্জ্জনের আশায় আসিয়াছিল, তাহাদিগকে জানাইলাম যে আমি পদব্রজই তীর্থযাত্রা করিব। এখানেই জানিতে পারিলাম যে সুধীর বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণ তখনও বীরগঞ্জ ত্যাগ করেন নাই; ধরমশালায় আছেন। আমি নব নিযুক্ত কুলীর পৃষ্ঠে (মস্তকে নহে) জিনিষ পত্র চাপাইয়া নিজে একা চড়িয়া ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

ধর্ম্মশালার নিকবর্ত্তী ওভারশিয়র বাবুর বাসায় পাকের উদ্যোগ হইতেছে; আমি তাড়াতাড়ি সেখানে

যাইয়া "আমিও একজন আছি" পাচক ব্রাহ্মণকে এই সংবাদ দিলাম। আজ হইতেই আমি অধ্যাপক চতুষ্টয়ের সঙ্গে "একান্নভুক্ত" হইলাম এবং মুক্তিনাথ যাত্রার দিন "পৃথগন্ন" হইয়াছিলাম।

অধ্যাপক চতুষ্টয় William's cart এ (তাঞ্জাম বা থাং চাং) যাইবেন, আমি পদব্রজে যাইব। কিন্তু রাত্র আমাদিগকে একত্র হইতে হইবে—এই জন্য আমি ১০.২৫ মিঃ বীরগঞ্জ হইতে কুলী সমভিব্যাহার যাত্রা করিলাম।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সিম্‌রীয়া বাজার পৌছিলাম। সিম্‌রীয়া বাজার যাত্রীদিগের বিশ্রামের একটা আড্ডা। কুলী তাহার বোঝা নামাইয়া "খাজ্ঞা" (জলখাবার) কিনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী দোকানে গেল, আমিও এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম।

আমার পূর্ব্বে একদল নাগা সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ২।৩টী নগ্ন সন্ন্যাসীও ছিল। পাছে গাছতলাটী আমি দখল করিয়া তাহাদের রাত্রিবাসের কোন অসুবিধা করি এজন্য তাহারা আমার বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে আপত্তি করিল। আমি সেখানে রাত্রিবাস করিবনা ইহা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাদের আপত্তি নিরাস করিলাম। বিষয়টী যত সহজে লেখা গেল কার্য্যটী তত সহজে নিষ্পন্ন হয় নাই।

অদ্য আমার গন্তব্য স্থান এখান হইতে ৮ মাইল দূর বীচাগড়ি। গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ। এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া সীম্‌রীয়া হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটি রেল লাইন গিয়াছে। এই পথে গাড়ীতে করিয়া পাথর (ballast) আনা হয়। গাড়ীগুলি এঞ্জিনের সাহায্যে চালানো হয় না, মানুষে ঠেলিয়া নিয়া যায়।

বীরগঞ্জ হইতে কাঠমুণ্ড পর্য্যন্ত টেলিফোঁ আছে। তাহার তারও এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বীচাগড়ি পৌছি। তীর্থ যাত্রার পথে অপরিচিত স্থানে এই প্রথমে রাত্রিবাস। এখানে একটী দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালায় যাইয়া দেখি অনেক লোক। অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, "জায়গা নেহি মিলেগা।" আরও একটী ভদ্রলোক আমার অবস্থাপন্ন। তিনি নেপাল তেরাইর অধিবাসী, তিনি বাজারে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। একটী হিন্দুস্থানী যুবক আমাদের নিকট ছিলেন, তিনি আমাকে বাজারে নিয়া আসিয়া রাত্রির জন্য একখানা ঘর ভাড়া করিয়া দিলেন। রাস্তার অপর পারে এক হিন্দুস্থানী হালুয়াইর দোকান ছিল, সেখান হইতে কিঞ্চিৎ মিঠাই ক্রয় করিয়া রাত্রির জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম।

আরও ২।১ টী যাত্রী পাশের ঘরে বাসা নিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। একজন সন্ন্যাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাঙ্গালী বাবু চা হ্যায়?" আমার সঙ্গে চা ছিল। সন্ন্যাসীর এই চা প্রার্থনায় আমারও চা পানের পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন ব্যাগ খুলিয়া চা বাহির করিলাম। কুলীকে গরম জল বুঝাইতে আমার বিদ্যায় কুলাইল না, পার্শ্ববর্ত্তী একটী যাত্রী বলিলেন "তাত পানি"। তখন কুলী হাসিয়া জল নিয়া হালুইর চুল্লী হইতে গরম করিয়া আনিল এবং আমরা "সমবেত যাত্রী মণ্ডলী" চা পান করিলাম।

চা পান অন্তে সভা ভঙ্গ হইল। আমিও একবার বাহিরে আসিলাম। যাত্রীর দল মাঠেই অধিকাংশ আশ্রয় নিয়াছে। শীতকাল। প্রত্যেক যাত্রী দলই হিম হইতে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার জন্য ধুনি জ্বালাইয়াছে। কেহবা পাক করিতেছে। চারি দিকে যেন একটা উৎসবের চিহ্ন—দেখিতে বেশ।

কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বপরিচিত হিন্দুস্থানী যুবকটী আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, আরও চারিজন বাঙ্গালী বাবু আসিয়াছেন। বুঝিলাম যে অধ্যাপক চতুষ্টয়ের আগমন হইয়াছে। সে রাত্রে আর "আশ্রয়স্থানং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।" যুবককেই অনুরোধ করিলাম তিনিই যেন ঐ বাবুগণকে সংবাদ দেন যে আমি এখানে আছি, কাল সকালে দেখা হবে।

বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই যুবকটী প্রথম

হইতেই আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে আমার যতটুকু প্রয়োজন তাহা স.ধন করিয়াছেন। ইঁহার নামটী পর্য্যন্ত আমি জানিনা কিন্তু এই উপকারটুকু আমরা চিরকাল স্মরণ থাকিবে।

১৭ই তারিখে প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপননান্ত ধর্ম্মশালাতে গেলাম। ধর্ম্মশালাতে স্থান না পাওয়াতে অধ্যাপক চতুষ্টয়কে স্থানীয় ওভারসিয়র বাবুর বাসায় আশ্রয় নিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে ঠিক হইল যে অদ্য ভোজনান্তে এখান হইতে রওয়ানা হইতে হইবে, এবং শুপারীটার নামক স্থানে ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিতে হইবে।

এই অধ্যাপক চতুষ্টয়ের সঙ্গে কেক্ পাউরুটী ডিম্ব প্রভৃতি কলিকাতা হইতে এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি তীর্থ যাত্রা করিলে কি হয়, "কম্‌লী তো ছোড়তা নেহি"। ডিম্ রুটী যে আমার অনুসরণ করিয়া এখানেও আসিয়াছে! তৃপ্তি সহকারে চা পান করা গেল। যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে শিবরাত্রিতে পশুপতিনাথ দৃষ্টে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইবে। স্নান ভোজন অন্তে আমি ৯-২০ মিঃ বীচাগড়ি হইতে রওয়ানা হইলাম।

বীরগঞ্জ হইতে বীচাগড়ি পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল। যদিও পাকা রাস্তা নহে, তবু রাস্তা আমাদের দেশের জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তার ন্যায়। বীচাগড়ী হইতেই পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইল। একটী শুষ্ক পার্ব্বত্য নদীর মধ্য দিয়া পথ। নদীটী এখন শুষ্ক, কেবল বালুকা ও উপলখণ্ড (boulders) কোথাও মাঝে মাঝে একটী ক্ষীণ জলধারা দেখা যায়। বর্ষাকালে এই পার্ব্বত্য নদী সমস্ত বেগবতী হয়, তখন এ পথে নেপাল যাওয়া অতিশয় কষ্টকর। এই শুষ্ক নদী গর্ভের পথে প্রায় ৬ মাইল হাটিয়া বেলা ১২ টার বুরিয়ায় উপস্থিত হইলাম।

বুরিয়া একটী গিরিসঙ্কট। দুই পার্শ্বে জঙ্গলাকীর্ণ অতি উচ্চ পর্ব্বত তাহার মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। পর্ব্বত গাত্র হইতে জল পড়িয়া পথটীকে অনেক যায়গায় অত্যন্ত পিচ্ছিল করিয়াছে। বুরিয়াতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করিলাম। গিরি সঙ্কটের অপর প্রান্তে একটা বিস্তীর্ণ স্থানে আসিলাম। এখান হইতে আবার ভাল রাস্তা আরম্ভ হইল। এই পথে কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে ছোট জঙ্গল দেখা গেল। এই জঙ্গলটী নাকি নানাবিধ হিংস্র ও অহিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। দিবা ভাগে কোন জন্তুর সাক্ষাৎ পাই নাই। পক্ষান্তরে পশ্চাৎ হইতে এক রকম অদ্ভুত ভাষা শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, একজন মুণ্ডিত কেশশ্মশ্রু গেরুয়া পরিহিত প্রৌঢ়, সঙ্গে আর একজন নীলাম্বরধারী যুবক। আমাকে দেখিয়া প্রৌঢ়টী অযাচিত ভাবেই ইংরেজীতে বলিলেন যে তিনি এক মাদ্রাজী বৈষ্ণব, নাম নাইডু হিন্দি জানেন না, তামিল ও ইংরেজী জানেন। ইঁহার সঙ্গে পথে আলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আজ অধ্যাপক চতুষ্টয়ের যান আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া গেল। আমিও আমার নূতন সঙ্গী দুটী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শুপারীটারে পৌছিলাম।

ধর্ম্মশালা একটী ক্ষুদ্র টীলার উপরে অবস্থিত। টীলার নিম্নে রাস্তা, রাস্তার অনেক নীচে একটী পার্ব্বত্য নদী। এটী শুকভোরা নদী নহে, এটী ভরা নদী ক্ষুর-ধারা খরপবশা জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নদী মধ্যস্থ প্রস্তরের উপর পড়িয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করি-তেছে। রাত্রে ধর্ম্মশালায় অবস্থিত করা গেল। নাইডু তামিল ভাষায় গান করিয়া সকলকে আমোদিত করিলেন। আমোদের প্রধান কারণ যে গানের এক বর্ণও আমরা কেহ বুঝিতে পারিলাম না।

১৮ই ফেব্রুয়ারী। অদ্য আমাদিগকে শেষ গিরি উত্তীর্ণ হইয়া কুকীথানিতে পৌছতে হইবে। আমি সকাল ৪ টায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, মধ্যরাত্রে চন্দ্রোদয় হইয়া চন্দ্রদেব এখন নদীর অপর পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্ব-তের শীর্ষদেশে অবস্থান করিতেছেন, একটু পরেই অদৃশ্য হইবেন। চারিদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতা; কেবল

পাহাড়িয়া ঝিঁ ঝিঁ তাহার বিকট শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর, ভীষণ জলকল্লোল। নদীতীরস্থ এক খানা প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া অনেক ক্ষণ স্বভাবের শোভা দেখিলাম। তার পর তীর হইতে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চে রাস্তায় উঠিলাম। এখান হইতে আবার ভিন্ন জাতীয় পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ। বামে নদী, নদীর অপর পারে অতি উচ্চ পর্ব্বত। দক্ষিণেও অত্যুচ্চ পর্ব্বত। এই নদীর দক্ষিণ তীর বাহিয়া আঁকা বাঁকা ভাবে রাস্তা টউবাসিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। ৪.৩৫ সময় সুপারীটার ছাড়িয়া ভীমফেদী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভোর ৬টার টেউবাসিয়ায় আসিলাম। এখানে একটী পুল পার হইয়া নদীর বামতীরে আসিলাম। টউবাসিয়াতে পুলের অপর পারে একটি আড্ডা। ২।৩ জন সিপাহী ও একজন হাবিলদার শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছে। কর্ম্মচারীকে পাশ দেখাইতে হইল। যত দূর স্মরণ পরে বীরগঞ্জ ছাড়িয়া এই দ্বিতীয় বার পাশ দেখাইলাম। এখান হইতে ভীমফেদী পর্য্যন্ত নদী দক্ষিণে রাখিয়া রাস্তা। বাম পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে ছোট ছোট পার্ব্বতীয় নদী দক্ষিণ দিকস্থ নদী'তে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত ছোট নদীতে ময়দা প্রস্তুতের পানিচাক্কি স্থাপন করিয়া নেপালীরা আপনাদের বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিতেছে।

বেলা ৯টায় ভীমফেদী পৌছিলাম। বীরগঞ্জে প্রদত্ত পাশ বদলাইয়া আবার নূতন পাশ গ্রহণ করিলাম। অধ্যাপক চতুষ্টয়ও আসিয়া পৌছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গী কুলীরা এখনও আসিয়া পৌছায় নাই, কখন আসিবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে আশ্রয় লইলাম। অধ্যাপক চতুষ্টয় তখন আমাকে বলিলেন যে, দুপ্রহরে শেষ গিরির "চড়াই" উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে হয়ত অসম্ভব, অথবা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। সুতরাং আমাকে অদ্য ভীমফেদীতে অবস্থান করিয়া আগামী কল্য অতি প্রত্যুষে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে উপদেশ দিলেন। অথবা এখান হইতে নেপাল পর্য্যন্ত এক জন "তোকোওয়ালা" ঠিক করিয়া তাহার ঝুড়িতে বসিয়া পর্ব্বত উত্তীর্ণ হই। আমি তাঁহাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম না। সম্মুখের অত্যুচ্চ পর্ব্বত আমার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার না করিয়া বরং যেন আমোদ আনিয়া দিল। এই শেষ গিরিটী সমুদ্র বক্ষ হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চ।

আমার সংকল্প দেখিয়া তখন আর তাঁহারা আমাকে বাধা দিলেন না। ইত্যবসরে আমাদের খাদ্যবাহী কুলিটা আসিয়াও জুটিল। টিফিন বাস্কেটে রুটি মাখন ছিল। বাজার হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া চা প্রস্তুত করা গেল এবং চা রুটী দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আমি, নাইডু ও নাইডুর সঙ্গী এই তিন জনে শেষ গিরি অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শেষ গিরির "চড়াই উৎরাই"তে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, সমস্ত পথে জল নাই। বন্ধুগণ তখন আমার দুই পকেট পুরিয়া কমলা লেবু ও "লজেঞ্চস" দিলেন। অতি ধীরে ধীরে পর্ব্বতে উঠিতে উপদেশ দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন এবং শেষ গিরির অপর প্রান্তে কুলীথানির ধর্ম্মশালায় তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

আমার বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে কেবলই অভিযোগ শুনিতে পাই যে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত যুবকগণ কেবল স্বার্থপরতা ও অন্যান্য অপকৃষ্ট দোষেরই আধার হইয়া থাকে। আমার সৌভাগ্য বশতঃ সেরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আমার মিলন হয় নাই। উচ্চ শিক্ষা যে মানুষকে কত উদার করিতে পারে, অপরকে সুখী করিবার যে কি একটা প্রবল ইচ্ছা মানুষের মনে আনয়ন করে এই অধ্যাপক চতুষ্টয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

রক্সোল হইতে নেপাল পর্য্যন্ত অমি পদব্রজে, আর ইঁহারা William's cart এ (থাং জাং বা কাণ্ডী, অনেকটা হাতীর হাওদার মত চেহারা পাল্কীর ন্যায় মানুষে বাহিয়া নেয়) আসিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে আমাদিগকে একত্র আহার ও অবস্থান করিতে

হইবে, কাযেই আমাকে ইহাঁদের ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে রওয়ানা হইতে হইত। আমার জন্য ইহারা এই শীতের মধ্যে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া চা ও জল খাবার তৈয়ারী করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া রওয়ানা করিয়া দিতেন। নেপালে যে এত দিন ইঁহাদের সঙ্গে ছিলাম আমার সর্ব্ব প্রকারের ভার ইঁহারা নিয়াছিলেন। আমাদের দেশে লোকে বলিত, জগন্নাথ যেন মনে পড়ে কিন্তু পথ যেন মনে না পড়ে। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বে যখন যাত্রীদিগকে পদব্রজে পুরী যাইতে হইত তখনকার কথা। আমি কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিব না যে পথ যেন মনে না পড়ে। তীর্থ যাত্রার সুখই পথে এবং আমার মনে পথের এই সুখস্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

বেলা ১১টার সময় গিরি আরোহণ আরম্ভ করিলাম। আমাদের পূর্ব্বেও অনেক যাত্রী যাইতেছিল। তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকের মত দেখা যাইতে ছিল। "শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং" এই বাক্যার্থ মনে উদয় হওয়াতে অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় ১৩০ টার সময় "গৌরীতে" উপনীত হইলাম।

গৌরী নেপালের Custom office। দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া সংকীর্ণ পথ। সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ পথ অবরোধ করিয়া আছে। পথের বামে ও দক্ষিণে দুই খানি ঘর। এক যায়গায় আমার ব্যাগ খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত জিনিষ পত্র গুলি দেখিল। কোন রকম নিষিদ্ধ জিনিষ না পাইয়া বিছানাটা আর খুলিল না। মাত্র জিজ্ঞাসা করিল উহার মধ্যে বিছানা ভিন্ন অন্য কিছু আছে কি না। আমার কথাতে বিশ্বাস করিয়া মাল ছাড়িয়া দিল। তখন হয় ঘরের সম্মুখে উপনীত হইলাম।

শিবরাত্রির সময় অত্যন্ত যাত্রীর ভিড় হয় এই জন্য সেই সময় নেপাল হইতে ২।৪ জন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী গৌরীতে আসিয়া থাকেন। আমি সাধু সন্ন্যাসীর ভেকধারীও নহি, আবার তীর্থযাত্রীর ন্যায় "বোচ্‌কা বুচকী" না নিয়া Glandstone Bag, Holdallএ বাঁধা বিছানা পত্র নিয়া যাইতেছি, বোধ করি এই কারণে আমার পরিচয়টা একটু বিশেষ করিয়া নেওয়া দরকার। আমার নাম, পিতার নাম, বাড়ী, কি ব্যবসায়, নেপালে কেহ পরিচিত আছেন কি না ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম।

যেখানে নাম ধামাদির পরিচয় দিতে হইল সেই ঘরে কতকগুলি নামাঙ্কিত বাক্স আছে যেমন গৃহী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি এক এক জন লোকের জন্য ১টি করিয়া ভুট্টার দানা ঐ সব বাক্সে রাখা হয় এবং দিনান্তে গননা করিয়া ঠিক করা হয় কোন্ জাতীয় কত লোক সেই দিন গৌরী ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছে, এবং এই সংবাদ নেপালে টেলিফোঁ করা হয়।

গৌরী হইতে আরও কিছুদুর আসিয়া আমরা বামে একটী অধিত্যকার (table land) উপর বসিলাম। সহরটী বড়ই মনোরম। পরে জানিতে পারিলাম এইটী Parade ground (কুচ কাওয়াজের মাঠ।) এথান হইতে প্রথমতঃ চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। দারজ্জিলিং হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার অতি অল্প অংশই দৃষ্ট গোচর হয়, এবং তাহা দেখিবার জন্য অতিপ্রত্যূষে মহাকাল বাবার আস্তানায় (অবজারভেটরি হিলে) যাইয়া ধন্না দিতে হয়। কিন্তু এথান হইতে এক বিশাল রজতগিরি দৃষ্ট হইল। অপরাহ্ণ সূর্য্য কিরণ সম্পাতে তাহা যে কি সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছে তাহা কবি বর্ণনা করিতে পারেন, আমার পক্ষে অসম্ভব।

অনেকক্ষণ দূরস্থ রজত গিরির শোভা সন্দর্শন করিয়া উৎরাই "আরম্ভ করিলাম এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকায় কুলিখানি ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

কাশ্মীর ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা যে বাড়ীতে উঠিলাম এ বাড়ীটিও সহরের অন্যান্য বাড়ীর ন্যায় কাঠের ছাদ, পাথর ইট ও কাঠের দেওয়ালে প্রস্তুত। ঘরটী একেবারে বাজারের রাস্তার উপর। জানালায় বসিয়া লোকজন যাতায়াত দেখিতে দেখিতে মেঘ কাটিয়া যাইবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

একটু দূরেই দেখি, দিবা দ্বিপ্রহরে একটী বার-বনিতা দিব্য সাজিয়া গুজিয়া জানালায় বসিয়া আছে। দুপুর বেলা প্রকাশ্য রাস্তার উপর এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। খানিকটা অপেক্ষা করিয়া যখন বৃষ্টি নামিল না, তখন আমরা ১-৩০ মিনিটে বাহির হইয়া পড়িলাম। টিপ টিপ করিয়া সামান্য বৃষ্টি পড়িতেছিল। মাইসুমা বাজার ১নং পোল 'মীরা কদল' হইতে আরম্ভ। ডাল পার দিয়া ২নং পোল 'হাওয়া বা হাবা' 'কদল' পর্য্যন্ত অতি সংকীর্ণ অপারস্কার গলির মধ্য দিয়া আসিয়া পোল পার হইয়া অপর পারে মহারাজ বাজার পর্য্যন্ত গেলাম। বাম পার দিয়া ক্রমাগত অপরিস্কার কদ্দমাক্ত রাস্তা ধরিয়া চলিয়া ৩নং পোল 'ফতে কদল' ছাড়াইয়া ৪নং পোল জিনাকদল দিয়া নদীপার হইয়া পুনরায় ডান পার দিয়া চলিলাম। দু পার্শ্বেই পাথরের মালা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। খানিকটা চলিয়া পুনরায় ৫নং পোল 'আলি কদল' দিয়া নদী পার হইয়া আবার বাম পার গেলাম।

জুম্মা মসজিদ।

একটু ঘুরিয়া আবার প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। জুতা খুলিয়া মসজিদে ঢুকিতে হইল। পুরাতন মসজিদের আর কিছুই নাই। তাহার স্থলে সুবৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত এই বিরাট মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছে। দুইখানা বড় পাথরে আরবীতে কি যেন লেখা আছে পড়িতে পারিলাম না। মসজিদের সুউচ্চ ছাদ সহস্রাধিক কাঠের উপর স্থাপিত। এত লম্বা এতগুলি কাঠ সংগ্রহ করাও দুস্কর। প্রাঙ্গণে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত চৌবাচ্চা আছে। মসজিদের অধ্যক্ষ বলিলেন পূর্ব্বে দূরের এক ঝরণা হইতে এখানে

মাথায় শাদা ঘের ও কোমরবন্দ পরিয়া পণ্ডিতানী।

জল আসিত, এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথা দিয়া জল আসিত পরীক্ষা করিতেছি, হঠাৎ দ্রুতপদক্ষেপ শব্দে চোখ তুলিতেই দেখি একটী পরীর মত সুন্দরী ৭।৮ বৎসরের বালিকা বোধ হয় চৌবাচ্চায় মুখ হাত ধুইতে আসিয়াছিল, আমাদিগকে দেখিয়া সভয়ে

পলাইতেছে। কিঞ্চিৎ দক্ষিণাস্ত করিয়া জুম্মা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পুনরায় সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্দ্দমাক্ত গলি ধরিয়া ডান দিকে চলিতে লাগিলাম।

বৃষ্টি একটু বেশী হইতে লাগিল। রাস্তায় দলে দলে পণ্ডিত ও মুসলমান পুরুষ চলিয়াছে সকলেরই গায়ে একখানা ১০।১২ হাত লুই ডবল করিয়া জড়ান। এই ছাড়া কাশ্মীরীরা রাস্তা চলে না। পণ্ডিতানী ও

কাশ্মীরী নর্ত্তকীর বিচিত্র ফেরণ।

মুসলমানীরা বৃহৎ খড়ম পায়ে 'ফেরণ' পরিয়া চলিতেছে। কাহারও কাহারও কোলে কাংরী। পণ্ডিতানীদের মাথায় একরকম সাদা ঘের কোমরে ফেরণের উপর একখানা কাপড় কোমরবন্ধের মত বাঁধা। মাঝে মাঝে ২।১টী অতি সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা দেখা যাইতেছে। 'কুলচার' দোকানে দুইটী পরমাসুন্দরী বালিকা দেখিলাম। 'কুলচা' একরকম ছোট পাঁউরুটী। কাশ্মীরীরা ইহার অতিশয় ভক্ত। সঙ্গী ও আমি দাঁড়াইয়া বালিকার নিকট হইতে কুলচা কিনিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটী কুকুর ছিল তাহাদের দিকে ফেলিয়া দিতে লাগিলাম। তাহারা নিপুণভাবে সেগুলি লুফিয়া খাইতে লাগিল। এদেশে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানীরা অতিশয় ভারী রৌপ্য নির্ম্মিত কর্ণাভরণ পরিয়া থাকে। এই কুলচাওয়ালী বালিকার কর্ণাভরণও এতই ভারী যে তাহার কাণ প্রায় ৩।৪ ইঞ্চি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

হরিপর্ব্বত।

ক্রমে আমরা সহর ছাড়িয়া হরিপর্ব্বতের পাদদেশে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। প্রবাদ এই যে, বহু পূর্ব্বে সমস্ত শ্রীনগর ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানাদি এক বিরাট হ্রদে ডুবিয়া ছিল। সেই জলরাশির মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য বাহির হইয়া দূরবর্ত্তী মনুষ্য ধ্বংস করিত। অবশেষে ভগবতী, মহাদেব পর্ব্বত হইতে একখণ্ড পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া সেই দৈত্যকে সংহার করেন। এই নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতখণ্ডই 'হরিপর্ব্বত'। তৎপরে মহাদেব ত্রিশূল দিয়া বরমুলার নিকট পর্ব্বতগাত্রে রন্ধ্র করিয়া এই বিরাট জলরাশি বাহির হইবার পথ করিয়া দেওয়াতে কেবল উপত্যকার এই অংশ এক বিস্তীর্ণ জনপদে পরিণত হয়।

এ গ্রামখানিও শ্রীনগরের মতই অপরিচ্ছন্ন। সমস্ত পর্ব্বতটী একটী পুরাতন পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। ঢুকিতে দেখি একটী ফটকের মধ্যে চারিটী কৃষক বালিকা কাশ্মীরি প্রথায় ধান ভানিতেছে। তাহার মধ্যে দুটী অনিন্দ্য সুন্দরী। বৃষ্টি একটু বাড়িয়াছিল, সুতরাং আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই ধান ভানা দেখিলাম।

পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে পাথরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। সেই সিঁড়ি ধরিয়া আমরা এক মসজিদে ঢুকিলাম। অনেক মুসলমান সেখানে বসিয়া আছেন। তাঁহারা বক্তৃতা সুরু করিলেন—"আকবর বাদশা ইয়া মস্‌জিদ বানায়া" ইত্যাদি। ফিরিয়া আসিয়া

দেখিব বলিয়া তাঁহাদের কবল হইতে মুক্ত হইলাম। কিন্তু এক বৃদ্ধ সঙ্গ লইল, এবং খানিকদূর গিয়া পাদদেশে স্থিত হজরতবাল গ্রাম দেখাইয়া দিয়া বখসিস আদায় করিয়া ছাড়িল। আমরা পর্ব্বতের গা বাহিয়া উপরের দুর্গে উঠিয়া গেলাম। এখানে দুর্গের আর এক প্রকাণ্ড দেওয়াল। ভিতরে দেখিবার মত কিছুই নাই। কয়েকটী কামান রহিয়াছে। কিন্তু এখান হইতে শ্রীনগর সহর, ডালহ্রদ ইত্যাদির দৃশ্য বড়ই সুন্দর। শঙ্কর পর্ব্বত হইতে সমস্ত অস্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু এখান হইতে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

অন্য দিক দিয়া নীচে নামিয়া একটা মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, পূর্ব্বের মসজিদ ডানদিকে ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরের দেওয়ালের এক সুরঙ্গ দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। পুনরায় শ্রীনগরের পথে চলিলাম। একটী ক্ষুদ্র গলির ভিতর হইতে বাহির হইতেই বরফের মত রং এক সুন্দরীকে দেখিলাম। এরূপ তুষারশুভ্র বর্ণ কাশ্মীরে আর দেখি নাই। শুনিয়াছি আইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা নাকি এইরূপ তুষারশুভ্র। ৫টায় বাড়ী ফিরিয়া চা পানান্তে দুইবন্ধু বসিয়া গল্প গুজব করিতে লাগিলাম।

মসজিদ দ্বারে।

শুধু শ্রীনগর সহর দেখিয়া কাশ্মীরীদের শারীরিক সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। এই সহরের লোক সংখ্যা সহরতলী লইয়া প্রায় ১২০০০০ ইহার মধ্যে পাঞ্জাবী, ডোগরা ও অন্যান্য অনেক জাতি আছে। এই সমস্ত জাতির মিশ্রণে শ্রীনগরে কাশ্মীরী অবয়বের বিশেষত্ব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তথাপি পুরুষও স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ খুব কমই পাওয়া যায়। যাহাদিগকে কালো দেখা যায়, একটু সাবান ও গরম জল দিয়া ধুইলেই তাহারাও সাদা হইয়া যায়। তবে মুখ চোখ ইত্যাদি সকলেরই যে সুন্দর তাহা নহে। কুৎসিত আকৃতিও দেখিয়াছি, কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প। চলনসই অনেক, নিখুত সুন্দর ও সুন্দরীও অনেক এবং মাঝে ২।৪টী অপূর্ব্ব সুন্দর ও সুন্দরী। কাশ্মীরীরা—বিশেষতঃ শ্রীনগরের—অধিকাংশই মুসলমান। ইহারা এত অপরিচ্ছন্ন থাকে যে দেখিলে ঘৃণা হয়। গরমের সময় ইহারা মাঝে মাঝে স্নান করে, তদ্ব্যতীত স্নান করা বা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা ইহাদের

অভ্যাস নাই। যদি এই জাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, তবে শ্রীনগরকে স্বর্গ ভ্রম করা অনেকের পক্ষেই আশ্চর্য্য হইত না।

এ শ্রীনগরের কথা। সহর হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, অধিবাসীরা ততই সুশ্রী। ৩০।৪০ মাইল দূরে পর্ব্বত গাত্রের অধিবাসীদিগকে বাস্তবিক দেবদেবী বলিয়া ভ্রম হয়।

পাণ্ডবাথান মন্দির।

কাশ্মীর প্রদেশ কতকগুলি পর্ব্বত ও নদীর উপত্যকায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে এই ঝেলম্ উপত্যকা। মার্ত্তণ্ড ভবনের অপর পার্শ্বে ভুবনবিখ্যাত অপরিসীম সুষমামণ্ডিত লিদার উপত্যকা ও সিন্দ উপত্যকাই প্রসিদ্ধ। আমরা শীঘ্র লিদার উপত্যকা দেখিতে যাইব, এখন বৃষ্টি থামিলে হয়।

এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর মহারাজার অধীনে জম্মু ব্যতীত লাদাক গিলগিত প্রভৃতি দেশ আছে। এইরূপে কাশ্মীর রাজ্যে একদিকে তিব্বত ও অপর দিকে রুষিয়া সাম্রাজ্যের পামীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের মধ্যে মহাদেব পর্ব্বত সর্ব্বোচ্চ, ইহার উচ্চতা সাগর সমতল হইতে ১৩২০০ ফিট। লিদার উপত্যকার পার্শ্বে অমরনাথের পথে কোলাহই পর্ব্বত ১৭৮০০ ফিট উচ্চ। পীর পাঞ্জাল পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ। আর কাশ্মীরের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ২৬৮০০ ফিট উচ্চ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক উচ্চ শৃঙ্গ আছে। এত অধিক উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ ভূমণ্ডলে আর কোন দেশেই নাই। অথচ দেশটী সমতল এই কাশ্মীরের বিশেষত্ব।

কাশ্মীরে ভারতবর্ষের সর্ব্ব বৃহৎ সুমিষ্ট জলের হ্রদ "উলার" গিলগিত যাইবার পথে শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৪।১৫ মাইল দূরে পাওয়া যায়। সেই হ্রদের তীরে প্রসিদ্ধ সুন্দর গ্রাম সোপর অবস্থিত।

কাশ্মীর শব্দ "কাশ্যপ মার" শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়। প্রবাদ, ইহাই প্রসিদ্ধ মহামুনি কাশ্যপের আশ্রম। পূর্ব্বে এখানকার সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু ছিল। এখনও এখানে বহু হিন্দু তীর্থ আছে—যথা "অমরনাথ"। আদিম নাগ উপাসনার চিহ্নও এখানে বর্ত্তমান—যথা অনন্ত নাগ, ভেরি নাগ, শেষনাগ, বিচার নাগ ইত্যাদি। বর্ত্তমানে নাগ শব্দে স্বাভাবিক উৎস (ফোয়ারা) বুঝায়। এই সমস্ত উৎসই কোন নাগের আবাসস্থল বিবেচনায় আদিম অধিবাসীরা উপাসনা করিত। এখনও অমর নাথের পথে "শেষ নাগে" যাত্রীরা স্নানদানাদি করিয়া থাকে এবং কোন কোন যাত্রী আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বচক্ষে অগণিত ফণাধারী নাগরাজকে (শেষনাগ) হ্রদের জলে ভাসিতে দেখিয়াছেন।

২০শে অক্টোবর। আজ সকাল বেলা শ্রীনগরের বাকীটুকু শেষ করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উঠিয়াই দেখি বৃষ্টি হইতেছে। বৃষ্টিও থামিল না, আমারও বাহির হওয়া হইল না। বেলা ১২টায় বৃষ্টি থামিল—১২-৪৫ মিনিটে

Mr. J আসিয়া উপস্থিত। স্থির হইল এখনই বাহির হইতে হইবে। বন্ধু বলিলেন আজ—

পামপুর

যাইবেন। পামপুর জম্মুর পথে শ্রীনগর হইতে ৯ মাইল। ১-৩০ মিনিটে উভয়ে বাহির হইতেই দেখিলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। আমার একটী বর্ষাতি ও একটি পশমের বালাক্লাভা টুপি--সঙ্গীর শুধু একটী পাগড়ী মাথায়। বাহির হইতেই সঙ্গী বলিলেন, ছত্রী মৃদু মৃদু বৃষ্টিপাত হইতে আমরা এক ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এইটীই পাণ্ডবাথান। প্রবাদ যে পাণ্ডবগণ এই মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষোদিত প্রস্তর গুলি প্রায় সমস্তই এখন শ্রীনগরের মিউজিয়মে রক্ষিত। মন্দিরটী অতি পুরাতন। হিন্দু মন্দির সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৃষ্টি দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার প্রস্তাব করায় বন্ধু বলিলেন, যখন বাহির হইয়াছি তখন যাইতে হইবেই। আবার চলিতে লাগিলাম। ডানদিকে ঝেলম্ বাঁকিয়া কখনও অদৃশ্য হইতেছে, আবার কখনও একেবারে

কাশ্মীরী সুন্দরী চরকা কাটিতেছে।

লইলে হইত। কিন্তু আবার বাসায় ফিরিলে দেরী হইয়া যাইবে বলিয়া তাহা আর হইল না। উভয়ে রওনা হইলাম। রেসিডেন্সির পাস দিয়া নদী তীরবর্ত্তী রাস্তা ধরিলাম। ঘাটে এক প্রকাণ্ড হাউসবোট, এখানি রেসিডেন্ট সাহেবের সম্পত্তি। তাহার পরই শ্রীনগর ক্লাব। সাহেবেরা বেজায় আমোদ করিতেছে। ক্রমে আমরা গুপাকর পাহাড় বাম দিকে রাখিয়া জম্মুর পথ ধরিলাম। বামদিকে পর্ব্বতরাজি। সুন্দর সফেদা বৃক্ষের avenue ধরিয়া প্রায় তিন মাইল যাইতেই রাস্তার ধারে পৌছিতেছে। বাম দিকে পর্ব্বতরাজি দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫ মাইল যাইতেই বৃষ্টি বেশ বাড়িয়া উঠিল। বন্ধুর নিতান্ত অনুরোধে আমি বর্ষাতি চাপাইলাম, কিন্তু মাথার টুপি ভিজিয়া যাইতে লাগিল। একটী ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট আসিয়া বন্ধুকে বলিলাম যে এই খানে দাঁড়ান যাউক। বন্ধু স্বীকৃত হইলেন না। আমি বলিলাম ইহাতে ভাল হইবে না। সঙ্গী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, "কুচ্ নেই"। আমি বলিলাম নিউমোনিয়া হইবে। সঙ্গী উত্তর করিলেন "বস্ মর

যায়েগা, উস্‌সে তো জেয়াদা কুছ নেই হো সাক্‌তা। ও তো মামুলী বাত্‌।" এই ডোগরা যুবকের সাহস অদ্ভুত। লজ্জিত হইয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তায় বেশী লোক জন নাই, কেবল পাশের মাঠে বালক বালিকারা ভেড়া ও অতিশয় লোমশ ছাগল চরাইতেছে।

আরও খানিকটা যাইয়া আমরা পাহাড় একটু দূরে রাখিয়া নদীর দিকে চলিলাম। এই বাঁকে নদীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মত। সুন্দর বৃক্ষ-রাজি সমন্বিত দ্বীপের পাশ দিয়া কলনাদে ঝেলম কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

গ্রাম ছাড়াইয়া বিস্তৃত মাঠ। এই মাঠেই কাশ্মীরের বিখ্যাত জাফ্‌রাণের চাষ। জাফরাণের গাছ বা ফুল সবে বাহির হইতেছে। আর ৭।৮ দিনের মধ্যেই ফুলে সমস্ত ক্ষেত আলো করিয়া ফেলিবে। আজ ২।১টী ভায়লেট রঙের ফুল কদাচিৎ দেখিতে পাইলাম।

বৃষ্টি ক্রমে বেশী হইতেছে। ৮ মাইল আসিয়া আমরা গ্রামের পাশে পৌছিলাম। একটী নালা পার হইয়া ক্ষুদ্র বাজারে গিয়া ডাকবাংলার খবর জিজ্ঞাসা করিয়া ফল হইল না—একজন ডাকঘর দেখাইয়া দিল। পুনরায় ফিরিয়া নদীর পারে একখানা হাউসবোট দেখিয়া, সেই দিকে যাইতে একটু দূরে দুইটী বিরাটা উইলো বৃক্ষের অন্তরালে একখানি ঘর দেখিয়া সেই দিকে চলিলাম। গিয়া দেখি এক শুভ্রশ্মশ্রু চৌকিদার দরজার সামনে মুদ্রিত নয়নে আরামের সহিত গড়গড়ায় তামাক টানিতেছে। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেখানে থাকিতে পারা যাইবে কি না? চৌকিদার আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনাদের নিকট একখানা গরম কাপড়ও দেখিতেছি না,আপনারা কি প্রকারে থাকিবেন? বিশেষত সমস্ত ঘরের চাবী সাবওভারসিয়ারেরং নিকট অবন্তিপুরায় আছে।"

তখন বন্ধু তাহাকে কয়েকটী আণ্ডা সিদ্ধ করিবার ফরমাইস দিতে সে বলিল য, বৃষ্টিতে তাহা হইবে না; অবশেষে বন্ধু একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিলেন। মন্ত্র চালিতের মত বৃদ্ধ উঠিয়া বসিল, এবং বিশাল দন্তপংক্তি প্রদর্শন করিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। সমস্তই বদলাইয়া গেল। "জনাব" মধুর সম্বোধন এবং দেখিতে দেখিতে আণ্ডা ইত্যাদি হাজির হইল। চৌকিদার প্রভু কাঠ জ্বালাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ঘর হইতে শুকনো ঘাস আনিয়া ফুঁ দিতে লাগিল। আমরা বসিয়া জামা খুলিয়া টুপি ছাড়িয়া সে গুলি উত্তাপে শুকাইতে লাগিলাম। নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাট হইতে রমণীরা খড়ম পায়ে দিয়া কলসী মাথায় জল লইয়া যাইতেছে। দুইটী একটী খুব সুন্দরী।

এখন যাইবার ব্যবস্থা দেখিতে হইতেছে। একটু দূরে একখানি টঙ্গা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বন্ধু অনুসন্ধানে জানিলেন টঙ্গাওয়ালা শ্রীনগর যাইবে। এক পণ্ডিত লুই খরিদ করিতে আসিয়াছেন তিনি একা সওয়ারী আছেন সুতরাং আমাদিগকেও লইয়া যাইতে পারিবে। এখানে চট ও লুই ইত্যাদির বুনানী হয়। এই বুনানী এ দেশের গৃহস্থদিগের একটী প্রধান ব্যবসা।

ইতিমধ্যে পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলিলাম যে, আণ্ডা ইত্যাদি সিদ্ধ হইলেই আহারাদি করিয়া উঠিব। পণ্ডিত মহাশয় একবার আহারাদির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াইবেন এবং বাজারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া জলযোগ শেষ করিলাম। হাত পা বেশ করিয়া সেঁকিয়া লইয়া টঙ্গার উদ্দেশে বাজারের দিকে চলিলাম। বখসিস পাইয়া চৌকিদার ঝুঁকিয়া বেলাম করিল।

বৃষ্টি থামিয়াছে। বাজারে আসিয়া দেখি বিশ্বাস-ঘাতক পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছে। ফলতঃ এ দেশের পণ্ডিতেরা ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক এ কথা অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের মুখের ভাব হইতে মনের ভাব কখনও বুঝা যায় না।

আবার ৯।১০ মাইল হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বেলা তখন ৫।১৫ মিনিট। অনাহারে, পরিশ্রমে, ভিজা কাপড়ে চলিতে হইবে। উপায় নাই। তখনই রওনা হইলাম। প্রায় এক মাইল আসিয়া সেই জাফ্রাণের মাঠে পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বপরিচয়—ক্ষণিকের মিলন।

সেই রাত্রেই বড় অভিমানে হরচন্দ্র স্ত্রীকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

যদুনাথের বন্ধু ও আত্মীয়মণ্ডলী সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "ইহা ইংরাজি শিক্ষারই কুফল।" যদুনাথও সে বিষয় সকলের সহিত একমত হইলেন এবং নিজপুত্রের গৃহত্যাগের পরদিনই তিনি কনিষ্ঠ শিবপ্রসাদকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। তাহাকে বলিলেন, "তুমি ঘরে বসে ব্যাবসা ইত্যাদি কাযকর্ম্ম শেখ, তোমার আর পড়তে হবে না।" শিবপ্রসাদ সেবার প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছিল; একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়াছিল যে একবৎসর পরে পরীক্ষাটা দিয়াই ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় না? কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিকে নাই।

হরপ্রসাদ স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সেইরাত্রে এক বন্ধুগৃহে উঠিয়াছিলেন। তাহার পরে এক খোলার ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে থাকেন। একবৎসর ৩।৪ যায়গায় ছেলে পড়াইয়া অতিকষ্টে আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়—সেই পুত্রের নাম শরৎচন্দ্র। পিতা বিমুখ হইলেও হরপ্রসাদ যথাসময়ে তাঁহাকে আপনার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা ও পুত্রলাভের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। যদুনাথ কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিতে করিতে ৪।৫ মাস পরে হরপ্রসাদ লাভপুর ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

মাসে একখানি করিয়া পত্র তিনি পিতাকে লিখিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন; পিতা নিরুত্তর রহিতেন। তখন তিনি কখন শিবপ্রসাদকে কখন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে পত্র লিখিয়া বাড়ীর সংবাদ গ্রহণ করিতেন।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল।

একদিন হরপ্রসাদ স্কুলে কায করিতেছেন, এমন সময় একখানি আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাইলেন। শিবপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "বাবা অত্যন্ত পীড়িত। সপরিবারে শীঘ্র আসুন, বাবা দেখিতে চাহিয়াছেন।"

সেই দিনই সেক্রেটারির নিকট একসপ্তাহের ছুটি লইয়া তিনি লাভপুর পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপরদিবস বাড়ী পৌছিলেন।

আসিয়া দেখিলেন পিতার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি টাইফয়েড্ জ্বরে শয্যাগত—৮।১০ দিন অতীত হইলে তবে তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন!

দীর্ঘ ৬।৭ বৎসরের পরে যখন হরপ্রসাদ পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অপরাধীর মত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, যদুনাথের তখন বাক্‌শক্তি ছিল না। বহুকাল পরে নির্ব্বাসিত পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

আর ৩০দিন পরে যদুনাথের বাঁচিবার আশা হইল। হরপ্রসাদ এই একমাসকাল প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রাণপণ করিয়া দিনরাত্রি পিতার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। যোগমায়াও যথাসাধ্য স্বামীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদকে ডাক্তার ডাকা পথ্য যোগাড় ইত্যাদি বাহিরের কার্য্য লইয়া থাকিতে হইত। যে দুজন ডাক্তার দেখিতেছিলেন তাঁহারা একবাক্যে হরপ্রসাদের শুশ্রূষার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—এ

যাত্রা আপনি হরপ্রসাদের শুশ্রূষার গুণেই রক্ষা পাইয়াছেন, টাকাকড়িতে চিকিৎসার চেয়ে শুশ্রূষার বেশী দরকার।”

যদুনাথ পুত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন ও পৌত্রের সুকুমার সৌন্দর্য্যে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যোগমায়াকে দেখিলেই তাহার মনটা পুনরায় কঠিন হইয়া উঠিত। তাঁহার মনে হইত, ইহারই জন্য তো তিনি এতদিন এমন পুত্র হইতে বঞ্চিত ছিলেন। তথাপি শরীরের ব্যাধি যেমন আপনা হইতে সহ্য হইয়া যায়, তিনিও তেমনি পুত্রবধূর আবির্ভাব সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন।

এইরূপে পিতা ও পুত্রের পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইতেছিল, এমন সময় এক শোচনীয় ঘটনায় সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

হরপ্রসাদকে মাসাধিককাল পিতার নিকট থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে স্কুলের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সেক্রেটারি তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া পরদিন কার্য্যস্থানে ফিরিবার দিনস্থির করিলেন। সেই রাত্রেই বন্ধুবান্ধবদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া হরপ্রসাদের কয়েকবার ভেদবমি হইল। তখন গ্রামে ২।৪টা কলেরা রোগ দেখা যাইতেছিল। যোগমায়া ভয় পাইয়া শ্বশুরকে সে সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। ডাক্তার আসিয়াই রোগ কলেরা বলিয়াই স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে হরপ্রসাদ একেবারে বলহীন হইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে সমস্ত শেষ হইয়া গেল।

মৃত্যুর পূর্ব্বে হরপ্রসাদ যোগমায়াকে কয়েকটি শেষ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। সেই কথাগুলি ‘তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা হইয়াছিল। পিতাকে কেবল তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—“বাবা, এরা রইল।” আর যাহা বলিবার ছিল, পুত্রের মূকদৃষ্টি ও অন্তিম অশ্রুধারা তাহা সমাপ্ত করিয়াছিল।

একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া যোগমায়া গতপ্রাণ-স্বামীর পা দুটি জড়াইয়া ভূমিশয্যায় পড়িয়া ছিল। হতভাগিনীর মূর্চ্ছিত দেহকে অতিকষ্টে স্থানান্তরিত করিয়া তবে মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা—শ্বশুরের উইল।

হরপ্রসাদের মৃত্যুর পর যোগমায়াকে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া যদুনাথের আর উপায়ান্তর ছিল না। বৎসরখানেক পূর্ব্বে তাঁহার পিতা হৃদ্‌রোগে লোকান্তরিত হওয়ায় পিত্রালয়েও তাঁহার কোন আশ্রয় ছিল না। ইহা ছাড়া যে পুত্র প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল, তাড়িত ও অবমানিত হইয়াও যে যথানিয়মে তাঁহার সংবাদ লইয়া মরিয়াছে, তাঁহার রোগসংবাদ শ্রবণমাত্র যে শুশ্রূষার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল তাহার অন্তিম অনুরোধ অমান্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। সে বেশী কথা বলিয়া যাইতে পারে নাই, অতি কষ্টে শুধু বলিয়াছিল, “বাবা, এরা রইল।” কিন্তু সেই কথা কয়টির মধ্যেই কি সব বলা হয় নাই?

কিন্তু তবু সংসারের মধ্যে পুত্রবধূর আবির্ভাব তাঁহাকে নিরতিশয় চঞ্চল ও অসহিষ্ণু করিয়া তুলিত। তাঁহার কেবলি মনে হইত, ইহারই জন্য অমন গুণের পুত্র তাঁহার পর হইয়াছিল। পিতা ও পুত্রের মাঝখানে যদি ও হতভাগিনী না আসিয়া পড়িত তাহা হইলে হয়ত অকালে তাহাকে হারাইতে হইত না। সামান্য কয়টি টাকার জন্য দীর্ঘ সাত বৎসর বিদেশে কত কষ্টেই না জানি তাহাকে কাটাইতে হইয়াছে। এ সকলের মূলই ত ঐ পুত্রবধূ। এই সব ভাবিয়া তিনি পুত্রবধূকে কিছুতেই সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিতে পারেন নাই।

পুত্রবিয়োগের একমাস পরে তিনি পুত্রবধূর জন্য সব পৃথক ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যোগমায়াও আপনার অবস্থা বুঝিয়া বাড়ীর একপ্রান্তে একটি ঘর লইয়া নির্জ্জন কারাবাসের মতই সেখানে থাকিতে লাগিলেন। তিনি তো বিনাপরাধে শ্বশুরের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; একমাত্র পুত্র যাহাতে পিতামহের স্নেহরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত না হয় সে জন্য তিনি পুত্রকেও বড় একটা

কাছে রাখিতেন না। শরৎ পিতামহের কাছেই খাইত, রাত্রে শয়নের সময় মার কাছে আসিত।

এইরূপে দশবৎসর কাটিয়া গেল। শরতের বয়স ষোড়শবৎসর হইল, এবং সে সেইবার এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। পিতামহ সেইবারই খুব সমারোহ করিয়া সেই গ্রামের অন্যতম জমীদারের কন্যার সহিত পৌত্রের বিবাহ দিলেন। যোগমায়ার মতাদি স্বামীর মতানুযায়ী গঠিত হইয়াছেন, সুতরাং পুত্রের বাল্যবিবাহে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পাছে পুত্র আবার পিতামহের বিরাগভাজন হয় এই আশঙ্কায় তিনি কোন আপত্তিই করেন নাই।

এই বৎসরেই অনেকদিনের দাসী রঙ্গিণীর মৃত্যু হয়। ইহার আঘাতটাও যদুনাথের কিছু লাগিয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল তাঁহারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে কোন গোলযোগ বাধে, এই ভাবিয়া তিনি সত্বর এক উইল করিলেন। ভাবনার কারণও ছিল। কারণ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদকে এমনই বিষয়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে তাহার লোভের আর অন্ত ছিল না। দাদা যে পিতার বিষয়ের ও অর্থের কোন অংশই পাইবেন না এই বিশ্বাসই তাহার জন্মিয়াছিল, এবং বোধ হয় সেই জন্যই সে শরৎকে স্নেহচক্ষে দেখিত না। বিচক্ষণ যদুনাথ এ সমস্তই বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি উইলের ব্যবস্থা করিলেন যে, তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় হইবে ১০০০৲ টাকা, পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থ স্থানীয় স্কুলে ২০০০৲ ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে কলেরা চিকিৎসার সৌকর্য্যার্থ ১০০০৲ দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া যাহা থাকিল তাহা সমান দুই অংশে বিভক্ত হইবে;—একভাগ পাইবে তাঁহার পৌত্র শরৎচন্দ্র, অপর ভাগ পাইবে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শিবপ্রসাদ।

উইল করিয়া কয়েকমাস পরেই যদুনাথ প্রাণত্যাগ করিলেন। শিবপ্রসাদ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিষয়াদি ভাগ করিয়া লইলেন। বাসভবন দুইখণ্ডে বিভক্ত হইল। একখণ্ডে তিনি থাকিলেন। অপর খণ্ডে যোগমায়া পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগমায়া দেবরকে তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবর শ্লেষের সহিত বলিয়াছিল—তোমার ভিতর যথেষ্টই পুরুষত্ব আছে, তোমার অভিভাবকের দরকার নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনন্দের বেদনা।

অপরাহ্নে জমীদার অতুলকৃষ্ণ একখানি টেলিগ্রাম হস্তে অন্তঃপুরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একটি পরিচারিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সদু, উনি কোথায় গেলেন?" সদু তখন কর্ত্তার ঘর ঝাঁড় দিতেছিল। কর্ত্তাকে দেখিয়া শশব্যস্তে ঝাঁটা রাখিয়া বলিল, "মা বোধ হয় ভাঁড়ার ঘরে আছেন, ডেকে দিই।" বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

অতুলকৃষ্ণ সুপুরুষ; বর্ণ সুগৌর, ও আকৃতি দীর্ঘ। বয়স এখনও পঞ্চাশ পার হয় নাই। পরিচ্ছদের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই। পাঠ্যাবস্থায় তিনি "সংযম সভা"র সম্পাদক ছিলেন। আহারাদি বেশভূষা ইত্যাদি সকল বিষয়েই সংযম রক্ষা তাঁহাদের সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের সমিতির পরিচ্ছদ ছিল টুইলের একটি সার্ট, সরুপাড় ধুতি ও ক্যাম্বিসের জুতা। শীতকালে সাদা মোজা ও গায়ের কামিজের উপর একটি কোট উঠিত। এখন পর্য্যন্তও সেই ব্যবস্থাই প্রায় বজায় আছে। কেবল গ্রীষ্মকালে উড়ানি ও শীতকালে কোন একটা শীতবস্ত্র বাড়িয়াছিল। পাণ, চুরুট ইত্যাদি সেই হইতেই পরিত্যজ্যই আছে। আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যাদির জন্য কখন তিনি ভৃত্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন না। অনেক জমিদার-সন্তানদিগকে দেখা যায় তাঁহারা আপনাদিগকে অসম্পূর্ণরূপে ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। বাবুদের তেল মাখানো, স্নান করাইয়া

দেওয়া, স্নানান্তে কাপড় বদলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যও ভৃত্যের দ্বারা হাস্যোদ্দীপক ভাবেই সম্পাদিত হয়।

অতুলকৃষ্ণ এ সমস্ত অভ্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বাবলম্বন বড়ই ভালবাসিতেন এবং একমাত্র পুত্রটির চরিত্র ও অভ্যাস তাঁহারই মতানুযায়ী গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী দেবীও স্বামীর অনুরূপ পত্নী। তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে স্বামী পুত্র ও সকলের জন্য রন্ধন করিতেন; দাস দাসী ও অভ্যাগত আত্মীয়দিগের পাকের জন্য পাচক নিযুক্ত ছিল। তাহার ব্যবস্থাও তিনি স্বয়ং করিয়া দিতেন। পত্নীর এই অভ্যাস মনে মনে ভালবাসিলেও অতুলকৃষ্ণ প্রথম প্রথম বলিয়া ছিলেন—"কেন তুমি নিজে ওসব রাঁধ? রাঁধবার লোক তো রয়েছে।" স্বরস্বতী দেবী উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি যদি জমিদারের ছেলে এবং নিজে জমিদার হয়েও নিজের কায নিজে করতে পার, তখন গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে আমি নিজের কায নিজে করতে পারব না কেন?" বলা বাহুল্য, স্ত্রীর এই উত্তর ও ব্যবহার অতুলকৃষ্ণকে বড়ই সুখী করিয়াছিল।

পরিচারিকা যাওয়ার একটু পরেই স্বরস্বতী দেবী হাস্যমুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা উনিকে কি জন্য ডেকেছ?"

স্বরস্বতী দেবী তেমন রূপসী নহেন, কারণ বর্ণ তাঁহার শ্যাম। তবে তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর শ্যামল শ্রী অঙ্গের গৌরবর্ণের অভাব দূর করিয়াছিল। সেই স্বচ্ছ পরিপূর্ণ সরোবরের মত চক্ষু দুটি দিয়া তাঁহার শুভ্র উদার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যাইত। মুখে এমন একটি কোমল শান্তভাব মাখান ছিল যাহা দেখিলে সমস্ত রূঢ়তা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িত।

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সদুর কাছ থেকে সেটুকুও জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হয়েছে? তোমার এ স্বভাবটি কিন্তু গেল না এখনও।"

"তোমাকে এত করে বলেও তোমার উনি বলা স্বভাবটা কিন্তু গেলনা। আমাকে আবার উনি বলা কেন?"

"অন্য লোকের সামনে যদি বলি 'ও কোথায় গেল,' সেটা কি রকম বিশ্রী শোনায় বল দেখি? আমার সম্বন্ধে কথা বল্‌বার সময় তুমি তাহলে 'ও' বলনা কেন?"

"বেশ! আমি আর তুমি! আমি হলাম—"

"দাসী, এই ত?"

"তা সেটা কি মিথ্যে?"

"খুব সত্যি, তা কত করে মাইনে?"

স্বরস্বতী মনে মনে বলিলেন, আমি তোমার বিনা-মূল্যের দাসী। মুখে কিছু বলিলেন না; শুধু আপনাকে স্বামিপ্রেমে অসীম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া স্বামীর প্রফুল্ল মুখ খানির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব ফুটিয়া উঠিল যে, অতুলকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখখানি কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। স্বরস্বতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই তিনি একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "একি, কেউ এসে পড়ে যদি, এখনও ছেলেমানুষি!

"ঐ তো তোমার দোষ। তুমি আমাকে একেবারে বুড়ো না করে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। মোটে ৪৫ বছর বয়সে কি করে বুড়ো হই বল দেখি? আচ্ছা, সে সব দিনের কথা বুঝি আর মনে পড়ে না, যখন এমনটি না হলে অভিমানে চোখে জল আস্‌ত? আর এখন ছেলে এসে পড়্‌বে, ঝিয়া কেউ দেখে ফেলবে, কতই আপত্তি! সত্যি বলছি, আমার তো মনে হয় সে সব কালকের কথা! আমার বাইরেটার যত বয়স হয়েছে, ভিতরটা বোধ হয় তার চেয়ে ঢের কাঁচা আছে নয়?

স্বরস্বতী প্রসন্নমুখে বলিলেন "তোমার বাইরেটাও এখনও তেমনি সুন্দর আছে।"

"আর তোমার বুঝি ভারি অসুন্দর হয়ে গিয়েছে? চোখ দুটি একবার আয়না দিয়ে দেখ দেখি।"

এই সময় লজ্জিত হইয়া স্বরস্বতী কথা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, কি জন্য ডাকছিলে বল্‌লে না?"

অতুলকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে টেলিগ্রামটি বাহির করিয়া বলিলেন, সুখবর আছে। অশোক "ফার্ষ্ট ডিভিজনে পাস হয়েছে; এই দেখ টেলিগ্রাম।"

স্বরস্বতীর মুখে চোখে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে স্বামীর হাত হইতে টেলিগ্রামটী লইয়া পাঠ করিলেন। স্বামীর নিকট তিনি মোটামুটি রকম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

"আহা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুমি একবার অশোককে ডেকে পাঠাও। সে বোধ হয় শরতের কাছে আছে। আমি এখনি ঠাকুরবাড়ীতে পূজো পাঠিয়ে দিই গে। আহা বাছা এগ্‌জামিনের সময় কি রোগাটাই হয়ে গিয়েছিলে। মা দুর্গা পরিশ্রম সার্থক করেছেন সেই ভাল।"—বলিতে বলিতে পুত্রের কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া স্বরস্বতী দেবী শুভ সংবাদটি সকলকে বলিবার জন্য ও পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহির হইলেন। অতুলকৃষ্ণও বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে পূজা পাঠাইয়া দিয়া স্বরস্বতী দেবী প্রসন্নমুখে পুরনারীদের সহিত পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন।

সদু বলিল—"তা মা, এখন কেন দাদা বাবুর বিয়ে দাওনা?"

স্বরস্বতী দেবী বলিলেন, "আমার তো ইচ্ছে করে মা, কিন্তু ওঁর ইচ্ছে লেখাপড়া শেষ হলে বিয়ে দেবেন।"

সদু একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি বাবুকে জোর করে বল তা হলে উনি খুব শোনেন।"

স্বরস্বতী দেবী ঈষৎ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "তা কি বল্‌তে আছে মা? চিরকাল ওঁরই মতে চলে এসেছি, আজ কি অন্যপথে যেতে পারি? আর উনি তো ছেলের ভালর জন্যেই বল্‌ছেন।"

এমন সময় অশোক হাসিমুখে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল। পুত্রের হাসিমুখ ও প্রণাম হইতেই স্বরস্বতী দেবী বুঝিলেন, পুত্র পিতার নিকট হইতে পাসের সংবাদ পাইয়াই আসিয়াছে। তিনি পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বিদ্যায় বৃহস্পতি হও বাছা, নীরোগ হয়ে বেঁচে থাক, রাজা হও।"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি ভাল লেখাপড়া জেনেও শেষে আশীর্ব্বাদের বেলায় ভুল কর্‌লে। রাজা কি করে হব বল? আজকাল তো আর আগেকার মত পাগলা হাতী ঘুরে বেড়ায় না যে, শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে যাবে, আর শূন্য সিংহাসনে চড়িয়ে দেবে।"

স্বরস্বতী দেবী মুগ্ধচিত্তে পুত্রের সুন্দর হাঁসিমুখখানির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোর বাপু সব কাযেই ঠাট্টা, তা কি কর্‌ব? রাজা মানে কি আর সত্যি সত্যিই রাজা? এই খুব বাড় বাড়ন্ত, সুনাম এই সব। তা যাক্, এতক্ষণ যে তোকে দেখবার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছিলাম। সেই দুপুর বেলা বের হয়েছিলি, আর এই প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এলি। কোথায় ছিলি বল দিকি, শরৎদের বাড়ী বুঝি?"

শরতের কথা উঠিতেই অশোকের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তাহার মনে হইল, শরৎ ও সে এক সঙ্গেই প্রথম হইতে পাস করিয়া আই, এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গত ছয়মাস হইতে শরৎ রোগে শয্যাগত হইয়া আছে, তা না হইলে তো একসঙ্গে আই, এ পাস করিবার কথা।

অশোক বিষণ্ণমুখে বলিল—"হাঁ মা, শরতের কাছেই এতক্ষণ ছিলাম। তারও এবার পাস হবার কথা, তা অসুখে এগ্‌জামিন দিতে পার্‌লে না। এখন বাঁচে কি মা সন্দেহ। সন্দেহই বা কেন। ডাক্তার তো একরকম বলেই দিয়েছে বাঁচবার আশা নেই। আহা খুড়িমার আর চক্ষের জলের বিরাম নেই। তবু এমন সহিষ্ণুতা মা, যে শরতের সামনে একটা জোরে নিশ্বাসও ফেলেন না।"

বন্ধু ও বন্ধুজননীর দুঃখে অশোকের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। স্বরস্বতী দেবীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "আহা, ঐ একটিমাত্র ছেলে, শিব রাত্তিরের সল্‌তে. মা দুর্গা যেন রক্ষে করেন।"

দেওয়া, স্নানান্তে কাপড় বদলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যও ভৃত্যের দ্বারা হাস্যোদ্দীপক ভাবেই সম্পাদিত হয়।

অতুলকৃষ্ণ এ সমস্ত অভ্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি স্বাবলম্বন বড়ই ভালবাসিতেন এবং একমাত্র পুত্রটির চরিত্র ও অভ্যাস তাঁহারই মতানুযায়ী গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী দেবীও স্বামীর অনুরূপ পত্নী। তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে স্বামী পুত্র ও সকলের জন্য রন্ধন করিতেন; দাস দাসী ও অভ্যাগত আত্মীয়দিগের পাকের জন্য পাচক নিযুক্ত ছিল। তাহার ব্যবস্থাও তিনি স্বয়ং করিয়া দিতেন। পত্নীর এই অভ্যাস মনে মনে ভালবাসিলেও অতুলকৃষ্ণ প্রথম প্রথম বলিয়া ছিলেন—"কেন তুমি নিজে ওসব রাঁধ? রাঁধবার লোক তো রয়েছে।" স্বরস্বতী দেবী উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি যদি জমিদারের ছেলে এবং নিজে জমিদার হয়েও নিজের কায নিজে করতে পার, তখন গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে হয়ে আমি নিজের কায নিজে করতে পারব না কেন?" বলা বাহুল্য, স্ত্রীর এই উত্তর ও ব্যবহার অতুলকৃষ্ণকে বড়ই সুখী করিয়াছিল।

পরিচারিকা যাওয়ার একটু পরেই স্বরস্বতী দেবী হাস্যমুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা উনিকে কি জন্য ডেকেছ?"

স্বরস্বতী দেবী তেমন রূপসী নহেন, কারণ বর্ণ তাঁহার শ্যাম। তবে তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর শ্যামল শ্রী অঙ্গের গৌরবর্ণের অভাব দূর করিয়াছিল। সেই স্বচ্ছ পরিপূর্ণ সরোবরের মত চক্ষু দুটি দিয়া তাঁহার শুভ্র উদার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা যাইত। মুখে এমন একটি কোমল শান্তভাব মাখান ছিল যাহা দেখিলে সমস্ত রূঢ়তা লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িত।

অতুলকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, "সদুর কাছ থেকে সেটুকুও জিজ্ঞাসা করে নেওয়া হয়েছে? তোমার এ স্বভাবটি কিন্তু গেল না এখনও।"

"তোমাকে এত করে বলেও তোমার উনি বলা স্বভাবটা কিন্তু গেলনা। আমাকে আবার উনি বলা কেন?"

"অন্য লোকের সামনে যদি বলি 'ও কোথায় গেল,' সেটা কি রকম বিশ্রী শোনায় বল দেখি? আমার সম্বন্ধে কথা বল্‌বার সময় তুমি তাহলে 'ও' বলনা কেন?"

"বেশ! আমি আর তুমি! অমি হলাম—"

"দাসী, এই ত?"

"তা সেটা কি মিথ্যে?"

"খুব সত্যি, তা কত করে মাইনে?"

স্বরস্বতী মনে মনে বলিলেন, আমি তোমার বিনা-মূল্যের দাসী। মুখে কিছু বলিলেন না; শুধু আপনাকে স্বামিপ্রেমে অসীম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া স্বামীর প্রফুল্ল মুখ খানির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব ফুটিয়া উঠিল যে, অতুলকৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখখানি কাছে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। স্বরস্বতীর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই তিনি একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "একি, কেউ এসে পড়ে যদি, এখনও ছেলেমানুষি!

"ঐ তো তোমার দোষ। তুমি আমাকে একেবারে বুড়ো না করে ছাড়বে না দেখ্‌ছি। মোটে ৪৫ বছর বয়সে কি করে বুড়ো হই বল দেখি? আচ্ছা, সে সব দিনের কথা বুঝি আর মনে পড়ে না, যখন এমনটি না হলে অভিমানে চোখে জল আস্‌ত? আর এখন ছেলে এসে পড়্‌বে, ঝিরা কেউ দেখে ফেলবে, কতই আপত্তি! সত্যি বলছি, আমার তো মনে হয় সে সব কালকের কথা! আমার বাইরেটার যত বয়স হয়েছে, ভিতরটা বোধ হয় তার চেয়ে ঢের কাঁচা আছে নয়?

স্বরস্বতী প্রসন্নমুখে বলিলেন "তোমার বাইরেটাও এখনও তেমনি সুন্দর আছে।"

"আর তোমার বুঝি ভারি অসুন্দর হয়ে গিয়েছে? চোখ দুটি একবার আয়না দিয়ে দেখ দেখি।"

এই সময় লজ্জিত হইয়া স্বরস্বতী কথা ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, কি জন্য ডাকছিলে বল্‌লে না?"

অতুলকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পকেট হইতে টেলিগ্রামটি বাহির করিয়া বলিলেন, সুখবর আছে। অশোক "ফার্ষ্ট ডিভিজনে পাস হয়েছে; এই দেখ টেলিগ্রাম।"

স্বরস্বতীর মুখে চোখে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে স্বামীর হাত হইতে টেলিগ্রামটী লইয়া পাঠ করিলেন। স্বামীর নিকট তিনি মোটামুটি রকম ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

"আহা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুমি একবার অশোককে ডেকে পাঠাও। সে বোধ হয় শরতের কাছে আছে। আমি এখনি ঠাকুরবাড়ীতে পূজো পাঠিয়ে দিই গে। আহা বাছা এগ্‌জামিনের সময় কি রোগাটাই হয়ে গিয়েছিলে। মা দুর্গা পরিশ্রম সার্থক করেছেন সেই ভাল।"—বলিতে বলিতে পুত্রের কৃত-কার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া স্বরস্বতী দেবী শুভ সংবাদটি সকলকে বলিবার জন্য ও পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহির হইলেন। অতুলকৃষ্ণও বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঠাকুরবাড়ীতে পূজা পাঠাইয়া দিয়া স্বরস্বতী দেবী প্রসন্নমুখে পুরনারীদের সহিত পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন।

সদু বলিল—"তা মা, এখন কেন দাদা বাবুর বিয়ে দাওনা?"

স্বরস্বতী দেবী বলিলেন, "আমার তো ইচ্ছে করে মা, কিন্তু ওঁর ইচ্ছে লেখাপড়া শেষ হলে বিয়ে দেবেন।"

সদু একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি বাবুকে জোর করে বল তা হলে উনি খুব শোনেন।"

স্বরস্বতী দেবী ঈষৎ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, "তা কি বল্‌তে আছে মা? চিরকাল ওঁরই মতে চলে এসেছি, আজ কি অন্যপথে যেতে পারি? আর উনি তো ছেলের ভালর জন্যেই বল্‌ছেন।"

এমন সময় অশোক হাসিমুখে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। পুত্রের হাসিমুখ ও প্রণাম হইতেই স্বরস্বতী দেবী বুঝিলেন, পুত্র পিতার নিকট হইতে পাসের সংবাদ পাইয়াই আসিয়াছে। তিনি পুত্রের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বিদ্যায় বৃহস্পতি হও বাছা, নীরোগ হয়ে বেঁচে থাক, রাজা হও।"

পুত্র হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি ভাল লেখাপড়া জেনেও শেষে আশীর্ব্বাদের বেলায় ভুল কর্‌লে। রাজা কি করে হব বল? আজকাল তো আর আগেকার মত পাগলা হাতী ঘুরে বেড়ায় না যে, শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে যাবে, আর শূন্য সিংহাসনে চড়িয়ে দেবে।"

স্বরস্বতী দেবী মুগ্ধচিত্তে পুত্রের সুন্দর হাসিমুখ খানির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোর বাপু সব কাযেই ঠাট্টা, তা কি করব? রাজা মানে কি আর সত্যি সত্যিই রাজা? এই খুব বাড় বাড়ন্ত, সুনাম এই সব। তা যাক্, এতক্ষণ যে তোকে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট করে বেড়াচ্ছিলাম। সেই দুপুর বেলা বের হয়েছিলি, আর এই প্রায় সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এলি। কোথায় ছিলি বল দিকি, শরৎদের বাড়ী বুঝি?"

শরতের কথা উঠিতেই অশোকের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তাহার মনে হইল, শরৎ ও সে এক সঙ্গেই প্রথম হইতে পাস করিয়া আই, এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু গত ছয়মাস হইতে শরৎ রোগে শয্যাগত হইয়া আছে, তা না হইলে তো একসঙ্গে আই, এ পাস করিবার কথা।

অশোক বিষণ্ণমুখে বলিল—"হাঁ মা, শরতের কাছেই এতক্ষণ ছিলাম। তারও এবার পাস হবার কথা, তা অসুখে এগ্‌জামিন দিতে পার্‌লে না। এখন বাঁচে কি না সন্দেহ। সন্দেহই বা কেন। ডাক্তার তো একরকম বলেই দিয়েছে বাঁচবার আশা নেই। আহা খুড়িমার আর চক্ষের জলের বিরাম নেই। তবু এমন সহিষ্ণুতা মা, যে শরতের সামনে একটা জোরে নিশ্বাসও ফেলেন না।"

বন্ধু ও বন্ধুজননীর দুঃখে অশোকের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। স্বরস্বতী দেবীও অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "আহা, ঐ একটিমাত্র ছেলে, শিব রাত্তিরের সল্‌তে. মা দুর্গা যেন রক্ষে করেন।"

অশোক বলিল—"সত্যি মা, শরতের অসুখের জন্যে আমার পাসের আনন্দের অর্দ্ধেকও নেই। পাসের খবরটাই শরতকে দিতে আমার লজ্জা করবে। সে কিন্তু আজও জিজ্ঞাসা করেছে আমার পাসের খবর বেরিয়েছে কি না। আর বল্‌ছিল, যদি দৈবাৎ বেঁচেও যাই, তা হলে আর দুজনে এক সঙ্গে পড়তে পাব না। কথাটা শুনে এত কষ্ট হল মা! মনে মনে ভাবলাম—এবার যদি ফেল হই তা হলে দুঃখ নেই—দুজনে আবার একসঙ্গে পড়তে পাব।"

দুঃখের প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য মা বলিলেন, "ও কথা ভেবে আর কি করবে বল্? উপায় ত নেই, হাত পা বেশ করে' ধুয়ে, তসরের কাপড়খানা পরে' আমার সঙ্গে আয়ত একবার। ঘরের নারায়ণের পূজো দিতে হবে।"

পুত্র মায়ের কথানুসারে হাত পা ধুইতে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

"আমার দেখা লোক"

(৪) ৺প্রসন্নকুমার বসু

নওয়াখালি হইতে আমার হাওড়ায় বদলী হওয়ার সংবাদে নওয়াখালির এক বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এইবার উত্তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিতে পতন (ফ্রম ফ্রাইং প্যান্ ইনটু দি ফায়ার) হইবে। বকল্যাণ্ড সাহেব ওয়েষ্টম্যাকট্‌ সাহেব অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

আমরা পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব এক সময়ে চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়াছিলেন; আমার মনে হইল যে বাটী যাইবার সময় ঐ তীর্থ দর্শন করিয়া চট্টগ্রাম দিয়া ফেরাই ভাল। কুমিল্লায় পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম; চট্টগ্রাম স্বেচ্ছায় গেলে হয়ত ঐ বিভাগে আর আসিতে হইবে না। তখন রেলপথ ঐ দিকে খোল নাই, (২৮।১০।৮১) গোরুর গাড়ীতে নওয়াখালি ছাড়িয়া পথে শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ, বাড়বানল, সহস্রধারা, জ্যোতির্ম্ময় দর্শনের আনন্দ লাভ করি। ৪।১১।৮১ তারিখে চুঁচড়ায় পৌছিয়াছিলাম। কয়েক দিন তথায় বড়ই সুখে কাটিল। বন্ধুবান্ধবদের বলিলাম, যদি বৎসরে একবার করিয়া বক্সর হইতে চট্টগ্রাম, বা রংপুর হইতে কটক বদলী করে, তাহা হইলে কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য প্রাপ্য সময় জয়েনিং টাইম হইতে আট দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী থাকা যায়। বন্ধু অভয় এ কথায় বলিলেন, "হাঁ, নওয়াখালি হইতে হাওড়ায় বদলী ভাল লাগিয়াছে; কিন্তু হাওড়া হইতে বদলী হয়ত পূর্ণিয়ায়, এক বৎসরের শেষে কেন, দুই বৎসর পরেও ভাল লাগিবে না।"

প্রকৃত আমার দুই বৎসরেই পূর্ণিয়ার আরারিয়া মহকুমায় বদলী হইয়াছিল। বন্ধুবরের কথা ওরূপ আশ্চর্য্য ভাবে ঠিক দাঁড়াইলে আমি যখন তাঁহাকে 'ত্রিকালদর্শী মহাত্মা' বলিলাম, তখন তিনি বলিলেন—"পাপমুখে কি যে বলিয়াছিলাম! ওখানে গিয়া, ব্যারামে না পড়িলেই ভাল!" প্রকৃতই আরারিয়ায় আমার সঙ্কটাপন্ন ব্যারাম হইয়াছিল। সুগন্ধ্যার কায়স্থ কবিরাজ বংশীয় অভয়চরণ রায় আমার বাঙ্গলা স্কুলের ও কলিজিয়েট স্কুলের সহপাঠী; আমাকে প্রকৃতই ভালবাসিত; সূক্ষ্ম সহানুভূতিতে হয়ত কিরূপে এসব উহার ঠিক মনে আসিতেছিল! অভয় পরে পুত্রশোকে উন্মাদগ্রস্থ হওয়ায় আমার মনে হয় যে, উহার স্নায়ুমণ্ডলে প্রকৃত এরূপ একটা অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতি আসিতেছিল, যাহা যোগী ভিন্ন অপরের পক্ষে ঠিক সুস্থাবস্থার ব্যাপার বা সহনীয় নহে। এছাড়া উন্মাদ হওয়ার পূর্ব্বে অভয় যোগ সাধনা আরম্ভ করে; অনেকগুলি আসন শিখিয়াছিল; কিন্তু কৌলিক দীক্ষা ছাড়িয়া

প্রণব মন্ত্র একজন শূদ্র গুরুর নিকট গ্রহণ করে। এ সব বড় কঠিন ব্যাপার। স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয়ে স্নায়ুতে নিজের অজ্ঞাতসারে নিদারুণ আঘাত লাগে।

হাওড়ায় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য চুঁচুড়া হইতে (১২।১২।৮১) গিয়া বেলা দশটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি ই বকল্যাণ্ড সাহেবের কুঠির বাহিরের ফটকে ঢুকিতেই দেখিলাম, শামলা মাথায় চাপকান পরা একটী বাবু বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি আমার নিকট পৌঁছিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "আপনিই কি নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মুকুন্দ বাবু?" আমি বলিলাম "হাঁ" এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার নাম শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু; এখানে সাব ডেপুটী; আমি বকল্যাণ্ড সাহেবের লোক,—তিনিই কেরাণী হইতে আমায় উন্নত করিয়াছেন, সাহেবের ভিতরটা বড়ই ভাল; না ঘাঁটাইলে বড়ই মিষ্ট। সে যাহা হউক, বঙ্কিমবাবুর সহিত সাহেবের যে গোলমাল চলিতেছে অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন। বঙ্কিম বাবু কলিকাতার বাড়ীতে যাইতে পান না। সাহেব বলিয়াছেন, বিনা অনুমতিতে কর্ম্মচারীদের জিলার বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। এ অবস্থায় যাহাতে আপনার পরম পূজনীয় পিতার নিকট কিছুদিন প্রত্যহ যাইতে পারেন, সে জন্য একটা পরামর্শ দিতে চাই। সিধে বা সাধারণ ভাবের প্রার্থনায় এ সাহেবের নিকট ফল হয় না; 'নির্ভর' করিলেই সাহেব গলিয়া যান। আপনি সাহেবকে কথাবার্ত্তার শেষে বলুন, 'কর্ম্মচারীদের হাওড়া ছাড়িয়া যাওয়া যে আপনি ভালবাসেন না, তাহা এখানে আসিয়া শুনিলাম। যদিও লোকজন জিনিষপত্র লইয়া আসি নাই, এবং বাসার ঠিক করি নাই, এবং আজ চুঁচুড়ায় বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মন করিয়াই আসিয়াছিলাম, তথাপি এখানে কাহারও বাড়ীতে একরাত্রি কাটাইয়া দিতে পারিব এবং আমার টেলিগ্রাম পাইয়া পিতৃদেব লোকজন পাঠাইয়া দিবেন এবং কালই আমার বাসা ঠিক হইয়া যাইবে।" আমি বলিলাম—"মাস দুই বাড়ী হইতে যাওয়া আসার অনুরোধ করিব স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম"। প্রসন্ন বড়ই মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন—"বিশেষজ্ঞের সমাদর সর্ব্বত্রই করিতে হয়। বকলণ্ড সাহেবকে আমি ভালবাসি, প্রকৃতই শ্রদ্ধা করি, এবং সেই জন্য তাঁহাকে ঠিক চিনি। তাঁহার সম্বন্ধে আমার পরামর্শ লইও। আমার ইংরাজী রিপোর্টের ভাষা সম্বন্ধে কাটকুট করিয়া দিতে যখন বলিব, তখন তোমার একটা আঁচড়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না, সব মানিয়া লইব।"

এমন সুমিষ্ট ধরণে এই কথাগুলি উক্ত হইল যে, প্রসন্ন যেন তৎক্ষণাৎ কত কালের পরিচিত বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল! আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবের বাড়ীতে গিয়া কার্ড দিবা মাত্র সাক্ষাৎ হইল। কিয়ৎক্ষণ নানা বিষয়ের কথা হওয়ার পরে, আমি উঠিবার সময় প্রসন্নের উপদিষ্ট কথাগুলি কোনরূপে বলিয়া ফেলিলাম। সাহেব আমার আপাদ মস্তক দুই তিনবার দেখিয়া বলিলেন, "এ ত বড়ই সন্তোষজনক! (দ্যাট্‌স্ ভেরি সেটিস্‌ফ্যাক্টরি)" তাহার পর এক মিনিট বাদে বলিলেন—"এখন তিনমাস ধরিয়া তুমি প্রত্যহ বাড়ী হইতে আসিতে পার। তোমার পিতা তোমাকে এখন দিন কতক প্রত্যহ দেখিতে পাইলে সুখী হইবেন।"

আমি প্রসন্নর অযাচিত বন্ধুত্বের জন্য বড়ই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলাম। ফিরিবার সময় দেখি, ফটকের নিকট প্রসন্ন তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। আমি সব কথা বলিলে প্রসন্ন বলিলেন—"ঐ কথা শুনায় সাহেব বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি বিবাদপ্রার্থী নয়; হুকুম মানিয়া আমাকে তুষ্ট রাখিয়া সহজ ভাবে কায করিতে চায়—ইহার অনুকূল হইব বৈ কি!"

যেখানে বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিম বাবুর হাওড়ার পুল পার হইবার অনুমতি নাই, সেখানে আমার ন্যায় অগণ্য নূতন কর্ম্মচারীর জন্য তিন মাস যাতায়াতের অযাচিত অনুমতি প্রসন্নের কথাই সম্পূর্ণ সমর্থন করিল! প্রসন্ন বলিল—"তোমার পিতৃদেবকে আমার প্রণাম জানাইও এবং বলিও যে, যখন বাসা

করিতে হইবে, তখন আমি বাড়ী ঠিক করিয়া দিব এবং তোমাদের শিষ্য ছকু ও নকুলালের ন্যায় দেখা শুনা করিব, কোন কষ্ট হইতে দিব না।" পূজনীয় পিতৃদেব সন্ধ্যার পর সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন প্রকৃতই অকপট বন্ধু হইল। উহার পরামর্শ কখন তাচ্ছিল্য করিও না। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে।"

কয়েক দিন পরে পাতিহাল (পাঁতেল) গ্রামে একটা জমি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সরে জমিনের নক্সা প্রস্তুতের এবং স্থানীয় তদন্তের হুকুম আসিল। তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই প্রসন্ন আসিলেন এবং বলিলেন—"পেস্কারের নিকট এইমাত্র শুনিলাম যে তোমার প্রতি সাহেবের একটা তদন্তের সংস্পষ্ট বিশেষ হুকুম আসিয়াছে।" আফিসের সকলের সঙ্গে প্রসন্নের ভাব; সকল সংবাদ উহার নিকট পৌছে। আমি নথিটার উপর সাহেবের হুকুম দেখাইলাম। প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাইবে?" আমি বলিলাম—"রবিবারে।" প্রসন্ন বলিলেন—"আজ ত সবে সোমবার, রিপোর্ট দিতে আট দিন দেরী হইবে, আর রবিবার বাড়ী থাকিতে পাইবে না—এটা কিরূপ সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হইবে?" আমি বলিলাম—"তবে?" প্রসন্ন বলিলেন—"চাঁদনী রাত্রি, কাছারির পারে এখান হইতেই রওয়ানা হইয়া যাও। তোমার ব্যাগে কাপড় গামছা থাকেই। আফিসে খাবার জন্য যে জলখাবার আনিয়া থাক তাহার উপর আরও বিষ্ণু ব্রাহ্মণ চাপরাসীকে দিয়া বড়বাজার হইতে আনাইয়া দিতেছি। কল্য প্রত্যুষেই তদারক করিয়া সোজা কাছারীতে চলিয়া আইস, এবং বেলা দুইটার সময়ে সাহেব আফিসে আসার পূর্ব্বেই রিপোর্ট দিয়া ফেল। ক্ষযটা হইয়া গেলে শরীর ঝরঝরে বোধ হইবে।"

পরামর্শ ভাল লাগিল। বুঝিলাম যে প্রসন্নর কার্য্যে সাহেব কেন তুষ্ট। সেইরূপই কার্য্য করিলাম এবং বরাবরই ঐরূপ ক্ষিপ্রকারিতার অভ্যাস রাখিলাম।*

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় আফিসে আসিলাম। প্রসন্ন বলিল, "তোমার হাতের লেখা ভাল নয়—তাড়াতাড়ি লেখ নাই ত?" নথিটা লইয়া সে দেখিল এবং বলিল, "ও লেখা চলিবে না, আমি 'ব্লাক লাইন' করা কাগজ আনিয়া দিতেছি; তাহার উপর সাদা কাগজ ফেলিয়া সোজা লাইনে বড় এবং সমান অক্ষরে ওটা নকল কর; ততক্ষণে আমি নক্‌সাটা ঠিক করিয়া আনিতেছি। খারাপ কালিতে তাড়াতাড়ি লেখা রিপোর্টটা তাচ্ছিল্য প্রকাশক। বিশেষতঃ বক্‌লণ্ড সাহেবের নিজের লেখা বড়ই সুন্দর।"

আমি দেখিলাম বাস্তবিকিই কালিটা খারাপ; উহা পড়িতে কষ্ট হইতে পারে। ধরিয়া ধরিয়া যথাসাধ্য ভাল অক্ষরে নকল করিলাম। ততক্ষণে

---

* অনেক বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় নদীয়া জেলার মেজিষ্ট্রেট এবং আমি মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমাদ্বয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলাম, তখন তিনি মেহেপুর আফিস-বাড়ি দর্শনের জন্য আইসেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহার তাঁবুতে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে একটা নথি দিয়া বলেন—'এটা গ্রাম্য রাস্তা বন্ধের বিরুদ্ধে দরখাস্ত; এটার তদারক শীঘ্রই করিয়া দাও।' আমি শেষ রাত্রে উঠিয়া গিয়া মাইলটাক দূরে স্থানটায় উপস্থিত হই এবং নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া বিবাদ মিটমাটের নিদর্শন স্বরূপ উভয় পক্ষের একত্রে সহি করা দরখাস্ত লইয়া চলিয়া আসি। বেলা ৯॥০টার সময় মাজিষ্ট্রেটের তাঁবুর সামনে গেলে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং দুই এক কথার পর বলিলেন—"সে রিপোর্টটা দু'একদিন মধ্যে—আমি এখানে থাকিতে—পাইলে ভাল হয়।" আমি পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম—"সে কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।" তিনি বলিলেন—"কখন গিয়াছিলে?—কিরূপে হইল?" আমি বলিলাম—"স্বদেশীয় উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবার সৌভাগ্য আমার চাকরীতে এই প্রথম পাইয়া, ভোরেই ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। রাস্তা একেবারে বন্ধ হয় নাই; তবে বেড়াদ্বারা উহার একটু অংশ ঘিরিয়া লইয়াছিল বটে। আমার সাক্ষাতেই সে বেড়া সরাইয়া লইয়া উভয় পক্ষেই দস্তখত করিয়া দিয়াছে।" 'স্বদেশীয় উপরওয়ালা' শব্দ ব্যবহারে করিতেই মিঃ গুপ্তের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল।—সামাজিক প্রবন্ধের উপদেশ—'স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে যদি চকুরী করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবে।'

প্রসন্ন নক্‌সাটা স্কেল অনুযায়ী আঁকিয়া, পেন্‌সিলে রং করিয়া আনিল এবং আমার রিপোর্টের সহিত নথিভুক্ত করিয়া দুইটার পূর্ব্বেই সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল।

অল্পকাল পরেই সাহেবের চাপরাসী নথিটা আমাকে দিয়া গেল। মিঃ বক্‌লণ্ড লিখিয়াছিলেন—"এ ভেরি প্রম্‌ট, ক্লীয়ার অ্যাণ্ড কম্‌প্লীট রিপোর্ট,-- ক্রেডিটেবল্‌ টু দি ডেপুটী কলেক্টর (ক্ষিপ্র পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ রিপোর্ট—ডেপুটী কলেক্টর প্রসংসার যোগ্য)।"—

প্রসন্ন বলিলেন, "এখন হইতে তোমার সাতখুন মাফ। বক্‌লণ্ড গোষ্ঠীর যাহাকে একবার 'ভাল' বলিয়াছে, তাহাকে আর কখনও মন্দ বলিবে না। উহাঁদের বিশ্বাস এই যে, উহাঁদের ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় কিছুরই সম্বন্ধে ভ্রম হইতে পারে না।—বস্তুতঃ হঠাৎ কাহাকেও 'ভাল' ইঁহারা বলেন না।"

চুঁচুড়া হইতে যাতায়াতের দুই মাস পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্ব্বে প্রসন্ন বলিলেন, "এইবার হাওড়ায় বাসা কর। ডাক্তার রসিকলাল দত্তের বাড়ীটা স্থির করিয়াছি, বাড়ীটা ভাল এবং আমাদেরও কাছে হইবে।" আমি বলিলাম "আরও একমাস বাকী আছে, এখনই কেন?" প্রসন্ন বলিলেন, "আর একদিনও বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করায় ক্ষতি অধিক নাই, কিন্তু বিলম্ব আর না করায় মহালাভ হইবে—আমি সাহেবকে চিনি।"

বাড়ী গিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বলায় তিনি অবিলম্বে বাসা করিতেই মত দিলেন। তাহাই করা হইল। কিন্তু আমার মন খুঁতখুঁত করিতেছিল। প্রসন্ন বলিলেন—"এইবার সাহেবের কুঠীতে যাও, এবং বল যে কল্য রাত্র হইতে হাওড়াতে বাসা করিয়াছ।—ঐ কথায় সাহেব যখন বলিবেন, এখনও ত তোমার ঠিক এক মাস বাড়ী হইতে যাতায়াতের অনুমতি ছিল, তখন বলিও, 'আমি আপনার অনুগ্রহের সমগ্র সুবিধা লইতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। (আই ফেল্‌ট দ্যাট আই কুড নট টেক দি অট্‌মোষ্ট অ্যাডভানটেজ অফ ইওর কাইণ্ডনেস্‌)।"

আমি বলিলাম, "সাহেব বুঝি দিন গুণিতেছেন আর হিসাব রাখিয়াছেন যে বলিবেন 'ঠিক এক মাস বাকী'?" প্রসন্ন শুধুই মুচকি হাসিলেন।

সাহেবের সহিত দেখা হইলে এবং বাসা করার কথা বলিলে, সাহেব প্রকৃতই একখানা পকেট বই খুলিয়া দেখিয়া, ঠিক প্রসন্ন যাহা বলিয়াছিলেন সেইরূপই প্রশ্ন করিলেন! তখন আমি একান্তই বিস্মিত হইয়া, প্রসন্নের দ্বারা শিক্ষিত উত্তর দিলাম। বক্‌লণ্ড সাহেব স্মিতমুখে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এইরূপ লোককেই আমার সহায়তা করিতে আগ্রহ হয়।" তাহার পর বলিলেন, "আমার আর পৃথক অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, তুমি প্রতি শনিবারে এবং সকল ছুটীর পূর্ব্বদিন বৈকালে বাড়ী যাইতে পাইবে। মধ্যে ইচ্ছা হইলে বুধবারেও যাইতে পারিবে।"

প্রসন্নের উপর এবং সাহেবের উপর বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম এবং প্রসন্ন কিরূপ নিখুঁত ভাবে সাহেবের মিষ্ট দিকটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে একান্তই বিস্মিত হইলাম। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একান্ত সুমিষ্ট ব্যবহারেরও আদর্শ মনে মনে গ্রহণ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলাম, বঙ্কিম বাবুর সহিত ব্যবহারও যেন না ভুলি। এত সুমিষ্ট যদি অত টক্‌ হইতে পারেন, তখন আমার নিজের উপর বড়ই অধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন—আমারও ত টক হওয়া তবে অসম্ভব নয়! অবিচলিত থাকাই যে হিন্দুর আদর্শ!

ইহার কিছুদিন পরে দেখি, বক্‌লণ্ড সাহেব দাড়ি কামাইয়াছেন; প্রসন্নও কামাইয়াছেন! জিজ্ঞাসায় প্রসন্ন বলিলেন "আমি বক্‌লণ্ড সাহেবের লোক। তাঁহার দাড়ির সহিত আমার দাড়ির সদ্ভাব ছিল; দুজনে একত্রে চলিয়া গেল!" তাহার পর খুব হাসিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সাহেবের সহিত খুব মজার কথা হইয়া গিয়াছে।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে সাহেব প্রসন্নকে একটু অপ্রতিভ করিবার চেষ্টায় বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার দেখাদেখি দাড়ি কামাইয়াছ!" প্রসন্ন বলেন, "হাঁ;

ঠিক তাই। আমার বাপ পিতামহের দাড়ি ছিল না; দাড়ির রহস্য আমি কি বুঝিব? (হোয়াট ডু আই নো অফ বিয়ার্ডস্) আপনারা রাখেন তাই আমিও রাখিয়াছিলাম। এখন দাড়ি ফেলিয়াছেন—আমি কারণ জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করি অবশ্যই উপযুক্ত কারণ দেখিয়াছেন—তাই আমিও ফেলিয়াছি।"

প্রসন্নের সহিত এবং নকুলাল এবং ছকুলাল সরকারের সহিত কথাবার্ত্তায় আমি বক্‌লণ্ড সাহেবের অনেক অসাধারণ গুণের কথা জানিতে পারিলাম। হাওড়ার বিভিন্ন ময়লা খোলার ঘরের বস্তি সকলের ভিতর সাহেব প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত এবং মিউনিসিপ্যালিটীর দ্বারা উহাদের সাফাই সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিতেন। একবার এক মাসের জন্য গয়ায় বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তখন বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত গাড়ী যাইতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এদেশীয় লোকে একটু সুখে থাকে এই ইচ্ছা এবং চেষ্টা বিশেষ ভাবে উঁহার ভিতর ছিল; তাহাতে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কথাবার্ত্তা ঠিক সমতুল্য বন্ধুর ন্যায় কহিতেন। তখন তিনি পাকা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একটীন ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কোন্ পদপ্রাপ্তি তুমি ইচ্ছা কর?" আমি বলিলাম, "খুব শীঘ্রই চীফ সেক্রেটারী হউন।" সাহেব বলিলেন, "আরও উচ্চ নহে কেন? (হোয়াই নট হায়ার) আমি বলিলাম, "তাহা হইলে বড়ই অধিক উচ্চ হইয়া পড়িবেন—আমার পক্ষে উপকারিতা থাকিবে না। চীফ সেক্রেটারী হইলে সুবিধামত স্থানে বদলী করিতে পারিবেন।" সাহেব খুব হাসিলেন। ইহার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে, আমি ভাগলপুরে তিনবৎসর কার্য্য করিয়া, চীফ সেক্রেটারী পদে উন্নীত বক্‌লণ্ড সাহেবকে কটক বা অন্য কোন স্থানে—(যথায় কলেজ আছে-ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পড়ার সুবিধার জন্য) বদলী প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং আমাদের হাওড়ার ঐ দিনের কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। সাহেব উত্তর দেন, "আমাদের সে দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। যেন গত কল্যকার কথা বলিয়া মনে হয়। আমি তোমাকে প্রেসেডেন্সির পরেরই কলেজটী দিলাম।"—আমাকে পাটনায় বদলী করিলেন।

মধ্যে যখন গয়ায় কার্য্য করিতাম, তখন একটা ছুটিতে একদিন (সে সময় বক্‌লণ্ড সাহেব বোর্ড অফ রেভিনিউর সেক্রেটারী) দেখা করিতে যাই। বলিলেন, "কি প্রয়োজন?" আমি বলিল, "কেবল স্মরণে থাকিতে আসিয়াছি। বক্‌লণ্ড সাহেব বলিলেন, "তুমি অজ্ঞাতসারে আমাকে একটা অবমাননা সূচক বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছ। কোনও বক্‌লণ্ড কি কখনও তাহার বন্ধুকে ভুলিয়াছে? (হ্যাজ এ বক্‌লণ্ড এভার ফরগট্‌ন হিজ্ ফ্রেণ্ড)!"

বক্‌লণ্ড সাহেবের সহিত আমার এতটা সুমিষ্ট সম্বন্ধের মূল—প্রসন্ন। ঐ সাহেবকে সকলেই তাঁহারই ন্যায় শ্রদ্ধা করে প্রসন্নের সর্ব্বদা এই চেষ্টা ছিল। সাহেবের কেহ নিন্দা করিলে উঁহার কষ্ট বোধ হইত। কোন কোন লোকে প্রসন্নকে 'খোসামুদে' বলিত; কিন্তু আমি সাহেবের প্রতি উঁহার গভীর কৃতজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইতাম। বকলণ্ড সাহেব অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকে কেরাণী হইতে ক্রমশঃ কলিকাতায় ইনকম ট্যাক্স ডেপুটী কলেক্টর করিয়া দেন নাই। প্রসন্নের কার্য্যক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, তাহার কার্য্যের কখনও নিন্দা শুনি নাই। প্রসন্নের স্নেহপ্রবণ মনের নিদর্শন যে কত পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। হাওড়ায় থাকার সময় সর্ব্বদাই দেখা হইত এবং প্রত্যহই যেন কোন না কোন উপায়ে বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রসন্ন সূক্ষ্মভাবে যত্ন করিতেছেন দেখিতে পাইতাম। একবার হাওড়ায় আমার জ্বর হয়। প্রসন্ন ঠিক ভাইয়ের ন্যায় যত্ন করিয়া সকল কষ্ট লাঘব করিয়াছিলেন।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০। অষ্টাবৃত্তা

(ক) কেন নিবে গেল বাতি ?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি
—দুরাকাঙ্ক্ষা, চিত্রা।

(খ) "ওই শোন ভাই বিশু,
পথে শুনি, জয় যীশু
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্য্য শিশু ?
—ধর্ম্মপ্রচার, মানসী।

(গ) আমি এ কেবলি মিছে বলি
শুধু আপনার মন ছলি
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্ম্মে জ্বলি !
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কি হবে লুকায়ে হৃদয় বেদনা ?
যেমন আমার হৃদয় পরাণ
তেমনি দেখাব খুলি !
—আত্মসমর্পণ, মানসী।

১১। মালিকা

(ক) কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া
এসেছি ভুলে,
তবু একবার চাও মুখ তুলে
নয়ন তুলে !
দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে
সজল আবেগে আঁখি পাতা দু'টি
পাড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না—
এসেছি ভুলে !
—ভুল, মানসী।

(খ) "বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে,
এখনো সময় নয়।"
নিশি অবসান, যমুনার তীর,
ছোট গিরিমালা, বন সুগভীর,
গুরুগোবিন্দ কহিল ডাকিয়া
অনুচর গুটিছয়।
—গুরুগোবিন্দ, মানসী।

১২। গুপ্তা

(ক) ভুলু বাবু বসি পাশের ঘরেতে
নাম্‌তা পড়েন উচ্চস্বরেতে
হিষ্ট্রী কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে,...
—বঙ্গবীর, মানসী।

(খ) একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহ রে। গান।

(গ) কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামল কান্ত
উজ্জ্বল নীল বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী !
—নগরসঙ্গীত, চিত্রা।

(ঘ) "প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি ?"
অনাথপিণ্ডদ কহিল অম্বুদ-
নিনাদে ।
— শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, কথা।

১৩। শতদলবাসিনী

(ক) হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটিনে কাহারো পিছুতে
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে ।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল খবর রাখিনে তো কোনো কিছুরি,
উপরে চড়িতে যদি নাহি পাই সুবিধা,
সুখে পড়ে থাকি নীচুতেই, থাকি
নীচুতে ।
-- উদাসীন, ক্ষণিকা।

(খ) নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আজি নাহিরে ;
ওগো তোরা আজ যাসনে ঘরের
বাহিরে ।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,
আউসের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে !
ওগো তোরা আজ যাস্নে ঘরের
বাহিরে ।
আষাঢ়, ক্ষণিকা।

(গ) ওগো, কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
এই, বিষাদ শান্ত শোভাতে
ঐ, ভৈরবী আর গেয়োনাক এই
প্রভাতে,
মোর গৃহছাড়া এই পথিক পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে।
—ভৈরবী গান, মানসী।

(ঘ) ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে
মোর ঘরে কেহ নাই যে !
তারে, মনে পড়ে যারে চাই রে।
তার, আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।
গান, কড়ি ও কোমল

(ঙ) বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায়,
এলে তুমি ঘন বরষায় !
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি নব ঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণ যে গান বাজাবে
সে গান তোমরা'কর সায়,
আজি জলভরা বরষায়।
আবির্ভাব, ক্ষণিকা।

(চ) তুমি, সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
শূন্য গগন বিহারী !
আমি, আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন বিহারী।
—মানস-প্রতিমা, কল্পনা।

(ছ)　আমি, পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ খেলা
নিশীথ বেলা!
সঘন বরষা গগন আঁধার
হের বারিধারে কাঁদে চারি ধার
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা,
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রি বেলা।
— ঝুলন, সোনার তরী।

(ছ)　ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে গানে বাজিছে
তাহার তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ মঞ্জীরে।
—যাচনা, কল্পনা।

(ঝ)　হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে!
হৃদয় নাচে রে!
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মত করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে
ময়ূরের মত নাচে রে!
—নববর্ষা, ক্ষণিকা।

(ঞ)　আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ
জানে না;
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ
মানে না;
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কতজনে কত করে পরিহাস—
পাছে সে না পারি সহিতে,
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়
কেহ কিছু নারে কহিতে।
—অন্তরতম, ক্ষণিকা।

১৪। দীর্ঘ ত্রিপদী

নিভৃত এ চিত্তমাঝে　　নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই　　মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিন রাত!
—উপহার, মানসী।

১৫। একাকিনী

দেখিনু ফুটিছে ফুল　　দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি　　ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
—পুনর্ম্মিলন, প্রভাত-সঙ্গীত।

১৬। খণ্ডিতা

দোলেরে প্রলয় দোলে, অকূল সমুদ্র কোলে,
উৎসব ভীষণ!
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন!
—সিন্ধুতরঙ্গ, মানসী।

(ক) বিয়োগিনী খণ্ডিতা

ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস বাসা,
যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা।
—প্রতীক্ষা, সোনার তরী।

(খ) মিলিতা-খণ্ডিতা

আমি যাহা দেখিয়াছি আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কৈ ?
—আমার সুখ, মানসী।

১৭। নর্ত্তকী

ওরে তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ ?—
—নদী, শিশু।

১৮। দীর্ঘবিলম্বিতা

আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করেছি দান
কেবল সরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে
নিশি দিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।
—লজ্জা, সোনার তরী।

১৯। সংযুক্তা

(ক) আজি হ'তে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে।
১৪০০সাল, চিত্রা।

(খ) খেলাধূলা পড়ে নাকি মনে
কত কথা স্নেহের স্মরণে !
সুখে দুঃখে শতফেরে সে কথা জড়িত যে রে
সেও কি ফুরাবে ?
হায় কোথা যাবে !
কোথায়, কড়ি ও কোমল।

(গ) বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তাহারে পড়েছে মনে বকুলতলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?
ভুল, কড়ি ও কোমল।

২০। পয়ার-বেষ্টিতা

[ক] ওই দূর খেলাঘরে খেলাইছে কা'রা
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হ'ল সারা।
—ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, কড়ি ও কোমল।

[খ] বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী
গাঢ়ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।
সেকাল ও একাল, মানসী।

[গ] মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা !
এই ভাঙে, এই গড়ে,
ওই ওঠে এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।
—নিষ্ঠুর সৃষ্টি, মানসী।

২১। পয়ারমুখী

[ক] হাসিতে ভরিয়া গেছে হাসিমুখখানি
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে—
মরি মরি মুখে নাই বাণী।
—স্নেহময়ী, ছবি ও গান।

[খ] মেঘের আড়ালে বেলা কখন যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়!
আর্দ্র পাখা পাখীগুলি গীতগান গেছে ভুলি
নিস্তব্ধ ভিজিছে তরুলতা!
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
—উপকথা, কড়ি ও কোমল।

২২। দশিকা শৃঙ্খলিতা

[ক] হের ওই বাড়িতেছে বেলা,
বসে আমি রয়েছি একেলা!
ওই হেথা যায় দেখা সুদূরে বনের রেখা
মিশেছে আকাশ নীলিমায়
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধূ ধূ করে
বায়ু কোথা বহে চলে যায়।
—মধ্যাহ্নে, ছবি ও গান।

[খ] সারাদিন গিয়াছিনু বনে
ফুলগুলি তুলেছি যতনে!
প্রাতে মধুপানে রত মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আনমনে।
—অনুবাদ, কড়ি ও কোমল।

[গ] আজ কিছু করিব না আর
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন্ গুন্ গেয়ে গেয়ে
বসে বসে ভাবি একবার!
—স্মৃতি প্রতিমা, ছবি ও গান।

[ঘ] তুমি মোরে পারনা বুঝাতে?
প্রশান্ত বিষাদ ভরে দু'টি আঁখি প্রশ্ন করে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে!
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত চোখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।
—দুর্বোধ, সোনার তরী।

২৩। ত্রিপদাষ্টিকা

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে
হু হু করে হাওয়া আসে
হি হি করে কাঁপে গাত্র।
—শীতে ও বসন্তে, চিত্রা।

[চতুর্থপদে শেষাক্ষর যুক্ত।]

২৪। মাত্রিক দীর্ঘত্রিপদী

ঘুমের মত মেয়েগুলি চোখের কাছে ঢুলি ঢুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রণরণি।
—মাতাল, ছবি ও গান।

২৫। বিচিত্রা

১। অসমিকা

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভাল লাগে।
—২৯, গীতাঞ্জলি।

২। নবাষ্টিকা

তব জীবনের আলোতে
জীবন প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
—৫১, গীতাঞ্জলি।

৩। বেণু-বাদিনী

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কায নাই তরণী।
"হাগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে?"

তাহারে শুধানু হেসে যেমনি,
অমনি কথা না বলি
ভরাঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

—দিনশেষে, চিত্রা।

৪। একাবলী

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জান', মন তোমারে চায়।

—৩০, গীতাঞ্জলি।

৫। মিশ্র একাবলী

জীবন যখন শুকায়ে যায়,
করুণা ধারায় এসো,
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়
গীত সুধারসে এসো!

৫৯, গীতাঞ্জলি।

৬। দশিকা

(প্রভাতে সঙ্গীতের কালেই এই ছন্দের জন্ম।)

[ক] নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ!

—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, প্রভাত-সঙ্গীত।

[খ] আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।

—কাঙালিনী, কড়ি ও কোমল।

মাত্রিক দশিকা

[গ] খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত' যারা তারা আজো হাসে!

—মায়ের আশা, কড়ি ও কোমল।

২৬। প্রবাসিনী

[১] অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী!
জনকজননি-জননী!
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরিটিনী।

— ভারতলক্ষ্মী, কল্পনা।

[২] জন গন মন অধিনায়ক জয় হে,
জয় জয় ভাগ্য বিধাতা।

—গান।

[৩) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি!

—গান।

প্রভৃতি রচনাগুলি সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে পঠিতব্য বলিয়া এশ্রেণীর সবগুলিকেই "প্রবাসিনী"র শ্রেণীভুক্ত করিতেছি। কারণ বাংলা ছন্দের ভিতর ইহারা প্রবাসিনীই।

সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত ছন্দগুলিই, এ নিবন্ধে আলোচিত হইল। গীতাঞ্জলির পর রচিত প্রায় সমস্ত ছন্দই, এই শ্রেণীগুলির ভিতর কোনোটিতে না কোনোটিতে ভুক্ত করা যাইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। যদি না যায় তো, সেগুলির সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করিব।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্য

এদেশে শিশু-সাহিত্যের বড়ই অভাব। বিলাতে ও অন্যান্য দেশে শিশুদের জন্য নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর মাসিক পত্র এবং গ্রন্থাবলী আছে। আমাদের এদেশে নাটক নভেল ও বাজে উপন্যাস প্রভৃতির তুলনায় শিশু-পাঠ্য গ্রন্থাদি অতি কম। বড় বড় লেখকগণ কেবল কাব্য উপন্যাস নাটক লিখিয়াই জীবন কাটাইয়া থাকেন, শিশু-সাহিত্যের প্রতি তাঁহারা একটীবারও দৃষ্টি করেন না। আধুনা এদেশে শিশুদের জন্য কতিপয় মাসিক পত্র ও পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু সকলগুলি শিশুদের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের ত অভাবই নাই; বাহ্যিক জ্ঞান লাভের জন্য শিশুদের উপযোগী কোনও পুস্তকাদি এতদিন ছিল না, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমানে শিশুপাঠ্য যে সকল পুস্তকাদি ও মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই তেমন সুন্দর নহে। অনেক লেখক শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি সরল ভাষায় লিখিতে যাইয়া এত অধিক 'সরল' করিয়া বসেন যে, তাহা পল্লী-গ্রামের কথ্য ভাষারও মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। আজকাল শিশুদের জন্য যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ গ্রন্থই সাধারণ কথ্য ভাসায় লিখিত। অনেকের বিশ্বাস যে শিশুরা ঠাকুরমার মুখের ভাষায় কথা না বলিলে বুঝিবে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর-মার মুখের ভাষায় গল্প লিখিতেছেন। এখন দেখা আবশ্যক যে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য কি?

গল্প বলাই যদি এই সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, তবে পুস্তক প্রকাশ করিয়া লাভ কি? কাগজ কালীর শ্রাদ্ধ করিয়া এবং মুদ্রাকরের পরিশ্রম বৃদ্ধি করিয়া শিশুদিগকে গল্প না শিখাইলেও চলে, গল্প মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া চলে। আর যদি ঐ সকল পুস্তক দ্বারা গ্রন্থকারের জীবিকা নির্ব্বাহ করা উদ্দেশ্য হয়, তবে আর কোন কথা বলিবার নাই। যাঁহারা কেবল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শিশু পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকের ভূমিকায় "ইহাতে শিশুদের শিখিবার ও জানিবার অনেক বিষয় আছে" এই কথা না লিখিয়া, "ইহা গ্রন্থকারের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য লিখিত" এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন; তবে অন্তত সত্যের মান, বজায় থাকে, পয়সাও সার্থক হয়।

শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যে সকল পুস্তক লিখিত হয়, সেগুলির প্রতি গ্রন্থকারদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আর একটী কথা গ্রন্থকারদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সকল শিশুদের জন্য পুস্তক লিখিত হয়, তাহারা দুগ্ধপোষ্য শিশু নহে। পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান লাভ হইবে এই উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হয় তাহার ভাষা অত ইতর শ্রেণীর না হইলেও শিশুরা বুঝিতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমানে শিশুদের জন্য নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে শিশুপাঠ্য গল্প প্রবন্ধাদি সরল ভাষায় লিখিতে যাইয়া 'হলুম, গেলুম, নিলুম, খেলুম' প্রভৃতি বাঘী ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই প্রকার গল্প পড়িয়া শিশুরা ভাষা শিক্ষার ও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শিক্ষার সুযোগ পায় না. কেবল গল্প গলাধঃকরণ করিতে পারে। ঐ প্রকার ভাষা পড়িতে পড়িতে তাহাদের ঐ প্রকারই অভ্যস্থ হইয়া যায়। 'শীগ্‌গির' স্থলে 'শীঘ্র' বা 'তাড়াতাড়ি', 'যাচ্চি' স্থানে 'যাইতেছি' লিখিলেও যে শিশুদের অভিধান খুঁজিতে হয় না ইহা লেখকের ভাবিয়া দেখা উচিত।

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্, শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্, সিটি বুক সোসাইটী ও অন্যান্য পুস্তকালয় হইতে শিশুপাঠ্য অনেক পুস্তক বাহির হইতেছে। সুখের কথা বটে। কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকেরই ঐ প্রকার 'বাঘী ভাষা.' উপরিউক্ত "সরল" ভাষার লিখিত প্রবন্ধাদি শিশুদের

দূরের কথা, তাহাদের বাপেদেরও পড়িতে বিরক্তি জন্মে। বর্ত্তমান সময়ে শিশু সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কারণ বিজ্ঞানের গল্প, ইতিহাসের গল্প, মহাপুরুষদের জীবনচরিত ও নানা দেশের ঐতিহাসিক তথ্য সমুদয় এখন অতি সুন্দর ভাবে শিশুদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। এই প্রকার শিশু-সাহিত্যের যত উন্নতি হয় ততই সুখের কথা। কিন্তু ভাষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিলে পুস্তকগুলি আরও সুন্দর হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রও এখন বেশ উন্নতির পথে চলিয়াছে। পূর্ব্বে শিশুপাঠ্য পত্রিকা একেবারেই ছিল না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে "সখা", "সখা ও সাথী" নামে দুইখানা অতি সুন্দর মাসিকপত্র বাহির হইত। ঐ দুইখানা অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল, পরে উপযুক্ত পরিচালক অভাবে উঠিয় যায়। 'মুকুল' নামে একখানা মাসিক-পত্র কিছুদিন বাহির হইয়া পরে বন্ধ হইয়া যায়। এখন 'সখা' এবং 'সখা ও সাথী'র ন্যায় সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ মাসিক পত্র দেখা যায় না। যাহা ২।৪ থানা বর্ত্তমান আছে, তাহাও তেমন সুন্দর নহে। তবে বর্ত্তমানে যে সকল শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র আছে, তাহার কয়েকথানার নাম উল্লেখযোগ্য।

'সখা ও সাথী' উঠিয়া যাওয়ার পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র ছিল না। পরে ১৩১৭ সনে ঢাকার শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'তোষিণী' নামক একখানি অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ মাসিক পত্র বাহির হয়। উক্ত পত্রিকা প্রথমতঃ বড় বড় লেখক দ্বারা পরিচালিত হইত। মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধের দরুণ উহার সৌন্দর্য্য নষ্টপ্রায় হইয়া যায়, কিন্তু তবু রীতিমত চলিতে থাকে। ঐ পত্রিকাখানি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমানে শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রাদির মধ্যে তোষিণীই পুরাতন এবং সুন্দর। ১৩২৮ সনে কলিকাতা বাইবেল সোসাইটী হইতে 'বালক' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিতে হয়, ৭।৮ বৎসর থাকিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৩২৯ সনে 'শিশু' নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়, উহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৩২০ সনে ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বহু পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে 'সন্দেশ' নামক একখানি সুন্দর মাসিক পত্র বাহির করেন। 'সন্দেশ' অদ্যাপি সুন্দর ভাবে চলিতেছে। বরং সন্দেশের দিন দিন উন্নতিই হইতেছে। বর্ত্তমানে 'তোষিণী' ও 'সন্দেশ'ই শিশু-সাহিত্যের মধ্যে প্রবীণ। ১৩২৭ সনে কয়েকখানা মাসিক বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে 'অঞ্জলি', 'মৌচাক', ও 'আমার দেশ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে 'অঞ্জলি' পত্রিকাখানিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে হইবে। 'মৌচাক' ও 'আমার দেশ' সুন্দর, কিন্তু ইহাদের ভাষা পূর্ব্বোক্ত যাচ্চি, থাচ্চি ধরণের। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি-এ মহাশয় শিশুসাহিত্যের উন্নতিকল্পে এক অতি সুন্দর রীতি অবলম্বন করিয়াছেন; তিনি শিশুদের জন্য বিলাতী প্রথা অনুসারে 'শিশুতোষ সিরিজ' নাম দিয়া প্রতি মাসে একখানি করিয়া সুন্দর পুস্তক বাহির করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আরও নূতন মাসিক পত্র ও পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইবার আয়োজন চলিতেছে।

শিশুসাহিত্যের উন্নতি যথেষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখকগণ একটু সতর্ক হইয়া লিখিলেই আর কোন ত্রুটীর আশঙ্কা থাকে না। আমরা গ্রন্থকার ও লেখক-গণকে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনা করিতে বিশেষ সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। শিশুদের পুস্তকেরও ভাষা, ভাব শব্দযোজনা ইত্যাদি নিখুঁত হওয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ সরল ভাষায় লিখিত পুস্তকই শিশুদের উপযোগী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে পুস্তকগুলি শিক্ষাপ্রদ হওয়া চাই। শিশুসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান *

ষষ্ঠ গীত

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

খুসরোজ্-মেলার অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণে গীত।

খাম্বাজ—— —একতালা।

(একি) দীপমালা পরি' হাঁসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'।
একি নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরী উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।
গায় "জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"—
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু উত্তরে হিমালয় ;
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে ভুবনে।
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

{ রা রা II ম মা মা | মা মা রা I মা ধা ধা |
{ এ কি II দী প মা লা প রি I হাঁ সি ছে |

৩ ০ ১ ২´
| ধা ণা ধা | পা পা ধা | মা মা পা I গমা -গপা -মগা ||
| রূ প সী | এ ম হা | ন গ রী I সা০ ০০ ০০ ||

৩ ০ ১ ২´
| রা { রা রা | .মা মা মা | মা মা রা I মা ধা ধা
| জি এ কি | নি শী থ | প ব নে I ভ ব .নে

---

* "প্রতাপসিংহ"এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হয়, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

| ৩ ধা পা ধা | ০ পা পা ধা | ১ মা মা পা I ২´ গমা -পধা -ণা |
ভ ব নে বা শ রী উ ঠি ছে বা০ ০০ ০

| ৩ ধা } II
জি

পা পা II { ০ পা পা পা | ১ র্সাঃ -ণঃ ণর্সা I ২´ র্রা র্র্রা র্রা |
এ কি কু সু ম গ ন্ ধ০ স মু দ্ ছ

| ৩ -া র্রা র্রা | ০ র্সা র্রা র্রা | ১ র্সা -র্র্রা র্রা I ২´ র্সর্রা -র্সর্গা -র্রা
০ লি ত তো র শে ষ ০ম্ তে প্রা ০০ ন্ গ

| (৩ র্সা -ণা পণা) } | ৩ র্সা -ণা -া | { ০ মা পা ধা | ১ ধা -া ধা I
ণে ০ একি ণে ০ ০ রূ প ত র ঙ্ গ

২´ ধধা র্সা ণা | ৩ ধা পা পা | ০ ধা র্সা ণা | ১ ধা পা -া I
প্রা ণা দে র ভ টে উ ছ লি য়া যা য়

I ২´ রা -জ্ঞমা -জ্ঞমা (৩ পা পা পা) } | ৩ পা -া পপা | { ০ রা রা রা
আ ০০ ০০ জি এ কি জি ০ গায় জ য় জ

১ রা রা গা I ২ মা পা পা I ৩ পা -া পা | ০ মা মা মা
য় জ য় যো গ ল য়া ০ জ ভা র ত

১´ গা গা সা I ২´ রা -া -া | (৩ রা -া পপা) } | ৩ রা -া -া
ভূ প তি জ ০ ০ য় ০ 'গায়' য় ০ ০

| { ধা -া ধা | ১ ধা ধা -া I ২´ ধা র্সা পা | ৩ ধা -া পা |
দ ০ ক্ষে ণে ও হ কে নি ল দি ন ধু

০ মা মা | ১ গা রা সা I ২´ রা -া -া |(৩ রা -া -া)} |
ত রে হি মা ল ০ ০ য় ০ ০

৩ রা -া ররা |{০ পা পা র্সণা | ১ -া ণা র্সা I ২´ র্স র্রা র্রা |
য় ০ আজ্ তা র গন্ত ০ ব্য ব প রি কী

৩ -া র্রা র্রা | ০ র্সা র্রা র্রা | ১ র্সা র্রা র্রা I ২´ র্সর্রা -র্সর্রর্গা র্রা |
র্ তি ত ন গ রে ন গ রে ভু০ ০০০ ব

৩ র্সা -ণা ণণা | ০ মা পা ধধা | ১ -া ধা ধা I ২´ ধা র্সা -ণা |
নে ০ আজ তা র গন্ত ০ ব্য বে ম মু দ্

৩ ধা পা পা | ০ ধা র্সা ণা | ১ ধা পা পা I ২´ রা -জ্ঞমা -জ্ঞমা |
ভা সি ত গ গ নে তা র কা রা ০০ ০০

৩ (পা -া ররা) }| ৩ পা II II
জি ০ 'আজ্' জি

সুবিধা ওরফে সর্ব্বনাশ

সুবিধার অন্বেষণ করে না কে ? জগতে জীবমাত্রেই সুবিধার প্রার্থী। অসুবিধা চায় এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বনাশ সাধ করিয়া ডাকিয়া আনে ইহাও বড় একটা নয়নপথে আসে না। কিন্তু সাধ করিয়া না চাহিলেও অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে, মোহের বশে, সাময়িক বা ক্ষণিক সুখের লোভ দেখাইয়া অনেক সর্ব্বনাশই আমাদের উপর নিত্য আধিপত্য বিস্তার করিতেছে ইহাতেও সন্দেহ নাই। আবার কত সময় সুবিধার অনুসন্ধান করিতে সর্ব্বনাশকেও ডাকিয়া আনিতেছি এ উদাহরণ ও বিরল নহে।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য কোন কোন সময় এরূপ ঘটনা কতকটা অনিবার্য্য হইলেও, অনেক স্থলে যে আমাদের ভ্রান্তির বশে আমরা সেবা বা সুবিধা গ্রহণ করা রূপ অমৃত বোধে উৎকট বিষ পান না করি তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় না। আপাততঃ যাহা সহজলভ্য, সহজে করণীয়, তাহাই সাধারণতঃ বিনা বিচারে আমাদের গ্রহণীয় করিয়া লওয়া কেমন আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাস বা দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হয়। এই সুবিধার পশ্চাতে বা পরিণামে কি আছে তাহা অনেক সময় আমাদের ভাবিতেই মনে হয় না। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আমরা এমনই শত সহস্র তথাকথিত সুযোগ বা সুবিধা ভোগ করিয়া এখন আমরা কোন্ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছি, কোথায় যাইতে চলিয়াছি তাহা ভাবিবার পক্ষে আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। আমাদের জাতীয় সুবিধা, এমন কি ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা সকল আমাদের সম্মুখে অযাচিত ভাবে আনিয়া দিবার জন্য অপরের এমন ব্যস্ততা, এমন আগ্রহ বোধ হয় সৃষ্টির আদিকাল হইতে আমাদের জন্য আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বুঝি বা জগতের অপর কোন জাতির জন্য কোন জাতি কখনও এমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সারা সভ্যজগৎ যেন আমাদের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। জানিনা এ আমাদের কোন সৌভাগ্য বা ভগবানের অভিসম্পাত।

সাত শত বৎসরেরও অধিক কাল আমরা পরাধীন। কিন্তু পরে আমাদের সুবিধার জন্য এতদিন কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, আমাদের অসুবিধার কোন্ দিকটা তাঁদের ভাবিবার বিষয় ছিল, সে সব ভাল করিয়া না জানিলেও শতাধিক বৎসর ধরিয়া এই অধীন জাতির দেহের সুবিধা ও সুখ বিধানের জন্য যে আগ্রহ যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহা যে পূর্ব্বে ছিল না একথায় সন্দেহের বোধ হয় কোন কারণ নাই।

সেই সব সুবিধার ফলে আমাদের লাভ লোকসান পরিমাণ করিবার এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহা আমাদের সম্মুখে অযাচিত ভাবে যদি আসিয়া উপস্থিত না হইত, বা যদি তাহা আমরা গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আমরা এতদিন কতটা পিছনে পড়িয়া থাকিতাম, তথাকথিত অসভ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ শৃঙ্খল এখনও কতটা দৃঢ়বদ্ধ থাকিত, এবং বিনা বিচারে বা বিচারের অবসর না পাইয়া যখন যাহা কিছু সম্মুখে পাইয়াছি তখন তাহাই অমৃতবোধে গ্রহণ করিয়াই বা আমরা এখন কতটা অগ্রসর হইয়াছি—এ সব হিসাব-নিকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শাসন প্রবর্ত্তনের পর হইতে একে একে ছোট বড় বহু সামগ্রী আমাদের ভোগের জন্য, আমাদের কাযে লাগাইবার জন্য আসিয়াছে এবং নিত্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। কলের গাড়ি, টেলিগ্রাফ, মোটর-গাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াশালাই, বিস্কুট, নিব পর্য্যন্ত এবং অপর দিকে থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় খেলা, হোটেল, ফুটবল, বিলিয়ার্ড এই সব সুবিধার কথাই বলিতেছি।

বাস্তবিকই বাষ্পীয়যানের প্রভাবে আমরা দেশ বিদেশে কত শীঘ্র গমনাগমন করিতে পারিতেছি, মালপত্র সহজে আমদানী রপ্তানি করিতে পারিতেছি। ষ্টীমারের সাহায্যে জলপথে যাতায়াতেরও ঐরূপ সুবিধা। টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিশ্বের অপূর্ব্ব আবিষ্কার, মুহূর্ত্তে হাজার মাইল দূরস্থিত লোকের সহিত সংবাদ আদান প্রদান ও কথোপকথন সম্ভব করিয়াছে।

দিয়াশালাই দেড় পয়সায় একটা, জামার পকেটে লইয়া যেখানে সেখানে যাওয়া যায়, সেই প্রাচীনকালের চকমকি সোলা ও দেকাটির তুলনায় কত সুবিধা! কেরোসিন কত সস্তা, উহাতে কেমন পরিষ্কার আলো হয়, আর বড় বড় সহরে বৈদ্যুতিক আলোর ত কথাই নাই, সুইচ্ টিপিলেই আলো,—ইহার সহিত তৈলের প্রদীপের তুলনা! তাহা কত অপরিস্কার, কি মিটমিটে আলো, উহাতে কি দেখা যায়? বৈদ্যুতিক পাখার ন্যায় গৃষ্মকালে অধিক সুখের ও সুবিধার জিনিষই বা কি আছে? কদর্য্য তালবৃন্ত বা বিশাল টানা পাখা তাহার সঙ্গে তুলনা হইবারই নয়। সেকালের সর, বা কঞ্চির কলমের তুলনায়, ছোট ছোট ষ্টীলপেন কত সুবিধা ও সুসভ্য! আবার ষ্টাইলো কলমে দোয়াতেরও আবশ্যক হয় না। সেকালের অঙ্গপরিস্কার ও দেহ সজ্জার জন্য বেসম, চুয়া, চন্দন, কুম্‌কুম অগুরু প্রভৃতি কদর্য্য উপকরণের অপেক্ষা সাবান, হেয়ারওয়াশ, পমেড, কস্‌মেটিক্ প্রভৃতি কত পরিস্কার, কত সুবিধাজনক। অসভ্য রুলি লোহার অপেক্ষা আজকালের বিবিধ বিচিত্র ধরণের কাচের চুড়ি কত মনোরম! কাচের গেলাস, কাচের বাটিতে পানে কি পরিতৃপ্তি। এনামেলের বাসন কেমন সস্তা ও পরিস্কার। হুঁকা শটকার অপেক্ষা সিগার সিগারেট্ কত সুবিধাজনক। সূর্য্যোদয়ের বহু-পূর্ব্বে যখন অন্য আহারীয় প্রস্তুত কত অসুবিধাজনক, তখন চা বিস্কুট্ গাঢ়দুগ্ধ কত সুবিধা। সেকালের ডেলাদিগ্‌ দিগ্, কপাটি খেলার তুলনায় ফুটবল্, টেনিস্ খেলা কেমন আনন্দদায়ক। বর্ষার সময় যখন বাহিরে খেলাধুলা অসম্ভব, তখন ঘরের ভিতর বিলিয়ার্ড্ ক্যারম খেলা কেমন সুবিধাজনক। শীতের দিনে বুকে ফিতা বাঁধা বেনিয়ন আর তুলা ভরা বালাপোস বা দোলাইয়ের পরিবর্ত্তে শার্ট কোট্ প্যাণ্ট কত সুন্দর ও সুসভ্য।

অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা সংসার চালাইবার জন্য অফিসে কেরাণীগিরী চাকুরী আমাদের আর এক সুবিধার জিনিষ। ছেলেরা কোন রকমে দুই তিনটা পাশ করিয়া একবার চাকুরী লইতে পারিলেই জীবনের একটা স্থিরতা হইয়া গেল। তখন সে নিশ্চিন্ত, আত্মীয় বন্ধুদের আনন্দ, সংসারের সকলে নিশ্চিন্ত, পিতামাতার মরিয়া শান্তি। এই সকলের সঙ্গে আমরা আরও অনুরূপ সুবিধাও অনেক পাইয়াছি—যেমন জলের কল, মিউনিসিপ্যালিটি, ক্লাব্, কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনর, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি সম্মান, কোম্পানির বা সরকারের হাতচিটায় টাকা ধার দেওয়া।

উক্ত সকলের প্রত্যেকটিই এখন আমাদের সুবিধার সামগ্রী, এমন কি এইক্ষণে এগুলির মধ্যে অনেকগুলির অভাব হইলে আমাদের একেবারেই অচল হইয়া দাঁড়ায়, সংসার আঁধার দেখিতে হয়। দেশীয়ের পরিবর্ত্তে সহস্র বিদেশীয় সামগ্রীতেই আমাদের দেশ ছাইয়া ফেলিয়া যে কেবল অর্থসমস্যার দিক দিয়া অনিষ্ট হইতেছে তাহা নহে, সেই সঙ্গে চা কফির ন্যায় পানীয়, কলার নেকটাইয়ের মত পোষাক, ঘাড় কামান গোঁফের পাশ ছাঁটার মত ফ্যাশান, দাসত্ব বৃত্তিকে পূজা করিবার মত মনোবৃত্তি, এই প্রকার বহু বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়া অধিকতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। বিদেশী জিনিষের অপেক্ষা কতকগুলি বিদেশী ভাব, বিদেশী ফ্যাশান, এমন কি বিদেশী নীতিও আমাদের দেশের পক্ষে অশেষ অনিষ্টকর। এ সকল ছাড়া এমন অনেক সুবিধার জিনিষ আছে যাহা এখনও আমাদের ততটা ব্যবহারে না আসিলেও, তাহাও যে অতি শীঘ্র আমাদের আদরের সামগ্রী না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? পল্লীগ্রামে সকল সময় সহজে মাছ পাওয়া যায় না, ঘৃতের দরও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তে টিনের কৌটায়

পোরা বিলাতি মৎস ও বিলাতি চর্ব্বি যে প্রচলিত না হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে? চালদা ও তেঁতুলের স্থান উবৃষ্টার শসের দ্বারা অবিকৃত হওয়াও বিচিত্র নহে।

সূর্য্যের ছায়ায়, বালি বা জলের মাপে পুরাকালে সময় নির্ণীত হইত। তৎপরে প্রথমে বৃহদাকার ঘড়ির আবিষ্কার হয়, ক্রমে ট্যাঁক ঘড়ি, তারপর এখন হাতের কব্জিতে পরিবার ছোট ঘড়ির ব্যবহার হইয়াছে। এমন দিন এদেশে ছিল যখন অতিদূর দেশেও আমাদের চলিয়া যাওয়া বিশেষ আয়াসসাধ্য ছিল না। তখনকার ধনীলোকদের পর্য্যন্ত নৌকা বা গোযানে বা পালকিতে গমনাগমনই উপায় ছিল। তারপর ঘোড়ার গাড়ি, ক্রমে বাষ্পীয় যান বাষ্পীয় পোত আসিয়া অতিদূর দেশও এ পাড়া ও পাড়া করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্তি নাই, শূন্য পথে যাহাতে দুলঙ্ঘ্য পর্ব্বত ও দুস্তর মহাসাগরও অবলীলাক্রমে পার হইয়া ছয় মাসের পথ ছয় দণ্ডে যাইবার সুবিধা হয়, তাহার কথাও কল্পনা করিতেছি। এখন সে অতীত যুগের নৌকা বা পদব্রজে বহু দূরদেশে যাতায়াতের কথা আমাদের স্বপ্ন। আবার এখনও এমন বহু স্থান আছে যেখানে গো-যান বা পাল্কি আছে বলিয়াই তথাকার লোক সুবিধা মনে করেন। আবার যেখানে তাহাও নাই, যদি ভাল পথ ঘাট থাকে, তাহা হইলেও অন্য গ্রামের তুলনায় তথাকার পল্লীবাসিগণ তাঁহাদের নিজ গ্রামকে সুবিধার স্থান মনে করেন।

পূর্ব্বে শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে তরুমূলে পর্ণকুটীরের দাওয়ায় বা পল্লীশিক্ষালয়ের সামান্য কুটীরেই প্রশস্ত স্থান ছিল। তথা হইতেই বাণভট্ট, গদাধর, রামমোহন, ভূদেবের উদ্ভব হইত। অন্তঃপুরের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, শাটী শাঁখা পরিয়া খনা, লীলাবতী, রাণী ভবানী সদৃশা রমণী তাঁহাদের নাম সোণার অক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। চাদর বনাতে দেহ আবৃত করিয়া, খড়ম চটি পায়ে দিয়াও রামকৃষ্ণ, বিদ্যা-সাগর, রাখালদাস ন্যায়রত্ন আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান গরিমা ও সভ্যতার অটল আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পল্লীগ্রামের বহুপরিবার-বিশিষ্ট সামান্য ভদ্রলোক মোটাধুতি, আবাদের ফসল, পুকুরের জল, কবিরাজের বড়ি ব্যবহার করিয়া স্বচ্ছন্দে দেব অতিথি সেবা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; জীবন যাপন একটা সংগ্রাম বলিয়া কখন ঘোষণা করেন নাই। সাদাসিধা আহার, সামান্য পরিধেয়, প্রদীপের আলো তখন আমাদের দেহের বলবীর্য্য, মনের তেজ, দর্শনের শক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রেল ষ্টীমারের অভাবও সেই পুরাতন দিনের দূরদেশ এমন কি বহির্ব্বাণিজ্যের পথে বাধা স্বরূপ হয় নাই। হরিদ্বার, বদ্রীনারায়ণ, গঙ্গোত্রীর পথে তীর্থ গমনেও বাধা পড়ে নাই এবং ধন-পতি ও শ্রীমন্তের সুদূর সিংহলে গমন সম্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিল্প, বিজ্ঞান, স্থাপত্য বিদ্যা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত না থাকা সত্বেও অজন্তা, এলিফেণ্টা, ইলোরার গুহা, মেবারের জয়সমন্দ রাজসমন্দ হ্রদ বা কোনার্ক ভুবনেশ্বর প্রভৃতির মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল এবং সেই দেশী বিদ্যায় দেশী মাল মশলা বিনির্ম্মিত বহু উচ্চ-চূড় মন্দির আজিও কালের নির্ম্মম শাসন উপেক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া জীবন্ত সাক্ষিরূপে ধরণী বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখনকার অসংখ্য কল কব্জার প্রচলন না থাকা সত্বেও তখন বিশুদ্ধ আহারীয় ও সুন্দর পরিধেয়ের এমন অনটন পরিলক্ষিত হয় নাই। কলের জল, মিউনিসিপ্যালিটি, লোক্যাল বোর্ড এ সব না থাকিলেও লোকের স্বাস্থ্য সবলতার এমন অভাব ছিল না বা নিত্য নব নব ব্যাধির স্থান এখানে ছিল না। ডেল-দিগ্ দিগ্, পাশা, দাবা প্রভৃতি ক্রীড়া তখন যুবকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা ও আনন্দ দিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে আমাদের যাহা ছিল তাহা তখনকার বেশ সুবিধার বিষয়ই ছিল। তাহাই আজিকার এই অধঃপতিত জাতিকে বহু প্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কোন্ যাদুযন্ত্রবলে জানি না, এখন আর সে সবের স্থান নাই, যাহাও আছে তাহাও খুবই কম। পক্ষান্তরে তৎপরিবর্ত্তে

বিস্তর নূতনের আবির্ভাব সত্বেও আমরা শরীরে ও মনে রুগ্ন শীর্ণ সুখহীন শান্তিহীন, অস্থিচর্ম্মসার, পরান্নভোজী ক্রীতদাসের জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি। এই ক্ষণে এ সকলের অভাবে আমাদের সংসার চলা কতকটা অসম্ভব হইয়া উঠে একথা মানিয়া লইলেও ইহা বলিতেই হইবে, এদশা আমাদেরই কৃতকর্ম্মের ফল। যখন রেল-গাড়ি বা ষ্টীমার মোটর আমাদের কল্পনাতেও ছিল না, বিলাতি দিয়াশলাই, বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টীল্ পেন্, ষ্টাইলো, সিগারেট, সাবান, কাঁচের চুড়ি, এনামেল্ এলুমিনিয়মের বাসন, চা বিস্কুট, চেয়ার টেবল, বায়স্কোপ প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন তুলনায় আমাদের সুখের দিনই ছিল। তখন প্রদীপের স্বল্পালোকেই দেখা চলিত। দেকাটিও দেশালাইয়ের অপেক্ষা সুবিধার ছিল। সিকি পয়সার বা বিনামূল্যের কলমই সুন্দর লিখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। চাদর দোলাইয়ে শীত ও সভ্যতা রক্ষার পক্ষে বাধে নাই। বরং সে সবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য, অর্থ, সামর্থ্য এখন ক্রমে যাইতেই বসিয়াছে।

এখন এই এক শতাব্দীর মধ্যে মোটর এয়ারোপ্লেন তারহীন টেলিফোন্, বড় বড় বিবিধ ধরণের স্কুল কলেজ, বৈদ্যুতিক আলো, কোট্ প্যাণ্ট্ মুরগী মটন্ ক্লাব কনফারেন্সের যুগে আমরা কি পাইয়াছি, কত লাভ করিয়াছি? উহার দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্য সুখ শান্তি তৃপ্তির কতটা অধিকারী হইয়াছি? সৌভাগ্য স্বচ্ছন্দতায় কতটা সম্পৎশালী হইয়াছি তাহার হিসাব করিতে হইলে নৈরাশ্যেই মগ্ন হইতে হয়। আর শুধু কি তাহাই? দিনের পর দিন নিত্য নব সুবিধার সন্ধান, অভাবের সৃষ্টি করিতে শিখা ভিন্ন অভাব মোচনের উপায় কিছু করিতে পারিয়াছি কি? বা সুবিধার পথ চাহিতে বিদেশের মুখপানে পিপাসিত চাতকের ন্যায় হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর কিছু শিখিয়াছি কি? যদি সমস্যার সমাধান করিতেই না পারিলাম, নূতন সমস্যার অবতারণা এবং পুরাতনের জটিলতা বৃদ্ধিই হইতে লাগিল, তবে যাহাকে সুবিধা বলা হইতেছে তাহা প্রকৃত সুবিধা, না রূপান্তরিত সর্ব্বনাশের সোপান তাহা কি ভাবিবার সময় এখনও হয় নাই?

এই সকল কথা উঠিলেই, কোন বিচার না করিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায় এ কথায় কাণ দিবার আবশ্যকতাই পান না। নবীনদের মধ্যে একদল বলিয়া উঠেন, "তবে কি আমরা আবার আদিম যুগে ফিরিয়া যাইব? রেল, টেলিগ্রাম, স্কুল, কলেজ এ সবের কি কোন স্বার্থকতা নাই; উহা কি উঠাইয়া দেওয়া হইবে?" আমার এখানে বলিবার কথা ইহা নহে, যে, যাহা আমাদের ছিল না, এখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সমস্তই আমাদের সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছে, সুবিধা উহার মধ্যে কিছুই নাই, সবই পরিত্যাজ্য, বা মানুষের সুযোগ সুবিধা বা সুখ সম্পদ বৃদ্ধির উপাদান উদ্ভাবন জাতির উন্নতির পরিপন্থী, অথবা মূল্য যদি বিশেষ বেশী না হয় বা সমান হয় তাহা হইলেই আমাদের পুরাতন নিজস্ব যাহা আছে তাহা ত্যাগ করিয়া উহাই গ্রহণীয়, তাহাও আমার কথা নহে। নূতনের আবশ্যকতা মোটেই নাই একথা বলিনা। যাহা প্রকৃত সুবিধা তাহাকে সুবিধার কে না বলিবে? কিন্তু যে সুবিধার পশ্চাতে ইষ্টের অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক, তাহা আপাত-দৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হইলেও উহা অনিষ্টের আকর বলিয়া অভিহিত হওয়া উচিত মনে করি। দেহ ও মনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আবশ্যক দ্রব্য গ্রহণ করা অন্যায় নহে। কিন্তু যদি তাহা মাত্র বিলাসিতা হয়, সেই গ্রহণের ফলে যদি এই দরিদ্র দেশের অর্থনাশ হইয়া বিদেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক মাত্র হয়, তবে তাহা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য বলিতে পারা যায় না। অথবা আবশ্যক অনাবশ্যক চিন্তা না করিয়া বিলাসের উপকরণ হাতের কাছে পাইয়া, কেবল মাত্র অনুকরণের দ্বারা যে সব অভাব সৃষ্টি করি, তাহা পুরণের উপকরণকে সুবিধার সামগ্রী বলিতেও আমি প্রস্তুত নহি। 'পরের ইষ্ট যাহাতে আছে, তাহাতে আমাদের যত উপকার হোক বা যে সুবিধাই থাকুক, তাহাই পরিবর্জ্জনীয় ইহাও আমার বলিবার তাৎপর্য্য নয়। আমাদের সুবিধার জন্য

যাহা সৃষ্ট তাহা দেশীয়ই হোক আর বিদেশীয়ই হোক, তাহার প্রতি সন্দেহ করিবার না থাকিলেও, যাহা অপরের স্বার্থ সুবিধার জন্য সৃষ্ট, তাহা বেশ বিবেচনার পর দেখিয়া শুনিয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ পরে অনুতাপ অনিবার্য্য।

সত্য বটে বাষ্পীয়যান বিবিধ প্রকারে মানুষের কল্যাণের কারণ, তাহার দ্বারা কোন কোন দুঃসাধ্যকে সাধ্যায়ত্ত করিয়া দিয়াছে। উহার আবিষ্কার মানবজাতির নব অভ্যুদয়ের একটা কারণ হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রেলপথের দ্বারা জলপ্রবাহ রোধ হওয়ায় গৌণতঃ বাঙ্গলার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, ম্যালেরিয়া আমাদের ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। আবার ছয় দিনের পথ হইতে ছয় দণ্ডে খাদ্য শস্য আনিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণে যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনই রপ্তানি করিবার ক্ষমতা থাকায় দুর্ভিক্ষের সহায়তাও করিতেছে। পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে আমাদের এখনকার অবস্থায় সত্যই শিখিবার বহু বিষয় আছে; কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে দাস-মনোবৃত্তিই সর্ব্বোপরি ফুটিয়া উঠে নাই কি? আত্মশক্তি আত্মবিশ্বাস আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়া বিস্মৃতির অতল তলে দিনে দিনে ডুবিয়া যাইতেছি না কি?

রেলগাড়ি যাহাদের দেশের জিনিস, তাহাদের সম্পত্তি। আমাদের শিক্ষিতব্য জ্ঞান বিজ্ঞান যাহাদের নিজস্ব বিদ্যা, তাহার দ্বারা তাহাদের যে কল্যাণ সাধিত হইতেছে, আমাদের তাহা হইতেছে না। এজন্য রেলগাড়ি, ইংরাজি বিদ্যা দায়ী না হইলেও, যে কারণেই হোক লাভের সঙ্গে বিপরীতটাই কি আমরা পুরামাত্রায় পাইতেছি না?

সুবিধা অসুবিধার নির্ণয় করা অনেক সময় প্রথম কার্য্যকালে ঠিক হয় না, হয়ত হওয়াও সম্ভব হয় না। একের সুবিধা অপরের অসুবিধা, অপরের এক সময়ের সুবিধা অপর সময়ের অসুবিধা, ইহা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। গ্রীসীয় শাসনকর্ত্তা লাইকারগাস্ মূল্যবান ধাতুর ক্ষুদ্র মুদ্রার সুবিধা ভুলিয়া, ভারি লোহার মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আবার লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদ আমাদের সুবিধার জন্য না হইলেও, কে বলিতে পারে উহাকে ভিত্তি করিয়া একদিন আমাদের মহাসুবিধার উদ্ভব না হইবে। মোট কথা যাহার উদ্দেশ্য-মূলে অপরের স্বার্থ বিজড়িত, তাহা আপাতঃ মধুর মনে হইলেও, প্রথম দৃষ্টিতে মহাসুবিধার বিবেচিত হইলেও, গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আর ইহাও মনে রাখা দরকার, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া কেহ আমাদের সুবিধার বা সেবার জন্য আসেন নাই, আসিবেন না। যাহাতে অন্যের কাছে সুবিধার জন্য পথ চাহিয়া থাকিতে না হয়, পরের অযাচিত সেবা না লইতে হয়, আপনাদের সুবিধা বা সেবার ভার আপনাদের হাতে আইসে, পরের অনুকরণীয়কে নিজস্ব করিতে পারা যায়, এই জন্যই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহা যত দিন না করিতে পারা যাইবে, ততদিন মোহের বশে না ভুলিয়া লোভ সংবরণ করা উচিত। ততদিন আমাদের যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। তবে ক্রমে ক্রমে যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি, তখন একেবারে ফেরা সম্ভবপর হইবে না। আর তাহা ছাড়া দেশ কালের প্রভাবও যখন উপেক্ষা করা যায় না, করিবার চেষ্টাও বৃথা, তখন নিজেদের যতটা ক্ষমতা আছে, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ততটা উঠিয়া পড়িয়া লাগা প্রয়োজন, নচেৎ নিমন্ত্রণের ভোজের মত, সুবিধার হইলেও, মৃত্যু-পীড়ার কারণ হওয়া যেমন বিচিত্র নয়। তেমনই নিত্য অভাবগ্রস্ত জাতি, যাহার আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা চলে না, তাহার পক্ষেও পূর্ব্বোল্লিখিত তথাকথিত সুবিধাগুলিও সর্ব্বনাশের কারণ হওয়া বিচিত্র নহে। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার সুখ স্বপনের মতই এ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অলীক।

শ্রীহরিহর শেঠ।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

আলেক্‌জান্দ্রার পরহিতব্রত।

পূর্ব্ববিবৃত ঘটনাবলী যে সময়ে ঘটিয়াছিল এক্ষণে আমরা তাহার দুই বৎসরের পরের ঘটনা বিবৃত করিতেছি। এখন অশ্রুকুমার তাহার পরিণীত জীবনের প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিল; এখন কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে তাহার দানশৌণ্ডতার কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এই সময় বাগবাজার অঞ্চলে একটা অপরিসর গলিরাস্তার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটীতে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। গৃহকর্ত্তা কোনও আফিসে দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে, এক চাকুরী করিতেন। গৃহস্থের লোকসংখ্যা মোট পাঁচটি; তাহার উপর একটি পরিচারিকা ও একটি পাচক ছিল। দেড়শত টাকা বেতন হইতে কর্ম্মস্থানের গমনাগমনের ট্রামভাড়া দিতে হইত, চল্লিশ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হইত, পুত্রদুইটীর স্কুলের বেতন ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ সরবরাহ করিতে হইত, পাচক ও পরিচারিকার মাহিনা যোগাইতে হইত, পীড়ায় ঔষধ পথ্যের খরচ এবং বস্ত্র তৈজস ও শয্যাদিরও খরচ ছিল। ইহার পর তিনি যদি কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে না পারিতেন, আমরা ত তাহাতে তাঁহার কোনও দোষ দিতে পারি না।

কিন্তু কন্যা সুভাষিণী বড় হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল; জনকজননী তাহাকে আর মেয়েস্কুলে যাইতে দিতেন না। তাঁরা বুঝিয়াছিলেন যে এখন তাহাকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া, শ্বশুরালয়েই পাঠান' আবশ্যক।

মানুষ অনেক সময় নিজের স্বল্প আয়ের সীমার মধ্যে, আপন মনের আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। সুভাষিণীর পিতাও আপনার অর্থাভাব বুঝিয়া আপনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তিনি অবশেষে কন্যার জন্য যে পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, সেই পাত্রপক্ষীয়গণ, পাত্রকে হস্তান্তরিত করিবার জন্য নগদ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে পাত্রটিকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন; সে সর্ব্বাংশে সুপাত্র—সুরূপ, বি-এ পাশ-করা এবং অর্থবান। বিধাতার বিশেষ কৃপা না হইলে সেরূপ পাত্র পাওয়া যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সেই দৈবপ্রাপ্ত পাত্র একবার হস্তচ্যুত হইলে, আর কোনও স্থানে, দ্বিগুণ মূল্যেও, তেমন পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিনি অর্থহীন গৃহস্থ; তিনি পাঁচ হাজার টাকা সদ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন? সুতরাং সুভাষিণীর জনকজননী অনন্যোপায় হইয়া চিন্তান্বিত দিবসগুলি, দীর্ঘনিশ্বাসের পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে একটা পর্ব্ব ছিল। গৃহকর্ত্তা আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইলে, গৃহিণী এক পুত্রকে সমভিব্যহারে লইয়া, পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। সে দিন বৈশাখী রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত প্রখর ছিল; সেদিন পল্লীমধ্যে একটা বিবাহোৎবের সূচনা দেখিয়া কন্যাদায়গ্রস্তার মাথায় দুশ্চিন্তার ভার অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; তাহার উপর বোধহয় গৃহিণীর পদব্রজে ভ্রমণঅভ্যাস ছিল না; আবার হিন্দুসমাজের অদ্ভুত নীতি অনুযায়ী মস্তকে ছত্রধারণ করাকে নারীগণ লজ্জাজনক এবং নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করেন, এজন্য আতপ তাপ প্রতিহত করিতে গৃহিণীর ছত্রও ছিল না। সুতরাং পথ চলিতে চলিতে গৃহিণী অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রখর রৌদ্রে তাঁহার নয়নদ্বয় দৃষ্টিহীন

হইয়া পড়িল। উপবাসিনী থাকিয়া গঙ্গাস্নানের পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য গৃহিণী বাটী হইতে পানাহার করিয়া বাহির হন নাই। এক্ষণে ক্ষুধায় তাঁহার দেহ বলহীন, এবং দারুণ তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠতালু পরিশুষ্ক হইয়া পড়িল; তাঁহার উত্তপ্ত মস্তকমধ্যে বাহ্যজ্ঞান শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ জ্ঞানাপহৃতা হইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেলেন; ফুটপাথের প্রস্তরফলকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহার ললাটের এক-স্থানে কাটিয়া গেল;—ললাট হইতে রক্তধারা ঝরিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া, সমভিব্যহারী পুত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, এবং ছুটিয়া তাঁহার মৃতবৎ দেহের নিকট আসিয়া, তাঁহার রক্তাক্ত মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া, পুণ্যকামী গঙ্গাস্নানযাত্রী অনেক হিন্দু, ক্ষুদ্র একটি 'আহা' বলিয়া গঙ্গাভিমুখে পুণ্য সঞ্চয় করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া, স্পর্শভয়ে ভীতা স্নাতা পুণ্যময়ীরা দুই হস্তে আপন পরিধেয় বসন, শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশেষ ভাবে সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন, এবং আপন আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, একটু অন্তরে থাকিয়া পথ অতিক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিজ্ঞব্যক্তি দাঁড়াইয়া, পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিলেন। এবং তাহা দেখিয়া অন্যান্য পথিকগণ অভিনয় দর্শনাভিলাষীর ন্যায়, তাহা দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের আরও মর্ম্মান্তিকতা ছিল। কিন্তু আমরা সেই নীরব ও অসাড় নিষ্ঠুরতার বর্ণনা করিতে পারিব না। হায়, লজ্জা! আমাদের স্বদেশ-বাসিগণের সেই লজ্জাহীন অধঃপতনের কথা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব? যে বাহু আতুরের দুঃখ মোচনের জন্য স্বতঃই প্রসারিত না হয়, তাহা কেন স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়ে না, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কথিত আছে, দেবী ভগবতী দেবতাদিগের দুঃখ বিদূরিত করিবার জন্য দশটি বাহু বাহির করিয়াছিলেন; আমরা সেই দেবীরই উপাসক হইয়া, কিরূপে পরের কষ্ট দেখিয়া আমাদিগের দুইটি মাত্র বাহুও সন্ত্রাসিত কমঠের মুণ্ডের ন্যায় গুটাইয়া লই?

কিন্তু সেই রক্তাক্ত করুণ দৃশ্যের আর একজন অদৃশ্য দ্রষ্টা ছিল। সেই অদৃশ্য দ্রষ্টা একখানি ল্যাণ্ডো আকারের মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সেই সময়ে সেই পথ দিয়া চলিয়াছিল। সেই শকটের গবাক্ষগুলি যে রেশম রচিত যবনিকার দ্বারা আবৃত ছিল, তাহার একটি পার্শ্বে অলক্ষ্যে বসিয়া এক শ্বেতবসনধারিণী করুণাময়ী সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া-ছিল, দেখিয়া দারুণ মর্ম্মব্যথায় তাহার দ্রবীণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—তাহার হৃদয়োত্থিত করুণার অনবদ্য ধারায় সেই রক্তাক্ত দুঃখ ধৌত করিবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দয়াময়ীর ইঙ্গিত পাইয়া সোফার মোটরের গতি সংযত করিল। যেখানে রোরুদ্যমান পুত্রের ক্রোড়ে সংজ্ঞাহীন মস্তক রাখিয়া গৃহস্থগৃহিণী ধূলিশয্যায় শুইয়াছিলেন, যেখানে সেই ধূলি শয্যাকে মাতার মৃত্যু-শয্যা মনে করিয়া অসহায় বালক মাতার ললাট প্রবাহিত শোণিতে আপন অশ্রুজল মিলাইতেছিল, মোটর গাড়ীখানি সেইস্থানে আসিয়া থামিল। মোটর যাত্রী স্ত্রীলোক অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। যে নামিল সে অত্যন্ত রূপবতী; তাহার রূপালোকে যেন রাজপথ আলো-কিত হইয়া উঠিল; তাহার রূপালোকে পথযাত্রী-গণের হৃদয়ের নির্ম্মমতা তাহাদের মলিন মুখে আরও প্রকটিত হইয়া উঠিল।

শ্বেতবসনধারিণী, নিরাভরণা, যোগনেত্রা এ রূপসী কে? পুরাতন ভক্তিযুগের লোক হইলে ভাবিত যে, গঙ্গা-স্নানাভিলাষিণীর বিপদ দেখিয়া, গঙ্গা নিজে মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা নব্যযুগের ভক্তিহীন পাষণ্ড; সুতরাং আমরা বলিব যে উহা গঙ্গা দেবীর

মানববিগ্রহ নহে; উহাকে আমরা চিনি, সে আমাদেরই পরিচিতা মিসেস্ আলেক্জান্ড্রা দত্ত।

আমরা জানি যে আলেক্জান্ড্রা পতিবিয়োগের পর হইতে পরপরিচর্য্যায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। এ যাবৎ—অর্থাৎ প্রায় সার্দ্ধ দুই বৎসরকাল—সে সেই ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই দীর্ঘকাল সে আপন ইচ্ছায়, এবং অশ্রুকুমারের ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তায়, আতুরের পরিচর্য্যায় পথে পথে ফিরিয়াছে; অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের শরীরের ব্যথা দূর করিয়াছে; আপনার এবং অশ্রুকুমারের অর্থদ্বারা তাহাদের অর্থহীনতা দূর করিয়াছে; তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য আনিয়া দিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে, গঙ্গারই মত স্নিগ্ধ করুণায় তাহাদের বাটী পূর্ণ করিয়াছে। তাহার হৃদয় মধ্যে অশ্রুকুমারের জন্য যে অসীম প্রেম সঞ্চিত ছিল, তাহা সে এইরূপে সমস্ত সংসারে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়নিহিত প্রেমের উদ্দামস্রোত ধর্ম্মাচরণের পবিত্র পথে প্রবাহিত হইয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল যে ধর্ম্মকে ভালবাসাই ভালবাসার চরমোৎকর্ষ। এইরূপে সে অশ্রুকুমারের প্রণয়িনী পত্নী হইতে না পারিলেও সে তাহার ধর্ম্মশিষ্যা ও সহধর্ম্মিণী হইতে পারিয়াছিল। তাহার প্রেম কামগন্ধহীন হইয়া পুণ্যের স্বর্গীয় সৌরভ মাখিয়া ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতেছিল।

এইরূপে ধর্ম্মাচরণের পথে বিচরণ করিয়া আলেক্জান্ড্রা আজ পূর্ব্বোক্ত বিপদগ্রস্তা গৃহস্থরমণীর পরিচর্য্যার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সে প্রথমেই আশ্বাসপ্রদ মিষ্ট বচনে ক্রন্দমান বালককে কতকটা শান্ত করিয়া লইল; তাহার পর, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে তাহাদের বাটীর ঠিকানা অবগত হইল; আর এক মুহূর্ত্ত পরে আপন যৌবন-পুষ্ট বলবৎ বাহুদ্বারা মূর্চ্ছিতার ক্ষীণ দেহ বেষ্টন করিয়া বালকের সাহায্যে তাহাকে আপন গাড়ীতে উঠাইয়া লইল।

গাড়ী চলিল। রমণীর রক্তাক্ত অর্দ্ধশায়িত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আর এক দিনের কথা আলেক্জান্ড্রার মনে পড়িয়া গেল। আর একদিন, কল্যাণময়ের শুভ নির্দ্দেশে, অশ্রুকুমারের রক্তাক্ত দেহ সে সেই গাড়ীতেই বহন করিয়াছিল। সেই শুভদিনের কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় কি একটা স্বর্গীয় উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় যেন প্লাবিত হইয়া গেল; পরপরিচর্য্যায় তাহার উৎসাহ যেন শতগুণে বাড়িয়া উঠিল!

যে গলিরাস্তার ধারে গৃহস্থের বাটী অবস্থিত ছিল, অবিলম্বে আলেক্জান্ড্রার গাড়ী সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিতাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ত্রিতলের কক্ষে বহন করিল, সে কক্ষে আলেক্জান্ড্রা দরিদ্রতার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করিল;—সেই ক্ষুদ্র কক্ষে একটিও গৃহ সজ্জা ছিল না, মলিন ভিত্তি গাত্র একখানি আলেখ্যদ্বারাও অলঙ্কৃত ছিল না, কক্ষকুট্টিমে যে শয্যা বিস্তৃত ছিল তাহা যেন দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াছিল।

সেই শয্যার উপর মূর্চ্ছিতাকে শায়িত করিয়া আলেক্জান্ড্রা স্বহস্তে তাহার ক্ষত ধৌত করিয়া দিল; রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জলের সিঞ্চন করিয়া তাহার চেতনা উৎপাদন করিল; তাহার ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া দিল; এবং সোফরকে মোটর গাড়ী সহ পাঠাইয়া এক জন চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিল।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এবং কহিলেন যে, আর ভয়ের কোনও কারণ নাই; দুই একবার ঔষধ খাইলেই এবং কিছু দুগ্ধ পান করিয়া ঘুমাইলেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন।

আলেক্জেন্ড্রা আপনার মুদ্রাকোষ হইতে টাকা বাহির করিয়া চিকিৎসককে দর্শনী প্রদান করিয়া বিদায় দিল; বাটীতে দুগ্ধের অভাব জানিয়া, দুগ্ধ ও ঔষধ সোফারের দ্বারা আনাইয়া দিল; এবং রোগীকে

একবার ঔষধ পান করাইয়া, রোগীর পুত্র কন্যাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিল, "তোমরা একটুও ভয় পেও না! তোমাদের মা দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাল হ'য়ে উঠবেন। এখন উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; ঘুমুন। ঘুম ভাঙলে তোমরা দুধ গরম ক'রে ওঁকে খেতে দিও। আমি ওবেলা এসে আবার ওঁকে দেখে যাব।"

এই বলিয়া আলেক্‌জেন্ড্রা চলিয়া গেল।

বালক বালিকাগণ মনে করিল, কে এ দেবী, কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মরণাপন্ন মাতার জীবন দান করিয়া গেলেন।

গৃহিণী নিদ্রাভঙ্গের পর সুভাষিণীর দ্বারা আনীত দুগ্ধ পান করিলেন, এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। পরে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁরে, ওবেলার দুধ ত আর ছিল না; দুধ কোথায় পেলি?'

সুভাষিণী কহিল, "তিনি ওষুধের সঙ্গে দুধও আনিয়ে দিয়েছিলেন।"

মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে তা জিজ্ঞেস ক'রেছিলি কি?"

সুভাষিণী কহিল, "তার পরিচয় জিজ্ঞেসা কর্‌তে আমাদের ত সাহস হয়নি, মা। তিনি বলে গেছেন যে তিনি এই বিকাল বেলা আবার আস্‌বেন, তিনি এলে তখন তুমিই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস্ করো। কিন্তু মা, আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোনও বড় লোকের বিধবা মেয়ে।"

মাতা কহিলেন,—'তিনি যে খুব বড় লোক তাতে সন্দেহ নেই;—হয় বড়লোকের মেয়ে, নয় বড় লোকের স্ত্রী। তা না হ'লে কেউ মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তুই কি ক'রে জান্‌লি যে তিনি বিধবা? আমি ত তাঁর মুখে একটুও বৈধব্যের লক্ষণ দেখ্‌লাম না। যে স্বামীর সেবা, স্বামীর কাজ কর্‌তে না পায়, তার মুখে তেমন আনন্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; তাঁকে দেখে আমার মনে হ'ল তিনি যেন আনন্দময়ী।"

সুভাষিণী কহিল, "কিন্তু মা, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে তিনি পাড়ওয়ালা কাপড় পরেন নি। তা ছাড়া' তাঁর গায়ে একখানিও গহনা ছিল না।"

সুভাষিণী কথা কহিতে কহিতে একবার কাণ পাতিয়া কি শুনিল; তাহার পর, আবার বলিল, "ঐ শোন মা, মোটর গাড়ীর বাঁশীর শব্দ! তিনি বোধ হয় আবার আস্‌ছেন।"

মাতা কহিলেন, "হাঁ, মোটর গাড়ীর বাঁশীর শব্দ আমিও শুনতে পেয়েছি, এ গলিতে ত আর কেউ মোটর-গাড়ী চড়ে আসে না; বোধ হয়, তিনিই আস্‌ছেন।"

সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মা, তাঁকে আদর ক'রে কিছু জলখাবার খাওয়ালে ভাল হয় না?"

মাতা মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন, "খাওয়াতে পারলে ত খুবই ভাল হয়, বাছা। কিন্তু জলখাবার কেনবার পয়সা কোথায় পাব? আজ তোদের জলখাবার আন্‌তে দেবার জন্যে চার আনা পয়সাও আমার বাক্সে নেই। বাবু বলে গেছেন যে আজ আফিসের কোনও লোকের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার ক'রে নিয়ে আসবেন। তিনি টাকা নিয়ে এলে, তবে তোদের জল-খাবার আন্‌তে দেওয়া হ'বে, তবে কাল সকালে মাছ তরকারি কেনবার পয়সা জুটবে।"

সুভাষিণী আর কথা কহিল না। কেবল মনে মনে ভাবিল এই কলিকাতাতে কত লোক কত ঐশ্বর্য ভোগ করিতেছে, কত লোক হাসিমুখে কত আনন্দ উপভোগ করিতেছে; তবে সে তাহার পিতামাতাকে চিরদিন বিষণ্ণ ও ধনহীন দেখিবে কেন? এই আনন্দময়ের রাজ্যে তাহারাই কেবল অর্থহীন হইয়া নিরানন্দ থাকিবে কেন?

বাস্তবিক সুভাষিণী তাহার জনকজননীকে কখন প্রফুল্ল দেখে নাই। যাহাদের মাসিক আয় দেড়শত টাকার বেশী নয়, তাহাদের সকলেরই অবস্থা কি তাহাদেরই মত অস্বচ্ছল, তাহাদের সকলেরই জীবন কি তাহাদেরই মত নিরানন্দ? তা ত নয়। সেই পাড়াতেই সুভাষিণী এমন অনেক লোক দেখিয়াছে, যাহাদের আয়

তাহাদের চেয়ে অনেক কম; তাহারা, তাহাদের মত তেতালা বাড়ীতে না থাকিলেও সুখে থাকে, এবং তাহাদের চেয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করে, এবং কন্যার বিবাহের ভাবনাও ভাবে না। কেন এরূপ হয়? সেই জটিল আর্থিক সমস্যার কথা বালিকা কিরূপে বুঝিবে?

সুভাষিণী অবনত মুখে চিন্তা করিতেছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া দেখিল, কক্ষদ্বারে তাহার মাতার জীবনদাত্রীর হাসিমাখা মুখ প্রভাতের শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই মুখ হইতে যেন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়া সব আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।

আলেক্‌জান্দ্রা আপন বামহস্তে ক্যাম্বিসের একটা ভারি থলিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। তাহা দ্বারের পার্শ্বে রাখিয়া, সে হাসিমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল;—যেন সজীব প্রফুল্লতা মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল; যেন সেই মলিন নিরানন্দ কক্ষমধ্যে নন্দনের পারিজাত পুষ্পিত হইয়া উঠিল!

জীবনদাত্রীকে অভিবাদন করিবার জন্য গৃহস্থরমণী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আলেক্‌জান্দ্রা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, আপনি উঠবেন না। আমি বসছি; আপনিও বসুন।"

সুভাষিণী সত্বর নিজের হাতে বোনা পশমের আসন খানি আনিয়া মেঝেতে বিছাইয়া দিল। আলেক্‌জান্দ্রা তাহাতে উপবেশন করিল। গৃহিণী আপন শয্যাতেই বসিলেন।

আলেক্‌জান্দ্রা স্বহস্তে আনীত থলিয়াটী আপনার নিকটে লইয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার মুখবন্ধন উন্মোচন করিয়া কহিল, "দেখুন আপনাকে অসুস্থ দেখে আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি সেই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের বিকালের জলখাবারের কোন বন্দোবস্ত করতে পারবেন না। তাই আমার ব্যাগের মধ্যে কিছু ফলমূল আর জলখাবার নিয়ে এসেছি।"

এই বলিয়া আলেক্‌জান্দ্রা থলিয়ার মধ্য হইতে, আঙুর বেদানা প্রভৃতি কাবুলি মেওয়া, এবং দেশী আম, কলা শশা ইত্যাদি ফল এবং একপাত্র উৎকৃষ্ট সন্দেশ বাহির করিয়া দিল।

তাঁহার প্রাণরক্ষাকারিণীর এই নূতন অনুগ্রহ দেখিয়া গৃহস্থরমণী মুখে একটা কথাও বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া কৃতজ্ঞতা উছলাইয়া পড়িল।

সুভাষিণী মনে করিল, নিশ্চয়ই ইনি স্বর্গের দেবী, তাই অন্তর্যামিনী, তাই তাহাদের জলখাবারের অভাবের কথা জানিয়া, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, নিজে এই সকল সামগ্রী লইয়া আসিয়াছেন।

আর আলেক্‌জান্দ্রা কি মনে করিল? যে পরোপকার করিয়া উপকৃতের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দেখিয়াছে, সেই বুঝিবে যে তাহার মনে কি মহা সুখ, কি স্বর্গীয় আনন্দ ক্রীড়া করিতেছিল।

মাতার অনুমতি পাইয়া সুভাষিণী দ্রব্যগুলি তুলিয়া রাখিবার জন্য নিম্নতলের অন্য কক্ষে গেল।

ইত্যবসরে সুভাষিণীর মাতা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া আলেক্‌জান্দ্রার সহিত অনেক কথা কহিয়া ফেলিলেন; তাঁহার হৃদয় যদি একেবারে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ না থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই একজন অপরিচিতার নিকট তত কথা কহিতেন না।

আলেক্‌জান্দ্রা সহৃদয় প্রশ্নের দ্বারা, সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা অল্পকালমধ্যে তাঁহাদের সকল সংবাদই জানিয়া লইল। তাঁহাদের পূর্ব্ব সৌভাগ্যের কথা, তাঁহাদের আধুনিক দৈন্যের কথা, বালকদ্বয়ের বিদ্যা-শিক্ষার কথা সে সমস্তই অবগত হইল। এবং তাঁহাদের নাম ধামেরও পরিচয় পাইল। কিন্তু আপনার কোনও পরিচয়ই সে প্রদান করিল না। গৃহস্থরমণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেবল একটু হাসিয়া নীরব রহিল। বাস্তবিক, আলেক্‌জান্দ্রা তাহাদ্বারা উপকৃত কোনও লোকের নিকট তাহার নিজের পরিচয় প্রকাশ করিত না। ইহার কারণ ছিল। প্রথমতঃ আলেক্‌জান্দ্রা ভাবিত, তাহার সেই কটমটে বিজাতীয় নামটা ভদ্র স্বদেশীয়ের শান্ত অন্তঃপুরে উল্লেখযোগ্য নহে। তাহার পর সে ভাবিত যে, যদি কোনও ব্যক্তি অযথা

কৃতজ্ঞতার বশে, তাহার তুচ্ছ কার্য্যের প্রশংসা প্রচার করিবার জন্য, জনসমাজে বা সংবাদপত্রে তাহার নামের ও কার্য্যের উল্লেখ করে, তাহা হইলে সুখ্যাতির কলকলায়মান স্রোতে পড়িয়া, তাহার নিষ্কাম ব্রত ব্যর্থ হইয়া যাইবে; তখন দান আর দান থাকিবে না, সুখ্যাতি প্রাপ্তির প্রলোভনমাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব গৃহকর্ত্রী আপন উপকারীর নাম জানিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে এবং গৃহস্বামী কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগত হইবার অনেক আগেই "আবার দেখা হ'বে," এই আশাবাক্য প্রদান করিয়া আলেক্‌জান্দ্রা চলিয়া গেল।

গৃহস্থরমণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ আলেক্‌জান্দ্রার প্রীতিপ্রদ কথা শুনিয়া তাঁহার বিষণ্ণ হৃদয়ের ভার অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব আলেক্‌জান্দ্রা প্রস্থিতা হইলে, তিনি সহজেই নিম্নতলে আসিয়া পুত্রকন্যাকে তাহার প্রদত্ত ফলমূল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। বহুকাল অর্থাভাবে তিনি এমন উৎকৃষ্ট আহার সামগ্রী খাইতে দিতে পারেন নাই। 'আজ মনোমত খাদ্যে সন্তানগণের উদর পূর্ণ করিয়া, মাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

সন্ধ্যার সময় গৃহকর্ত্তা কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, মুখ হাত ধুইয়া, আলেক্‌জান্দ্রা প্রদত্ত ফলমূল মিষ্টান্ন আহার করিতে করিতে, মহা সন্দেহে ললাটতল আচ্ছন্ন করিয়া গৃহিণীর নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া মহাভাবনায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আজ কাল অনেক ডাকাতের দলে অনেক মেয়ে গোয়েন্দা আছে, মাগী তাই নয় ত?"

দশম পরিচ্ছেদ

দিদি।

পরদিন আলেক্‌জান্দ্রা অশ্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তখন অশ্রুকুমার আপন পাঠাগারে বসিয়া ছিল। এই পাঠাগার ত্রিতলে; এবং আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহাতে সৌদামিনীর গতিবিধি ছিল। অশ্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে আলেক্‌জান্দ্রা কখনও পত্র লিখিয়া তাহাকে আপন বাটীতে আহ্বান করিত; কখনও আপনি ঐ পাঠাগারে আসিয়া সাক্ষাৎ করিত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে কখনও সৌদামিনীর সহিত আলাপ পরিচয় করে নাই; এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগও প্রদান করে নাই। পত্নীর সহিত পরিচয় স্থাপনের জন্য অশ্রুকুমার পূর্ব্বে দুই একবার আলেক্‌জান্দ্রাকে বলিয়াছিল; কিন্তু, কি জানি কেন, আলেক্‌জান্দ্রা কখনই তাহাতে সম্মত হয় নাই। আমাদের সন্দেহ হয়, বুঝি, আলেক্‌জান্দ্রা মনে করিত, তাহারই সম্মুখে, তাহা অপেক্ষা সুন্দরী যুবতীকে অশ্রুকুমার প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, সে সেই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবে না;—বুঝি সে ভাবিত, আর একজন নবীনা প্রেমিকাকে অশ্রুকুমারের পার্শ্বে দেখিলে তাহার অন্তঃসারশূন্য হৃদয় করীপদ বিদলিত মৃৎকলসের ন্যায়, একবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা পরে দেখিব, সেই প্রেমের ছবি দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল; মনে করিয়াছিল, বুঝি বা স্বর্গের দৃশ্য দেখিল।

অশ্রুকুমার একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া কাগজে কি লিখিতেছিল। আলেক্‌জান্দ্রাকে নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া সে পুস্তক পাঠে বিরত হইল; এবং তাহাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য, উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ললাটে যুগ্ম কর তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ শুধু দেখা করতে এসেছ, না, কোনও কায আছে?"

আলেক্‌জান্দ্রা প্রতিনমস্কার করিয়া অশ্রুকুমারের নিকটস্থ একটা আসন গ্রহণ করিল; এবং ভক্তিপূর্ণ নয়নে অশ্রুকুমারের জ্ঞানোজ্জ্বল ললাট নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—"আজ আমার কিছু টাকার দরকার হ'য়েছে। কাল বাগবাজারে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তারা একবারে গরীব না হলেও, আমার মনে হ'ল, তারা এখন বড়ই অভাবে পড়েছে; টাকার

অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না।—বরপক্ষ অনুগ্রহ করে পাঁচ হাজার টাকা চান। আমার যদি ক্ষমতা থাকৃত, পাঁচ হাজার টাকা পাবার আশায় উড্ডীয়মান বরপক্ষের পক্ষচ্ছেদ করে, তাঁদের সকল আশা নির্ম্মূল করতাম। আমার সে ক্ষমতা নেই বলে, তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে এসেছি ”

অশ্রুকুমার দান করিবার সুযোগ পাওয়ায়, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সস্মিত মুখে কহিল, “বরপক্ষের পাঁচ হাজার টাকা, আর লোকজন খাওয়ানতেও, বোধ হয়, আর এক হাজার টাকা খরচ হবে।—এই ছ'হাজার টাকা তুমি চাও?”

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, “হা, ছ'হাজার টাকা হ'লেই চল্‌বে।”

অশ্রুকুমার কহিল, “ঐ ছ'হাজার টাকার একটা চেক্ লিখে দেব, না, খাতাঞ্চি বাবুর কাছ থেকে নগদ টাকা চেয়ে এনে দেবো?”

আলেক্‌জান্দ্রা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “না, নগদ টাকা দিও না। আমি দুরন্ত মেয়েমানুষ হ'লেও এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি, যে মেয়েমানুষ মাত্র। আমরা, আমাদের সভ্যা নারী সমাজের মতে, আর সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হলেও, এটা স্বীকার কর্ত্তেই হ'বে যে আমরা সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, এবং দেবী চৌধুরাণীর মত কুস্তি ক'রেও পুরুষ অপেক্ষা সবলা হ'তে পারব না। কাযেই, মোটর গাড়ী থেকে নামবামাত্র, কোনও সবল পুরুষ একটু মোচড় দিলেই নগদ টাকার তাড়াটা, এই পিয়ানো বাজান দুর্ব্বল হাত থেকে অনায়াসে কেড়ে নিতে পারবে। আর বাগবাজার অঞ্চলে গলি রাস্তার মধ্যে সে রকম সবল পুরুষের মোটেই অভাব নেই।”

অশ্রুকুমার কহিল, “তাহ'লে, তুমি তা'দের ঠিকানা লিখে রেখে যাও; আমি দরওয়ান দিয়ে টাকাটা তা'দের কাছে পাঠিয়ে দেব।”

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, “না, দরওয়ান দিয়ে পাঠান 'বে না। দরওয়ানের হাত থেকে তাঁরা মোটেই টাকা নেবেন কি না সন্দেহ আছে। তার চেয়ে, তুমি একখানা বেয়ারার চেক্ লিখে দাও।”

অশ্রুকুমার পার্শ্বস্থিত ‘দেরাজ’ খুলিয়া একখানি চেক বহি বাহির করিল; এবং ছয় সহস্র মুদ্রার একখানি চেক লিখিয়া দিল।

যে কার্য্যের জন্য আলেক্‌জান্দ্রা অশ্রুকুমারের নিকটে আসিয়াছিল, তাহা ত দুই চারি মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রা ত ততশীঘ্র অশ্রুকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না; অশ্রুকুমারকে দুই চারি মিনিট মাত্র দেখিয়া সে ত আপন পিপাসিত নয়নকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না; অশ্রুকুমারের দুই চারিটি মাত্র কথা শুনিয়া সে ত আপন শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না; যে মহা আকর্ষণে তাহার হৃদয় আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, শত চেষ্টা করিলেও, সে ত তাহা ছিন্ন করিতে পারে না। আহা! তোমরা এই বিকলা অবলার নিন্দা করিও না। সে ত অশ্রুকুমারের সহিত প্রেমালাপ করিবার আশা করে না, সেত তাহার হৃদয়োদ্যানের চিরপ্রস্ফুটিত প্রেমপ্রসূনদাম চয়ন করিয়া, প্রেমের শোভন ডালা সাজাইয়া অশ্রুকুমারকে উপহার দিতে চায় না; সে কেবল তাহার নিকট দুই দণ্ড বসিয়া শিষ্যার ন্যায়, তাহার দুইটা উপদেশ বাক্য শুনিতে চায়; সে কেবল দুই দণ্ড তাহার নিকট বসিয়া দেবদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে চায়।

অতএব চেকখানি গ্রহণ করিয়া আলেক্‌জান্দ্রা আসন ত্যাগ করিল না। পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া অশ্রুকুমারের সুধাধিক মিষ্ট ও প্রাণময় বাক্য শুনিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিল, “তুমি এখন কি বই পড়ছিলে, অশ্রুবাবু?”

অশ্রুকুমার একখানা পুরাতন পুস্তক আলেক্‌জান্দ্রার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, “এই দেখ, এই বই খানা পড়ছিলাম।”

আলেকজান্দ্রা পুস্তক খানাকে কোনও পবিত্র সামগ্রীর ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া উহার পত্রোন্মোচন করিয়া, উহা পাঠ করিতে চেষ্টা

করিল ; কিন্তু উহার একবর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তখন অশ্রুকুমারকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ভাষা ? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

অশ্রুকুমার হাসিত মুখে কহিল, "তুমি ত লাটীন শিখ্‌লে না ? তা শিখ্‌লে বুঝতে পারতে। ওখানা—"ইমিটেসিও ক্রাইস্‌টি" (Imitatio christi)

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "এমন সুযোগ অবহেলা ক'রে, লাটীন না শেখাটা আমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে, কিন্তু বোধ হয়, এ বয়সে আর শিখ্‌তেও পারতাম না। এ বই খানায় কি লেখা আছে ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "ওতে ভারি চমৎকার সদুপদেশ আছে ; ঐ সব সদুপদেশ মেনে কায করতে পারলে, মানুষ পৃথিবীতে থেকেই দেবতা হ'তে পারে। ইয়োরোপের লোকে বাইবেলের পরেই ঐ বই খানাকে সব চেয়ে বেশী আদর করেন। বাস্তবিক, ঐ রকম আদর পাবারই উপযুক্ত বই। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত ঐ বই খানার অনুবাদ হয় নি। বোধ হয়, আমাদের এই রামায়ণ মহাভারতের দেশে নূতন ধর্ম্মোপদেশের দরকার নেই বুঝে, কেউ এই চমৎকার বই খানার অনুবাদ করেন নি। ইয়োরোপের সকল ভাষাতেই উহার অনুবাদ আছে। আমার মতে বাঙ্গালাতেও ওর অনুবাদ থাকা উচিত ; তাতে আমাদের ভাষার একটা সম্পদ বেড়ে যাবে। তাই আজ কদিন থেকে, আমি বই খানার অনুবাদ আরম্ভ করে দিয়েছি, মূল কেতাব থেকেই তরজমা কর্‌ছি। The following of Chiist কিম্বা The imitaton of chiist এই নামে উহার অনেক ইংরাজি অনুবাদ প্রচলিত আছে ; তার একখানি তুমি পড়ে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে, ওর একটা বাঙ্গালা অনুবাদ সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে, দেশের নীতিজ্ঞান কতটা বৃদ্ধি পাবে।"

আলেক্‌জান্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে মূল বই খানা থেকে অনুবাদ করছ, সেটা কার রচনা ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তা ঠিক করে বলা বড় কঠিন। অনেক পণ্ডিত লোকই বলেন যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রুশিয়া দেশে কেম্পেন নামক এক গ্রামে, টমাস্‌ এ কেম্পিস্‌ (Thom as A Kempis) নামক এক সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৌমার ধর্ম্ম গ্রহণ করে এক মঠে বাস করতেন। তিনিই ঐ বইখানা লিখেছিলেন। আবার এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁরা অন্যান্য সাধুপুরুষকে ঐ গ্রন্থের রচক সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন।"

ইহার পর আলেক্‌জান্দ্রা আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, অশ্রুকুমার আরও অনেক কথা কহিল। কিন্তু সে সকল তত্ত্বের কথা, সে সকল নীতি শাস্ত্রের কথা—তাহা আলেক্‌জান্দ্রার কর্ণে অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও, তাহা প্রেমকথার ন্যায়, উপন্যাস পাঠকের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে না বুঝিয়া, আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম না।

অর্দ্ধপ্রহরকাল আলেক্‌জান্দ্রার সহিত বাক্যালাপে অতিবাহিত করিয়া অশ্রুকুমার কক্ষগাত্রে সংলগ্ন বৃহৎ ও সুদৃশ্য ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল চারিটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। প্রত্যহ চারিটার সময়ই অশ্রুকুমার সেই কক্ষে বসিয়া জলযোগ করিত। প্রত্যহ ঠিক চারিটার সময়ই সৌদামিনী অশ্রুকুমারের জন্য স্বহস্ত-প্রস্তুত সামান্য খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে বহন করিয়া সেই কক্ষে আসিত। স্বামীর সামান্য সেবার ভারও স্বামিসেবাব্রতা সৌদামিনী কখনও অসংখ্য দাস দাসীর মধ্যে কাহারও হস্তে প্রদান করিত না—প্রদান করিয়া এতটুকু সুখলাভ করিতে পারিত না। বৃহৎ নিকেতনের সুদূর প্রান্তে বসিয়া সৌদামিনী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলেও তাহার সৌরভ যথাকালে অশ্রুকুমারের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত। প্রস্তুতকারিণী প্রিয়তমার প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত কনককঙ্কণের মধুর শব্দ তাহার শ্রবণ পথে দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইত। তাহার পর, বৃন্তচ্যুত প্রসূনপাতের ন্যায় সৌদামিনীর নীরব চরণপাতের শব্দহীন শব্দ তাহার আশাপ্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিত ; সৌদামিনীর পৃষ্ঠবিলম্বিত চঞ্চল গুঞ্জিকা-গুচ্ছের মধুর নিক্কণ, দেবী বীণাপাণির বীণার ঝঙ্কারের ন্যায়, তাহার উৎফুল্ল কর্ণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

আজও অশ্রুকুমার প্রাণতমার শুভাগমনের সকল শব্দ, সকল সৌরভ অনুভব করিল। একটা মহানন্দে তাহার হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহস্থেরা যেমন প্রাচুর্য্যের মধ্যে আরাধিতা কমলার শুভাগমন দেখিতে পায়, অশ্রুকুমারও তেমনই আপনার হৃদয়ের পূর্ণতার মধ্যে সৌদামিনীর শুভাগমনের বার্ত্তা পাইল। পাইয়া, সে আলেক্‌জান্দ্রার দিকে চাহিয়া কহিল,—"সদু—আমার স্ত্রী—আমার জল নিয়ে আস্‌ছে।"

আলেক্‌জান্দ্রা সত্বর আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; এবং কিছু চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে, আমি যাই?"

অশ্রুকুমারের পাঠাগারে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ ছিল। একটি অন্তঃপুরের সহিত সংযুক্ত;—সৌদামিনীর আগমন প্রত্যাশায় অশ্রুকুমার এই পথের দিকেই তাকাইয়া ছিল। অপর পথটি বহির্ব্বাটীর সহিত সংযুক্ত;—আলেক্‌জান্দ্রা সেই পথেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সেই পথেই কক্ষত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল।

কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রার প্রস্থান প্রস্তাবে অশ্রুকুমার বাধা প্রদান করিয়া কহিল,—"যাবে কেন? তুমি ত কথনই আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হওনি, আজ তার সঙ্গে আলাপ করো।"

আলেক্‌জান্দ্রা শঙ্কিতা হইয়া কহিল,—"না না, আজ নয়, আর একদিন এসে আলাপ করবো এখন। আজ বাগবাজারে যেতে হ'বে; আজ যাই, নমস্কার!"

কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রা চলিয়া যাইতে পারিল না। সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইবার পূর্ব্বেই যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তিতে সমস্ত কক্ষ প্রভাসিত হইয়া উঠিল, যেন রূপের একটা বন্যায় সমস্ত কক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল, যেন দেব সদাগতি সংসারের সমস্ত সৌরভ সংগ্রহ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। রূপসী, অধুনা সপ্তদশবর্ষীয়া সৌদামিনী রজতরচিত অনতিবৃহৎ স্থালী হস্তে লইয়া বরণডালাধারিণী পূজাভিলাষিনী দেবমন্দিরাগতা দেবীর ন্যায় কক্ষ মধ্যে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিল। প্রস্থানোদ্যতা আলেক্‌জান্দ্রা যেন কি একটা দৈব প্রেরণায় চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছটায় সে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, মহা বিস্ময়ে তাহার চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত হইয়া রহিল।—সে ত কখনও সুদূর প্রসারিত কল্পনাতেও সৌদামিনীর সেই মহিমময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারে নাই।

আলেক্‌জান্দ্রা সৌদামিনীকে পূর্ব্বে কখনও না দেখিলেও, তাহার অগোচরে সৌদামিনী কিন্তু তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিল। সৌদামিনী যখন গৃহকার্য্যে, দানে, রন্ধনে, পরিবেষণে, পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিত, তখনও তাহার সতর্ক দৃষ্টি অশ্রুকুমারের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে, প্রত্যেক গতিবিধিতে নিবদ্ধ থাকিত। অন্যান্য অনেক প্রেমিকার দৃষ্টির ন্যায় সৌদামিনীর সতর্ক দৃষ্টি সন্দেহদুষ্ট নহে; সেই ভক্তিময়ীর হৃদয়ে কখনও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার সতর্ক দৃষ্টি কেবল মাত্র অশ্রুকুমারকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, শরীররক্ষক অনুচরের ন্যায়, অশ্রুকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় যেন অশ্রুকুমারকে সকল বিপদ হইতে ঘিরিয়া রাখিত। এই সর্ব্বত্র অনুসারিণী দৃষ্টির বলে, সব সময় অশ্রুকুমার নিজে না জানাইলেও, সৌদামিনী জানিত, অশ্রুকুমার কখন কি করিতেছে, কখন কোথায় যাইতেছে।—আলেকজান্দ্রার অহেতুক নিষেধ জন্য যদিও অশ্রুকুমার আলেক্‌জান্দ্রার সহিত সৌদামিনীর সাক্ষাৎ ঘটাইয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচয় ঘটাইয়া দেয় নাই, তথাপি সৌদামিনী আলেক্‌জান্দ্রার সকল সংবাদই জানিত। কখন কি কাযে আলেক্‌জান্দ্রা অশ্রুকুমারের নিকট আসে, কখন সে অশ্রুকুমারকে লইয়া, মোটর গাড়ী আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হয়, কখন সে অশ্রুকুমারের নিকট বসিয়া গল্প করে, কখন সে তাহার নিকট অর্থ গ্রহণ করে—এ সকল তথ্যই সৌদামিনী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত থাকিত। আজও সে জানিত

যে আলেকজান্দ্রা অশ্রুকুমারের নিকট উপস্থিত আছে; এবং আমাদের সন্দেহ হয়, কি আকর্ষণে সে অশ্রুকুমারের নিকট বসিয়া ছিল, তাহাও প্রখর বুদ্ধিমতী সৌদামিনীর অগোচর ছিল না।

তোমরা আমার পাঠিকাগণ! তোমরা হয়ত সন্দেহকুটিল হাসি হাসিয়া, তোমাদের সুন্দর নয়নে অবিশ্বাসের কৃষ্ণছায়া মাখিয়া, কৃষ্ণ ভ্রূযুগল কটাক্ষের কুটিলতায় তরঙ্গিত করিয়া বলিবে, পোড়া কপাল, সৌদামিনীর প্রখর বুদ্ধির! এমন জীবন্ত কাল নাগিনীর হাতে একটি মাত্র স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া, সে কিরূপে ছার গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করে? যাহার একমাত্র প্রাণপতি অন্য যুবতীর সহিত মিলিত হইয়া অতটা সময় অতিবাহিত করে, তাহার হৃদয়ে ত তিঁতিড়ি কাঠের প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনের ন্যায়, তীব্র হুতাশন অহরহঃ জ্বলিবে; সে কিরূপে বক্ষে সেই অগ্নিজ্বালা লইয়া হাসিমুখে পরহস্তগত স্বামীর জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আনিবে? কিন্তু সৌদামিনী সত্যই তাহা করিত। সেই নন্দনের ন্যায় চিরানন্দিত হৃদয়ের মধ্যে এতটুকু সন্দেহের, এতটুকু অবিশ্বাসের স্থান ছিল না। তাহার প্রিয়তম প্রাণতম স্বামীর অগাধ প্রেমের গভীরতা জানিয়া, সৌদামিনী আপন কল্পনাকে বিকৃত করিয়াও ভাবিতে পারিত না, যে অন্য যুবতীর সহিত স্বামীর এই প্রকার মিশ্রণে কোনও প্রকার সন্দেহের বা অবিশ্বাসের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।—অসীম প্রেমের আলোকে যে হৃদয়াকাশ চিরোজ্জ্বল তাহাতে সন্দেহের মেঘ উদিত হইতে পারে না। আর যদিই বা তাহার স্বামীকে জগতের লোকে তাহারই মত ভালবাসে তাহাতে তাহার মনঃকষ্টের কারণ কোথায়?

সৌদামিনী প্রস্থানোন্মুখী আলেকজান্দ্রাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "আপনি যাবেন না। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ না করে, আপনাকে ছেড়ে দেব না।"

আলেকজান্দ্রা কহিল,—"না, যাব না। যে মুখ এমন সুন্দর, সে মুখের কথা কত মিষ্টি, তার স্বাদ না নিয়ে যাব না। যে ফুল এমন চমৎকার, তার সৌরভ না শুঁকে যেতে পারব না।"

সৌদামিনী আলেকজান্দ্রার সরস বাক্যের উত্তর দিতে পারিল না। আপন রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া অতি লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত ও অবনত হইয়া পড়িল। সে খাদ্য পাত্র একটা শ্বেত মর্ম্মর বিরচিত টেবিলের উপর রাখিয়া অশ্রুকুমারের দিকে আহ্বান সূচক দৃষ্টিপাত করিল।

অশ্রুকুমার গাত্রোত্থান করিয়া আলেকজান্দ্রাকে ও সৌদামিনীকে বসিতে বলিল; এবং নিজে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দিল; এবং তাহারা কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হইলে, শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের নিকট যাইয়া জলযোগ করিতে বসিল।

আমরা পূর্ব্বে প্রগল্‌ভা সৌদামিনীকে তাহার দাদা মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে শুনিয়াছি। কিন্তু সে দিন আর নাই। প্রেমরাজ্যে মুখরার স্থান নাই, তাই মুখরা সৌদামিনী মুখবন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার হাসি ঘনীভূত ও মিষ্ট হইয়া এখন তাহার অধরেই লাগিয়া থাকিত। প্রভাতের কলকলায়মান বিহঙ্গ কাকলীর মধ্যে পিকবধূর মৃদু কুহুরবের ন্যায় সে কেবল মাত্র হাসিমাখা মুখে একএকবার আলেকজান্দ্রার সরস বাক্যের এক একটি ক্ষুদ্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

জলযোগ সমাপ্ত করিয়া অশ্রুকুমার সৌদামিনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী পশ্চাৎ দিকে না ফিরিয়া কেবল মাত্র ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া, বৃহৎ চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে বিস্ফারিত করিয়া, তাহার মস্তকের দিকে ঈষৎ অবনত অশ্রুকুমারের মুখ দেখিল,—প্রেমিকার সেই প্রেমপূর্ণ আগ্রহপূর্ণ বিশাল বিলোল ঊর্দ্ধদৃষ্টি দেখিয়া আলেকজান্দ্রার জীবন সার্থক হইল। সে মনে করিল যেন তাহারই অভীষ্ট দেবতার পূজার জন্য দুইটী ইন্দীবর ফুটিয়া উঠিল! পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের ছবি দেখিয়া আলেকজান্দ্রা ধন্য হইল।

সৌদামিনী স্বামীর প্রফুল্ল মুখ হইতে দৃষ্টি অবনত করিয়া, আবার কিয়ৎকাল আলেকজান্দ্রার সহিত

কথা বার্ত্তায় যোগদান করিল। কথা কহিতে কহিতে অবশেষে ঠিক হইয়া গেল যে, অতঃপর সৌদামিনী আলেক্জান্দ্রাকে দিদি বলিবে।

আলেক্জান্দ্রা হাসিতে হাসিতে অশ্রুকুমারকে জানাইল—"শুনলে, অশ্রুবাবু, আমি আজ থেকে তোমার স্ত্রীর দিদি হ'লাম।"

শুনিয়া অশ্রুকুমার কহিল,—"আমিও আজ থেকে তোমায় দিদি বলবো।"

আলেক্জান্দ্রা সে কথার উত্তর দিতে পারিত যে, অশ্রুকুমার বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং সে কনিষ্ঠকে দিদি বলিতে পারে না। কিন্তু সে অশ্রুকুমারের প্রস্তাবের কোন উত্তরই দিল না। তাহার নীরব আনন রক্তাভ হইয়া অবনত হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

ধরণীর প্রেম

হে আমার সুন্দর ভুবন !
তব চির অন্ধকার আলো,
রূপ গান গন্ধ পরশন,
বাসিয়াছি বাসিয়াছি ভালো।
পিয়াসী পরাণ মোর তব শোভা সুধারস পিয়া
নিয়ত মরণ মাঝে পলে পলে উঠে সঞ্জীবিয়া !
তব স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল, মর্ম্মরিত কুসুম-কানন,
সন্ধ্যার সিন্দুর-টিপ, ঊষালোকে রঞ্জিত আনন,
প্রসন্ন আকাশ তব, জলধি অপার,
ষড়ঋতু-আহরিত অঞ্জলি-সম্ভার,
তব প্রেম, অনন্ত যৌবন,
আনন্দের অমৃত ধারায়
প্রতিদিন সারা দেহ মন
ভরিয়াছে কানায় কানায় !

কাঙ্গাল লভেছে বিত্ত, সর্ব্বহারা লভিয়াছে কোল,
বেদনা ভুলায় পলে হিয়াতলে হরষ-হিল্লোল ;
কারাবন্দী—ভুলে যাই বন্ধনের দুঃখ অনিবার,
শৃঙ্খল টুটিয়া যায় অবারিত অঙ্গনে তোমার ;
দিগন্তে ছড়ায়ে আছে স্নেহের অঞ্চল,
প্রসারিত সুধা-বক্ষ করুণা চঞ্চল ;—
চেয়ে থাকি আবেশ-বিহ্বল
পিঞ্জরের বাতায়নে তাই,
মা বলিতে চোখে আসে জল,
ভুলে যাই সব ভুলে যাই !

তৃষিত আকুল ওই তব স্তন্য-অমিয়ার লাগি,
ক্ষুধিত ভাণ্ডার-দ্বারে ফিরিছে গো ক্ষুদকণা মাগি ;
নয়ন হাসিছে দৃপ্ত দুর্ব্বলেরে করিয়া বঞ্চন,
অভাগা সন্তান ফিরে মাতৃহীন শিশুর মতন ;
তুচ্ছ করি বঞ্চিতের মৌন হাহাকার
জাগে বক্ষ আগুলিয়া স্বার্থের প্রাকার !
কে বোঝে গো অভাগার তরে
জননীর করুণা বিপুল,
তাই বুঝি নিশিদিন ঝরে
স্নেহ-বক্ষ বেদনা-আকুল !

বিচিত্র বরণ ছন্দে মর্ম্ম তব উঠিছে আভাসি,'
কাঙ্গালে এমন স্নেহ, তাই মাগো এত ভালবাসি !
বিফল কামনা মোর আঁখি তব করেছে করুণ,
ব্যথার শোণিত-রাগে সন্ধ্যাকাশ বেদনা-অরুণ ;
যে বাণী পঞ্জরতলে রোধিছে নিশ্বাস;
কল্লোলে নর্ম্মরে শুনি তাহারি আভাস !
গানে গানে করিলে মুখর
অকথিত সঙ্গীত আমার,
হে ভুবন ! হে চিরসুন্দর !
ভালবাসি তাই অনিবার।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

দ্বারকাপুরী

যাত্রা

গঙ্গোত্তরী হইতে সবেমাত্র হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। দ্বারকাপুরী দর্শন জন্য মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল। হরিদ্বার হইতে মীরাটে আসিলাম—উদ্দেশ্য, দ্বারকা যাইবার পথ ইত্যাদি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইব। কিন্তু এখানে আসিয়া অভিলাষ পূর্ণ হইল না—দ্বারকা যাইবার পথ জানিতে পারিলাম না। কেবল স্মৃতিপথে উদয় হইতে লাগিল যেন বহুপূর্ব্বে কাহাকেও গল্প করিতে শুনিয়াছি যে, পোড়বন্দর হইতে যাইতে হয়। রেলওয়ে মানচিত্রে পোড়বন্দর পর্য্যন্ত রেল গিয়াছে দেখিলাম বটে, কিন্তু তথা হইতে দ্বারকা কতদূর এবং কি উপায়ে যাইতে হয়, তাহা ত জানি না। সন্দেহও হইতে লাগিল—পোড়বন্দর হইয়া বা পথ নহে। পঞ্জিকা দেখিলাম, তাহাতে বোম্বাই হইয়া পথ লেখা আছে। ইহাতে আরও সন্দেহ হইল,—কোথায় বোম্বাই, আর কোথায় দ্বারকা! কেহ কেহ বলিলেন, করাচী হইয়া যাইতে হয়। মানচিত্রে পোড়বন্দর অপেক্ষা করাচী দ্বারকা হইতে বেশী দূর দেখিয়া এ পথেরও সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ফলকথা—এমন কোন লোক মিলিল না, যিনি দ্বারকা গিয়াছেন অথবা আমায় ঠিক পথ বলিয়া দিতে পারেন।

এমন একটা ঝোঁক হৃদয়ে আসিয়াছে, যাহা পথ অনুসন্ধানের নিমিত্ত কালবিলম্ব করিতে দিতেছে না। অতএব ১লা আষাঢ় ১৩২৮ (ইংরাজী ১৬ই জুন ১৯২১) শুক্রবার মীরাট হইতে দিল্লী গেলাম। দিল্লী বড় সহর, এজন্য আশা হইল, এখান হইতে কোন না কোন প্রকার খবর পাইব। এমন কি দ্বারকা যাইবার সহযাত্রীও পাইতে পারি। প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে একবার দিল্লী গিয়াছিলাম। সে সময় যাঁহাদের অতিথি হইয়াছিলাম, এবারও ষ্টেসন হইতে বরাবর তাঁহাদের বাটী-অভিমুখে চলিলাম। পৌছিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বপরিচিত কেহই নাই, তৎপরিবর্ত্তে একটী বালিকা-বিদ্যালয় সেই বাটীতে প্রতিষ্ঠিত। বিফলমনোরথ হইয়া পার্শ্বস্থ একটী দোকানে অনুসন্ধান করায় জ্ঞাত হইলাম যে, তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে এবং মরিবার পূর্ব্বে বাটীখানি উক্ত বালিকা বিদ্যালয়কে দান করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন পরিচিত না থাকায় অগত্যা আমায় ষ্টেশনের অনতিদূরস্থিত লালা চিন্নুমলের ধর্ম্মশালায় যাইতে হইল। ধর্ম্মশালাটী নানাস্থানের যাত্রীতে পরিপূর্ণ। অতএব আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার খুব সম্ভাবনা দেখিয়া, একে একে যাত্রীদের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম কেহ মথুরা, কেহ হরিদ্বার, কেহ কাশী, কেহ কেদারবদরি, কেহবা আর কোন স্থানে যাইবে—কিন্তু কেহই দ্বারকা যাইবার নাম করিতেছে না; অথবা দ্বারকা কখনও দর্শন করিয়াছে, তাহাও বলিতেছে না। অতএব তাহাদের নিকট হইতে উঠিয়া ধর্ম্মশালার ফটকের নিকট আসিলাম। তথায় অনেককে চৌকিদারের নিকট নিজ নিজ গাড়ী কখন ছাড়িবে খবর লইতে দেখিয়া আমিও আমার গন্তব্য স্থানের পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে সে বোম্বাই অথবা করাচী হইয়া যাইবার কথা বলিল। উত্তর মনোমত না হওয়ায় প্রাতে ষ্টেশন হইতে তত্ত্ব লইব স্থির করিয়া, সে রাত্রি তথায় যাপন করিলাম।

পরদিন শনিবার প্রাতঃকালে ষ্টেশনে আসিয়া টিকিট বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, পোড়বন্দরের টিকিট পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বারকা যাইবার পথ তিনি অবগত নহেন। আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা বৃথা দেখিয়া অগত্যা পোড়বন্দরের টিকিট লইব স্থির

করিলাম, কারণ দ্বারকা যাইবার যতগুলি পথ জানিলাম, তন্মধ্যে পোড়াবন্দরই যখন দ্বারকার অধিক নিকটবর্ত্তী, তখন তথায় যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। যদি পৌছিয়া দেখি তথা হইতে পথ নাই, তখন না হয় করাচী যাইব।

সারাদিন ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া, সন্ধ্যা ৭৷৷৹টার সময় আর, এম, আর কোংর বোম্বাই মেলে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া যাত্রা করিলাম। ভাড়া ৭৸৶৹ লাগিল। গাড়ীতে অত্যন্ত ভীড়, কোনপ্রকারের বসিয়া রাত্রি প্রভাত হইল। ট্রেণ রাজপুতানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পরদিন রবিবার প্রাতে ৭।৪৫ মিনিটের সময় আজমীর পৌছিল। আজমীর হইতে ডাকগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি মধ্যম শ্রেণীতে পরিণত হওয়াতে, আমার নামিতে হইল। ষ্টেশনের মুসাফিরখানায় আসিয়া স্নানাদি করিয়া লইলাম। পরে বেলা ১১টার সময় এক খানি পাসেঞ্জার গাড়ীতে আরোহণ করিলাম।

রাজপুতনার শুষ্ক মরুপ্রদেশ ও পর্ব্বত মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গাড়ী কখনও বক্রভাবে যাইতেছে, কখন উপরে উঠিতেছে, কখনও বা নীচে নামিতেছে। গাড়ী এক একটী পুরাকালের স্বাধীন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া উহা অতিক্রম করিতে থাকিল। তখন রাজপুতজাতির শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়ের কতই না পূর্ব্ব কথা আমার মানসপটে জাগরূক হইতে লাগিল। আবার যখন মেবার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন স্বতঃই মেবারের সেই একচ্ছত্র সম্রাট্ পুণ্যবান্ মহারাণার তেজস্বিতা-পূর্ণ কার্য্যকলাপ হৃদয়ক্ষেত্রে উদিত হওয়ায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৎসঙ্গেই আবার যখন মেবার-পতন মনে হইতে লাগিল, তখন চক্ষে জল আসিল, বাধ্য হইয়া চিন্তা শক্তির গতি সে দিক হইতে ফিরাইয়া জনৈক রাজপুত যাত্রীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি দ্বারকা গিয়াছিলেন। আমায় পোড়বন্দর হইয়া যাইতে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন যে, সেদিকে পথ আদৌ নাই, করাচী হইয়া যাওয়াই উচিত। ইঁহার কথা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় স্তম্ভিত হইতে হইল। পরে তথায় পৌছিয়া যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া মনকে প্রকৃতিস্থ করিলাম।

ক্রমশঃ গাড়ী গুর্জ্জর দেশে প্রবেশ করিল এবং পরদিন সোনবার প্রত্যুষে ৪ ঘটিকায় মেহসানা জংশনে পৌছিল। এখানে আমায় গাড়ী বদলাইবার জন্য নামিতে হইল এবং কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া বেলা ৭৷৷টার সময় একখানি গাড়ী পাইলাম। সারাদিন উহাতে থাকিয়া সন্ধ্যা, ৬ ঘটিকায় ডোহরা জংশনে আসিলাম। এখানে বি, জি, জে, পি কোংর ট্রেণ প্রস্তুত ছিল—তাহাতে উঠিয়া কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশে প্রবেশ করিয়া রাত্রি ১০ টার সময় জেতলসর জংশনে পৌছিলাম। এখানে শুনিলাম, রাত্রিকালে কোনও গাড়ী পোড়বন্দর যায় না; এ গাড়ী আরও ২।৪টা ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবে বটে, কিন্তু তথায় যাত্রীদের থাকিবার স্থান না থাকায় আমার এইখানে থাকিয়া যাওয়া উচিত। এখানে থাকিলে আরও একটী সুবিধা যে, প্রাতঃকালে অপর একটী ট্রেণে যাওয়া যাইবে, যাহা সিধা পোড়বন্দর যাইবে। ইহা শুনিয়া আমি নামিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ষ্টেশন হইতে কিছুদূর ধর্ম্মশালা। অন্ধকার রাত্রি হেতু তথায় যাওয়া কষ্টকর বলিয়া তাঁহার নিকট ষ্টেশনে থাকিবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি বলিলেন, পুলিশ থাকিতে দিবে না। কিন্তু রেলওয়ে পুলিশের জনৈক সিপাহি আমায় থাকিতে দিল। এই সিপাহির নিকট প্রথম শুনিলাম যে, পোড়বন্দর হইতে দ্বারকা যাইবার রাস্তা আছে—এ সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

মঙ্গলবার প্রাতে ৭-১৫ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল। ট্রেণে দ্বারকা যাইবার একজনও যাত্রী দেখিলাম না। যাহা হউক উহা দ্বিপ্রহরে পোড়বন্দর ষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী হইলে হঠাৎ এঞ্জিন লাইনের বাহিরে চলিয়া গিয়া থামিয়া গেল; সুতরাং সকল আরোহীকে এখানে নামিয়া পদব্রজে যাইতে হইল। সহরে পৌছিয়া

"রঘুনাথ ছত্র" নামক ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। বৈকালে সহর দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

পোড়বন্দর বড় সহর। উহা একটী ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত। বর্ত্তমান রাজা নাবালক বলিয়া ইংরাজ সরকার রাজ্য পরিচালন করিতেছেন। আমি প্রথমে সুদামাজীর মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন, কিন্তু পরলোকগত রাজার রাজত্বকালে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। মন্দিরের নাম হইতে এ অঞ্চলের সকলেই পোড়বন্দরকে সুদামাপুরী নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পরে বাজার ও সহরের ভিতর দিয়া বন্দরাভিমুখে চলিলাম। অতিশয় ময়লা এবং দুর্গন্ধ; সহরের মধ্যভাগ দেখিলে, এস্থানে প্রায় প্রতি বৎসর প্লেগ হইবার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। মান্দ্রাজের ন্যায় এ বন্দর বড় নহে। ইহা ছোট বন্দর, তবে পুরীর ন্যায় একেবারে খোলা নহে। জাহাজাদি লাগিবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ডকে কতকগুলি হুড়ি তৈয়ার ও মেরামত হইতেছে, দেখিলাম। এখানে নেভিগেশন কোংর একটী আফিসও আছে। সমুদ্রতীরে বায়ুসেবনের জন্য রাস্তাও সুন্দর—রাস্তার একপার্শ্বে শ্মশান।

রঘুনাথ ছত্রের কারিন্দার(কর্ম্মচারীর) মুখে দ্বারকার পথ জানিয়া লইয়া, পরদিন বুধবার প্রত্যূষে পদব্রজে রওনা হইলাম। কারিন্দা সহরের বাহিরে পর্য্যন্ত আসিয়া আমায় রস্তা দেখাইয়া দিয়া প্রত্যাগমন করিল। আমি তাহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ৮ই আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যার পর শ্রীদ্বারকা ধামে পৌছিলাম। পোড়বন্দর হইতে দ্বারকা গরুর গাড়ীতে আসিলে ২॥ দিনের পথ, কিন্তু তীর্থ যাত্রায় গোযান নিষেধ বলিয়া আমি পদব্রজে গিয়াছিলাম। রাস্তায় অনেকগুলি ধর্ম্মশালা, দোকান, চটী এবং গ্রাম আছে। যাত্রীর কোন প্রকার কষ্ট হয় না। আবার মরুভূমি সদৃশ সুদূর প্রান্তর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে নানা বর্ণের মৃগদলের স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে লম্ফ ঝম্ফ বা বিচরণ এবং পেখম ধরিয়া ময়ুর ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলাধাম নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এবং ঐ সকল তাহার নিদর্শন।

পোড়বন্দর হইতে উত্তরাভিমুখে দ্বারকা প্রায় ৩৫ মাইল। পথিমধ্যে একটী চটীতে ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যের দপ্তর আছে, যথায় রাজ্য মধ্য দিয়া যাইবার শুল্কস্বরূপ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে ॥৵০ লওয়া হয়। তবে সাধু সন্ন্যাসী বা অসমর্থ ব্যাক্তিকে কিছুই দিতে হয় না। পথে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটী ছোট বড় মঠ ও মন্দির আছে।

সাধারণের অবগতির জন্য দ্বারকার অপর কয়েকটী পথ এ স্থানে লিখিয়া দিলাম। প্রথম—বোম্বাই হইতে ষ্টীমার যোগে পোড়বন্দর হইয়া—২৫ ঘণ্টার যাত্রা। দ্বিতীয় করাচী হইতে ষ্টীমার যোগে। তৃতীয়—কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশস্থ জামনগর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী বদিবন্দর হইতে নৌকাযোগে। পোড়বন্দর হইতে ষ্টীমার অথবা নৌকাযোগেও যাওয়া যায়।

দর্শন।

শুক্রবার রাত্রে একটী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলাম। দ্বারকা একটী ক্ষুদ্র সহর বিশেষ; সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়; কিন্তু পানীয় জলের অতিশয় কষ্ট। প্রায় ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে গরুর গাড়ী যোগে জল আনাইয়া জলসত্র খোলা হইয়াছে; সেই সব জলসত্র হইতে পরিমিত জল বিতরণ করা হয়। দ্বারকার কূপ সমূহে পানের অযোগ্য লবণাক্ত জল।

পরদিন প্রাতে গোমতী-গঙ্গার চক্রতীর্থে গমন করিলাম। গোমতীর খানিকটা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ইহাকেই চক্রতীর্থ কহে। এস্থান হইতে গোমতী সাগর সঙ্গম অতি নিকট। চক্রতীর্থে স্নানের কর ।১০ সিকা লাগে। পার্শ্বেই বরদা রাজের কাছারী ঘর আছে, তাহাতে কর জমা দিতে হয়। স্নানের জন্য বাঁধা ঘাট আছে। স্নানান্তে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। গোমতীর নাম হইতে দ্বারকার নাম 'গোমতী দ্বারকা' হইয়াছে।

স্নানান্তে দ্বারকাধীশের মন্দিরে গমন করিলাম। দ্বারকাধীশকে এখানে রণছোড়জী নামে অভিহিত করা হয়। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন হেতু তাঁহার নাম ঐ প্রকার হইয়াছে। প্রথমে একটী সিঁড়ি দিয়া উচ্চ সমতল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণটী খুব প্রশস্ত,উহাতে দুইটী ছোট মন্দির আছে। প্রাঙ্গণ হইতে পুনরায় আরও কয়েকটী সিঁড়ি উঠিয়া প্রধান মন্দিরে :পৌঁছিলাম। মন্দিরটী কারুকার্য্য খচিত এবং বেশ প্রশস্ত। ভিতরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বেদীর উপরে দণ্ডায়মান। মূর্ত্তিটী বেশ বড় এবং অলঙ্কারাদি ভূষিত, পার্শ্বে রুক্মিণী প্রভৃতি দেবী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি প্রায় ২০০ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বের রণছোড়জীর মূর্ত্তি এক্ষণে বেট দ্বারকায়। মন্দিরটী শিখর সমেত উচ্চে ১০০ ফুট, এ কারণে দূর হইতে দেখা যায়। আমি যথাবিহিত শ্রীভগবানের পূজা এবং পাদপদ্ম স্পর্শ করিলাম।

দ্বারকায় 'সারদা মঠ' রণছোড়জীর মন্দির সংলগ্ন একটী মহলে অবস্থিত। এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গদী আছে, গদীর নিয়মিত পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া থাকে। মঠের কর্ম্মচারী প্রভৃতি উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। আধুনিক মোহান্ত সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ পুরুষ। রণছোড়জীর মন্দিরে এই মঠের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, কিন্তু পাণ্ডা ও মন্দিরের পূজারী প্রভৃতি এবং স্থানীয় লোক প্রায় সকলেই বল্লভাচারী বৈষ্ণব।

সহরে অনেক দেবমন্দির ও সকল সম্প্রদায়ের মঠ আছে। কতকগুলি ধর্ম্মশালা আছে আলোকস্তম্ভের নিকট সাহেবদের কয়েকটী বাঙ্গলা আছে। সহরের প্রান্তভাগে গোমতী গঙ্গা আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানকে গোমতী-সাগর-সঙ্গমতীর্থ বলে। এখানেও স্নান ও শ্রদ্ধাদি করিতে হয়।

রবিবারে বেট দ্বারকা যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। সমুদ্রের তীরে তীরে সুন্দর রাস্তায় প্রায় ১৫ মাইল চলিয়া অপরাহ্ণ ৩টার সময় কচ্ছ উপসাগরের মোহানার নিকট স্থিত 'রামড়া' নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। পথে কয়েকটী ধর্ম্মশালা এবং ২।৩টী গ্রাম পাওয়া যায়। আমি একটী ধর্ম্মশালায় দ্বিপ্রহরের আহারাদি করিয়া লইলাম। রামড়ায় সাধুদিগের নিমিত্ত সদাব্রত আছে। এখানেই যাত্রীরা দ্বারকার প্রসিদ্ধ তপ্তছাপ লইয়া থাকেন। দুই আনা দিলে লৌহনির্ম্মিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মের ছাপ ঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইয়া বাহুমূলে লাগান হইয়া থাকে। রামড়ার উপকূল হইতে বেট ৬ মাইল নৌকায় যাইতে হয়। প্রায় ২০।২৫ জন যাত্রী হইলে নৌকা ছাড়িল। নৌকামধ্যে কয়েকজনের সমুদ্র পীড়া হইল। আমার কিছুই হইল না। অবশেষে প্রায় ৫॥টার সময় বেটে আসিয়া পৌঁছিলাম।

বেটদ্বারকায় শঙ্খতলাও (তলাও অর্থে সরোবর বা হ্রদ) আছে। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে বধ করেন, তাহারই অস্থি পঞ্জর হইতে সমুদ্রের খাড়ি মধ্যে এই দ্বীপের সৃষ্টি। ইংরাজ ইহাকে পাইরেট আইল্যাণ্ড ('বম্বেটে বা জলদস্যুর দ্বীপ) বলেন। বোধ হয় 'বম্বেটে হইতে ক্রমে 'বেট' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় 'মীরাবাই নু মন্দির' (মীরাবাইয়ের মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। এখানে পিত্তল নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের বামে মীরাবাই আসীনা। মন্দিরটী অত্রস্থ জনৈক শেঠ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহারা সকলে বল্লভাচারী বৈষ্ণব। বেট ভাল লাগায় আমি এখানে ২১ দিন রহিলাম। মন্দিরের অধ্যক্ষ নৈষ্ঠিক এবং সদালাপী ব্যক্তি। তিনি বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ পড়িবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে কয়দিনে কঠোপনিষদ্‌খানি আদ্যোপান্ত পড়াইয়া দিলাম।

সোমবার প্রাতে রণছোড়জী দর্শনে গেলাম। মন্দিরটী উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত, বেশ প্রশস্ত এবং কয়েকটী মহলে বিভক্ত, উপরে শিখরাদি নাই। প্রথম মহলে বরদা রাজের দপ্তর। এখানে যাত্রীদিগের নিকট হইতে দর্শনার্থ ১৷০ সিকা হিসাবে কর লওয়া হয়। মন্দিরের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার রাজদরবারের হস্তে। দ্বিতীয় মহলে যাইয়া দেখি, মন্দিরদ্বার তখনও খুলে নাই; নাট মন্দিরে গায়ক গৌরী রাগিণী ধরিয়াছেন এবং বাদক মৃদঙ্গে চৌতালে সঙ্গত দিতেছেন—উভয়ে যেন ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীভগবানের

নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টায় মত্ত। বহুদিন পরে ধ্রুপদ শ্রবণে কর্ণ কুহর তৃপ্ত হইল। আকৃষ্ট হইয়া উপবেশন করিলাম। ক্রমে একখানি ভৈরব হইয়া গেলে যখন মন্দির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তখন সুর ফাঁকতাল সহায়ে খাম্বাজে গীত হইতে লাগিল—

আজি শম্ভু হর নাচত ডমরু করে।
বাজাওত গজবদন লম্বোদর আনন্দ ভরে॥
পঞ্চবদন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাওত সুরগণ সমবেত ভরে।
রঙ্গনাথ মোহন বিলসিত রূপমে বিরাজে॥

আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ক এবং বাদক ডম্বুরা ও মৃদঙ্গ লইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিলেন। উভয়ে গলদ্‌ঘর্ম্মকায়, ভ্রূক্ষেপ নাই, তথাপি সে মাতোয়ারা নৃত্য চলিতেছে; আর মুখদ্বয় হইতে তালমান লয় সহকারে নির্গত হইতেছে—আজি শম্ভু আজি শম্ভু আজি শম্ভুরে নাচত ডমরু করে, ইত্যাদি। প্রায় একঘণ্টাকাল এইপ্রকার গদ্গদভাবে অতীত হইবার পর তাঁহারা শান্তভাব ধারণ করিয়া উপবেশন করিলেন।—আমি ত পেশাদারের মধ্যে এরূপ ভাব বিভোরতা দেখিয়া অবাক্। অবশেষে ভাবিলাম, কেনই বা না হইবে? —তাঁহারা যে শ্রীভগবানের নিত্যসেবক— ভগবৎকৃপা যে অলক্ষিতেও ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে! শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে শিববিষয়ক গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিতে পারেন। গীতের মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝি যে, দেবাদিদেব মহাদেব এবং গণেশ উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের রূপে বিভোর।

মঙ্গলারতি আরম্ভ হইলে আমি মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ মহলটী লক্ষ্মীর। এখানে শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী রণছোড়জী লক্ষ্মীদেবীর সহিত অবস্থিত। ইহাই রণছোড়জীর আসল মূর্ত্তি—মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে গোমতী হইতে আনীত হইয়া এখানে লুক্কায়িত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের মোহান্তজী ২০।২১ বৎসরের যুবক, বল্লভাচারী বৈষ্ণব সাধু। ইনি আমায় মন্দিরমধ্যে প্রবেশ এবং ভগবানের স্নানকালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধাদি লেপন করিবার অধিকার দিলেন। আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলাম। পরে ইনি আমায় রণছোড়জীর শয়নালয়ে লইয়া গিয়া তাঁহার পালঙ্কস্পর্শেরও অধিকার দেন। কিন্তু রণছোড়জীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার সেবা করিয়া তৃপ্তি হয় না—আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যাহা হউক, সেদিন এস্থান ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পাটরাণীর মহলে আসিলাম। ইহা রুক্মিণী দেবীর মহল। এখানে রণছোড়জী এবং রুক্মিণীদেবীর মূর্ত্তি। পরে তৃতীয় পাটরাণী সত্যভামাদেবীর মহল হইয়া অবশেষে চতুর্থ পাটরাণী জাম্ববতীর গৃহে গেলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহলের ন্যায় এখানেও রণছোড়জী ও জাম্ববতীর মূর্ত্তি দর্শন হইল। যে জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়া, কালক্ষেপ না করিয়া ছুটিয়া আসিলাম, তাহা আজ সফল হইল—রণছোড়জীকে উপরিউক্ত চারিটি পাটরাণী যুক্ত হইয়া বিরাজমান দেখি। নয়ন সার্থক ও জীবন ধন্য জ্ঞান করিলাম।

রণছোড়জীর সেবার অধিকার যথাক্রমে চারিটি রাণীর একমাসকাল হিসাবে নির্দ্ধারিত আছে। যে সময় যে রাণীর পালা, তখন সেই রাণীর মোহান্ত শ্রীভগবানের সেবা করেন এবং সেই রাণীর ভাঁণ্ডার হইতে ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক রাণীর একটি মোহান্ত এবং একটী অধিকারী নিযুক্ত আছেন। মোহান্ত ভগবানের সেবা করেন এবং অধিকারী মোহান্তের আদেশানুসারে ভাণ্ডারাদির পরিচালক—উভয়েই বল্লভাচারী বৈষ্ণব সাধু। আমি যে সময় আসিয়াছিলাম, তখন লক্ষ্মীদেবীর পালা; অতএব উক্ত যুবক মোহান্তের সেবার অধিকার।

আমার অবস্থানকালে প্রতিদিন দুইসন্ধ্যা রণছোড়জীর দর্শন ও সেবা করিতে যাইতে লাগিলাম। মোহান্তজীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে তিনি একদিন শ্রীভগবানের নানাবিধ উপাদেয় মহাপ্রসাদ সহকারে আমার নিকট মীরাবাইয়ের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা-

প্রসাদ দিয়া নানা কথার পর অধিকারীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য এবং কলহের কথা উত্থাপন করিলেন। ফলতঃ তাঁহার কথায় প্রতীয়মান হইল, অধিকারী নীচপ্রকৃতির লোক, তাহার চরিত্রদোষ আছে এবং মোহান্তজীকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া তাঁহার অধিকার নিজহস্তে লইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে ও তাঁহাকে নানাপ্রকার উৎপীড়িত করিয়া তুলিতেছে; এমন কি রাজদরবার পর্য্যন্ত মামলা চলিয়াছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

হাসি

ওই মধুর হাসি,
বীণার তারে সুরের মত
যায় এ প্রাণে ভাসি।
ওই হাসিটি আলোর মত
করছে ঝলমল্,
প্রাণে আমার ফুটিয়ে তোলে
রঙিন ফুলদল।
ওই হাসির আলোক পেয়ে
রবির কিরণ ধারা
ইন্দ্রধনুর রঙিন আভা
ফুটায় প্রাণে তারা।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সতী লক্ষ্মী

কল্যাণি তব হিয়ার মাধুরী যত্নে পুণ্যে গড়া,
হিন্দুর দীন সংসারখানি আজো মহিমায় ভরা।
ত্যাগে তব ভোগ, বিলাস তোমার নিজসুখ বলিদানে,
বিরাজ পুণ্য আত্মার মত সমাজের দেহে প্রাণে।
বেদনা তোমায় পীড়িতে যাইয়া লভিয়াছে পরাজয়,
সাধনা তোমার সংসারে দেয় আশা বল বরাভয়।
অলস লালসা ধূলি হলো তব রাঙা চরণের তলে,
নারীর সরম রতন-পরম শিরোভূষা হয়ে জ্বলে।
মোহন মধুর দোহন ধারায় শিশু-কলতান মাঝে,
পার্ব্বণ ব্রতে অতিথির হিতে তোমার গরিমা রাজে।
তোমারে বেড়িয়া পুষ্পিত আজে সকল মমতা মায়া
স্বচ্ছ হৃদয়ে চিরন্তনের চরণ-কমল ছায়া।
তব মঞ্জুষা সিন্দুর ঝাঁপি স্পর্শমাণিকে ভরা
তোমার কণ্ঠে পুরাণ বার্ত্তা দিনের ক্লান্তিহরা।
মহাকাব্যের মহানদী দুটী, সতীর মহিমা গেয়ে
আঘাতিয়া পড়ে তব চিত্তটে, পূত তুমি তায় নেয়ে।
সতীর, সীতার চরণচিহ্ন হৃদয় ফলকে আঁকা,
রাজপুত নারী জহর অনলে উজ্জ্বল তব শাঁখা।
তব মঙ্গল সন্ধ্যাদীপের আলোকে দৃষ্টি পেয়ে,
আজিও পরুষ পুরুষ হৃদয় ভক্তিতে রয় চেয়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

শেষ জিৎ

(গল্প)

তবে আজও চিঠি আসে নাই। উর্ম্মিলা ক্ষুণ্ণমনে কিছুক্ষণ উদাসনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, ফিরিয়া আসিয়া আবার রুগ্না মাতার পদতলে বসিল।

পদতল হস্তস্পৃষ্ট হওয়ায় মা চক্ষু মেলিলেন, কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কটা বেজেছে?" ঘড়ির দিকে চাহিয়া উর্ম্মিলা বলিল, "দশটা।" "ডাক আসেনি?" নতমুখে উর্ম্মিলা বলিল,—"এসেছে, চিঠি নেই।" "আজও চিঠি আসেনি?"—রুগ্না পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। চিন্তার মলিন ছায়া তাঁহার রোগ-শীর্ণ মুখ আরও কাতর করিয়া তুলিল।

দশ দিনের কড়ারে তিনি মেয়েকে আনিয়াছিলেন। দশ দিনের স্থানে তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অন্য মেয়েদের দূরে বিবাহ হইয়াছে, তাহারা সকলেই আপন আপন সংসার লইয়া আবদ্ধ, 'কোলপোঁছা' ছোট মেয়েটিকে ইচ্ছামত আনিতে পারিবেন বলিয়াই ঘর বরের বিশেষ কিছু খোঁজ না লইয়া এত কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন।

ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে শয্যাগত করিয়া ফেলিল; শেষ জীবনের অবলম্বনটুকু পরের হাতে সঁপিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এ সময় তাহাকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে পারিলেন না,—ভয়, পাছে শেষ মুহূর্ত্তে তার মুখখানি আর দেখিতে না পান।

আজ কাল করিয়া সময় যতই চলিয়া যাইতে লাগিল ওদিকে কর্তৃপক্ষ ততই অসহিষ্ণু হইয়া কড়া কড়া চিঠি লিখিতে লাগিলেন। বৈবাহিকের শেষ চিঠিতে লেখা ছিল—"পত্রপাঠ যদি আপনার কন্যাকে রাখিয়া যাইতে পারেন, উত্তম; অন্যথা আমরা অন্য ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইব, কেননা আমাদেরও ত সংসারের কাযকর্ম্ম চলা চাই।" উর্ম্মিলা তখন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেও, বৈবাহিকের পত্রের অবমাননা করিতে সাহস না হওয়ায় জ্বরগায়েই তাঁহারা মেয়েকে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু মেয়ে বাঁকিয়া বসিল; বলিল, "এই জ্বরগায়ে আমি যেতে পারব না, যা ইচ্ছে তারা করুক।" অগত্যা উর্ম্মিলার পিতা কন্যার পীড়ার সংবাদ জানাইয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন। যে কন্যা অন্নপথ্য পাইবামাত্র কন্যা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। পত্রের কোন উত্তর না আসায় তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কথা রক্ষা করার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

যে সাহসে উর্ম্মিলা সেদিন "যা খুসী তাঁরা করতে পারেন" বলিয়াছিল, সে সাহস যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা এই একমাস ওপক্ষের চিঠিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হইয়া দেখা গিয়াছে; সাহসের যে বাঁধনে সে বুক বাঁধিয়া রাখিয়াছিল সে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল; ভীতিতে সে স্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। লোকে কথায় বলে—খুঁটী শক্ত থাকলে ঝড়ের ভয় নেই। মেয়েদের সাহস বলিতে যা কিছু বুঝায় সে সমস্তই স্বামীর ভালবাসার উপর নির্ভর করে। তার স্বামী যে কত দুর্ব্বলচেতা তাহা তার অবিদিত নাই—এক্ষেত্রে পিতা মাতা, স্ত্রীর বিপক্ষে যাহাই কেন বলুন না, নির্ব্বিচারে সে তাহাতে সায় দিবে। তার পর উর্ম্মিলার প্রেমের একনিষ্ঠ সাধকও সে নয়। তার বিদ্যার দৌড় ম্যাট্রিকুলেশনের পঞ্চম শ্রেণী অবধি; নিজের গ্রাম ছাড়া কখনও এক পা দূরে যায় নাই। নিকৃষ্ট ইয়ার মণ্ডলী, তাস, পাসা ও গঞ্জিকার সাহচর্য্য ছাড়া শিক্ষিত ভদ্র সমাজে মেলা মেশা বা উচ্চ বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগও সে পায় নাই। লোকে কথায়

বলে "মূর্খের অশেষ দোষ"। ফণিভূষণের চরিত্রের আরও একটি প্রধান দোষ ছিল, স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি; উর্ম্মিলার সৌন্দর্য্য সে সন্দেহের ইন্ধন যোগাইত। "নষ্ট আঙ্গুল দিলে ঘি, নষ্ট বাপের বাড়ীর ঝী" এই গ্রাম্য প্রবাদটীরও সে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিত এবং সেই বাক্যের নজির অনুসারে সে স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে ঘোর আপত্তি করিত। মেয়েরা যে পিত্রালয়ে একটু স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা করিবে ইহা তার চোখে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হইত; তার বিশ্বাস, স্ত্রীজাতি অতি অপদার্থ, জুতার তলা এবং কড়া শাসন ছাড়া ইহাদিগকে সায়েস্তা করিবার অন্য উপায়ই নাই।

রুগ্না মাতার অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইয়া তাঁহার রোগজীর্ণ বক্ষ অশ্রু-প্লাবিত করিয়া উর্ম্মিলা সেই দিনই বৈকালের ট্রেণে মোহনপুর যাত্রা করিল। সঙ্গে চলিল জ্ঞাতি ভ্রাতা অবিনাশ।

আর মাকে দেখিতে পাইবে কি না? এই বোধ হয় শেষ। মা কি আর এ যাত্রা ফিরিবেন? মার রুগ্ন মূর্ত্তি ও বিদায় কালে তাঁহার বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি উর্ম্মিলার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গাড়ীর জানালার উপর মথা দিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। যখন অনুভবে বুঝিল যে কামরার অনেকগুলি চক্ষুর উৎসুক দৃষ্টি তাহার উপর আবদ্ধ হইয়াছে, আর "মেয়েটির কি হয়েছে গা?" "শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে বুঝি?" "হ্যাঃ—আজকালকার মেয়েরা আবার শ্বশুর বাড়ী যেতে কাঁদে! কে জানে কি হয়েছে বাপু!" ইত্যাদি মতামত ও মন্তব্য যখন তার কাণে গেল, তখন সে কাপড়ে চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিল। খোলা জানালার বাহিরে রেল পথের ধারের শ্যামল শস্যক্ষেত্র, বিস্তৃত প্রান্তর, গ্রাম, নদী, পুষ্করিণী সব ছায়াচিত্রের মত তার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগিল—কিছুই আজ তার নয়ন ও মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। ট্রেণ উন্মত্ত মত্ত মাতঙ্গের বলে উদ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

২

'মো-হন্—পু—উ—র' কাণে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই উর্ম্মিলার বুকের রক্ত যেন জমাট হইয়া উঠিল। তবে সত্যই সে আবার আসিয়াছে! কখন যে গতি মন্দ হইয়া ট্রেণ থামিয়া গিয়াছে তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই। "নেমে এস।"—সর্ব্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করিয়া সে নামিয়া অবিনাশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও তাহারা তাহার জন্য ডুলি পাঠান নাই—একটি লোকও তাহাকে লইতে ষ্টেশনে আসে নাই। তাহার প্রতি শ্বশুরবাড়ীর এই অবহেলা ও অশ্রদ্ধা অবিনাশের নিকট প্রকাশ পাওয়ায় সে বড় সঙ্কুচিত হইল। সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"এই ত কাছেই বাড়ী, পথেও লোকজন ত বেশী নেই, চল অবিনাশ দা হেঁটেই যাই তাঁরা বোধ হয় তার পান নি।"

ডুলি পাওয়া না গেলেও একজন লোক ত তাঁহারা ষ্টেশনে পাঠাইতে পারিতেন। এমন ত কখনও হয় নাই।—মাত্র ত দশ মিনিটের রাস্তা! উর্ম্মিলার মনে কেমন একটা ভয় জাগিয়া উঠিল; হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে ভয় ক্রমে উদ্বেগে পূর্ণ হইল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল। সূর্য্যদেব অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রক্তাম্বরের প্রান্তভাগ তখনও দেখা যাইতেছে। অদূরে কুটীরে জোনাকির মত প্রদীপগুলি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। ঐ তো আমবাগানের পাশেই তাহাদের বাড়ী। তাহাদের বাড়ী! গৃহের নিকট আসিয়া উর্ম্মিলার পা দুইটা যেন বিশ মণ পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড একটা ফুটবল হাতে সারা গায়ে কাদা মাখা সুরেনকে সেই পথে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া উর্ম্মিলা তাহাকে ডাকিল। বিস্মিত বালক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"মামীমা সেই গিয়েছিলে—আর এই এলে?" সে দিকে কাণ না দিয়া উৎকণ্ঠিতা উর্ম্মিল কি একটা কথা বালককে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল। বিজ্ঞের মত

মাথা হেলাইয়া বালক বলিল—"গেলেই বুঝতে পারবে।"

মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ে ছাওয়া তিনখানি ঘর, একখানি গরু রাখিবার চালা, মাঝখানে মাটির নিকানো ক্ষুদ্র উঠান—বাড়ীর বাহিরে বাঁশের বেড়া। কম্পিত পা দু'খানিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া উর্ম্মিলা যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে গৃহপ্রাঙ্গণ প্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বড় ঘরের দাওয়ায় কুশাসনে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। সাত হাতি কাপড়, তাও আবার মাটিতে লুটাইবার ভয়ে যথাসাধ্য হাঁটুর উপর তুলিয়া, পা-ভরা কাদা লইয়া শ্বশুর মহাশয়ও সেই মাত্র ঘরে ফিরিয়াছেন। অনাহুত ভাবে বধূকে আসিতে দেখিয়া প্রথমে উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিলেন। তাহার দিকে একবার দারুণ উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী আহ্নিকে মনঃসংযোগ করিলেন এবং শ্বশুর মহাশয় গাড়ু, গামছা লইয়া পুকুর ঘাটে হাত মুখ ধুইতে চলিয়া গেলেন।

অপরাধীর মত উঠানের এক কোণে উর্ম্মিলা তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ও বাড়ীর শান্তিলতা কলসী কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সেই অবস্থায় তখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—"মা গো, বৌটা সেই এসে অবধি সমানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে উঠ্‌তে বস্‌তেও কেউ বলেনি? কেমন ধারা লোক তোমরা কাকিমা? যাও বৌদি, হাত-পা ধুয়ে ঘরে যাও।" শ্বশুরগৃহরূপ দুস্তর মরুপ্রান্তরে উর্ম্মিলার একমাত্র শান্তির প্রস্রবণ ছিল এই শান্তিলতা। এই মেয়েটির সাহচর্য্যটুকুই ছিল উর্ম্মিলার বাস করিবার পক্ষে যা কিছু সান্ত্বনার—আর ইহার নিকট আপন মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিত।

অন্য বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে বধূর এই প্রীতিটুকু শাশুড়ী ও ননদিনী যামিনীর চোখে একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এবং সময় সময় ইহার জন্য উর্ম্মিলার লাঞ্ছনারও অবধি থাকিত না। ঘাটে জল আনিতে যাইবার সময় উর্ম্মিলাকে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, জল লইয়া ফিরিয়াও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া শান্তির ধৈর্য্য সীমালঙ্ঘন করিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী আহ্নিক ভুলিয়া রুদ্ধ রোষে ফুলিতেছিলেন, অন্তরনিরুদ্ধ রোষাগ্নি এইবার বহির্মুখী হইবার পথ পাইল। তিনি শান্তির উপর গর্জ্জিয়া উঠিলেন - "মুখ সাম্‌লে কথা ক'স, বাড়ী বয়ে ঝগড়া করে আসিস, লজ্জা করে না? বউয়ের উপর যদি এত দরদ নিয়ে যা না—"

"উপায় থাকলে নিয়ে যেতুম বৈ কি"—বলিতে বলিতে শান্তি কলসী কক্ষে চলিয়া গেল।

শাশুড়ীর রোষাগ্নি এইবার উর্ম্মিলার পিতা মাতা ও এই 'উটমুখী' বৌটার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সংসারের তিনি যদি কেহ হইতেন, তাঁহার কথা যদি থাকিত, তা হ'লে এতদিন নিশ্চয়ই তিনি তাঁর মনোমত বধূ ঘরে আনিতেন ও এই 'আবাগের বেটী'কে দিয়ে সতীনের পদ প্রক্ষালন করাইতেন, এইরূপ বলিলেন।

"মানিমা, মানিমা, কোলে"— বলিতে বলিতে একটি ক্ষুদ্র শিশু নিশ্চেষ্ট উর্ম্মিলাকে জড়াইয়া ধরিল। শিশুর কোমল স্পর্শে উর্ম্মিলার সকল দ্বিধা, কুণ্ঠা এক নিমেষে দূরে গেল। তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে চুমা দিতে দিতে সে ঘরে প্রবেশ করিল। এদিকে যামিনীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—"ওরে হতভাগা ছেলে, কোলে চড়বার আর লোক পাওনি, তাই মানিমার কাছে গেছ আদর জানাতে।"

৩

প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল। পিত্রালয় হইতে আসিয়া সে মাত্র দুইখানি চিঠি পাইয়াছিল। আজ এক মাসের উপর রুগ্না মায়ের খবর না পাইয়া উর্ম্মিলার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আর যে একখানা চিঠি সে লিখিবে, সে উপায়ও তাহার ছিল না। দিন কয়েক হইতে তার বালিসের নীচ হইতে চাবির রিংটি অদৃশ্য হইয়াছে—পিতার দেওয়া দুই চারিখানা খা

পোষ্ট কার্ড ও দুই চারিটি টাকা পয়সা সবই যে বাক্সে বন্ধ। সময় সময় শান্তি এ অভাব পূরণ করিত সেও শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গিয়াছে। চাবি হারাইয়া সে এ কি মুস্কিলে পড়িল!

দুপুর বেলা বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সে ধীরে ধীরে শাশুড়ীর ঘরে যাইয়া চাবি খুঁজিতে লাগিল। দেওয়ালে ঝুলান তক্তার উপর ধামা, কাঠা, শিশি, বোতলগুলি সরাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তক্তার পাশ দিয়া ঝনাৎ করিয়া চাবির রিংটি মেঝেয় পড়িয়া গেল! হারানিধি পাওয়ার মত সে খপ্ করিয়া চাবিটি তুলিয়া লইয়া, নিদ্রিতা ননদের মুখের দিকে পলক মাত্র চাহিয়া আপন ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু বাক্স খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। টাকা পয়সা দূরের কথা, একখানি পোষ্টকার্ডও তাহার মধ্যে নাই।

ক্ষুণ্ণমনে বাক্স বন্ধ করিয়া উর্ম্মিলা চাবি লুকাইয়া রাখিল, কেননা এই চাবি পাওয়া ব্যাপার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা মহা অনর্থের সূত্রপাত এখনই হইবে; নিজে চাবি লুকাইয়া রাখিয়া যে সে বাড়ীশুদ্ধ লোককে চোর অপবাদ দিয়াছে, এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সহজে হইবে না।

উর্ম্মিলা ঘরের বাহির হইতেই দেখিল, বড় ঘরের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া যামিনী চোখের সম্মুখে একখানা চিঠি মেলিয়া ধরিয়া আছে। যামিনীর কিন্তু বর্ণ-পরিচয় জ্ঞানও নাই। কথাটা হাসির হইলেও এক্ষেত্রে উর্ম্মিলার হাসি মোটেই আসিল না। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তবে আজও তার চিঠি নাই। রোজই যে সে মায়ের খবর পাইবার জন্য চিঠির আশায় থাকে।

তার চিন্তাচ্ছন্ন মনে সহসা একটা আশার হিল্লোল খেলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুহলও জাগিয়া উঠিল। লেখার ভঙ্গিটা দূর হইতে অস্পষ্টভাবে তার চোখে পড়িল। লেখাটি তার বাবার হাতের লেখার মত। হয়ত তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই তার চিঠিগুলি তাহাকে না দিয়া ইহারা নষ্ট করিয়া ফেলে। দেখিতে হইবে কার চিঠি। ঘর ঝাঁড় দিবার উপলক্ষ্য করিয়া সে ঝাঁটাগাছটি হাতে করিয়া যামিনীর নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'কার চিঠি দেখি দিদি।" তাহাকে আসিতে দেখিয়াই যামিনী চিঠি ও খামখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়াছিল, গম্ভীর মুখে বলিল—"কেন তোমার ছাড়া কি এ বাড়ীতে আর কারু চিঠি আসতে নাই নাকি?" বিনীতা উর্ম্মিলা বলিল—"না, তা কেন আস্‌বেনা; এ চিঠি কি ঠাকুর জামাইয়ের? কেমন আছেন তিনি, চিঠিখানা একবার দেখাবেনা দিদি?" যামিনী তাহার কথার অর্থ বিকৃতভাবে ধরিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং নানারূপ ভর্ৎসনায় তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া, ফণি আসিলে তাহাকে বলিয়া বৌকে জব্দ না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। ইতোমধ্যে গৃহিণীর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনিও আসিয়া কন্যার সহিত যোগ দিলেন এবং সে ব্যক্তির "উত্তর শিয়রী"র সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহার মেয়েদেরও এ ভিটায় পা দেওয়া মিটিয়া যাইবে এ ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে ভুলিলেন না।

আরও কতদিন কাটিয়া গেল। জল আনিতে গিয়া পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে বিস্তৃত মাঠ ও ভিন্ন গ্রামের গাছপালার অস্পষ্ট রেখার দিকে চাহিয়া উর্ম্মিলা কত কি ভাবিত; ভাবিত ঐ গ্রামখানার ওপারে কিছুদূর গেলেই ত হরিপুর রেল ষ্টেশন, ইচ্ছা করিলে আজ রেলে উঠিয়া আবার আজই মার কাছে পৌছিতে পারে। আঁকা বাঁকা মেঠো পথে কৃষক বালকেরা মন খুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে গরু লইয়া ফিরিত; সে তাহাদের দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিত, আহা ওরা কত স্বাধীন, কত সুখী, ইচ্ছা করিলে এই সন্ধ্যার ট্রেণেই হরিপুর পৌছিতে পারে। ঐ ত মাঠের পাশ দিয়াই রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে।

৪

প্রায় ছয়মাস উর্ম্মিলা ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। মাসের অধিকাংশ দিনই জ্বরে শয্যাগত থাকে। আজ

এক সপ্তাহের উপর তার প্রবল জ্বর। বৈকালের দিকে দারুণ পিপাসায় শয্যা ছাড়িয়া সে বাহিরে আসিল। শাশুড়ী ননদের মধ্যে যে এখনই একটা আলোচনা চলিতেছিল এবং তাহাকে দেখিয়াই তাঁহারা তাহা চাপিয়া গেলেন তাহা সে বুঝিল। একটা নিদারুণ আশঙ্কায় সহসা তার বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমার মা কি নেই?" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া শাশুড়ী উত্তর করিলেন—"কি জানি তোমার মা আছে কি মরেছে তার আমরা কি জানি?"

"ও মা গো" বলিয়া উর্ম্মিলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "ভর সন্ধ্যে বেলা এ আবার কি অলুক্ষুণে কাণ্ড গো"—রবে শাশুড়ী ননদ উভয়েই গর্জ্জিয়া উঠিলেন। উর্ম্মিলা কাঁদিতে কাঁদিতে পুকুর ঘাটের দিকে ছুটিয়া গেল।

সহসা পুষ্করিণীর পাড়ের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে দেখিল আমবাগানের পাশ দিয়া কে একজন যাইতেছে। লোকটির মুখ দেখা না গেলেও পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। সে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে দমন করিয়া একটু আগাইয়া গিয়া ডাকিল—"অবিনাশ দা।" লোকটি ফিরিয়া বলিল—"কে, উর্ম্মিলা?" অবিনাশ নিকটে আসিলে তার পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া উর্ম্মিলা বলিল—"মা কেমন আছেন অবিনাশ দা?"

উর্ম্মিলার মা আজ দুই দিন স্বর্গগতা। ছোট মেয়েটিকে কাছে পাইলে এই সময় শোকাকুল বৃদ্ধ পিতার মনে একটু সান্ত্বনা আসিতে পারে এই বলিয়াই অবিনাশ তাহাকে লইতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মত দেন নাই। একটু থতমত করিয়া অবিনাশ বলিল—"কাকিমা তেমনি আছেন, অনেক দিন তোমার খবর না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে আমায় দেখতে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা যদি ছেড়ে দেন ত নিয়ে যাবারও কথা ছিল।" তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে একবার দেখা না করিয়াই সে চলিয়া যাইতেছে—অনুযোগপূর্ণ স্বরে উর্ম্মিলা বলিল—"আমায় দেখতে এসেছ, অথচ দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলে যে?"

অবিনাশ একটু মুস্কিলে পড়িল। তাহাকে লইতে আসিবার অপরাধে এই মাত্র তার উপর যে অভদ্রোচিত ব্যবহার ইঁহারা করিয়াছেন, তাহা কি উর্ম্মিলা জানে না? বালিকার জ্বরতপ্ত শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তার বড় দুঃখ হইল, কোন কথাই মুখ হইতে বাহির হইল না; শুধু মনে হইল—হায় বঙ্গঘরের বালিকাবধূ, অকারণে কত লাঞ্ছনা কত গঞ্জনা তোমাদের নীরবে সহিতে হয়!

তাহাকে নীরব দেখিয়া উর্ম্মিলা বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি অবিনাশ দা, তুমি এখনি যেওনা, আমি যেমন করে পারি ওঁদের মত নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব।"

তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া অবিনাশ সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাঁদিস্‌নে, আচ্ছা ততক্ষণ আমি এই দিকে একটু ঘুরে বেড়াই, যদি তাঁদের অনুমতি পাস চেষ্টা করে দেখ।"

"তা হ'লে তুমি যেওনা, আমি এখুনি আস্‌ছি।" বলিয়া উর্ম্মিলা গৃহের দিকে ছুটিল।

এই সময় কে একজন সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া গাছের আড়ালে আড়ালে চলিয়া গেল, উর্ম্মিলা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি যে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী দিবেন না ইহা নিশ্চয় জানিয়াও তাহার আশা ক্ষুণ্ণ হইল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যে ষ্টেশনে পৌছিতে হইবে, নহিলে রাত্রি দুইটার এদিকে আর ট্রেণ নাই।

আজ কয়েক দিন সে জ্বরের জন্য চুল আঁচড়াইতে পারে নাই; এই জটা বাঁধা রুক্ষ চুল দেখিলে তার মা কত দুঃখিত হইবেন। তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সাজ সজ্জায় অবহেলা যে তাঁর বড়ই অপ্রীতিকর। চুল বাঁধিয়া কাপড় ছাড়িয়া সে এইবার শাশুড়ীর পায়ের তলায় আছড়াইয়া পড়িল। ফল কিছুই হইল না, কেবল শাশুড়ীর তিক্ত কণ্ঠের কতকগুলি ভাষা পুরস্কার

লাভ করিয়া সে আপন ঘরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

আশা মানুষকে ছাড়িতে চাহে না। স্বামী ঘরে আসিলে তাঁহার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া সম্মত করাইয়া তাঁহাকে লইয়া সে পিত্রালয় যাইবে। বিবাহের পরে এই এতদিনের মধ্যে সে তো তাঁহাকে কোন অনুরোধ করে নাই। রাত্রি বারটা অবধি জাগিয়া থাকিয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল বুঝিল না। স্বপ্নে দেখিল তার মাকে খাটে করিয়া যেন কাহারা লইয়া যাইতেছে, তাঁর সমস্ত দেহ লাল কাপড়ে মোড়া, কেবল মুখখানি অনাবৃত, ললাট সিন্দুর রঞ্জিত। "মা কোথা যাও মা" বলিয়া সে যেন সেই শ্মশান যাত্রীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল; হঠাৎ মায়ের সেই মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ যেন কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তিনি তাহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন—"আয় মা, আমার কাছে আয়।"

সহসা মা-মা বলিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। জাগিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার, সে মেঝেতে মাটীর উপর পড়িয়া আছে, চোখের জলে ভেজা মাটী তার গালে ও চুলে লাগিয়া রহিয়াছে।

অনুভবে বুঝিল নিকটেই তক্তপোষে তাহার স্বামী নিদ্রিত। উর্ম্মিলা আজ কয়দিনের জ্বরে অনাহারে মানসিক উদ্বেগে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছে, স্বামী তাহার স্বচক্ষে এসব দেখিয়াও অবিচলিত চিত্তে আরামে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন!

উর্ম্মিলার অবসন্ন দেহে আবার তড়িৎ-শিখার মত উত্তেজনার তরঙ্গ খেলিয়া গেল। সে উঠিয়া নিদ্রিত স্বামীর পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি, ওগো আমার মা বুঝি নেই, তোমার পায়ে পড়ি আমার মাকে একবার দেখাবে চল।"

কোন সাড়া নাই। কিছুক্ষণ পরেই, কুকুর বিড়ালের মত পদতলে লুণ্ঠিতা রুগ্না স্ত্রীকে ফণিভূষণ পা দিয়া ঠেলিয়া বলিয়া উঠিল "আমায় স্পর্শ করিস্‌নে দ্বিচারিণী অবিশ্বাসিনী কোথাকার!"

একি? কি কথার কি উত্তর? বীরপুরুষ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর—দূর হয়ে যা!"

মুহূর্ত্তে উর্ম্মিলার চোখের জল শুকাইয়া গেল। কম্পিত স্বরে কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তার সে অস্ফুট কাতর উক্তি ফণিভূষণের তীব্রকণ্ঠের মধ্যে ডুবিয়া গেল—"মিথ্যা বলে আর পার পাবে না। আমি নিজের চোখে আজ সব দেখছি—ও মায়া কান্নায় আর তা চাপা পড়বে না গো। হুঁ তুমি মনে কর্ত্তে আমি লেখাপড়া শিখিনি বলে কিছু বুঝি না—কেমন? আজ ধরে ফেলেছি কি না?"

ফণী বলিতে লাগিল, "ভরসন্ধ্যে বেলা কোন্ কুলবধূ আমবাগানে দাঁড়িয়ে পুরুষ মানুষের সঙ্গে হাসি তামাসা করে? আমি ধাঁধা দেখে সব মিছে বল্‌ছি, কেমন?"

কথাটা পরিষ্কার হইবার সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কার বোঝাটা যেমন হাল্কা হইয়া গেল, তেমনি উর্ম্মিলার বুক ক্রোধে ও ঘৃণায় ভরিয়া গেল। তবুও এই অমূলক সন্দেহ স্বামীর মন হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাহাকে লইতে আসিবার ঘটনাটির উল্লেখ করিবার সে চেষ্টা করিল—কিন্তু, কম্পিত ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। এই সময় ফণী পুনরায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি তোমায় চাই না এ কথা অনেকবার বলেছি—সে তুমি রাগ করে বাপের বাড়ী যাও কি যমের বাড়ী যাও যা খুসী কর্ত্তে পার। কাল গ্রামের পাঁচ জনকে ডেকে আমি সব কথা পরিষ্কার করে বলে তোমাকে ত্যাগ করবো এ নিশ্চয়। এতে আমায়ও কেউ দোষ দিতে পার্ব্বে না। আপাততঃ আমায় একটু ঘুমুতে দাও, কাল আবার ঘোষগাঁয়ের বাবুদের বাড়ী থিয়েটার কর্ত্তে যেতে হবে।"

উর্ম্মিলার মস্তিষ্ক ইতঃপূর্ব্বেই স্বাভাবিক অবস্থার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছিল, বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা

এখন তার ছিল না। স্বামীর শেষ কথাগুলি ঠিক যেন মৃত্যুর আহ্বানের মতই তার কাণে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মাদের মত গৃহত্যাগে করিয়া একেবারে পুকুর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মহত্যা রূপ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি তার মনে ভীষণ ভাবে জাগিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে পিচ্ছিল মেটে ঘাটে সে দ্রুত নামিতে লাগিল। ঝিল্লি-মন্দ্রিত কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার রাশি এই সময় তাহাদের আপন জাল বিস্তার করিয়া, আকণ্ঠ নিমগ্না ঊর্ম্মিলার দেহের চারি পাশ যেন জড়াইতে লাগিল। সে ডুবিতে পারিল না।

পুনরায় ঘাটের উপর উঠিয়া আসিতেই মাঠের অপর প্রান্তের কতকগুলি লাল ও সবুজ আলোক রেখা অকস্মাৎ তার চোখে পড়িল। সে আলোকে তার আত্মহত্যা প্রবৃত্তি নিবিয়া গেল। ঊর্ম্মিলার মনে হইল যেন তাহারা তাহাকে ডাকিতেছে—এস-এস। বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা-বালিকা কি এক দারুণ উন্মাদনার বশে মাঠ ভাঙ্গিয়া সেই দিকে ছুটিতে লাগিল।

ষ্টেশনে তখন দুইটার মেল ট্রেণ শত উজ্জ্বল দীপ বক্ষে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঊর্ম্মিলা যখন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আসিয়া পৌঁছিল, তখন ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে সহসা সেই চলন্ত গাড়ীর পা দানিতে পা দিয়া হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল। ঠাণ্ডার জন্যই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, অধিকাংশ যাত্রী গাড়ীর জানালাগুলি তখন বন্ধ। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না বা তাহার কম্পিত কণ্ঠের অস্ফুট স্বরও শুনিতে পাইল না।

* * * *

"আটাটা না বাজ্‌লে বড় মানুষের বেটীর ঘুম ভাঙ্গে না?" বলিতে বলিতে ঊর্ম্মিলার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বধূর গৃহদ্বারে গিয়া তিক্তস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"কি গো, আজ কি উঠবে না?"

অন্য দিনের মত আজ আর ত্রস্তভাবে ঊর্ম্মিলা মাথার কাপড় টানিতে টানিতে বাহিরে আসিল না। পুত্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "বউকে উঠিয়ে দে না, কায কর্ম্ম হবে কখন?"

এবারেও কোন সাড়া না পাইয়া তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন। অর্গলহীন দরজা খুলিয়া গেল। তক্তপোষের উপর ফণিভূষণ নিদ্রিত বধূ ঘরে নাই। নিদ্রিত পুত্রের গায়ে ঠেলা দিয়া বলিলেন, "বৌ কোথা রে?"

তন্দ্রাজড়িত স্বরে সে বলিল—"বৌ, বৌ কোথা তার আমি কি জানি?"

"সে তো বাড়ীতে নেই"—এই সময় ফণিভূষণের তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রের ঘটনা মনে পড়িল। সে বিছানায় বসিয়া দুই চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"বাড়ীতে দেখ কোথাও আছে।"—শঙ্কা জড়িত স্বরে গৃহিণী বলিলেন—"না, কোথাও সে নাই।"

আম বাগান হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহের প্রতি কোণ খুজিয়াও বধূর সন্ধান মিলিল না।

ইতোমধ্যে হুজুকপ্রিয় প্রতিবেশীবর্গও আসিয়া জমা হইয়াছিল এবং ফণিভূষণের মুখে গত রাত্রির বিবরণ শুনিয়া আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। অতঃপর যদি সে ফিরিয়া আসে, তবে আর তাহাকে 'গৃহে স্থান দেওয়া হইবে না বলিয়া তীব্র সমালোচনা চলিতেছিল। এই সময় কে একজন উপস্থিত হইয়া বলিল, গত রাত্রে একটী স্ত্রীলোক রেলে কাটা পড়িয়াছে।

পরিচিত অপরিচিত জনমণ্ডলী-বেষ্টিত ফণিভূষণ মৃতা পত্নীকে সনাক্ত করিতে গেল। এত দিনের পর আজ এই সে প্রথম ভাল করিয়া স্ত্রীর মুখ দেখিবার অবকাশ পাইল। সে মৃতা স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই পায়ের উপর দিয়া ট্রেণ চলিয়া গিয়াছিল; মুখখানি অবিকৃত; সে মুখ সফলতার হাসির রেখায় উদ্ভাসিত।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

অশোক-যুগের মথুরা

১। বিতর্ক মুদ্রায় উপবিষ্ট অশোক চিত্র

পৌরাণিক যুগে বজ্রনাভের পর মথুরা কোন্ রাজার অধীন হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে কর্ণ, গোনর্দ্দ ও প্রমোদ নামে তিন জন রাজা কিছুদিন এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। বিষ্ণু ও বায়ু পুরাণে লিখিত আছে যে, মথুরা এক সময়ে সাতজন অনার্য্য নাগ রাজগণের রাজধানী হইয়াছিল। তাঁহারা সর্প-বিভূষিত দেবমূর্ত্তির পূজা করিতেন। এরূপ কয়েকটা মূর্ত্তি মথুরায় পাওয়া গিয়াছে। সে সকল কথা পরে বলিব। অভিনিষ্ক্রমণ নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, সুবাহু নামে একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজা মথুরায় রাজত্ব করিতেন বলিয়া বুদ্ধদেব এস্থানে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তৎপরে ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধদেবের পর মথুরায় কোন্ কোন্ রাজা আধিপত্য করেন তাহা অজ্ঞাত, তবে মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে যে মথুরা প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্ত কোন রূপ কীর্ত্তিকলাপ মথুরায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ আজিও পাওয়া যায় নাই। তাঁহার পৌত্র সম্রাট অশোক যে মথুরায় তিনটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে কথা হিয়ঙ্ সাঙের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অশোকস্তম্ভে যেরূপ মাথলা দেখা থাকে, তদনুরূপ মাথলা দেওয়া কয়েকটা অপেক্ষাকৃত ছোট স্তম্ভ মথুরার কঙ্কালী টিলার নিকট পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি হয়ত কোন দেবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। অশোকের বহু পূর্ব্ব হইতেই মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময় হইতেই সমগ্র ভারতে, কোথাও বা ভারতের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত বৌধর্ম্ম বিস্তৃতিলাভ করে। সম্রাট্ অশোকের আদেশক্রমে বৌদ্ধস্তূপ, চৈত্য, সংঘারাম প্রভৃতি বিশেষভাবে যে শিল্পকলা বিভূষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আজি পর্য্যন্ত ভারতের
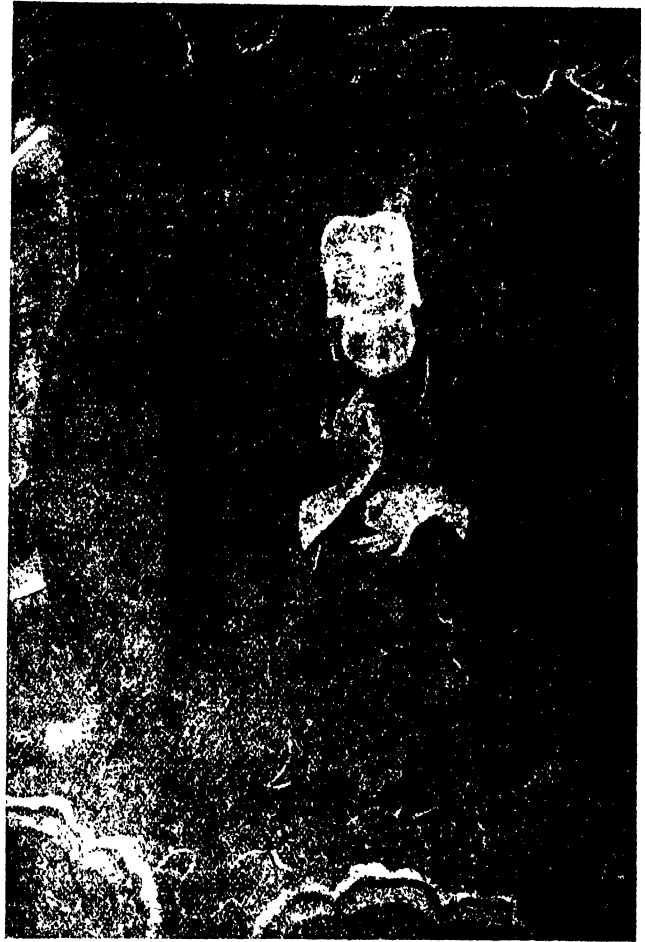
নানাস্থানে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। কালের কঠোর অপরিহার্য্য শাসনে বা রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-বিপ্লবে সেই সকল কীর্ত্তিগুলি কোথাও ম্লান ও ভগ্ন, কোথাও বিনষ্ট, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়াছে। মথুরার অদৃষ্টেই বা সে অলঙ্ঘ্য-লিপি বিফল হইবে কেন? মথুরা নিবাসী বৌদ্ধস্থবির যশ ও সনবাসের বিশেষ কোন আখ্যান পাই নাই। প্রথমে সম্রাট্ অশোকের ইতিহাস দিয়া, পরে তাঁহার গুরু ও উপগুরুর পরিচয় দিব।

বলিতে কি, সম্রাট অশোকের উদ্যোগে ও প্রযত্নে

২। লুম্বিনী গ্রামে অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ

বৌদ্ধধর্ম্ম রাজ-ধর্ম্মে পরিণত হইয়া, একসময়ে, বৈদিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে অধঃকৃত ও হীনপ্রভ করিয়া দিয়াছিল। জাতি-বিচারের বালাই না থাকাতে সে সময়ের অধিকাংশ রাজারা পর্য্যন্ত সানন্দে বৌদ্ধধর্ম্মে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সাধারণ প্রজাগণের ত কথাই নাই।

অশোক

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯৭ বৎসরে মৌর্য্যসম্রাট্ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার পাটলিপুত্র নগরে পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সুভদ্রাঙ্গী নাম্নী ব্রাহ্মণজাতীয়া মহিষীর গর্ভে অশোকের জন্ম হয়।* যৌবনারম্ভে অশোক সিন্ধুনদ সমীপে পশ্চিম প্রস্থে তক্ষশিলা নগরে বিদ্রোহ দমন জন্য পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি সুনিপুণ রাজনীতিবলে, নির্ভীক কৌশলে ও বিনারক্তপাতে বিদ্রোহ দমন করেন। তৎপরে কিছুকাল রাজপ্রতিনিধি রূপে মধ্যভারতের উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া বাস করেন। তথায় অবস্থান কালে দেবী নাম্নী একটী শ্রেষ্ঠীকন্যার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই উজ্জয়িনী বা বিদিশা নগরে দেবীর গর্ভে অশোকের মহেন্দ্র নামে একটী পুত্র ও সঙ্ঘমিত্রা নামে একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তাঁহার পিতা বিন্দুসারের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে সম্রাটের ১০১ পুত্র হইয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। তাহাদের মধ্যে সুষীম সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া সিংহাসনের অধিকারী হইবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল এবং যুবরাজ পদেও তাঁহাকে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সুষীমের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে, মল্লাতক ও রাধাগুপ্ত নামে দুইজন প্রধান অমাত্য এবং অপরাপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও জাতক্রোধ হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৩ অব্দে যখন বিন্দুসারের পরলোক-প্রাপ্তি হয়, তখন সুষীম দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমনার্থে

* সুভদ্রাঙ্গীর নামে এই আখ্যায়িকাটি শুনিতে পাওয়া যায়।—সুভদ্রাঙ্গীর পিতা, দৈবজ্ঞ মুখে ইঁহার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী সন্তান হইবে শুনিয়া, ইঁহাকে রাজবাটীর দেবালয়ে সেবিকারূপে রাখিয়া দেন। রত্নাবলী নাটকের সাগরিকার ন্যায় মহিষীরা ইঁহাকে রাজার নয়ন-পথ হইতে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিতেন। দৈবযোগে একদা রাজা বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিতে পাইলেন, ও তাঁহার রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে যাতার দাসীভাব ও মনঃক্লেশ ঘুচিল। তদবধি সুভদ্রাঙ্গী অ-শোক (বিগতশোক) হইলেন এবং পুত্রের নাম অশোক রাখিলেন।

সুদূর তক্ষশিলায় অবস্থান করিতে-ছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব-কথিত বিরক্ত অমাত্য ও রাজপুরুষেরা ষড়যন্ত্র করিয়া অশোককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সুষীম পিতৃ-বিয়োগবার্ত্তা অবগত হইয়া, যখন পাটলিপুত্র নগরে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে মন্ত্রি-গণের চক্রান্তে জলদগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কেহ কেহ ইহাতে অশোকের ইঙ্গিত ছিল বলিয়া নিন্দাও করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, অবশিষ্ট ৯৮ জন রাজকুমার (অশোকের ভ্রাতারা) সম্রাটের ছলে বলে কৌশলে অচিরকাল মধ্যেই বিনাশপ্রাপ্ত হ'ন। সেইজন্য লোকে তাঁহাকে প্রথমে 'চণ্ডাশোক' আখ্যা দিয়াছিল। কেবল তাঁহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠভ্রাতা তিষ্য এই ভীষণ হত্যা-ব্যাপার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। ইহাঁর নামে আরও নানারকম নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে।

৩। বুদ্ধগয়ার মন্দির

সে যাহা হউক, বিন্দুসারের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে গৃহকলহ মিটিয়া গেলে খৃঃ পূঃ ২৬৯ অব্দে জৈষ্ঠমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে শুভমুহূর্ত্তে সম্রাট্ অশোক পাটলি-পুত্র নগরে মহাসমারোহে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া-ছিলেন। রাজ্যলাভের ৮ বা ৯ বৎসর পরে সম্রাট্ স্বয়ং বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে কলিঙ্গদেশঃ জয় করিতে গিয়াছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়, এবং অর্দ্ধলক্ষ লোক সম্রাটের নিকট বন্দী হয়। সম্রাট নিজনয়নে এইরূপ অমানুষিক নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরভাবে অগণিত নর-হত্যা দেখিয়া মনে মনে বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিবেকের অঙ্কুশাঘাত পড়িতে লাগিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, অচিরকাল মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন। সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার পর এই কারুণ্য পূর্ণ কথাগুলি তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত যৌগড় ও ধৌলি
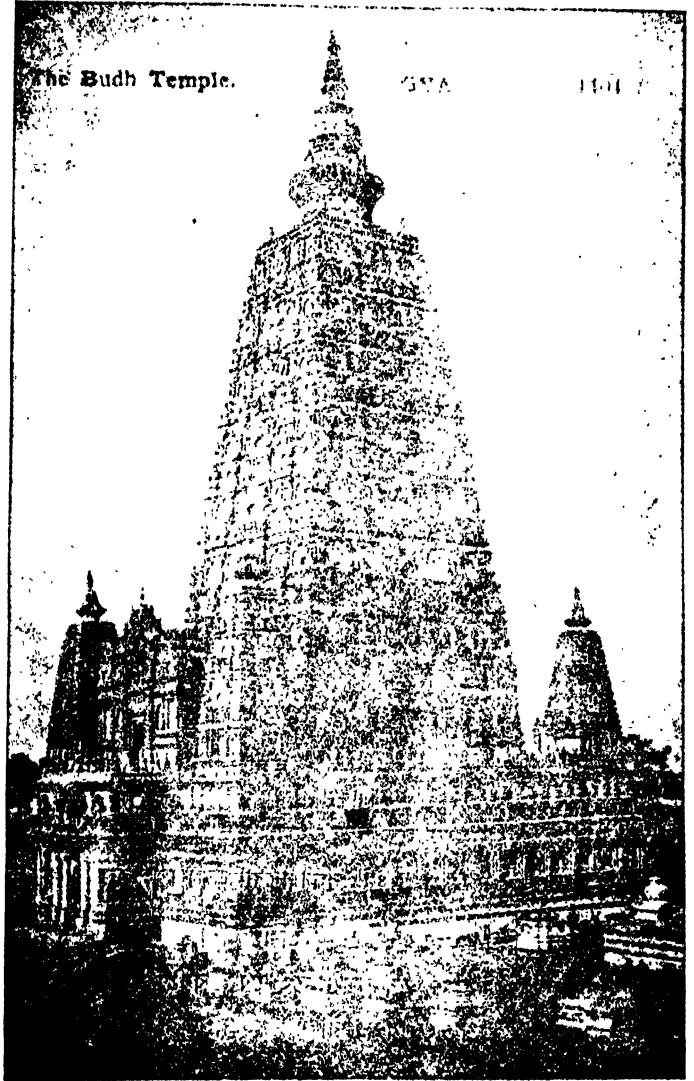
নামক স্থানের স্তূপদ্বয়ে চিরতরে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন :—

"যেহেতু কোন স্বাধীন রাজ্য জয় করিতে হইলে অসংখ্য প্রাণিহত্যা, জীবন নাশ, এবং বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী;—তাহা পবিত্রচেতা সম্রাটের গভীর দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিঙ্গ বিজয়ে যে সমস্ত লোক হত, আহত, বন্দী ও তৎপরে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার শতাংশের বা সহস্রাংশের এক অংশ মাত্র লোক বিনষ্ট হইলেও এক্ষণে কারুণ্যপূর্ণ সম্রাটের গভীর মর্ম্মবেদনার কারণ হইবে।"

এই কলিঙ্গবিজয়ের পর হইতে তিনি আর কখনও যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে এতদূর অনুতাপ ও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত শান্তি সাম্য মৈত্রীময় ধর্ম্মের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া শান্তি লাভের প্রয়াসী হইলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নবীন শ্রমণ 'নিগ্রোধের' মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া হিংসাবহুল ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপাসক বা গৃহস্থবৌদ্ধরূপে কয়েক বৎসর যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি ভিক্ষুরূপে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে মানস করেন।*

এই সময়ে উপগুপ্ত নামে একজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধ মহাস্থবির মথুরানগরে অবস্থান করিতেছিলেন। অশোক লোক পাঠাইয়া নৌকাযোগে তাঁহাকে পাটলিপুত্রে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার নিকট ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে বৌদ্ধসম্রাট্

৪। বুদ্ধগয়া বোধিদ্রুম মূলে বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব

* ফাহিয়ান বলেন যে অশোক পূর্ব্বজন্মে বালকবেশে অন্য কোন দানযোগ্য দ্রব্য না পাইয়া, বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্রে ধূলিমুষ্টি দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাহাতেই প্রীত হইয়া বালককে আশীর্ব্বাদ বা ভবিষ্যদ্-বাণীরূপ বলিয়াছিলেন যে সেই বালক পরজন্মে রাজা হইয়া ৮৪০০০ স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন। চৈনিক পরিব্রাজক আরও লিখিয়াছেন যে, সম্রাট অশোক একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে পুরিয়া একজন বৌদ্ধ যতীক অতিশয় উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। পরে অনুশোচনাবশে তাঁহারই নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, এই ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

নিজগুরু উপগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলাস্থানগুলি স্বচক্ষে পরিদর্শনজন্য তীর্থযাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি গণ্ডকীতীরে বৈশালীতে গিয়াছিলেন। এই বৈশালীতে জৈনগণের শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর স্বামীর জন্ম হইয়াছিল। এখানে বুদ্ধদেবও কিছুকাল অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। এখানে 'লিচ্ছবি' বংশীয় বৃজ্জীগণের বাস ছিল। নিকটেই রামগ্রামে বুদ্ধদেবের শরীর-ধাতুর উপর স্তূপ নির্ম্মিত পড়েন। মথুরায় এই বৌদ্ধ ভিক্ষু যশের একটি বিহার ছিল। সে সকল কথা পরে বলিব।

তৎপরে অচিরাবতী নদীর তীরে কুশীনগরে উপস্থিত হন। এইস্থানে শালতরু মূলে বৈশাখী পৌর্ণমাসী তিথিতে ৮০বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। চৈনিক পরিব্রাজকেরা এখানে অশোক নির্ম্মিত ২০০ফুট উচ্চ স্তূপ ও একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। এখানে সে সময়ে মল্লজাতীয় লোকেরা বাস করিত।
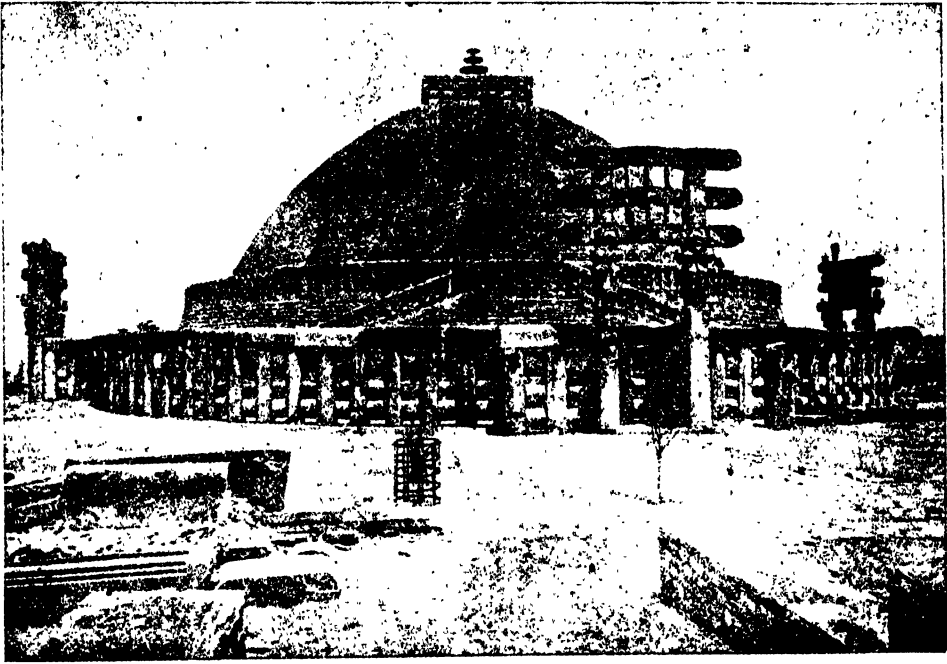
৫। অশোক নির্ম্মিত সাঁচিস্তূপ

ছিল, পরে অশোক এইস্থানে একটি সিংহশীর্ষ স্তম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের প্রায় শতাধিক বৎসর পরে যশ নামে একজন মথুরাবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া 'দশ বস্তু' নিষেধ করিলে, বৃজ্জিগণ তাঁহার উপর অত্যাচার করে। যশ অহোগঙ্গ পর্ব্বতে যাইয়া রেবত নামক মহাস্থবিরকে লইয়া আসেন। এখানকার বালুকা বিহারে ২য় মহা ধর্ম্ম সংগীতি সমবেত হয়। এবং তদবধি বৌদ্ধগণ ১৮ দলে বিভক্ত হইয়া

লুম্বিনী উদ্যান ;—

গোরক্ষপুর হইতে কাপ্তেনগঞ্জ ষ্টেশনে যাইতে হয়। তথা হইতে ছয় সাত মাইল দূরেলুম্বিনী উদ্যান—আধুনিক "রুমিনী দেয়ী"। এস্থান নেপালরাজ্য এলাকায় বা নিকটে। একটী অনুচ্চ টীলার উপর একখানা ছোট ঘরের ভিতর প্রাচীরগাত্রে মায়াদেবী ও প্রজাবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ইহাদের পার্শ্বে দুইটা অস্ত্রধারী পুরুষেরও মূর্ত্তি আছে। ইহা হইতে কিছু নিম্নভূমিতে একটী পাষাণ স্তম্ভগাত্রে পালিভষায় যাহা খোদিত আছে

তাহার অর্থঃ—"দেবগণের প্রিয় রাজা অশোক স্বীয় রাজত্বের বিংশতি বৎসরে (খৃঃ পূঃ ২৪৯) স্বয়ং এখানে আগমন করিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। এইস্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য এস্থান পাথরে রেলিং দিয়া ঘেরিয়া দিলাম ও একটী স্তম্ভ স্থাপিত করিলাম। এবং এই স্থান ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলিয়া এই লুম্বিনী গ্রাম নিষ্কর হইল, এবং অষ্টভাগীয় রাজস্বের অধিকারী হইল।" নিকটে একটি অণ্ডাকৃত শুষ্ক সরোবর আছে। অল্প দূরে "দানো" নামে সংকীর্ণ-গিরিনদী বহিয়াছে। এ সমস্ত স্থান এখন জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। অশোকের নির্ম্মিত রেলিং অদৃশ্য ; এখন কেবল ভগ্নশীর্ষ স্তম্ভটা প্রায় ২২০০ বৎসর যাবৎ শীতাতপ ও বৈরীগণের উপদ্রব সহ্য করিয়া আহত প্রহরীর মত আজিও দাঁড়াইয়া আছে। এখনকার লোকেরা নারী মূর্ত্তি দুইটীকে রুক্মিণী নামে হিন্দু দেবী বলিয়া পূজা করে।

৬। সারনাথে অশোক-নির্ম্মিত ধামেক স্তূপ

কপিলাবস্তু—

গণ্ডকী ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গম প্রদেশকে বস্তি জেলা বলে। তাহার উত্তর-পশ্চিমভাগে বর্ত্তমান 'ভুইলা' বা নগরখাস্‌গ্রামে এখনও পুরাতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আছে। ফাহিয়ান বলেন, কপিলাবস্তু, কোশল, ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের উপর অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন ও সংঘারাম প্রভৃতির ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেন। কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র বিরুঢ়ক বা বৈদুর্য্য কপিলাবস্তু ধ্বংস করেন। হিয়েন্থসাং সপ্তম শতাব্দীতে এখানে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী—

রামায়ণের মতে ইহাই লবের রাজধানী শরাবতী। ইহা রাপ্তি নদীর দক্ষিণ তীরে, বর্ত্তমান নাম 'সাহেৎ-মাহেৎ'। এখানে সহস্র মহাশালা নামক গৃহে বুদ্ধদেব অমৃতোপম উপদেশ দিয়া সহস্র সহস্র নরনারীকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। নিকটে তাঁহার মাতৃস্বসা প্রজাবতীর নির্ম্মিত বিহার ছিল। তাহার কিছুদূর দক্ষিণে তাঁহার কোটিপতি শিষ্য অনাথপিণ্ড

প্রদত্ত বিখ্যাত জেতবন বিহারে বুদ্ধদেব ২৫ বৎসর ছিলেন ও অধিকাংশ সময় উপদেশ দিতেন। এখানে বৃষ চূড় ও ধর্ম্মচক্র শোভিত দুইটী বৃহৎ স্তম্ভ হিয়াঙ্গসং দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অপর কয়েকটী স্তূপ ও ছোট ছোট স্তম্ভ ছিল।

উরুবিল্ব—

গয়া হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে, নৈরঞ্জনা (ফল্গু) নদীতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষ (বোধিদ্রুম) মূলে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এখানে অশোক যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে, অমরসিংহ নামে অপর একজন বৌদ্ধরাজা তাহার সংস্কার করিয়া দেন। মন্দিরটী ভগ্ন ও মৃত্তিকাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল; প্রায় ৫০ বৎসর হইল ইংরাজ অনেকটাকা ব্যয় করিয়া মৃত্তিকাখনন ও মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরমধ্যে অশোকনির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। তৎপশ্চাতে বজ্রাসন আছে। ইংরাজী আমলে স্থাপিত এখানে একটী ক্ষুদ্র যাদুঘরের ভিতর স্তম্ভ রেলিং মূর্ত্তি প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ সকল সংগৃহীত হইয়াছে।

ঋষিপতন—

এখানে বুদ্ধদেব পঞ্চশিষ্যকে উপদেশ দিয়া প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অশোকনির্ম্মিত ধামেক স্তূপ আছে। ইহার চারিদিকের মৃত্তিকা খনন করিয়া বৌদ্ধদিগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ সকল সংগৃহীত হইয়া একটী যাদুঘরে স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি মঠ ও ভবনাদির ভিত্তিসকল স্থানে স্থানে বাহির হইতেছে। কেশরীত্রয়-মুকুটিত স্তম্ভের ভগ্নখণ্ডসকল, ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সম্রাটের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার বর্ত্তমান নাম সারনাথ, বরাণসী হইতে ৭মাইল উত্তরে অবস্থিত।

কোশাম্বী—

প্রয়াগ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে যমুনা তীরে অবস্থিত। রামায়ণের মতে এ নগরী রামতনয় কুশ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে জৈনগণের মন্দির আছে। ললিত বিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোশাম্বীর রাজা উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য। বুদ্ধদেব এখানে তিন বৎসর বাস করিয়াছিলেন, তাই এটি বৌদ্ধতীর্থ। উদয়ন রাজা বুদ্ধদেবের রক্তচন্দন নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তি

১। পারখাম গ্রামে প্রাপ্ত যক্ষমূর্ত্তি

স্থাপন করেন। হিয়ঙ্গ সাঙ্ সে মূর্ত্তিটী ও অশোক প্রতিষ্ঠিত একটী স্তম্ভ এখানে দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফেরোজসা তোগলক সে স্তম্ভকে প্রয়াগ দুর্গে লইয়া যান, এখন দুর্গমধ্যে এলেনবরা ব্যারাকে তাহা রহিয়াছে। ফিরোজসা আম্বালার ডোপরা গ্রাম হইতে আর একটী অশোক স্তম্ভ আনিয়া ১৩৫৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে স্থাপিত করেন।

এইরূপে সম্রাট অশোক, গুরু উপগুপ্তের সহিত, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধগণের লীলাপ্রচার ভূমিসকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে, পাটলিপুত্রে অশোকারাম বিহারে বৌদ্ধগণের ৩য় মহা-ধর্ম্ম-সঙ্গীতি আহূত হয়। প্রথমে মৌদ্গলিপুত্র তিষ্য সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য কুমার মহেন্দ্রকে সভাপতি পদে বসাইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই সভায় ভণ্ড, ছদ্ম ও অধার্ম্মিক বৌদ্ধগণকে রাজাশ্রয় হইতে বঞ্চিত, ও সংঘ হইতে বিতাড়িত করা হয়। ইহা লইয়া সভায় একটা গোলযোগ বাঁধে। শেষে তিষ্য আসিয়া সমস্ত মতভেদ মীমাংসা করিয়া দেন। সম্রাট্ অশোক হীনযান বা রক্ষণশীল (Conservative) সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত কঠোর বিধি নিষেধগুলি যাহাতে সম্যক্‌রূপে ও অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি-পালিত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যদি কোনরূপে কেহ তাহার অনুমাত্র লঙ্ঘন করিত, তবে তাহাকে পীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে শ্বেতবাস পরাইয়া, সংঘ হইতে দূর করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

অশোক যখন কপিলাবস্তু নগর হইতে নেপালে যাত্রা-করেন, তখন তাঁহার বিধবা কন্যা চারুমতি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। অশোক নেপালে মেঞ্জুপাটন, বা ললিতপটন নামে একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার নির্ম্মিত ৫টী স্তূপ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবা কন্যা, পিতার দেখাদেখি, নিজ স্বামী দেবপালের নামে, 'দেবপাটন' নামে একটী নগর সংস্থাপন করেন। চারুমতি পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরে একটী বৌদ্ধমঠে ভিক্ষুণী বেশে শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। অশোকের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা, পিতার আদেশক্রমে, বুদ্ধদেবের দেহভস্ম ও বোধিদ্রুমের শাখা লইয়া, সিংহলে ধর্ম্ম-প্রচারজন্য গিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণ হইতে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, প্রভৃতি হইয়া ভারতের দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ও সামন্তরাজগণকে দিয়া, এক-দিকে রাজকার্য্য পরিচালনা ও অপরদিকে বৌদ্ধসঙ্ঘের ধর্ম্মকার্য্যগুলি পরিদর্শন করিতেন। তিনি একাধারে সম্রাট্ ও বৌদ্ধস্থবিররূপে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। চণ্ডাশোক নামের পরিবর্ত্তে, এই সময়ে প্রজাগণ পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ধর্ম্মাশোক আখ্যা দিয়াছিল।

অশোক বাল্যকালে শিবোপাসক ছিলেন। তখন শাক্তগণের মত ইঁহার পাকশালায় নানাবিধ জীব হত্যা করিয়া সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা হইত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর, দুইটী ময়ূর ও একটী মৃগমাত্র ইঁহার ভোজনজন্য সংগৃহীত হইত। ইহার পর খৃঃপূঃ ২৫৭ অব্দ হইতে ইঁহার রন্ধনশালামধ্যে প্রাণিহিংসা একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছিল। ইনি জীব-হত্যার বিষয়ে এতদূর কঠোর বিধি দিয়াছিলেন যে, সামান্য কীটকে পর্য্যন্ত কেহ হত্যা করিলে, তাহাকে নরহত্যা-করার ন্যায় দণ্ডভোগ করিতে হইত। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা মৃগয়া ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করিতেন; অশোক তৎপরিবর্ত্তে গ্রামপরিদর্শন, লোকহিতসাধন, সাধু ও তীর্থ দর্শনে গমন, দান, ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও কথনে আনন্দ অনুভব করিতেন।

পাষাণস্তম্ভ গাত্রে ইঁহার অনুশাসনগুলিতে পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি, সর্ব্বজীবে সদয় ব্যবহার, আত্মীয়স্বজনে প্রীতি প্রভৃতি নীতিবাক্যগুলি খোদিত আছে। এমন কি অপরের ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পরে শ্রীহর্ষদেবকে এই অশোকের সাধুজীবনের অনুকরণ করিতে দেখিতে পাই। স্তম্ভগাত্রে খোদিত অনুশাসন বা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিধিগুলির মধ্যে কোথাও কোন দেবতা বা ঈশ্বরের নামোল্লেখ না থাকিলেও, তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মোপদেশের অভাব নাই। ইঁহার মতে মানবেরা আপন স্ত্রী, বন্ধু

কর্ম্মজন্য নিজ নিজ ফলভোগ করেন। তাঁহাকে নিজ-কৃত কর্ম্মদ্বারা স্বর্গীয় সুখলাভ করিতে হইবে। ইনি প্রধান প্রধান রাজপথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপ-খনন ও ধর্ম্মশালা সকল সংস্থাপন করিয়া, পথিকগণের ও ভারবাহী পশুদিগের ভ্রমণক্লেশ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন। লোক-চিকিৎসাজন্য ভৈষজ্যবিদ্যার আলোচনা, বৈদ্যশিক্ষা প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করেন। সম্রাট্ অশোকই প্রথমে রুগ্ন পশুদিগের জন্য পিঞ্জরাপোল প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার অনুসাশনগুলি সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিবে বলিয়া তদ্দেশে প্রচলিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকর্ষ ও প্রচার জন্য সম্রাট অশোক নিজ রাজকোষ অকাতরে শূন্য করিয়া, রঘুর ন্যায় 'মৃৎ-পাত্র শেষ' হইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস ঘোষণা করে। ইঁহার দুইজন মহিষী ছিলেন। প্রথমা দেবী বা অসন্ধিমিত্রা, ইঁহার গর্ভজাত পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে চলিয়া যান। দ্বিতীয়া চরুবাকী বা তিষ্যরক্ষিতা, ইঁহার গর্ভে তিবর নামে পুত্র হইয়া অল্পবয়সে গতায়ু হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩০ অব্দে পরিণত বয়সে অশোকের নির্ব্বাণ লাভ হয়। তৎকালে ইঁহার কোনও পুত্রসন্তান জীবিত না থাকায় কুণালের • পুত্র "সম্প্রতি" সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ ও ও দশরথ নামে অপর একজন পৌত্র পূর্ব্বদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। 'সম্প্রতি' জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মথুরা তখন ইঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। 'সম্প্রতি' মথুরায় নিজ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, এবং রাজা জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মথুরার প্রজাদিগের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল কি না, সে কথা ইতিহাসে পাই নাই। তবে ইঁহার সময়ে মথুরায় জৈনধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সে কথাটী সহজেই অনুমেয়। মথুরার ধ্বংসাবশেষ মধ্য হইতে এরূপ কয়েকটী শিলালেখা পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অশোকের বহুপূর্ব্ব হইতে মথুরায় বৌদ্ধ ও জৈনগণের অস্তিত্ব ছিল, তবে অশোকের সময় হইতে সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব বলেন যে, "দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী"র পূরা নাম অশোক বর্দ্ধন্। তাঁহার উপর যে অমানুষিক ভ্রাতৃহত্যার অপবাদ দেওয়া হইয়া থাকে, সেটা সর্ব্বৈব অমূলক ও বিরুদ্ধ পক্ষীয়-গণের ঈর্ষাপ্রসূত। কেন না অশোকের অনুশাসন মধ্যে তাঁহার কোন কোন ভ্রাতা বা ভগিনীগণের তৎকালে জীবিত থাকিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট্ অশোক যে সমস্ত স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণে মহীসুর ও বোম্বাই হইতে প্রয়াগ বারাণসী হইয়া, গান্ধারের খাইবার্ পাশ পর্য্যন্ত ভারতের নানা প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সিরিয়া, মিশর, মাসিডোনিয়া, ইপিরাস্ প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী স্থানেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকল্পে অনেক প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কেবল ভারতে নহে—ইঁহার উদ্যোগে, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা বলেন যে, সম্রাট নিজগুরু উপগুপ্তের প্রমুখাৎ, ভগবান বুদ্ধদেব চৌরাশী হাজার ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন শুনিয়া, চৈত্য, স্তূপ, বিহার, স্তম্ভ প্রভৃতিতে সেই সংখ্যা পুরণ করিয়া দেন। তিনি নবীন যৌবনে, রাজপ্রতিনিধিরূপে গান্ধারের অন্তর্গত তক্ষশিলা ও পুরুষপুরে, তৎপরে বিদিশা বা উজ্জয়িনীতে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ সকল স্থানে তিনি যেসকল স্তূপ ও স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিদিশাসন্নিহিত 'সাঁচী'র স্তূপটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও অক্ষত। কিন্তু হায়! চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার যে সুরম্য প্রাসাদের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দুরন্ত কালের করালদন্তে চর্ব্বিত, ভগ্ন, এবং গঙ্গার পলীমাটিতে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিয়াঙ্‌সাং ভারতে অশোক-নির্ম্মিত ১৬টি স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখন কেবল

১০টী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলা হয়ত বিপক্ষ বা বিধর্ম্মীরা চূর্ণ বা রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছে। কোন কোন স্তম্ভ প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ, ও ওজনে প্রায় ১৫০০ মণ হইবে। কাহারও চূড়ায় সিংহ, হস্তী, বৃষ বা ময়ূর প্রভৃতি জন্তুগণের প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন তিনি যেসকল গিরিলিপি শিলা-লিপি বা পর্ব্বতগাত্রে গুহ্য-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়ছিলেন তাহার সংখ্যা হয় না। 'বরাবর' পর্ব্বতগাত্রে 'আজীবক' ভিক্ষুগণের জন্য যেসকল গুহা-গৃহ খনন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পালিশ আজিও যেন টাট্‌কা রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও শিল্পকলা বিশারদ পণ্ডিত-গণের মত এই যে, খৃষ্টের সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের সময় হইতেই ভারতের ভাস্কর-বিদ্যা ও তক্ষণশিল্পের সমধিক উন্নতি আরম্ভ হয়। আর তৎপূর্ব্বে এদেশে প্রস্তরশিল্প যে ছিল না, তাহা নহে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পকলাগুলের সময় আজিও নির্ণীত হয় নাই। ভারতের লোকেরা স্বর্ণ ও রজত শিল্পে যতটা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন; পাষাণ-তক্ষণে ততদুর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। তৎকালে পাষাণ তক্ষণ শিল্পে, সুন্দরভাবে প্রকৃতির অনুকরণকারী গ্রীক্‌দিগের সমকক্ষ কেহই, ছিল না। সম্রাট্ অশোক ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বাহ্লীক্ হইতে শিল্পিগণকে আনাইয়া অভিনব প্রণালীতে স্তম্ভ ও স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে পারস্য-শিল্পেরও কিছু কিছু সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়ার মধ্য ভাগ হইতে, বিভিন্ন সময়ে, নানাদেশীয় বর্ব্বর আক্রমণকারীরা আসিয়া, বহুবার ভারতের উত্তর পশ্চিমভাগ লুণ্ঠন করিয়া যাহা কিছু উৎকৃষ্ট শোভন ও বহুমূল্য শিল্পকলা বা ভাস্করকার্য্য খচিত দ্রব্য সামগ্রী ছিল তাহা লইয়া গিয়াছে। তাহাদের লুণ্ঠনের পর, অল্প যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহা হইতেই তক্ষশিলা, পুরুষপুর, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে, গ্রীক্‌-দিগের কয়েকটী ভগ্ন নমুনা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বিদিশার একটা মন্দিরে স্তম্ভগাত্রে গ্রীক্‌শিল্পী হেলিওডোরসের নাম খোদিত আছে। কুশানবংশীয় শকরাজাগণেরাও গ্রীক্‌শিল্পিগণকে ভারতের নানাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। গ্রীক্ ও ভারতীয়গণের সম্মিলনে গান্ধার-শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

অশোক প্রবন্ধের চিত্র পরিচয়

১ নং চিত্র—এখানি তিব্বৎ হইতে আনীত 'টঙ্কে' (পতাকায়) অঙ্কিত, বিতর্ক মুদ্রায় উপবিষ্ট, অশোকের চিত্র। এখানি এখন কলিকাতার আর্ট গেলারিতে আছে।

২ নং চিত্র—লুম্বিনী গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ। পশ্চাদ্ভাগে উচ্চ ভূমির উপর রুম্মিনীদেবীর গৃহে দেখা যাইতেছে।

৩ নং চিত্র—উরুবিল্বে (বোধ্‌গয়ায়) বোধিদ্রুম পার্শ্বে অশোক নির্ম্মিত মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া গেলে, অমরসিংহ নামে একজন বৌদ্ধরাজা তাহা মেরামত করিয়া দেন। তাহাও কালবশে ধ্বংস মুখে পতিত হইবার উপক্রম হইলে, ইংরেজরাজ ইহার যেরূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, এখানি তাহারই চিত্র।

৪ নং চিত্র—বোধিদ্রুমতলে কুলুঙ্গীর ভিতর রক্ষিত বুদ্ধমূর্ত্তি। সম্মুখে বজ্রাসন রহিয়াছে।

৫ নং চিত্র—মালব প্রদেশে উজ্জয়িনী বা বিদিশা নগরীর সন্নিহিত—'সাঁচি' নামক গ্রামে অশোক নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ স্তূপ। কেহ কেহ বলেন,অশোকের প্রথমা পত্নী দেবী বা অসন্ধিমিত্রার পিত্রালয়ে এই গ্রাম ছিল এবং অশোক তাঁহারই অনুরোধে এই শিল্পকলা-বিভূষিত স্তূপটী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উপরের ছত্র, পরিক্রমা পথ, ও রেলিংয়ের কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ইংরাজরাজ যেরূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন ইহা তাহারই চিত্র। উপরের পরিক্রমা পথে, উঠিবার সোপান দেখা যাইতেছে।

৬ নং চিত্র—এখানি ঋষিপত্তন বা সারনাথে, যেখানে বুদ্ধদেব পঞ্চশিষ্য মধ্যে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের স্মরণ জন্য অশোক নির্ম্মিত ধামেক স্তূপ। সংস্কারের পূর্ব্বের চিত্র।

৭ নং চিত্র—এখানি মথুরা সন্নিহিত প:র্খাম গ্রাম হইতে কানংহাম্ সাহেব কর্ত্তৃক আনীত যক্ষমূর্ত্তি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই একটী মাত্র মূর্ত্তিকে অশোকের বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তীকালের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

আলোচনা

"আস্থায়ী" ইত্যাদি

সঙ্গীত সম্বন্ধে বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে "আস্থায়ী" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ শব্দটি সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এখানে তাহাই বলিতেছি।

শাস্ত্র-সম্মত গানে চারিটী চরণ বা কলি থাকে—"আস্থায়ী", অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। "আস্থায়ী"টি প্রথম চরণ বা কলির নাম। আমার মনে হয় ঐ শব্দটি বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী গায়কগণের মুখে অপভ্রষ্ট উচ্চারণ—"স্থায়ী" স্থলে "আস্থায়ী"। বহুকাল হইতে তাঁহারাই বাঙ্গালীর সঙ্গীত-শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ওস্তাদের "আস্থায়ী" শিষ্যের মুখে ও পুস্তক প্রবন্ধাদিতে চলিয়া আসিতেছে। "আস্থায়ী" শব্দের কোন অর্থই হয় না। তবে বাঙ্গালী গায়কদের মুখে ও লেখায় ঐ শব্দের ব্যবহার থাকায় "প্রকৃতিবাদ অভিধান" উহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। যে কলিকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়, তাহাকে "স্থায়ী" নাম দেওয়াই সঙ্গত। কারণ, তাহা ধ্রুব পদেরই মত। বেহার ও পশ্চিমাঞ্চলবাসী অনেকের মুখে "আস্কন্দ" পুরাণ শুনিয়াছি। উহা স্কন্দপুরাণের তদ্দেশীয় উচ্চারণ। অবশ্য সংস্কৃতে শিক্ষিতদের মুখে ঐরূপ উচ্চারণ না হইতে পারে। আমি মঠধারী "পণ্ডিত" ও বাবাজীদের মুখে ঐরূপ উচ্চারণ শুনিয়াছি। "স্নান" স্থলে "আস্নান" সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের দেশেও লিখিত স্ক-কলা ও স্ক-কলা মুখে "আস্ক"-কলা ও "আস্ক"-কলা হইয়াছে। আমার মনে হয়, ঐরূপে স্থায়ীও "আস্থায়ী" হইয়াছে।

সঙ্গীতে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি ভ্রষ্ট উচ্চারণ বাঙ্গালী গায়কদের মুখে শুনা যায়—খড়জ বা খরজ, ঋখব ও নিখাদ। পশ্চিমাঞ্চলে "ষ"-কারের সাধারণ উচ্চারণ "খ"-কারের মত। ওস্তাদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া বাঙ্গালী গায়ক-বাদকেরাও ষড়জকে "খড়জ" বা "খরজ", ঋষভকে "ঋখব" (লেখায় "রিখব" বা "রেখাব") এবং নিষাদকে "নিখাদ" বলিয়া থাকেন। শেষের দুটি ভ্রষ্ট উচ্চারণ লেখাতেও দেখা যায়। আমার বোধ হয় এই সব শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া বলা ও লেখা উচিত। বিশেষজ্ঞ লোকেরা বিচার করিয়া দেখিবেন বলিয়া এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ইতি।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

চিতোরের রাণা সমরসিংহ

ভাদ্রের মানসীতে (১৫।১৬ পৃঃ) চিতোরের রাণা সমরসিংহ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্যিকরা তাঁহাকে এখনও দিল্লীর শেষ হিন্দু নৃপতি চোহান পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। টড তাঁহার পুস্তকে ঐ কথা চন্দ বরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসো হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বহুকাল হইল প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, চন্দ বা চাঁদ নামক কোন কবি পৃথ্বীরাজের সভাতে বর্ত্তমান ছিলেন না। যে পুস্তকখানি "পৃথ্বীরাজ রাসো" নামে প্রচলিত, সেখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা। আমি যখন প্রথমে রাসো পড়ি, তখন তাহার কয়েকটি উক্তিতে সন্দেহ হইয়াছিল। যথা

১। রাসোতে আতর শব্দ আছে, অথচ জাহাঙ্গীরের সময়ে নূরজাহানের মাতা আতর আবিষ্কার করেন। তাহার পূর্ব্বে আতর নামক কোন বস্তু ছিল না।

২। রাসোতে আছে যে সমরসিংহ পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করিতে আসিবার পূর্ব্বে আপনার দ্বিতীয় পুত্র রত্নসিংহকে অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের ভাগিনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুম্ভ নাকি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দাক্ষিণাত্যে বিদর নগরে মুসলমান বাদশার সহচর হইয়াছিলেন। এ কথা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের

ঘটনা, কিন্তু ১২৯১র পূর্ব্বে মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করে নাই। বিদরের মুসলমান-রাজ্য প্রথমে গুলবর্গাতে ১৩৪৭ সনে স্থাপিত হয়, পরে ১৩৮৫ সনে বিদরে যায়। লেখক ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পরের না হইলে একথা লিখিতে পারিতেন না।

৩। মুসলমান ঐতিহাসিক-মতে দুইবার পৃথ্বীর সহিত যুদ্ধ হয়, প্রথম যুদ্ধে মুসলমানেরা হারিয়া যায়, দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বী নিহত হন। কিন্তু রাসোতে কেবল মাত্র এক যুদ্ধের কথা আছে। প্রথম যুদ্ধের উল্লেখ নাই। মুসলমান মতে মুসলমানেরা এক নদীতীরে পৃথ্বীর মৃতদেহ পাইয়াছিল। কিন্তু রাসোতে পৃথ্বীকে গজনীর কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখা যায়। তাঁহার দুই চক্ষু তুলিয়া লওয়া হয় ও কয়েক দিবস পরে তিনি চক্ষুহীন অবস্থায় আপনার শব্দভেদী ক্ষমতা দেখাইবার সময়ে মহম্মদ ঘোরীকে মারিয়া ফেলেন। মুসলমানদের আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই চাঁদ ও পৃথ্বী উভয়ে উভয়ের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। মুসলমান-ইতিহাসে ১২০৬ খৃঃ পর্য্যন্ত ঘোরী জীবিত ছিলেন, পরে একজন গক্করের হাতে মারা যান।

এইরূপ অনেক ভুল রাসোতে আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর হইল চিতোরে সমরসিংহের কতকগুলি দানপত্রের তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বোধ হয়, পৃথ্বীর মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে সমর চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন অতএব পৃথ্বীর সমসাময়িক বা তাঁহার ভগিনীপতি হইতে পারেন না। ঐ এক সমর সিংহ ব্যতীত অন্য কোনও সমরসিংহের নাম চিতোরের রাজাদের তালিকায় নাই।

রাসো খানি আগাগোড়া কল্পিত। ঐ পুস্তক হইতে উপন্যাস বা গল্পে নায়ক-নায়িকা সংগ্রহ করিলে ইতিহাসের অপমান করা হয়।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

পাচক ব্রাহ্মণ

সান্ধ্য ভ্রমণের পরে ধীরে ফিরিলাম গৃহে ;
ছড়িখানি রাখি এক কোণে
আলোক উজ্জ্বল করি সংবাদ পত্রিকা নিয়া
বিশ্ববার্ত্তা পড়ি এক মনে।
সুমিষ্ট পানীয় আনি গৃহিণী ধরিল করে,
শীতল হইনু পান ক'রে
বসিল গৃহিণী কাছে— সংসারের তুচ্ছ কথা
কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে :—
"কমল,—চাকর মেয়ে, চলিল শ্বশুর ঘরে
তার মাতা কাঁদিল কতই,
বীণার বিবাহ হবে, ঢাকাতে পাত্রের বাড়ী—
দিন স্থির—বৈশাখ দশই।
খোকা আজ দুপুরেতে ছড়িটি করিয়া ঘোড়া,
সারা বাড়ী ছুটিয়া ঘুরেছে,
চাকর বামুন যেবা যেখানে ঘুমায়ে ছিল
ছড়ি দিয়া তাহারে তুলেছে।
চিঠি লিখিবার তরে কাগজ কলম নিয়া
বসিয়াছিলাম আমি একা—
বার বার আসি খোকা কলম কাড়িয়া নিল
নাহি হ'ল মোর চিঠি লেখা।
রাগ করে বকিলাম, বলিলাম তুমি এসে
তাহারে মারিবে কাণ ধ'রি,
খিল খিল করি হাসি উঠিল সে দুষ্ট ছেলে,
চুমায় দিলাম তারে ভরি।"
এই সব তুচ্ছ কথা গৃহিণীর কাছে ইহা
বিশ্ববার্ত্তা হতে অতি বড়।
আমারো শ্রবণে ইহা অবশ্য লাগিয়াছিল
বিশ্ববার্ত্তা হতে মিষ্টতর।
এহেন সময়ে মোর পাচক আসিল ঘরে,
কহিল সে অতি সশঙ্কিত—
আসিয়াছে পত্র তার, যাইতে হইবে বাড়ী
মাতা তার কঠিন পীড়িত।
আমি বলিলাম তারে— "তুমি যদি যেতে চাও,
দাও মোরে নূতন ঠাকুর।"
"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মোর পাচক চলিয়া গেল,
গল্প পুন চলিল প্রচুর।

(২)

দিন দুই ঘুরিল সে লোকের সন্ধান করি,
না পাইল পাচক ব্রাহ্মণ
তৃতীয় দিনের শেষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে
আমারে সে কহিল তখন—
আজ পুনরায় তার এসেছে বাড়ীর পত্র
মাতা তার বাঁচে কি না বাঁচে—
তাহারে দেখিবে ব'লে চেয়ে আছে পথ পানে
বড় ভয় দেরী হয় পাছে!
এত বলি সে বালক আসিয়া আমার কাছে
পা' দুখানি ধরিল জড়ায়ে;
"কর কি? কর কি?" বলি বসিলাম উঠে আমি,
"ব্রাহ্মণ হইয়া ধর পায়ে!
তোমারে ত' বলিয়াছি, ঠাকুর আনিয়া দিলে
সেইদিন তুমি ছুটি পাবে
ঠাকুর না পেলে মোর চলিবে কেমন করে
ইহাও ত দেখিতে হইবে!
নূতন বিদেশে তুমি আসিয়াছ, তাই এত
সহজেই হয়েছ কাতর
ভাল হবে মা তোমার, দেখিবে বাড়ীতে গিয়া;
দিন দুই আরও দেরী কর।"

(৩)

"হোম রুল" সভা ছিল, আদালত হতে আমি
ফিরিতেছিলাম সভা দেখি,
রাজনীতি অধিকার তরে অসহিষ্ণু প্রাণ,
নাহি জানি কতদিন বাকি!
নিরক্ষরে শিখাইব, পীড়িতে ঔষধ দিব,
দরিদ্রের দুঃখ ঘুচাইব,
করিতে স্বদেশ সেবা চাহি মোরা অধিকার
নাহি জানি কবে তা পাইব।—
এত ভাবি অন্যমনে প্রবেশিনু গৃহে মোর
চলে' যাই চঞ্চল চরণে
চমকিয়া দাঁড়ালাম— কে যেন কাঁদিছে ওই
বসি অন্ধকার গৃহকোণে!
"কে তুমি বসিয়া হেথা? কাঁদিতেছ কি কারণ?"
শুধালাম তাহারে যখন,
পাচকের কণ্ঠস্বর প্রবেশিল মোর হৃদে
অগ্নিময় শরের মতন,—
"মা আমার মারা গেছে; আর না দেখিতে পাব,
দুখিনী জননী মোর হায়!
আর না শুনিতে পাব সে মধুর কণ্ঠস্বর
দুখে মোর বু ফেটে যায়!
বিদেশ যাইব আমি— কাতর হইল মাতা,
অশ্রুপূর্ণ মুখে কহে মোরে,
'আর কেহ নাহি মোর তুই যদি চলে যাস্
কেমনে রহিব আমি ঘরে?'
কহিলাম, মা তোমার দুঃখ আর নাহি সয়,
চলিলাম উপার্জ্জন তরে,
গৃহখানি সারাইব, ধার আছে শোধ দিব,
ফিরিয়া আসিব পুনঃ ঘরে।
তখন গৃহেতে থাকি দেখিব চাষের কায;
কিছুদিন থাক বাঁধি বুক।
হায় কিছু নাহি হল বিদেশে আসিয়া শুধু
দুখিনীরে দিনু বেশী দুখ!
নাহি জানি কতবার শুয়ে রোগশয্যা পরে
মাতা দ্বার পানে চাহিয়াছে,
'এলি বাছা? কাছে আয়— কেন এত দেরী হ'ল?'
প্রলাপের ঘোরে বকিয়াছে!"
এত বলি সে বালক কাঁদিতে লাগিল পুন,
মোর চক্ষু ভাসে অশ্রুনীরে
কেমনে সান্ত্বনা দিব খুঁজে নাহি পাই ভাষা,
বসিনু নিকটে তার ধীরে!
"দিলাম এ হেন কষ্ট বড়ই অন্যায় মোর।"
বহুকষ্টে বলিলাম তায়—

ভাবিলাম মনে মনে, হায় নাহি শক্তি মোর
প্রতীকার করি সে অন্যায়!
কাঁদিতে লাগিল ব'সি সে বালক সম্মুখেতে,
স্থিরভাবে রহিলাম আমি।
অন্তর আমার হায় অনুতাপানলে দগ্ধ
জানিলেন শুধু অন্তর্য্যামী

(৪)

স্বদেশ সেবার তরে অধিকার পাই নাই,
সুধু তাই হৃদয়ে আমার
যতটুকু অধিকার আছিল আমার, তার
করিলাম কিবা ব্যবহার ?
আসিয়াছে দূরদেশে দরিদ্র বালক এই
বিধবার অঞ্চলের ধন,
তার দুঃখ তার ব্যথা বুঝিতে কখনো আমি
করেছি কি কোন আকিঞ্চন?
মাসান্তে বেতন দিই, এইমাত্র তার সাথে
করিয়াছি সম্বন্ধ স্থাপন।
ত্রুটি হলে বকিয়াছি, কিন্তু কভু মিষ্ট কথা
বলিয়াছি হয় না স্মরণ।
কখনও ত ভাবি নাই— আমার স্বদেশবাসী
দুরগ্রামে দরিদ্র কৃষক
তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া এসেছে হেথা
আমার দুয়ারে এ বালক।
এ আমার ভৃত্যমাত্র, রন্ধন করিয়া দিবে
আহারের সামগ্রী আমার,
কেন এ ধারণা মোর হৃদয়ে আসিছে সদা
প্রীতিশূন্য এহেন বিচার!
গৃহ ছাড়ি হেথা আসি ইহারা করিবে সেবা,
কে দিয়াছে মোরে অধিকার?
হীন ভাবি ইহাদের কিন্তু এরা না থাকিলে
হবে মোর অচল সংসার!
যাহাদের তরে মোর হৃদয়েতে নাহি স্থান,
তাহাদের সেবা আমি লই!
ইহাতে হৃদয় মোর অবনত হয় কত
তাহা কভু ভেবে দেখি নাই।
কৃত্রিম জীবন ইহা নিকটেতে থাকিলেও,
নাহি কোন হৃদয়ের যোগ।
অন্তরে সর্ব্বদা জাগে শুধু বিলাসের চিন্তা
শুধু অর্থ, মান, সুখ ভোগ!
ধিক এই কৃত্রিমতা— চাহি আমি গ্রাম মাঝে
সে উদার সরল জীবন,
দাস দাসীগণে যথা স্নেহের সম্বন্ধ পাতা,
ভৃত্য নহে পাচক ব্রাহ্মণ,
দরিদ্র কৃষক যথা হবে আপনার জন,
শুনিব তাদের সব কথা,
তাহাদের দুঃখগুলি ঘুচাতে পারি না পারি—
হৃদয়ে থাকিবে মোর ব্যথা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ--সমালোচনা

রণ-ডঙ্কা। (সচিত্র)---শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৹

শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে ছোট-ছোট পাঁচ-ছয় খানি ইতিহাসের বই লিখিলেন। প্রথম দুই তিনখানি বড়দের জন্য, আর এখন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ছেলেদের জন্য। ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর ভাষায় ইতিহাস লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন, বালকদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তবুও আমার মনের একটা 'কিন্তু' ঘুচিতেছে না। বহুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস নামক ছোট ছেলেদের বইখানির সমালোচনা 'বঙ্গদর্শনে' করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদের মুষ্টিভিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা হইলেও ইহা স্বর্ণমুষ্টি।' শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের বইগুলি পড়িয়া আমার সর্ব্বদাই মনে হয়, তিনি স্বর্ণমুষ্টি দিয়াছেন বটে, কিন্তু মুষ্টি ত। তাঁহার হাতে যে-রকম ঐতিহাসিক মাল-মস্‌লা মৌজুদ, তিনি যে প্রকার সরস রচনা কৌশলী, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে আমরা—অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধেরা-বড় একটা কিছুর দাবী করিতে পারি এবং এ দাবী পূরণ করিতে তিনি বাধ্য। তিনি এই 'রণ-ডঙ্কা' বাজাইয়া, প্রথিতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত সুন্দর ত্রিবর্ণ-চিত্রে পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পট সাজাইয়া ছেলেদিগকে ভুলাইয়াছেন, আমাদিগকেও ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বলিয়াই ফেলি যতক্ষণ 'রণ-ডঙ্কা' পড়িয়াছি, ততক্ষণ ভুলিয়াও ছিলাম। কিন্তু আধ-ঘণ্টার মধ্যে যখন এই ৩১ পৃষ্ঠাব্যাপী বড় হরফে ছাপা বইখানি পড়িয়া শেষ করিলাম, তখন হাসিও পাইল, ক্ষোভও হইল এবং মনে হইল, যিনি মোগল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিতে সমর্থ, তিনি চারিটা ঐতিহাসিক গল্প দিয়া ডঙ্কা মারিতে চান। তাঁহার 'রণ-ডঙ্কা' খুব বাজিবে, কিন্তু আমরা তাঁহার জয়-ডঙ্কা বাজাইবার জন্য হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

বাঙ্গালীর বল---শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ প্রণীত। "মানসী প্রেসে" মুদ্রিত, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৬০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৪৲।

'বাঙ্গালীর বল'—বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস। সুপ্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত—যুগের পর যুগ বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে জানিবার ও ভাবিবার খোরাকের অভাব নাই। এরূপ একখানি পুস্তকের অভাব আমরা অনেকদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম। রাজেনবাবু সে অভাব পূরণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানি মনোজ্ঞভাবে লিখিত—ভাল উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"কুলিমজুরে গাছ পাথর কাটিয়া যে পথ রচনা করে, তাহা সর্ব্বদা সুসজ্জিত ও সুমার্জ্জিত না হইলেও, সেই পথে বীর সেনাপতির রথ ধাবিত হইয়া দেশের জন্য জয় ও মান আনে। কবে বাঙ্গালায় সেই শক্তিশালী জেনোফন্ বা হেরডোটাদের শুভাগমন হইবে জানি না, তবে তাঁহারই রথচক্রের নিনাদ শুনিবার আশায় আমি পথ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।" আমরা বলি, তাঁহার সে চেষ্টা অনেক পরিমাণে ফলপ্রসূ হইয়াছে। ঐতিহাসিকের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—চারিদিক হইতে আলোচ্য বিষয়ের মালমসলা সংগ্রহ করা। তিনি সে কর্ত্তব্যপালনে যথাসাধ্য করিয়াছেন। একসঙ্গে বাঙ্গালীর বাহুবলের বহু উপাদানই গুছাইয়া দেওয়ায়, রাজেনবাবু ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের কায অনেকটা সোজা করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে---যায়গায় যায়গায় উচ্ছাসের আধিক্যে রসভঙ্গও হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুস্তকের গুণের তুলনায় এগুলি কিছুই নয় বলিয়া মনে করি। এই পুস্তকের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার সময়, 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের লিখিত 'উস্‌মান্', 'প্রতাপাদিত্যের পতন', 'বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারের পতন' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি অনুসারে "বাঙ্গালীর বলের" স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইবে।

এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালী সর্ব্বত্র ভীরু কাপুরুষ বলিয়া দুর্নাম বহন করিয়া আসিতেছিল। রাজেন বাবু ইতিহাসের সাহায্যে বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক ধুইয়া মুছিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি জগতের সমক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গালী ভীরু নহে---কোনদিন ছিলও না---বীরের সভায় তাহারও একটা স্থান আছে।

পুস্তকখানি খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

শ্রী—

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ

৺ইন্দিরা দেবী

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী, ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে, বিগত ১২ই আশ্বিন মহানবমী পূজার রাত্রে, তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "স্পর্শমণি" ও "স্রোতের গতি" উপন্যাসদ্বয় "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ আছে। বিখ্যাত উপন্যাস-লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী। "ইন্দিরা" ইহাঁর আসল নাম ছিল না, পুস্তকাদিতে ব্যবহার জন্য ছদ্মনাম মাত্র। ইহাঁর প্রকৃত নাম সুরূপা। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "মুদ্রাদোষ" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

সুগন্ধমণি মেডেল পুরস্কার—

কণ্টাই ক্লাবের পক্ষ হইতে জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় ৺সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য পদক উপহার প্রদান করিবেন। প্রবন্ধটি ৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে কণ্টাই ক্লাবের সেক্রেটারীর নিকট পৌছান চাই। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত "মণ্টুর মা" উপন্যাস গুরুদাস লাইব্রেরীর আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "মোক্ষদা" কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত "অভাগী" উপন্যাসের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল, মূল্য

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা প্রণীত "রিক্তিয়ার স্বরলিপি" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৹

কলিকাতা
১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাননে মহাশ্বেতা

(চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয়ের সৌজন্যে)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

২য় খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

মোক্ষ-বিদ্যা ও পুরুষাত্মবাদ

এ দেশের মোক্ষবিদ্যা, জীবের সুখ দুঃখজ্ঞান এবং তাবৎ বিষয়-বোধ মাত্রকেই, পরম অবজ্ঞাভরে "হেয় পক্ষে নিক্ষেপ" করিয়া এক বিষয়-বোধাতীত সুখ-দুঃখ-পরিহীন মুক্তিকেই জীবের পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এবং শুধু নির্দ্দেশ করিয়াই তাহা ক্ষান্ত হয় নাই—সেই মোক্ষকে কার্য্যতঃ ও প্রত্যক্ষভাবে লাভ করিবার জন্য তাহা এক সুদূর-অবগাহী কৃচ্ছ্র সাধনবিধিরও ব্যবস্থা করিয়াছিল। আমরা জানি, বহুকাল ব্যাপিয়া অগণিত মুমুক্ষু সাধক, সেই সাধন-বিধি অবলম্বনে ভারতবর্ষীয় সাধন-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের সেই বিচরণের পদ-চিহ্নকে রেখাঙ্কিত করিয়া আমাদের পুরাতন সাধন-ক্ষেত্রের উপর দুইটি প্রশস্ত পথরেখা আপনা হইতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই দুইটি প্রাচীন পন্থার নাম যোগ এবং সাংখ্য—কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ। এখন আমরা যাহাকে ভক্তিমার্গ বলিয়া থাকি, তাহা প্রাচীনকালে কর্ম্ম-মার্গেরই অন্তর্গত ছিল। এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম বিভিন্ন মার্গ হইলেও, অবশেষে কিন্তু তাহারা একই অভিন্ন কৈবল্য-ধামে আসিয়া মিশিয়া গিয়াছিল।

যে মোক্ষ এইরূপে কার্য্যতঃ ও প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই আবার বিচারতঃ দর্শন-বিদ্যার দ্বারাও সঙ্গত হইয়াছিল। যে শ্রেয়কে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগিগণ সাধনা বলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যুক্তিতন্ত্র তাহাকেই আবার চরম শ্রেয়ঃ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সেই জন্য আমাদের তপোবনের সাধনা এবং বিদ্যাপীঠের আলোচনা বরাবরই পাশাপাশি চলিয়াছিল। সাধন-বিদ্যা ও দর্শন-বিদ্যা চিরকালই পরস্পরের সহযোগী হইয়াছিল।

সুদূর-ব্যবহিত অতীতের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া, এখন যদি আমারা এই দুই বিদ্যার মধ্যে প্রাচীন সাধন-বিদ্যা কি ছিল ইহা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি, তবে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। কারণ সেই যে সাধন বিদ্যা, তাহা কেবলই বিচার-সাধ্য বিদ্যা

ছিল না। এবং পরের মুখে শুনিয়াও তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ আস্থা জন্মিতে পারে না। সেই সাধন বিদ্যা জানিতে হইলে নিজেরও কথঞ্চিৎ সাধনার প্রয়োজন হয়। "যদিও শাস্ত্র, অনুমান ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা সিদ্ধি সকলকে সম্ভূত অর্থ বলিয়া জানা যায়,—কেন না, সম্ভূত অর্থ এই সকল উপায় দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে,—তথাপি যতক্ষণ সাধনার কোন এক প্রদেশেও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততক্ষণ তাহা পরোক্ষই থাকিয়া যায়। এবং পরোক্ষবিষয় সম্বন্ধে কোনই দৃঢ় বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সেই জন্য যোগাদি সাধন-শাস্ত্রের অনুশাসন প্রত্যক্ষ করণার্থ নিজেরও কিঞ্চিৎ কর্ম্মের আবশ্যক হয়।" * কিন্তু মোক্ষের দর্শন-বিদ্যা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে না। এই আলোচনা বিদ্যার অখিল রহস্য, কৌপীন, কম্বল কিংবা গেরুয়া কাপড়ের মধ্যেই নিহিত নহে। এবং যে কেহ ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন, নৈয়ায়িক যাহাকে বিচারের পঞ্চ অঙ্গ বলিয়াছেন,—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন—সেই পঞ্চ অঙ্গ ব্যাপিয়াই মুমুক্ষু দর্শন-বিদ্যার সমস্ত রহস্য অবস্থান করিতেছে। অধিকারী ভেদে ইহার কপাট রুদ্ধ নহে,—এ কপাট খুলিয়া যাইতে করাঘাত মাত্রেরই অপেক্ষা করে।

কিন্তু তা বলিয়া মুক্তির সাধন-তন্ত্রের মধ্যে ন্যায় ও যুক্তির প্রসর যে একেবারেই নিরুদ্ধ হইয়াছে এ কথাও বলা যায় না। সাধন-বিধির যদি কোন প্রত্যক্ষ সিদ্ধি ও ফল থাকে, তবে তাহা যে হাতে হাতেই লভ্য তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কেবল সেই জন্যই সেই সাধন-তন্ত্রকে যথেচ্ছ বিধিনিষেধের এক পুরাতন পঞ্জিকা, কিংবা লোক ভুলাইবার জন্য অর্থহীন মন্ত্রপুঞ্জ মাত্র বলিয়াও বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। খুঁজিয়া দেখিলে, সেই সকল বিধি ব্যবস্থার মধ্যে, একটি ন্যায়ানুগত শৃঙ্খলা, ক্রমান্বয়ী পৌর্ব্বাপর্য্য, কিংবা সুবিন্যস্ত কার্য্য-কারণ পদ্ধতিও যে মিলে না এমন কথাও নহে। মোক্ষ সাধক চিরদিনই যে চিনির বলদের ন্যায়, গুরুদত্ত বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সুদীর্ঘ পথ হাঁটিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই, মোক্ষের সাধন বিষয়ক এক দর্শন বিদ্যাও অসম্ভব হয় নাই।

উপস্থিত আমরা, মুক্তির সাধন-বিষয়ক দর্শন-বিদ্যার কোন উল্লেখ না করিয়া, মোক্ষের সিদ্ধান্ত বিষয়ক দর্শন-বিদ্যার কথাই কহিব। এবং সেই দর্শন-বিদ্যার যুক্তি সকলকে একত্র সঙ্কলন ও সংযোজনা করিয়া, এইটুকু মাত্র দেখিতে চেষ্টা করিব যে কোন্ যুক্তির বলে, আমরা মোক্ষকেই সার করিয়া, এই ভোগের জগতে অভুক্ত উদাসীন হইতে চাহিয়াছিলাম।

পুরুষাত্মবাদ।

ইউরোপের নবীন দর্শনের ন্যায়, আমাদের প্রাচীন মোক্ষ-দর্শনও,—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের, বিষয়ী (subject) এবং বিষয়ের (object), দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের দ্বৈতভাব (duality) লইয়াই তাহার বিচারের সূত্রপাত করিয়াছিল। এবং এই দ্বৈতভাবকে এ দেশেরও প্রশাস্ত দর্শনবাদ-সকলের অন্তঃস্রোত বলিলে কোনই অত্যুক্তি হয় না। এই দ্বৈতভাবের অত্যন্ত বিরোধী যে কোন অদ্বৈতবাদ আছে তাহাও বোধ হয় না। এমন কি আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদের বিনিদ্র প্রহরী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার অদ্বৈত তর্কের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছিলেন—"বিষয়ী এবং বিষয় অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় অত্যন্ত-বিরুদ্ধ স্বভাব।" * এবং যাহারা "অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাব", তাহারাই সাধারণ বিচারে দ্বৈত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। দ্বৈতাচার্য্যেরা তাঁহাদের বিচারের প্রতি অস্থিসন্ধিতে চিৎ ও অ-চিতের বিরুদ্ধ প্রকারভেদ যে স্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যোগভাষ্যের সেই আদিমতম দার্শনিক—যিনি কখনই নাম লেখাইয়া দ্বৈত বা অদ্বৈত

* যোগভাষ্য—১।৩৫

* বেদান্তভাষ্য, ভূমিকা

বাহিনীভুক্ত হইতে চাহেন নাই—তিনিই যথার্থ নিরপেক্ষ দর্শন-বেত্তার ন্যায় কদাচিৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বিষয়ী এবং বিষয়ই শুধু যে পরস্পর বি-রূপ তাহা নহে, তাহারা পরস্পর স-রূপও বটে। "এই পুরুষ (বিষয়ী) বুদ্ধির (বিষয়ের) বি-রূপ, কারণ, বুদ্ধি বিকারশীল, পুরুষ নির্ব্বিকার, পুরুষ চেতন, বুদ্ধি অচেতন পুরুষ নিত্য, বুদ্ধি অনিত্য। আবার এই পুরুষ বুদ্ধির স-রূপও বটে, কারণ, যাহা বুদ্ধ্যাকার তাহাই জ্ঞানাকার।"

পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে আমাদের দর্শনের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের দ্বৈতভাব অবধারণায় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও, সেই সাদৃশ্য শুধুই নাম মাত্রের সাদৃশ্য। কেন না সাধারণ পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদী, জ্ঞাতা বলিতে যে self বা egoকে বুঝিয়া থাকেন, আমাদের মতে সেই "অহং" জ্ঞাতা নহে, জ্ঞেয়। এবং যিনি জ্ঞাতা তিনি অহং নহেন, তিনি পুরুষ বা আত্মা। এই জন্য পাশ্চাত্য দর্শনবাদের আলোকে প্রাচ্য দর্শনবাদ পাঠ করিতে যাওয়া অনেক স্থলে বিপদসঙ্কুল।

কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনবাদের ন্যায় এদেশেও দর্শন-বাদ ছিল, যাহা মন অথবা মনেরই নামান্তর "অহং"-কেই জ্ঞাতা বলিয়া মানিয়াছিল—এবং মনের ও "অহং'এর অতিরিক্ত কোন জ্ঞাতা স্বীকার করে নাই। এই দর্শন-বাদ সকল "বুদ্ধ্যাত্মবাদ" আখ্যা লাভ করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের মতে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বুদ্ধ্যাত্মবাদী ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধদের পূর্ব্বেও বুদ্ধ্যাত্মবাদ এ দেশে অবিদিত ছিল না, এমন আভাসও পাওয়া যায়। এবং সাংখ্য বেদান্তাদি দর্শন-পক্ষ বুদ্ধ্যাত্মবাদ খণ্ডনের যুক্তি অল্প বিস্তর দিয়াছিলেন। বুদ্ধ্যাত্মবাদ নহে, কিন্তু পুরুষাত্মবাদই এদেশের প্রশস্ত দর্শনবাদ, এবং এই পুরুষাত্মবাদই মুক্তিদর্শনের প্রসিদ্ধ প্রবেশ-দ্বার।

পুরুষাত্মবাদের দর্শন প্রথমে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহ্য বিষয় সকল আমাদের জ্ঞেয় নহে, কিন্তু বাহ্য বিষয়ের আকার-উল্লেখী-বুদ্ধি-ভাব সকলই (Ideas) আমাদের জ্ঞেয়। "বুদ্ধিই সকল বিষয়ে অবগাহন করে। সেই জন্য জ্ঞাতা পুরুষের পক্ষে বুদ্ধি হইতেছে দ্বারী, এবং ইন্দ্রিয় সকল দ্বার।" * অতএব দ্বারস্থ বিষয়কে জ্ঞাতার সমীপস্থ হইতে হইলে, দৌবারিক বুদ্ধিকে সংবাদ দিতে হয়, এবং দ্বারী সেই সংবাদ বহন করিয়া জ্ঞাতার সকাশে 'এত্তেলা' করিলে জ্ঞাতার বিষয়জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, বাহ্য জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিচয়ই হয় না। বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় হয়, তাহা বুদ্ধির মারফতে, বুদ্ধির নিজের ভাষায় এক "দ্বিতীয় হাতের" (second hand) পরিচয় মাত্র। তাহাতে জগৎ সম্বন্ধে কতটা সত্য পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই, এবং কতটা বুদ্ধির 'বানাওটি' খবরে প্রতারিত হই, সে বিচারের এখানে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের বিচার্য্য হইতেছে এইটুকু মাত্র, বুদ্ধ্যাকার বিষয়রূপের জ্ঞাতা কে—বুদ্ধি নিজেই, না বুদ্ধি হইতে অন্যতর কোন জ্ঞাতা পুরুষ?

বুদ্ধ্যাত্মবাদী বলিয়াছিলেন বুদ্ধি নিজেই বুদ্ধির জ্ঞাতা, এবং বুদ্ধি হইতে অন্যতর কোন জ্ঞাতা নাই। ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, অগ্নির স্বরূপ যেমন অগ্নির নিজের আলোতেই প্রকাশিত হয়, তেমনি অহং বা বুদ্ধির নিজের আলোতেই অহং বা বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মন বা বুদ্ধি হইতেছে "স্ব-আভাস" (**self illumining**) সত্তা।

উত্তরে পুরুষাত্মবাদী বলিলেন,—"ন তৎ স্ব-আভাসং, দৃশ্যত্বাৎ"। (পাঃ দঃ—৪।১৯)। বুদ্ধি স্ব-আভাস হইতে পারে না, কারণ, বুদ্ধি নিজেও জ্ঞেয় বা "দৃশ্য"। অর্থাৎ মন এবং মনের ভাব-নিচয় আমাদের জ্ঞেয় হইয়া থাকে বলিয়া, বুদ্ধি জ্ঞাতা হইতে পারে না। কেন যে পারে না তাহার যুক্তি হইতেছে এই:—খাদ্য যেমন নিজেই তাহার খাদক হইতে পারে না, কর্ত্তা যেমন নিজেই

* সাংখ্যকারিকা, ৩৫।

তাঁহার কর্ম্ম হইতে পারেন না, তেমনি যাহা জ্ঞেয় তাহা নিজেই তাহার জ্ঞাতা পারে না। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে "কর্ম্মকর্ত্তৃদোষ" উপস্থিত হয়। এবং যে ধারণা এই কর্ম্ম কর্ত্তৃদোষে বাধিত হয়, তাহা কখনই সত্য ধারণা হইতে পারে না। মন এবং মনের ভাব সকলও আমাদের জ্ঞেয় বিষয়। তাহা না হইলে আমরা কখনই এমন কথাও বলিতে পারিতাম না 'ক্রুদ্ধোঽহং,' "ভীতোঽহং। অর্থাৎ 'অহং—যাহা মনেরই নামান্তর মাত্র, তাহা—এবং ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মনোভাব সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। তাহাতে মনই বিষয়ী ও জ্ঞাতারূপে, বিষয় ও জ্ঞেয় মনকে জানিতেছেন বলা যাইতে পারে না। অতএব মনের জ্ঞাতা মন নহে, মন হইতে অন্যতর কোন সত্তা। এতদুপলক্ষ্যে বুদ্ধ্যাত্মবাদীরা যে আগুনের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্তও ঠিক্ নহে, ইহা ব্যাস দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আগুনের এক প্রকাশ-শক্তি ও প্রকাশ স্বরূপ আছে যাহার সংযোগে গৃহভিত্তি প্রভৃতির প্রকাশ যোগ্য রূপ সকল প্রকাশিত হয়। যখন আমরা আগুনের আলোতেই আগুনের রূপ দেখিয়া থাকি, তখন আমরা আগুনের সেই বিশুদ্ধ প্রকাশ-স্বরূপ দেখিনা, তখন আমরা আগুনের প্রকাশ স্বরূপের সাহায্যে আগুনের (গৃহভিত্তিবৎ) এক প্রকাশ-যোগ্য রূপকেই দেখিয়া থাকি। এবং আলোকিত গৃহভিত্তিকে যেমন আলো বলা যায় না, তাহাকে গৃহভিত্তিই বলিতে হয়, তেমনি আগুনের দ্বারা প্রকাশিত আগুনের প্রকাশযোগ্য রূপকেও আগুনের স্ব-রূপ বা প্রকাশ-রূপ বলা যায় না, তাহাকে অগ্নির প্রকাশ্য রূপই বলিতে হয়।

অতএব প্রকাশ-স্বরূপ যে চিৎ বা পুরুষ, তিনি কখনই প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞেয় হইতে পারেন না। যিনি সকলকে জানিতেছেন, তিনি কাহারও জ্ঞেয় নহেন। আরণ্যক উপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এই মর্ম্মেই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল :—যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে! কেন বিজানীয়াৎ?"—যিনি এই সমস্তকে জানিতেছেন তাঁহাকে আবার কে জানিবে? অরে! বিজ্ঞাতাকে আবার কে জানিবে?

অতএব জ্ঞাতা পুরুষ হইতেছেন প্রত্যক্ষতঃ অজ্ঞেয় এক চিৎ বা জ্ঞান-শক্তি। সেই চিৎ শক্তির প্রকাশ-আলোকে বিষয়াকার মন ও মনোভাব সকল প্রকাশিত হইতেছে। এবং যাহা বিষয়রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহা চিৎ নহে অ-চিৎ, তাহা বিষয়ী নহে, বিষয়, তাহা চেতন নহে, তাহা অচেতন ও জড়। সেই জন্য পুরুষত্মবাদের আদ্য সিদ্ধান্ত হইতেছে—বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির নামান্তর 'অহং' হইতেছে অচিৎ বা অচেতন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ অনুভবের বিরোধী, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না, আমরা সকলেই জানি যে 'আমি' ও আমার মনই জানিয়া থাকে, এবং এই 'আমি' ও 'আমার মনের' অতিরিক্ত অন্য কোনই জ্ঞাতা নাই। অতএব দর্শনবাদ এইখানে একটি বিষম সমস্যায় ঠেকিলেন। তাঁহার বিচার বলিতেছে জ্ঞেয় মন কিংবা 'আমি' জ্ঞাতা হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব বলিতেছে আমি এবং আমার মনই জ্ঞাতা। এই জন্য তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন,—কেন এবং কি জন্য বুদ্ধিই জ্ঞাতা-রূপে প্রতীয়মান হইতে পারিয়াছে?

তাহাতে, বিস্মৃত আদিম যুগের এক দর্শনাচার্য্য পঞ্চশিখ মুনি দেখিতে পাইলেন—"একমেব দর্শনম্, খ্যাতিরেব দর্শনম্"—দর্শন বা বুদ্ধ্যাকার এবং খ্যাতি বা জ্ঞানাকার এক ও অভিন্নাকার। অর্থাৎ জ্ঞান রূপ, বুদ্ধি রূপের অনুকারী মাত্র, বুদ্ধি বিম্বের জ্ঞান প্রতিবিম্ব মাত্র। এবং দর্পণগত প্রতিবিম্বের যেমন কোনই স্বতন্ত্র স্বাধীনতা নাই, তাহা যেমন সর্ব্বথাই বস্তুবিম্বের প্রতিরূপ ইহাতে বাধ্য, তেমনি জ্ঞাতৃশক্তি পুরুষও সর্ব্বথা জ্ঞেয়াকার অনুকরণ করিতে বাধ্য। যাহা বুদ্ধির মুখভঙ্গিমা, তাহাই বুদ্ধির জ্ঞাতৃপুরুষেরও মুখভঙ্গিমা, এবং সে মুখভঙ্গিমাকে সংশোধন পূর্ব্বক জ্ঞাতৃ-পুরুষ দেখিতে কখনই সমর্থ নহেন। তাহাতে বুদ্ধি যদি বলিতে চাহে

আমিই জ্ঞাতা, তবে পুরুষ নিজে জ্ঞাতা হইলেও বুঝিবেন বুদ্ধিই জ্ঞাতা। অনুকরণ-পরাহত পুরুষ কখনই নিজেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল নহেন। এবং বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে এই যে অনুকারি-সম্বন্ধ, শাস্ত্র বলিয়াছেন ইহা 'অনাদি সম্বন্ধ', এ সম্বন্ধের অন্য কোনই আদি সম্বন্ধ নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার ইহাই চরম বিধান, সংসার প্রবর্ত্তনের ইহাই সনাতন বিধি।

কিন্তু ইহা বলিলেই সমস্ত সমস্যাই একেবারে জল হইয়া যায় না। যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে সৃষ্টির অনাদি বিধানে পুরুষ বুদ্ধির অনুকারী মাত্র হইয়াছেন, তাহা হইলেও ইহা ত বুঝা যায় না—কিরূপে এক অচেতন সত্তা মন, প্রতিবিম্ব ক্রমে, চেতন-সত্তা মন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কালো জিনিষ প্রতিবিম্বক্রমে কখনই সাদা বলিয়া দেখায় না। বিম্বগত কালো, প্রতিবিম্বেও কালো রূপেই প্রতিভাত হয়। অতএব পুরুষাত্মবাদ এক দ্বিতীয় সমস্যায় পড়িলেন, কেন এই অচেতন বুদ্ধি চেতন-রূপেও প্রতিভাত হইতে সমর্গ হইয়াছে?

ইহার উত্তরে দর্শনবাদ বুদ্ধির উপর এক চিচ্ছায়াপাত দেখিতে পাইলেন। বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকেই বুদ্ধির "চিদাভাস" বলিয়াছেন, যোগ ইহাকে "বুদ্ধিতে চৈতন্যের উপরঞ্জনা ও উপগ্রহ" বলিয়াছেন, এবং সাংখ্যশাস্ত্র ইহাকে "অন্তঃকরণের চিদুজ্জলতা" নাম দিয়াছেন। বেদান্তসার বলিতেছেন—"যেমন দীপ-প্রভা-মণ্ডল অন্ধকারগত ঘট-পটাদিকে বিষয় করিয়া, তদ্গত অন্ধকারকে নিরসন পুরঃসর, নিজের প্রভার দ্বারা তাহাকে ভাসমান করে"—সেইরূপ চিদাভাস দ্বারাও বুদ্ধিভাব ও বুদ্ধিগত বিষয় সকল ভাসমান হইয়াছে। সাংখ্য বলিয়াছেন—"স্বরূপতঃ অনুজ্জ্বল লৌহ অগ্নিসান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া যেমন অগ্নিবৎ উজ্জ্বল হইয়া থাকে, তেমনি স্বরূপতঃ অচিৎ বুদ্ধিও পুরুষ-সান্নিধ্যে চিদুজ্জলিত হইয়াছে।" যোগ বলিতেছেন—"স্ফটিক ও মণির ন্যায় স্বচ্ছ এই চিত্ত-সত্ত্ব চৈতন্য দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাতে চৈতন্য-সাদৃশ্য ভ্রান্ত জীব চিত্তেই চৈতন্য ভ্রম করিতেছে"—অর্থাৎ চিদুজ্জ্বল বুদ্ধিই, চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া চেতন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, পুরুষাত্মবাদী বুদ্ধি হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে প্রতিপন্ন করিতে গিয়া দুইটি তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমটি হইতেছে বুদ্ধিরূপ ও জ্ঞানরূপের একাকারতা। তাহার দ্বিতীয়টি হইতেছে বুদ্ধির চিদুজ্জলতা। এবং এই দুই তত্ত্ব অঙ্গীকারের মর্ম্মানুসারে আমরা সহজেই দেখিতে পাই যে পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞাতা হইলেও, বুদ্ধি হইতে সর্ব্বথা নির্লিপ্ত সত্তা। তাহা বিশ্বচিত্রের ও বুদ্ধি-চিত্রের এক তটস্থ, উদাসীন জ্ঞাতা ও নিরপেক্ষ সাক্ষিমাত্র। এবং বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে অনুকারী-সম্বন্ধ থাকিলেও কোনই বাস্তবিক সংযোগের সম্বন্ধ নাই। তজ্জন্য বুদ্ধির উপর পুরুষের কোনই দাবী দাওয়া দাঁড়ায় না। চেতন পুরুষ সমীপস্থ হইলেও বুদ্ধিকে কখনই 'আমার' বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু এ দাবী সংসার ব্যবহারে নিত্যই চলিয়াছে। বুদ্ধিগত সুখ দুঃখ ও বিষয় সকল, জ্ঞাতার নিজের সুখ দুঃখ ও বিষয় বলিয়া নিত্যই সংসার-ব্যবহারে পঠিত হইতেছে। পুরুষ এই সংসার রঙ্গের শুধুই দর্শক নহেন, ইহার কর্ত্তা ও ভোক্তাও বটেন। এবং এই রঙ্গের যাহা দৃশ্য ও জ্ঞেয়, তাহার দ্রষ্টারই নিজস্ব দৃশ্য ও জ্ঞেয়। বুদ্ধিস্থিত ভাব নিচয়কে আমরা পৃথক্ আধারস্থ ভাব বলিয়া কখনই জানি না, তাহা জ্ঞাতৃরূপ আধারেই সর্ব্বদাই আহিত হয়। তাহা জ্ঞাতা হইতে অন্যতর সত্তার গুণ ও ধর্ম্ম বলিয়া কখনই বিবেচিত হয় না, তাহা জ্ঞাতারই গুণ ও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব পুরুষাত্মবাদ এইখানে এক তৃতীয় সমস্যা অনুভব করিলেন। সেই সমস্যা হইতেছে এই:—কেন এবং কি জন্য বুদ্ধিস্থিত ভাব-সকল পুরুষেও আরোপ যোগ্য হইয়াছে? এবং এই সমস্যার উত্তর হইতেছে—

অভিসন্ধিবাদ।

ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, আমাদের অভিসন্ধি-বাদ (Teleology), কোনই সুবিধাজনক

ও মনঃকল্পিত "ঈশ্বরেচ্ছায়" অবগাহন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি কার্য্যকে অসম্ভব সোজা করিয়া দেয় নাই। আমরা দেখিতে পাইব যে এই অভিসন্ধিবাদের কর্ম্ম, যে-কোন এবং যথেচ্ছ ঈশ্বরেচ্ছা নহে, ইহার যাহা মর্ম্ম তাহা এমন এক সহজ ও সরল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে তাহাকে অস্বীকার করা সুসাধ্য ব্যাপার নহে।

এই অভিসন্ধিবাদ প্রথমে বিচার করিয়াছিলেন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের এই যে বিবিধ ও বিচিত্র ভাবনিচয়, যদ্বিষয়ে আমাদের কোনরূপ জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই সকল ভাবের সাধারণ লক্ষণ কি?—কণাদ বলিয়াছিলেন 'সত্তা' বা অস্তি-ভাবই ইহাদের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু 'সত্তা' বিশেষভাবে (concretely) কোনই নিরপেক্ষ ও নিরালম্ব সত্তা হইতে পারে না, তাহা আপেক্ষিক ভাবে কোন না কোন জ্ঞাতারই জ্ঞেয় সত্তাই হইয়া থাকে। অতএব কোন বিষয়কে যখন আমরা "অস্তি" বলি, তখন সেই সঙ্গে আমরা মানিয়া লই যে সেই অস্তিকে 'সৎ' বলিয়া জানিবারও কোন জ্ঞাতা আছে। অর্থাৎ কোন না কোন জ্ঞাতার জ্ঞান-যোগ্যতাই হইতেছে বিষয় সকলের অস্তিতা বা সত্তা। এবং এমন সত্তা যদি থাকে, যাহা সর্ব্বথাই জ্ঞানের অযোগ্য—যাহাকে 'অস্তি' বলিয়া জানিবার কোনই উপায় নাই,—তাহা সত্তা হইলেও অসৎ। তাহা সৎ-রূপে প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য নহে। সাংখ্যের কপিল এইরূপ এক "অসৎ সত্তা"কেই জগৎ-অভিব্যক্তির "অমূল মূল" ও পরা প্রকৃতি বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। এই পরা প্রকৃতিকে 'অস্তি' রূপে কোন জ্ঞাতাই প্রত্যক্ষতঃ জানিতে সমর্থ হয়েন না। সেই অজ্ঞেয় পরা প্রকৃতি যখন বিশ্ব-প্রকৃতি-রূপে পরিণাম লাভ করিল,—তখন তাহা অস্তিতা মাত্রা লাভ করিল মাত্র। যাহাকে পূর্ব্বে জ্ঞাতা অস্তি-রূপে জানিতে সমর্থ ছিলেন না, সৃষ্টির প্রবর্ত্তনে তাহা জ্ঞাতার জ্ঞেয়, এবং অস্তি-রূপে প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইল। ইহারই নাম সৃষ্টির প্রথম পরিণাম 'মহৎ'।

কিন্তু আমাদের বিশ্ব-রূপকে যে জানা, তাহা শুধুই অস্তিতা মাত্রারই জানা নহে। যে ফুলটী দেখিতেছি ঐ ফুলের সম্বন্ধে মনে যে ভাবটি (idea) হইতেছে তাহা শুধু ভাবই নহে, তাহা 'আমি' নামক এক জ্ঞাতার ভাব, তাহা শুধু ফুল নহে, তাহা "আমার দৃষ্ট ফুল।" অর্থাৎ বাস্তবিক জ্ঞানে অস্তি-মাত্র রূপে প্রতিপত্তি-যোগ্য মহৎ সত্তা, এমন এক প্রকার পরিণামে পরিণত হইয়াছে যাহাতে তাহা শুধুই অস্তি-রূপে নহে, বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতার বিশেষ বিশেষ অস্তি-রূপেও প্রতিপন্ন হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ইহার নামই সৃষ্টিতত্ত্বে মহৎ-সত্তার অহংকার পরিণাম। এবং মনোভাব সম্বন্ধে এই অহংকার পরিণামের এই সূক্ষ্ম বোধকে মহাত্মা Kantও তাঁহার সমস্ত Ideaর মধ্যেই অনুভব করিয়াছিলেন—ইহা আমরা বিদিত আছি। ক্যান্টের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি এই:—I can, any moment, claim the Ideas as my own. In truth, we are never conscious of Ideas which are nobody's Ideas।" এবং বিষয় উপলব্ধি মধ্যে এই যে "my Idea" ভাব, ইহাই বুদ্ধির অহংকার। এবং বুদ্ধিগত Idea সকল যদি এই অহংকার-মাত্রা না লাভ করিত, তবে তাহারা কখনই "my Idea" রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারিত না—তাহারা "nobody's Idea" রূপেই প্রতিপন্ন হইত।

যাহা কোন না কোন সূত্রে এইরূপে my ও mine হইতে পারে, কেবল মাত্র তাহার দ্বারাই আমাদের সুখ দুঃখাদি ভোগ সম্ভব, অন্যথায় নহে। বিশ্ব প্রকৃতি বুদ্ধিগত হইয়া এইরূপে মমত্ব-মাত্রা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই জগতের দ্বারাও আমাদের সুখ দুঃখাদি সম্ভব হয়—অন্যথায় জগতের সঙ্গে আমাদের কোনই সুখ দুঃখের সম্বন্ধ নাই। অতএব অহংকার-মূলক এই যে জগৎ-জ্ঞান-ইহা আমাদের শুধু জ্ঞান নহে, ইহা আমাদের ভোগও বটে। কেন না ভোগ বলিতে জ্ঞাতার অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে বিষয় গ্রহণকেই বুঝাইয়া থাকে, এবং সেই রূপে বিষয় গ্রহণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যতক্ষণ না গ্রহীতা সেই গ্রাহ্য বিষয়কে নিজস্ব রূপে গ্রহণ করেন। এবং ব্যবহার জগতে জীবের তাবৎ বিষয় গ্রহণই এই-

রূপ নিজস্ব ভাবেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং বিষয় মাত্রই তজ্জন্য আমাদের ভোগ্য বস্তু।

এখন যদি বলি—এই ভোগ্যরূপা চিত্তসত্তা এবং চিত্ত ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি হইতেছে, এক জ্ঞাতা ও ভোক্তার ভোগকে সার্থক করা মাত্র,—তবে অবশ্যই আমাদের কোন কষ্ট কল্পনাকে আশ্রয় করিতে হয় না; কেন না, ভোগ্য বিষয় যখন ঐ রূপে কোনই ভোক্তার ভোগাত্মক জ্ঞানকে সিদ্ধ করে না, তখন তাহার কোন অস্তিত্ব ও কোন সত্তাই থাকে না—তখন তাহা 'অসৎ' হইয়া যায়। অতএব "তদর্থ এব দৃশ্যস্য আত্মা।" (পাঃ দঃ ২১.২) জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনই হইতেছে জ্ঞেয় ও দৃশ্যের স্বরূপ। জ্ঞেয় রূপা বিশ্ব প্রকৃতি এবং সেই জ্ঞেয়-রূপা বিশ্ব প্রকৃতির বাহা জ্ঞেয় বুদ্ধি-রূপ, তাহার একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে জ্ঞাতার ভোগ। জ্ঞাতা পুরুষের তাহা মূর্ত্তিমান ও আকার-বদ্ধ ভোগরূপ ও প্রয়োজন মাত্র।

অতএব পুরুষাত্মবাদ দেখিতে পাইলেন, বিশ্ব প্রকৃতির হৃদয় হইতে রূপ রসের এই যে অনন্ত বৈভব ও বৈচিত্র্য উদ্গত হইতেছে—ইহার অন্য কোনই অর্থ নাই, তাহা পুরুষার্থ মাত্র। এবং সেই পুরুষার্থ হইতেছে পুরুষের বিচিত্র ভোগকে প্রথমতঃ সিদ্ধ করা। এবং পুরুষার্থ স্বরূপ বিশ্বচিত্রকে বুদ্ধি নিজের আকারে আকারিত করিয়া যে জ্ঞাতৃ-পুরুষে নিবেদন করিতেছে, তাহাতে পুরুষের ভোগ আরও সুচারু ভাবেই নিষ্পন্ন হইতেছে। কারণ বুদ্ধি, পুরুষের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম ও বুদ্ধ্যাকার বিষয়-রূপকে পুরুষেরই সুখ দুঃখ ও বিষয় বলিয়া জানাইতেছে, তাহার আক্ষেপ ও বিক্ষেপকে তৎস্বামী পুরুষেই আরোপ করিতেছে। সেই আরোপ কিরূপে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহা দেখাইবার জন্য পাতঞ্জল ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"রাজার প্রয়োজন-বশে সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত জয় পরাজয়, সৈন্যদণের মধ্যে অবস্থিত হইলেও, তাহা যেমন রাজারই জয় পরাজয় রূপে ব্যপদিষ্ট হয়, তেমনি পুরুষার্থ-উপার্জ্জিত বুদ্ধি-স্থিত ভাব সকল পুরুষেই ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।"

পুরুষাত্ম-বাদ, এই পুরুষার্থ ও অভিসন্ধিবাদের দ্বারাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, কেন এবং কি জন্য বুদ্ধি-ভাব ও বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম সকল জ্ঞাতা পুরুষেরই ভাব ও সুখ দুঃখাদি রূপে পঠিত হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

পূজার আনন্দ

বক্ষে তোমায় পাওয়া প্রভু সুখের বুঝি হবে!
আরো সুখের পাওয়ার লাগি পূজার আয়োজন,
তোমার বরাভয়ের আশিস কাম্য কহে সবে,
আরো মধুর তাহার লাগি তপের আচরণ।

তোমায় প্রভু গৃহেই পাওয়া গর্ব্ব করার কথা
পাওয়ার আগে গর্ব্ব আরো গর্ব্ব নিরাপদ।
আজকে তুমি ক্ষমছ দীনের সাহস আকুলতা
তখন পাবো যোগ্য কোথা অর্ঘ্য পরিচ্ছদ?

পাখীর স্বাধীন কূজন যদি শঙ্ক বুকে বাঁধে,
পুষ্পবনের হাস্য লভে বেদীর অটলতা,
তখন হবে নিত্য সেবার নিত্য অপরাধে
ভক্তি-বধূ সঙ্কুচিতা মর্ম্মে পাবে ব্যথা।

এ কি প্রভু কম করুণা? কোথায় মিলিয়াছে?
অধিকারী করেছ যে তোমায় পূজিবার
ভক্তি হতে ভক্ত জনের কাম্য কিবা আছে?
পূজা হতে আবার কিবা পূজার পুরস্কার!

হারাব যে, পেয়ে যদি বাঁধন পড়ে খসি,
দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে তাই ত পূজা মম
চারি পাশে অর্ঘ্য নিয়ে ঘুরছে গ্রহশশী—
রবির সাথে নিবিড় বাঁধন এইত দৃঢ়তম।

শ্রীকালিদাস রায়।

দ্বারকাপুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপর একদিন মোহান্তজী আসিয়া কহিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, অধিকারীর সহিত তাঁহার যে মামলা চলিয়াছে, তাহাতে জয়প্রাপ্ত হইবার মানসে চণ্ডীর হোম করিবেন এবং তাহাতে আমাকে যোগদান করিতে হইবে। আমি স্বীকৃত হইলে তিনি সন্ধ্যার পর সমুদ্রতীরস্থ একটী বাটী নির্দ্দেশ করিয়া আমায় তন্ত্রধারকের উপদেষ্টারূপে বরণ করিলেন, কেননা, তন্ত্রধারকটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকমাত্র। যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ হইয়া প্রায় অর্দ্ধেক হোম হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ বহির্দ্দেশ হইতে দ্বারে আঘাতের উপর আঘাত হইতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া দিলে স্থানীয় ফৌজদার (দারোগাকে ফৌজদার কহে) কয়েকটী ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসিলেন, "What's that! you're a Bengalee, I suppose?" (এ কি হচ্ছে? আপনি বাঙ্গালী বোধ হচ্ছে?) আমি উত্তর করিলাম, "ইহা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছু নয়। আর হাঁ, আমি বাঙ্গালী।" তৎপরে তিনি আমায় একটী স্বতন্ত্র নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া হিন্দিতে কহিলেন, "আপনি ত জানেন, মোহান্ত আর অধিকারীর মধ্যে কি রকম মামলা চলেছে। এতে অধিকারী নিশ্চয় জিতবে, কেন না, সে খারাপ হলেও এখানকার অনেক বড় বড় লোককে হাত করতে পেরেছে; আর মোহান্তের পক্ষে কেউ নেই বল্লেই হয়। আপনি বড় এর ভিতর থাকবেন না; থাকলে হয়ত অধিকারীর চক্রে পড়ে ফেঁসে যেতে পারেন। তাই আপনাকে বন্ধুর মত পূর্ব্বে সাবধান ক'রে দিচ্ছি।" আমি বলিলাম, "মোহন্তজীকে যে রকম দেখছি, উনি অল্প বয়স্ক হ'লেও অতি সজ্জন এবং সচ্চরিত্র। অতএব ওঁর কাযে যখন সহায়তা করতে নেমেছি, তখন ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে আমি আপনার কথামত কার্য্য কর্ত্তে অক্ষম।" ইহা কহিয়া আমি ফৌজদারের সঙ্গে পূর্ব্বকক্ষে আসিয়া মোহান্তজীকে যথাযথ নিবেদন করিলে তিনি কহিলেন, "আপনি বিদেশী, আপনাকে আমি নিজের জন্য কখন বিপদগ্রস্থ হ'তে দেব না। যা হোক আপনি ত দেখলেন আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর কিরূপ ব্যাঘাত। আমায় আমার গদীতে বসতে দেয় না, প্রায় সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে, ভগবানের সেবার জন্য যা যা জিনিষের দরকার আমি বল্লেও যোগায় না, রাত্রে আমায় মন্দিরে থাকতে দেয় না পাছে আমি তার কুক্রিয়া ধ'রে দিই, আর আজ আমার হোম পণ্ড করবার চেষ্টা! যদি আপনি আমার উপকার করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সেবা সুশৃঙ্খলার সহিত দেখতে চান ত, এই সব ব্যাপার মহারাজের দরবারে জানাবেন—আপনার কাছে আমার এই নিবেদন।" তাঁহার কথায় আমি সর্ব্ব সমক্ষে স্বীকার করিলাম যে, প্রত্যাগমন কালে আমি বরোদা গিয়া রাজ দরবারে এ সব ঘটনা নিবেদন করিয়া ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিব।

আমার অবস্থিতি কালে একদিন শঙ্খচূর্ণ মঠের মোহান্তজী দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। মঠটী বেটের প্রায় শেষ সীমায় অবস্থিত এবং পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। মঠাভ্যন্তরে মহাদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র মন্দির আছে। মঠের মোহান্তজী এবং অন্যান্য সাধুগণ শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী! মোহান্তজী বৃদ্ধ এবং সদাশয় ব্যক্তি—অতি যত্ন সহকারে নানাবিধ গুজরাতী মিষ্টান্ন দ্বারা আমার সৎকার করিয়া মিষ্ট ভাষায় বিদায় করিলেন। ইনি

পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মী দেবীর মোহান্তের হিতাকাঙ্ক্ষী মিত্র। বেটে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ আছে।

রথযাত্রার দিন শ্রীচরণছোড়জীকে রথে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" ক্ষুদ্রকায় রথোপরি শৃঙ্গারে ভূষিত হইয়া রণছোড়জী অবস্থিত—মোহান্তগণ তাঁহাকে ধারণ করিয়া আছেন, মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা রথ টানিতেছে। যাত্রীরা ভিড় ঠেলিয়া মধ্যে মধ্যে রজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক রথ চালনে সহায়তা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কর্ম্মচারীর হাঁকডাক, ধাক্কাধাকি ও প্রহার পর্য্যন্তও চলিতেছে—আর প্রায় পঞ্চশত কণ্ঠে "জয় রণছোড়জীকী জয়," "জয় দ্বারকাধীশ কী জয়" ইত্যাদি জয় জয় ধ্বনি মন্দির প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া গগনে উঠিতেছে। এই প্রকারে শ্রীদ্বারকানাথের রথ মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে এদিক ওদিক প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বিচরণ করিতে লাগিল।

রথযাত্রার দিন-কয়েক পরে আমি একদিন প্রাতঃকালে বেট ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে পাঁচ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে নদীতটে আসিলাম। এ স্থান হইতে এক মাইল দূরে গোপীতলাও তীর্থ। দীর্ঘিকাটি প্রায় ১০।১২ বিঘা হইবে। উহার তিনদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট। তটে অনেকগুলি মন্দির বা মঠ আছে, তন্মধ্যে গোপীনাথজীর মন্দিরই প্রধান ও প্রসিদ্ধ। দীর্ঘিকার মৃত্তিকাকে 'গোপী চন্দন' বলে। উহার বর্ণ পীতাভশ্বেত—অনেক বৈষ্ণব উহার তিলকসেবা করিয়া থাকেন।

এখানে একটী ধর্ম্মশালায় আহারাদি করিয়া, দ্বিপ্রহরে রওনা হইয়া, গোমতী দ্বারকাভিমুখে প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নাগেশের মন্দিরে আসিলাম। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন এবং চতুষ্পার্শ্ব প্রস্তরে বাঁধান কুণ্ডের পার্শ্বে অবস্থিত। কুণ্ডস্থিত জল সহায়ে মন্দির সেবা হইয়া থাকে। মন্দিরাভ্যন্তরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি এবং বাহিরে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ বা নন্দী আছে। নিকটে কোন গ্রাম বা বসতি নাই। নাগেশ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একতম, যথা—"নাগেশর্ দারুক বনে"।

প্রত্যাবর্ত্তন।

নাগেশের নিকট হইতে দুইটী পথ গিয়াছে—একটী ৬।৭ ক্রোশ গিয়া গোমতী দ্বারকায় পৌঁছিয়াছে, অপরটী অধিক দূর গিয়া দ্বারকা হইতে ৩ মাইল ব্যবধান পোড়বন্দরের রাস্তায় মিলিয়াছে। আমি এই দ্বিতীয় পথ সহায়ে পূর্ব্বাতিবাহিত মার্গে তৃতীয় দিবস প্রাতে পোড়বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সে দিন তথায় অবস্থান করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে রেলযোগে আহমেদাবাদ এবং আনন্দ-পেহলাদ আদি হইয়া তৃতীয় দিন প্রাতে বরোদা পৌঁছিলাম।

বরোদা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী মহারাষ্ট্রীয় মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। সেখানে শুনিলাম যে, মহারাজ গায়কোবাড় ভারত বহির্ভূত দেশে গিয়াছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য একটী কমিটী দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সে কমিটীর প্রধান আমাদের বঙ্গদেশীয় মিষ্টার গুপ্ত এবং তাঁহার সহকারী পঞ্জাব প্রদেশস্থ দেওরাম টেকচাঁদ।

মন্দিরে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আমি প্রথমে মিষ্টার গুপ্তের বাঙ্গালাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া আরদালীর নিকট শুনিলাম, তিনি চা পান করিতেছেন। আমি খবর দিতে বলায় সে চলিয়া গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া কহিল যে, তিনি দেখা করিতে অপারক। বিফল মনোরথ হইয়া অগত্যা আমি দেওয়ান টেকচাঁদের বাঙ্গলায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি সৎ প্রকৃতির লোক—আমাকে নিকটে বসাইয়া চা পান করাইলেন এবং বেটদ্বারকার সেই মোহান্তজী ও অধিকারীর বিবাদের বিষয় আমার নিকট আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া, একখানা কাগজে লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাঁহার কথা মত করিলে তিনি কাগজখানি রাখিয়া দিলেন এবং উহার তদন্ত করিবেন স্বীকার পাইলেন। পরে গোয়ালিয়রে অবস্থান কালে

আমি তাঁহার একখানি পত্র পাই, তাহাতে জানিতে পারি যে, তিনি তদন্তের ভার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। ইহার পর বহুস্থান পর্য্যটন বশতঃ এ বিষয়ে আর কোন সংবাদ লইতে পারি নাই, তবে কয়েক বৎসর পরে হরিদ্বারে একদিন একটী দ্বারকাবাসীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, অধিকারী আপিলে জয়লাভ করিয়াছে এবং মোহান্তজী নাকি মনঃকষ্টে আত্মহত্যা করিয়াছেন! এ সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

সে দিন বরোদার রাজপ্রাসাদাদি দেখিয়া রাত্রি ৯টার গাড়ীতে রওনা হইলাম এবং রতলাম হইয়া বেলা আন্দাজ ১০টার সময় উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলাম। যদিও উজ্জয়িনী এক সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান উজ্জয়িনী গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত একটী আধুনিক সহর। এখানে বহু সাধু সমাগম হইয়া থাকে। শিপ্রা নদী ক্ষুদ্রকায়া, এমন কি গরুর গাড়ী অনায়াসে পার হইয়া যায়। '২৪ খম্ভেকা দরোয়াজা' (অর্থাৎ ২৪ স্তম্ভ বিশিষ্ট দ্বার) দেখিলাম—ইহাই বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের প্রস্তর নির্ম্মিত ও সিন্দুরাদি লেপিত ভগ্ন সিংহদ্বার। মহাকালেশ্বরাদি কয়েকটি মন্দির দর্শনান্তর সহরের বহির্ভাগে উত্তর প্রান্তে আসিয়া "ভর্তৃহরিকা গুফা" দেখিলাম। অবন্তীশ্বর ভর্তৃহরি রাজ্যসুখে বীতরাগ হইয়া নাকি এস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। একটী সুরঙ্গ দেখিলাম, প্রবাদ উহা নাকি কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

রাত্রের গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন প্রাতে ভূপাল আসিলাম। কথায় বলে—

তাল তো হায় ভোপাল তাল আউর সব তলৈয়াঁ।
রাণী ত হায় কমলাপৎ রাণী আউর সব গধাইয়াঁ॥

—অর্থাৎ হ্রদের মধ্যে একমাত্র ভূপাল হ্রদই শ্রেষ্ঠ, আর সব ক্ষুদ্র সরোবর বিশেষ; এবং রাণীর মধ্যে একমাত্র কমলাবতী রাণীই উল্লেখযোগ্যা, অপর সকলে স্ত্রী-গর্দ্দভ বিশেষ। বহু দিবাবধি এই প্রকার দম্ভসূচক উক্তি শ্রবণ করায় একবার ভূপালের 'তাল' দেখিবার বাসনা হৃদয়ে পোষিত ছিল। তাই এই সুযোগে উহা দেখিয়া লইলাম। হ্রদটী প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু ঐ শ্লোকোক্তি প্রণেতা বা উহার আবৃত্তিকারীরা নিশ্চয় রাজপুতনান্তর্গত শম্বর অথবা গঞ্জামের চিলকা হ্রদ দেখেন নাই; যদি দেখিতেন তাহা হইলে কখনও ও প্রকার বলিতে সাহসী হইতেন না। যাহা হউক, আমি ঐ হ্রদ এবং বেগমের শিষ মহলাদি বাহির হইতে দেখিয়া, অপরাহ্নের গাড়ীতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে গোয়ালিয়র আসিয়া পৌছিলাম।

গোয়ালিয়রে আমি মাতাজীর কোঠিতে অবস্থান করিলাম। (আমি ইঁহাকে এই নামে ডাকিতাম। ইনি গোয়ালিয়র-সেনাপতি পরলোকগত প্রসিদ্ধ আঙ্গরে সাহেবের বৃদ্ধ বিধবা।) ইঁহার সহিত গঙ্গোত্তরীর পথে আমার আলাপ হয়। কয়েক দিন একত্র তীর্থবাস বশতঃ পুত্রস্নেহে আমায় তিনি 'বেটা' বলিতেন এবং বিদায়কালে একবার তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করেন। মাতাজী আমায় একপক্ষ কাল রাখিয়া সব নব উৎসব দ্বারা, তাঁহার জমীদারীর নূতন নূতন স্থান দেখাইয়া এবং কখনও বা শিকারাদির বন্দোবস্ত করিয়া আমার সৎকার করিলেন। গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদ এবং পর্ব্বতোপরি দুর্গাদিও দেখিলাম। অবশেষে তথা হইতে বিদায় লইয়া হরিদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

জাতীয়তা ও খদ্দর

যে দেশে প্রত্যেক লোকই একটী ভিন্ন "জাতি" সে দেশে জাতীয়তা নাই ইহা শুধু অদৃষ্টের একটী বিষম পরিহাস। জাতীয়তা নাই শুধু ইহাই নহে, জাতীয়তা জিনিষটা কি এখনও পর্য্যন্ত সাধারণে বুঝেন না। আবার যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন, 'আমাদের জাতীয়তায় প্রয়োজন নাই'—ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে। জাতীয়তা নাই, তথাপি এই দেশেই শিখ জাতির হুঙ্কারে হিমাদ্রি চঞ্চল হইয়াছিল, মারহাট্টার তূর্য্য নিনাদে গঙ্গার সৈকতভূমি পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল, রাজপুতনা জাতীয় গৌরবে জগতের শীর্ষস্থানই অধিকার করিয়াছিল। শিখ একটা জাতি—এখনও তাহাদের প্রাণের সাড়া মাঝে মাঝে পাওয়া যায়; মারহাট্টা একটা জাতি ছিল, রাজপুতও একটা জাতি ছিল—কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া কখনও কোন জাতি ছিল না।

ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ, পুরাকালে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, মুদ্রণ-যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই—বাঙ্গালার মনোভাব মারহাট্টাকে জানাইবার সুবিধা ছিল না, ইহা সমগ্র ভারতবাসীকে এক জাতীয়ভাবে উদ্দীপ্ত করিবার পক্ষে অন্তরায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর মধ্যে কখনও জাতীয়ভাব জাগে নাই—সে আমরা প্রতাপাদিত্যের গান যতই উচ্চঃস্বরে করি—আর মোহনলাল মোহনলাল বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন।

কোন একটা বড় কায করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া করিতে হয়। রাজাকে দেশজয় করিতে হইলে বা দেশরক্ষা করিতে হইলে সৈন্যকে সুশিক্ষিত করিতে হয়। সুশিক্ষিত সৈন্য সেনাপতির অঙ্গুলি সঞ্চালনে চালিত হয়, সেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে থামিয়া যায়। একটা 'জীবন্ত জাতি' অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য মাত্র; তাহারা দেশের আহ্বানে দেশের কাযে লাগিয়া যায়—কিছুমাত্র বিচার করে না। তাহারা ধর্ম্মগত বিষয়গত কোন দ্বন্দ্বই তখন রাখে না, চিরশত্রুর সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দেশের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে। তবে জাতীয়তা লাভ করিতে হইলে কি যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইবে? ঠিক তাহা নহে। তবে দেশের আহ্বানে সকলকে উঠিতে বসিতে হইবে ইহা ঠিক। যদি আমরা ভারত মহাসভাকে 'জাতীয় মহাসভা' বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে সকল প্রকার যুক্তিতর্ক বিসর্জ্জন দিয়া ভারত মহাসভার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। ভারত মহাসভা যদি স্থির করেন 'প্রত্যেক ভারতবাসীকে জাতীয় মঙ্গলের জন্য প্রাতে একক্রোশ করিয়া বেড়াইতে হইবে'—তবে তাহাই করিতে হইবে; যদি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তাহা ভারত মহাসভার ভিতরেই বলিতে হইবে, তাহার বাহিরে নহে; এযুক্তি যদি খণ্ডন করিতে হয় তাহা হইলে ভারত মহাসভার ভিতরেই করিতে হইবে। যদি ভারত সভার আদেশ হইয়া যায়, তাহা হইলে শত মতদ্বৈধ থাকিলেও সে কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে—যে না করিবে সে জাতীয়তা লাভ করিবার অযোগ্য। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে ইংরাজের শত শত যুক্তি ছিল, সহস্র সহস্র ইংরাজের ইহাতে সম্পূর্ণ অমত ছিল, কিন্তু ভ্রম করিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, যে মুহূর্ত্তে ইংলণ্ডের মহাসভা স্যর এডোয়ার্ড গ্রে'র মত সমর্থন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তন্মুহূর্ত্তে যে ইংরাজের জার্মানি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল, সেও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কারণ ইংরাজ একটা জাতি; যেখানে জাতীয় স্বার্থের উপর আঘাত লাগে সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এবং জাতি বা নেশন বলিয়াই তাহারা এই বিগত মহাযুদ্ধে

জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল ; আর যে কারণ থাকে থাকুক, কিন্তু ইহাই যে মুখ্য কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজ এ যুদ্ধে কিরূপ জাতীয়তার পরিচয় দিয়াছিল, কিরূপে লক্ষ লক্ষ যুবক অম্লান বদনে দেশের জন্য জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিরূপে প্রত্যেক নরনারী—এমন কি আতুরাশ্রমবাসীরা পর্য্যন্ত—দেশরক্ষার কোন না কোন কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিল, তাহা বিগত যুদ্ধের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন। ঘুস্ দিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা হয় নাই, লক্ষ লক্ষ যুবকের হৃদয়ের পবিত্র শোণিত দানে দেশ রক্ষা করা হইয়াছিল। ইংরাজ যথার্থই গর্ব্ব করিতে পারে এই মহাযুদ্ধে কোন ইংরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে গোয়েন্দার কায করে নাই, কোন ইংরাজ জার্ম্মানীকে এতটুকু সাহায্য করে নাই—ইংরাজ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ত দূরের কথা!

এই জাতীয়তার বিন্দুমাত্র অংশ একদিন কলিকাতা উপলব্ধি করিয়াছিল—যেদিন দেশের আজ্ঞায় গত ১৯২১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে হরতাল হইয়াছিল। "হুকুম এসেছে দোকান বন্ধ কর—সব কায বন্ধ কর"—অমনি যন্ত্রের ন্যায় মহানগরী কলিকাতায় সমস্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, রাস্তার দীপটী পর্য্যন্ত জ্বলিল না, ভিক্ষুক ভিক্ষায় বাহির হইল না—ইহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে কেহ বিবেচনা করিল না।

মহাসভা আদেশ করিলেন "খদ্দর পর, চরকা ধর।" ত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি সে আদেশ শিক্ষিত সৈন্যের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে ইংলণ্ড ত দূরের কথা, সমস্ত সভ্য জগৎ ভারতবাসীর নিকট সম্ভ্রমে মস্তক নত করিত। তখন ত্রিশকোটি ভারতবাসীর-ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইত? আমরা যদি জাতীয় জীবনের প্রমাণ দিতে পারিতাম, তবে এ মহাদেশের আদেশ লঙ্ঘন করিতে কাহার শক্তি হইত? যদি আমরা জাতির জন্য, দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে, বিলাস সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি দেখাইতে পারিতাম—কে আমাদের অবজ্ঞা করিতে পারিত? দেশের টাকা দেশে থাকিত কি না, ম্যাঞ্চেষ্টার ইহার জন্য বিলাতের মহাসভায় আমাদের তরফ হইতে ওকালতি করিত কি না এ সমস্ত পরের কথা। আমরা যদি শুধু ইহাই বুঝাইতে পারিতাম যে আমরা প্রয়োজন হইলে একতাবদ্ধ হইতে পারি, মহাসভার আদেশই আমাদের একমাত্র পরিচালক, তাহা হইলে স্বরাজ আমাদের স্বপ্নরাজ্য হইত না। তবে মহতী সেনার মধ্যে সেনাপতির আদেশ মুহূর্ত্ত মধ্যেই পরিচালিত হয় না, সেখানেও কিছু সময় লাগে। সুতরাং এ আদেশ যে অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত ভারতবাসীর গ্রহণীয় হইবে তাহাও আশা করা যায় না। এখনও সময় আছে—যেখানে যে এই আদেশ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাকে এই আদেশ পালন করিতেই হইবে—ইহার ফল ভাল কি মন্দ, প্রশ্ন করিবার অধিকার পর্য্যন্ত তোমার নাই, এ অধিকার তুমি নিজে স্ব-ইচ্ছায় জাতীয় মহাসভার হস্তে তুলিয়া দিয়াছ।

যখন Light Brigadeকে charge করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন সে আদেশ ভ্রমপূর্ণ জানিয়াও কেহ অবহেলা করে নাই। যদি করিত, তখনই সে সৈনিকশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইত এবং তাহাকে গুলি করিয়া মারা হইত। যে ব্যক্তি মহাসভার আদেশ-পালনে পরাঙ্মুখ, সে জাতীয়তা লাভের গৌরব হইতেও বঞ্চিত এবং দেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার মতামত নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে। প্রত্যেক সৈনিকেরও সেইরূপ ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা আছে, কিন্তু তাহা Parade groundএর বাহিরে। তথায় কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। চরকা ও খদ্দরের বিরুদ্ধে যত যুক্তি আছে তাহা তুমি বলিতে পার মহাসভার ভিতর, কিন্তু বাহিরে নহে। যদিই বল, খদ্দর পরিয়া চরকা চালাইতে চালাইতে বলিতে হইবে। জাতীয় মহাসভার আদেশ কিছুতেই অমান্য করিতে পারনা—কেননা সে যে

আমাদেরই মহাসভা। অনেক চিন্তার পর মহাত্মার এই মঙ্গলময় আদেশ মহাসভা প্রচার করিয়াছেন—“চরকা ধর, খদ্দর পর।” কিন্তু এ আদেশ না দিয়া যদি মহাসভা আদেশ দিতেন—“সকলে ছোট ছোট ধনুক তৈয়ারী কর”—জাতীয় হিসাবে তাহাই করিতে হইত, কেননা ইহাই জাতীয়ত্বের লক্ষণ। হিন্দু টিকি রাখে, মুসলমান দাড়ী রাখে, পঞ্জাবী পাগড়ী বাঁধে, বাঙ্গালী মাথা খোলা রাখে—কিন্তু ইহারা একজাতি, কেননা ইহারা এক মহাসভার আদেশে পরিচালিত হয়, চরকা কাটে, খদ্দর পরে।

ইহা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে, আমরা জাতীয়তা শিক্ষার প্রথম সোপানে মাত্র উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু এই ত্রিশকোটি মানব যদি এই প্রাথমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহা হইলেই যে কায হইত, তাহাতে জগৎ চমৎকৃত হইয়া যাইত, আমাদের অপ্রাপ্য বুঝি কিছু থাকিত না। হায়, যে বাঙ্গালী, জাতীয় জীবনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, সে আবার শিক্ষার গর্ব্ব করে! বঙ্কিমচন্দ্র ত্রিবিধ মূর্খের কথা বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন সেই সর্ব্বপ্রধান মূর্খ। বাঙ্গালী এই সর্ব্বপ্রধান মূর্খের আসনের দাবী অবশ্যই করিতে পারে! যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সে যদি শিক্ষিত, তবে মূর্খ কে? বাঙ্গালী পিতা বুক চাপড়াইতেছেন - বড়সাহেবকে ধরিয়া আমার ছেলেকে ডেপুটী করিয়া দিতাম, হায় তাহাকে জেলে লইয়া গেল! তবু ছেলে মরে নাই—দেশের জন্য যাহা মহাপুণ্যের কায তাহা করে নাই। এই যে ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ যুবক অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিল, তাহাদের কি মা বাপ নাই, না তাহাদের পত্নী পুত্র নাই, না তাহাদের দয়ামায়া নাই? তবু তোমার ছেলে মরে নাই। জীবিকা উপার্জ্জনের হাজার দরজা তাহার খোলা রখিয়াছে, গোলামী নাহয় নাই করিল, তাহাতে এমন কি সর্ব্বনাশ হইবে? সে যদি বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ হয়, জীবিকার তাহার অভাব হইবে না। আর শিক্ষা? সে বরং প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। আর অমুক বাবুর পুত্র যে ডেপুটী হইল, সেত এই প্রাথমিক পরীক্ষায় এক নম্বরও পায় নাই! শিক্ষার কি একমাত্র উদ্দেশ্য চাকুরি বাগানো? তাহার উদ্দেশ্য কি মনুষ্যত্ব লাভ নহে? যাহারা হুজুগে পড়িয়া জেলে গিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র হইতে পারে; কিন্তু যে ছেলেরা মহাসভার আদেশ বলিয়াই দেশের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবলিদান দিয়াছে, তাহারা উচ্চপদস্থ ডেপুটীগণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তাহারা চিরকাল আমাদের নমস্য হইয়া থাকিবে। ডেপুটী বাবুকে এজলাসের বাহিরে কে পুছিবে? এসকুইথ সাহেবের পুত্র যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিত, পরে ইউনিভার্সিটির অতি উচ্চ ডিগ্রী পাইলেও, ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোক তাহার সহিত বাকালাপ করিতেন না।

প্রশ্ন হইবে, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কখনও কি এক জাতি হইতে পারে? কেন পারিবে না? এক সেনাপতির আদেশে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, শিখ, রাজপুত, পাঠান, মারহাট্টা কি সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই? ব্রাহ্মণ, রাজপুত রেজিমেণ্টে কি নিজ নিজ ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেনাপতির আদেশ পালন করে নাই? সে সব কথা নহে। এই খদ্দরের সূত্রে সমস্ত ভারতবাসী একতাসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে, তাই মহাসভা আদেশ করিয়াছেন ‘খদ্দর পর।’ যিনি মুসলমান তিনিও খদ্দর পরিতে পারেন, যিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তিনিও খদ্দর পরিতে পারেন, যিনি সি আই ডি অফিসার তিনিও খদ্দর পরিতে পারেন, ইহাতে কাহাকেও ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে না, অথচ তিনি জাতীয়তা রক্ষা করিতে পারিবেন!

কেহ কেহ বলেন খদ্দর সস্তা হইলে, মিহি হইলে পরিব। খদ্দর মিহি ও সস্তা হইলে সকলেই পরিত, তাহার জন্য বিশহাজার ভারতসন্তানকে জেলে যাইতে হইত না। কিন্তু গৌরব কিসে বেশী, সস্তা মিহি খদ্দর পরায়, না মহার্ঘ্য মোটা খদ্দর পরায়? গৌরব কাহার? যে বাঙ্গালীপলটন অক্ষত শরীরে ফিরিয়া

আসিয়াছে, না যে 29th Punjabis ধ্বজামাত্র সম্বল করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে? এই খদ্দর পরিধানের জন্য যাহাকে যত বেশী ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, তাহার তত বেশী গৌরব। হিন্দুকেও একথা বুঝাইতে হয় ইহাই দুঃখের বিষয়। হিন্দু ভগবানের উপাসনা করে অভুক্ত থাকিয়া, হিন্দু জানে ভগবানের জন্য যে যতটা ত্যাগ স্বীকার করে সে তত পুণ্যবান। কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার না করিয়া জাতীয়তার দাবী করিব, এত বড় অসম্ভব দাবী কুত্রাপি গ্রাহ্য হইতে পারে না। একদিন কালীঘাটের এক পাণ্ডাকে বলিয়াছিলাম, মন্দিরে আরও দুই একটা দরজা করিয়া দিলে দর্শনের সুবিধা হয়। সে বলিয়াছিল, মায়ের দর্শন করিতে হইলে একটু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে বৈ কি! কষ্ট স্বীকার না করিলে মাও সন্তানের মুখ দেখিতে পান না, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, ইহার ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই।

কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলেন, চরকা চালাইলে কি ম্যালেরিয়া দূর হইবে, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে? হাঁ, হইবে। জাতীয়তা লাভ হইলে, গ্রামের একজন লোক যে কার্য্য করিতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সে কায করিতে পারিবে। একতা আসিলে ভয় দূর হইবে, খদ্দর আসিলে দৈন্য দূর হইবে, বিলাসিতা যাইবে, সহরের লোক আবার পল্লীগ্রামে যাইবে, মোটরের মোহ কাটাইয়া খাঁটী দুধ ঘিতে শরীর পুষ্ট করিবে, নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে।

অনেকে আবার বলেন, এ সমস্ত সেন্টিমেণ্টালিটি। হউক সেন্টিমেণ্টালিটি, সেন্টিমেণ্টালিটির খাতিরে পুত্র-পরিবারের জন্য অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে পার, আর দেশমাতৃকার জন্য এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিতে পার না?

কতকগুলি বিশ্বপ্রেমিক আছেন তাঁহারা বলেন ইহা বয়কটের নামান্তর মাত্র, ইহাতে অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষের ভাব বর্ত্তমান আছে। ইহা ভুল, ইহা বয়কট নহে, ইহা আত্মজীবন লাভের ও আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। ইহাতে বিদ্বেষ মাত্র নাই, বরং যাহাতে আমাদের সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হয় তাহার ব্যবস্থা আছে। আগে তুমি শিখ মুসলমান রাজপুত পাঠানকে আপনার জন ভাবিতে শেখ—তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীকে ভালবাসিতে শেখ, তাহার পর সার্ব্বভৌমিক প্রেমের কথা বলিও।

পূজ্যপাদ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই খদ্দরের economic side লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। আশাকরি পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মায়ের হাতে কাটা, স্ত্রীর হাতে কাটা সুতার কাপড় পরিতে কি বেশী মিঠা লাগে না? তার চেয়ে কি ভাল ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতির হাতের কাপড়? আমরা না কবিত্বপ্রিয় জাতি বলিয়া বড়াই করি? আমরা কি এতই নীরস এতই প্রাণহীন লইয়া পড়িয়াছি? আমাদের কি এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নাই? আমরা এখনও বিদেশী বস্ত্রে অঙ্গ শোভিত করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াই—কি মনে করে এই বিদেশীরা? তাহারা মনে মনে হাসে, আর বলে, বক্তৃতাই কর আর যাই কর, কাযের বেলায় তোমাদের যোগ্যতা কত তাহা আমাদের জানা আছে। আজ যে মহাত্মা কারাগারে, তিনি যে আমাদের সকলের পাপ, স্বার্থপরতা মস্তকের উপর গ্রহণ করিয়া কারা বরণ করিয়া লইয়াছেন, আমাদের এতটুকু ত্যাগস্বীকারে মহৎকল্যাণ হয়, আমরা কি সে সামান্য ত্যাগটুকু করিয়া জগতের সম্মুখে আমাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে পারিব না?

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাতৃহৃদয়।

তাহার পর দিন ভোরের বেলাই মেঘ করিয়াছিল। শেষরাত্রে বেশ একপশলা জল হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নও পথে ঘাটে রহিয়াছে। ৭টা বাজিতেই মাতার নিকট জলযোগ শেষ করিয়া অশোক একটু চিন্তিতমনে শরৎদের বাড়ী চলিল। আকাশে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্যমান হইলেও তাহার আভাসটুকু লুপ্ত হয় নাই। মেঘান্তর্হিত দিবাকরের মত, অশোকের কৃত-কার্য্যতার আনন্দটুকুও বন্ধুর রোগচিন্তায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল।

শরৎদের বাড়ী পৌঁছিয়াই অশোক দেখিল, যোগমায়া রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অশোককে দেখিয়াই তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ অশোক, তোমার পাশের খবর কাল এসেছে শুনলাম। 'কালই খবর দিয়ে পাঠাওনি কেন? শরৎ আজ সকালে শুনে তোমার ওপর রাগ করেছে।"

অশোক কোন উত্তর না করিয়া, ম্লানমুখে শুধু একটু লজ্জিত হাস্য করিয়া যোগমায়ার পদধূলি লইল।

যোগমায়া অশোকের গোপন ব্যথাটুকু বুঝিলেন। তাই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন - "তার আর কি হবে বাবা, তবু তো তুমি পাশ করেছ। এতেই তার কত আনন্দ। আজ ভোরে উঠেই খবর পেয়ে শরৎ বল্লে – 'মা, আজ অশোককে এখানে খেতে বল, আর তোমার বৌমাকেও নেমন্তন্ন করে' পাঠাও।' তাই সকালে সকালে উঠে রান্না চড়িয়েছি। বৌমাকেও বলে পাঠিয়েছি। ভাবলাম তুমি একটিবার আসবেই, তাই তোমার কাছে এখনও খবর দিইনি।"

শরতের স্ত্রীর কথা উঠিতেই, বন্ধুর সহিত অশোকের গতকল্য যে সব কথা হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী সুসঙ্গিনী যাহাতে মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার প্রতি অনুরক্তা হয়, এই জন্যই শরতের এই চেষ্টা তাহা অশোক বুঝিল। সে মনে মনে স্থির করিল, শরতের নিকট যাইবার পূর্ব্বেই আজ খুড়িমার নিকট কল্যকার সেই কথা উত্থাপন করিবে।

নূতন জিনিষ কি কি রান্না হইবে, শরতের স্ত্রী কখন আসিবে ইত্যাদি দুই চারিটি অন্য কথা কহিয়া অশোক বলিল—"খুড়িমা, একটা কথা তোমাকে বলব বলব ভাবি, রোজই ভুলে যাই।"

যোগমায়া বলিলেন—"কি কথা বাবা?"

অশোক চট্ করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিল না। দেখিল, পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিল, কথাটি উত্থাপন করা তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিন। অথচ বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলে কথাটা আরও নির্দ্দয় রূঢ় ঠেকিবে। তাই কোনপ্রকারে অশোক বলিয়া ফেলিল,—"শরতের শ্বশুর লোক তেমন ভাল নন্। তাই সাবধান হওয়ার জন্যে আপনার নামে সম্পত্তির একটা অংশ লেখাপড়া করে নিলে ভাল হয়।"

যোগমায়ার মুখের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার কথা কহিবার শক্তি লুপ্ত হইল। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাবা, ডাক্তার কি আর একেবারেই আশা নেই বলেছে?"

মাতৃহৃদয়ে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে অনুমান করিয়া অশোক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া বলিল,—"না

খুড়িমা, ডাক্তার সে কথা কিছুই বলেননি। তবে রোগ ভাল নয় তা তো আপনি জানেন। সে জন্যে ভবিষ্যৎ ভেবে এটা করলে কোন ক্ষতি নেই, তাই বলছিলাম। শরতের মনটাও তাতে একটু নিশ্চিন্ত থাকে। সেও সেদিন বলছিল এরকম কল্লে মন্দ হয় না।"

ধীরে ধীরে যোগমায়ার মুখে একটা ম্লান গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ ভেবে ভালোর জন্যেই একথা বলছ তা আমি বুঝেছি। কিন্তু তাতে কিছু দরকার নেই। ভগবান না করুন, যদি শরতের অভাবই সহ্য করতে হয়, তাহলে এমন কোন অভাব নেই যা আমার তখন সইবে না। অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট দুদিন গেলে সয়ে যাবে। কিন্তু প্রাণ ধরে আমি আমার শরৎকে সে ব্যবস্থা করতে দিতে পারব না।"

অশোক বলিল—"শরৎ কিন্তু বলছিল—এতে তার মন আরও হাল্কা হয়ে যাবে।"

যোগমায়া বলিলেন—"তোমার কাকা বলতেন, 'আমি ভাল হব কোন ভয় নেই', এ বিশ্বাসটা রোগীর বড্ড দরকার। এ বিশ্বাস যাতে কমে, এমন কোন কায করা কিছুতেই উচিত নয়। ও ভাবনাটাই শরতের মন থেকে একেবারে দূর করে দিতে হবে। তোমরা সবাই মিলে তাকে বিশ্বাস করিয়ে দাও, ওসব ব্যবস্থার কিছুই দরকার এখন নেই। আমার কপালে যা থাকে থাক্, তাকে নির্ভরসা আমি কিছুতে হতে দেব না।"

ইহার উত্তরে অশোক আর কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু নিঃস্বার্থ মাতৃহৃদয়ের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায় তাহার তরুণ হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

"আপনার কথাই ঠিক খুড়িমা। আমি শরৎকে এই কথাই বুঝিয়ে বলিগে।" বলিয়া অশোক উপরে শরতের নিকট গেল।

যোগমায়া কিছুক্ষণ রন্ধনগৃহের দুয়ারে উন্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে আপনার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আশাহত।

শরৎ যখন স্ত্রীকে একদিন আনিবার জন্য মার নিকট ইচ্ছাপ্রকাশ করিল, তখন সেই ইচ্ছার মূলে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার আগ্রহ ছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল।

মাত্র দুইবৎসর হইল সুসঙ্গিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশ কালই সে কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়াছে। অবকাশকালে যখন বাড়ী যায়, শ্বশুরগৃহে তাহার সহিত সাক্ষাতের স্বল্প পরিচয়ে যে সমবেদনা ও নির্ভরতা সৃজিত হইয়া উঠিতেছিল, রোগশয্যা-গ্রহণ ও দূরাবস্থানে তাহা ধীরে ধীরে অসমাপ্ত ও পরিত্যক্ত-নির্ম্মাণ কাঁচা গৃহের মত ভগ্ন ও শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। বেশীদিন বধূর অদর্শনে পুত্র মনে ব্যথা পাইবে ইহা বুঝিয়া, দিবা-ভাগে মাঝে মাঝে যোগমায়া তাহাকে বাড়ীতে আনাইয়া, মায়ের স্নেহে তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সন্ধ্যার সময় পিতৃগৃহে পৌছাইয়া দিতেন। তাঁহার মনে ইচ্ছা ছিল বধূমাতাকে কছুদিনের জন্য নিজের কাছেই রাখেন, কিন্তু বৈবাহিকের কঠিন নিষেধের জন্য তাহা করেন না।

মাঝে মাঝে সুসঙ্গিনীকে দেখিয়া শরতের মন একটু শান্ত হইত, কিন্তু সুসঙ্গিনী মনকে অত সহজে শান্ত করিতে পারিত না। তাহার যৌবনোন্মেষিত চিত্ত স্বামিগৃহেই থাকিতে চাহিত। না হয় স্বামীর কাছে অধিকক্ষণ নাই থাকিবে। স্বামীর গৃহে থাকিলে তাঁহার কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পিতার অমত তাহা সে জানিত, কিন্তু শাশুড়ী যদি অভিভাবিকার মত জোর করিয়া বলিতেন, না আমার বৌমা আমার কাছে থাকিবেন, তাহার বিরুদ্ধে তাহার পিতা কি কিছু বলিতে পারিতেন? শাশুড়ীর হৃদয় না হয় বধূমাতার দুঃখে না

কাঁদিতে পারে; কিন্তু স্বামী—তিনিও কি একবার বলিতে পারেন না—আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আনিয়া রাখ? মেয়েকে কেন শ্বশুরবাড়ী পাঠান হয় ইত্যাদি দুই চারিটি কথা যখনি সে শুনিত, তখন পিতা, মাতা, স্বামী, শাশুড়ী ও সর্ব্বোপরি চিকিৎসা শাস্ত্রটার উপর একটা বিষম ক্রোধে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। নারীদেহটা কি এতই অসার? তাহার মধ্যে বুদ্ধি, বল বলিয়া কি কোন পদার্থই নাই? ওসব কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িত। এক একবার মনে করিত যে সে জোর করিয়া স্বামীর কাছে চলিয়া যাইবে, কেন সে অপরের নিকট হইতে এই অপমান ও অবিচার সহ্য করিবে? কিন্তু সেখান হইতে কোন আহ্বানই আসে না! কিসের জোরে সে যায়?

সুসঙ্গিনীর যে কঠিন হিষ্টিরিয়া রোগ হইয়াছিল তাহার মূলে এই উদ্বেগ, মনঃক্ষোভ ও উত্তেজনা ছিল—যাহা শারীরিক রোগের চিকিৎসকগণ নির্দ্ধারণ না করিতে পারিলেও, প্রকৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের অজ্ঞাত রহিত না।

স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ হইলে সমস্ত সংকোচ কাটিয়া যাইত। সুসঙ্গিনী অনায়াসেই স্বামীকে বলিতে পারিত, আমি তোমার এখানেই থাকিব, তুমি আমাকে এখানে আনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কর। কিন্তু সংকোচ ও অভিমান ইহার অন্তরায় হইয়াছিল।

সুসঙ্গিনী যে এখানে আসিবার জন্য অতখানি ব্যগ্র তাহা শরৎ বুঝিতে পারে নাই। কত আশা ও কত আকাঙ্ক্ষা, পাখীর মত, এই তরুণ বয়সে যাহার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহাকে শুধু রুগ্ন স্বামীর সেবার জন্য কাছে রাখিতে তাহার বলিষ্ঠ অথচ স্নেহ-প্রবণ প্রাণ চাহিত না। কিন্তু দূর হইতে সমুদ্র গর্জ্জনের মত মৃত্যুর একটা গম্ভীরধ্বনি, সেখানকার বায়ু-স্রোতের মত একটা শীতল স্পর্শ যেন সে অনুভব করিতেছিল। তাই সংসারের সকলের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া, সকলেরই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। বিষয়ের একটা অংশ লেখা-পড়া করিয়া লইতে মায়ের যখন নিতান্ত অনিচ্ছা শরৎ বুঝিতে পারিল, তখন তাহার এই ইচ্ছা প্রবল হইয়া পড়িল যে, জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট মেয়াদটুকুর মধ্যে সে স্ত্রী ও মায়ের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী স্নেহের বন্ধন রচিত করিয়া দিয়া যাইবে। মা যাহাকে বুকে তুলিয়া লইবার জন্য দুট ব্যাকুল বাহু তুলিয়া আছেন—সে কি তাহার মাঝে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিবে না? শরতের বিশ্বাস ছিল, যে সুসঙ্গিনী যদি মায়ের দিকে থাকে, তাহা হইলে তাহার শ্বশুর মায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবেন না।

আজ যোগমায়া যখন তাঁহার এক দেবরপুত্রের সঙ্গে ঝিকে দিয়া সুসঙ্গিনীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাহার মনে প্রথমটা একটা প্রকাণ্ড "না" ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল একবার বেশ জোর গলায় বলে—'না আমি যাইব না—তোমাদের যখন ইচ্ছা হইবে আমাকে দয়া করিয়া খানিকক্ষণের জন্য ডাকিয়া লইয়া যাইবে—আমি তোমাদের সে দয়া আর লইব না।'

কিন্তু মানুষ যত কথা বলিবে এবং যত কায করিবে বলিয়া ভাবিয়া রাখে, তাহার কয়টা পারে? ক্রুদ্ধ অভিমানের প্রথম বেগটা কমিয়া গেলে সে ভাবিয়াছিল, কোন একটা ওজর করিয়া সে আজ যাওয়া বন্ধ রাখিবে। তাহার পিতামাতাও তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে একমাস বা দুইমাস পরে কন্যাকে একবার স্বামিগৃহে যাইতে দিয়া তাঁহারা একেবারে অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা দেখান নাই। কিন্তু সেই নির্জ্জন কক্ষের রোগ শয্যায় শায়িত সেই দুর্ব্বল অথচ আত্মনির্ভর-শীল শীর্ণ যুবাটির ম্লান দয়াভরা দৃষ্টি স্মরণ করিয়া, সে দুইটি কার্য্যের কোনটিই করিতে পারিল না। শুধু কন্যাত্বের গণ্ডীটুকু পার হইয়া কম্পিত হৃদয়ে বধূত্বের সীমারেখায় পৌঁছাইবার জন্য আপনার অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ঝিয়ের সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিল।

সুসঙ্গিনী আসিয়া প্রণাম করিতেই, যোগমায়া যখন

তাহাকে 'সাবিত্রী সমান হও, হাতের লোহা বজ্র হোক, চিরকাল মনের সুখে থাক', ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ করিয়া, 'এস মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী এস! বলিয়া পরম স্নেহে তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইলেন, তখন সুসঙ্গিনী অতিকষ্টে অশ্রু দমন করিয়া নত নেত্রে দাঁড়াইল। যোগমায়ার মনে শুধু এই কথাটি জাগিতেছিল—গত জন্মে না জানি কত পাপ করিয়াছি, তাই বুঝি এজন্মে পুত্র পুত্রবধূ লইয়া মনের সাধে ঘর করিতে পারিলাম না!

সুসঙ্গিনী যখন আসিল তখন বেলা এগারটা। অশোক তখন শরতের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। সুসঙ্গিনী শাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাত পা ধুইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

অশোককে শরতের ঘরে, বসাইয়া সযত্নে খাওয়াইয়া, যোগমায়া পুত্রবধূর সম্মুখে থাকিয়া সস্নেহে তাহাকে আহার করিতে দিলেন। বহুদিন পরে কন্যা শ্বশুরালয় হইতে আসিলে মাতা যেমন তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, যোগমায়ার সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। এই মায়ের মত স্নেহটুকু সুসঙ্গিনীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। একবার তাহার বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল—"মা আমাকে আর পাঠাইও না; আমি তোমার কাছেই থাকিব।"

কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা মুখে আট্‌কাইয়া গেল। সাধারণ বধূদিগের মত ত তাহার অবস্থা নহে! একথা শুনিয়া শাশুড়ি যদি কিছু মনে করেন!

অন্যান্য কাযকর্ম্ম সারিয়া নিজের আহার করিতে যোগমায়ার দুইটা বাজিয়া গেল। তাহার পরে তিনি সুসঙ্গিনীকে সস্নেহে বলিলেন—"এবার বৌমা শরতের কাছে একটু বস গে যাও।" বলিয়া তিনি অন্য একটি কার্য্যের নাম করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে কম্পিত বক্ষে সুসঙ্গিনী আসিয়া স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিল। শরৎ তখন আঙ্গুল দিয়া বন্ধকরা একখানি বই হাতে লইয়া পাশ ফিরিয়া জানালার দিকে চাহিয়া শুইয়া ছিল।

পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—"এই যে, এসেছ! বসো আমি এখনও তোমারি কথা ভাবছিলাম।" বলিয়া শরৎ শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

সুসঙ্গিনী তখন তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরৎ করুণ স্বরে বলিল—"অনেক দিন পরে এলে; দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো।"

সুসঙ্গিনী জড়সড় হইয়া শয্যার কাছটায় মেঝের উপর বসিল।" "উঠে বস" কথাটা বলিতে গিয়া শরতের মনে পড়িয়া গেল, তাহার চোখটা যেপ্রকারে দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন সুস্থ ব্যক্তিরই তাহার শয্যায় বেশীক্ষণ বসা উচিত নহে। তাই ঐ কথার পরিবর্ত্তে শরৎ বলিল—"শুধু মেঝেতে বোসো না, ওই যে আসন খানা পাতা রয়েছে ওইখানে বসো।"

"ওখানে কেন, বিছানায় উঠে বসো"—শুধু এই কথাটা, হয়ত বা একটু হাত ধরিয়া উঠানো—এই রকম একটা কিছু একটু বেশী মাত্রায় আশা করিয়া সুসঙ্গিনী মেঝের উপর বসিয়াছিল। তাই এই আসনের কথার আঘাতটা তাহাকে একটু বেশী করিয়াই লাগিল।

আসনের দিকে একবার না তাকাইয়াই, সুসঙ্গিনী স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল—"আমার শরীরে কি এতই বিষ যে বিছানার কাছে বস্‌লেও তোমার অসুখ বাড়বে? বিছানায় তো বসিনি।"

আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জড়সড় ভাবটুকু কাটিয়া গিয়াছিল।

বেদনা ও বিস্ময়ে শরৎ খানিকটা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। সুসঙ্গিনী কি শেষে এই ভাবিল? কিন্তু সেও তো সুসঙ্গিনীকে বিছানায় বসিতে বলে নাই, বিছানায় যে সে বসে তাহাও তো চাহে নাই। কিন্তু সে যে কি ভাবিয়া স্ত্রীকে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতে বলে নাই, তাহা তো এই সদ্য স্ফুটিত ফুলের মত পরিস্ফুট যৌবনশ্রীর মুখের উপর বলা যায় না।

তাই একটু পরে শরৎ অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলিল—"আমি তো তোমাকে ও কথা বলিনি।"

জবাবটা ঠিকমত হয় তাই। সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বরে যাহা ছিল কথায় তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই।

সুসঙ্গিনীর মনের ক্ষোভ তাহাতে দূর হইল না। কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেশ একটু জ্বালা রাখিয়াই সুসঙ্গিনী বলিল—"মনের সব কথা কি লোকে সবাইকে বলে?"

"বলিয়া সে শয্যা হইতে আর একটু সরিয়া বসিল।

শরৎ এই আঘাতে চঞ্চল হইয়া ব্যস্তভাবে সরিয়া আসিয়া, সুসঙ্গিনীর কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিল—"রাগ কোরো না সু—এস বিছানায় উঠে এস। আমি সত্যি ও ভেবে বলিনি"—

শরৎ আরও দুই একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় সুসঙ্গিনী বেগে আরও অনেকখানি সরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "থাক্ তোমার আর মায়া দেখাতে হবে না।" বলিয়া সে একেবারে ঘরের এক কোণে আসিয়া বসিল।

শরতের চোখে মুখে যে সামান্য রক্তটুকু ছিল, তাহাও যেন মুহূর্ত্তে নামিয়া গেল। সে বুঝিল ইহা অভিমান। কিন্তু এই কি অভিমা নর সময়?

কোথায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া দুই চারিটী কথা কহিবে, যাবার আগে বলিয়া যাইবে, মায়ের সঙ্গে যেন স্নেহের বন্ধনটী বজায় রাখে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সংকোচ ছিল তাহা যদি কমিয়া যায় —তা নয় এ যে আরও ব্যবধান বাড়িয়া গেল!

তবু আর একবার চেষ্টা দেখিবার জন্য বলিল—"রাগ কোরো না সু। একটা কথা বলবার জন্যেই তোমাকে কত করে ডাকিয়ে এনেছি।"

বলিয়া আর একটু থামিয়া শরৎ বলিল—"দেখ আমি বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—বাঁচবো না। ভগবান যে আমার হাত দিয়ে তোমাকে এমন দুঃখ দিলেন, আরও দুঃখ দেবেন, তাই ভেবে আমি কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। আর কি বল্‌বো, মাকে যেন কখন ভুল বুঝো না। যদি পার, মার কাছে এসেই থেক। যে কদিন থাকি, মাঝে মাঝে এখানে এসো। মার কথা---"

কথাটাকে সমাপ্ত হইতে না দিয়াই সুসঙ্গিনী চোখের জলের মধ্যেও আগুন জ্বালিয়া বলিল—"আমি কেউ নই, মা ই তোমার সব—তোমাদের দোহাই দিচ্ছি, আমাকে এখেনে এনে তোমরা আর দগ্ধে দগ্ধে মের না। আর আন্‌তে গেলে আমি আস্‌বই না।"

বলিয়া মুখে আঁচল দিয়া সুসঙ্গিনী সেখান হইতে সবেগে উঠিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে চিত্রার্পিতের মত শয্যার উপর বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যায় ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া যোগমায়া যখন বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা অমন করে বসে কেন?" তখন শরতের যেন চমক ভাঙ্গিল। মনে পড়িল, সুসঙ্গিনী তো অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, আর কেন বসিয়া থাকা?

মাকে বলিল,—"অনেকক্ষণ থেকে বসে আছি মা, তাই শরীরটা যেন কি রকম কচ্চে।"

যোগমায়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পুত্রের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এতক্ষণ কেন বস্‌লি বাবা? সন্ধ্যা উৎরে গেছে তো, এখন শো।" বলিয়া পুত্রকে একপ্রকার শোয়াইয়া দিয়া, তাহার ললাটের উপর আপনার দক্ষিণ হাতখানি রাখিলেন।

মায়ের সস্নেহ শীতল স্পর্শ অনুভব করিবা মাত্র শরতের দুটী চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। মায়ের কাছে তাহা আর লুকাইবার চেষ্টা না করিয়া, আর্ত্ত-কণ্ঠে কহিল—"মা, ওকে আর এখানে আমার কাছে ডেকে এনে কষ্ট দিও না। আর কি হবে মা?"

আকাশের বজ্র যদি মায়ের বক্ষে প্রবেশ করিত, তাহা হইলেও বুঝি তাঁহার ইহার অর্দ্ধেকও আঘাত বাজিত না!

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু-নারী

শ্রাবণের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে দেখিলাম শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার গত ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত 'হিন্দুসমাজে নারীর স্থান ও শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক কথার অবতারণা করিয়া আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-জাতির উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধের যত বেশী আলোচনা হইয়া আমাদের মনকে সজাগ রাখে ততই মঙ্গল। যাহা হউক তাঁহার এই মন্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব।

চণ্ডীচরণ বাবু হিন্দুসমাজে নারীর স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া স্ত্রী ও পুরুষ জাতির আদিমকাল হইতে কার্য্য-কারিতা ও উপযোগিতা এবং ইতিহাস, পূর্ব্বযুগে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও মানব সমাজের আদিম অবস্থা ইত্যাদি বহুবিষয়ের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সকল দেশে পুরুষজাতিই সর্ব্বাগ্রে ক্ষমতা-শালী হইয়াছে; আদিমকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন দিন, কোন দেশে, কোন সমাজে নারী কর্ত্রী হইতে পারে নাই; কাযেই অনুমান করা যাইতে পারে, স্ত্রী-জাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা হীনবুদ্ধি ও ক্ষমতায় ন্যূন, অতএব তাহারা পুরুষজাতির আশ্রিতা ও ছায়াস্বরূপা; তাহাদের স্বাতন্ত্র্যলাভ ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা সমাজের অমঙ্গলকর ও নীতিবিগর্হিত। এ সকল বিষয়ে যুক্তিতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারা কোন চরম মীমাংসায় উপনীত হওয়া সুকঠিন তাহা জানি। তথাপি যে সমস্ত আনুমানিক বিষয়কে স্বীকৃত সত্যরূপে (datum) অবলম্বন করিয়া তিনি বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। যদিও এবিষয়ে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও বিশেষজ্ঞদিগের উপর নির্ভর করাই আমার কর্ত্তব্য, তথাপি আমি লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি একবার প্রাচীন পণ্টাস্ ও থেমিস্কাইরা, * প্রাচীন অষ্ট্রেলিয়া, মহাভারতের রমণীপুর ও বোহেমিয়ার অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাস; প্রাচীন সেমাইট্ বংশ, মালাবারের নেয়ার বংশ, আরবের সেমাইট্ বংশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় পর্য্যটক বীর ওরেলেনা, মেরী অ্যান, ট্যালবট এবং ডাহমী প্রভৃতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করুন। তাহা হইলে বোধ করি তিনি বুঝিতে পারিবেন, যতটা দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সঙ্গিত তিনি বলিয়াছেন, কোন দেশেই পুরুষের অগ্রে স্ত্রীজাতি সমাজ গঠনের বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ বা কোনপ্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে নাই, ততটা জোরের সঙ্গে তাঁহার ঐ কথাগুলি বলা বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করি, তিনি জাপানের পুরাকালের ইতিহাসের দিকেও একবার লক্ষ্য করিবেন। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, বৌদ্ধ ও কন্‌ফিউসীয় ধর্ম্ম জাপানে প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে রমণীগণ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে কিরূপ প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং রমণীগণের প্রভাবে কিরূপে এই দুই ধর্ম্ম ক্ষিপ্রগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ইহাও দেখিতে পাইবেন যে কিরূপে নয়জন জাপরমণী রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে রমণীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কিরূপে ধর্ম্ম ও সামাজিক কার্য্য জন্য তাৎকালীন জাপরমণীগণ দেশে-বিদেশে গমনা-গমন করিতেন। ইহাদের মধ্যে যে তিনজন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম জেন সিন্নি, জেন জোনি এবং কেই জেন্নি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে আশঙ্কায় আর অধিক উল্লেখ করিতে পারিলাম না। মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিলে চণ্ডীবাবু দেখিতে পাইবেন, এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে। যিনি মানবজাতির আরম্ভকাল হইতে

* Herodotus (IV. 110—117)

একাল পর্য্যন্ত মানব পরিবার ও মানব সমাজের বিবর্ত্তন-ধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি এসমস্ত বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য রাখিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক সে সব প্রত্নতত্ত্বের জটিল আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, একাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা হীনবুদ্ধি এবং ক্ষমতার ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে, তাহারা পুরুষজাতির ছায়ামাত্র বা নিত্য আশ্রিত, স্বাতন্ত্র্যলাভ করিবার ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিবার অধিকার তাহাদের নাই বা করিলেও তাহা সমাজের অকল্যাণকর ও অশোভন হইবে? যাঁহারা নিজেরা প্রাণপণ করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন এবং স্বাধীনতালাভকে মানুষের জন্মজাত অধিকার বলিয়া অপরের কাছে দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না।

লেখক মহাশয় প্রাচীনের মত সান্ত্বনা দিয়া লিখিয়াছেন—"যদি কোন দার্শনিক কবি, পুরুষকে কায়া এবং স্ত্রীকে ছায়া বলিয়া থাকেন, তাহাতে স্ত্রীজাতির অভিমানের কোনও কারণ দেখা যায় না।" ইহাতে মনে হয় কোন জাতি বিশেষকে অপর কোন জাতি বিশেষের ছায়া বলিলেও তাহার স্বাতন্ত্র্য ও সত্বাকে যে নির্ম্মমভাবে অস্বীকার করা হয়' লেখক মহাশয় বোধ হয় তাহা স্বীকার করেন না; অথবা ছায়ার অর্থ তিনি অন্যরূপ বুঝেন। যাহা হউক, তাঁহার এ প্রকার সান্ত্বনায় আমরা প্রীত হইতে পারিলাম না। বহুশতাব্দী হইতে আমরা ভারতবাসী অপর জাতির অধীন হইয়া আছি বলিয়াই যে আমাদিগকে তাহাদের ছায়ামাত্র বলিতে হইবে, বা আমাদের সত্বা ও স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিতে হইবে এ কথা বোধ হয় কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না।

লেখক মহাশয় আর একস্থানে লিখিয়াছেন—"শ্লোক-কর্ত্তার রুচি অনুসারে তাঁহার ভূয়োদর্শনে যাহা শ্রেয় মনে হইয়াছে, তিনি (নারী সম্বন্ধে) তাহাই শ্লোকে রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অভিমানের কারণ নাই।" কারণ নাই-ই বটে! যেহেতু কোন শ্লোককর্ত্তা তাঁহার রুচি অনুসারে নারী সম্বন্ধে যাহা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন তাহাই শ্লোকে রচনা করিয়াছেন, অতএব তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে; একটি কথাও তাহার বিরুদ্ধে বলা চলিবে না। এ যুক্তির সারবত্তা সম্ভবতঃ লেখক ছাড়া আর কেহ স্বীকার করিবেন না। লেখক মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, মেকলে সাহেব যখন বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে অনেক কলঙ্কের কথা লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার রুচি অনুসারে এবং ভূয়োদর্শনে যাহা শ্রেয়ঃ মনে হইয়াছিল অবশ্য তাহাই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কোনও বঙ্গবাসী তাহা মাথা হেঁট করিয়া লয় নাই এবং কখনও লইবেও না।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু অন্যস্থানে লিখিয়াছেন, হিন্দুর চক্ষে নারীত্ব বা সতীত্ব মহামূল্যবান জিনিষ সেই সতীত্ব ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নিয়মের উপর নিয়ম বিধির উপর ব্যবস্থা এবং শ্লোকের উপর শ্লোক রচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য মহানরকভোগের ভয়ও দেখান হইয়াছিল।" প্রথমতঃ তাঁহার এই সতীত্ব কথায় আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। তিনি নারীত্ব ও সতীত্বকে যে একই জিনিষ বলিয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার করি না। হইতে পারে সতীত্ব নারীজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কিন্তু তাহাই যে একমাত্র ধর্ম্ম, এবং নারীত্ব মানেই যে সতীত্ব, তাহা গায়ের জোরে বলিলেও স্বীকার করিব না।

দ্বিতীয় কথা, চণ্ডীবাবু যে দেখাইতে চান সতীত্ব ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সত্বা-স্বাতন্ত্র্য, বিচার-বুদ্ধি, আত্মনির্ভরতা, চরিত্রদৃঢ়তা, স্নেহমমতা প্রভৃতি নারীধর্ম্ম বলিতে আর যাহা কিছু বুঝায় সমস্তই অস্বীকার করা যাইতে পারে—তাহা আমরা নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার বলিয়া মনে করি না। ইহাতে নারীত্বের মর্য্যাদারক্ষা ত দূরের কথা, পুরুষের স্বার্থপরতাই অধিক সূচিত হয় এবং যেখানে পুরুষের স্বার্থের যোগ তাহাকেই নারীধর্ম্মের সর্ব্বস্ব বলিয়া আরও বড় করিয়া দেখান হয়। অথচ তিনিই আবার বলিতেছেন, "বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে স্ত্রী-

পুরুষ উভয়ে মিলিয়া যখন এক হইল, তখন একজন প্রভু একজন দাসী ; একজন উত্তম একজন অধম এরূপ ভেদ-বুদ্ধি কেন থাকিবে ? তখন নিজস্ব জ্ঞানে উভয়েই উভয়ের সততা ও অসততার বিচার করিতে পারে।” আমরা তাঁহার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আবার পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন - “যে স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী জাতির উন্নতিতে স্বামী ভক্তি বৃদ্ধি পায়, একনিষ্ঠতা দৃঢ় হয় এবং স্বামী-নির্ভরতা প্রগাঢ় হয়, পুরুষ যদি তেমন শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাহাতে পুরুষের স্বার্থ-পরতা ও অনুদারতা কোথায় প্রকাশ পাইল ?” হাঁ, স্বীকার করিতাম, পুরুষের ঐরূপ চেষ্টায় স্বার্থপরতা নাই, যদি দেখিতাম যে, পুরুষজাতির পক্ষেও পুরুষ এমন সকল বিধিনিষেধ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতা দৃঢ় হয়, স্ত্রীনির্ভরতা প্রগাঢ় হয় এবং সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট হইলে নারীরও যেমন নারীত্ব বলিতে আর কিছু থাকে না, সেইরূপ পুরুষের সততা নষ্ট হইলে পুরুষেরও পুরুষত্ব বলিয়া কিছু থাকে না—এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় হয়। কিন্তু তাহা ত নহে। কার্য্যতঃ যাহা দেখি তাহা যে সম্পূর্ণ বিপরীত। কাযেই তাঁহার এ যুক্তি শুনিলে স্বতঃই সেই কানাইএর মার আশীর্ব্বাদের কথা মনে পড়ে। পাড়ার অপর কোন ছেলে কানাইএর মাকে প্রণাম করিতে আসিলে, তিনি এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন, “আমার কানাই ধনে পুতে লক্ষেশ্বর হোক, বাবা তোমরা বড় হয়ে তার দুয়ারে বড় বড় চাকরী কর।”

তারপর শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু লিখিতেছেন, “এক্ষণে যদি পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার গুণে চরিত্রের দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, আত্মনির্ভরতা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাঁহাদিগের জন্মিয়াছে দেখাইতে পারেন, তবে পুরুষের নিকট নিজ প্রাপ্য স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আদায় করিয়া লইবেন। কিন্তু সামান্য স্বাধীনতার লোভে যদি হিন্দুর মহারত্ন অঞ্চলচ্যুত হয় তবে বড়ই মনস্তাপের বিষয় হইবে।” তাঁহার একথা বলিবার আবশ্যকতা বুঝিলাম না। যদি তাহাদের ক্ষমতা হয় তাহা হইলে ত তাহারা তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেই। তজ্জন্য কি আর আমাদের মতামতের অপেক্ষা করিবে ? কাযেই সে কথা বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়া লাভ কি ? তার পর তিনি লিখিয়াছেন, “সামান্য স্বাধীনতার লোভে মহামূল্য রত্ন যেন না হারায়।” স্বাধীনতা যে সামান্য জিনিষ তাহা তাঁহার মুখেই এই প্রথম শুনিলাম। নারিজাতীর স্বাধীনতা নারীজাতির কাছে সামান্য কি অসামান্য, মূল্যহীন কি মহামূল্য তা' তিনি কি করিয়া বুঝিবেন ? স্বাধীনতা যে কি জিনিষ, আর তাহা হারান যে কি অভাব, তাহা যাহার হারাইয়াছে সেই জানে।

তার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু বর্ত্তমান সময়ের উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি মনগড়া নিজের কথা নারীশিক্ষার পক্ষপাতী লেখকদের ঘাড়ে চাপাইয়া অতি তীক্ষ্ণ ভাষায় তাহার সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—“পুরুষের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-লোকের স্বাধীন শিক্ষা, দীক্ষা, উন্নতিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে বুঝা সুকঠিন।...যে শিক্ষায় নারীজাতি পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা করিতে পারে, যে শিক্ষায় কলহপ্রিয়তা তার্কিকতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাহাতে বাঙ্গালীর দরিদ্র সংসারে কলহ কিচকিচি আসিয়া লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন সেইরূপ শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিলে বাঙ্গালীর সুযশ, সুনাম, উদারতা স্ত্রী মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে ? কায নাই এমন সুনামে।” তিনি এরূপ অদ্ভুত শিক্ষা বিধানের কথা কোথায় পাইলেন আমরা জানি না। তবে তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যেরূপ অসহিষ্ণু ভাবে মনের ঝাল ঝাড়িয়াছেন, তাহাতে মনে হয় আমাদের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই তিনি এ সব কথা, লিখিয়াছেন। যদি তাহাই হয়,তাহা হইলে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রবন্ধটি পুনরায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্মভাবটুকু গ্রহণ করিবেন ; তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যাহাতে আরও প্রগাঢ় ও

স্বভাবসুন্দর হয়, সেইরূপ শিক্ষা বিধানের কথাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বর্ত্তমান যুগের আদর্শে শিক্ষালাভ করিয়া পুরুষজাতি যেমন যুগোপযোগী হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষা ধারারও তাহার সহিত মর্ম্মযোগ না থাকিলে পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হইবার ও স্ত্রী পুরুষের ভিতরে হৃদয় মনের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, কাযেই যে ভাব শিক্ষা লাভ করিলে সমাজের উভয় অঙ্গের সমোন্নতি ও স্বাভাবিক বিকাশ হয়, উক্ত প্রবন্ধে আমি তাহার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সমস্যাটি এত কঠিন যে কোন বিশেষ প্রণালী বা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ পাঠক সমীপে উপস্থাপিত করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি নাই। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, আমার প্রবন্ধের কোন স্থান বিশেষে, কোন বিষয় বিশেষকে যুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া দেখিবার জন্য আমি ফরাসী দেশের (আমেরিকার নহে) প্রবীণ দার্শনিক টোক্‌ভিলের লিখিত আমেরিকার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীর ধারণা সম্পর্কের দুই চারিটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়াই শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবু এত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার মনে নাকি "বিভীষিকার উদয় হইয়াছে।" কাযেই তাঁহার বিভীষিকা দূরীকরণের জন্যও দুই একটী কথা বলিতে আমি ন্যায়তঃ বাধ্য। অবশ্য বিভীষিকা যদি তাঁহার হইয়াই থাকে তবে আমি সহস্রবার 'ভয় নাই' বলিলেও তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিবেন না। তথাপি চেষ্টা করিব।

আমার প্রবন্ধের ইংরাজীতে উদ্ধৃত অংশকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন, "এই দার্শনিক উপদেশ প্রণালী শুনিলেই আমাদের মনে বিভীষিকার উদয় হয়। কন্যার দৃঢ় চরিত্র গঠন উদ্দেশে পাপের পাঠশালায় তাহাকে পাঠাইতে হইবে।......বায়ুগ্রস্ত ভিন্ন কোনও প্রকৃতিস্থ পাশ্চাত্য পিতামাতাও কন্যাকে সে পাঠাগারে পাঠাইবেন না।" চণ্ডীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এই পাপের পাঠশালা কাহাকে বলিতেছেন? আর আমাদের মাতা কন্যাকে সেই পাঠশালায় পাঠাইতে হইবে ইহার অর্থ বা তিনি কি বুঝিতেছেন। এমন কোন কথা ত সেই উদ্ধৃত অংশ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে কোন লেখার বাক্যবিশেষের উপর ঝোঁক দিয়া তাহার বিকৃতার্থ সহজেই করা যায়; কিন্তু তাহাতে লাভ কিছুই হয় না, লেখাকে বীভৎস করা হয় মাত্র। চণ্ডীবাবু যদি আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উদ্ধৃতাংশের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মন এমন বিভীষিকার উদয় হইত না। আমার প্রবন্ধে, কন্যাদিগকে যে কোনও পাঠশালা বিশেষে পাঠাইতে হইবে অথবা কোনও প্রণালী বা পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ত কিছু বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে শুদ্ধ সমাজে নারীর স্থান ও শিক্ষা সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করিতে যাই, তখন আমাদের চিন্তার কোথায় অসম্পূর্ণতা বা দোষ থাকে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য এইমাত্র। ইহাতে বিভীষিকার কোন কারণ দেখি না।

হাঁ, পাপের পাঠশালা অর্থে তিনি কি কোনও স্থান বিশেষকে মনে করেন, না এই সংসারকেই মনে করেন? যদি কোন স্থান বিশেষকে মনে করিয়া থাকেন, তবে সত্য সত্যই বায়ুগ্রস্ত ভিন্ন অন্য কেহ কন্যাদিগকে সেখানে পাঠাবেন না; কিন্তু তিনি যদি এই সংসারকেই মনে করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি এ পাঠশালার পড়ুয়া কাহারা? মনুষ্য মাত্রই নিশ্চয়। তাহা হইলে উপায় কি? স্ত্রী কন্যাদের সিন্ধুকে বন্ধ রাখা ছাড়া ত পুরুষের "বক্রদৃষ্টি" হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার অন্য উপায় দেখি না। আবার সিন্ধুকে রাখিয়াই বা নিরাপদ কোথায়? ভগবান মনু বলিয়াছেন, (পাঠক পাঠিকাগণ মার্জ্জনা করিবেন) প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও কন্যাও, মাতা বা পিতার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবে না। যাহা হউক পাপ ও অধর্ম্ম আছে বলিয়াই পৃথিবীকে একেবারে পাপের পাঠশালা বা নরক ভাবিয়া লইলে যে মানুষকে পশুর অধম করা হয়, একথা একবার তিনি ভাবিয়া দেখিবেন, তারপর নারীর সতীত্বধর্ম্ম পুরুষের "বক্রদৃষ্টিতে

ও নিশ্বাসে” বিকৃত, মলিন হইবে বলিয়া, একটা জাতিকে আলোক-বাতাস হইতে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া না রাখিয়া যাঁহারা বক্রদৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা যাহাতে একটু সংযত হন এবং তাঁহাদের দৃষ্টির প্রাখর্য্য যাহাতে কমিয়া আসে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না কি? যাহা বেশী লুকান যাইবে, মানুষের ঔৎসুক সেইদিকেই তত পড়িয়া থাকিবে, ইহাই মানব মনের সাধারণ ধর্ম্ম।

যাহা হউক, একই কথা বার বার নানাভাবে বলিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে চাহি না। উপসংহারে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য কেহ কাহাকেও দেয় না বা দিতে পারে না, লইবার মত সময় আসিলে কেহ তাহা রক্ষা করিতেও পারে না। পুরাতনের জীর্ণ নিগড় ছিঁড়িয়া নবীনের অনুসন্ধানে আজ জগৎ জুড়িয়া যে পরিবর্ত্তনের হাওয়া উঠিয়াছে, প্রাচীনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়া আপন আপন অধিকার বুঝিয়া লইবার যে উৎসাহ আগুন আজ জগদ্‌বাসীর বুকে জ্বলিয়াছে, তাহা ত পুরুষের অধিকৃত শুদ্ধ আধখানা জগতেই লাগে নাই, তাহা যে নারী জাতিকেও স্পর্শ করিয়াছে ও মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমরা পুরুষ নিষ্ঠুর আইন গড়িয়া, লোকাচারের বেড়া দিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নরকের ভয় দেখাইয়া যতই তাহাদের আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করি না কেন, সময় আসিলে সে বাধা তাহারাও মানিবে না। আমরা যত আপশোষ করি না কেন, নিজেদের প্রাপ্য তাহারা বুঝিয়া লইবেই। এবং যদি কোন অবিচার তাহাদের প্রতি আমরা করিয়া থাকি, ভগবানের নিকট তজ্জন্য জবাবদিহি আমাদের করিতেই হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার।

ফুল ফোটা

আমার বুকের মধ্যে শিউরে উঠে
কিসের পুলক আজি?
এ কোন্ তানে প্রাণের বীণা
উঠ্‌লো আজ বাজি?
শ্যামল তরু পল্লবিয়া,
উঠ্‌ছে যেন মর্ম্মরিয়া,
তাহার বুকে কিসের লাগি
এত পুলক নাচে?

ওই যে তার শ্যামল বুকে,
শুভ্র কুসুম ফুট্‌লো সুখে,
সেই আনন্দ ছড়িয়ে গেল—
সারা জগৎ মাঝে।
আমার প্রাণে সেই আনন্দ
কে দিল আজ আনি
উঠ্‌লো ফুটে ফুলের মত
কার এ মুখ খানি?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পরিচয়

(গল্প)

প্রাতে উঠিয়া মা বলিলেন, "রাণী, শীগ্‌গির কায-কর্ম্ম সেরে নে, আজ দত্তবাড়ী নেমন্তন্নে যেতে হবে।" আমার নাম উষারাণী।

আজ মহামায়ার মহাষ্টমী পূজা। গ্রামের জমিদার দত্তবাবুদের বাড়ী এবার পূজার বড় ধুমধাম। গত বৎসর বাড়ীর বড়কর্ত্তা উমাশঙ্কর দত্ত মহাশয় সাংঘাতিক এক মামলায় পড়িয়া প্রচুর অর্থব্যয় ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগের পর অবশেষে অব্যাহতিলাভ করেন, তাই এবার পূজায় অতি সমারোহ।

আজ পূজাবাড়ীতে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ। অপরাহ্ণ ৫টায় যাত্রাগান আরম্ভ হইবে, সুতরাং গান শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গানের ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিলে চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন চিকফেলা এক প্রকোষ্ঠে গিয়া আমরা বসিলাম। একে একে উত্তম বসন ভূষণে সুসজ্জিত আরও কয়েকটি ভদ্র মহিলা সেখানে আসিয়া জুটিলেন। পালা চলিল—"বামন ভিক্ষা।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল। এখন পালার পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভ। বামনের উপনয়ন, তাই কশ্যপমুনি উপনয়নের দ্রব্যাদি লইয়া ফর্দ্দের সঙ্গে মিলাইতে ব্যস্ত। তিনি সংক্ষেপে ক্রিয়া সারিবেন, কিন্তু অদিতির তাহাতে ঘোর আপত্তি। এজন্য কিছু পূর্ব্বেই মুনি দম্পতীর মধ্যে কিঞ্চিৎ কলহ হইয়া গিয়াছে। বামন জননী পুনর্ব্বার আসিয়া বলিলেন—"না, এ কায তুমি সংক্ষেপে সারতে পারবেনা, স্বর্গের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ করতে হবে, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি বৌরা আসবেন। এ আমার ছোট ছেলের পৈতে, এতে এ সব না করলে লোকে বলবে কি?" কশ্যপমুনি তাঁহার কাশশুভ্র দীর্ঘদাড়ী দোলাইয়া ভ্রূকুটী পূর্ব্বক কহিলেন—"রেখে দাও তোমার বড়মানুষি চাল! ও, কিছুতেই হবে না, আমি পাঁচজন মাত্র বামণ দিয়ে বামনের উপনয়ন সারবো, এতে তোমার কোন আপত্তিই খাটবে না।" পরাভব মানিয়া অদিতি ক্ষুণ্ণ মনে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুনিপ্রবর পুনরায় কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবেন, এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে উচ্চ কণ্ঠে কে ডাকিয়া উঠিল—"কশ্যপ ঠাকুর বাড়ী আছেন?" ডাক শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে গৃহিণীকে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! এ যে নারদের গলা! বল, বল, ঠাকুর বাড়ী নেই।" "আমি মিথ্যে বলতে পারবো না" বলিয়া গৃহিণী রোষভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি এক পা দুই পা করিয়া প্রায় অন্দর মহলের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত! এবার কশ্যপ বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, তারপর—"যা! এইবার সব মাটী হল, কোন মতে একটু টের পেলে এক্ষুণি ত্রিজগৎ রাষ্ট্র করে দেবে।" বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের উত্তরীয়খানি খুলিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থালা ঘটী বাটী কাপড় ও গামছা প্রভৃতি ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং সেই ঢাকা জিনিস-গুলির প্রতি চকিতনেত্রে একবার চাহিয়া অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন "আছি আসুন, আসুন, এই দিকে।"

২

কৃপণ ঋষির এই কার্পণ্যের অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই হাসির রেখা অধর প্রান্তে মিশিয়া যাইতে না যাইতেই, তাহাদের করতালির তাল বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইতে না হইতেই অকস্মাৎ

নাটমন্দিরের নানা দিক হইতে প্রাণাতঙ্ককারী শব্দ আসিল— ক্রম! ক্রম! ক্রম!

নিমেষ মধ্যে নাটমন্দিরটি ধূমে সমাচ্ছন্ন হইল, বারুদের উগ্রগন্ধে বাতাস ভরিয়া গেল। সহসা ঠিক মাথার উপর কতকগুলি ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের যুগপৎ আবির্ভাব জানিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমকিয়া উঠিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ সবেগে লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই সেই ধূম রাশির ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠে কে গর্জ্জিয়া কহিল—"সাবধান! যে যেখানে আছ, ঠিক সেখানেই থাক, একটু নড়াচড়া করেছ কি বন্দুকের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে।" ভয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বাত্যাতাড়িত বংশপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, অভিনেতার উক্তি কণ্ঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। আতঙ্কে আমাদেরও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, আমি কম্পিত কলেবরে মায়ের কোলে মাথা গুঁজিলাম।

দুই তিন মিনিট পর মাথা তুলিয়া দেখি—খাকীর কোট পাৎলুনপরা অনেকগুলি বলবান্ যুবক, দর্শক-বৃন্দের ললাট লক্ষ্য করিয়া বন্দুক হস্তে নাটমন্দিরের চারিদিকে বীরদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকের পায়ে বুটজুতা ও মোজা, কোমরে ভুটানের বক্রাকার ছোরা, কেহ কেহ মুখোষ পরিয়া আসিয়াছে, কাহারও মুখে আবার খড়ি মাখান, সংখ্যায় তাহারা অন্যূন ..জন। তাহাদের দলপতির পোষাকটি অবিকল সৈনিক অফিসারের অনুরূপ। হাতে তাহার বড় একটি বিগ্‌ল্, কটিতে কোষবদ্ধ দীর্ঘ তরবারি, খুব লম্বা ও বলিষ্ঠ চেহারা। তিনি উমাশঙ্কর বাবুর মধ্যম ভ্রাতা পার্ব্বতী বাবুর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার জ্যেষ্ঠ কোথায়?" তিনি ভীতিবিজড়িত স্বরে উত্তর দিলেন—"বিশেষ জরুরি কাযে কাল জিলায় চলে গেছেন।"

দস্যুপতি ধমক দিয়া বলিলেন—"তা'ত জানি। আজ বিকেলে যে তাঁর সেই আপোষের আঠারো হাজার টাকা নিয়ে ফিরে আস্‌বার কথা?" পার্ব্বতী বাবু ক্ষীণ-স্বরে কহিলেন—"আসেন নি।"

দস্যুপতির মুখ অপ্রসন্ন হইল। তিনি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় পার্ব্বতী বাবুকে বলিলেন—"তা হোক, আপনিই উঠে আসুন। শীগ্‌গির সিন্দুকের চাবি দিন্। বিলম্ব করবেন না, অন্যথা আপনার উপর এক্ষুণি গুলি চল্‌বে।"

পার্ব্বতী বাবু এতক্ষণ আসরের এককোণে স্বতন্ত্র একখানি আসনে বসিয়া একাগ্রমনে গান শুনিতে-ছিলেন। তিনি তখনই যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া আসিলেন। সহসা দুইজন দস্যু ছুটিয়া আসিয়া দুইদিক হইতে তাঁহার দুইহাতের কব্জি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল এবং একরূপ বলপূর্ব্বকই অন্দরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

দস্যুপতি সিঙ্গা বাজাইয়া কতকগুলি দস্যুকে তাঁহা-দের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। প্রায় দুই মিনিট পর অন্দরের দিক হইতে একবার বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে "বাপ্‌রে জান গিয়া!" এই মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ বায়ুতরঙ্গ আমাদের কাণের কাছ দিয়া বহন করিয়া লইয়া গেল।

তার পর সব চুপ্‌চাপ্! কাহারও টুঁশব্দটি পর্য্যন্ত নাই; প্রাণভয়ে সকলেই নীরব, নিস্পন্দ, অসাড়! এতবড় আসরটিকে ঠিক যেন চিত্রা-পিতের মত বোধ হইতেছিল। উৎসবের উচ্চ কোলাহল নিমেষমধ্যে মরুস্থলীর গভীর নীরবতায় পর্য্যবসিত হইল। এইভাবে আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটাইলাম।

এটু পরেই ডাকাতেরা ফিরিয়া আসিল। তার পর "মার্চ্চ" করিতে করিতে দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত পথটি ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের পিঠেই এক একটি পুঁটুলী। পুঁটুলীগুলি কিসের, তাহা আর আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না।

যাহাহউক, তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। মা অনুচ্চস্বরে

বারংবার বলিতে লাগিলেন—"হে মা দুর্গে! রক্ষা কর!"

কিন্তু, এ আবার কি! একজন ডাকাত পশ্চাৎ দিক হইতে ছুটিয়া গিয়া দস্যুপতির কাণের কাছে কি যেন বলিতেই তিনি বিগ্‌লে ফুঁ দিলেন। দেখিতে দেখিতে সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্রুত পদে পুনরায় নাটমন্দিরের দিকে আসিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! ইহারা যে এখন আমাদেরই দ্বারে অতিথি। আমরাই যে এখন ইহাদের দ্বিতীয় শিকার! ভয়ে আমরা উৎসর্গকরা অজশিশুর মত কাঁপিতে লাগিলাম। আতঙ্কে কয়েকজন স্ত্রীলোক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

তারপর দস্যুপতি দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "মা সকল! আপনারা ভয় পাবেন না, আপনাদিকে লাঞ্ছিত বা অপমানিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আপনাদের অলঙ্কারগুলি পেলেই চলে যেতে পারি। আপনারা স্বেচ্ছায় গয়নাগুলি খুলে মেজের উপর রেখে দিন।"

দস্যুপতির কথা শেষ হইতে না হইতেই সর্ব্বাগ্রে মা তাঁহার হাতের অনন্ত, বালা, সোণার চুড়ী এবং কাণের ফুল প্রভৃতি খুলিয়া দিলেন। অন্যান্য মহিলারাও তখনই মার কার্য্যের অনুকরণ করিল। তিন চারি বৎসরের একটি ছোট ছেলের গলায় নূতন তৈরি কতকগুলি সোনার পদক ছিল, তাহার মা তাহা খুলিয়া লইতেই ছেলেটা চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং দুই হাতে সেগুলি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। স্ত্রীলোকটি দুই তিনবার চেষ্টা করিয়াও তাহা খুলিয়া লইতে পারিলেন না। শেষের বার একটু জবরদস্তির সহিত চেষ্টা করিতেই ছেলেটা একেবারে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। দস্যুপতি তখন মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"থাক মা! খোকার গয়না আর দিতে হবে না।"

সব অলঙ্কার খুলিয়া এক জায়গায় রাখা হইয়াছিল, সেখানে অলঙ্কারের ছোট খাট একটা স্তূপ হইল। ডাকাতদের হস্তস্থিত জলন্ত মশালের উজ্জ্বল আলোকে অলঙ্কারগুলি দ্বিগুণ প্রভাজাল বিস্তার করিতে লাগিল। দস্যুপতি ইঙ্গিতে সেগুলি তুলিয়া লইবার আদেশ করিলে ডাকাতেরা খুব স্ফূর্ত্তির সহিত তাহা কয়েকখানি রুমালে বাঁধিয়া লইল।

আমার গলায় একছড়া কড়ি নেকলেস্ ছিল, এপর্য্যন্ত আমি তাহা খুলিয়া দেই নাই। প্রত্যুত এতক্ষণ আঁচলের আড়ালে বেশ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চাতুরী ডাকাতদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তখনই একজন ডাকাত অগ্রসর হইয়া আমাকে বলিল—"ওগো, লক্ষ্মী মেয়েটির মত তোমার গলার হারগাছটি শীগ্‌গির খুলে দাও ত, দেরি করোনা।"

আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত হইতে হইল। আমি অবিলম্বে গলার হার খুলিয়া ফেলিলাম। অদূরে একজন যুবক দস্যু দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মুখে তাহার খড়ি মাখান, সে ঈষৎ হাস্যের সহিত আমার খুব নিকটে আসিয়া আমার হাত হইতে হারছড়া মৃদুভাবে টানিয়া লইল। হঠাৎ তাহার চক্ষুর দিকে চক্ষু পড়িতেই আমি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম, ওঃ! কি সুন্দর চক্ষু! কি উজ্জ্বল দৃষ্টি! চক্ষু দিয়া যেন বুদ্ধি, সাহস, ও তেজের তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে! কিন্তু সে জ্যোতিতে একটুও জ্বালা নাই, সে দৃষ্টিতে কিছুমাত্র প্রখরতা নাই, শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুময়! আমি মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিলাম। নিমেষ মধ্যে আমার মানসপটে চক্ষু দুইটির এক সুস্পষ্ট গভীর ছাপ পড়িয়া গেল। আমার সর্ব্বশরীর কি এক অপূর্ব্ব পুলকে শিহরিয়া উঠিল, আমার প্রতি অঙ্গ দিয়া কি যেন এক অব্যক্ত ভাবের প্রবল বন্যা ছুটিল, আমি তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদিলাম।

তারপর চক্ষু মেলিয়া দেখি—ডাকাতেরা সেস্থান ত্যাগ করিয়া বিজয়োল্লাসে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে নদীর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

গান আর হইল না, সকলেই বিষণ্ণচিত্তে বাড়ীর দিকে চলিলাম। আমরা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি —দত্তবাড়ীর পুরাতন দারোয়ান পৃথ্বীপাঁড়ে ডাকাতের বন্দুকের গুলিতে গুরুতর আঘাত হইয়া রক্তাক্ত দেহে মাটীতে পড়িয়া আছে। স্বয়ং পার্ব্বতীবাবু প্রাণপণে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। বাবাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি পরিতপ্তস্বরে কহিলেন—"ভাল তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম দাদা! সব খুইয়ে গেলে।" বাবা আমাদিগকে দেখাইয়া উত্তর দিলেন—"কিছু খোয়াই নি ভাই! এইত সবই আমার সঙ্গেই রয়েছে।"

৩

এ আজ দুই বৎসরের আগের কথা। তখন আমার বয়স ছিল, কিঞ্চিন্ন্যূন পনেরো, বর্ত্তমানে সতের চলিতেছে। এখনও আমার বিবাহ হয় নাই। বাবা ডাকবিভাগের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী। এই কয়-বৎসর ধরিয়া কেবলই তাঁহাকে এ জিলা হইতে সে জিলায়, সে জিলা হইতে এ জিলায় ক্রমাগত বদ্‌লি করিয়া আসিতেছে। সুতরাং তিনি স্থির হইয়া কখনও আমার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন নাই। আমরা বরাবর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি। অতএব এই আইবুড় মেয়ের জন্য কোনদিন তাঁহাকে কোনরূপ সামাজিক বা লৌকিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। গত অগ্রহায়ণে তিন মাসের ছুটীতে তিনি কলিকাতায় আসেন, বলাবাহুল্য আমরাও সঙ্গেই ছিলাম। উদ্দেশ্য, একটি ভাল পাত্র খুঁজিয়া আমার বিবাহ দিবেন।

কয়েকস্থানে সম্বন্ধ হইবার পর অবশেষে এক জায়-গায় আমার বিবাহ স্থির হইল। ইঁহারা আমাদের দেশীয়, কিন্তু বর্ত্তমানে কলিকাতাবাসী। বরের বাপ একজন নামজাদা এটর্ণি। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম পাত্রটি নাকি সম্প্রতি মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বয়স অনুমান ২৫ বৎসর, খুব শান্ত শিষ্ট ভদ্র প্রকৃতির, স্বভাবের গুণে তিনি সকলেরই আদরণীয়। পরোপকার ও সেবা-পরায়ণতার জন্য ছাত্রজীবনেই তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি-লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহাতে কন্যার প্রার্থিত বস্তুরও নাকি অভাব ছিল না। অতি অল্পেই বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইল; বাবা সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দিবেন তাহাতেই তাঁহারা রাজি। বরের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু আসিয়া সমস্ত বিষয় পাকাপাকি করিয়া গেলেন। আগামী ৮ই ফাল্গুন বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

৪

আজ ৮ই ফাল্গুন। আজ আমার শুভ বিবাহের তারিখ। নব বসন্তের নবীন উষায় নয়নোন্মীলন করিয়া দেখি, প্রকৃতি আজ নূতন সজ্জায় সজ্জিত। পাপিয়ার ললিতরাগ, মধুপানমত্ত ভ্রমরকুলের কল ঝঙ্কার, চূত-মুকুলের চিত্তোন্মাদক গন্ধ, নব বল্লরীর কমনীয় অঙ্গরাগ, নব কিসলয়ের নবীন সুষমা, মলয় মারুতের মৃদুমন্দ হিল্লোল আমার নবীন প্রাণে আজ এক নব ভাবের নূতন তুফান তুলিয়াছে। আজ আমার নারী জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আজ আমি আমার সপ্তদশ বৎসরের জীবন-অর্ঘ্য এক জনের পায়ে সমর্পণ করিতে চলিয়াছি, জানি না এ অর্ঘ্যের দেবতা কেমন হইবেন! জানি না এ অর্ঘ্য তাঁহার নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিবে!

আমি পিতার প্রথম সন্তান, তিনি এই প্রথম বড় ক্রিয়া করিতে বসিয়াছেন, সুতরাং আয়োজনের কোনও ক্রটিই থাকিল না। আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ববর্গে গৃহগুলি ভরিয়া গেল, নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে বাড়ীটি মুখরিত হইয়া উঠিল, নহবৎ সানাইয়ের সুমধুর প্রভাতী রাগে গ্রামটিকে মাতাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। গোধূলি লগ্নে বিবাহ, সুতরাং আমার পিসীমারা দুপুরের পর হইতেই আমাকে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি বাল্যাবধি সুরূপা বলিয়াই পরিচিত ছিলাম, অতএব তাঁহারা আমাকে বধূবেশে সাজাইয়া মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিলেন। আমার পিস্‌তুত বোন্ কমলা

কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ আমাকে দেখিতেই হাসিমুখে বলিয়া ফেলিল—"আহা! ঠিক যেন বসন্তের রাণী!"

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। আমাকে সম্প্রদান সভায় লইয়া যাওয়া হইল, আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আজ নারী-জীবনের এক মহাপর্ব্ব আরম্ভ, এ পর্ব্বের সমাধান কিরূপ তাহা একমাত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই জানেন।

পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। সংস্কৃত আমার অপঠিত ছিল না, সুতরাং মন্ত্রগুলির উচ্চ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এখন মাল্য-বিনিময়। কম্পিত করে বরের গলায় মালা পরাইয়া দিলাম। বিনিময়ে আমিও একটি পাইলাম।

তারপর পুরোহিত ঠাকুর শুভদৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। আমি একটু মাথা তুলিয়াই লজ্জায় আবার নামাইলাম। পুরোহিত হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"লজ্জা কি? ভাল করে তাকাও।" এবার আমি সাহসে ভর করিয়া তাকাইলাম। বরের কোনও কৌতুকপ্রিয় কিশোর বন্ধু তাড়াতাড়ি একটি উজ্জ্বল গ্যাসের বাতি আনিয়া আমাদের মুখের কাছে উচ্চ করিয়া ধরিল।

তাঁহার চক্ষুর দিকে চাহিতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এ যে সেই চক্ষু! এ যে সেই দীপ্ত চক্ষুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি—বিবাহ বাসরে এক অভাবনীয় অপূর্ব্ব পরিচয়!

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আর তাকাইতে পারিলাম না। আমার সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিল, কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। ও হরি! এ যে সংজ্ঞা লোপ পাইবার লক্ষণ!

দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। চারি দিক হইতে জল! জল! পাখা! পাখা! এই উচ্চ কোলাহলের অতি ক্ষীণ স্বর একবার মাত্র আমার কাণে আসিল। তারপর কি হইল কিছুই জানি না।

মূর্চ্ছা ভঙ্গে দেখি—আমি শয্যায় শুইয়া আছি, বাবা, মা ও পিসিমারা আমার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। আমাকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া সকলেরই দুশ্চিন্তা দূর হইল। তারপর আমি সম্পূর্ণ সুস্থতালাভ করিলে একে একে তাঁহারা সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কেবল আমার কাছে থাকিল, আমার পিসতুত বোন কমলা। আমি এদিক ওদিক তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, তিনি ঘরের এক কোণে একখানি চেয়ারে নিতান্ত অপরাধীর মত জড়সড় ভাবে বসিয়া আছেন। আমাকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমার চপলা বোনটি পরিহাস করিয়া কহিল—"কনেটি দেখ্‌ছি বরকে খুঁজে মর্‌ছেন।"

অমনি তিনি স্মিতমুখে উঠিয়া আসিলেন এবং কোমল বাহুযুগলদ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—"ডাকাত দেখে ভয় পাচ্ছিলে রাণী?"

কি আশ্চর্য্য! ইনিও আমায় চিনিতে পারিয়াছেন দেখিতেছি! আমি কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া লজ্জা-জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার সেই হার?"

তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"ওঃ! সে দামোদরের বন্যায় ভেসে গিয়েছে।"—পরে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, সেদিনকার লুণ্ঠিত অর্থ, দামোদর-বন্যায় প্রপীড়িত আর্ত্তগণের সেবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল।

আমার বোনটি এই অপূর্ব্ব পরিচয়ের কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না, অবাক্ হইয়া কেবল আমাদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

শ্রীমধুসূদন আচার্য্য।

মুক্তিনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক চতুষ্টয় আমার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি তখন কুলিখানীর ধর্ম্মশালার সম্মুখস্থ নদীর পুলের মাথায় বিশ্রাম করিতেছিলাম। আমাকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহারা হাসি মুখে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—"পারবেন আপনি নেপালে পৌঁছতে।" এই শেষাগিরি উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা—যখন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি তখন আমার শেষ সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে আর সন্দেহ রহিল না। শেষাগিরির পথ যে কি কঠিন, ব্রহ্মচারীজীর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে তাহার একটু নমুনা দিতেছি :—

"শিশা গরিকা কঠিন চড়াই আরম্ভ হইল। সে যে কি ভয়ানক পথ তাহা কাহাকেও বুঝান যায় না। ক্রমাগত সোজা হইয়া উচুতে উঠিতেছি, যেন আকাশে উঠিতেছি। উভয় পার্শ্বে জঙ্গল, কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহাড়ের ক্রমোচ্চ গাত্র বাহিয়া উপরে উঠিতেছি। দু'পা উঠি আর বিশ্রাম করি। আরও ভয়ঙ্কর যে প্রতি পদবিক্ষেপে পদতল হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া পড়িতেছে। সময় সময় দুই এক পা পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছি। সময়ে সময়ে পতনের আশঙ্কা। এ কি ভয়ানক রাস্তা।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৫—৩৫৬ পৃঃ)

কুলিখানী স্থানটী বড়ই রমণীয়। চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী পর্ব্বতের প্রাচীর। ধর্ম্মশালার সম্মুখে অতি নীচে একটী পার্ব্বত্য নদী। তাহার উপর একটী অতি সুন্দর ঝুলান পুল (Hanging Bridge)। ধর্ম্মশালার নিকটে একটি দেবালয়। আলয়ে যে কোন্ দেবতা তাহা চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা যায় না। শুনিলাম তিনি শিব।

সন্ধ্যাকালে আরতি আরম্ভ হইল। একটী বাঁশী, একখানা কাঁসী ও একটী ঢাক বাহিরে বাজিতে আরম্ভ করিল। স্থানটী একেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ, তাহার পর যখন "মৃদুলে গম্ভীরে" আরতি আরম্ভ হইল তখন যেন গাম্ভীর্য্য আরও মধুর হইয়া উঠিল। আরতির আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত আমি মন্দিরের দ্বারে বসিয়া থাকিলাম। যাত্রিগণ অনেকে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আরতির পর দ্বার বন্ধ করিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন। দেবালয়টী নেপাল দরবারের সম্পত্তি। দেবতার প্রাত্যহিক পূজা ও শিবরাত্রির সময় যাত্রীদিগকে, সদাব্রত দেওয়া জন্য রাজসরকার হইতে এক ব্যক্তি জায়গীর ভোগ করে। দেবালয়ের ও যাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করা তাহার কার্য্য।

আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলে একটী প্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইয়াছিলাম। আগামী কল্য আমাদিগকে নেপাল পৌঁছিতে হইবে, এই জন্য অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে। নাইডু ও তাহার সহযাত্রী আহারাদি শেষ করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের নিকটই আশ্রয় লইল।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ভোর ৪টা—শয্যাত্যাগ করিলাম। চা, তাহার কিছু পরে খিচুড়ী ভোজন করিয়া ৬টায় রওয়ানা হওয়া গেল। আমি, নাইডু ও তাহার সহযাত্রী—আমরা একত্র রওয়ানা হইলাম। ঘণ্টা খানেক পথ চলার পর আমরা একদন্তা নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে চেৎলাঙ্গিয়া। চন্দ্রাগিরির পাদদেশে যাইতে দুইটী রাস্তা। বামেরটী রাজপথ—ডুলি প্রভৃতি সেই পথে যায়; আর দক্ষিণেরটী পাহাড়ীয়া পথ—অর্থাৎ পাহাড়ীয়াগণের "একপেয়ে" পথ। ডান দিকের রাস্তায় চেৎলাঙ্গিয়া

পৌঁছিতে বাম দিকের রাস্তা হইতে প্রায় দুইঘণ্টা সময় কম লাগে।

আমরা ডান দিকের পথেই রওনা হইলাম। শেষাগিরির পথের বর্ণনা দিয়াছি, এইটীও তজ্জাতীয় পথ। তবে শেষাগিরেতে এক দম উপরে উঠা- আর এক দম নীচে নামা। আর এ পথে কতবার যে উঠিলাম আর কতবার যে নামিলাম —কতদূর যে উঠিলাম কতদূর নামিলাম—তাহার ইয়ত্তা নাই। এই রূপে চড়াই উৎরাই করিয়া ১০টায় সময় চেৎলাঙ্গিয়া পৌঁছিলাম। অধ্যাপক চতুষ্টয়ও তখনই পৌঁছিলেন। তাঁহারা অধিক বিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে আবার আমার দুই পকেট বোঝাই করিয়া কমলা, লজেঞ্জস্ দিয়া গেলেন, কারণ আজ আবার চন্দ্রাগিরি উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে।

আমি, নাইডু ও তাহার সঙ্গী স্নান করিয়া, কিছু চা সেবন করিয়া লইলাম। বেলা ১১টায় চন্দ্রাগিরি আরোহণ আরম্ভ করিলাম। এটী উচ্চতায় শেষা- গিরির বড় ভাই—কিন্তু যাত্রীকে কষ্ট দেওয়া হিসাবে তাহার ছোট ভাই।

চন্দ্রাগিরির সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া আমরা নেপাল রাজধানী, পশুপতিনাথের মন্দির, স্বয়ম্ভূর মন্দির দর্শন করিলাম। তখন বেলা ১টা।

সেখান হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল। বেলা ২-৩০ মিনিট আমরা থানকোটে আসিলাম। এইটী নেপালের উপকণ্ঠ, এখান হইতেই নেপাল অধিত্যকা আরম্ভ। অধিত্যকাটী চারিদিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। এই সব পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে ৫০০০ ফিট হইতে ৮০০০ ফিট পর্য্যন্ত। চন্দ্রাগিরি ৮০০০ ফিট উচ্চ। নেপাল অধিত্যকাটী ডিম্বাকৃতি (oval shape) দীর্ঘে ১৫ মাইল, প্রস্থে ১৩ মাইল, আয়তন ২৫০ বর্গ মাইল। ব্রিটিশ রেসিডেন্সি সমুদ্র বক্ষ হইতে ৪৭০০ ফিট উচ্চ।

থানকোটে আবার নামধাম, ব্যবসায়ের পরিচয় দিয়া কাঠমণ্ডু সহর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিছুদূর যাইয়া দেখিতে পাইলাম মাঠের মধ্যে একটী তাম্বু এবং সেখানে সৈন্যের সমাবেশ হইতেছে। কারণ জানিতে পারিলাম না। সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বাঁধানো রাস্তা—দুইদিকে মাঠ। মাঠে যব ও সরিষা। সম্মুখে কাঠমণ্ডু সহর, মনে হয় যেন অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ, কিন্তু কিছুতেই পথ আর ফুরায় না। ক্রমে অবসাদ আসিতে লাগিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে "মাইয়ে পুগে"—এসে পৌঁছিয়াছ। কিন্তু পৌঁছবার কোন লক্ষণই দেখি না।

বেলা ৫-৩০ মিঃ কাঠমণ্ডু সহরে "হনুমান ঢোকায়" উপস্থিত হইলাম। হনুমানের প্রকাণ্ড একটি মূর্ত্তি—এই পথে সহরে ঢুকিতে হয়। এখন আশ্রয় স্থানের সন্ধান। প্রফেসর সঙ্ঘ মহাকাল থানে। নেপালী উচ্চারণ "মহংকল কর্থান"। অতিকষ্টে মহংকল থানে আসা গেল। তখন প্রায় ৬টা। বাসা চিনিয়া বাহির করা যায় কি করিয়া? এমন সময় একটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। আমি আজ এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঘরে ঢুকিয়া মেঝের কার্পেটের উপর শুইয়া পড়িলাম। কুলিকে বলিলাম "কাল আকে রূপেয়া লেও।"

রাত্রি ৯টা কি ১০টায় সুধীর বাবু ঘুম হইতে জাগাইলেন। তখন হাত মুখ ধুইয়া, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার শেষ করিয়া, আবার নিদ্রা। রাত্রি যে কি ভাবে কাটিল কিছুই জানি না।

২০শে ফেব্রুয়ারী। প্রাতে উঠিয়া চা-পানের সময় সুধীরবাবু বলিলেন, "আজ আর কোথাও বাহির হইবেন না, একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করুন" আমি "তথাস্তু" বলিয়া বিছানায় আশ্রয় লইলাম। যথাসময়ে কুলী আসিয়া তাহার পাওনা হিসাব করিয়া লইল। ইহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, চুক্তির টাকার উপর চারআনা পয়সা বখসীস্ প্রার্থনা করিল—এবং তাহা পাইয়া অতি প্রসন্ন মনে বিদায় হইল। শিবরাত্রির চারি দিন পরে আবার আসিবে এবং দেশে যাইবার

কালে অন্য কুলি না লইয়া তাহাকেই যেন লই এই অনুরোধ করিয়া গেল।

নাইডু ও তাহার সহচর গতরাত্রে এখানে ছিল এবং অধ্যাপকগণের আতিথ্যে সুখেই ছিল। আজ প্রাতে ধর্ম্মশালা অভিমুখে যাত্রা করিল।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ভারতীয় প্রজার রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা নাই, ইহা এক শ্রেণীর আন্দোলনকারীদের মত। এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমাদের অনেক মুসলমান "সহপ্রজা" (Fellow subjects) স্বাধীন দেশের বায়ুসেবন জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য কাবুল বেড়াইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে এ কার্য্যটী কিন্তু এখনও করা হয় নাই। যদি মুসলমান ভ্রাতাদের আদর্শে হিন্দু রাজনৈতিকগণ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে স্বাধীনতার বায়ু সেবন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদের নেপালে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কারণ, নেপালই একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। কিন্তু "এ বড় কঠিন ঠাঁই"। "বায়ু সেবন" কি "সময় কর্ত্তন" জন্য নেপালে আসা বড় সহজ নয়,—মোটেই আসা যায় কি না সে বিষয়েই ঘোর সন্দেহ। তিব্বত যেমন Land of Mystery, নেপালও Jealously guarded from 'foreigners এবং এই "বৈদেশিক" সংজ্ঞার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতবাসীও ভুক্ত। একমাত্র শিবরাত্রির সময় তীর্থযাত্রিগণ সহজে—তাহাও বিনাপাশে নয়, যাইতে পারে এবং তীর্থকৃত্য সমাপনান্তে তাহাদিগকে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। অন্য সময় এ রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন ব্যাপার। এই নেপালে যখন সম্পূর্ণ দুই মাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি, তখন এই দেশ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিলে বোধ হয় তাহা পাঠকগণের প্রতি উৎপীড়নের কার্য্য হইবে না; বরং না করিলেই পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি হইবে না। এই বিবেচনায় প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নেপাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটু সংক্ষেপ বর্ণনা দিলাম।

পুরাকালে নেপাল উপত্যকাটী জলপরিপূর্ণ ছিল এবং "নাগ হ্রদ" নামে অভিহিত হইত। হিন্দুদের মতে বিষ্ণু এবং বৌদ্ধদের মতে মঞ্জুশ্রী তরবারির আঘাতে পর্ব্বত দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া জল নিষ্কাষিত করিয়া দেওয়ায়, নাগহ্রদ উর্ব্বর উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। খ্রীঃ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত নেপালের ধারাবাহিক কোন প্রামাণ্য ইতিহাস আছে কি না, জানা যায় না। কিম্বদন্তী অনুসারে মঞ্জুশ্রীর পর ধর্ম্মাকর, ধর্ম্মপাল, সুধন্ব, কুশধ্বজ, কনকমুণি বুদ্ধ, বাঙ্গালার রাজা প্রচণ্ডদেব, কাল্পিভেরমের ধর্ম্মদত্ত, বিক্রমাদিত্য, বিক্রমকেশরী এবং মানদেব এখানে রাজত্ব করেন। রাজা সুধন্বা সীতার স্বয়ম্বরে জনকপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি হত হয়েন এবং রাজা জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজ নেপালে রাজত্ব করিতে আসেন। কাল্পিভেরমের ধর্ম্মদত্তের সময় নেপালে চতুর্ব্বর্ণের বসতি হয় এবং রাজা ধর্ম্মদত্ত পশুপতিনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজা মানদেব বোধনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

নেপালের আদিম অধিবাসিগণ মঙ্গোলিয়ো জাতীয় মগর গুরুঙ্গ খস্ নেওয়ার, যক্ষ লিম্বু মুরমি কিরান্তী এবং ল্যাপচা প্রভৃতি। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য তিব্বতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই নেপালে তিব্বতীয়গণের আগমন হইয়াছিল।

শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ যে নেপালে গিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দে নেপাল-নিবাসী দেবপাল নামক কোন ক্ষত্রিয়ের সহিত রাজা অশোকের কন্যা চারুমতির বিবাহ হয়। এই ক্ষত্রিয়-যুবকের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষ হইতে আগত আর্য্যদের সঙ্গে মঙ্গোলিয় জাতির রক্ত-সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়।

নেপালের ইতিহাস গোপ রাজবংশ হইতে আরম্ভ। নে মুনি নামক জনৈক ঋষি বাগমতী ও বিষ্ণুমতী (বর্ত্তমান নাম কেশাবতী) নদীর সঙ্গমস্থলে বর্ত্তমান নেপাল সংস্থাপন করিয়া কোন ধার্ম্মিক গোপনন্দনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। নে কর্ত্তৃক পালিত এজন্য স্থানের নাম নেপাল। নেপাল বলিলে সাধারণতঃ কাঠমণ্ডু সহর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানকেই বুঝায়। কাষ্ঠ এবং মণ্ডপ অথবা মন্দির হইতে কাঠমণ্ডু সহরের নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এখনও কাঠমণ্ডু সহরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড বাড়ী আছে।

গোপরাজবংশ হইতে মল্লরাজবংশ পর্য্যন্ত নেপালে দ্বাদশ বার রাজবংশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু নেপালীগণ গৌরব করে যে তাহাদের দেশে কখনও মুসলমান লুণ্ঠনকারী অথবা বিজেতা আগমন করিতে পারে নাই। তাহাদের দেশের পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই।

১ গোপরাজবংশ ২ আহির রাজবংশ ৩ কিরাতী রাজবংশ ৪ সোমবংশ ৫ সূর্য্যবংশ ৬ ঠাকুরী রাজ বংশ ৭ বৈশ্য ঠাকুরী রাজবংশ ৮ ঠাকুরী রাজবংশ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বার, ৯ কর্ণাটক রাজবংশ, ১০ রাজা মুকুন্দ সেনা, ১১ মুকুন্দ সেনার পরবর্ত্তীগণ, ১২ অযোধ্যা রাজবংশ এবং ১৩ মল্লরাজবংশ, বর্ত্তমান গোর্খারাজ বংশের পূর্ব্বে নেপাল রাজত্ব করিয়াছেন।

কিরাতী বংশের সপ্তম রাজা জিতদষ্টি কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে এই রাজার রাজত্ব কালে শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য নেপালে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এক রাজার রাজত্ব সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও শাক্যসিংহের আবির্ভাব ইতিহাস মতে অসম্ভব বোধ হয়।

কিরাতী বংশের চতুর্দ্দশ রাজা ষ্টিনকোর রাজত্বকালে রাজা অশোক নেপালে আগমন করেন এবং পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকট দেবপত্তন (দেবপাটন) নামক এক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন।

খ্রীঃ ৬৫৩—৬৫৬ অব্দে সূর্য্য বংশীয় সপ্তম রাজার রাজত্বকালে শঙ্করাচার্য্য নেপাল আগমন করেন। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"One Sankaracharya, a bigoted Brahmin induced most furious persecution against all persons of every age and rank and of either sex who professed or practised the religion of Budha. He destroyed their literature, burned their temples and butchered their priests and sages, but failed to overthrow their religion."

শঙ্কর নেপাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে না পারিলেও, তিনিই নেপালে শৈব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শৈব ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান আকারে নেপালে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

পণ্ডিত ভগবান দয়াল ইন্দ্রজী নেপালী শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীঃ ৬৩০—৬৩৫ অব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজা শ্রীহর্ষ নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। সম্ভবতঃ নেপালে কোন প্রতিনিধি রাখিয়া শ্রীহর্ষ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেই প্রতিনিধিকে পরাজয় করিয়া অংশুবর্ম্মণ রাজা হয়েন এই অংশুবর্ম্মণ ঠাকুরী বংশের প্রথম রাজা।

ঠাকুরী বংশের পঞ্চম রাজা বীরদেব ললিতপুর (ললিতপাটন) নগর প্রতিষ্ঠা করেন। কোনও কুণ্ডের জলে স্নান করাতে এক ঘাস বিক্রেতার কুরূপ দেহ লাবণ্যময় দেহে পরিণত হয়, এবং সেই ঘাস বিক্রেতার নামানুসারে পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের নিকটে রাজা বীরদেব ললিতপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

ঠাকুরী বংশের ষষ্ঠ রাজা চন্দ্রদেব কান্তিপুর বা বর্ত্তমান কাঠমণ্ডু সহর নির্ম্মাণ করেন।

ঐ বংশের সপ্তম রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে খস্ জাতির মধ্যে অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হয় এবং নেপালী দেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছেন্দ্র বা মকিন্দ্রনাথ) দেবের কৃপায় জলকষ্ট নিবারিত হয়।

অষ্টম রাজা বড়দেব তাঁহার রাজধানী ললিতপাটনে স্থানান্তরিত করেন।

যদি শঙ্করাচার্য্যের নেপালে আগমন ৬৫৩—৬৫৬ খ্রীঃ হওয়া ঠিক হয়, তবে তাঁহার আগমন সূর্য্য বংশীয় সপ্তম রাজার রাজত্ব সময়ে না হইয়া ঠাকুরী বংশীয় অষ্টম রাজা বড়দেবের রাজত্ব সময়ে হইয়াছিল।

মল্ল বংশের অষ্টম রাজা যক্ষের রাজত্বকালের (১৪৬০-১৪৮০ খ্রীঃ অব্দ) পরে নেপালে তিনটী রাজধানী হইতে তিনজন রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইতে আরম্ভ হয়। যথা ১ বক্তারপুর বা ভাটগাঁও, ২ কান্তিপুর বা কাঠমণ্ডু, এবং ৩ ললিতপুর বা ললিতপাটন।

আলাউদ্দীন খিলিজি চিতোর ধ্বংস করিবার পর তথা হইতে পলায়িত কোন রাজপুত্র হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে গোর্খা রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বহু পরে রাণা বংশীয় ভ্রাতৃদ্বয় গোর্খা রাজ্যে আসিয়া গোর্খা রাজের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। রাজবংশের পৃথ্বী নারায়ণ সৈন্যাধ্যক্ষদের সাহায্যে মল্লবংশীয়গণকে পরাজিত করিয়া নেপালে বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৬৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চারি বৎসর যুদ্ধের পর পৃথ্বীনারায়ণ কান্তিপুর, ললিতপুর এবং ভাটগাঁও-এর রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া আপন প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই চারিবৎসর ব্যাপী যুদ্ধের কোনও যুদ্ধে নেপালী সৈন্যের শরাঘাতে পৃথ্বীনারায়ণের এক ভ্রাতার চক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ কল্পে নেপাল অধিকারের পর পৃথ্বীনারায়ণ অনেক নেপালীর চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার বংশধরেরা কার্লে জুম্লা, পাল্পা, মস্তার প্রভৃতি স্থানের রাজা ও তাঁহাদের অধীনস্থ আরও ২৪ জন রাজাকে (চৌবিশিয়া রাজ) পরাস্ত করেন। তিব্বতের সহিতও নেপালের যুদ্ধ হয়। ইহার পরিণামে নেপাল রাজ্য নেপাল উপত্যকা হইতে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

খ্রীঃ ১৮১৪ অব্দে নেপালের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের পর নেপালরাজ ইংরেজকে নাইনিতাল, মসৌরী, শিমলা এই তিনটী পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য নিবাস ও তিরাইএর কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া সিগৌলী নামক স্থানে ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। তখন হইতে কাঠমণ্ডু সহরে ইংরেজ রেসিডেণ্টের আগমন হয়। বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট অপেক্ষা উচ্চতর রাজকর্ম্মচারী এন্‌ভয় (Envoy) থাকেন।

নেপাল প্রকৃতিদেবীর লীলা নিকেতন। নদী, হ্রদ গিরিসঙ্কট, অত্যুচ্চ তুষার শৃঙ্গ, শ্যামল প্রান্তর, পুষ্পিত বনস্থল নিবিড় অরণ্য, জনকোলাহলপূর্ণ নগর—সমস্তই ভ্রমণকারীর মনে একটী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আনয়ন করে। নেপালে অনেকগুলি নদী আছে এবং তাহার সমস্তগুলির দ্বারাই ভারতবর্ষ উপকৃত হইতেছে। কৃষ্ণা অথব কালী গণ্ডকী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মুক্তিনাথ হইতে চারিদিনের পথ উত্তরে দামোদর কুণ্ড হইতে নির্গত হইয়া এই নদী ভারতবর্ষে পড়িতেছে।

নেপাল হইতে তিব্বৎ যাইতে ৬টী গিরিসঙ্কট (mountain pass) আছে। ইহার প্রত্যেকটীই সমুদ্র বক্ষ হইতে অনেক উচ্চে।

১। তকলাথার। এইটী নন্দাদেবী ও ধবলাগিরির মধ্যে। নেপাল হইতে মানস সরোবরে (মানস তলাও) যাইতে এই গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়।

২। মস্তাং। ধবলগিরির ৪০ মাইল পূর্ব্বে। মুক্তিনাথ, দামোদর কুণ্ড এবং মস্তাং যাইতে এই গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে হয়। জনশ্রুতি যে মস্তাং হইতে ভোটের (তিব্বতের) মধ্য দিয়া মানস সরোবর, তথা হইতে বদ্রীনাথ ও হরিদ্বারে আসা যায়। এই পথে গেলে মস্তাং হইতে নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন এবং তকলাথার গিরিসঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে হয় না। এই মস্তাংএর পথে মানস সরোবর গিয়াছেন এমন কাহারও সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

৩। ৪। গোসাইথানের পশ্চিমে ও পূর্ব্বে কেরাং ও কুটীপাশ। ত্রিশূলী হইতে কেরাংএর পথে তিব্বৎ

যাওয়া যায়। কাঠমাণ্ডু হইতে ত্রিশূলী একদিনের পথ—আমি অবশ্য দেড় দিনে আসিয়াছিলাম। ত্রিশূলী হইতে গোসাইথানের পাদদেশ ৪ দিনের পথ। এই গোসাই-থানের পাদদেশে গোসাইকুণ্ড তীর্থ এবং গোসাইকুণ্ড হইতে ত্রিশূলী গঙ্গা নির্গত হইয়াছে। নেপাল মাহাত্ম্য মতে মহাদেব সমুদ্র মন্থনে উদ্ভুত বিষপানে অস্থির হইয়া এই গোসাইকুণ্ডের জলে গাত্র জ্বালা নিবারণ করেন এবং লোক হিতার্থে ত্রিশূলাঘাতে কুণ্ড বিদারণ করিয়া জলস্রোত নিম্নভূমিতে প্রেরণ করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে অধ্যাপক ডাক্তার আগরকার এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ গোসাইথানে গিয়াছিলেন। শুনা গেল যে তাঁহারা ১৩০০০ তেরো হাজার ফিটের উপরে উঠিতে পারেন নাই।

কুটীপাশ তিব্বতের রাজধানী লাসা যাইবার পথ। বর্ত্তমানে অনেকে তিব্বৎ যাইতে রকশোল হইয়া রেল পথে কলিংপো এবং তথা হইতে গিয়াংসির পথে লাসা যাইয়া থাকে। কুটীপাশ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। এখনও তীর্থযাত্রীরা ও বণিকগণ এই পথে লাসা গমনাগমন করিয়া থাকে।

৫। ৬। হাতীয়া ও ওয়ালাং নামে আরও ২টী গিরি সঙ্কট আছে। ওয়ালাং নেপাল রাজ্যের পূর্ব্ব সীমানায়। ওয়ালাংএর অপর নাম ওয়ালাঞ্চাং। ইহাই বোধ বল্লং বা বংক্ষন নামে একটী স্বতন্ত্র গিরি সঙ্কট বলিয়া বাঙ্গালাতে অনুবাদিত হইয়াছে।

পশ্চিমে কমায়ুন হইতে পূর্ব্বে সিকিম পর্য্যন্ত আবার তিনটী অত্যুচ্চ চিরতুষারাবৃত শৈল শৃঙ্গ।

১	নন্দাদেবী	সমুদ্রবক্ষ হইতে	২৫৭০০	ফিট উচ্চ
২	ধবলাগিরি —	" "	২৬৮২৬	ফিট উচ্চ
৩	গোসাইথান	" "	২৬৩০৫	" "
৪	গৌরীশঙ্কর	" "	২৩৪৪০	" "
৫	এভারেষ্ট	" "	২৯০০০	" "
৬	কাঞ্চনজঙ্ঘা	" "	২৮১৫৬	" "

নেপালরাজ্যে ধান্য, গোধূম, যব, সরিষা, গোল আলু নানা জাতীয় ডাইল, লঙ্কা, পেয়াজ এবং মেথি প্রভৃতি প্রধান ফসল। কমলা, কলা, আম ইত্যাদি ফল।

এ রাজ্যে লোহা, তামা, সীসা ও সোণার খনি আছে বলিয়া বিশ্বাস। আমি কোন কোনও পর্ব্বতে অভ্র দেখিয়াছি।

একদিকে তিব্বৎ ও অপর দিকে ইংরেজের সহিত নেপালবাসীদের বাণিজ্য। কম্বল, নানাবিধ পশমী কাপড়, ঘোড়া, কুকুর, ছাগল, ভেড়া, স্বর্ণরেণু এবং পার্ব্বত্য লবণ তিব্বৎ হইতে যথেষ্ট রপ্তানি হইয়া নেপালে আসিয়া থাকে। অন্যদিকে বিলাতী কাপড়, সিগারেট, দেশালাই, কেরোসিন তৈল, মেয়েদের হাতের কাঁচের চুড়ি, গলার ফুঁকের মালা প্রভৃতি ব্রিটীশ ভারত-বর্ষ হইতে নীত হইয়া থাকে।

বস্ত্রের জন্য এখনও নেপালীরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশের উপর নির্ভর করে না। পার্ব্বত্য জাতিরা কার্পাস বা পশমে তাহাদের নিজেদের বস্ত্র নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যেও নেওয়ারেরা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। এখানকার শিল্পবাণিজ্য অধিকাংশই নেওয়ারদের হাতে।

নেপালে জাতিভেদ প্রথা আছে। "ছোলে না হোয়" অস্পৃশ্য জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। নেপাল রাজ্যে এখনও দাসত্ব প্রথা আছে। এ রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীর তেরটী কথ্য ভাষা আছে। একটীর সহিত অপরটীর কোনই সাদৃশ্য নাই। রাজকীয় ভাষার নাম পার্ব্বতীয়া। আফিস আদালতে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। পাঠশালাতে এইটীই "ভাষা" রূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। পার্ব্বতীয় ভাষাতে "গোর্খাপত্র" নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ কাঠমণ্ডু সহরে বাহির হয়। নেওয়ারেরা তাহাদের ভাষাকেই উন্নত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষা বলিয়া দাবী করে।

এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পূজা পার্ব্বণ সমস্তই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। শিব চতুর্দ্দশী, দোলপূর্ণিমা রামনবমী ও অক্ষয় তৃতীয়া এই কয়টীই প্রধান পর্ব্ব।

নেপাল রাজের টাকশাল আছে। পয়সা। (আমাদের দেশের হিসাবে মূল্য অর্দ্ধ পয়সা) ঢেবুয়া (মূল্য ভারতীয় এক পয়সা) তাম্র মুদ্রা। এক শ্রেণীর ঢেবুয়া আছে তাহাতে কোন ছাপা নাই, একটু তাম্রখণ্ড মাত্র। নেপাল রাজ্যের বাহিরে গোরখপুর পর্য্যন্ত এই ঢেবুয়ার আংশিক প্রচলন আছে। মোহর (মূল্য প্রায় ছয় আনা), এবং রূপেয়া (মূল্য প্রায় বার আনা) রৌপ্যমুদ্রা। ষাট্‌ মোহর অথবা ত্রিশ রূপেয়ায় আমাদের চব্বিশ টাকা। নেপালী মুদ্রা হইতে ব্রিটীশ ভারতীয় মুদ্রার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ব্রিটীশ ভারতীয় মুদ্রাকে সাধারণ লোকে "কোম্পানী" এবং শিক্ষিতেরা ব্রিটীশ কয়েন্‌ (British coin) বলিয়া থাকেন। নেপালে স্বর্ণমুদ্রার আসরফীর প্রচলন আছে, মূল্য ত্রিশ টাকা। এখানে কারেন্সি নোটের খুব আদর।

পূর্ব্বে নেপালে একটী হাইস্কুল মাত্র ছিল। এখন একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নেপাল রাজ্যে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা আছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের টোলে যেমন কলাপ ব্যাকরণ প্রথম পাঠ্য, নেপালরাজ্যে তদ্রূপ লঘুকৌমুদী। রাজকীয় সাহায্যপ্রাপ্ত অনেকগুলি পাঠশালা আছে, সেখানে সংস্কৃত ও "ভাখা" (পার্ব্বতীয়া ভাষা) শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক পাণ্ডতের টোল আছে, সেখানে শুধু সংস্কৃতই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নেপালের অনেক ব্রাহ্মণ বারাণসী যাইয়া তাঁহাদের পাঠশেষ করেন ও উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। বেদ, উপনিষৎ পাঠের কোন চতুষ্পাঠী নাই, কিন্তু ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের "সহস্র শীর্ষা পুরুষ" হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর পাঁচটী সূক্ত অনেক ব্রাহ্মণই আবৃত্তি করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই কাশ্যপ ও আত্রেয় গোত্রীয়। আত্রেয়গোত্র বঙ্গদেশে নাই—অন্ততঃ আছে বলিয়া আমি জানি না। এখানকার সকল ব্রাহ্মণই—এমন কি কাশ্যপ গোত্রীয়েরাও—যজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনী শাখাভুক্ত।

নেপালে অনেক বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী আছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক সকলেই বাঙ্গালী। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও রাজপুরুষদের সন্তানগণের গৃহশিক্ষকগণ সকলেই বাঙ্গালী। পূর্ত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়র। স্বাস্থ্য বিভাগ বাঙ্গালী ডাক্তারের হাতে। কাঠমণ্ডু সহরে একটী মেয়ে হাঁসপাতাল আছে। দুইটী বাঙ্গালী মহিলা ডাক্তার তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

কাঠমণ্ডু সহরে একটী রেসিডেন্সি পোষ্টাফিস ও একটী নেপাল দরবারের পোষ্টাফিস আছে। যে চিঠিপত্র বৃটীশ ভারত হইতে কাঠমণ্ডু সহরে যায়, তাহা রেসিডেন্সি পোষ্টাফিস হইতে বিলি হয়, এবং যে সমস্ত চিঠিপত্র নেপাল রাজ্য হইতে ব্রিটীশ ভারতবর্ষে আইসে তাহা রেসিডেন্সি পোষ্টাফিসের যোগে আইসে। যে সমস্ত চিঠিপত্র নেপাল রাজ্য মধ্যে বিলি হয় তাহা নেপাল দরবারের পোষ্টাফিসের যোগে বিলি হইয়া থাকে। নেপালে রাজের নিজের ডাক টিকট আছে। ব্রিটীশ ভারতবর্ষ হইতে আগত কোন চিঠি নেপাল রাজ্যের কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বিলি করিতে হইলে, বিলির ব্যবস্থা অনেকটা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কোন ব্রিটীশ ভারত-প্রবাসী নেপালী স্বদেশে তাহার আত্মীয়কে চিঠি লিখিলে, লেখককে দুই রকম ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমতঃ আত্মীয়ের নামের চিঠিতে নেপালী ষ্ট্যাম্প দিয়া, ঐ চিঠিকে অন্য একটা খামে পুরিয়া ব্রিটীশ ভারতীয় ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হইবে এবং নেপাল কাঠমণ্ডুর পোষ্ট মাষ্টারের নামে পাঠাইতে হইবে। রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার ঐ খাম খুলিয়া, চিঠিখানা নেপাল রাজ্যের পোষ্টাফিসে পাঠাইবেন। তথাকার পোষ্টমাষ্টার আবার উহা গন্তব্য স্থানের পোষ্টাফিসে পাঠাইবেন। যে আফিস হইতে চিঠি বিলি হইবে, সেই আফিসের পোষ্টমাষ্টার তাহার আফিশের নিকট দিয়া যে কোন লোক লিখিত ঠিকানার গ্রামে যাবে, তাহা দ্বারা শিরোনামা লিখিত লোককে চিঠির খবর দিবেন এবং লোকটি আসিয়া আপন চিঠি লইয়া যাইবে।

কাঠমণ্ডু হইতে বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত টেলিফোঁ আছে। নেপাল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড হয় না।

গোহত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা এবং গরুকে অকর্ম্মণ্য (maiming) করিলে আসামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

নেপাল রাজ্যে অনেক মুসলমান প্রজা আছে। গোহত্যা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাহারা সরকার হইতে কোনই বাধা পায় না। তাহাদের দায়াদ অধিকার তাহাদের শাস্ত্র অনুসারেই স্থিরীকৃত হয়। আমি অনেক মুসলমান প্রজার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। ইহারা আপনাদিগকে বেশ সুখী মনে করে। ইহারা প্রায়ই উচ্চ পর্ব্বতের অধিবাসী। স্থানীয় ভাষার সঙ্গে ইহারা হিন্দি ভাষাও বেশ বলিতে পারে। ইহাদের মকৃতব আছে, মস্‌জিদ আছে এবং মৌলবী আছেন।

আমাদের দেশে প্রবাদ যে মুসলমান বিজেতা ভারত অধিকার করিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি এবং তাঁহার সমধর্ম্মীরা যদি গোহত্যা না করেন, তবে হজরত মহম্মদকে হিন্দুর দশ অবতারের মধ্যে স্থান দিয়া তাঁহার পূজা হিন্দুগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বিজেতা গোহত্যা বন্ধ করিতে সম্মত না হওয়ায়, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নেপাল রাজ্যে মুসলমানেরা যদিও গোহত্যা করে না, তথাপি তাহাদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা হিন্দু কি বৌদ্ধ দেবতার সঙ্গে এখনও পূজিত হয়েন না। হিন্দু কি বৌদ্ধগণ মুসলমানদিগকে তাহাদের সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন নাই। কিন্তু তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মগত ও সমাজগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন না।

"নেপালে মহিষ ভক্ষণং" নেওয়ারদের মধ্যে প্রচলিত। "রাঙ্গাকা মাস' (মহিষ মাংস) নেওয়ারদের এবং "বুন্দেলকা মাস" (বন্য বরাহ মাংস) রাণাদের প্রিয় খাদ্য। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী। নিম্ন শ্রেণীর কিছু অখাদ্য আছে কিনা জানি না। "হংস পারাবত ভক্ষঃ কামরূপনিবাসিনাং" কেবল নহে, এখানেও যথেষ্ট প্রচলিত; অধিকন্তু কুক্কুট মাংস।

নেপাল রাজ্যের বর্ত্তমান সীমানা উত্তরে তিব্বৎ, পূর্ব্বে সিকিম ও মিচি নদী, দক্ষিণে বিহার ও যুক্ত প্রদেশ এবং পশ্চিমে কমায়ুন ও কালী নদী। দৈর্ঘ্যে ৫২০ মাইল, প্রস্থে ১৪০ মাইল এবং আয়তনে ৫৪০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা নেপালীদের মতে ৫২০০০০০ হইতে ৫৬০০০০০ মধ্যে, ইংরেজদের মতে ৪০০০০০০। রাজস্ব দশলক্ষ মুদ্রা—(ইংরেজদের মতে) কোটী মুদ্রা। রাজ বংশের উত্তরাধিকারীর অর্থাৎ পৃথ্বীনারায়ণের বংশধরের। "গদিকা মলিক" বলিয়া যদিও যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে বহুদিন হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার লোপ হইয়াছে। রাজ্য উত্তরাধিকারীর উপাধি "ধীরাজ" এবং তিনি His Majesty the King of Nepal। তাঁহার মন্ত্রীর উপাধি His Highness the Maharaja Prime Minister of Nepal, মহারাজ বলিলে প্রধান মন্ত্রীকেই বুঝায়—ধীরাজকে বুঝায় না। নেপাল রাজ্যের শাসন যন্ত্রের পরিচালক প্রধান মন্ত্রী। ইনি বিখ্যাত মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের বংশধর। মন্ত্রিত্ব পদও বংশগত, তবে এক্ষেত্রে Law of primogeniture নাই। বংশের প্রধান ব্যক্তি মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রীই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা- যাহা কিছু অভাব অভিযোগ প্রার্থনা সকলই প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে জানাইতে হয়। [Although the Mahadhiraj (the king) is the nominal ruler of Nepal and important statements are issued under his seal (Lal mohur) and proclamations are made in his name and he appears at some State functions, his actual power is nil The real ruler of the country is the Prime Minister.—Gurkha)

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

আলোচনা

জৈনধর্ম্ম

গত ভাদ্রের "মানসী"তে লিখিয়াছিলাম, "জৈন-গুরু মহাবীর স্বামীর এক উপদেশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে পবিত্র ভারতবর্ষে আর্য্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে তবে জীবের নির্ব্বাণ লাভ সম্ভব।" কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, জৈনাচার্য্যরা অনার্য্য বংশীয় (দ্রবিড়, সিংহলী ইত্যাদি) লোকদের শিক্ষা দিয়া জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এখনও দাক্ষিণাত্যে বিস্তর জৈন আছেন। তবে কি তাঁহারা আপনার গুরুর আজ্ঞা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন? আমি ঐ কথাটি একজন ইংরাজ লিখিত পুস্তক হইতে লইয়াছিলাম। পরে জৈনদের প্রামাণিক গ্রন্থ "উত্তরাধ্যায়ন সূত্র" সংগ্রহ করিয়া মহাবীর স্বামীর উপদেশ দেখিলাম। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে ৩৬টি উপদেশ আছে, তাহার দশম উপদেশে এইরূপ উক্তি পাইলাম মহাবীর স্বামী তাঁহার প্রধান শিষ্য মহামহোপাধ্যায় গৌতম ইন্দ্রভুতিকে বলিতেছেন :—

১৬ শ্লোক। মনুষ্য জন্ম পাইলেও জীব কদিচ আর্য্য হয় কেন না অনেকে দস্যু, বা ম্লেচ্ছ শরীর পাইয়া থাকে। অতএব হে গৌতম, সাবধান হও।

১৭। জীব আর্য্য শরীর লাভ করিলেও কদিচ পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত হয়; কেন না এরূপ মনুষ্যও দেখা যায় যাহার একাধিক ইন্দ্রিয় নাই। অতএব হে গৌতম, সাবধান হও।

১৮। জীব পঞ্চেন্দ্রিয় লাভ করিলেও কদিচ সর্ব্বোত্তম শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পায়। অতএব হে গৌতম, সাবধান হও। ইত্যাদি।

আদি পুস্তকে বা উপদেশে "পবিত্র ভারতবর্ষ" শব্দ নাই। বোধ হয় ইংরাজ লেখক ঐ শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া জৈনেরা "আর্য্য" শব্দ আর্য্যবংশ (Aryan race) অর্থে কখনও ব্যবহার করে নাই। তাঁহারা আর্য্য শব্দ "সম্ভ্রান্ত" অর্থে ব্যবহার করিতেন। অতএব বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত ভারতের বাহিরে জৈন ধর্ম্ম কেন যায় নাই তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। জৈন সূত্রগুলি সংখ্যায় বহু। অন্য কোনও সূত্রে সন্ধান পাইলে জানাইব।

জৈনাচার্য্যদের যে সকল কঠোর নিয়ম আছে ও যাহা এখনও তাঁহারা পালন করিয়া থাকেন, তাহাতে বিদেশে যাওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আজকাল গুজরাত, কাটিয়াওয়াড় ইত্যাদি প্রদেশে অনেক জৈন সাধু আছেন। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাধু প্রচার উদ্দেশে মাদ্রাসে গিয়াছিলেন। জৈন সাধুদের কোনও প্রকার যান বাহনে উঠিতে নাই, পদব্রজেই যাইতে হয়। এই সাধু রেলে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। হাঁটা পথে যাইবারও উপায় নাই, কারণ সাধুরা অযাচিত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের রন্ধন করিতে নাই। যদিও অ-জৈন বৈষ্ণবদের দান গ্রহণ করিতে দোষ নাই, জৈনেরা মাছ মাংস খাদকের রাঁধা অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের খাদ্য বিচার অতি কঠোর। তাঁহারা তাজা তরকারী কন্দ মূল খাইতে পারেন না। জৈনমতে তাহাতে প্রাণ আছে। কেবল শুষ্ক চাল, ডাল, গম ইত্যাদি খাইতে পারেন; কিন্তু এরূপ খাদ্য সাধারণ অজৈন গৃহস্থ বাটীতে পাওয়া অসম্ভব না হইলেও দুষ্কর। কোনও সাধু আসিলে জৈন শ্রাবক (গৃহস্থ) তাঁহাকে রাঁধা খাবার ও তিন চার ঘণ্টা ফোটান জল খাইতে দেন। সাধুরা কাঁচা জলও খাইতে পারেন না। অতএব হাঁটাপথে যাইলে, পথে জৈন গৃহস্থদের বাস না থাকিলে, তাঁহাদের জলাভাবেই দেহত্যাগ করিতে হয়। বোধ হয় এই সকল কারণে জৈন সাধুরা ভারত ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ, কিংবা অন্য কারণও আছে নিঃসন্দেহে এখন বলিতে পারিলাম না।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

সূফী ধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আষাঢ় (১৪শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা) সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে "সুফীধর্ম্ম" নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে সুফীধর্ম্ম কি তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সুফীধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং তিনি যে অজ্ঞতা বশতঃ অনেক বিপক্ষ কথা বলিয়াছেন, তাহাও এস্থলে সংশোধন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

তিনি লিখিয়াছেন---"সুফীধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মের একটী শাখা।" বাস্তবিক পক্ষে সুফীধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মের শাখা নহে—স্বরূপ। ইসলাম ধর্ম্মটি কি তাহার বিশ্লেষণ করিলেই সমস্ত পরিষ্কার

হইয়া যাইবে। তাহা হইলে সহজেই বোঝা যাইবে সুফীধর্ম্ম ইসলাম ধর্ম্মের শাখা না স্বরূপ।

মুসলমান সেই ব্যক্তি, যিনি মনে এবং মুখে স্বীকার করেন ও বিশ্বাস করেন যে, "উপাস্য নাহিক কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত হজরত মোহম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত "রসুল" (নায়েব বা প্রতিনিধি), আল্লাহ নিরাকার এবং তাঁহার কোন শরিক বা অংশী নাই; তিনিই একমাত্র কর্ত্তা ও উপাস্য; হজরত মোহম্মদ (দঃ) তাঁহার বার্ত্তাবহ। মুসলমানের কর্ত্তব্য এই বার্ত্তাবহের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করা এবং কোরাণকে আল্লার বাক্য বলিয়া স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা; হজরত মোহম্মদকে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ "পায়গম্বর নবী" ও রসুল বা বার্ত্তাবহ বলিয়া স্বীকার করা ও বিশ্বাস করা, কোরাণের আদেশ পালন করা ইত্যাদি।"

উক্ত কার্য্য পালন ব্যতীত মুসলমান হইতেই পারে না। মুসলমান হইবার পর মুসলমানকে কতকগুলি কার্য্য করিতে হইবে—যেমন নামাজ পাঠ, রোজা রাখা (অবশ্য রমজানের পূর্ণ একমাস), কোরবাণী করা, জাকাত দেওয়া ও হজ্জ করা (শেষ তিনটি সমর্থের জন্য) এবং কোরাণ পাঠ। নামাজ পাঠের বিধি দিবা রাত্রিতে পাঁচবার—যেমন সকালে, দ্বিপ্রহরে, সায়াহ্নে, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে। নামাজ পাঠ মুসলমানের পক্ষে কোন অবস্থাতেই নিষেধ নাই; কেবল জ্ঞান হারাইলে, বাতুল হইলে তাহার নামাজ পড়িবার আবশ্যকতা নাই, রোজাও ন্যায়-সঙ্গত নহে। যিনি নামাজকে মুসলমানের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাহিরে স্থান দিবেন, তিনি আল্লার আদেশে অবাস্থা স্থাপন করিলেন—সুতরাং তিনি মুসলমান নহেন।

নামাজ রোজা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরজ' (অবশ্য করণীয়) কার্য্যগুলি ব্যতীত নির্জ্জনে "এবাদত" (ঈশ্বরোপাসনা) করা মুসলমানের নিষিদ্ধ নহে, এবং সেরূপ করিলে বিশেষরূপে পুরস্কৃতই হইয়া থাকে। "ফরজ" এবং কতকগুলি "সুন্নত" (পায়গম্বরের আদেশ) কার্য্য ব্যতীত নির্জ্জনে উপাসনা করা পায়গম্বরের উপদেশ। সেই নির্জ্জন উপাসনা যিনি করেন তিনিই সুফী নামে খ্যাত হন।

মুসলমানকে আরও একটি বিষয় মানিয়া চলিতে হয়—সেটি "শরিয়াৎ" বা ধর্ম্ম বিধি ব্যবস্থা (যা আল্লাহ ও পায়গম্বরের আদেশ) "শরিয়াৎ" ত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য করিবারই ক্ষমতা মুসলমানের নাই, করিলে তাহাকে পথভ্রষ্ট বলা হইবে এবং "শরিয়াতে" বিশ্বাস স্থাপন না করিলে মুসলমানের গণ্ডী হইতে সে বাহির হইয়া যাইবে।

বিমলবাবু লিখিয়াছেন, "নামাজ,রোজা প্রভৃতি লোক দেখান ভড়ঙের উপর সুফী অত্যন্ত চটা।" এবং "একজন সুফী সাধু বলিয়াছেন, মূর্খ মসজীদ নির্ম্মাণ করায়, কিন্তু সে নিজের হৃদয়-মন্দিরকে অনাদৃত ভাবে ফেলিয়া রাখে।" এই কথার দ্বারা উক্ত বাক্যের সমর্থন করাইয়াছেন। বিমলবাবু এখানে বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। ইহার এক কথায় অর্থ "বক ধার্ম্মিক।" অর্থাৎ গোপনে অনেক কুকর্ম্মই করিতেছে, প্রকাশ্যে সুফীয়ানা দেখাইতেছে, দান খয়রাত করিতেছে ইত্যাদি। এইরূপ লোকের উদ্দেশেই ঐ বাক্য প্রযোগ হইয়াছে—নামাজ রোজার বিপক্ষে হয় নাই।

সুফীগণের সাধারণতঃ চারিটি স্তর আছে যেমন—আবেদ, মজ্জুব, সালেক ও আরেফ। আবেদ সেই সমস্ত লোক যাঁহারা নির্জ্জনে উপাসনা করেন। উপাসনা করিতে করিতে যাঁহারা আল্লার প্রেমে বিভোর হইয়া উন্মত্ত হইয়া যান এবং যাঁহাদের জগৎ সংসার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়া যায় তাঁহাদিগকে মজ্জুব বলে। আবার এই মজ্জুবি অবস্থা যখন পরিবর্ত্তিত হইয়া আরও একটু উচ্চ সোপানে উঠে তখন তাহাকে সালেক বলে। এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্তর বা সোপানকে আরেফ বলে। ১৩০০ বৎসরের মধ্যে মাত্র তিন জন—দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা—আরেফ-জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রত্যেক স্তর বা সোপান অতিক্রম করিতেই হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। যাহার যেমন ক্ষমতা তিনি তখনই সেই সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। যাহা হউক, আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, অনেক সুফী নামাজ পড়েন না এবং রোজা রাখেন না। সকল সুফীই যে এরূপ করেন তাহা নহে এবং করিতে পারেন না। কেবল যিনি মজ্জুব বা জ্ঞানহীন তিনিই এরূপ করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞানহীন বাতুলের জন্য কোন বিধিই পালনের ব্যবস্থা নাই সুতরাং জ্ঞানহীন বাতুল মজ্জুবকে দেখিয়া সুফী শিরোমণি মনে করা যে কতটা অর্ব্বাচীনতা তাহা সহজেই অনুমেয়।

কথিত আছে একদা একব্যক্তি নদীর ঘাটে বসিয়া ওজু (ablution) করিবার সময় অদূরে একটি পরমা সুন্দরী নব যুবতীকে দেখিতে পাইয়া, অজু সমাপনান্তে তাহার নিকটস্থ হইয়া কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কামিনী তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনার প্রশ্নোত্তরের পূর্ব্বে আমার কিছু কথা শুনুন। আপনাকে যখন দৌড়িয়া আসিতে দেখিলাম তখন মনে করিলাম আপনি মজ্জুব হইবেন (অর্থাৎ উন্মাদ)। কিন্তু যখন অবাধে ওজু ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, তখন

মনে করিলাম আপনি আরেফ (অর্থাৎ সজ্ঞান যোগী) হইবেন। কিন্তু যখন আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তখন মনে করিলাম আপনি আরেফ ভিন্ন অন্য কেহ নন। কিন্তু যখন আমার সন্নিকটে আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বুঝিলাম এ তিনটির কোনটিই আপনি নন—সুতরাং যাহার মধ্যে এ সমস্ত গুণের কোনটিই নাই, তাঁহার প্রশ্নের আমি কোন উত্তর করি না।" এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন। এ উপদেশের যে অর্থই থাকুক, মজ্জুবের স্থান যে কত নিম্নে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

বিমলবাবু লিখিয়াছেন, "মুক্তির জন্য সুফীগণ পুরোহিত (পীর) আচার্য্য (মৌলবী বা মৌলানা) বা নবীর কাছে যায় না, সুফী ধর্ম্মের উপদেশ পালন করিলেই তাহারা মুক্তিলাভ করে।" এ কথাটি ভুল। নবীকে না মানিলে তিনি মুসলমানই নন, এবং নবীর নিকট না গেলে তাঁহার মুক্তিই নাই। অ-মুসলমানদের যেমন ঈশ্বরের পূজার সময় পুরোহিত আবশ্যক হয়, মুসলমানদের সেরূপ কোন আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা আবশ্যক কায সকলেই স্বয়ং করিতে পারেন। সুফীগণই মুক্তির জন্য পীর বা পুরোহিতের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুসলমান শাস্ত্রে সাকার পূজা একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু সুফীগণ যখন মুক্তির পথে অগ্রসর হন, তখন তাঁহাদিগকে সাকার পূজা করিতে হয়। কিন্তু সে সাকার পূজা মৃন্ময় বা পাষাণময় মূর্ত্তি গড়িয়া তাহার ধ্যান নয়—পীর বা পুরোহিতের মূর্ত্তি ধ্যান করা। সুফীগণের এই সময়কে "ফানা ফিশ শেখ" বলে। এই সোপানে পূর্ণতা লাভ হইলে পীর বা পুরোহিত এক মহাপুরুষের নিকট লইয়া যান। এই মহাপুরুষই নবী। এই সময় হইতে নবীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়। এই সময়টিকে "ফানা ফির রসুল" বলে। এই সোপানে পূর্ণতা লাভ হইবার পর নবী সাধকের অভীষ্ট স্থানে লইয়া যান। এই সময় জগৎ সংসার ভুলিয়া কেবল আল্লারই ধ্যান করিতে হয়। এই সময়কে "ফানা ফিল্লাহ" বলে। সাধক এইখানেই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধক যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন যে স্তরে বা সোপানে সে অধিষ্ঠিত থাকে তাহাকে "বাকা বিল্লাহ" বলে। এই সময় সাধকের আর কোন বিকার উপস্থিত হয় না, সে একাধারে বৈরাগী ও সাংসারিক। হাফেজ, নিজামি, সাদি, খৈয়াম যাহা কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, সমস্তই "বাকা বিল্লাহ" উপনীত হইবার পূর্ব্বে। এই "বাকা বিল্লাহ" উপনীত হইতে অনেক অসাধ্য সাধনার প্রয়োজন। মহর্ষি মনসুর "ফানা ফিল্লাতেই" এমন বিকারগ্রস্ত হইলেন যে, "আয়নাল হক্ক" (আমিই আল্লাহ) বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আবার হজরত খাজা মইনউদ্দীন চিস্তি (আজমীরে যাঁহার সমাধি) স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির জন্য এমন কিছু করিলেন যাহা জগতে চিরস্মরণীয়, কারণ তিনি বাকা বিল্লায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মুসলমান কখনও বিধর্ম্মীকে ঘৃণা করিতে পারে না, কারণ কোরাণ সে শিক্ষা মুসলমানকে দেয় না, উপরন্তু কোরাণ অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্বও অস্বীকার করে না। বরং যুগে যুগে সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁহার নবী বা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন এবং কেতাবও দিয়াছেন, ইহাই কোরাণ প্রমাণ করে। তবে সকলগুলিকে বাতিল করিয়া কোরাণ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে ইহাও কোরাণ বলে এবং কোরাণের পরে আর কোন গ্রন্থ আল্লার নিকট হইতে আসিবে না ইহাও মুক্ত কণ্ঠে বলে। সকল ধর্ম্মকে বাতিল করিয়া ইসলাম ধর্ম্মকে প্রেরণ করিলেও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক হজরত মোহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন যে, যদি কেহ এক নিরাকার আল্লার উপাসনা করে এবং আমার অস্তিত্ব স্বীকার নাও করে, তথাপি আমি তাহার "সাফাবেতের" (মুক্তির) জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিব। ইহা কি কম উদারতার কথা? এহেন গুরুর শিষ্য হইয়া মুসলমান কখনও কি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারে? তবে যে করে, তাহা অনেকটা প্রতিবেশীর সঙ্গগুণে—এবং স্বধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া।

মোহম্মদ জাহাঙ্গীর খাঁ চৌধুরী।

বৈদেশিকী

বালীদ্বীপে হিন্দু প্রভাব।

যবদ্বীপের প্রধান নগর বাটেভিয়া হইতে Sluyters' **Monthly** নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রচারিত হয়। গত জুলাই মাসে ঐপত্রে "Rambles through **the** Isle of Bali" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে।

খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা বালী দ্বীপের কিয়দংশ অধিকার করে; তাহা দুইটি জেলায় বিভক্ত। বাকী অংশ আজও কোন য়ুরোপীয় জাতির কুক্ষিগত হয় নাই।

Royal Packet Steam Navigation কোম্পানির জাহাজে চড়িয়া, বালীর উত্তর উপকূলে বোয়লেলেং নামক স্থানে নামিয়', মোটব গাড়িতে দক্ষিণ
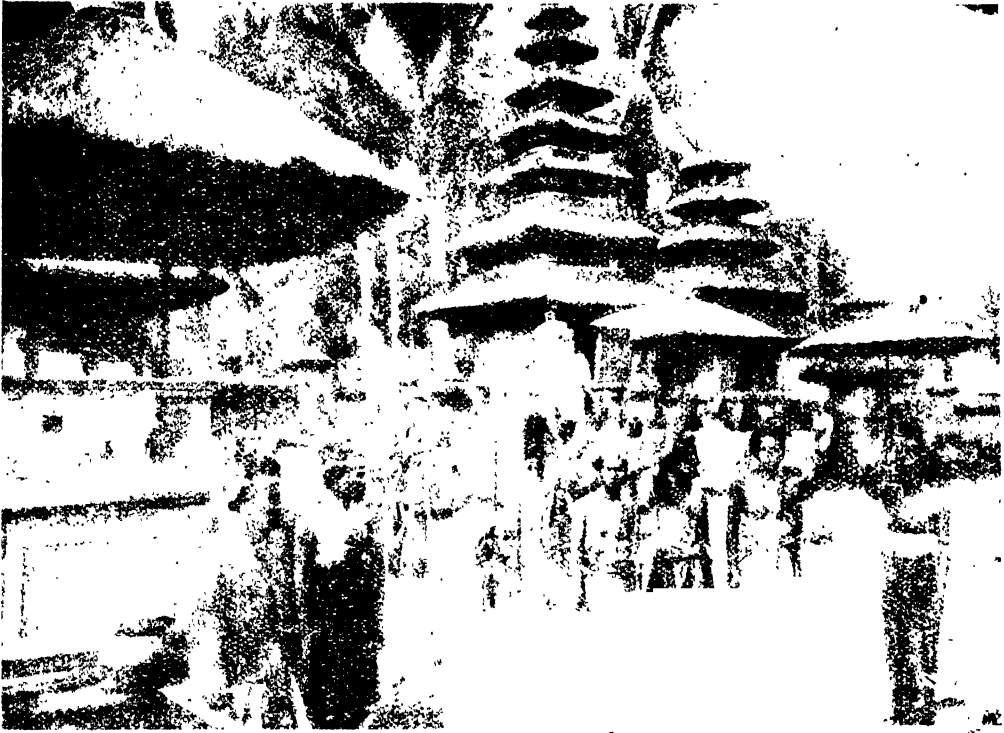
বালীদ্বীপে হিন্দু মন্দির

বোর্ণিও দ্বীপের দক্ষিণে যব সমুদ্র; তাহার দক্ষিণে বালী দ্বীপ। ইহার আয়তন প্রায় দুই হাজার একশত বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। ইহ'তে কয়েকটি আগ্নেয় গিরি আছে। ১৯১৭ সালের ভূমিকম্পে ঐ দ্বীপের খানিকটা ধসিয়া জলে পড়িয়া যায়। ১৮৪৯

উপকূল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। বালীতে মোটর গাড়ি প্রচুর। তথায় ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়াদের রঙ্গীন সাজসজ্জা দেওয়া হয় এবং তাহাদের গলায় ও পিঠে ঘণ্টা ও ছোট আর্সি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

বালীর মুর্গিগুলি প্রকাণ্ড। তাহাদের লড়াই খুব

প্রচলিত। লড়াইএর পূর্ব্বে মুর্গির পায়ে ছুরি বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

বালীর লোকেরা পোষাক পরিচ্ছদ ও গৃহ নির্ম্মাণে কার্পণ্য করে এবং মন্দির গঠনে যথাসাধ্য ব্যয় করে। ("The contrast is remarkable between the beautiful temples dedicated to gods and the hovels used by human beings.")

কাশীতে যেমন গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে মন্দির, বালীদ্বীপেও সেইরূপ। মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য্য যথেষ্ট। নরম পাথরে তৈয়ারী বলিয়া ইহা বেশী দিন টেঁকে না। বালীর অধিবাসীদের প্রধান দেবতা শিব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে ইহারা শিবের অংশ বলে। ("The Balinese adhere to ancient Hindu religion...... Their main god is Ciwa.")। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বালী দ্বীপের একটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

শ্রীগৌরহরি সেন।

বিদেশে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

ইং ১৯০৬ সালে যে সকল ছাত্রকে Scientific and Industrial Association কর্তৃক বিদেশে পাঠানো হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ গুহ তন্মধ্যে ছিলেন। একবৎসর পরে জাপান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত টোকিও নগরীতে Indo-Japanese Associationএর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কাউণ্ট ওকুমা মহাশয়ের অনুগ্রহে গুহ মহাশয় উক্ত কমিটির সভ্য পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার অদম্য উচ্চ-বাসনার সাফল্য-সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ঐ বৎসর ৮ই জুলাই তারিখে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অন্তর্ভুক্ত Sanfrancisco নগরে বিদ্যার্জ্জন মানসে তিনি উপনীত হইলেন। ১৯১১ সালে California বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক বিদ্যায় বি, এস্, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে যখন এম, এস্, সি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তিনি U.S A Government প্রদত্ত একটী অতি লোভনীয় কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তখন হইতে তাঁহার অন্তরে মাসিক পত্রিকার লেখক হইবার বাসনা জাগিয়া উঠে। যখন California বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যালেরিয়া প্রশমন Inspector পদে নিয়োজিত হইলেন, তখন ম্যালেরিয়া দমনের উপায় সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধ Modern Review পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৩ সালে ১১০০ একর জমি স্বয়ং বন্দোবস্ত লইয়া স্বাধীনভাবে তাহাতে কৃষিকার্য্যের পরীক্ষা ও পরিচালনা করিতে থাকেন। সেই সময় নাট্যকলাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন কল্পে তাঁহার প্রাণে বাসনা জাগিয়া উঠিল। ১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে বায়স্কোপের প্রধান কেন্দ্র "লস্‌এঞ্জিলিস্" নামক স্থানে উক্ত কলাশিক্ষার জন্য গমন করেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তথাপি শিক্ষার স্পৃহা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বায়স্কোপের উপযোগী করিয়া ছোট ছোট নাটক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। সেই সময় "Frisco Republic" সংবাদ পত্রের সম্পাদক তাঁহার পত্রিকায় সেই গল্পগুলি প্রকাশ করায় তাঁহার নাম অল্পে অল্পে বেশ প্রচারিত হইয়া পড়িল।

এই প্রকার ছয়মাস যাবৎ কঠোর সাধনার পর তাঁহার লিখিত প্রথম চলচ্চিত্রের নাটক "The Seven Incarnations of Robert Meejik" কোনও বায়স্কোপ কোম্পানির নিকট বিক্রীত হয়। অল্পদিনের মধ্যে "Armstrong's Fortune" ও "Plantic Venture" নামক দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া বিক্রয় করায়, তিনি একজন

আমেরিকায় "আবুহোসেন" অভিনয়

সিনেমা-লেখক বলিয়া পরিচিত হন। ১৯১৫ সালে আবু-হোসেন গল্পটি বায়স্কোপের উপযোগী নাটকাকারে পরিণত করেন। পুস্তকখানি ইউনাইটেড ষ্টেট্সের প্রধান প্রধান ক্লাবে অভিনীত হইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। তার পর "The Conquest of Kama" নামক একখানি নাটক লেখেন, উহা Orphium Circuit Club দ্বারা অভিনীত হয়। Barkley বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কুমারসম্ভব হইতে অনুবাদ করিয়া একখানি নাটকও প্রস্তুত করেন। উহার অভিনয় কার্য্যও তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রসংশার সহিত সাধিত হইয়াছিল।

নাটক-লেখক হইয়া সুরেন্দ্রনারায়ণের আশার তৃপ্তি হইল না। এবার তাঁহার চিত্তে স্বয়ং সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া খ্যাত হইবার ইচ্ছা জন্মিল। তিনি Kelam Co. তে সহকারী লেখক ও অভিনেতারূপে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে "Shannon o the 6th", "The Raja's Vow", "The Beggar of Cawpur", "Toast of Death", "Lost Village", "Beacon Light" প্রভৃতি কতিপয় পুস্তক নাটকাকারে পরিণত করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। Mr. D. W. Griffith মহাশয়ের সহিত অভিনেতা রূপে থাকিয়া ৮ মাস কাল অভিনয় শিক্ষা করেন। পরে তিনি স্বাধীন অভিনেতা হইয়া Light of Asia পুস্তকখানি সুন্দররূপে অভিনয় করান। ১৯১৭ সালে Keystone Co. তাঁহাকে সিনেমা চিত্র প্রস্তুত করিবার ডিরেক্টার নিযুক্ত করিয়া লইয়া যান। সেখানেও "Sultan's Wife", "Oriental Love" ইত্যাদি কয়েক খানি নাটক তিনি লেখেন। অতঃপর Universal Co. তে অভিনেতারূপে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। সেখানেও "The Campbells are coming" ইত্যাদি পুস্তক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন।

১৯১৯ সালে তিনি স্বয়ং স্বাধীনভাবে বায়স্কোপ ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্ব প্রথম The Life of Christ নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয়

আবুহোসেন ও তাহার স্ত্রী

মৃত্যুর ভানে শায়িত আবুহোসেন

করেন। অদ্যাপি প্রতি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ক্লাব কর্ত্তৃক এই পুস্তক খানির অভিনয় হইয়া থাকে। মধ্যে উক্ত ব্যবসায় মন্দা পড়ায় পুনরায় কিছুদিনের জন্য অন্যান্য ক্লাবের লেখক ও অভিনেতা রূপে তিনি চাকরি করেন। ইতিমধ্যেও অনেক পুস্তক রচনা ও অনেক পুস্তক নাটকাকারে পরিণত করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় Tagore Players' Club নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়া সেখানে ভারতীয় ভাবে ভারতীয় নাটকের অভিনয় করাইতে আরম্ভ করেন। এমেরিকায় তাঁহার শেষ কার্য্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রা (চিত্রাঙ্গদা) নাটকের অভিনয়। এই নাটক অভিনয় দ্বারা তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। Tagore Players' Club আজিও বর্ত্তমান আছে, আমেরিকার প্রায় ৫০০ ভদ্রলোক এই ক্লাবের সভ্য।

১৯২১ সালে ডিসেম্বর মাসে U. S. A. গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া গুহ মহাশয় ভারতীয় নাট্যকলার বৈজ্ঞানিক উন্নতি কল্পে ভারতে আসিয়াছেন। এ দেশের সাহিত্য বহু বহু নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। দেশীয় নট নটীগণদ্বারা সেই ঘটনাবলী বায়স্কোপের আকারে পরিণত করিতে পারিলে জগতের লোক-শিক্ষার উপযুক্ত বহু উৎকৃষ্ট film তৈয়ারি হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতখানি উদ্যম লইয়া এমেরিকার ন্যায় সুসভ্য, চলচ্চিত্রের জন্মস্থানে শত শত গুণী লেখক ও অভিনেতা-গণের মধ্যেও যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন, আমরা আশা করি যে তিনি এদেশে শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, গুহ মহাশয় স্বীয় অবলম্বিত মহৎ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া জগদ্‌বাসীকে মুগ্ধ করিতে পারিবেন।

এতৎসহ কয়েকখানি আলোক চিত্র সন্নিবেশিত হইল। এই চিত্রগুলি গুহ মহাশয়ের সঙ্কলিত আবু-হোসেন নাটকের কয়েকটী দৃশ্য। গুহ মহাশয় কর্ত্তৃক আমেরিকায় অভিনীত দৃশ্যের এই চিত্রত্রয়ই তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যের নিদর্শন।

শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ত্তব্য ও মহত্ত্ব

আমরা কবি হ্যাংলা বড়—
তাদের যশই গাই,
সাধারণের অতীত যেথা
অধিক কিছু পাই।
আকাশ ভ্রমণ, সন্তরণে
সারস বড় নয়,
মহত্ত্ব তার পৃষ্ঠে করে'
বৃদ্ধ পিতায় বয়।
সিংহ কভু হয়নি বড়
ফুলিয়ে কেশর তার,
দুর্ব্বলেরে দেয় সে জানি
দৃষ্টি করুণার।
কর্ত্তব্য ত করতে হবেই—
সেই যে গীতের সুর,
মহত্ত্ব যে গমক তাহার
গিট্‌কিরী মধুর।
কর্ত্তব্য ত অঙ্গ সবল—
আবশ্যকের দান,
মহত্ত্ব যে লাবণ্য তার,
প্রাণের ভিতর প্রাণ।

কর্ত্তব্য ত দেখছি নিতুই—
দাতার করে হেম,
মহত্ব যে অসাধারণ
দানের সাথে প্রেম,
কর্ত্তব্য ত সম্মুখেরি
নগর সুশোভন,

মহত্ব যে পথের পাশে
ঋষির তপোবন।
কর্ত্তব্য ত নিত্যপূজা—
শঙ্খ কাঁসর রব ;
মহত্ব যে নয়ন ধারা,
বুকের মহোৎসব !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

নারীর কথা

আমাদের এই জাগরণের দিনে সকলের মনেই নিজ নিজ অধিকার লাভ করিবার একটা প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে সকলেই একটী অভূত-পূর্ব্ব নব ভাবের প্রেরণা অনুভব করিতেছেন।

আমরা নারীরাও পুরুষদের সহিত অধিকার লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি, এবং অনেক ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছি—অনেক ক্ষেত্র অধিকারের চেষ্টায় আছি। পূর্ব্বকালে বোধ হয় স্ত্রীলোক ও পুরুষদের কার্য্যক্ষেত্র এবং অধিকার লইয়া এত গোলযোগ হইত না। আমরা দিন দিন যত সভ্যতার দিকে, যত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, যত বেশী কার্য্য করিবার সুযোগ পাইতেছি, ততই নিজেদের কার্য্য ত্যাগ করিয়া অলক্ষ্যে পুরুষদের কার্য্যের মধ্যে গিয়া পড়িতেছি,—ততই নিজেদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছি, এবং ততই নিজেদের প্রকৃত অধিকার হারাইতেছি।

এখন আমাদের ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না সত্য কথা —কার্য্য করিতে হইবে। কার্য্য না করিলে, কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষদের সাহায্যকারিণী না হইলে, এ দুর্দ্দিনে কিছুতেই চলিবে না ইহা ধ্রুব সত্য! কিন্তু নারী যদি তাঁহার সমস্ত নারীত্ব ভুলিয়া পুরুষ-ভাবাপন্ন হইয়া তাহার সাহায্য কারিণী হয়েন, তবে নারীর "নিজস্ব" বলিয়া কিছু-ই থাকিল না। নারী তাঁহার নারীত্ব লইয়া, তাঁহার কোমলতা লইয়া কার্য্যে উৎসাহদায়িনী, গৃহে গৃহিণী, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী রূপে নিজেকে জাগাইয়া মন প্রাণ ঢালিয়া শক্তিরূপে বিরাজ করিবেন—ইহাই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বকালের নারীর অধিকার।

ভগবান চিরদিন নারীকে ত্যাগে ঐশ্বর্য্যময়ী, স্নেহ মমতায় করুণাময়ী ও কর্ত্তব্য-দৃঢ়তায় মহিমময়ী করিয়া সৃজন করিয়াছেন। পুরুষ কর্ত্তব্যে কঠোর, কর্ম্মে নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ হইবেন, নারী তাঁহার সমস্ত স্নেহ করুণা আর্ত্তের সেবায়, সংসারাশ্রমে ঢালিয়া দিয়া নিজে সুখী হইবেন এবং সংসারকে সুখী করিবেন, সংসার সাম্রাজ্যে তাঁহারই যে একচ্ছত্র অধিকার!

আমরা নারীরা হয় তো বলিব, কেন, কিসের জন্য আমরা এত সহ্য করিব? আমাদের কি আর সুখ দুঃখ নাই, আমরা কি মনুষ্য নহি, আমাদের কি স্বাধীন ইচ্ছা নাই? আছে—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা বহু কাল্পনিক অভাবের দুঃখ মনে মনে সৃষ্টি করিয়াছি। ক্রমে সেই অভাব বোধটা আমাদের এতদূর অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা কি চাই, কি পাই, কোন্‌টা সুখ আর কোন্‌টা অ-সুখ তাহা সম্যক্‌রূপে অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছি।

আমাদেরই কত ভগিনী কি ভাবে ত্যাগের মহিমা দেখাইতেছেন, কি ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া

দিয়াছেন, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের সমস্ত নারী জাতির প্রাণে নব ভাবের উদ্বোধন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক নারী যদি আমাদের পূজনীয়া নমস্যা-ভগিনী-গণের দৃষ্টান্তে নিজেদের গঠিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে "সোণার বাংলা" আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, বাংলার হাসি ফিরিয়া আসিবে।

এখন আমরা নারীরা ত্যাগের মহিমা ভুলিয়া যাইতেছি, এখন আমরা ঘোর স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদের গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে হইলে মনে হয়, কি দুর্ভাগ্য! একদিন পাচক বা চাকর না আসিলে চক্ষে "সরিষা ফুল" দেখিতে হয়। কেন, আমাদের দিদিমা ঠাকুরমারা কি এ সমস্ত স্বহস্তে করিতেন না, তাঁহারা কি সুখী ছিলেন না? আমরা কি সভ্যতার প্রভাবে এতই নবনীত-কায়া হইয়া পড়িয়াছি যে নিজেদের প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলিও নিজেরা সম্পাদন করিতে পারিব না? ইহা আমাদেরই দোষ। আমরা ভাবি, নিজেরা স্বহস্তে সংসারের কার্য্য করিলে, সংসারে দশ জনের সেবার জন্য পরিশ্রম করিলে বুঝি স্বামী পুত্রগণ অসন্তুষ্ট হইবেন, যেহেতু তাঁহারা "চাকুরে বাবু", তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা যদি স্বহস্তে কোন গৃহকর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পদমর্য্যাদার বুঝি খর্ব্বতা হইবে। কিন্তু তাহা ভুল।

আমরা যদি যথার্থ আমাদের অধিকার লাভ করিতে চাহি, তবে পুনরায় আমাদিগকে ত্যাগমন্ত্রের সাধনার পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা বিদেশী মেয়েদের অনুকরণে নিজেদিগকে গঠিত করিতে গিয়া নারীর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ বালিকারা বারো তেরো বৎসর পর্য্যন্ত যা কিছু বিদ্যা শিক্ষা করে। তার পর বিবাহিতা হইয়া অকালে—অর্থাৎ সংসার সম্বন্ধে ধারণা না জন্মিতেই—স্বামিগৃহে গৃহিণীপদে আরূঢ়া হয়।

যাঁহারা উদার মতাবলম্বী, তাঁহাদের গৃহে অবশ্য বালিকারা শিক্ষার বেশী অবসর পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও পুরুষদের ন্যায় রাশি রাশি পুস্তক মুখস্থ করা এবং সেলাই গান বাজনা ইত্যাদি। নারীর শিক্ষা যে স্বতন্ত্র ভাবের হওয়া উচিত সে কথা বড় মনে পড়ে না। পুরুষ-ভাবাপন্ন এ সব শিক্ষা কিন্তু বালিকাদের পরবর্ত্তী জীবনে, গৃহিণীর কর্ত্তব্যে, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও কার্য্যদক্ষতা ইত্যাদিতে তাদৃশ সাহায্য করিতে পারে না।

অবশ্য এ সমস্ত যে নিষ্প্রয়োজন বা বাহুল্য তাহা আমি বলিতেছি না। আতিশয্যই আনন্দের প্রাণ, মনুষ্যের জীবনযাত্রায় আনন্দটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং সেই আনন্দকে ফুটাইয়া বাহিরে প্রকাশের জন্যই সুশিক্ষার আশ্রয় বা সাহায্য লওয়া।

নারী যদি নিজের স্বার্থকে সংসারের দিক হইতে গ্রহণ করেন, তবে বড় সুখের সংসার হয় এবং সেই-খানেই যথার্থ নারীত্বের বিকাশ। সব সময়ে নারী, ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। নারী গৃহের সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন, কি প্রকারে সর্ব্বতোভাবে সংসারের উন্নতি হইবে সেই চিন্তা করিবেন, যেন পুরুষেরা গৃহের জন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন অনুভব না করেন, তাঁহারা যেন সমগ্র মন প্রাণ দিয়া বাহিরের কার্য্য করিবার অবসর পান।

পুরুষ যখন কর্ম্মজনিত ক্লান্তি অনুভব করিবেন, তখন নারী তাহার সমস্ত স্নেহ করুণা, দয়া ঢালিয়া, ঐকান্তিক আগ্রহ দ্বারা পুরুষদের কর্ম্মে উৎসাহ, প্রাণে আগ্রহ, জাগাইয়া তাঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিবেন ইহাই নারীর অধিকার।

আমাদের দেশে দরিদ্রতার প্রবল চাপে, নারী নারীর মর্য্যাদা হারাইয়া পুরুষদের ভার স্বরূপ হইয়া অনেক সময় সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। হয়তো চারি পাঁচটী সন্তান লইয়া বিধবা ভগিনী তাঁহার পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী ভ্রাতার সংসারে, নিত্য অভা-বের জ্বালা আর একটু বৃদ্ধি করিতে আশ্রয় লইলেন। হিন্দু ঘরের আবদ্ধ বিধবাগণের অপরের গলগ্রহ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

যদি হিন্দুঘরের বঙ্গনারীর অর্থাভাব মোচনের কিছু

উপায় থাকিত, তবে পুরুষদের ভারও অনেকটা লাঘব হইত। কিন্তু তাহার উপায় নাই। বঙ্গনারী যে একেবারেই পরমুখাপেক্ষী, সংসারের ভার স্বরূপ, সে জন্য আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে অনেকাংশে দায়ী করা যাইতে পারে।

সংসারের কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেক নারীই যেটুকু অবসর লাভ করেন, সেইটুকু অযথা অপব্যয় না করিয়া ঘরে বসিয়া চরকা, সেলাইয়ের কল অথবা ঐ জাতীয় কোন যন্ত্র দ্বারা যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। কিন্তু আমাদের এতই দুর্ভাগ্য যে বাল্যজীবনে মনে সে ভাবের কোন বৃত্তিরই স্ফূরণ হয় না, সে জন্য কার্য্যকালে কার্য্যে উৎসাহও আসে না। আমরা অভাবের জ্বালায় হাহাকার করি, কিন্তু কার্য্যের দ্বারা এ কষ্টের বিন্দু মাত্র যাহাতে লাঘব হয়, একটু শ্রম স্বীকার করিয়া তাহা করিতে প্রস্তুত নহি।

এ জন্য আমরা সমাজকে আংশিক ভাবে দোষী করিতে পারি। লেখাপড়া গান বাজনা ইত্যাদি শিক্ষা না দিলে কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ হইবার বাধা জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কায় পিতামাতা কন্যাগণকে খান দুই ইংরাজী পুস্তক ও খান কয়েক বাংলা পুস্তক মুখস্ত করাইয়া বিবাহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইবার মত শিক্ষিতা করিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সুগৃহিণী হইবার ও নিজের দায়িত্ব, নিজের অধিকার, নিজের সাধ্যমত নিজের ভার বহিবার জন্য পিতা মাতা কন্যাগণকে কোনও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না!

আমরা যে দিন আমাদের অনাবশ্যক বিলাসিতা ও আমোদপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারিব, সেই দিন আমরা নারীরা যথার্থ নিজেদের অধিকার লাভ করিতে পারিব।

আমরা অনেকেই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেছি, অনেকেই খদ্দর ব্যবহার করিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাও বিদেশী ছাঁচে ঢালা। সর্ব্বদা অনুকরণের চেষ্টা করিয়া করিয়া, আমরা আমাদের "নিজস্ব" ধরণ ভুলিয়া গিয়াছি।

আমাদের এই দুর্দ্দিনে যেটুকু অপরিহার্য্য, সেইটুকু রাখিয়া সমস্ত বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, নিজেদের অধিকার লাভ করিতে হইলে ত্যাগের মহিমা, সহিষ্ণুতার পবিত্রতা, সেবার মাধুর্য্য, প্রীতির সৌন্দর্য্য প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যেদিন আমরা নারীরা নিজেদের প্রত্যেকটী কার্য্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইব না, যেদিন আমরা পুরুষদিগকে সংসারের সব চিন্তা হইতে—নিজেদের অনাবশ্যক বিলাসিতার উপকরণের জন্য অতিরিক্ত উপার্জ্জনের চিন্তা—হইতে অব্যাহতি দিয়া, সংসার শান্তিপূর্ণ করিতে পারিব, যেদিন সন্তানগণের সুশিক্ষার ভার এবং সংসারের শৃঙ্খলার ভার নিজেরা বহন করিতে পারিব, সেই দিন আমরা আমাদের অধিকার লাভ করিয়া সুখী হইব এবং পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রগণকে সুখী ও সংসারকে শান্তিপূর্ণ করিতে পারিব।

শ্রীসুহাসিনী ঘোষ।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান *

(সপ্তম গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

মেহের্‌উন্নিসা

মিশ্র ভৈরবী————একতালা।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে ?
এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি স্বর কাণে বাজে,
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।
মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরধনে।

[স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

০　　　　　　　১　　　　　　　২´　　　　　　৩
{সা　দা　দা । পদা　-পণদপা　মা I মম　মা　মপা । -দক্ষা　-মা　-জ্ঞা ।
সে　মু　খ　কে০　০০০০　ন　অহ　র　হ০　০০　০　০

০　　　　　　　১　　　　　　　২´　　　　　　৩
। জ্ঞজ্ঞা　জ্ঞা　জ্ঞা । -সা　-মা　-া I জ্ঞমা　জ্ঞঋসণ্া　-সঋজ্ঞা । ঋা　সা　-া }।
ম নে　প　ড়ে　০　০　০　প ০　ড়ে০ ০০　০০০　ম　নে　০

০´　　　　　　　১　　　　　　　২´　　　　　　৩
।{পপা　পা　-া । -া　া　পা I পা　মপা　-দা । পা　মা
নিখি　ল　০　০　০　ছা　ড়ি　য়ে০　০　কে　ন

০　　　　　　　১　　　　　　　২´　　　　　　৩
। জ্ঞজ্ঞজ্ঞা　জ্ঞা　-সদা । -া　-া　-ঋা I ঋজ্ঞা　-মা　জ্ঞা । ঋা　সা　-া }II
কেন চা　হি　০০　০　০　০　সে০　০　ই　জ　নে　০

* "প্রতাপসিংহ"-এর গানের স্বরলিপি ধারাবাহিকরূপে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

—লেখিকা।

II { র্সা র্সা র্সা । র্সর্ঋা -র্সর্ঋা -ণা I ণণদা -ণর্সা -র্ঋর্ঋা । ণা র্সা -া ।
এ নি খি ল০ ০০ ০ স্বর০ ০০ ০ মা ঝে ০

। র্সা র্সা র্সর্ঋা । -র্সর্ঋা -র্সর্ঋা ণা I ণর্সা ণদপা -মপদণা । দা পা -া } ।
তা রি স্ব০ ০০ ০০ র কা০ ণে০০ ০০০০ বা জে ০

। { পপা পা পা । পা পা -া I -মপা -দা -া । পা মা -া ।
ভাসে সে ই সু খ ০ ০০ ০ ০ স দা ০

। জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । -সা -দা -ঋা I ঋজ্ঞা -মা জ্ঞা । ঋা সা -া } II
স্বপ নে কি ০ ০ ০ জা০ ০ গ র ণে ০

II { র্সা র্সা র্সর্ঋা । -র্সর্ঋা ণা -া I ণা ণা -দনর্সর্ঋা । ণা র্সা -া ।
মো হে র০ ০০ ম ০ দি রা ০০০০ ঘো র ০

। র্সা র্সা র্সর্ঋা । -র্সর্ঋা -র্সর্ঋা -ণা I ণর্সা ণদপা -মপদনা । দা পা -া } ।
ভে ঙ্গে ছ০ ০০ ০০ ০ ভে০ ঙ্গেছে০ ০০০০ মো র ০

। { পপা পা পা । পা পা -া I -মপা -দা -া । পা মা -া ।
কেন র হে পি ছে ০ ০০ ০ ০ প ড়ি ০

। জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । -সা -দা -ঋা I ঋজ্ঞা -মা জ্ঞা । ঋা সা -া } IIII
পাপ বাঞ্ছা ০ ০ ০ প০ ০ র ধ নে ০

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলহান্তরিতা।

এক দুঃস্থ গৃহস্থের দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার জন্য অশ্রুকুমার দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে একটা অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার বৃহৎ মোটর গাড়ী গলি রাস্তার প্রবেশ-পথে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়াছিল। গৃহস্থের দুঃখ দূর করিয়া সে আপন মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য বড় রাস্তার দিকে আসিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী একটা খোলার বাড়ীতে কলহের কোলাহল শুনিয়া, সেই কলহের কারণ কি, তাহা বুঝিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বুঝিল যে কলহকারিগণের মধ্যে একজন পুরুষ অন্যজন রমণী।

পুরুষ কি রূঢ় কথা বলিয়াছিল, তাহা অশ্রুকুমারের শ্রবণগোচর হয় নাই। কিন্তু তাহা শুনিয়া বিদ্রূপের তীব্র স্বরে রমণী যাহা বলিল, তাহা অশ্রুকুমার স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

রমণী কহিল, "ওঃ! ভারি ত আমার স্বামী! দু'বেলা দু'টো ভাত যোগাবার ক্ষমতা নেই, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি!"

পুরুষ অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "কখন আবার চোখ রাঙ'লাম? পূজা-আহ্নিকের জায়গা ঠিক করে রাখনি, তাই শুধু বলেছি। শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীই সহধর্ম্মিণী। সেই স্ত্রী যদি আমার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা না করে, তাকে স্ত্রীই বলা যেতে পারে না।"

রমণী আরও উগ্র কণ্ঠে কহিল, "না বল্‌লে ত বয়ে গেল। স্ত্রী হয়ে ত সুখের সীমে নেই। খাটতে খাটতে শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে গেল; তার ওপর আবার রাতদিন ফৈজত।"

পুরুষ আরও একটু নম্র স্বরে কহিল, "কি আবার ফৈজত করলাম?"

রমণী উগ্রতর কণ্ঠে কহিল, "কি না করেছ? সর্দ্দারণী পর্য্যন্ত বলেছ।"

পুরুষ প্রশ্নময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সর্দ্দারণী? কৈ, আমি ত তোমাকে সর্দ্দারণী বলিনি। ওঃ!—বুঝেছি—কি আপদ? সহধর্ম্মিণী শব্দটা তুমি অনুধাবন কর্ত্তে পারনি, গিন্নী। না বুঝে, মনে করেছ আমি তোমাকে সর্দ্দারণী বলে গালি দিয়েছি।—শাস্ত্রে ঠিকই বলেছে, 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'।"

ইহার পর, ক্রন্দনের ও ক্রন্দনময়ী রমণীর কলহের যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহা শ্রবণ করিয়া অশ্রুকুমার বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিল, হায়, কত সামান্য কারণ হইতে সংসারে কত ভীষণ অশান্তির উৎপত্তি হইতে পারে;—কি সামান্য স্ফুলিঙ্গে কি বিরাট বহ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠিতে পারে! কিন্তু এই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের, এই সামান্য কারণটুকুর কেন উৎপত্তি হয়?—অশ্রুকুমার তিন বৎসর কাল পরহিত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বুঝিয়াছিল যে, দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণেই যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহাতেই অভাব-পরিশুষ্ক সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। সে বিলক্ষণ জানিত যে শত শত সংসারে অর্থাভাবেই দাম্পত্য প্রণয়, সহোদরপ্রীতি, সন্তানের পিতৃমাতৃভক্তি, অধিক কি জনক জননীর সন্তান-স্নেহ সমস্তই পরিশুষ্ক হইয়া যায়;—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র—সমস্তই শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়।

আবার একটা বিকট চিৎকারে অশ্রুকুমারের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

পুরুষ পরুষকণ্ঠে কহিল, "বাঃ, ঘা কতক দিতে না পারলে এ কিচ্‌কিচির নিবৃত্তি নেই।—শাস্ত্রেই বলেছে, 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ' অর্থাৎ মূর্খদের লাঠিই ওষুধ।"

রমণীকণ্ঠে যেন এককালে সহস্র বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। রমণী বজ্রসদৃশ কড়কড় নিনাদে করকা বৃষ্টির ন্যায় বাক্য বর্ষণ করিল, "এসো, এসো না তোমার লাঠি নিয়ে; যদি না আনবে ত তোমার ধর্ম্মের মাথা খাবে। নিয়ে এসো তোমার লাঠি! দেখি তোমার লাঠির জোর বেশী, না আমার এই চেলা কাঠের জোর বেশী। দেখেছ এই তেঁতুল কাঠের চেলা? আজ রক্তগঙ্গা করবো তবে ছাড়ব! নিয়ে এসো তোমার লাঠি। এখন তোমার আর ত কিছু নেই, লাঠি আর লোটাই সম্বল হ'য়েছে।"

ভগ্নদূতের কণ্ঠস্বরের ন্যায় পুরুষের কণ্ঠে স্বরভঙ্গ ঘটিল; পুরুষ কাতর কণ্ঠে কহিল, "নাঃ, আর কোনও উপায় নেই। এ গৃহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; য গৃহের গৃহিণী কটুভাষিণী, সে গৃহে কোনও মতে বাস করা চলে না। আমি এখনই বনবাসী হব! সত্যিই আজ থেকে লাঠি আর লোটাই সম্বল করবো।"

রমণী আবার শিলাবৃষ্টি সদৃশ বাক্যবর্ষণ করিল, "আবার হুমকি দেখান হচ্ছে! হুম্‌কিতে ভয় পাবার মত মেয়েমানুষ হ'লে এতদিন তোমায় নিয়ে ঘর করতে পারতাম না। যাও না, কোথায় যাবে। তুমি বনবাসী হলে, আমরা উপবাসী থাকবো না।"

পুরুষ একটু খেদপূর্ণ স্বরে কহিল, "এবার সত্যই বনবাসী হব; শাস্ত্রেই বলছে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। আমার এই বয়সে বাড়ীতে থাকাই ঝকমারী হয়েছে। তোমরা সুখে থেকো, গিন্নি! পাপ আজ জন্মের মত বিদায় হ'লো।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অশ্রুকুমার দেখিল, বহির্দ্বার খুলিয়া এক বয়স্ক ব্যক্তি সজল নয়নে বাটী হইতে বহির্গত হইল। তাহার কৃষ্ণ বর্ণ, তাহার সেই কদম্ব-কেশরতুল্য কেশকলাপ, তাহার শিরঃশীর্ষে কমনীয় শিখা, বোধ হয় এখনও তোমাদের স্মরণপথে জাগরূক আছে। সে তোমাদের সেই শাস্ত্রবচনাভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ঘটকঠাকুর। তাহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছিল, এবং তাহার কৃষ্ণ কেশমধ্যে, অন্ধকার-পাদপমধ্যগত খদ্যোতের ন্যায়, অনেকগুলি শুভ্র কেশ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু এখনও তাহার শারীরিক গঠনের মৌলিকত্ব নষ্ট হয় নাই। শ্যালকভ্রাতাদিগের প্রবঞ্চনা প্রকাশিত হইবার পর, কিছুদিন তাহাকে ডেপুটীবাবুর ভয়ে ভীত হইয়া, অপ্রকাশিত অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময় অবাধে আপনার ব্যবসা চালাইতে না পারায়, তাহাকে অত্যন্ত অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সময় দারিদ্র্যের অভিমানে সে সর্ব্বদা আপনাকে অপমানিত মনে করিত, এবং তজ্জন্য সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িত। পরিবার প্রতিপালনে আপনাকে অক্ষম বুঝিয়া সে শান্ত নয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না! তাহাদের প্রতিপালনভারে সে আপনাকে প্রপীড়িত মনে করিত।

তাহাকে দ্বারদেশে দেখিবার অব্যবহিত পরেই অশ্রুকুমার শুনিল রমণী আপন মনে বলিতেছে, "কি জ্বালাতে পড়লাম। ছেলে দুটোও বাড়ীতে নেই। কাকে যে পাছু পাছু পাঠাই তার ঠিক নেই। কি এমন বলেছি যে চোখে জল এল! দূর হকগে ছাই! কিসের সংসার? আমিও ওর সঙ্গে বনবাসী হব।"

অশ্রুকুমার যখ রমণীর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাপন্ন বাক্য-গুলি শ্রবণ করিতেছিল, তখন ঘটকঠাকুর গলির বক্রপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। অশ্রুকুমার সত্বর তাহার পশ্চাদানুবর্ত্তী হইয়া স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি দাঁড়ান, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো।"

পশ্চাদাগত অশ্রুকুমারের বাক্যে কিছু সন্ত্রাসিত হইয়া, ঘটক ঠাকুর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "কে হে ছোকরা তুমি আমার বৈরাগ্যে বাধা প্রদান করছ?"

অশ্রুকুমার কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু

তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই এক ক্রন্দনমনা প্রবীণা তাহার পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘটক-ঠাকুরের হাত ধরিল ; এবং রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ওগো! তুমি যদি বনবাসী হবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সে সংসার স্বামীকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারব না, আমি সে সংসারে থাকতে পারব না।"

ঐ কৃশা শঙ্খবলয়মাত্র ভূষিতা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, সীমন্ত সিন্দূরালঙ্কৃতা প্রবীণা অন্য কেহ নহে, ঘটক ঠাকুরেরই কলহকুশলা প্রণয়িনী। তোমরা আশ্চর্য্য হইও না ; কলহিনীগণের অন্তর মধ্যেও প্রবল প্রণয়ের স্থান আছে। জানিও, আদরের ন্যায় কলহও প্রণয়-বৃক্ষেরই একটা ফল মাত্র ;—কলহ অপক্ক ফল, টক্ ; আদর পরিপক্ক ফল, তাই মিষ্ট। স্বামী নিকট থাকিলে যে নির্ভয় কণ্ঠ রূক্ষ বাক্য উদ্গিরণ করে, তাহাই স্বামীর বিচ্ছেদভয়ে করুণস্বরে ক্রন্দন করে। হিন্দুস্ত্রী কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না ; কিন্তু স্বামীর চরণপ্রান্ত ধরিয়া কাঁদে। যে দেশে এই পুণ্যময় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সে দেশ ধন্য !—সে দেশে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও ধন্য !

বাল্যকাল হইতে যে স্ত্রী প্রাণপণ শক্তিতে স্বামী-সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহার চিরাদৃত কপোলে প্রবল অশ্রুপ্রবাহ দেখিয়া ঘটক ঠাকুরেরও নয়নদ্বয় আর্দ্র হইল। সে গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "না না, আমি বনবাসী হব না। চল, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আমি কি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? আমাদের এই কলহ কলহই নয়। শাস্ত্রেই বলেছে, "দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" ; অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের কলহ কলহই নয়। রাস্তায় পাঁচটা কুলোক আছে, যুবতী স্ত্রী দেখলে তারা কুনজর দেয় ; তুমি রাস্তায় আর দাঁড়িয়ে থেক না, চল, বাড়ীর মধ্যে চল।"

কলহান্তরিতাকে সঙ্গে লইয়া প্রেমোচ্ছ্বসিত বক্ষে ঘটকঠাকুর গৃহমধ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলে, অশ্রুকুমার অগ্রসর হইয়া আবার কহিল, "আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

রৌদ্রতাপিত পথিক বিটপীচ্ছায়া প্রাপ্ত হইলে, যেমন তাহা প্রাণপণে উপভোগ করিয়া লয়, ঘটক-ঠাকুরও তেমনই কলহান্তরিতার নবানুরাগ সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিল। অশ্রুকুমারের মৃদুবাক্য তাহার শ্রবণগোচর হইল না। কিন্তু ঘটকজায়া পশ্চাৎ ফিরিয়া অশ্রুকুমারের শান্ত সৌম্য দীর্ঘ মূর্ত্তি, স্নেহময় চক্ষে নিরীক্ষণ করিল ; তাহার কর্ণে অশ্রুকুমারের মৃদু-বাক্য করুণার ধারার ন্যায় প্রবেশ করিল। সে পুনঃ-প্রাপ্ত স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওগো! শুনছ? ছেলেটি তোমাকে কি বলছে।"

ঘটক ঠাকুর অশ্রুকুমরের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওঃ তুমি? তুমি এখনও আছ? তুমি গৃহত্যাগেও বাধা দিয়েছিলে, গৃহপ্রত্যাগমনেও বাধা দিলে। তা' ভালই করলে ; এতে আমাদের মঙ্গলই হবে। কেন না শাস্ত্রেই লিখেছে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" এখন তোমার জিজ্ঞাসাটা কি শীগ্‌গির বলে ফেল ত বাপু।"

অশ্রুকুমার পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, "আপনারা একটু আগে বাড়ীতে বসে যে কথা বলছিলেন, তা' দৈবক্রমে আমি কতকটা শুনেছি। শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, টাকার অভাবেই আপনাদের বাড়ীতে অশান্তির উৎপত্তি হয়েছে। আপনারা কি বরাবরই এই অশান্তি ভোগ করছেন?"

ঘটক ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঘটক গৃহিণী কথা কহিল। অশ্রুকুমারের করুণ কণ্ঠস্বরে সে এমন একটা সহানুভূতির আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল যে, সে তাহার সহিত আগ্রহের সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সে কহিল, "না, না, আমাদের এই অশান্তি বরাবর ছিল না। আজ প্রায় তিন বছর আমরা বড় কষ্টে পড়েছি।"

অশ্রুকুমার কহিল, "কেন কষ্টে প'ড়েছেন, আমাকে তা বল্লে আমি তার প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো।"

ঘটকিনী কহিল, "এস, আমাদের বাড়ীর ভেতর এস বাবা, আমরা সকল কথাই তোকে বলবো। সে দিন গঙ্গায় নাইতে গিয়ে এ পাড়ারই একটি মেয়ের সঙ্গে

আমার দেখা হ'য়েছিল। তারা আমাদের চেয়ে দুঃখী ছিল। কিন্তু সেদিন সে বল্লে, কে একজন বড়লোক তাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে তাদের ভাত-কাপড়ের উপায় করে দিয়েছেন। তার কথা শুনে আমি মনে করলাম যে তার কাছ থেকে সেই বড়লোকের নামটি জেনে নিয়ে আমরাও তাঁকে আমাদের কষ্টের কথা জানাব। কিন্তু সে সেই বড়লোকের নাম বলতে পারলে না। তোমাকে দেখে অবধি আমার কেবল মনে হচ্চে তুমিও কোন বড়লোক হবে, আর বাবা তোমার দ্বারাই আমাদের অন্নকষ্ট দূর হবে।"

বলা বাহুল্য, আমাদের অশ্রুকুমারই সেই পল্লিবাসিনী দুঃখীদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ অপনয়ন করিয়াছিল। আজও সে সেই দুঃখিনীদের কয়েকটা ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাদেরই বাড়ীতে আসিয়াছিল। এবং প্রত্যাগমন পথে ঘটকগৃহস্থের কলহ শ্রবণ করিয়াছিল। এক্ষণে ঘটক-প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সে তাহাদিগের খোলার ঘরে প্রবেশ করিল; সেখানে দাবার একটা স্থান ত্বরিত হস্তে সম্মার্জ্জিত করিয়া ঘটকপত্নী তাহার উপবেশন জন্য একটী অতি মলিন মাদুর বিস্তৃত করিয়া দিল।

উপবেশনান্তে অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তিন বছর আগে আপনাদের কষ্ট ছিল না; এখন কষ্টে পড়লেন কেন?"

ঘটক-ললনা কহিল, "তিন বছর আগে উনি ঘটকতা করে', টাকা আনতেন, তাতে আমাদের সংসারের সকল খরচই কুলিয়ে যেত; বরং আমাকে দু'একখানা গহনাও দিতে পারতেন। তারপর ঘটকতা বন্ধ করে দিলেন; আর আমাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না। প্রথমে এই বাড়ীটুকু বন্ধক রেখে কর্জ্জ করে কিছুদিন চল্‌লো। তারপর আমার গায়ের সোনা-টুকু রূপাটুকু যা ছিল তাই বিক্রি করে সংসার চালিয়েছি। এখন ঘটী বাটী বিক্রি করে অতি কষ্টে খাওয়াটা চলছে। এরপর কি হবে ভগবান জানেন।"

ঘটক ঠাকুর ঊর্দ্ধ দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "গিন্নি ভগবানকে ডাক। এ গোলোকবিহারীর দ্বারা আর কিছু হবে না। এখন ভগবানই আমাদের সংসার চালিয়ে দেবেন। শাস্ত্রেই বলেছে, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।"

অশ্রুকুমার ঘটক ঠাকুরের মুখের উপর শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আপনি ঘটকতা কাযটা ছেড়ে দিলেন কেন?"

ঘটক ঠাকুর অশ্রুকুমারের বিশাল চক্ষু দেখিয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। মনে করিল ঐ দর্পণ সদৃশ বিশাল চক্ষে বুঝি তাহার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথাই প্রতি-বিম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার আপন মাথায় হাত বুলাইল; একবার ঊর্দ্ধমুখী অনমনীয় শিখাগুচ্ছ নামাইতে চেষ্টা করিল; একবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার পর কহিল, "নিয়তি, সকলই নিয়তি! শাস্ত্রেই বলেছে, নিয়তিঃকেন বাধ্যতে।"

ঘটকভামিনী বুঝিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য আসিয়াছে, তাহার নিকট সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব সে কহিল, "দাঁড়াও বাবা, আমি তোমাকে সকল কথাই বলবো। এই তিন বছর আগে একদল জুচ্চোর কোথা থেকে এসে ভবানীপুরে বাসা করেছিল। তারা লোভ দেখালে, যে যদি শেয়ালদার এক হাকিমের নাতিনীর সঙ্গে তাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে তারা হাজার টাকা দেবে। সেই লোভে—"

অশ্রুকুমার আপন প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথাই বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, সে ঘটকজায়ার কথায় বাধা দিয়া ঘটক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ লোকেরাই বুঝি হরিহরপুরের জমীদার বলে পরিচয় দিয়েছিল, আর আপনি বুঝি তাদের প্রবঞ্চনা বুঝতে না পেরে, ডেপুটী বাবুর নাতিনী সৌদামিনীর সঙ্গে তাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন?"

বজ্রাহত পথিকের সকল দেহ যেমন নিমেষ মধ্যে অচল হইয়া যায়, অশ্রুকুমারের প্রশ্ন শুনিয়া ঘটকঠাকুরের দেহও তেমনই নিশ্চল হইয়া গেল।—তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু

চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় স্পন্দহীন হইল; তাহার হস্তপদ গৌতম পত্নী পাষাণময়ী অহল্যার হস্তপদের ন্যায় অসাড় হইয়া রহিল; তাহার ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেল; বুঝিবা, তাহার নিশ্বাস বায়ুও প্রবাহিত হইল না। সে সভয়ে ভাবিল, কে এ যুবক? এ কিরূপে তাহার সমস্ত বিপদের গুপ্তকাহিনী অবগত হইল? হয়ত এ ব্যক্তি কোনও উপদেবতা, অথবা উপদেবতা হইতেও ভয়ানক—পুলিশের গুপ্তচর। ডেপুটীবাবু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, প্রবঞ্চনা অপরাধের জন্য, তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। হায় হায়! তাহার কলহান্তরিতা বনিতা এই অপরিচিত যুবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কি ভয়ঙ্কর নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছে; এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।"

অশ্রুকুমার ঘটকের ও ঘটকগৃহিনীর শঙ্কিত মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, তাহাদের শঙ্কা অপনয়ন করিবার জন্য কহিল, "আপনাদের কোনও দোষ নেই। আপনারা ত কোনও অধর্ম্মাচরণ করেন নি! আপনারা প্রতারিত হয়েছেন মাত্র।"

ঘটকঠাকুর কিছু সাহস পাইয়া কহিল, "আমি এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে বল্‌ছি, প্রতারণায় পড়ে জাত নষ্ট করিনি; আমি কখনই সেই প্রতারকদের বাড়ীতে জলগ্রহণ করিনি। ধর্ম্ম আমার অক্ষুন্ন আছে, কিন্তু ডেপুটীবাবুর নিকট যে অর্থ গ্রহণ করেছিলাম, দারুণ অভাবে প'ড়ে তা প্রত্যর্পণ করতে পারিনি, তাই ধরা পড়বার ভয়ে জনসমাজে ঘটকতা করবার জন্যে বাহির হতে পারিনে। তাই কাপুরুষের মত বাড়ীতে লুকিয়ে বসে দৈবের উপাসনা করছি।—শাস্ত্রেই বলেছে, 'কাপুরুষা এব দৈবং অবলম্বন্তে।'

অশ্রুকুমার আশ্বাস দিয়া কহিল, "আপনি দৈবের অবলম্বন ত্যাগ করে' আবার ঘটকালি ব্যবসা অবলম্বন করুন। ডেপুটীবাবু আমার নিকট আত্মীয়; আমি তাঁকে বল্লে, তিনি কখনই আপনাকে সেই টাকার জন্য দায়ী করবেন না। তা' ছাড়া, হরিহরপুরের নকল জমীদারদের কাছে আপনি যে টাকা পাবার আশা করেছিলেন তাও আপনি পাবেন। আমি কাল আবার এসে সে টাকাটা দিয়ে যাব। আপাততঃ বাজার হাট করবার জন্যে এই টাকাগুলি নিন।"

এই বলিয়া অশ্রুকুমার পকেট হইতে দশ খানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

অশ্রুকুমারের বাক্য শুনিয়া এবং সেই নোটগুলি দেখিয়া, কি জানি মানসিক কি উচ্ছ্বাসে, ঘটকের ও ঘটকপত্নীর চক্ষু হঠাৎ জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ঘটকপত্নী গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাবা! তোমার একশো আশী বছর পরমায়ু হ'ক। বাবা! আজ তুমি আমাদের সকল দুঃখ দূর করলে।"

অশ্রুকুমার প্রবীণার আবেগময় আশীর্ব্বাদের কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কেবল চাহিয়া দেখিল, প্রভাকর প্রভায় যেমন কৃষ্ণ কুজ্ঝাটিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায়, সেই কয়েকখানি নোটের প্রভায় অশান্তির ঘোর কুহেলিকা তেমনি ঘটকগৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; শিশিরভারাক্রান্ত পল্লবপ্রান্ত হইতে যেমন জলবিন্দু খসিয়া পড়ে, ঘটক ভামিনীর অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন হইতে তেমনই অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল। তাহা মানব হৃদয় হইতে বিগলিত কৃতজ্ঞতার বিন্দু; তাহার সহিত কোনও পার্থিব পদার্থের তুলনা হইতে পারে না; নতুবা আমরা বলিতাম, ঐ এক একটি অশ্রুবিন্দু এক একটি কোহিনুর অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধির খেলা।

অশ্রুকুমার যখন ঘটকঠাকুরের বাটীতে বসিয়া তাহাদের আর্থিক কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন অদূরবর্ত্তী আর একটা গলিরাস্তার ধারে একটা দ্বিতল বাটীর দ্বিতলের ক্ষুদ্র কক্ষে একটা অতরুণ তরে উপবেশন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যালক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ আপন কৃষ্ণগুম্ফে হস্ত সঞ্চালন করিতেছিল; এবং

কতটা বুদ্ধি খরচ করিতে পারিলে, সদ্য পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই চিন্তা করিতেছিল। মধ্যম অঘোরনাথ একটা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং একটি পুরাতন পাঞ্জাবীতে অঙ্গ আবৃত করিয়া দাদার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। দেখিয়া, কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভায়া, কেষ্টবাবুর কোনও খবর পেলে? পণের টাকার কোনও কিনারা কর্ত্তে পেরেছে?"

অঘোর। কেষ্টবাবুর সঙ্গে এখনি রাস্তায় দেখা হয়েছিল। এক মাগীর কেষ্টবাবুর পরিবারের সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব। বাবা! চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই, সেই মাগীর নাকি অনেক টাকা আছে। শুন্‌লাম, সেই মাগীই মেয়ের বিয়ের খরচটা দিয়ে গিয়েছে। এখন তুমি চটপট করে শুভবিবাহের দিন স্থির কর্ত্তে পারলেই বিয়েটা হ'য়ে যায়, আর পাঁচ হাজার টাকা আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু, দাদা, পাঁচ হাজার টাকাতে ত আমাদের কুলোবে না, তপ্তখোলায় এক ফোটা জলের মত চুড়ুৎ করে শুকিয়ে যাবে। বাড়ীভাড়া আর চাকর বামুনের মাইনে পাঁচ মাস বাকী প'ড়েছে, তার উপর, কাপড়ের দেনা, মুদীর দেনা, গোয়ালার দেনা, ধোবার দেনা, সা কোম্পানির দেনা; আবার তোমার সোণার ঘড়ী চেন বাঁধা আছে তাও উদ্ধার করতে হ'বে; আর সুধীরনাথকে হাজার টাকা না দিলেও সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারবে না।—বাবা! যার সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তার ওষুধ দেবে কোথায়?"

কেদার। ভাই, একটু বুদ্ধিখরচ কর্ত্তে পারলেই সকল দিকে সুবিধা হ'য়ে যাবে।

অঘোর। তুমি, দাদা, কেবল ঐ বুদ্ধিরই বড়াই করো?—বলে, অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।

কেদার। ভায়া এই অতিবুদ্ধির জোরেই এই তিন বছর বিনা পুঁজিতে একরকম নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিয়েছি। প্রথম দু'তিন মাস সেই হারামজাদা ঝগড়াটে মাগীর বাসায় থেকে, কৌশলে তার গহনাগুলা সংগ্রহ করে, তারপর মাগীকে কলা দেখিয়ে আর এক পাড়ায় উঠে এসে গা ঢাকা দিলাম। সেখানে ছ'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ল'; আর গোয়ালা বেটা টাকা না পেয়ে দুধের যোগান বন্ধ করে দিলে; আর মুদীও কিচিমিচি আরম্ভ করলে; আমরাও রাতারাতি বাগবাজারে উঠে এলাম। সেখানেও পাওনাদারেরা অত্যাচার আরম্ভ করে দিলে; আমরাও এই শোভাবাজারে উঠে এলাম। বাগবাজারে থাকবার সময়ই ত আমাদের সঙ্গে কেষ্টবাবুর আলাপ হ'য়েছিল।

অঘোর। তারপর এখানে এসে কিছু দিন তক্কে তক্কে থেকে টোপ ফেলা গেল। মাছে টোপ গিলেছে, এখন টেনে তুলে ফেলতে পারলেই হয়। কিন্তু, দাদা, মাছ খেয়ে না আঁচালে বিশ্বাস নেই।—কথায় বলে চুণ খেয়ে যার গাল পোড়ে, দই দেখলে তার ভয় করে।

কেদার। ভয়ের একটুও কারণ নেই। যে বুদ্ধি খেলা গেছে তাতে পাঁচ হাজার টাকা ত হস্তগত হবেই, তার উপর সুধীরনাথেরও একটা হিল্লে হবে।

অঘোর। তারপরে, ব্যস! একবারে কেল্লা ফতে। বাড়ীওয়ালা বেটার বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে, আর অন্যান্য দেনা শোধ করে, দিন কতক নিশ্চিন্ত হয়ে কাটান যাবে।

কেদার। তুমি ভুল বুঝলে, ভাই। যার বুদ্ধি আছে সে কখনই বাড়ীভাড়া শোধ করে না। মুদীর কি অন্য লোকের বাকীও মিটিয়ে দেয় না।

অঘোর। কিন্তু তিন শ' টাকায় ঘড়ী চেনটা বাঁধা আছে, সেটা ত উদ্ধার করতে হবে।

কেদার। পঁচিশ টাকা দামের গিল্‌টী করা ঘড়ী চেন; সেটা তিন শ' টাকায় বাঁধা দিয়েছি। সেটা উদ্ধার করা ত বুদ্ধিমানের কায নয়, ভায়া। কেবল সুধীরনাথকে হাজার টাকা দিতে পারলেই আমরা সকল দায় থেকে মুক্তি পাব।

অঘোর। বাবা! আমরা বুদ্ধি খরচ করে টাকা আদায় করবো, আর সুধীর ভায়া নির্ভাবনায় হাজার টাকা পাবে, আবার তার উপর উপরি পাওনা একটি বউ! বাবা, একেই বলে, 'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।"

কেদার। তা তুমি যদি বল, একটু কৌশল করে তা'কে আপাততঃ পাঁচ শ' টাকা দিলেই ঠাণ্ডা করে দেব। তারপর, বাকী সাড়ে চার হাজার নিয়ে আমরা একবারে উধাও হব। বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন বড় চমৎকার যায়গা।

অঘোর। কাশী কি বৃন্দাবনে গেলে, রথ দেখা আর কলা বেচা ছুই হবে। এক দিকে তীর্থ স্থানে থাকার পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবো, আর এক দিকে বিদেশে পাওনাদার না থাকায় বেপরওয়া স্ফূর্ত্তিও চলবে।

কেদার। তার উপর একটু বুদ্ধি খরচ কর্ত্তে পারলে এ টাকা ক'টা খেলিয়ে বেশ ছু'পয়সা রোজগারও ক'তে পারবো।

ভ্রাতৃদ্বয় যখন উপরিউক্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল, তখন ঘটক ঠাকুরের বাটীতে অশ্রুকুমারের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। সে ঘটকের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গলিপথ অতিক্রম করিয়া, বড় রাস্তার ধারে আসিয়া আপন মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল। এবং সোফারকে আপন বামপার্শ্বে বসাইয়া, নিজেই মোটর চালনা করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। বলা বাহুল্য কয়েক বৎসর মোটর শকট চালনা করিয়া অশ্রুকুমার এই কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।

অশ্রুকুমারের দ্বারা চালিত মোটর গাড়ী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সহসা এক ব্যক্তি টলিতে টলিতে ফুটপাত হইতে গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ধূলিশয্যা গ্রহণ করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি অশ্রুকুমার দক্ষতার সহিত অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে শকটগতি একবারে নিরোধ না করিলে, লোকটা নিশ্চয়ই শকটতলে নিষ্পেষিত হইয়া একবারে প্রাণহীন, অথবা জন্মের মত অঙ্গহীন হইত।

লোকটা কেন সেরূপভাবে আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে পতিত হইল, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য, অশ্রুকুমার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পতিত ব্যক্তিকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; এবং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল যে লোকটা অতিরিক্ত সুরা পান করিয়া সংজ্ঞাহীন ও অসংযতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সে তাহার শিথিল দেহ বহন করিয়া আপন গাড়ীতে উঠাইয়া লইল; এবং তাহার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা জানিতে চাহিল।

এই মদ্যপায়ী অন্য কেহ নহে,—আমাদের সুপরিচিত বরবেশধারী সুধীরনাথ। দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও তাহার মদ্যপানাভ্যাস বা সৌখীনতা নষ্ট হয় নাই; এখনও তাহার বেশভূষার পারিপাট্য কমে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে বেশভূষা মলিন এবং স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াছিল, এবং কেশ ও বেশানুলিপ্ত সুগন্ধ, সুরাগন্ধে, দেহনির্গত ক্লেদগন্ধে এবং সিগারেটের গন্ধে মিশ্রিত হইয়া একটা মহাদুর্গন্ধে পরিণত হইয়াছিল। অশ্রুকুমারের প্রশ্ন শুনিয়া সে আপনার জবাকুসুমবৎ রক্তচক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "এই—এই বাওবা গাড়োয়ান! —এই—আমি ত বাওবা—এই—তোমার্-র—এই—গাড়ীর তলার পোওড়ে—এই মোওরে গিছি, বাওবা। ও-তবে—এই—তোমার্-র্ও কথার—এই—হুত্তর-র দেব থেমন্-ন্ কোরে? এই—মরা মা-মানুষে কি—এই—কথা কয়, বাওবা?"

বাক্যোদ্গারের সহিত তাহার মুখবিবর হইতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল, তাহা কষ্টে সহ্য করিয়া অশ্রুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ীর ঠিকানা কি? আপনি মনে করে বলুন। আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিতে চাই।"

সুধীরনাথ এপ্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিল না; সে আপনাকে মৃত মনে করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বার বার প্রশ্ন করিয়া, কোনও উত্তর না পাইয়া অশ্রুকুমার কিয়ৎকাল নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পার্শ্বস্থ দোকান হইতে কিছু শীতলজল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা সুধীরনাথের ললাট প্রদেশ ও চক্ষুর্দ্বয় স্নাত করাইয়া দিল। ইহাতে সে আংশিক ভাবে চেতনা প্রাপ্ত হইল। তখন অশ্রুকুমারের প্রশ্নে পূর্ব্ববৎ বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "এই সাম্‌নের—এই গলি; এই—উনিশ্ নোম্বরের বাড়ী। বড়-দাধা—এই—হিশ্বর কেদার্-র্ নাদ রায়। তাকে—এই—বোলভে—এই

—মোরেছি ভটে খিস্তু—এই—নরকে যাব না। সারা-রাত—এই—জগাকীতুনীর এই গলাধরে—এই হোরি নামের—এই খিত্তন শুনেছি; থারপর—এই সকাল ভেলা—এই খোয়ারি ভেঙে, তবে—এই মোরেছি। বাওবা!—এই-অক্ষয় স্বর্গ—এই—আমার কপালে লেখা আছে।"

অশ্রুকুমার নম্বর জানিতে পারিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া, সত্বর বাড়ীটা খুঁজিয়া লইল। সেখানে জীবন্ত কেদারনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং সকল সংবাদ আনুপূর্ব্বিক প্রদান করিল। পরে কহিল, "আপনারা একটু সহায়তা করুন, আমি তাঁকে বাড়ী পৌছে দিই।" —কিন্তু কেদারনাথ বা অঘোরনাথ কেহই ভ্রাতার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না।

কেদারনাথ কহিল, "আমি বুদ্ধি যোগাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা উচ্চবংশে জন্ম-গ্রহণ করেছি, শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করা আমাদের অভ্যাস নেই।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা সেই বাসি মড়ার মত ভারি লাস আমার বাবা এলেও তুল্‌তে পারবে না!"

ফলতঃ ভ্রাতৃদ্বয় যে ভ্রাতার বিবাহের পণে আপনা-দিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিল, তাহারই সাহায্যের জন্য একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না। অগত্যা অশ্রুকুমার আলোকহীন সিঁড়িগুলি গুলি সাবধানে অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামিয়া আসিল।

অশ্রুকুমার দ্বিতলের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র কেদারনাথ কহিল, "এই ব্যাপার কোনও ক্রমে কেষ্টবাবু জানতে পারলে, সুধীরনাথের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

অঘোরনাথ কহিল, "আর আমরা পাঁচহাজার টাকাও পাব না।"

কেদারনাথ কহিল, "কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলে আমরা এই মদ খাওয়ার কথাটা একবারে চাপা দিয়ে ফেল্‌তে পারব, আর এই ঘটনা থেকে সদ্য কিছু রোজগারও কর্ত্তে পারব। একটু পরেই তুমি আমার বুদ্ধির খেলাটা দেখতে পাবে।"

অন্ধকার সোপানাবলী দিয়া নামিতে অশ্রুকুমার সাবধানতা অবলম্বন করায়, অবতরণ কার্য্যে তাহার বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এজন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের উপরিউক্ত বাক্য তাহার শ্রবণ গোচর হইল। ঐ কথাগুলিতে তাহার মনের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার স্মরণ ছিল যে সুধীরনাথ রায় চৌধুরী নাম দিয়া এবং হরিহরপুরের জমীদার বলিয়া পরিচয় দিয়া একব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে সৌদামিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আজ সে যে সুধীরনাথের নাম শুনিল, এ কি সেই ব্যক্তি? সেই কি এখন এমন মদ্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছে? এই ব্যক্তির সহিত সৌদামিনীর বিবাহ ঘটিলে তাহার কি সর্ব্বনাশই হইত, তাহা ভাবিয়া অশ্রুকুমার শিহরিয়া উঠিল। সেই সুধীর-নাথই কি আবার এক ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছে? এব্যক্তি কৃষ্ণবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কৃষ্ণ বাবু কে? সৌদামিনীর কাকামহাশয়ের নাম, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; এজন্য অশ্রুকুমার কৃষ্ণ নামক কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাইলেই তাহার বিশেষ পরিচয় না লইয়া ছাড়িয়া দিত না। এখনও সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল সে এই কৃষ্ণবাবুর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিবে। তাহার পর, পাঁচ হাজার টাকার উল্লেখ শুনিয়াও তাহার মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিন মিসেস্ আলেকজান্দ্রা দত্ত এক কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থের কন্যার বিবাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকাই চাহিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। ভাবিল সেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রার সহিত এই টাকার কি কোনও সংস্রব আছে?

এই সকল চিন্তায় উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া সে পুনরায় আপন শকটের নিকট প্রত্যাগত হইল; এবং একজন মুটিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া অতি কষ্টে সুধীরনাথের টলটলায়মান দেহ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পৌছাইয়া দিল।

অশ্রুকুমার আপন কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কেদারনাথ আপন বিরাট বুদ্ধির কৌশলে কিছু অর্থোপার্জ্জন করিবার অভিলাষে

তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "দাঁড়াও তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

অশ্রুকুমার কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কেদারনাথ আপনার গুম্ফপ্রান্তদ্বয় জর্ম্মাণ সম্রাটের ন্যায় উর্দ্ধদিকে তুলিয়া কহিল, "পুলিসে খবর দিতে হ'বে।"

অশ্রুকুমার আরও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পুলিসে খবর দেবার দরকার কি? রাস্তায় মাতাল হইয়া ঘুরছিল একথা জানতে পারলে পুলিসের লোক এসে যে আপনাদের ভাইকে গ্রেপ্তার করবে।"

কেদারনাথ চক্ষু তারা ঘূর্ণিত করিয়া কহিল, "আমাদের ভাই মাতাল, এ কথা কোনও শালা বল্‌তে পারবে না। তুমিই আমাদের ভাইকে তোমার গাড়ীর তলায় ফেলে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছ। আমি পঁচিশ জন সাক্ষীর দ্বারা তা' প্রমাণ কর্ত্তে পারব। এ রকম অসাবধান ও বেকুব মোটর গাড়ীওয়ালার সাজা হাওয়ার খুব দরকার। তাই আমরা ঠিক করেছি যে, তোমাকে পুলিশের হাতে দেব। তবে তুমি যদি ভায়ার চিকিৎসা খরচের জন্যে নগদ একশ' টাকা দও, তাহলে আমরা তোমায় এবারকার মত ক্ষমা করে ছেড়ে দেব।"

অশ্রুকুমার কত বড় ধনী ব্যক্তি তাহা কেদারনাথ আপনার প্রকাণ্ড বুদ্ধিবলেও বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল যে অশ্রুকুমার একজন পোষাকহীন সামান্য মোটর চালক মাত্র। এ জন্য সে একশত টাকা মাত্র চাহিয়াছিল।

কেদারনাথের ভীতি প্রদর্শনে অশ্রুকুমার ভ্রূক্ষেপ করিল না; মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভের ন্যায় সে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; এবং মৃদু স্বরে কহিল, "আপনার ভাই গাড়ীর তলায় পড়ে অজ্ঞান হ'ন নি, মদ খেয়েই অজ্ঞান হ'য়েছেন। আপনারা ইচ্ছা করলে পুলিসে খবর দিতে পারেন; আমি এইখানেই এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব। আপনারা আমার কাছ থেকে একটি টাকাও পাবেন না।"

কেদারনাথ বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, তুমি একটুও বুঝলে না। একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে বুঝে দেখ পুলি'সর হাতে পড়লে, তুমি মুস্কিলে পড়বে। প্রথমেই তুমি উর্দ্দী পরনি বলে তোমার এক দফা সাজা হ'য়ে যাবে। তার পর, তোমার গাড়ীর তলায় ফেলে আমার ভাইকে অজ্ঞান করে দেওয়ার জন্যে ঠিক পঁচিশ টাকা জরিমানা, আর দু'বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অশ্রুকুমার কেদারনাথের বাক্যের কোনও প্রকার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অঘোরনাথ কহিল, "বাবা, সুবোধের মত টাকাটা চট্ করে দিয়ে ফেল। তুমি বুঝতে পারছ না।—কথায় বলে, সুবুদ্ধি না নিলে কানে, প্রাণ যাবে হেঁচ্‌কা টানে! বাবা! দু'বচ্ছর জেলের বাইরে থাক্‌লে, কত একশ'—টাকা রোজগার করবে।"

অঘোরনাথের বাক্যেরও অশ্রুকুমার কোনও উত্তর প্রদান করিল না।

তখন কেদারনাথ দাবিত্বের পরিমাণ ক্রমে কম করিয়া পঞ্চাশ টাকায় নামিল। কিন্তু তখনও অশ্রুকুমার নির্ব্বাক রহিল এবং ঐ পঞ্চাশ টাকা দিবার জন্য কোনও ব্যগ্রতা দেখাইল না। কেবল তাহার কম্র ও নম্র মুখমণ্ডলে একটা কৌতুকময় হাস্য-তরঙ্গ লীলা করিতে লাগিল।

সেই মৃদু হাস্য-তরঙ্গ উজ্জ্বলোর্ম্মির আকার ধারণ করিয়া কেদারনাথের বুদ্ধি-গৌরবান্বিত হৃদয়ে প্রহত হইল। সে আপন রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল,—"এই মোড় থেকে কনেষ্টবল্‌কে ডেকে আন।"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন জন্য ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন কেদারনাথ রোষ কষায়িত লোচনে অশ্রুকুমারের হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ় স্বরে কহিল, "এইবার বোঝা যাবে চাঁদ, আমার ভাই মাতাল, না, তুমি বেকুব, বদ্‌মাইস, হারামজাদা গাড়োয়ান।"

এই গালিতে অশ্রুকুমার একটুও রাগান্বিত হইল না; তাহার মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ প্রসন্নই রহিল। পরহিত ধর্ম্ম

অবলম্বন করিয়া অবধি প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সে বার বার দেখিয়াছে যে, আমাদের এই পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বস্তুটা অত্যন্ত বিরল। আমাদের এই সংসারে উপকৃতের নিকট গালি খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আজ কেদারনাথের গালিটাকেও স্বাভাবিক কার্য্য মনে করিয়া সে আপনার চির তুষ্টভাব নষ্ট করিল না।

অল্পক্ষণ পরে গৃহ মধ্যে কনেষ্টবল আসিল। সে কেদারনাথের নিকট সুধীরনাথের শকটতলে পতিত হইবার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, অশ্রুকুমারের সহিত সুধীর-নাথকেও থানায় লইয়া যাইতে চাহিল। তাহাতে কেদার-নাথ আপত্তি উত্থাপন করিল। কিন্তু পুলিসজাতি কখনও কোনও আপত্তিতে কর্ণপাত করে না; আজও করিল না।

অতঃপর ডুলি আসিল, তাহাতে সুধীরনাথের মৃতবৎ দেহ বহন করিয়া আবার মোটর গাড়ীতে আনা হইল। অশ্রুকুমার পাহারাওয়ালাকে ও সুধীরনাথকে লইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে সব্ইন্স্পেক্টর অশ্রুকুমারকে চিনিতে পারিয়া সম্মানের সহিত নমস্কার করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিল; এবং সুধীরনাথকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল। হাঁস-পাতালের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে সুধীর নাথের কোনও অঙ্গে কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই; কেবল অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জ্ঞান জন্মাইলে, অতিরিক্ত মদ্য পানের অপরাধে পুলিস তাহাকে বিচারের জন্য চালান দিল।

সন্ধ্যালে সকল সংবাদ শুনিয়া অঘোরনাথ বাটী ফিরিয়া কহিল, "দাদা, এ যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা হ'ল। ঐ টাকাটার লোভ করা তোমার ভাল হয় নি।—বাবা! অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

কেদারনাথ আপনার দীর্ঘ শ্মশ্রুতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিল, "ভায়া, বসে বসে আমার বুদ্ধির খেলাটাই দেখ না।"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গৃহে

(গল্প)

(রুষ ঔপন্যাসিক শেখভের অনুসরণে)

গভর্ণমেণ্টের উকিল রমেশবাবু সন্ধ্যার সময় কোর্ট হইতে ফিরিয়া চা পানান্তে আফিস ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় বাড়ীর পুরাতন ঝি গম্ভীরভাবে অনেক-গুলি সংবাদ জানাইয়া পরে বলিল—"মণ্টু আজকাল বড় দুষ্টু হয়েছে। আজ আর পশু দিন তাকে চুরুট খেতে দেখেছি। তাকে বারণ করেছিলাম কিন্তু আমার কথা শোনা দূরে থাক সে এমনি জোরে চীৎকার আর নানা ভঙ্গীতে গান সুরু করে দিল যে, আমাকে চুপ করে থাক্তে হ'লো।"

রমেশবাবু বিপত্নীক, এই পুরাতন ঝিই ছেলেটিকে মানুষ করে। রমেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মণ্টু চুরুট খেয়েছে? বাঃ। অতটুকু ছেলের মুখে অতবড় বর্ম্মা চুরুট! হাঃ হাঃ! তার বয়স যেন কত হ'ল?"

ঝি অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বলিল, "সাত। তুমি হয়তো গ্রাহ্য করছো না বাবু, কিন্তু এত ছোট বয়সে চুরুট খাওয়া ভারি বদ অভ্যাস! এখন থেকে তার শাসন হওয়া উচিত।"

"ঠিক কথা। কিন্তু সে চুরুট পেল কোথা?"

"তোমারই দেরাজের মধ্যে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

ঝি চলিয়া গেলে রমেশ বাবু টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তাঁহার ছোট ছেলের মুখে মস্তবড় লম্বা চুরুট, আর তার কচিমুখের চারিদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—এই চিত্র তাঁহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিতেই তিনি অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিলেন।—পরক্ষণেই ঝিয়ের গম্ভীর মুখ তাঁহার শৈশবের আধভোলা দিনগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তখনকার দিনে ছোট ছেলেদের ধূমপান করার কথা শুনিলে শিক্ষক ও পিতামাতা কি শাস্তিই যে দিতেন! তাহাদের নিষ্ঠুর ভাবে বেত মারা হইত—স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হইত! এই লঘু অপরাধে তাহাদের জীবন কি শোচনীয়ই না হইয়া উঠিত!

এই চিন্তার প্রসঙ্গ তাঁহাদের দুই তিনটি ছাত্রের কথা মনে হইল যাহারা এই অপরাধে স্কুল হইতে বিতাড়িত হওয়াতে তাহাদের জীবনটাই মাটি হইয়া গিয়াছিল। পাপ অপেক্ষা যে পাপের শাস্তিই তাহাদের অধিক ক্ষতি করিয়াছে ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাঁহাদেরই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খুব ভাল লোক হইলেও একজন ছাত্রের মুখে চুরুট দেখিয়া এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত শিক্ষকদের ডাকাইয়া সভা করিয়া সেই ছাত্রটিকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা সামাজিক আইন। কারণ, সামাজিক আইনে—যেখানে পাপের গুরুত্ব যত অল্প সেখানেই শাস্তির মাত্রা তত অধিক।

রমেশ বাবু শুনিলেন মণ্টু ও ঝিয়ের মধ্যে কথা হইতেছে। মণ্টু ব্যগ্রভাবে বলিতেছে, "বাবা এসেছে! বাবা এসেছে! আমি বাবার কাছে যাব।"

বাধা দিয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে ঝি বলিতেছে, "আমার কথা আগে শোন্ হতভাগা ছেলে।"

রমেশ বাবু মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন ঝির নারীজন-সুলভ স্নেহ উথলিয়া উঠিয়াছে। মণ্টুর নামে নালিশ করিয়া, এখন যাহাতে তাহার অধিক শাস্তি না হয় তাহারই কিছু ফন্দী তাহাকে শিখাইবার চেষ্টায় আছে বোধ হয়।

কিন্তু মণ্টু তাহার কথা শুনিবার পাত্র নয়। সে ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আমি তোমার কোন কথা শুনতে পারবো না। আমি আবার বাবাকে কি বল্‌বো, বা-রে!" এই বলিয়াই সে ছুটিয়া পিতার কক্ষে উপস্থিত হইল।

পিতার জানু বাহিয়া কোলে উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোমলস্বরে মণ্টু বলিল, "তুমি কি আমাকে ডেকেছিলে বাবা?"

রমেশবাবু তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ তোমার সঙ্গে আমার গোটাকত কথা আছে। আমি তোমাকে আর কখনো ভালবাসবো না।"

মণ্টু একবার ম্লানভাবে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া, তারপর তাহার দৃষ্টি টেবিলের দিকে ফিরাইয়া লইয়া, পুনরায় পিতার দিকে চাহিয়া চোখ মিট মিট করিতে করিতে বলিল, "আমি তোমার কি করেছি বাবা? আমি সারাদিন তোমার ঘরেও ঢুকিনি - তোমার কোনও জিনিষই ছুঁইনি তো!"

"ঝি বলছিল—তুমি নাকি চুরুট খেয়েছ। সত্যি?"

"হ্যাঁ—আমি একবার খেয়েছিলাম। এ কথা সত্যি বাবা।"

রমেশ বাবু হাসি চাপিতে গিয়া ভ্রূ কোঁচকাইয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছি—তুমি মিথ্যা কথাও বলতে শিখেছ। আমি শুনেছি,—ঝি তোমাকে দু'দুবার চুরুট খেতে দেখেছে। তা হ'লে দেখ তুমি তিনটে খারাপ কায করে ধরা পড়ে গিয়েছে—চুরুট খাওয়া, অন্যের চুরুট চুরি করা, আর মিথ্যে কথা বলা—তিনটে দোষ।"

মণ্টুর বলিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ। এ কথা ঠিক—আমি দুবার চুরুট খেয়েছি। আজ আর পর্শু।"

"তা হ'লে দেখ একবার নয়—দু' দু'বার। আমি ভারী রাগ করেছি তোমার ওপর। ভেবেছিলাম তুমি

ভাল ছেলে হবে। এখন দেখছি তুমি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছ।"

রমেশ বাবু ভাবিয়া লইলেন ইহার পর কি বলিতে হইবে।

"হ্যাঁ—এ তোমার ঠিক কায হয় নি মণ্টু। তুমি যে এমন করবে আমি তা ভাবিনি। প্রথমতঃ, যা তোমার নয় সে জিনিষ নেওয়া তোমার উচিত হয় নি। প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের জিনিষ ব্যবহার করবে। যে অন্যের জিনিষ নেয় সেই খারাপ লোক।" রমেশ বাবু ভাবিলেন, বোধ হয় এরূপ ভাবে বক্তৃতা করা ঠিক হইতেছে না। তারপর দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন—"এই যেমন আমাদের ঝিয়ের একটা বাক্স আছে। ওটা তার নিজের, আমার কিংবা তোমার তা' স্পর্শ কয়বারও অধিকার নাই। এ কথা ঠিক ত? আচ্ছা। আবার ধর তোমারও নিজের খেলনা আছে। কৈ, আমি তো সেগুলো নিই না-নিই কি? আমার হয়তো ওগুলো নিতে খুব ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু তবু আমি নিই না। কারণ, ওগুলো আমার নয়, তোমার।"

মণ্টু ভ্রু টানিয়া বলিল—"তোমার যদি ইচ্ছা হয় ওগুলো তুমি নেও না কেন বাবা? না—না, তুমি কিছু মনে করো না, তুমি নিও। এই যে আমার লাল কুকুরটা তোমার টেবিলের ওপর আছে, আমি তার জন্যে কিছু মনে করবো না। ওটা ওখানেই থাক।"

রমেশ বাবু বলিলেন—"না। তুমি আমার কথা বুঝ্‌তে পারছো না। তুমি তোমার কুকুর আমাকে দিয়ে দিলে, এখন এটা আমার। কিন্তু আমি তো আমার চুরুট তোমাকে দিই নি।"

রমেশ বাবু মনে করিলেন ঠিক ভাবে বোঝানো হইতেছে না, তথাপি বলিতে লাগিলেন—"যদি আমার অন্যের চুরুট খেতে ইচ্ছে হয়, তা হ'লে আগে তার অনুমতি নিতে হবে।"

গুরু মহাশয়ের মত গম্ভীর হইয়া রমেশবাবু একে একে উপদেশের উপর উপদেশ গাঁথিয়া বক্তৃতা দিয়া চলিলেন। মণ্টু কিছুক্ষণ মনেযোগ দিয়া শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর টেবিলের উপর কনুয়ের ভর রাখিয়া হেলিয়া শুইয়া তাহার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়া টেবিলের উপর কাগজ, দোয়াত দান প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। তারপর, গঁদের শিশির দিকে লক্ষ্য পড়িলে, সেইটি হাতে লই‌া রমেশবাবুর চোখের নিকট তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, আঠা কি দিয়ে তৈরী হয় বাবা?"

রমেশবাবু তাহার হাত হইতে গঁদের শিশি লইয়া যথা স্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"তারপর—তুমি চুরুট খাও। এর মত খারাপ অভ্যাস আর কিছু নাই। আমি চুরুট খাই বটে, তাই ব'লে তোমার খাওয়া উচিত নয় তো! আমি চুরুট খাই একটা অন্যায় কায করি সে জন্য নিজেকে দোষী মনে করি।" এই কথা বলিয়াই রমেশ বাবু ভাবিলেন 'বাঃ, কি চমৎকার শিক্ষাদাতা আমি!' "হ্যাঁ—তামাক শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। যে তামাক খায় সে অকালে মারা যায়। তোমার মত বয়সের ছেলেদের চুরুট খাওয়া আরও খারাপ। তোমাদের বুক দুর্ব্বল, তাই তোমাদের বয়সের ছেলেরা যদি চুরুট খায় তা হলে বেশী দিন বাঁচতে পারে না। তোমার হরিশ কাকা যে বুক খারাপ হয়ে মারা গেলেন তা তুমি জান তো? যদি তিনি চুরুট না খেতেন তাহলে এতদিনও বেঁচে থাকতেন।"

মণ্টু টেবিলের উপরের আলোর দিকে তাকাইয়া আলোর ঢাকনি আঙ্গুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"হরিশ কাকা কেমন সুন্দর বাঁশী বাজাত, না বাবা? সে বাঁশীটা এখনও আছে কিন্তু।"

মণ্টু এইবার টেবিলের উপর কনুয়ের ভর রাখিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তাহার ছোট্টো সুন্দর গম্ভীর মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল সে বোধহয় মৃত্যুর কথাই ভাবিতেছে। এই মৃত্যু, অল্পদিন পূর্ব্বে তাহার মা ও কাকাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছে। মৃত্যু তাঁহাদিগকে লইয়া গেল বটে, কিন্তু মায়ের ছেলে, কাকার বাঁশী সবই এইখানে পড়িয়া আছে তো! বোধহয় মরা

মানুষ ঐ উপরে তারার পাশে আকাশে বাস করে, আর ঐখান থেকে এই পৃথিবীর সকলকে দেখিয়া থাকে। আচ্ছা, তাদের কি ছেড়ে থাকৃতে কষ্ট হয় না? আশ্চর্য্য!

এদিকে রমেশবাবু ভাবিতে লাগিল—"এখন কেমন করে বোঝাই ওকে। ওতো কিছুই শুনছে না দেখ্‌ছি। হয় মণ্টু আমাকে খারাপ বলে ভাবছে, না হয় উপদেশগুলি গুরুতর বলে মনে করছে না। কেমন করে যে বোঝাবো ভেবে পাইনে যে!" তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে আরম্ভ করিলেন।

রমেশ বাবু মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, আগে এইরকম প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজেই হইয়া যাইত। কেহ চুরুট খায় এ কথা ধরা পড়িলেই তাহাকে প্রহার দেওয়া হইত। ইহার মানে, যাহারা ভীরু তাহারা ধূমপান করিত না, আর যাহারা চতুর আর সাহসী, তাহারা প্রহার হজম করিয়াও লুকাইয়া লুকাইয়া চুরুট খাইত। যাহাতে আমি চুরুট না খাই সে জন্য আমার মা আমাকে পয়সা দিতেন। এখন এরকম প্রণালী গর্হিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকালকার দিনে শিশুদের ভয় কিংবা পুরস্কারের লোভ না দেখাইয়া, যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া তাহাদের বদ অভ্যাস ত্যাগ করানোর চেষ্টাই শিক্ষকেরা করিতেছেন।

পিতা যখন এইরূপ চিন্তা লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, পুত্র তখন চেয়ারের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। যাহাতে সে দরকারী কাগজপত্র নষ্ট না করে সেই জন্য টেবিলের উপর কতকগুলি সাদা টুক্‌রা কাগজ ও নীল রঙ্গের পেন্সিল তাহার জন্য রমেশ বাবু রাখিয়া দিতেন। ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া ছিল।

কাগজের উপর একটি ছোট বাড়ী আঁকিতে আঁকিতে মণ্টু বলিতে লাগিল—"দেখ বাবা, আজ বামন ঠাকুর আলু কাট্‌তে তার আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল। আঙ্গুল কেটে সে এম্‌নি চীৎকার করে উঠ্‌লো যে আমরা দৌড়ে রান্নাঘরে যাই। আহা বেচারি! ঝি ঠাণ্ডা জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখ্‌তে বল্লো। বামুন ঠাকুর কিন্তু আঙ্গুল চুষতে আরম্ভ করে দিলে! আচ্ছা, ও কেমন করে ঐ অপরিস্কার আঙ্গুল মুখের মধ্যে দিলে বাবা?" তারপর ছবি আঁকা রাখিয়া মণ্টু হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া যাইতে লাগিল যে যখন সে খাইতে বসিয়াছিল তখন একটা ভিক্ষুক একটি ছোট্ট মেয়ে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে আসে। সেই মেয়েটি কেমন সুন্দর গান গাইতে আর নাচ্‌তে লাগ্‌লো ইত্যাদি।

রমেশ বাবু ভাবিলেন—"মণ্টু নিজের চিন্তার ধারা নিয়েই আছে। ওর ছোট্ট মাথার মধ্যে নিজেই ছোট্ট জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে কোনটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় তা' নিজেই ঠিক করে সেই ভাবেই চলেছে। ওর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে ওরই মনের গতি অনুসরণ করে বল্‌তে হবে। যদি আমার চুরুট নেওয়ার জন্য আমার সত্যিই কোনও ক্ষতি বলে মনে হত, আর যদি শিশুর মতই কাঁদতে পারতাম। তা' হ'লে নিশ্চয়ই মণ্টু আমার কথা বুঝ্‌তে পারতো। এই জন্যই মা যেমন করে শিশুকে তৈয়ারী করতে পারে এমন আর শিক্ষক পারে না। কারণ, মা তার সন্তানের মনের ভাব ঠিক বুঝে তাদের সঙ্গেই সমান ভাবে কাঁদে হাসে। শিশুদের যুক্তি তর্ক দিয়ে কিছুই বোঝানো চলে না দেখ্‌ছি। যথেষ্ট করে তো বোঝানো গেল। এখন আর কি করা যায়?"

রমেশবাবু একজন নামজাদা গভর্ণমেণ্টের উকিল—সমস্ত জীবন ধরিয়া কত লোককে নানা যুক্তি তর্ক দ্বারা নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছেন, কতরকমে অন্যের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে কি করিয়া বুঝাইতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া রমেশবাবু পুত্রকে বলিলেন "মণ্টু শপথ কর যে আর কোনও দিন চুরুট খাবে না।"

মণ্টু পেন্সিল লইয়া তাহার ছবির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—"শপথ করবো?"

রমেশবাবু মনে মনে ভাবিলেন—"শপথের অর্থ কি তাই বোধ হয় ও জানে না। নাঃ, দেখ্‌ছি নীতিশিক্ষা দেওয়া আমার কর্ম্ম নয়! যদি আমার কথাবার্ত্তা কোনও স্কুলের শিক্ষক বা কোনও উকিল শুন্‌তো, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমার মুর্খতা দেখে না হেসে থাক্‌তে পারতো না। কিন্তু স্কুলে কিংবা কোর্ট এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা ত খুব শীগ্‌গির হয়ে যায়! কারণ বোধ হয়, সেখানে বাড়ীর মত ভালবাসার লোক নিয়ে বিচার করতে হয় না। স্নেহ মমতাই যে সমস্ত প্রশ্নকেই জটিল করে' তোলে। যদি মণ্টু আমার ছেলে না হয়ে ছাত্র কিংবা বিচারের আসামী হ'তো, তা হ'লে নিশ্চয়ই এত কথা আমার ভাবতে হতো না।"

রমেশবাবু পুনরায় চেয়ারে বসিয়া মণ্টুর ছবির কাগজখানা টানিয়া লইলেন। কাগজখানিতে মণ্টু ছোটখাট একটা বাড়ী আঁকিয়াছে এবং সেই বাড়ীর সম্মুখে একজন সিপাই বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশবাবু বলিলেন—"মানুষ কি করে' বাড়ীর চেয়ে বড় হয় মণ্টু?"

মণ্টু এইবার উৎসাহ পাইয়া আবার পিতার কোলে উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যদি লোকটাকে বাড়ীর চেয়ে ছোট করি তা' হ'লে ওর চোখ দেখা যাবে না যে।" অখণ্ডনীয় যুক্তি! আর তর্ক করা চলিল না। তারপর মণ্টু ছবি আঁকা ফেলিয়া রাখিয়া পিতার ক্রোড়ে বেশ আরামের সহিত বসিয়া তাঁহার দাড়ি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রথম সে আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল, তাপর দুই অংশে ভাগ করিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন তোমাকে ঠিক দরওয়ানের মত দেখাচ্ছে বাবা। আচ্ছা, দরওয়ানরা সদর দরজায় কেন দাঁড়িয়ে থাকে? চোর তাড়াবে?"

রমেশ বাবু তাঁহার মুখের উপর পুত্রের নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার চিবুকে মণ্টুর মাথার চুলের সহিত সংস্পর্শে, তাঁহার মনে অতি কোমল স্নেহের ভাব উথলিয়া উঠিতেছিল। তিনি স্নেহ-ভরে বালকের সুদীর্ঘ কালো চোখের দিকে তাকাইলেন। মণ্টুর চোখের বিস্তৃত তারকার ভিতর দিয়া যেন তাহার মাতারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া রহিয়াছে!

রমেশ বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন মণ্টুর দুষ্টুমির জন্য তাহাকে প্রহারের কল্পনা করাও তাঁহার পক্ষে কি কঠিন! এখন কি করিয়া পুত্রকে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে মানুষ সরল ছিল এবং চিন্তাও করিত কম। তাই তাহারা সকল সমস্যাই অনায়াসে সমাধা করিতে পারিত। কিন্তু এখন আমাদের ভাবিতে হয় বেশী এবং যুক্তিতর্কও আমাদের একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। খুঁটিনাটি নানা কথা চিন্তা করিয়া কায করিতে হইতেছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল। রমেশ বাবু বলিলেন, "মণ্টু শোবার সময় হয়েছে—শোবে চল।" মণ্টু বলিল, "না বাবা আমি আর একটু থাকবো। আমাকে একটা গল্প বল না।"

"বেশ—একটা গল্প শুনেই তোমাকে শুতে যেতে হবে কিন্তু!"

রমেশবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার সময় মণ্টুকে গল্প শুনাই-তেন। অনেক সাংসারিক লোকের মতই, তাঁহার শৈশবের শোনা গল্পগুলি মনে ছিল না, তাই নিজেই নতুন করিয়া গড়িয়া গল্প বলিয়া যাইতেন। প্রতিদিনই তিনি এক-ভাবেই গল্প করিতেন—এক দেশে এক রাজা ছিল, তারপর একে একে নিজের খেয়ালমত গল্পের জাল বুনিয়া পুত্রকে শুনাইতেন। গল্পের ঘটনাস্থান, চরিত্র সবই উপস্থিত বুদ্ধি অনুসারে সৃষ্টি করিতেন—গল্পের নীতিও আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়িত। মণ্টু এসব গল্প খুব ভালবাসিত এবং গল্প বলিবার ভঙ্গী যত সরল হইত, ততই ইহা তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিত।

রমেশবাবু বলিলেন, "আচ্ছা শোন।" তরপর আরম্ভ করিলেন—"এক দেশে এক বুড়ো রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর ঠিক আমারই মত মস্তবড় পাকা দাড়ি আর গোঁফ ছিল। সেই রাজা এক কাঁচের প্রাসাদের

মধ্যে বাস করিতেন! সেই কাঁচের মস্ত বড় বাড়ী ঠিক বরফের মতই রোদ্দুরে জ্বলজ্বল করতো। সেই রাজ বাড়ীর চারদিকে মস্ত বড় বাগান ছিল, তাতে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল ও ফলের গাছ ছিল, আর সেই গাছে নানা বিচিত্র রং বেরঙের পাখী গান করতো। বাগানের গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকতো, বাতাসে গাছ নড়ে উঠলেই সেই ঘণ্টা টুং টুং করে মিষ্টি সুরে বাজতে থাকতো। তার-পর, সেই বাগানে অনেকগুলো ফোয়ারা ছিল—এই যেমন এখানকার জমিদার বাড়ীতে আছে। কিন্তু রাজার বাগানের ফোয়ারা এর চেয়ে অনেক বেশী বড় ছিল—আর তার জলও উঠতো ঢের উঁচুতো।"

রমেশবাবু এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভাবিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সেই বুড়ো রাজার একমাত্র ছেলে ছিল ঠিক তোমারই মত বয়স। সেই রাজপুত্র ভারি শান্ত ছিল, কক্‌খনো তার বাবার টেবিলের জিনিষে হাত দিত না। সে খুব ভাল ছেলে ছিল—কেবল, তার একমাত্র দোষ ছিল সে চুরুট খেত।"

মণ্টু অপলক নেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া গল্প শুনিতেছিল। রমেশবাবু ভাবিলেন এখন কি করিয়া গল্প শেষ করা যায়।—তারপর আরম্ভ করিলেন—"রাজার ছেলের চুরুট খাওয়ার জন্যে বুক খারাপ হ'লো। তারপর কুড়ি বছর বয়সেই সে মারা গেল। তার বুড়ো বাপকে সাহায্য করবার আর কেউই থাকলো না। রাজ্য রক্ষা করবার লোকও কেউ ছিল না। শত্রুরা সুবিধা পেয়ে রাজ্য আক্রমণ করে রাজ্য দখল করে নিয়ে রাজাকে মেরে ফেল্‌লো। এখন আর সেখানে ফল ফুলের গাছও নেই, পাখীও ডাকে না, গাছের ডালে ঘণ্টাও আর মধুর সুরে বেজে ওঠে না।"

এই ভাবে গল্প শেষ করা রমেশবাবুর মোটেই ভাল বোধ হইল না, কিন্তু ইহা মণ্টুর মনের কোমল তন্ত্রীকে আঘাত করিল। তাহার চোখের কোণে দুঃখের অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সে জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আধভাঙ্গা স্বরে বলিল—"আর আমি চুরুট খাব না বাবা।" রমেশবাবুর মুখ সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তারপর পুত্রের মস্তকে স্নেহের পরশ বুলাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"এইবার শুতে যাও মণ্টু।"

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়।

পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসু

আমরা ইংরাজ কবি শেলির গোষ্ঠীর খবর বলিতে পারি, অথচ আমাদেরই ঘরের কবি দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের নাম অনেকেই জানি না। বসুজ মহাশয় গত শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 'বঙ্গ-দর্শন', 'বান্ধব' ও 'বামাবোধিনী'র লেখক বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র আদর পাইতেন। দীনেশবাবু একাধারে কবি, ঔপ-ন্যাসিক ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সুনিপুণ সম্পাদকতায় 'ভারত মিহির', 'চারুবার্ত্তা' ও 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকা প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার রচিত "মানস বিকাশ", "কবিকাহিনী" "কুল-কলঙ্কিনী" ও "মহা প্রস্থান" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির সাক্ষ্য দেয়। আমাদের সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে এমন কবির গ্রন্থ দেশবাসীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে না।

দীনেশ বাবু পূর্ব্ববঙ্গের কবি। গত শতাব্দীতে যে কয়টী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যাকাশ দীপ্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তিনি অন্যতম। কালী-প্রসন্ন, গোবিন্দ দাস ও দীনেশচরণের নাম তখন পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে শোনা যাইত। দীনেশ বাবুর কবিতার বিশেষত্ব এই যে, উহা সকল সম্প্রদায়ের

লোককেই আনন্দ দান করে। উহা বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের কথা লইয়া রচিত, সুতরাং বাঙ্গালার প্রাণের কথা।

গুপ্ত কবির সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও বিশেষ লাভ।" কথা কয়টি প্রণিধান-যোগ্য। কি বেষ্টনীর মধ্যে, কি প্রকারের সংসর্গে কবি-জীব ' গঠিত হইয়াছে তাহা না জানিলে কবিতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কবিত্ব বুঝিতে হইলে আগে কবিকে জানিতে হইবে। দেখা যাউক দীনেশচরণের কবিতার উৎস কি এবং কিরূপ আবহাওয়ায় তাহার জীবন গঠিত হইয়াছিল এবং কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল।

ঢাকার শ্রীবাড়ীর বিখ্যাত বসুবংশে ১২৫৮ সনের ফাল্গুন মাসে ৺অভয়াচরণ বসু মহশয়ের ঔরসে দীনেশ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। দীনেশ বাবুর জনক জননী উভয়েই সদাচারী ও সুশিক্ষিত ছিলেন। দীনেশ বাবুর কবিত্ব শক্তি তাঁহার পৈতৃক ধন। "বাঙ্গালা ভাষায় লেখক" মহাশয় বলেন, দীনেশ-চরণের জননী, রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্ত কবিগণের গান অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন। আমরা তাঁহার জীবন আলোচনার সময় দেখিতে পাইব, পিতা মাতার এই কাব্যাসক্তি ও সঙ্গীতানুরাগ তিনিও উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। অভয়াচরণ বসু মহাশয় পূর্ণিয়ার সেরেস্তাদার ছিলেন। পূর্ণিয়াতেই দীনেশ বাবুর জন্ম ও হাতেখড়ি হয়। তিনি ভাগলপুর হইতে প্রবেশিকা পাস হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু ভগবা ের ইচ্ছা অন্যরূপ, মস্তিষ্কের পীড়া হেতু তাঁহাকে পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই বাটী ফিরিতে হয়। এই আকস্মিক পীড়াতে তাহার জীবনযাত্রার গতি অন্যদিকে ফিরিয়া যায়। তিনি ইহার পর রীতিমত সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন। পঠদ্দশায় যে সাহিত্যানু-রাগ তর্কসভার প্রবন্ধ র৷নার সময় অঙ্কুরিত দেখা গিয়াছিল, এখন তাহা পল্লীজননীর আকাশে বাতাসে নবজীবন লাভ করিয়া অপূর্ব্ব কবিতার সৃষ্টি করিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষা বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই অদম্য পাঠস্পৃহা তাহার আজীবন ছিল। বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে মাইকেলের কবিতা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। মোটামুটি বলিতে গেলে মাইকেলের মেঘনাদবধ পড়িয়া তাঁহার কবিতানুশীলনে প্রবৃত্তি হয়।

আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, গোয়ালন্দ হইতে নৌকা-যোগে বাড়ী ফিরিবার পথে পদ্মা-বক্ষে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন। সন ১৩০৫ সনের ২০শে আশ্বিন রবিবার বেলা ১টার সময় তিনি পরিবার ও বন্ধুবর্গকে কাঁদাইয়া পরলোকে চলিয়া যান। অকালে বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। পল্লীজীবনে অভ্যস্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি পল্লীর আপামর সাধারণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া শাশ্বত লোকে চলিয়া গেলেন।

দীনেশচরণের মৃত্যুসংবাদ তাৎকালীন সাহিত্য-জগতে যে শোকের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। এমন খাঁটি বাঙ্গালী কবির জন্য দেশের সকলেই অশ্রুপাত করিয়াছিল। কবিরা অমর, আজ তাই দীনেশচরণের কথা ভাবিতে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। বাস্তবিকই সাহিত্যসেবা দীনেশ বাবুর অবসরের আনন্দ ও পল্লীজীবনের একমাত্র কর্ম্ম ছিল। তিনি দি ারাত্রি কখনও উর্দ্দূ, কখনও বা ইংরাজী আবার কখনও বা বাঙ্গালা সাহিত্য রসে ডুবিয়া থাকিতেন। পল্লী জননীর নিভৃত ক্রোড়ে বসিয়া তিনি মনের আনন্দে গাহিতেন। রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন —"চিরপ্রিয় শ্রীবাড়ী গ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি বেশী দিন কোন খানেই থাকিতেন না। শ্রীবাড়ীতে স্বগৃহ সংলগ্ন শিব মন্দিরের পার্শ্বে সুন্দর সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন।" তাই তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যেই "একরূপ মুগ্ধকর গ্রাম্য পুষ্পের সুবাস আছে।" আমার মনে হয় এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছন্দ ও পল্লীর দৈনন্দিন

জীবনের হাসি কান্নার কথা তাঁহার কাব্যের বিষয় হওয়াতেই তাঁহার কবিতা সমসাময়িকদের মধ্যে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং তাৎকালীন কবি সমাজে তিনি "বন-বিহঙ্গ" আখ্যাও পাইয়াছিলেন। দীনেশ-চরণ ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহার কবিতা ইংরাজী ভাব বর্জ্জিত ছিল।

দীনেশচরণের সাহিত্য সেবার প্রধান সহচর ও উৎসাহদাতা ছিলেন স্বর্গীয় সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। শুনিয়াছি তিনি এবং পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই ইঁহার "কবি-কাহিনী" গ্রন্থস্থ "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা" ও "প্রতিমা বিসর্জ্জন" শীর্ষক দুইটী কবিতার বড়ই প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁহার কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ও উৎসাহদাতা ছিলেন। সেন মহাশয়ের চিঠির ফাইল নাকি আজিও দীনেশচরণের কবিতার প্রেম উপঢৌকনে পরিপূর্ণ। দীনেশচরণ বড়ই বন্ধুবৎসল ছিলেন। সেন মহাশয় তাঁহার স্বদেশবাসী 'সুহৃৎকবি'র কথা এখনও মনে করিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য অশ্রুবর্ষণ করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনেশচরণ কালে ভদ্রে সহরে আসিতেন, অথবা আসিলেও বেশীদিন থাকিতেন না। বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইয়াছিল। রবিবাবু বোধ হয় সে অতীতের সৎসঙ্গের স্মৃতি ভোলেন নাই।

দীনেশচরণের চারিখানি গ্রন্থ ও কতকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। গানগুলি নবকান্ত বাবুর সঙ্কলিত "সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "মানস বিকাশ" ও "কবিকাহিনী" দুই খানি কাব্যগ্রন্থ; "মহাপ্রস্থান" ও "কুলকলঙ্কিনী" তাঁহার শেষ দিকের রচিত উপন্যাস।

"মানস বিকাশ" কবিতাগ্রন্থ খানি কবির তরুণ বয়সের রচনা। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন —"মানস বিকাশ অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি এবং পদবিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। 'মিলন' নামক কাব্যের প্রথমাংশ এত সুন্দর যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়।" বঙ্কিমবাবু আরও বলেন—"এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ। তাঁহাদের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। বিস্তৃতি-গুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। 'মানস বিকাশ'ও এই কথা প্রমাণ করিতেছে।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'কাল' নামক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন :—

সহসা যখন বিধির আদেশে
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে
রজতছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়।

নর-নারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।

তখনত কাল প্রচণ্ড শাসনে
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি করনা বিচার
বধ সকলে,

রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ
দুঃখনীরে তায় কর নিমগণ,
পদযুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে।

সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কত শত নরে দাও ভাসাইয়া
নয়ন জলে ॥

এই একটী কবিতার মধ্যে "সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্যজাতির নয়নজল সবই আছে।" ইহাকেই সাহিত্য সম্রাট্ প্রগাঢ়তা হীনতা দোষ বলিয়াছেন। ইহাতে মনুসংহিতার প্রতিধ্বনি হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ কবির

Sceptre and crown must tumb'e down.
And in the dust be equal made

পর্য্যন্তের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজী গন্ধ কয়।"

"মানস বিকাশ" কবির তরুণ বয়সের রচনা। সুতরাং ভাবের আবেগে ভাষা অনেক স্থলেই পঙ্গু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই কবিতাগুলির মধ্যেই যেন কবি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়াছেন। কবিতাগুলি কবি হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি—অনেকটা আত্মকাহিনী জাতীয়।

"কবি কাহিনী" কবির পরিণত বয়সের রচনা। কবি এখন সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান জন্য ব্যস্ত। বিধবার দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রকার সামাজিক অত্যাচারের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা" কবিবর হেমচন্দ্রের "ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অইরে" এই বিষাদমাখা কবিতার সহিত তুলনীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটী বিষাদের সুর তাঁহার সকল কবিতার মধ্যেই দেখা যায়। বিষাদমাখা কবিতা গুলিই তাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা।

"কবি কাহিনী"তে কতকগুলি সাময়িক বিষয় লইয়া লিখিত কবিতাও আছে। যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, উহা অনেকে হেমচন্দ্রের তৎসাময়িক লিখিত কবিতার সহিত তুলনা করেন।

আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাহার উপন্যাস দুইখানির আলোচনা করিব। এখন তাঁহার রচিত গানগুলির আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করি।

দীনেশচরণের রচিত গানগুলি সংখ্যায় খুব বেশী না হইলেও, সেগুলি ভাবে ও ভাষায় অতি চমৎকার। গানগুলিতে রামপ্রসাদের মত প্রাণের আকুল নিবেদনের ভাব আছে। ভাসা অতি সরল—কাযেই সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁহার গান কিরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টী হইতেই প্রমাণিত হইবে। তাঁহার রচিত—

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে,
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরাবে,
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজপাপ স্মরিয়ে,
যবে দু'ধারে নয়ন ধারা বহিবে,
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশুসন্তান ধুলায় লুটাবে ॥
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি,
গাহিবে তবগুণ কাঁদিবে,
প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন জলে ভাসিবে।
অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে,
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নবজীবন পাইবে ॥

গান এখনও বাঙ্গালার মাঠে ঘাটে গীত হয়, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। কবিতাগুলি যেমন বিষাদমাখা, গানগুলিও তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে দীনেশ বাবু সাহিত্য চর্চ্চা একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত সুলেখকের এই নীরবতা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল। "জন্মভূমি"তে 'বাঙ্গালাভাষার

লেখক' মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এখন আর দীনেশচরণের কবিত্ব বাঁশরী বাজে না কেন? তুমি দীনেশচরণ বসু মহাশয়, প্রৌঢ়েই এমন নীরব, নিঃশব্দ কেন? যৌবনে তুমি বৃদ্ধ হও কেন? ভাই, সাহিত্য বন্ধুর এ অনুযোগ শুনিবে কি? আমাদের কথা রাখিবে কি?" এ আকুল আহ্বান তাঁহার কাণে পৌছিয়াছিল কিন্তু তখন আর তাঁর—

বাহুতে সে বল নাই, অঙ্গুলিতে গতি
চিন্তায় চঞ্চল চিত্ত, স্ফূর্ত্তিহীন মতি—

কাযেই "জীর্ণ-বীণা" তুলিয়া ধরিলেও সে বীণার ঝঙ্কার দেশ আর বেশী দিন শুনিবার সৌভাগ্য পাইল না। যদিও তিনি—

আয় তবে যাই বীণা সাহিত্য কাননে
প্রকৃতির লীলাভূমি, কল্পনার কেলি কুঞ্জ,
ছায়াময় শান্তিময় প্রমোদ উদ্যানে,
নবীন বসন্ত যথা নব অনুরাগে
চুমে প্রকৃতিরে, বীণা শিহরে সোহাগে—

বলিয়া পরম আগ্রহে সাহিত্য চর্চ্চায় মন দিলেন, কিন্তু সে কেবল নিবিবার পূর্ব্বে প্রদীপের উজ্জ্বলতার মত ক্ষণিক। ১৩০৫ বৈশাখের 'প্রদীপে' এই "জীর্ণ বীণা" কবিতাটী বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! সেই বৎসরই আশ্বিন মাসে তিনি সাহিত্যিক বন্ধুগণকে কাঁদাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তাঁহারই কথায় বলিতে ইচ্ছা হয় তিনি তাহার চিরবাঞ্ছিত দেশে গিয়াছেন যে দেশে—

শোভে নীলাম্বর তলে কনক মণ্ডল
পর জি কোকিল কণ্ঠে বাজিছে বাজনা,
চতুর্দ্দিকে হেম জ্যোতি করে ঝলমল,
পীযূষ সলিলা শত বহে তরঙ্গিণী,
হীরকের ফল শোভে মরকত শাখে,
প্রকৃত মুকুতালয়ে ঊষা বিনোদিনী
প্রভাতে প্রকৃতি অঙ্গ সাজাইয়া রাখে
অনন্ত সুখের ধাম সতত উল্লাস
ভাবনার ছায়া তথা না পারে পশিতে
রোগ শোক দুঃখ তাপ দারিদ্র্য হুতাশ
সে দেশ নিবাসিগণে পারে না দংশিতে।—

সেই দেশে তাঁর অমর আত্মা চিরবিশ্রাম করিতেছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী।

কুঙ্কুমকুমারী

(গল্প)

"ছোট বউ—ও ছোট বউ! ছোট বউ কৈ? ডাক্ না তাকে। খাবে কখন, রাত কি হয় নি?"

জ্যৈষ্ঠমাস, পল্লীগ্রামের রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। কর্ত্তাদের এবং বাড়ীর অন্যান্য পুরুষগণের আহার সমাপ্ত হইয়াছে। রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া বড় গিন্নী হরিনামের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে ঐ কথাগুলি বলিলেন। বড় মেয়ে সাবিত্রী বলিল, "কোথায় পড়ে' ঘুমুচ্চে বোধ হয়। যা ত সুরি, খুঁজে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আয়।" সুরবালা গজর্ গজর্ করিতে করিতে ছোট বউকে খুঁজিতে গেল।

একতালা, দোতালা, তিনতালার ঘরে ঘরে, বারান্দায় বারান্দায়, নানা সম্ভব অসম্ভব স্থানে সুরবালা ছোট বউকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে ছাদের সিঁড়ি উঠিল

—ছাদ অন্ধকার—দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সভয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে হাঁকিল—"ছোট বউ, ও ছোট বউ! —কুমি, ও কুমি! কুমি লো!—পোড়ারমুখী হতভাগী বাঁদরী—কৈ, এখানেও ত দেখ্‌ছি নে!"—বলিয়া সে নীচে নামিয়া গিয়া ছোট বউয়ের অপ্রাপ্তি-সংবাদ সকলকে জানাইল।

শুনিয়া, গৃহিণীরা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মেঝ গিন্নী—কুমি বা কুঙ্কুমকুমারী যাঁহার পুত্রবধূ—নিজে গিয়া বাড়ীময় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, কিন্তু সন্ধ্যার পর ছোট বউকে দেখিয়াছে এমন কথা কেহই বলিল না। তখন বড় গিন্নী বলিলেন—"ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ হল! আমার বুক যে কাঁপছে!"

বধূদের, কন্যাদের মুখ শুকাইয়া গেল। গৃহিণীদের মনে একটা ঘোর আশঙ্কার ছায়া পড়িল। একজন উঠানের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "সদর দরজা, দুই খিড়কী দরজা—সবই ত বন্ধ!"

ছোট গিন্নী বলিলেন, "রাত দশটা বাজে, দরজা বন্ধ হবে না? সন্ধ্যার সময় ত সব দরজাই খোলা ছিল, তখন থেকেই ত সে বাড়ীতে নেই!"

কর্ত্তারা আহারান্তে তখন নিজ নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। বয়স্ক পুত্রগণ কেহ কেহ বা শয়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া বন্ধুবান্ধবসহ তখনও তাস পাশা চালাইতেছে। গৃহিণীরা স্থির করিলেন, কর্ত্তাদের খবর দেওয়া উচিত। বড় গিন্নী তখন হরিনামের মালা হস্তে, দ্বিতলে স্বীয় শয়নকক্ষ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

২

এই ছোট বউয়ের নাম কুঙ্কুমকুমারী—বয়স এখন ১৬ বৎসর। আজ তিন বৎসর সে শ্বশুরঘর করিতেছে। পিতার নাম হারাধন বসু, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তিনি একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। এইটি তাঁহার একমাত্র কন্যা।

বাপ আদর করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কুঙ্কুমকুমারী। কিন্তু গোড়াতেই যাহার কু, (মাঝেও কু) সে কি কখনও সু হইতে পারে? এই কারণেই হউক, অথবা জন্ম নক্ষত্রের ফলেই হউক, বাল্যকালেই কুঙ্কুম অত্যন্ত দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার পুকুরে পুকুরে ছিপ হাতে করিয়া সে মাছ ধরিতে ভালবাসিত, ভাইদের ঘুড়ি নাটাই লইয়া ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, প্রতিবেশীদের বাগানে বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া স্বচ্ছন্দে গাছে উঠিয়া ফল চুরি করিয়া খাইত। এই সকল কারণে পিতামাতার নিকট কুঙ্কুমকে সময়ে সময়ে প্রহারও খাইতে হইত কম নয়—এমন কি তার নামে পাড়ায় এই ছড়াই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল—

কুম্‌কুম্
তোর পিঠে দুম্ দুম্।

একদিন এক সমবয়সী বালক, কুঙ্কুমের সহিত বিবাদ করিয়া উপরিউক্ত ছড়াটি বলিতে বলিতে এবং হস্তদ্বারা দুমদুমের ইঙ্গিত করিতে করিতে তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে—কুঙ্কুম ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া, খুব খানিকটা ঝাঁকানি দিয়া, তাহাকে এমন ধাক্কা মারিয়াছিল যে, ছেলেটা টাল খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার নাক হইতে ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে থাকে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া গ্রামের প্রবীণারা কুঙ্কুম সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন, তাহা সুরুচিসঙ্গত নহে; এবং সেগুলি কুঙ্কুমের পিতা মাতার কর্ণে যে মধুবর্ষণ করিত না ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পিতামাতার স্নেহ আদরে প্রতিপালিত হইয়া কুঙ্কুম ওরফে কুমি ক্রমে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তখন তাহার জন্য পাত্র অন্বেষণ আরম্ভ হইল। মেয়েটি দেখিতে শ্যামবর্ণ, তবে মুখশ্রী ভাল। চুল বেশ ঘন ও বড়। একমাত্র মেয়ে, বেশী দূরে বিবাহ দিতে পিতামাতার মন সরিল না। বৎসরখানেক খোঁজা-খুঁজির পর একটি সুপাত্র মিলিল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের

যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র নির্ম্মলকুমার। ছেলেটি গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তখন কলিকাতায় কলেজে এফ-এ পড়িতেছে। দেখিতে শুনিতেও ভাল। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। কুমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কী চড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গেল।

কুঙ্কুমের শ্বশুরবাড়ী বৃহৎ বাড়ী। বাড়ীর পশ্চাতে প্রাচীর ঘেরা বৃহৎ বাগান। তাহার মধ্যে পুষ্করিণী ও বহুজাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ। শ্বশুরেরা তিন ভাই—হরিনাথ, যদুনাথ ও কুমুদনাথ—তিন ভাই একত্র আছেন। তিন গৃহিণী, তাঁহাদের প্রত্যেকের পুত্র, কন্যা, বধূ, নাতি, নাতিনী ত আছেই, তাহা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরও অভাব নাই। চাষবাসও বিস্তৃত পরিমাণে আছে—চাকর কৃষাণ প্রভৃতির সংখ্যাও অল্প নহে। চাষের বলদ ও দোহাল গাই রাখিবার সুবিস্তীর্ণ পাকা গোহাল বাড়ীটি নির্ম্মাণে যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহাতে অনায়াসে একটি ছোট খাট গৃহস্থ পরিবারের আবাস বাটী নির্ম্মিত হইতে পারে।

শ্বশুরবাড়ীতে এই জনবহুলতা দেখিয়া কুঙ্কুমের প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিল। বউ সাজিয়া ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা হইয়াছিল। তাই সে তৃতীয় দিন বিকালে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এক সুযোগমত শ্বশুরালয় হইতে চম্পট দিল। পথঘাট তাহার অপরিচিত নহে,—প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পিতৃভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, ধূলিধূসরিত বসনে মেয়েকে এই ভাবে গৃহে আসিতে দেখিয়া তাহার পিতামাতা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, অথবা রাগই করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বেহাই বাড়ীর দুশ্চিন্তা দূরীকরণার্থ তৎক্ষণাৎ লোক ছুটাইয়া দিলেন। অপর একজন গোরুর গাড়ী আনিতে গেল। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া কন্যা সঙ্গে লইয়া পুনরায় তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। কুঙ্কুমের পিতা তাহার শ্বশুরগণের নিকট এবং মাতা অন্তঃপুরে গৃহিণীদের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় ও তোষামোদ করিয়া, তাঁহাদের রাগরোষ মিটাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সেই কুঙ্কুম এখন ষোল বছরের হইয়াছে। সেই এখন এ বাড়ীর ছোট বউ পদবী লাভ করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার দুষ্টামি অনেকটা কমিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও সে আদর্শ হিন্দু কুলবধূ হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই পাড়াতেই তাহার দুই তিনটি সখী আছে তাহারা এ গ্রামেরই মেয়ে। তাহাদের সঙ্গে কুমির বড় ভাব—তাহারা সর্ব্বদাই এ বাড়ীতে আসে। কুঙ্কুমও মাঝে মাঝে শাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে যায়। এ জন্য তাহাকে যথেষ্ট বকুনি খাইতে হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহার এ কু-অভ্যাস দূর হইল না।

বৈশাখের শেষে গ্রীষ্মের ছুটিতে কুঙ্কুমের স্বামী নির্ম্মল বাড়ী আসিল। কয়েক দিন পরে, এই পাড়া বেড়ানো লইয়া নির্ম্মল তাহাকে খুব বকিল। স্বামী স্ত্রীতে রীতি ত ঝগড়া হইয়া গেল। নির্ম্মলের এক বন্ধু তখন দার্জ্জিলিঙে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল। বাপ মার মত করিয়া রাগের ভরে নির্ম্মলও দুই সপ্তাহের জন্য দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেল।

ইহার তিনটি দিন পরেই বাড়ীতে এই বিষম বিভ্রাট্! ছোট বউ কোথায় গেল?

৩

দ্বিতলে উঠিয়া স্বামী সাক্ষাৎ জন্য বড় গিন্নী শয়ন কক্ষের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পালঙ্কের নিম্নে জল চৌকির উপর গুড়গুড়িতে তামাক সাজা রহিয়াছে—কলিকা হইতে অল্প অল্প ধূম উদ্গত হইতেছে, কিন্তু পালঙ্কে কেহ নাই। গৃহিণী দেখিলেন, সেই ঘরের কোণে একটি আমের ঝুড়ির নিকটে বড়কর্ত্তা বসিয়া আছেন, তন্মধ্যস্থ আমগুলি বাহির করিয়া আলোয় ধরিয়া একে একে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং সুপক্ক গুলি পৃথক্ করিয়া রাখিতেছেন। এই আম বড় কর্ত্তার বড় যত্নের—গোহাল বাড়ীর সংলগ্ন যে গাছটি আছে, এগুলি তাহারই ফল। বাগানের কোনও গাছের

আম এগুলির তুল্য সুস্বাদ ও সুমিষ্ট নহ। এ আম-গাছে কাহারও হাত দিবার পর্য্যন্ত হুকুম নাই। কর্ত্তা স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া উপযুক্ত ফলগুলি পাড়াইয়া, নিজ শয়ন-কক্ষে গুদামজাত করিয়া রাখেন এবং স্বহস্তে সাবধানে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়া দেন।

গিন্নী মুহূর্ত্তকাল কর্ত্তার কার্য্য দেখিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ওগো, এখন আম বাছা রাখ, বড় বিপদ।"

আম্র-নির্ব্বাচনে কর্ত্তা এমনই তন্ময় হইয়া ছিলেন যে স্ত্রীর কথা তাঁহার কর্ণগোচরই হইল না।

গৃহিণী এবার একটু নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ওগো শুনছ? এ দিকে যে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

কর্ত্তার তখন চমক্ ভাঙ্গিল। "কেন, কি হয়েছে?" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী পুনরুক্তি করিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে। ছোট বউকে পাওয়া যাচ্চে না।"

কর্ত্তা নিকটে সরিয়া আসিলেন। বলিলেন, "বল কি? কখন থেকে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সন্ধ্যার আগে ত বাড়ীতেই ছিল। বাড়ীময় খোঁজা হয়েছে, কোথাও সে নেই। সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সন্ধ্যার পর আর কেউ তাকে দেখে নি।"

কর্ত্তা গুম্ হইয়া, নিজ কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে দুই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "গা ধুতে গিয়েছিল কি? একলা গা ধুতে গিয়ে যদি ডুবে টুবে গিয়ে থাকে! কার সঙ্গে গা ধুতে গিয়েছিল খবর নিয়েছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না, তা ত নিইনি।"

কর্ত্তা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁঃ—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! যাও, সেইটে আগে ভাল করে জানো।"

"আচ্ছা সবাইকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি।"—বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিতেছিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আর, শোন। যদুকে, কুমুদকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাও।" বলিয়া হরিনাথ বাবু বিছানায় বসিয়া উদ্বেজিত চিত্তে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

এই তালার অপর প্রান্তে মেঝকর্ত্তা ও ছোট কর্ত্তার শয়ন গৃহ। বড় গিন্নী মেঝ কর্ত্তাকে খবর দিয়া, ছোট দেবরের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া এক মনে একখানি বহি পড়িতেছেন। বাঙ্গালা উপন্যাসের ইনি একজন অক্লান্ত পাঠক। স্থানীয় লাইব্রেরীর সেক্রেটারি। "চমকপ্রদ" অথবা "লোমহর্ষণ" কোন উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দেখিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরীর জন্য তাহা অর্ডার দিয়া থাকেন, এবং ভি পি আসিলে প্রথমে স্বয়ং তাহার রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়া তার পর্ লাইব্রেরী ভুক্ত করেন। বড়গিন্নী ইঁহাকে সংবাদটা দিয়া, নিম্নে আসিয়া সকল বধূ সকল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আজ কোনও দলের সঙ্গে ছোট বউ যে গা ধুইতে গিয়াছিল এমন সংবাদ পাওয়া গেল না।

৪

তিন কর্ত্তা তখন একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বয়স্ক পুত্রেরাও আসিয়া যোগদান করিল। গৃহিণীরা, নবীনারা বাহিরে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, গা ধুইতে গিয়া খুব সম্ভব সে খিড়কীর পুকুরে ডুবিয়া গিয়াছে; একা গিয়াছিল, তাহাতেই এ দুঃসংবাদ এতক্ষণ কেহ জানিতে পারে নাই। অথবা হয়ত বাগানে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে, সেইখানেই সে মরিয়া পড়িয়া আছে। বাগানটা একবার ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।

পুত্রগণের মধ্যে সাহসী ও বলিষ্ঠ দুইজন, তখনই বাঁশের লাঠি ও হারিকেন লণ্ঠন লইয়া বাগানে ছুটিল। বাগান পুকুর ঘাটের চারিপাশ তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও কোনও চিহ্ন নাই।

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, তাঁহার সন্দেহ হয়ত কেনও দুর্বৃত্ত বদমায়েস, পাঁচিল টপকাইয়া বাগানে আসিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটা কেহই

সম্ভব বলিয়া মনে করিলেন না। মেঝ কর্ত্তা—কুঙ্কুম যাঁহার পুত্রবধূ—বলিলেন, "আমার বোধ হয় ভুলি, কি খেঁদি, কি মনোরমা, পাড়ার কারু বাড়ীতে সন্ধ্যার আগে সে বেড়াতে গিয়েছিল, কোনও অভাবনীয় কারণে আস্‌তে পারে নি। কিম্বা, হয়ত পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে।"

অনেকেই বলিলেন, এতদিন পরে, আবার পলাইয়া বাপের বাড়ী যাইবে ইহা সম্ভব কি? তবে ভুলি খেঁদি বা মনোরমাদের বাড়ী গিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সেখানে আটকাইয়া পড়ারই বা কি কারণ ঘটিতে পারে? যদি হঠাৎ অসুখ বিসুখ করিয়া থাকে, তবে তাহারা কি এতক্ষণ খবর দিত না?

তিন কর্ত্তায় এবং বড় গিন্নীতে মিলিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল, কিন্তু এই রাত্রে, "আমাদের ছোট বউ তোমাদের বাড়ী আছে কি?"—এ সন্ধান লইতে প্রতিবেশীদের গৃহে লোক পাঠানো কাহারও মত হইল না—কারণ, আর একটা অব্যক্ত আশঙ্কা সকলেরই মনে জাগিতেছিল, এখন এ সম্বন্ধে কোনওরূপ গোলযোগ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। তবে কুঙ্কুমের পিত্রালয়ে গোপনে লোক পাঠাইতে আপত্তি নাই—এবং তাহা পাঠানো হইল। ছোট কর্ত্তা বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই ছোট বউ কোনও গুণ্ডা বা ডাকাইতের হাতে পড়িয়াছে; এখনই পুলিসে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু তাঁহার মতে কেহই মত দিল না।

রাত্রি ছ'টার সময় কুঙ্কুমের পিত্রালয় হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কুঙ্কুম সেখানে যায় নাই।

৫

সে রাত্রে বাড়ীর অনেকেই আপন শয্যায় না। যে যেখানে পাইল পড়িয়া রহিল। বিষম দুশ্চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগে রাত্রি শেষ হইল।

শেষ রাত্রে বড় কর্ত্তা মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ছোট ভাই কুমুদ তাঁহাকে ডাকিতেছে—"বড়দা—বড়দা উঠুন। ছোট বউয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

বড়কর্ত্তা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ? কোথা?"

ছোট কর্ত্তা মুখখানা পেচকের মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আমার কথা তখন কেউ শুন্‌লেন না। কে তাকে হত্যা করে', গোয়ালবাড়ীর ছাদের উপর লাস তুলে রেখে চলে গেছে।"

"অ্যাঁ! লাস তুলে রেখে গেছে! খুন করেছে? কি সর্ব্বনাশ!—তুমি কি করে জানলে?"

ছোট কর্ত্তা বলিলেন, "এইমাত্র আমি গাড়ুটি হাতে করে, মুখ হাত ধোবার জন্যে পুকুরঘাটের দিকে যাচ্ছিলাম। গোয়াল বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি, ছাদের আলসের উপরটায় একখানা শাড়ীর আঁচল, ভোরের হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। পাড় দেখেই আমি চিনতে পারলাম, ও শাড়ী ত গত মাসে আমিই ওর জন্যে কিনে এনেছিলাম।"

বড়কর্ত্তা কাপড় পরিতে পরিতে পালঙ্ক হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া বলিলেন, "শুধু শাড়ী দেখেছ? তবে লাসের কথা বল্লে যে!"

ছোট কর্ত্তা অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত ভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, "শুধু কাপড়খানা ছাদের উপর উঠবে কি করে বড়দা? কাপড় যখন রয়েছে, তখন লাসও নিশ্চয়ই ছাদের উপর আছে—এই সবই ত বুঝ্‌কি না! লাসটা আল্‌সের জন্যে দেখা যাচ্ছে না।"

"চল চল, ছাদে উঠে ত দেখা যাক্।"

ছোটকর্ত্তা বলিলেন, "না দাদা, অমন কাযটি করবেন না। এখন প্রথম কর্ত্তব্য পুলিসে খবর দেওয়া। লাস যে অবস্থায় আছে ঠিক সেই অবস্থায় পুলিসে এসে দেখুক। এই হচ্ছে নিয়ম—তবে ত ঠিক সুরতহাল হবে, ডিটেক্‌টিব এসে ক্রমে খুনের কিনারা করবে! ছাদে এখন আমাদের কারু ওঠা উচিত নয়।"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "আরে না না—কি বল তুমি!

চল চল, ছাদে উঠে আগে আমরা দেখি গিয়ে।" বলিয়া কর্ত্তা শুধু পায়েই ছুটিলেন।

বাড়ীর অপর কেহ তখনও জাগে নাই—এমন কি ভৃত্যেরাও ঘুমাইতেছে। মেঝ ভাইকেও জাগাইয়া, তিন জনে উঠানে নামিলেন। উঠান পার হইয়া গোহাল বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, সকলে দেখিলেন, ছাদের আলিসার উপর একখানা শাড়ীর প্রান্তভাগ বাতাসে উড়িতেছে বটে।

কিছু দূরেই একখানা মই পড়িয়া ছিল। মেঝকর্ত্তা সেখানা টানিয়া আনিয়া, ছাদে লাগাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। তিনি উপরে উঠিলে, বড়কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখ্‌ছ ?"

মেঝকর্ত্তা বলিলেন, "ছোট বউমাই ত বোধ হচ্চে।"

ছোটকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্তের চিহ্ন আছে ?"

মেঝকর্ত্তা উত্তর করিলেন, "কৈ, সে রকম ত কিছু দেখছি নে।"

"ওঃ, বুঝেছি, তা হলে অস্ত্রাঘাত করে নি। বিষ প্রয়োগ কিম্বা গলা টিপে মেরেছে"—বলিয়া তিনিও মই বাহিয়া ছাদে উঠিয়া পড়িলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও কষ্টেসৃষ্টে উঠিলেন।

তিনজনে দাঁড়াইয়া লাসের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ বড়কর্ত্তা বলিলেন, "ওহে, নিশ্বেস পড়ছে যে!" বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "ছোট বউমা! ও ছোট বউমা!"

এই শব্দে, লাস পাশ ফিরিল, চক্ষু মেলিল, এবং তিন শ্বশুরকে তথায় সমবেত দেখিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! শ্রীগুরু রক্ষা করেছেন। ওঃ"—বলিয়া তিনি দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া, ছাদের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বহুসংখ্যক আমের আঁঠি ও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—কতক বা শুষ্ক ও পুরাতন, কতকগুলি বা সদ্যোভুক্ত। দেখিয়া, তিনি এই "গুপ্ত রহস্যের" সূত্র পাইলেন।

মেঝকর্ত্তা ক্রোধের স্বরে বলিলেন, "বউমা, তুমি এখানে এলে কি করে ?"

বউমা নীরব—বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

বড়কর্ত্তা তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "সে সব কৈফিয়ৎ পরে হবে এখন। আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি। এখন তোমরা সব নামো দেখি। আমিও নেমে যাচ্চি। তার পর বউমা, তুমি আস্তে আস্তে, খুব সাবধানে, নেমে এস। কিছু ভয় নেই তোমার, মা! কেউ তোমায় বকবে না, কিচ্ছু বলবে না। বাড়ীর লোক এখনও কেউ উঠেনি—এই বেলা নেমে এস কেউ দেখতে পাবে না।"

মেঝকর্ত্তা ছোটকর্ত্তা নামিলেন, তৎপশ্চাৎ বড়কর্ত্তাও নামিয়া গেলেন। মই নামিতে বউমা পাছে পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় মেঝ কর্ত্তা একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে যাইতেছিলেন। বড় কর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "এস এস, কিচ্ছু ভয় নেই। ও সব ওদের অভ্যাস আছে।" ভাইদের লইয়া তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

বড়দাদার আচরণ ও কথাবার্ত্তা উভয় ভ্রাতার নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। তাঁহারা অবাক্ হইয়া, প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠের পানে চাহিয়া রহিলেন বড় কর্ত্তা তখন বলিলেন—"কাল বিকেলবেলা, আমি যখন বাগানে যাচ্ছিলাম, দেখ্‌লাম, মইখানা গোয়ালের পিছনে লাগানো রয়েছে। দেখে বল্লাম, মইখানা এখানে এনে কে রাখ্‌লে রে!—কেষ্টাকে ডেকে সেখানা সরিয়ে ফেল্লাম। তখন কি জানি যে ছোট বউমা সেই মই দিয়ে ছাদে উঠে বসে আছেন!"

এত বড় একটা "রহস্য" এত সহজে মীমাংসা হইয়া যায় দেখিয়া ছোটকর্ত্তা ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মই দিয়ে ছোট বউমা গোয়ালের ছাদেই বা উঠতে যাবেন কেন ?"

বড়কর্ত্তা বলিলেন, "কেন ? আমার পিণ্ডি চট্‌কাতে, আর কেন ? আম খেতে উঠেছিল বোধ হয়। ছাদময় ত আমের খোলা আর আঁঠি ছড়ানো রয়েছে দেখলাম।"

এতক্ষণে বেশ ফর্সা হইল। গৃহিণীরা জাগিলেন, বাড়ীর সকলে জাগিল, সকলে ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছোটবউকে ঘিরিয়া বসিল। বড়কর্ত্তার আশ্বাস সত্ত্বেও, বকুনি যে তাহাকে একেবারেই খাইতে হইল না এমন নহে।

ক্রমে প্রকাশ পাইল, গত দিবস বিকালে মুখুয্যেদের মনোরমা এবং কুঙ্কুম, দুজনে আম খাইবার জন্য গোয়ালের পশ্চাতে মই লাগাইয়া ছাদে উঠিয়াছিল। গোটাকতক আম খাইয়া মনোরমা নামিয়া যায়, কুঙ্কুম বলে, এই আমটা খেয়ে আমি নামছি। নামিবার সময় সে আর মই পায় নাই। লজ্জায় কাহাকেও ডাকিতেও পারে নাই। গাছের অনেকগুলা ডাল, ঘনপল্লব ও প্রচুর ফলের ভারে অবনত হইয়া গোয়ালের ছাদ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। ডালপালা সরাইয়া ছাদের সে কোণটায় কেহ গিয়া বসিলে, নিম্নের লোক তাহাকে দেখিতে পায় না। যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ কুঙ্কুম সেই আম ঝোপের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া ছিল। বেশ অন্ধকার হইলে, আবার ডালপালা সরাইয়া বাহির হইয়া খোলা ছাদে আসে। অনেক রাত্রি অবধি সেখানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর, শেষে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জেরায় ইহাও প্রকাশ পাইল যে, শুধু কুঙ্কুম ও মনোরমা নহে; এবাড়ীর অন্যান্য মেয়ে ও বধূরাও মাঝে মাঝে এইরূপ ভাবে ছাদে উঠিয়া আম্রভক্ষণ করিয়া থাকে। তবে এদিন যে কুঙ্কুম ও মনোরমা আম খাইতে গিয়াছিল, এ কথা তাহারা জানিত না।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আকাশ-বাণী

দেবতারা অন্তরীক্ষ হইতে যে কথা বলেন তাহার নাম আকাশবাণী; ইহাকে দৈববাণী ও বলে।

আকাশ কুসুমের মত অকাশ বাণী যেন কেমন অসম্ভব কথা বলিয়া মনে হয়। আকাশ কুসুম কেহ কখনও দেখে নাই, আকাশ বাণীও কখনও কাহার শ্রুতি-গোচর হয় নাই; কিন্তু অনেক সময় আমাদের হৃদয়াকাশে কেমন একপ্রকার অব্যক্ত বাণী উত্থিত হইয়া থাকে—কে যেন আমাদের অন্তরের কোনও নিভৃত কক্ষে দাঁড়াইয়া নীরব ভাষায় কি যেন বলিয়া দেয়—মনে মনে সেই কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং সেই কথা শুনিয়া কোন কায করিবার জন্য আমাদের প্রগাঢ় একটী ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উদয় হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Presentiment বলে। কএকটি উদাহরণ :—

(১) সার ইভান নেপিয়ান সাহেব যখন নৌসেনা সংক্রান্ত কার্য্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন, সেই সময় এক রাত্রে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিদ্রা আসিল না। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসার জন্য কে যেন বারবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল; সে কথা তিনি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলেন; রাত্রি তখন দুইটা।

শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসার পর তাঁহার আফিসে যাওয়ার ইচ্ছা হইল; সে সময় আফিসে যাওয়ার তাঁহার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, কে যেন তাঁহাকে দুয়ার খুলিয়া আফিসে আনিয়া উপস্থিত করিল।

আফিসে আসিয়া দেখেন, টেবিলের উপর একখানি সংবাদপত্র রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে মুদ্রা প্রস্তুত করার অপরাধে যাহাদের প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদের সেই দণ্ড স্থগিত রাখার জন্য ইয়র্ক নগরে সংবাদ পাঠান হইয়াছে।

ইভান্‌স সাহেবের হঠাৎ মনে হইল, এসংবাদ পাঠাইতে তাঁর ভুল হইয়াছে; তিনি খাতাপত্র খুলিয়া অনুসন্ধান

করিয়া দেখিলেন এই সংবাদ পাঠানর কথা ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই।

তখন সেই রাত্রে তিনি অতি ব্যস্ততা সহকারে আসামীদের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্য টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। সেই রাত্রে এই নিষেধ আজ্ঞা পাঠান না হইলে আসামীদের জীবন কখনই রক্ষা হইত না।

Night-side of Nature p. 82.

(২) রাত্রিকালে কোন ব্যক্তি একটী বড় রাস্তা দিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন; কিছু দূর আসিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন; এই পথে গেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী পৌঁছিতে পারিবেন ভাবিয়া সেই পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়া সে পথেযাইতে তাঁর কেমন একটা অনিচ্ছা হইল; ফিরিয়া বড় রাস্তায় আসিলেন। তখন মনে হইল, নিকট পথ ছাড়িয়া কেন দূর পথে যাইবেন? আবার সঙ্কীর্ণ পথে ফিরিলেন, কিন্তু সে পথে যাইতে কিছুতেই মন গেল না। বার বার তিনবার এ পথে সে পথে যাতায়ত করিয়া, অবশেষে বড় রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিতে পাইলেন, পশ্চাৎ দিক হইতে কাহারা দড় বড় শব্দে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছে, এবং সম্মুখে দেখিতে পাইলেন রাস্তার উপর একজন মাতাল অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে। পথিক সেই মাতালকে ধরিয়া রাস্তার একধারে টানিয়া লইয়া যাওয়া মাত্র ঘোড় সোয়ারেরা ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হইলে মাতালকে অশ্বপদদলিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইতে হইত।

Light, Vol. XXIX p, 59.

(৩) জার্ম্মান দেশে কোন একটী প্রাসাদে তিন ভাই সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময় জ্যেষ্ঠ শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে; তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মনে হইল, তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়াছেন। বালক পিতার ঘরে যাইয়া দেখে তিনি ঘুমাইয়া আছেন।

বালক পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে সময় তিনি তাহাকে ডাকিয়াছেন কেন? পিতা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, কৈ তিনি তো ডাকেন নাই।

বালক আসিয়া শয়ন করা মাত্র আবার শুনিতে পাইল, কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে আবার তাহার পিতার ঘরে যাইয়া তাঁহাকে জানাইল ও তাঁহার মুখে শুনিতে পাইল তিনি তাহার নাম ধরিয়া ডাকেন নাই।

বালক ফিরিয়া আসিয়া তাহার শয্যায় শয়ন করিয়াছে, আবার শুনিতে পাইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে।

বালকের মনে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, সে তাহার কনিষ্ঠ ভাই দুটীকে জানাইয়া এবং তাহাদের সঙ্গে করিয়া পিতার ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পিতার ঘরে যাইয়া এবং তাঁহাকে জাগাইয়া যখন বার বার তিনবার এই ডাক শুনার কথা বলিতেছিল, সেই সময়, যে ঘরে তাহারা শয়ন করিয়াছিল সেই ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

এই ঘটনা লইয়া জার্ম্মানিতে অনেক দিন পর্য্যন্ত নানা প্রকার আন্দোলন ও আলোচনা চলিয়াছিল এবং এ সম্বন্ধে কবিতা রচিত হইয়াছিল। সে কবিতা আজ পর্য্যন্ত সে দেশে প্রচলিত আছে।

Night-side of Nature p. 88.

(৪) মোঁসিও কালিপসন্ একজন বিখ্যাত লোক। যখন তিনি বার্ণ নগরে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় এক রাত্রে উপর্য্যুপরি তিনবার তাঁহার উপর দৈব-বাণী হয়—"প্লেগ আসিতেছে—পলাও পলাও।"

এই কথা শুনিয়া কালিপসন্ সাহেব সপরিবারে বার্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার অনতিকাল মধ্যে প্লেগ উপস্থিত হইয়া নগরটী এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

Night Side of Nature, p. 87

(৫) জেনারেল বিয়র্লিনের প্রতি সময় সময় দৈব-বাণী

হইত; একদিন অপরাহ্নে তিনি সুস্থমনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া গেল—

The Arch-Bishop of Canterbury is dead.

(ক্যাণ্টারবরির প্রধান ধর্ম্মযাজক মারা গিয়াছেন।) জেনারেল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; এবং পরের পরদিন সংবাদ পত্রে দেখিতে পাইলেন, ঠিক সেই দিন ধর্ম্মযাজক ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

Light, Vol XXIX p. 516

(৬) মা ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমরা নাকি শীকারে যাবে?"

ছেলে উত্তর করিল, "অনেকেই শীকার করতে যাবেন, তাঁদের সঙ্গে আমিও যাব।"

মা। না বাবা তোমার যাওয়া হবে না।

ছেলে। কেন মা আমাকে নিষেধ করছ?

মা। আমার মনে ভাল বল্‌ছে না, আমার মনে হচ্ছে তুমি শীকারে গেলে তোমার শরীরে বন্দুকের গুলি লেগে তুমি মারা যাবে।

ছেলে অনেকক্ষণ নীরব থাকয়া বলিল, "আমার শরীরে গুলি না লাগে সে জন্য আমি সাবধানে থাকব।"

এই কথা বলিয়া মাকে আশ্বস্ত করিয়া, পুত্র তাহার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শীকারে বাহির হইয়া গেল এবং অক্ষত দেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া মা সুখী হইলেন।

সেই দিন তাহাদের বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তিনি পাখী শীকার করিতে যাইবেন, পুত্রও তাহার সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু মা বলিয়াছেন শীকারে গেলে তাহার শরীরে গুলির আঘাত লাগিবে এজন্য সে বন্দুক ধরিবে না।

এই কথার পর তাঁহারা উভয়ে পাখী শীকার করিতে বাহির হইয়া গেলেন। পুত্রের শরীরে দৈবাৎ সেই আগন্তুক ভদ্রলোকের গুলি লাগিয়া তাহার জীবন শেষ হইল এবং তাহার মৃতদেহ লোকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী লইয়া আসিল।

Night side of Nature, p. 79

অনেক সময় অনেকেই মনের মধ্যে এ প্রকার অব্যক্ত বাণী শুনিতে পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর জীব জন্তুর মনে এক প্রকার জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাকে instinct বলে। এই জ্ঞানের সাহায্যে তাহারা তাহাদের আহারের সন্ধান পায়; মধু মক্ষিকারা দূরে কোথাও উপবন আছে তাহা জানিতে পারিয়া মধু আহরণ করিতে সেই স্থানে চলিয়া যায়; কুকুর বিড়াল ব্যারাম হইলে বনে যাইয়া ঘাস এবং লতা পাতা খাইয়া রোগমুক্ত হয়। বিপদ আপদের বিষয়ও তাহারা পূর্ব্ব হইতে এইরূপে জানিতে পারিয়া সাবধান হয়।

মিষ্টার ক্রোর (Crow) একটী ভালবাসার কুকুর ছিল—কুকুরটীর নাম ছিল টাইগার।

ধাত্রী ক্রে র ছেলে কোলে করিয়া প্রতিদিন সকালে বেড়াইতে বাহির হইলে কুকুরটী আহ্লাদের সহিত তাহাদের সঙ্গে যাইত। একদিন ধাত্রী আসিয়া ক্রো সাহেবকে জানাইল,টাইগার তাহাদের স ঙ্গ যাইতেছে না। কেন সে দিন টাইগারের বেড়াইতে যাইতে অনিচ্ছা হইয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না; তাকে বাধ্য করিয়া ধাত্রীর সঙ্গে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

সেইদিন জাহাজে একটা দুর্দ্দান্ত কুকুর আসিয়াছিল; সে টাইগারকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিল।

টাইগার হয়ত তাহার instinct গুণে তাহার যে এই দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা জানিতে পারিয়া সে দিন বেড়াইতে যাইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল।

মিঃ ক্রোর কোন আত্মীয়ের একটী অতি ভালবাসার কুকুর ছিল। কুকুরটী একদিন তাহার মুনিবের পায়ের নিকট বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার কাপড়

ধরিয়া টানিতে লাগিল। কুকুর তার মুনিবের কাপড় ধরিয়া টানে, দুই চারি পা যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া পায়ের তলায় বসিয়া কাপড় টানে। তাহার ভাব ভঙ্গি এবং রকম সকম দেখিয়া মুনিবের মনে হইল, কুকুর তাঁহাকে তাহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করিতেছে।

মুনিব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুকুরের নীরব আহ্বান উপেক্ষা করিয়া, অবশেষে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার সঙ্গ লইলেন ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

কুকুরটী অনেক দূর যাইয়া নগরের প্রান্তভাগে এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং মুনিবকেও সেইস্থানে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

কুকুর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে শয়ন করিয়া থাকিল এবং মুনিবও সেইস্থানে বসিয়া থাকিলেন। তারপর কুকুর বাড়ীর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল এবং মুনিবও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া আসিলেন।

মুনিব বাড়ীতে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, কতকগুলি সশস্ত্র সৈন্য তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল এবং বাড়ীর মধ্যে নানা স্থানে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ডের উত্তর অঞ্চলে ঘোর বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং এই মুনিব সেই বিদ্রোহী দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সন্ধানে সৈন্য আসিয়াছিল শুনিয়া তিনি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

Night side of Nature, p. 65

ইতর জীবজন্তুর পক্ষে যদি তাহাদের instinct প্রভাবে বিপদ আপদ জানিতে পারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের পক্ষে কেন অসম্ভব হইবে? এ জগতে সম্ভব কি, অসম্ভবই বা কি কিছুই বলা যায় না। দৈববাণী হওয়া অসম্ভব নয়। সকল দেশে এবং সকল জাতির ধর্ম্মপুস্তকে দৈব-বাণী হওয়ার উল্লেখ আছে। পৌরাণিক যুগে দৈব-বাণী হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে একজন মনিষী বলেন—

That any case, however incredible, if it be a recurrent case, is as much entitled under the laws of induction to a fair valuation, as if it had been more probable beforehand.

Essay on Probabilities—La Place.

কোন ঘটনা আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও যদি তাহা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সে প্রকার ঘটনা নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষা করা কখনও উচিত হয় না।

নিদ্রিত অবস্থায় অতীন্দ্রিয় দর্শন শক্তির বলে পরলোকগত মহাপুরুষগণের সহিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় এবং অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তিবলে তাঁহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

মৃত ব্যক্তিগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা যে কেবল নিদ্রিত অবস্থায় হয় তাহা নহে, জাগ্রত অবস্থাতেও হইয়া থাকে তাহার কতগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া গেল:—

(১) কোন ভদ্রমহিলা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা সৈনিক বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কি বলিলেন তাহা যদিও এই মহিলা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছে। এই ছায়া মুর্ত্তিতে পিতা কন্যার সহিত দেখা করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কন্যা এডিনবরা নগরে এবং পিতা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতবর্ষে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কন্যা এই ঘটনার কথা তাঁহার কোন পাদ্রি বন্ধুকে জানাইলে তিনি তাহা লিখিয়া রাখেন। পরে এডিনবরায় সংবাদ আসে, ভারতবর্ষে সেনাবিদ্রোহ হইয়া এই

সৈন্যাধ্যক্ষকে গুলি করিয়া ঠিক সেই দিন সেই সময় মারিয়া ফেলে।

পিতা নিজ মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কন্যাকে দিতে গিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয় তিনি কোন কথাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে বাণী কন্যার শ্রুতিগোচর হয় নাই।

Encyclopædia Britannica—Apparitions.

(২) সন ১৭৫০ খৃঃ অব্দে উইণ্ডসর নগরে বিবি গোভার নামক কোন ভদ্র মহিলা অত্যন্ত পীড়িত হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। এই সময় মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার কোন মৃত আত্মীয় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—

"এ যাত্রায় তুমি কখনই মারা পড়িবে না। কিন্তু তোমার বয়স এক্ষণে ২৩ বৎসর; যে দিন ২৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবে, সেই দিন তোমাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইবে।"

বিবি গোভারের জীবন যে সে যাত্রা রক্ষা পাইবে ইহা তাঁহার চিকিৎসক বা আত্মীয় স্বজন কেহই আশা করেন নাই। কিন্তু ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। তাঁহার উপর যে এই দৈব-বাণী হইয়াছিল তাহা তিনি ভুলিলেন না; তাঁহার মৃত্যুর দিন ক্রমে নিকটস্থ হইতেছে ভাবিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চিন্তাকুল হইত।

ক্রমে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবি গোভার সুস্থ শরীরে ২৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। তাঁহার স্বামী তাহার এই মনের অন্ধকার দূর করিবার জন্য এই জন্মতিথি উপলক্ষে অনেক বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন সমস্ত দিন মাহা আনন্দ উৎসবে কাটিয়া গেল; বিবি গোভার রোগ শয্যায় বিভীষিকা দেখিয়া থাকিবেন এবং স্বপ্নে হয়ত কি ভুল শুনিয়া থাকিবেন বলিয়া আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। সকলে বিদায় হইয়া গেলে বিবি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মারা পড়িলেন।

Apparitions Supernateral ocucrrucnes 1799,

(৩) দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে সার জর্জ ম্যাকেনজি প্রধান এডভোকেট্ জেনারেল ছিলেন। তিনি এডিনবরা নগরে বাস করিতেন এবং প্রতি রাত্রে আহারের পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টাকাল তিনি Leith Walk নামক কোন নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে যাইতেন।

এক রাত্রে তিনি বেড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার দেখা হইল।

ভদ্রলোকটী ম্যাকেনজি সাহেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে ১৪দিন পরে লণ্ডনে একটী বড় রকমের স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে; কোন ব্যক্তি অন্যায় করিয়া বহুমূল্যের সম্পত্তি হইতে তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করিবার দুরভিসন্ধিতে এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। আবশ্যক দলিলাদির অভাবে প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মোকদ্দমা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু দলিলাদি সমস্ত এই উত্তরাধিকারীর বাড়ীর মধ্যে [কোন একটী বাক্‌সের উল্লেখ করিয়া বলিলেন] তাহার ভিতর রাখা আছে।

উকীলকে এই মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া বৃদ্ধ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

ম্যাকেনজি সাহেব বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া এবং তাহাকে অন্তর্দ্ধান হইতে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন আর এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থান পাইল না।

পরদিন রাত্রে আবার যখন ম্যাকেনজি সাহেব সেই স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন, সেই সময় আবার সেই বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং বৃদ্ধ তাঁহাকে আর একদিনও বিলম্ব না করিয়া লণ্ডনে যাওয়ার জন্য আগ্রহের সহিত বার বার অনুরোধ করিয়া বলিল, এ মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে পারিলে তাঁহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ম্যাকেনজি সে দিনও সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

তৃতীয় দিনে বৃদ্ধ তাঁহার সহিত সেই নিভৃত স্থানে দেখা করিয়া বলিলেন, "আপনি এই মোকদ্দমা না চালাইলে প্রতিবাদীর জয়লাভের কোন আশা নাই, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।"

বৃদ্ধের কাতরতা দেখিয়া ম্যাকেনজি সাহেব পরদিন লণ্ডন রওনা হইলেন।

প্রকৃত উত্তরাধিকারীর বাড়ীর সন্নিকটে যাইয়া তাহার সহিত দেখা শুনা ও আলাপ পরিচয় হইলে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি পরম সমাদরে ম্যাকেনজি সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। সেখানে একটী ঘরের মধ্যে বড় এক খানি ছবি টাঙ্গান ছিল। পূর্ব্বোক্ত ময়দানে তিনরাত্রি যে বৃদ্ধের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া ছিল, এ যে তাঁহারই চেহারা!! ম্যাকানজি সাহেবের শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি সেই উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, উহা তাঁহার মৃত পিতামহের ছবি।

তার পর অনুসন্ধান করিয়া একটী অতিজীর্ণ বাক্সের ভিতর পোকায় কাটা কতকগুলি পুরাতন দলিল পাওয়া গেল এবং বিবাদিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলও তাহার ভিতর ছিল।

ম্যাকেনজি সাহেব ধার্য্য দিনে প্রতিবাদীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া দক্ষতার সহিত মোকদ্দমায় দলিলাদি দেখাইয়া জয়লাভ করিলেন। অনেক টাকা তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

ম্যাকেনজি সাহেব এডিনবরায় ফিরিয়া আসিয়া কত রাত্রি সেই মাঠে বেড়াইতে গিয়াছেন, কিন্তু আর সে বৃদ্ধের সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

The Prophecies of Barhan Seer.

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের ভাবী বিপদ আপদের বিষয় জানিতে পারা যায় তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে:—

(৪) সন ১৮১৭ খৃঃ অব্দের ২১শে জুন তারিখে কোন ভদ্র মহিলা স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার ভাই উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—"মেরি, আমি আজ ভিক্টোরিয়া সহরে প্রাণত্যাগ করিলাম।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এই ভাই সৈন্য বিভাগে কায করিতেন।

ভিক্টোরিয়া নামে যে কোন সহর আছে তাহা এই মহিলার আদৌ জানা ছিল না। সকালে উঠিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে ভূগোল ও মানচিত্র খুলিয়া দেখিলেন ভিক্টোরিয়া নামে একটি সহর আছে।

ভগিনীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ৯ মাইল দূরে তাঁর আর এক ভগিনীর বাড়ী রওনা হইলেন এবং সেখানে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি তাহাদের ভাই জনের কোন সংবাদ রাখেন কিনা।

ভগিনী উত্তর করিলেন, "অনেক দিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই, তবে গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে ভাই মারা গিয়াছে।"

দুই ভগিনী স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত সাব্যস্ত হইয়াছিল; পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সেই দিন যুদ্ধে ভিক্টোরিয়া সহরে ভাই জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

Night-side of Nature.

(৫) দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা হইয়া, এক পক্ষ এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

অপর পক্ষের অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি বা নিকট উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায়, গ্রাম্য ধর্ম্মযাজক তাঁহাকে তাঁহার নিঃস্ব প্রতিপক্ষের ভরণপোষণের কোন রকম ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য প্রায়ই অনুরোধ করিতেন। ধর্ম্ম যাজকের সহিত এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বিশেষ আত্মীয়তা থাকায় তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন।

হটাৎ একদিন এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইল এবং দূর সম্পর্কে তাহার একজন জ্ঞাতি ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া তাহার যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করিবার উদ্যোগ করিল।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ধর্ম্ম-যাজকের উপর স্বপ্নে দৈববাণী হইল—

"মৃত ব্যক্তি তাহার নিঃস্ব প্রতিপক্ষের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত উইল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই উইল লণ্ডনে কোনও এটর্ণির বাড়ীতে আছে।"

ধর্ম্মযাজক অনেক সময় এই নিঃস্ব ব্যক্তির জন্য মনে মনে কষ্ট অনুভব করিতেন। এজন্য এই প্রকার একটা অলীক স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন ভাবিয়া এই স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

কয়েক দিন পরে ধর্ম্মযাজক আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন মৃত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং কাতর বাক্যে তাঁহাকে তাঁহার সেই উইলের সন্ধান করিতে বলিতেছেন। ধর্ম্মযাজকের প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগিল কিন্তু স্বপ্নের কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি কি করিবেন, কোন পথে যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না।

আর এক দিন মৃত ব্যক্তি ধর্ম্মযাজকের নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাকে যেন সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে সেই এটর্ণি আফিসে লইয়া গিয়া, একটী ড্রয়ারের ভিতর হইতে উইল বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন।

পরদিন ধর্ম্মযাজক বার বার তিন বার এই স্বপ্ন দর্শনের কথা তাঁহার একজন বন্ধুকে বলিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে যাইয়া সেই এটর্ণি আফিস সন্ধান করিয়া উইল বাহির করিলেন। তাঁহার নিঃস্ব যজমানের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইল।

Rev. F. G, Lee's Glimpses of the Supernatural.

দৈব-বাণী হয়। চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে দৈব-বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে গ্রীশে অ্যাপলো মন্দিরে যাইয়া ধরণা দিলে দৈব-বাণী হইত। আমাদের দেশে এখনও বৈদ্যনাথ বা তারাকেশ্বর মন্দিরে যাইয়া ধরণা দিলে দৈব-বাণী হয় এবং সেখানে কঠিন কঠিন রোগের ঔষধ পাওয়া যায়। সে ঔষধে রোগ আরোগ্যও হয়। দেব-মন্দিরে যাইয়া ধরণা দিলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে।

দেব-মন্দির ভিন্ন অন্য স্থলেও চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে দৈব-বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। নিদ্রিত অবস্থায় চিত্তের প্রক্ষেপ দূর হইয়া একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে এজন্য স্বপ্নে দৈব-বাণী লাভ করা যায়।

আমার নিজের একটী কথা বলি। কোনও সময় আমার চক্ষুর ব্যারাম হইলে, আমি কলিকাতায় স্যাণ্ডার্স সাহেব দ্বারা চিকিৎসিত হইতে গিয়াছিলাম। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি স্যাণ্ডার্স সাহেবের বাড়ী হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে থিয়েটার প্লাকার্ড টানানো ছিল, সেই বড় বড় অক্ষরে লেখা প্লাকার্ডের এক বর্ণও পড়িতে পারিলাম না; তখন আমার চক্ষুর দৃষ্টি এককালে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল—আমি বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। অনেক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন কোন মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে সাহস ভরসা দিয়া, একটি ঔষধ আমাকে ধারণ করিতে বলিলেন। সেই হইতে প্রায় ২০ বৎসর আমি সেই ঔষধ ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, এবং অনেকের চক্ষুরোগে এই ঔষধ দিয়া ফলও পাইয়াছে।

সন ১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাসের "মানসী"তে "প্রত্যাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি স্বপ্নে এই ঔষধ প্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করিলে, অনেকে আমার নিকট এই ঔষধ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নানা কাযে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত আমি তাঁহাদের সকলকে ঔষধ পাঠাইতে পারি নাই। তবে অনেককেই দিয়াছিলাম এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রোগমুক্ত হইয়া কোন্ দেবতার ঔষধ, তাঁহার পূজা দেওয়ার জন্য আমাকে দেবতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে কোনও দেবতার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায়, আমি সে কথার কোন উত্তর দিতে পারি নাই।

দৈব-বাণী হয় সে বিষয় সন্দেহ নাই; তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সে বাণী কাহার?

মানুষ মরিয়া আপন আপন কর্ম্মফল অনুসারে কেহ দেবতা বা কেহ অপদেবতা হইয়া থাকেন। এই সকল পরম কারুণিক আত্মিক দেবতাগণ অদৃশ্য সহায় হইয়া বিপদ আপদ হইতে আমাদের রক্ষা করিতেছেন এবং স্বপ্নে আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আদেশ উপদেশ দিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে কোনও ব্যক্তি তাহার আসন্নকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া পরকালের মঙ্গল কামনায় একজন ধর্ম্মযাজককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মযাজক তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় অনেকক্ষণ ধরিয়া উপাসনা করিলেন। তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসার সময় পথে সন্ধ্যা হইল এবং কিছু দূর আসিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তখন অন্ধকার হইয়াছে, আর তিনি অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

ধর্ম্মযাজক একটী চৌমাথা পথের ধারে বসিয়া, হাঁটু-গাড়িয়া করযোড়ে আত্মরক্ষার্থে ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; সেই স্থানে বসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনা করার পর তাঁহার মনে যেন স্বর্গীয় বলের সঞ্চার হইল। ধর্ম্মযাজক পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই ঘটনার ২।৩ বৎসর পরে নরহত্যা করার অপরাধে এক ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম হয় এবং অন্তিম কালে তাহাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়ার জন্য এই ধর্ম্ম-যাজককে ডাকিয়া পাঠান হয়। ফাঁসির আসামীর নিকট ধর্ম্মযাজক আসিয়া উপস্থিত হইলে, আসামী তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি।"

ধর্ম্মযাজক প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ? গির্জ্জায় কি তুমি কোনও দিন আমার ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে গিয়াছ?"

আসামী। আমি জীবনে কোন দিন গির্জ্জায় যাই নাই, বা ধর্ম্মোপদেশ শুনি নাই। ধর্ম্মের কাহিনী শুনা আমার কায ছিল না। কিন্তু আপনার মনে হয় কি, এক দিন আপনি রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ার সময় একটী চৌমাথা পথে বসিয়া ভয়ে ভীত হইয়া ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন? ঐসময় আমি ও আমার একজন সঙ্গী আপনাকে হত্যা করিয়া আপনার ঘড়িটী অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম; হঠাৎ সাদা পোষাক পরা দুইজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আপনার দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তাহাদের দেখিয়া আর আপনার গায়ে হাত দিতে আমাদের সাহস হইল না।

ধর্ম্মযাজক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রিকালে আমি এক চৌমাথা পথের ধারে বসিয়া উপাসনা করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু কোনও লোক ত সে রাত্রে আমার নিকট আসে নাই এবং আমাকে সঙ্গে করিয়াও লইয়া যায় নাই।

আসামী। আপনি বলেন কি? সে রাত্রে সেই দুইজন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই আপনার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। তেমন বলিষ্ঠ সুশ্রী পুরুষ আমরা জীবনে কখনও দেখি নাই।

ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের দেখিতে পান নাই, এজন্য আসামীর কথার উত্তর দিতে পারিলেন না; তবে বুঝিলেন তাঁহারা স্বর্গীয় দূত—অদৃশ্য সহায় হইয়া সেই বিপৎ-কালে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

Christian Herald, September 5th, 1898

পরলোকগত আত্মিকেরা অদৃশ্য সহায় হইয়া আপদ বিপদ হইতে যে আমাদের রক্ষা করিয়া থাকেন এবং আমাদের অনেক উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়:—

সক্রেটিসের একজন আত্মিক দেবতা সহায় ছিলেন। প্লেটো, এরিস্থিমেস্, সিসিরো, এপিউলিউস্ প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তিকালের মনীষিগণ মধ্যে কেহ এই অদৃশ্য সহায়কে সক্রেটিসের দেবতা (god) কেহ বা তাঁহার অপদেবতা (demon) বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। তিনি দেবতা হউন বা অপদেবতা হউন, সক্রেটসের উপর যে তাঁহার দৈব-বাণী হইত এবং বিপদে আপদে সক্রেটিসকে যে তিনি রক্ষা করিতেন সে বিষয়ে উপরিউক্ত মনীষিগণ মধ্যে কাহারও সংশয় থাকা শুনা যায় না।

কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন সত্য যে সক্রেটিস তাঁহার প্রতিভা (genius) বলে তাঁহার ভাবী বিপদ আপদের বিষয় জানিতে পারিতেন। কিন্তু সক্রেটিস নিজে তাহা তাহা বলিতেন না; তিনি বলিতেন, বাল্যকাল হইতে তাঁহার উপর দৈব-বাণী হইত এবং কোন অপদেবতা বাল্যকাল হইতে তাহার অদৃশ্য সহায় থাকিয়া বিপদ আপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিত এবং প্রত্যেক কার্য্যে চালনা করিত।

Life's Borderland and Beyond, p. 308

পরলোকগত আত্মিক মহাপুরুষেরা আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে অন্তরীক্ষে বসিয়া যে কথা বলেন, তাহারই নাম আকাশ-বাণী। এই আকাশ-বাণী চিরকালই হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে এবং তৎ-পূর্ব্বে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তির বলে তাঁহাদের কথা কখন কখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল আত্মিকেরা তাঁহাদের মনের ভাব আমাদের মনে চালনা করিয়া দিলে তাহাকে ইংরাজিতে presentiment অথবা Premonition বলে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির (Psychical Research Society) সভ্য মহোদয়গণের গবেষণায় জানা গিয়াছে, একজন তাহার মনের ভাব অপরের মনে চালনা করিতে পারে (Thought transference) এবং অপরের মনের ভাব সে নিজে অবগত হইতে পারে (Thought reading)। ভাবের এই যে আদান প্রদান করিবার শক্তি, ইহা আমাদের এই জড় শরীরের নয়, এ শক্তি আমাদের আত্মার। আমাদের আত্মা এই জড় শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যদি এই শক্তির পরিচালনা করিতে পারে, তাহা হইলে পরলোকগত আত্মিকেরা তাহাদের মনের ভাব জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, আমাদের মনে চালনা করিয়া দিবেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

জার্ম্মান দেশের স্বনামখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত Immanuel Kant বলেন—

At some future day it will be proved-I cannot say when and where—that the human soul is, whilst in earth-life, already in uninterrupted communication with those living in another world ; that the human soul can act upon those beings and receive in return, impressions from them, without beng conscious of it in the ordinary personality.

অর্থ—আমাদের জীবাত্মা, এই পার্থিব জীবন যাপন করা কালে যে পরলোকগত আত্মিকগণের সহিত প্রতিনিয়ত ভাবের আদান প্রদান করিতেছে ইহা এক দিন সপ্রমাণ হইবে—কোথায় এবং কত দিনে হইবে ইহা আমি এক্ষণে বলিতে পারি না। ইহাও প্রমাণিত হইবে যে, আমাদের জীবাত্মা পরলোকগত আত্মীয়গণের উপর ক্রিয়া করে এবং বিনিময়ে, অজ্ঞাত সারে তাহাদের নিকট হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পথিকের গান

কেন নয়নের জল ?
কেন হতাশের হহোকার ধ্বনি ?
কেন পদ নিশ্চল ?
কেন শুকায়েছে হাসি ?
কেন থেমে গেছে বাঁশী ?
কেন নিবে গেছে হৃদয়ের সেই
উচ্ছল কোলাহল ?

জাননা রে মূঢ় মন!
কাল মহানদী চলে নিরবধি
গরজি অনুক্ষণ ;
না মানে কাহারো হাসি ;
না মানে অশ্রুরাশি ;
সকলেরে পিছে ফেলিয়া ছুটিছে,
কে করিবে নিবারণ ?

হেথা বসন্ত বায়,
চিরদিন কভু বহেনা বহেনা,
ফুলরেণু মাখি গায় ;
শীতরাক্ষসী আসে,
নিখিলের আলো গ্রাসে ;
দুদিনের তরে জ্বালায়ে সবায়ে
সেও শেষে চলে যায় !

রবির আলোক রাশি
অনুখন নাহি করে বরিষণ
দীপ্ত কনক হাসি।
আঁধারে দিনের শেষে
আসে দানবের বেশে,
বিরাট পাখায় ধরণীরে ছায়
বিশ্বের আলো গ্রাসি !

নাহি হেথা হেন জন
কালের বক্ষে পাতিয়াছে যে বা
অটল সিংহাসন।
কালিকার ফুল হাসি
আজি হয়ে যায় বাসি ;
আজিকার কুঁড়ি ফুল হয়ে কাল
করে সুধা বরিষণ।

আজিকার হাহাকার
কালিকার শত হাসির মাঝারে
হয়ে যায় একাকার !
কাল যে হরষে মাতি
নেচেছিনু সারা রাতি,
আজি তাহা, হায়! নিঠুর ঘায়
ভেঙে হয় চুরমার !

এই জগতের রীতি !
এমনি করিয়া কালের চক্র
ঘুরিতেছে নিতি নিতি !
নিরাশা, বেদনা, ভয়—
কিছু নয়, কিছু নয়,
সবারে চাপিয়া উঠিছে ছাপিয়া
কালের বিজয় গীতি !

তবে আর কেন ভয় ?
ওঠ, বীর ওঠ, সমুখেতে ছোট,
বল জয়, জয়, জয় !
দুঃখ যাতনা মিছে,
সব পড়ে রয় পিছে,
পথিকের আগে পথ শুধু জাগে
অসীম জ্যোতির্ম্ময় !

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মধুসূদনের কাব্যে অনার্য্যপ্রীতি

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "মেঘনাদ বধ কাব্য" অনার্য্যপ্রীতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শনের বিষয় কিছু বলিব। এখানে অনার্য্য-প্রীতি অর্থে নিকৃষ্ট গুণধর্ম্মাদিযুক্ত ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের প্রতি আনুরক্তি নহে, পরন্তু মাইকেল কর্ত্তৃক রাবণ ও রক্ষোবংশের চরিত্রে আর্য্যোচিত মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ! যদি পুরাণ মতে রক্ষোবংশকে "অনার্য্য" বলা হইয়াছে, কিন্তু মাইকেলের "অনার্য্যপ্রীতি" বস্তুতঃ আর্য্যধর্ম্মপ্রীতি, কারণ মহদাশয় ব্যক্তির স্বাভাবিক অনুরাগ সর্ব্বদা মহদ্‌বিষয় সম্পর্কিত। তাঁহার রাবণ মহামহিমান্বিত রাজা, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ও মহান্, মন্দোদরী মহীয়সী রাণী, প্রমীলা অপূর্ব্ব সাধ্বী বীরাঙ্গনা।

যাহা হউক, মাইকেলের জীবনচরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ইন্দ্রবিজয়ী রাক্ষসরাজ, রামচন্দ্রকে রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ;—

> * * * না চাহি তোমারে
> আমি, হে বৈদেহীনাথ! এ ভব মণ্ডলে
> আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে।
> কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
> পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
> শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ।

"আততায়ী শত্রুর এই গর্ব্বিত ও ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া রামচন্দ্র সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ ব্যবহার রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক নয়। যে ব্যক্তি, পত্নীর সতীত্ব নাশের প্রয়াসী হইয়া মর্ম্মে শেলাঘাত করিয়াছিল, এবং যে প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণ সংহারের জন্য রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার দিকে ধাবিত হইতেছিল, মনুষ্য-হৃদয় লইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে? রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যও কি এরূপ অবস্থায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মধুসূদন যেখানেই রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্রে বিনয় অথবা কোমলতার অভাব নাই, কিন্তু কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার সামঞ্জস্যই যে রামচন্দ্রের চরিত্রের গৌরব, তিনি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রামচন্দ্র প্রমীলার বীরত্ব দর্শন ভীত, ভ্রাতাকে যুদ্ধে প্রেরণের সময় রোদনপরায়ণ, এবং আততায়ী শত্রুকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।"

এখানে রামচরিত্রে যে দোষ ঘটিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, রাবণের উপরিউক্ত কথায় রাম কিছুই বলিলেন না। প্রকৃত বীরের পক্ষে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত ছিল; তাহাতে পরাজিত হইলে কোন দোষের হয় না; বিশেষতঃ রাবণ 'রুদ্র' তেজে বলীয়ান্। তাহা ছাড়া প্রবল মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধেও রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া সাময়িক পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বীরপুরুষের পক্ষে প্রকৃত পরাজয় মাত্র তখন, যখন সে কর্ত্তব্য বিমুখ হয়, হৃদয়ের বল হারাইয়া ফেলিয়া কাপুরুষবৎ আচরণ করে। রামের পক্ষে এখানে তাহাই ঘটিয়াছে। কিন্তু এখানে রামের চরিত্র অঙ্কনে মাইকেল যেন কিছু ব্যস্ততা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে ঘটনা সংস্থানে সুসঙ্গতি আদৌ হয় নাই। ফলে, রামচরিত্রে কাপুরুষতা স্পর্শ করিয়াছে। মাইকেল যদি রামকে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে উন্মুখ করিতেন, তাহাতে পরাজয় ঘটিলেও রামচরিত্রে দোষ স্পর্শিত না। বাল্মীকির

রামায়ণে রাম সবিক্রমে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে রাবণ মেঘনাদের মৃত্যু শ্রবণে অতিশয় শোকার্ত্ত ও রামলক্ষ্মণকে মারিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি প্রথমে ক্রোধবশে সীতাবধ ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু সচিব ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক নিবারিত ও যুদ্ধে মনের ক্ষোভ মিটাইতে উপদিষ্ট হইলেন। (লঙ্কাকাণ্ড ৯২ অধ্যায়) পরে সৈন্যদিগকে কহিলেন যে, তোমরা সকলে মিলিয়া রাবণকে বধ কর, অথবা আমি একাই তাহা পারিব। (লঙ্কা ৯৪।১-৫) রাক্ষসদের আক্রমণ বানরগণ সহ্য করিতে না পারিয়া রামের শরণ লওয়াতে রাম যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। (লঙ্কা ৯৪।১৭-১৮) এইরূপে রামরাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ রামের সহায়ে অগ্রসর হইয়া শরবর্ষণ করিলেন, বিভীষণও গদা দ্বারা রাবণের হস্তিহয়াদি বধ করিলেন। রাবণ বিদ্রোহী বিভীষণকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি 'শক্তি' অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। লক্ষ্মণ সে অস্ত্র বাণ দ্বারা বিমুখ করিয়া বিভীষণকে বাঁচান্। পুনরায় রাবণ 'শক্তি' অস্ত্র গ্রহণ করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বাণ-জর্জ্জরিত করেন, তাহাতে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সেই অব্যর্থ 'মহাশক্তি' নিক্ষেপ করেন। (লঙ্কা ১০১।২৭-২৮) রাম 'মহাশক্তি'কে লক্ষ্মণের দেহে না পড়িবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ পতিত হইলে মুহূর্ত্ত শোকার্ত্ত হইয়া রামচন্দ্র 'যুগান্তে পাবকে'র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং—

ন বিষাদস্য কালোঽয়মিতি সংচিন্ত্য রাঘবঃ।

চক্রে সুতুমুলং যুদ্ধং রাবণস্য বধে ধৃতঃ।

সর্ব্ব যত্নেন মহতা লক্ষ্মণং পরিবীক্ষ্য চ ॥ ৩৯।১০১ অঃ

হনুমান্ ও সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের দেহরক্ষা করিতে বলিলেন, কারণ,

পরাক্রমস্য কালোঽয়ং সংপ্রাপ্তো মে চিরেপ্সিতঃ ॥ ৪৬।১০১।অঃ

অস্মিন মুহূর্ত্তে ন চিরাৎ সত্যং প্রতি শৃণোমি বঃ।

অরাবণমরামং বা জগদ্ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥ ৪৮।১০১অঃ

লক্ষ্মণের দেহ হইতে শেল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ততক্ষণ রাবণ রামের প্রতি শরবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু রাম অচিরে যুদ্ধ করিয়া রাবণকে সদলবলে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। রাবণ লক্ষ্মণের দেহ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন মাইকেল এরূপ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বীরভদ্র শোকার্ত্ত রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিয়াছিল। মূলগ্রন্থে এ সমস্ত নাই—তাহাতে রাম বীরপুরুষ, রাবণ হেয় রাক্ষস। কৃত্তিবাসও বাল্মীকির ধারা রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক, মাইকেল যে রামচরিত্র অঙ্কনে এই স্থলে এক মহাভ্রম করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার "অনার্য্য-প্রীতির" প্রধান নিদর্শন। ইহার কারণ যে ঘটনা সমাবেশে নৈপুণ্যের অভাব, সে সম্বন্ধে "মালঞ্চ" পত্রে পূর্ব্বে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠকগণের বিচারের জন্য দেওয়া গেল:—

"মহাদেবের বরে মহাতেজস্বী রাবণ মেঘনাদের হত্যার প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্রকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু রামের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষোক্তি করিলেন মাত্র, তাঁহার প্রতি অস্ত্র-নিক্ষেপ করিলেন না। রামও রাবণকে কিছু বলিলেন না। রাবণ এখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এখানে যেন কিছু তাড়াতাড়ি করা হইয়াছে যাহাতে রামের চরিত্রে যেন কিছু অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়, অথচ সে জন্য রামকে ভীরু, কাপুরুষ বলা সঙ্গত হয় না। এখানে কবির একমাত্র উদ্দেশ্য, লক্ষ্মণের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎকার ঘটানো, সেজন্য তিনি সকল বাধাকে সংক্ষেপে এবং দ্রুত সরাইয়াছেন। যে মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধের প্রধান প্রতিপক্ষরূপে প্রবল বৈরীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার চরিত্রে এরূপ বিসদৃশ নীরবতা একান্ত অস্বাভাবিক; কিন্তু কবি এখানে অতি ব্যস্ততার সহিত রাবণকে তাঁহার লক্ষ্যের নিকট উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতেই এই বিসদৃশ সংঘটন,—ইহা পাঠকমাত্রেরই সহজে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যে তেজস্বিতা, যে বিশেষত্ব রামচরিত্রের ভিতর নীরব রহিয়া গেল, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলে পরে লক্ষ্মণের ভিতর দিয়া কবি স্বতঃই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। রাক্ষসরাজের কথায় লক্ষ্মণ বলিতেছেন,—

"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর রথি। আশু নিবারিব
শোক তব প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।"

এবং পরে লক্ষ্মণের রণকৌশল দেখিয়া,—

"সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, 'বাখানি
বীরপনা তোর আমি সৌমিত্রী কেশরী
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।"

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ গুহ।

বঙ্গবাণীর ক্রন্দন

[গত ৩০শে ভাদ্র নদীয়া শাখা সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক উৎসবে লেখক কর্তৃক পঠিত। সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর]

তুমি নাটোরাধিপতি মহারাজ আজ, আমার পূজায় পুরোহিত হইয়া আসিয়াছ, তুমি আমার কান্না শুনিবে? আজ আমি তোমার দেখা পাইয়াছি,—তুমি আমাকে চেন, আমিও তোমাকে চিনি, দরদী ভিন্ন আমার হৃদয়ের ব্যথা কে বুঝিবে? তাই তোমার কাছে আমার ফুকরাইয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছে।

তোমরা বলিবে আমার দুঃখ কিসের? আজ আমি বিশ্ববরেণ্য দিগ্‌বিজয়ী সন্তানের জননী। তাহার কল্যাণে আজ আমার যশের সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না। আমি আজ জাপান-মার্কিন, ফরাসী জার্ম্মানির ঘরে ঘরে আদৃত। সে বিষয়ে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে সন্দেহ নাই, আমার যাহা কিছু দুঃখ কেবল অন্ন বস্ত্রের।

অনেক লোক ঘরে আটহাতি আটপৌরে কাপড় পরে, যখন রাস্তায় ময়দানে সভাস্থলে বাহির হয় তখন তাহাদের লম্বা কোঁচা। কিন্তু এই দুঃখিনীর সেবকগণ আমাকে "গেলুম-খেলুম বল্লুম-করলুম" এইরূপ আটপৌরে, ধূলি মলিন, রন্ধন শালার মসীলিপ্ত কাপড় পরাইয়া সভা সমিতিতে পর্য্যন্ত বাহির করিতেছে। সেই সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদে আমার গা ঢাকে না, আমি লজ্জায় মরিয়া যাই, আর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করি।

তোমরা আমার এই যে দীনহীন মলিন বেশ দেখিতেছ, চিরদিন আমার এ বেশ ছিল না। ছিল একদিন যখন আমার পল্লীবাসী সেবক চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ-কাশীদাস স্বভাবজাত পদ্ম শেফালিকা চম্পক মল্লিকার মালা দ্বারা, এবং আমার রাজসভা-শোভন সেবক বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র রাজোদ্যান সমাহৃত চামেলিযূথিকার হার গাঁথিয়া আমাকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছিল। ছিল একদিন যখন আমার মধু-বঙ্কিম, হেম-নবীন, দ্বিজ-রবি প্রভৃতি সুকৃতি সন্তানগণ কত স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য খচিত রত্নাভরণ দ্বারা আমার এই দেহ সুসজ্জিত করিয়াছিল। কিন্তু হায়, কালক্রমে আমার সেই সকল পুষ্পাভরণ শুকাইয়া গিয়াছে, আমার সেই সকল মণিভূষণ একে একে খসিয়া পড়িতেছে। এখন আমার বর্ত্তমান বেশ দেখিয়া বঙ্গের বাহিরে বড় কেহ আমাকে চিনিতে পারে না। কালক্রমে কংস কারাগারস্থ কৃষ্ণজননী দেবকীর ন্যায় আমাকে কলিকাতা রাজধানীর চতুঃসীমার মধ্যেই বোধ হয় আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

আমার আধুনিক সন্তানগণ আমার আহারের জন্য কত দেশ বিদেশ হইতে ভারে ভারে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে সত্য। কিন্তু তবুও আমি খাইতে না পাইয়া এরূপ শুকাইতেছি কেন শুনিবে? আজ তোমার যখন দেখা পাইয়াছি, তখন আমার মনের কোন কথা তোমার নিকট গোপন করিব

না। আমি সম্রাট্ জননী হইয়াও কেন পথের কাঙ্গালিনী তাহা বলিতেছি শুন।

একটি ব্রহ্মচর্য্য-নিরতা হবিষ্যাশিনী ব্রাহ্মণ বিধবাকে যদি ভোজনের জন্য "কারি কাট্‌লেট্" দেওয়া হয়, তবে তাহার কি দশা ঘটে? সে এই সকল হুঙ্কারজনক খাদ্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া উপবাস করিয়া থাকে। যদিও এখন আমার সেবকগণ মাসে মাসে কত প্রকার খাদ্য জোগাইয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে, আমি সে সকল গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রায় উপবাসে দিন কাটাইতেছি। আমার প্রিয়তম পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পরে আমার দশা ক্রমে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে আমার বিশ্ববিজয়ী পুত্র রবীন্দ্র নাথ একদিন তাঁহার স্বর্ণবীণার ঝঙ্কারের সহিত গীত গাইতে গাইতে মন্দাকিনী বারিদ্বারা অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া আমার তর্পণ করিয়াছিল। সত্য বটে আমার অন্যতম সুসন্তান শরৎচন্দ্র, শরচ্চন্দ্রের সুষমাদীপ্ত প্রতিভায় অনু-প্রাণিত হইয়া একদিন চিরস্নিগ্ধ বাৎসল্য রসধারায় আমার অভিষেক করিয়াছিল। কিন্তু হায়! আমার পোড়া কপালে সে সুখ সহিল না।

আমার সেবকগণের মনে ধারণা হইল, দেশজাত খাদ্যে আমার শরীর তেমন বাড়িতেছে না, তাই আমার আরও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। তাই তাহারা বিলাতী সুরার ন্যায় উৎকট মাদকতাময় বিলাতী প্রেমের দ্বারা আমার ভোগ দিতেছে। আমি ব্যাস বাল্মীকি ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিতা সংস্কৃত-জননীর কন্যা। সেই সকল ঋষির তপস্যাপূত শোণিত ধারা আমার প্রতি শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। বিলাতী প্রেম রস আমার সেই রক্তের সহিত মিশ খাইবে কেন? কাযেই সেই সকল তীব্র খাদ্য, পরিপাকের অভাবে আমার শরীরে বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া আমাকে জীর্ণ শীর্ণ করিতেছে। আমার মন্দিরের আর এখন সে শতদলগন্ধি তুষারশুভ্র পবিত্রতা নাই, তাহা পূতিগন্ধময় "বিধবার প্রেম," "সধবার প্রেম," "বারবিলাসিনীর প্রেমের" লীলা নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। আমার পূর্ব্বতন সেবকগণ আমার ধাতুর অনুকূল স্নেহ বাৎসল্যাদি বিবিধ অমৃতময় রসের দ্বারা আমার সেবা করিত। তাহারা পবিত্র দাম্পত্য স্নেহের বিচিত্র লীলা তাহাদের কলা-নৈপুণ্য দ্বারা প্রকটিত করিত। দাম্পত্য প্রেমের যে ব্যভিচারী ভাবকে "পীরিত" বলে তাহও ব্রজগোপীগণের দ্বারা ভগবানে অর্পিত হইয়া পবিত্র হইয়াছিল। ভক্ত কবি চণ্ডীদাস "রামী রজকিনী"র "পীরিতি"কেও স্নেহরস সিক্ত করিয়া পবিত্র করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এখন অনেক কবিরই সেই ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তি নাই। তাহারা প্রেমকে বিলাতী আদর্শে বিলাসের সামগ্রীতে পরিণত করিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছে। তোমরা ইহার প্রতিকার না করিলে নিশ্চয়ই আমার জীবন সংশয় হইবে।

তোমাকে আমার দুঃখ কাহিনী বিশেষ করিয়া বলিতেছি, তাহার কারণ তুমি সেই এককালীন অর্দ্ধ-অঙ্গের অধীশ্বরী মহামহিমময়ী রাণী ভবানীর বংশধর। যবার যে মহাপুরুষ সিদ্ধার্থের ন্যায় বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া "বঙ্গোজ্জ্বল" প্রাসাদ ত্যাগ পূর্ব্বক জগজ্জননীর সন্ধানে বাহির হইয়া আনন্দময়ীর পরমানন্দ লাভ করিয়া-ছিলেন, সেই সাধক-কুলতিলক রামকৃষ্ণও তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ। তুমি বিষয়সমৃদ্ধি ও বৈরাগ্য, ভোগ ও সংযমের মহিমা অবগত আছ। আবার তুমি নিজেও আজীবন আমার সেবা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছ। তুমি কি আমার এই কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া আমার জীবন রক্ষার সহায় হইবে না?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শেষ জীবন

গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি। যদি দেশবাসীর মানসিক উন্নতিবিধান করা সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যে সকল দুঃস্থ সাহিত্যসেবক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াও দেশবাসীর মানসিক উন্নতির জন্য তাঁহাদের প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক অনশনের কবল হইতে মুক্ত করাও সেই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য সুসভ্য দেশে দুঃস্থ সাহিত্যসেবককে যথোচিত বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। স্যর উলিয়াম হণ্টার হেমচন্দ্রের জন্য সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট হইতে যথাযোগ্য পেন্সন মঞ্জুর করাইয়া লইবার সংকল্প করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্দেশেও ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য হেমচন্দ্রকে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বৃত্তি প্রদান করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল দিবসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বজেট বিতর্ক উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহিরপুরের মাননীয় রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর "বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ" বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি বৃত্তি প্রদানের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে মাননীয় মিষ্টার (পরে স্যর এডওয়ার্ড নরম্যান) বেকার বলেন যদি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট যথারীতি আবেদন করা হয়, তাহা হইলে সেই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের এই উত্তরে প্রোৎসাহিত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন। আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"One of the various duties of the Association has been to seek to assist eminent men of science and literature in these provinces who have fallen into pecuniary difficulty. The Association therefore begs most humbly to approach the Government with a representation for help on behalf of Babu Hem Chandra Banerjee, the late senior goverment pleader of the High Court and celebrated Bengali poet, who is and will continue to be widely known all over the country for the genuine and exceptional excellence of his poems. This old gentleman has now grown blind and is at present devoid of any means to support himself and his family. During his early days of prosperity he devoted most part of his income to the cause of charity and his generous heart and benevolence have, I am afraid, been the cause of his distress."

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই পত্র প্রাপ্তির পর তদানীন্তন শিক্ষাধ্যক্ষ মিষ্টার (পরে স্যর আলেক্জাণ্ডার) পেডলার

মহোদয়কে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলেন। ইনি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত সংগ্রহ করেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যর আলেক্জাণ্ডার কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নোদ্ধৃত অভিমত প্রকাশ করেন :—

"I beg to state that Babu Hem Chandra Banerjee is considered the greatest living poet of Bengal. His poetry is of a very high order of merit, being adorned alike with the gorgeous magnificence of the East and the sombre grandeur of the West and it has enriched our literature with some of the noblest products of Eastern and Western culture. Considering his eminent services to literature and considring the physical affiction which he, like England's great epic poet, is suffering from and which has compelled him to retire from the legal profession, it would be a most gracious act on the part of Government to confer on him some pecuniary recompense for his work and one that will he highly appreciated and gratefully acknowledged by the whole country."

শুনা যায় স্যর আলেক্জাণ্ডারের পরামর্শানুসারে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট, এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নিকট হেমচন্দ্রকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তির জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থের প্রতি অসাধারণ মমতা এবং মিতব্যয়িতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট মহোদয় হেমচন্দ্রের জন্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে মাসিক পঁচিশটি টাকা মাত্র পেন্সন মঞ্জুর করেন। হেমচন্দ্রকে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে পত্রে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

No 657 T. G. he 20th Jure 1900.
From E. Lister Esq.
Under Secretary to the Govt. of Bengal
General Department.
To Babu Hem Chandra Banerjee

Sir—I am directed to inform you that Her Majesty's Secretary of State for India has been pleased on the recommendation of the Government of India to grant you with effect from 1st January 1900, a pension Rs 25 per mensem in consideration of your literary merits and distresed circumstances. I am to request that you will be good enough to intimate to this office the name of the Treasury at which the pension should be paid.

এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া হেমচন্দ্র গবর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেন, তাহার শেষ ভাগে তিনি নিজে স্বাক্ষরের পরিবর্ত্তে রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিসাব বিভাগের নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হেমচন্দ্রকে এই পেন্সন প্রদত্ত হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের শেষভাগে পরিষদ-সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

Babu Hem chandra Banerjee has been regarded by his countrymen as a national poet of Bengal of exceptional excellence and the recognition of his merits at the hands of the Government will undoubtedly

encourage the cause of vernacular literature of Bengal.

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তির পরিমাণ অতি অল্প হওয়ায় অনেকের মনস্তুষ্টি হয় নাই। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পেন্সনের পরিমাণ বড়ই অল্প হইয়াছিল।" স্যর গুরুদাসের ন্যায় ব্যক্তির এই মন্তব্য গভীর অর্থ বহন করে।

কবির দারিদ্র্য কতদূর কাল্পনিক?

মধুসূদনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে রচিত কবিতায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

হায় মা ভারতী, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।

মাইকেল ও হেমচন্দ্রের জীবনের উদাহরণ দিয়া অনেকেই এই দুই ছত্র কবিতার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতীর এই বর-পুত্রদ্বয়ের প্রতি সত্যই কি কমলা বিরূপা ছিলেন? মধুসূদন ও হেমচন্দ্র কি বাণীর প্রসাদে এককালে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই? শেষ জীবনে মাইকেল ভয়ানক দারিদ্র্যকষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে তাঁহার নিজের দোষে। একবার কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে বিলাত হইতে নবপ্রত্যাগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় নিমন্ত্রিত হন এবং উভয়ের মধ্যে কথোপকথন প্রসঙ্গে মাইকেলের কথা উঠে। শুনিয়াছি মনোমোহন বলিয়াছিলেন—"যদি স্বয়ং ভগবানও চেষ্টা করেন, মাইকেলের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে পারিবেন না। মাইকেলকে আজি যদি কেহ সহস্র টাকা দেন, তাহা হইলে মাইকেল আজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার্য্য ও পানীয় প্রস্তুত করিতে আদেশ দিবেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীর ন্যায় বিলাসিতায় সমস্ত অর্থ এক রাত্রিতেই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন।" হেমচন্দ্রও অপরিমিত ব্যয় করিতেন, কিন্তু মাইকেল ও হেমচন্দ্রের চরিত্রগত প্রভেদ অনেক। মাইকেল যখন নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় আপনার সুখের জন্য নানা প্রকার বিলাসিতায় অজস্র অর্থ ব্যয়িত করিতেন, তখন পরের কথা দূরে থাকুক, নিকটতম আত্মীয় স্বজনের কথা, এমন কি তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর কথা বা পুত্র কন্যার কথাও ভাবিতেন না। হেমচন্দ্র অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেন—দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ, স্বজন আশ্রিতগণের সুখের জন্য। তিনি "চিত্ত বিকাশে" যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য!

আত্ম পর ভাবি নাই, অনন্য উপায়
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়।

হেমচন্দ্র যে দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজেরই কর্ম্মফল। কিন্তু গোল্ডস্মিথের "গ্রাম্য পুরোহিতে"র ন্যায়

Even his failings leaned to virtue's side

এবং এই জন্য হেমচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু "চিত্ত বিকাশে" হেমচন্দ্র যে লিখিয়াছিলেন "কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন," "ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই"—এ সকল কথা নিতান্ত অতিরঞ্জিত। সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ এই সকল অতিরঞ্জিত কথা আরও অতিরঞ্জিত করিয়া কবির জন্য সাহায্যভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, বার্দ্ধক্যে ভগ্নমস্তিষ্ক কবি তাঁহার বিলাসী পুত্রগণের প্ররোচনায় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাইকেলের ন্যায় তাঁহার সাধারণ্যে ভিক্ষা করিবার মত অবস্থা হয় নাই। কবি মৃত্যুকালেও যে বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার মূল্য তখনকার দিনেও অর্দ্ধলক্ষমুদ্রার কম নহে। তাঁহার শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত "রাজবোলহাটে"র তালুক কিছুদিন পূর্ব্বে ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে বিক্রয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার উইলে দেখা যায় এই সময়ে তাঁহার বৃহদায়তন আবাস-ভবন এবং চারিখানি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাটী তাঁহার অধিকারে ছিল, চৌদ্দ পনেরো হাজার টাকার কোম্পানীর

কাগজও ছিল। 'চিত্তবিকাশ' প্রকাশকালে তাঁহার লক্ষ্মণোপম সহোদর পূর্ণচন্দ্র জীবিত ছিলেন এবং কাশীতে চিকিৎসকরূপে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। অবশ্য যে ভাবে হেমচন্দ্র এতদিন কালযাপন করিতেছিলেন তাহার তুলনায় তিনি দরিদ্র হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কবি যে দারিদ্র্যের ভীষণছায়া দেখিয়া নৈরাশ্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা অনেকাংশে কাল্পনিক। যিনি চিরদিন তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে আত্মসম্মানজ্ঞান জাগ্রত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে সাধারণের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্যগ্রহণ করা নিতান্ত বিস্ময়কর। তাঁহার পরিবারবর্গের অনেকেই তাঁহার এই আচরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। উমাকালীকে লিখিত পূর্ণচন্দ্রের দুইখানি পত্র হইতে কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য :—

Benares city
July 30th 1899.

My dear Umakali

* * * As for my brother's case I did not like that his circumstances and poverty should be made known even to his dearest friends. The second time when I went down to Calcutta after the operation it was to settle the family and household expenses. I divulged a little of my mind to him but he prevented me to talk over those matters. Next morning after this he asked me to write to Ramesh Babu and Jogendra to come over to him. I believe it was to settle the family matters. Ramesh Babu came but Jogendra did not come. Before Ramesh Babu went to dada I told him that howsoever he might have been thick and thin with my brother I did not wish that my brother should disclose the secrets of his family matters to him; this point was to be settled between him and me. No outsiders are to be allowed to hear such matters. He quite approved of my words and he went to my brother and told him that I wanted to talk with him on some family matters. My brother said that speaking of such subjects would bring tears to his eyes and thus he would lose his sight. He had hopes then but I had not. I wanted to come away and from this I had reaped all sorts of abuses on my head from Jogendra. When brother came here he disclosed his circumstances before Ramesh Babu, Annada Babu and me. Ramesh Babu wanted to assist him and my brother said Baku would give him Rs. 25 or so and Jogendra told him that he would give him Rs. 8 a month. I told them that as long as I was able to earn I would not like that my brother would go begging from door to door and I undertook to bear all the expenses. Since this time I have been paying Rs. 100 a month for his family and Rs. 20 for Ishan's family and Rs. 8 for his pocket expenses here & Rs 4 for his servant Hari, besides other expeuses extras. He disclosed his circumstances without my knowledge to the public in his book চিত্ত বিকাশ and to some others. This made the public to take up his case and the Rajah of Tipperah offered to assist him with Rs 30-

a month. When the offer was made he asked me and I could not but consent to this as he himself divulged his secret. He has been getting this subscription, yet I have been regularly remitting money to Kidderpore. Fani has been drawing Rs 30 a month and he would not pay a single pice for the family. * * *

Yours obediently
Sd. Poorna ch. Banerjee.

Benares city
August 8th 1899.

My dear Umakali

* * * Since I have written to you my brother has got a further help from Maharshi Debendranath Tagore and his nephew of Rs 30 a month and Rs 10 a month from Zamindar of Santosh. Our nephew (a cousin's son) Girindranath Benarjee of Uttarpara who is a Deputy Magistrate now has agreed to help him with Rs 10 a month. Besides he has received a donation of Rs 350 or so from different parties. His mind has fallen down to a lower level from its original greatness and he does not scruple to accept anything. If I speak to him not to accept donation from certain quarters he feels sorry and dejected. Under the circumstances I had to keep within bounds. It pains me good deal for this but I cannot help. Though he has got a monthly subscription of Rs 80 besides donations I ungrudgingly meet all demands of his family and himself. It is mean of me to say so but I tell you.

Ram Ch. mitter of your Court wrote to him to raise subscription for him. Calica Das Dutt wrote to me to know all the facts of his case. I feel great humility to give out everything but when he has made it public and he wishes to have the help what could I do. It pains me to say that a signaller has sent him Re. 1.

Yours affly
Sd. Poorna Ch. Banerji.

হেমচন্দ্রের এই ব্যবহার বিস্ময়জনক বটে কিন্তু উহার কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। হেমচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার পুত্রগণের প্রতি গভীর বাৎসল্যে পূর্ণ ছিল। তাঁহার স্বজন আশ্রিতগণের অভাব দূর করণের জন্য মানী হেমচন্দ্র সকলপ্রকার অপমান ও হীনতা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। উঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অল্প বয়সেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণও উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন না, অথচ তাঁহাদের অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ইঁহাদের জন্য হেমচন্দ্রের অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের কোনও স্নেহভাজন বন্ধু একবার তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার আবাসভবনখানি বিক্রয় করিলেই অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিতে পারে। উহাতে স্বল্পমূল্যের বাটীভাড়া করিয়া অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাহাতে হেমচন্দ্রের অন্ধনয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। তিনি কাতরস্বরে উত্তর দেন, "ছেলেদের একটিকেও মানুষ করিতে পারিলাম না। তাহাদের মাথা গুঁজিবার স্থানও রাখিয়া যাইব না?" কয়েক সহস্রমুদ্রার কোম্পানীর

কাগজ ছিল, তাহাও উন্মাদিনী পত্নীর চিকিৎসা ও ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পুত্রগণ পিতার এই অপার্থিব স্নেহের প্রতিদান দিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতার দিনেও কোনও পুত্র কালীপূজা উপলক্ষে ২০০৲। ২৫০৲ টাকার বাজী পুড়াইয়াছেন। হেমচন্দ্রের নামে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা সমস্ত হেমচন্দ্র পাইতেন না, যাঁহার হাতে পড়িত তিনিই তাহা লইয়া ইচ্ছানুরূপ ব্যয় করিতেন। শেষ কয়বৎসর হেমচন্দ্র স্বহস্তে নামসহি করিতে পারিতেন না, রবার-ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতেন। শুনিয়াছি ঐ ষ্ট্যাম্পও হেমচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে অর্থসংগ্রহার্থ ব্যবহৃত হইত। হেমচন্দ্রের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা দেবী তাঁহার ভ্রাতৃগণের জন্য পিতাকে এই দীনতা স্বীকার করিতে দেখিয়া মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ হইতে পিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অবশেষে বিফলপ্রযত্ন হইয়া "আর এগৃহে আসিব না" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাগমন করেন। অভিমানিনী কন্যা সত্য সত্যই আর পিতৃগৃহে যান নাই। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সতীলোকে প্রয়াণ করেন।

বিধাতা কি উদ্দেশ্যে হেমচন্দ্রকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পাতিত করিয়া তাঁহার এইরূপ মতি গতি করিয়াছিলেন তাহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। হয়ত এই ঘটনা না ঘটিলে, বাঙ্গালীজাতির সাহিত্যপ্রেমের ও দেশের সেই পরমোপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হইত না। বলা বাহুল্য বাঙ্গালীজাতি এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, মাইকেলের প্রতি আচরণে যদি বাঙ্গালীর কোনও পাপ স্পর্শিয়া থাকে, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিতে তাহার ক্ষালন হইয়াছে। একজন অজ্ঞাতনামা সিগন্যালার হেমচন্দ্রকে একটি টাকা পাঠাইয়াছেন ইহাতে, পূর্ণচন্দ্র মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে সেই অজ্ঞাতনামা দেশবাসীর ভক্তি-জবার নিকট কুবেরের ধনরাশি নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং যে অমর লেখনী বিনিঃসৃত কাব্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছে, এই ঘটনা চিরদিন সেই শক্তিশালিনী লেখনীর গৌরব ঘোষণা করিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম-এ, কবিরত্ন প্রণীত। ঢাকা, "আশুতোষ" যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সেই নগরের "সিটি লাইব্রেরী" হইতে শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ৪০৫ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখা নাই।

এখানি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, যুগ ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ। এরূপ একখানি পুস্তক বাঙ্গালায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের গ্রন্থাধ্যক্ষ, পূর্ব্বে তিনি ঢাকা কলেজে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত, সুলেখক এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। আমরা এ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি।

বঙ্কিম বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বঙ্কিম জীবনী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জীবনী লিখিবার উপযুক্ত মাল মশলা তাহাতে বিস্তর সংগৃহীত আছে। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর এই প্রায় ৩০

বৎসর কাল নানা সাময়িক পত্রে তাঁহার স্মৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় হইতে এবং শচীশ বাবুর "বঙ্কিম জীবনী" হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অক্ষয় বাবু এই সমালোচ্য গ্রন্থখানি সজ্জিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, মোটামুটি তাহা সমস্তই এ পুস্তকে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। বঙ্কিম যুগ সম্বন্ধে—অর্থাৎ কিরূপ আবেষ্টনের মধ্যে বঙ্কিম মানুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহার বর্ণনা সূচনায় প্রদান করিয়াছেন, গ্রন্থের এই অংশটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তা, সূক্ষ্মদর্শন, রসগ্রাহিতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইতেছে।

একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবার পর কথা উঠিয়াছিল, Ivanho উপন্যাসের ছায়া লইয়া ইহা লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্ব্বে তিনি Ivanho পড়েন নাই। এই বিষয়টির আলোচনায়, অক্ষয় বাবু Ivanho ও দুর্গেশনন্দিনীর প্রধান প্রধান পাত্রপাত্রীগুলির বিস্তৃতভাবে তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বঙ্কিম Ivanhoর ছায়া লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছিলেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

মোটের উপর, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এমন একখানি সুসম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত পুস্তকের একান্ত অভাব ছিল, অক্ষয় বাবু সে অভাব দূর করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদরের আসন পাইয়াছে; বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সম্যক্ আলোচনাপূর্ণ এই গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উচ্চ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

রাণী লক্ষ্মীবাই (উপন্যাস)—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা নিউ সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত এবং ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স ঘোষ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৪৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

ইহা সিপাহী বিদ্রোহ সময়ের প্রবাসী বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন অবলম্বনে রচিত একটি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস। এই পুস্তকের একটু ইতিহাস আছে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হয়। তদানীন্তন বিখ্যাত "বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় পত্রিকায় সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের কয়েক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কোনও পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া তিনি গ্রন্থকার মহাশয়কে গ্রন্থখানি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে উপদেশ দেন, কারণ উহাতে মিউটিনি সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখিত ছিল যাহা প্রকাশিত হইলে গ্রন্থকার রাজদ্বারে বিপন্ন হইতে পারেন এরূপ আশঙ্কা ছিল। গ্রন্থকার উহার পাণ্ডুলিপিটি পোড়াইয়া ফেলিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এক বন্ধু উহা কাড়িয়া লন। এখন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, রাজকীয় মতবাদও ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাই এই ৩০ বৎসর কাল গ্রন্থখানি অজ্ঞাতবাসে যাপন করিয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

উপন্যাসের আখ্যান ভাগটি বেশ কৌতূহলজনক; ভিন্ন ভিন্ন পাত্র পাত্রীগণের চরিত্র চিত্রণেও নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু অনাথ তাহার মৃত পিতাকে "পিতাঠাকুর মহাশয় স্বর্গপুর" এই ঠিকানায় চিঠি লিখিতেছে, এই দৃশ্যে চোখের জল রাখা যায় না।

উপন্যাসের মাঝামাঝি হইতে গ্রন্থকার সুকৌশলে সিপাহী বিদ্রোহ ও ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের কাহিনী সহ, উপন্যাসোক্ত পাত্রপাত্রীগণের অদৃষ্ট গাঁথিয়া দিয়াছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বীরত্বকাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মোটের উপর বহিখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ছাপা ও বাঁধাই সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

স্বদেশ সঙ্গীত—ঢাকা, "কাশী" প্রিণ্টিং ওয়ার্কসএ মুদ্রিত এবং সেই নগরের ১৮ নং রূপচাঁদ লেন, সনাতন জাতীয় মন্দির হইতে প্রকাশিত। ডবল ফুলস্কাপ ১৬ পেজি, ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ পয়সা।

মলাটে মহাত্মা গান্ধীর একখানি ছবি এবং ভিতরে ১৩টি স্বদেশী সঙ্গীতের সংগ্রহ আছে। গানগুলি সবই উত্তম এবং সুবিখ্যাত। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সরলাদেবী প্রভৃতির গান আছে, সুতরাং সেগুলির গুণানুবাদ অনাবশ্যক। কিন্তু একটা কথা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সনাতন জাতীয় "মন্দির" কেন? মন্দির কি অপরাধ করিয়াছিল?

পাকা-রং-প্রণালী—ডাক্তার টি, এন্, চক্রবর্ত্তী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা, হেনা প্রেসে মুদ্রিত এবং ব্রাহ্মণগাঁ হোমিও রিসার্চ্চ লেবরেটরি হইতে শ্রীযুক্ত এস্, সি, ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্কাপ ১৬ পেজি, ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০

নামেই গ্রন্থের পরিচয়। রং করিবার উপাদান গুলি সমস্তই সহজে লভ্য, তবে সব গুলি এই দেশীয় নহে। যাঁহারা

একার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবস্থা গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সচিত্র বয়ন-বিজ্ঞান--শ্রীরসময় সিংহ প্রণীত। কলিকাতা চেরি প্রেসে মুদ্রিত ও বাঁকুড়া লালবাজার হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০

ঠকঠকি তাঁতে বস্ত্রাদি বুনিতে হইলে যাহা কিছু করা আবশ্যক—সূত্র র কার্য্য, টানা করা, ঢাল গুটানো, "ব" তোলা ইত্যাদি সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর বয়ন, পাচন (ডিজাইন করা) প্রভৃতিও বুঝাইয়া দেওয়া আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"যে কোনও সাধারণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি এই পুস্তকের সহিত মিলাইয়া তাঁতের কার্য্য একবার মাত্র দেখিলেই, অতি অল্প আয়াসে তিনি বয়ন কার্য্য শিখিতে পারিবেন।"

আমিয়া (কবিতাগ্রন্থ)--শ্রীরাজেন্দ্র কর প্রণীত। কলিকাতা "বাসন্তী" প্রেসে মুদ্রিত এবং ৯১নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স এ, সি, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজি ৩৬ পৃষ্ঠা মূল্য ।৵০

নানা বিষয়িণী কবিতা। সকল গুলিতেই নিতান্ত কাঁচা হাতের পরিচয়। বর্ণাশুদ্ধিও রাশি রাশি।

সাহিত্য-সমাচার

শোক সংবাদ

৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

বিগত ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার প্রবীণ সাহিত্যিক, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা, এবং পরে ওকালতি করিতেন। কিন্তু সাহিত্য সেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ইংরাজি, সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের তিনি অধিকারী ছিলেন, তাহার অনুপাতে বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কাছে অতি অল্পই পাইয়াছে বলিতে হইবে। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা; উহা বাহির হইবামাত্র তিনি সাহিত্য সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করেন। তাহার পর, তিনি আরও ২।৩ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। "সাহিত্য" ও অন্যান্য ২।১ খানি মাসিক পত্রে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল; সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। যাহা হউক, একমাত্র "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" বাঙ্গালীর মনে তাঁহার স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখিবে এমন আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মোক্ষদা" উপন্যাস প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷৵০

শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত গল্পগ্রন্থ "সুহাস" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল প্রণীত "গৌরপাণ্ডুয়া" (ভ্রমণ ও প্রত্নতত্ত্বালোচনা), দুর্গাচরণ সিরিজের ২য় গ্রন্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৸০

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত কবিতাগ্রন্থ "অগ্নিবীণা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রণীত সচিত্র শিশুপাঠ্য কবিতা (বা ছড়া) গ্রন্থ "ভজার বাঁশী" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল প্রণীত, মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ "সৌন্দরনন্দ" কাব্যের সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়পুর মহিলা

(চিত্রকর—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩২৯ | ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা

শঙ্কর-দর্শন

মুখবন্ধ

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের দর্শন আলোচনায় তাঁহার গীতা, উপনিষৎ ও বেদান্তভাষ্যই একমাত্র অবলম্বন। প্রধানতঃ তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য আলোচনা করিলেই তাঁহার দার্শনিক মত জানিতে পারা যায়।

বেদান্তশব্দের অবিকল অর্থ বেদের পরিশিষ্টভাগ। উপনিষদ্‌গুলিই বেদের পরিশিষ্টভাগ। বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। প্রবৃত্তি-লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদ্‌ভাগে উক্ত হইয়াছে। এই দ্বিবিধলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মোক্ষ। প্রবৃত্তি-মার্গ পরোক্ষভাবে ও নিবৃত্তিমার্গ প্রত্যক্ষভাবে মোক্ষ-সাধনের উপায়। নিবৃত্তিমার্গকে জ্ঞানমার্গ বলা হয়। ব্রহ্ম বা মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ উপায়স্বরূপ জ্ঞানমার্গ উপনিষদ্‌ভাগের সহিত সম্পর্কিত।

কয়েকটী প্রধান উপনিষদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দর্শনশাস্ত্রটী বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত। যে সকল অল্পাক্ষর অথচ সারগর্ভ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের অবতারণা, সেই সকল সূত্র, ব্যাসসূত্র, ব্রহ্মসূত্র বা শারীরকসূত্র নামে অভিহিত। ব্যাসসূত্র সকল চারিঅধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এবং প্রত্যেক অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক পাদ কতকগুলি অধিকরণে বিভক্ত। সূত্রসকলের সংখ্যা সর্ব্বসমেত পাঁচ-শত পঞ্চান্ন ও অধিকরণের সংখ্যা একশত একানব্বই।

বেদান্তদর্শন বর্ত্তমান সূত্রাকারে রচিত হইবার পূর্ব্বে বৈদান্তী দার্শনিকদিগের মধ্যে বেদান্তদর্শনের খুঁটিনাটি লইয়া বিরোধ ছিল। বাদরায়ণই তাঁহার সূত্রে সাতটী প্রাচীন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সে সাতটী মতের নাম-- আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরি। এই মতগুলি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

মূল সূত্রগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। টীকা বা ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হইবার নহে। ব্রহ্মসূত্রের একজন প্রাচীন বৃত্তিকারের নাম বোধায়ন। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থসংগ্রহে এই বোধায়নের বচন প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বেদার্থসংগ্রহে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দী ও ভরুচি নামক ছয়জন পূর্ব্বাচার্য্যের নামও করিয়াছেন, মতও দিয়াছেন। বৃত্তি নামক, ব্রহ্মসূত্রের আর একটী প্রাচীন ব্যাখ্যাসূচক টিপ্পনী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। উপবর্ষ নামে, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার প্রাচীন টীকাকারের নামও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের টীকাকার ও ভাষ্যকারদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, শারীরক-মীমাংসাভাষ্য নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-মীমাংসাভাষ্যেরও আবার অনেক টীকা লিখিত হইয়াছে। শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যের টীকাকারদিগের মধ্যে, মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামি-শিষ্য বাচস্পতিমিশ্রই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার টীকা ভামতী-নিবন্ধ বা শারীরকভাষ্য-বিভাগ নামে অভিহিত।

অমলানন্দ-(ব্যাসাশ্রম) রচিত বেদান্তকল্পতরুতে বাচস্পতির ভামতীটীকার ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। অপ্যয়-দীক্ষিত-প্রণীত বেদান্তকল্পতরুপরিমলে আবার তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বৈদ্যনাথ ভট্ট-প্রণীত বেদান্তকল্প-তরুমঞ্জরীতে তাহার আবার সংক্ষেপব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এ ছাড়া শাঙ্করভাষ্যের উপর আরও দুইটী উল্লেখ-যোগ্য টীকা লিখিত হইয়াছে, সে দুইটী, গোবিন্দানন্দ-শিষ্য রামানন্দ সরস্বতী প্রণীত ভাষ্যরত্নপ্রভা ও রামানন্দতীর্থ-শিষ্য অদ্বৈতানন্দ-প্রণীত ব্রহ্মবিদ্যাভরণ। দেবেশ্বর-শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিও 'সংক্ষেপ শারীরকে' সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বেদান্তের উপর আরও অনেক টীকা ও গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখ-যোগ্য :—ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভবদেব মিশ্রপ্রণীত বেদান্তসূত্র-ভাষ্য-চন্দ্রিকা, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-প্রণীত বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী, রঙ্গনাথ-প্রণীত ব্যাস-সূত্র-বৃত্তি, রামানন্দ-প্রণীত সুবোধিনী বা ব্রহ্মসূত্রবর্ষিণী, ধর্ম্ম-রাজদীক্ষিত-প্রণীত বেদান্তপরিভাষা, ও সদানন্দ-প্রণীত বেদান্তসার নামক গ্রন্থও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। * শঙ্করাচার্য্যও স্বয়ং উপদেশসহস্রী নাম দিয়া শ্লোকা-বলিতে সংক্ষেপে বেদান্তদর্শন লিখিয়াছেন। রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, ভট্টভাস্কর, মধ্বাচার্য্য, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এক এক জন এক একটী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহারা বেদান্তের উপর সুন্দর সুন্দর ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রধানতঃ শঙ্কর-মতের বিরোধী।

শঙ্কর ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের মধ্যে প্রধানতঃ নয়টী ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। আচার্য্য রামানুজ (শ্রীবৈষ্ণব) একাদশ শতকের শেষপাদে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য্য (মাধ্ব) দ্বৈতবাদী। কেহ কেহ ইঁহার মতকে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদও বলেন। ইনি ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সূত্রভাষ্য রচনা করেন। বিষ্ণুস্বামীও দ্বৈতবাদী। ত্রয়োদশ শতকে ইনি বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অনুকূল "ব্রহ্মসূত্রভাষ্য" লেখেন। শ্রীনিবাস (নিম্বার্ক) ভেদা-ভেদবাদী। ইঁহার বেদান্তকৌস্তুভ ত্রয়োদশ শতকে রচিত হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ চতুর্দ্দশ শতকে শৈবভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য ষোড়শ শতকে ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য নামে বল্লভসম্প্রদায়-যোগ্য ভাষ্য করেন। শ্রীপতি (লিঙ্গায়ত) শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দিক্ দিয়া "শ্রীকরভাষ্য" প্রকটিত করেন। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী শুক (ভাগবত) 'শুকভাষ্য' রচয়িতা। 'শ্রীকর'

---

* এগুলি ছাড়া বিজ্ঞানভিক্ষু বা বিজ্ঞানযতির "বিজ্ঞানামৃত বা ব্রহ্মসূত্র ঋজুব্যাখ্যা" আছে। মুকুন্দগোবিন্দ-শিষ্য রামানন্দ 'ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী' লিখিয়াছিলেন। সদাশিবপুত্র গঙ্গাধর মহাডকর "সুবোধিনী বা শারীরক সূত্র সারার্থচন্দ্রিকা"র রচয়িতা ছিলেন। তিরুমলপুত্র অন্নম্ ভট্ট "মিতাক্ষরা" নামক ভাষ্য করেন। আনন্দতীর্থ (মধু বা মধ্ব) ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী-শিষ্য স্বয়ম্ প্রকাশানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছিলেন "বেদান্ত নয়ন ভূষণ", আর আনন্দপূর্ণ মুনি (অভয়ানন্দ-শিষ্য বিদ্যাসাগর) লিখিয়াছিলেন "সমন্বয়সূত্রবৃত্তি।" ১৮২৪ বিক্রমাব্দে মরাঠী পণ্ডিত ভৈরব দীক্ষিততিলক ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি রচনা করেন।

ও 'শুক্লভাষ্যের" সময় এখনও নির্ণীত হয় নাই। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বলদেব জীবগোস্বামি-প্রতিপাদিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদের দিক্ দিয়া "গোবিন্দভাষ্য" সঙ্কলন করেন।

প্রধানতঃ যে সকল উপনিষদ্ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শনের অবতারণা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, বাজসনেয়ী, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, তলবকার, মাণ্ডুক্য, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে (১) 'ঐতরেয়' ঋগ্বেদের 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। ইহা ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিটী পাদে সম্পূর্ণ। (২) বৃহদারণ্যক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। মাধ্যন্দিন শাখামতে ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশকাণ্ড। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম চারিটিতে বৈদান্তিক আলোচনা আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থের অর্থাৎ সমগ্র উপনিষদের সারাংশ সন্নিবেশিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল এই ছয় অধ্যায়ে তাহাদের উত্তরে তিনি ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইগুলিতে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ব্রহ্মবেত্তাদিগের কথোপকথন সন্নিবেশিত আছে। (৩) ছান্দোগ্য একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপনিষৎ, ইহা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক কথোপকথন ও বিচার বিতর্কাদিতে পরিপূর্ণ। (৪) তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ-বিভাগের অংশবিশেষ। ইহা শিক্ষা, ব্রহ্মানন্দ ও ভৃগু এই তিন বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম বল্লীতে জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বল্লীতে নিছক উপদেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসু শিষ্য কি ভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞানের সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করিবেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। (৫) মুণ্ডক উপনিষদে শৌনকের বিশ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরার উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থ তিন মুণ্ডকে বিভক্ত, এবং প্রতি মুণ্ডক দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে পরম পুরুষের স্বরূপ ও তাঁহার গুণ বর্ণিত আছে। পরমাত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, কি উপায়ে মানুষ পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে পারে, প্রভৃতি বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। (৬) কঠোপনিষৎ দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে তিনটী করিয়া বল্লী। যম ও নচিকেতার পরস্পর কথোপকথন ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। (৭) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক কথা এবং অন্যান্য বিষয়ও সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতেও ছয়টী অধ্যায়।

উপনিষৎ সকল প্রধানতঃ পরমাত্মা, জীব, জগৎ প্রভৃতি বিষয়ে বিচার বিতর্কাদিতে পরিপূর্ণ। বেদান্ত-দর্শন এই সকল উপনিষদের মীমাংসা।

বেদান্তের সার মর্ম্ম এই যে, একমাত্র পরমাত্মাই সৎ, আর সমস্তই অসৎ। পরমাত্মা জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। একমাত্র পরমাত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং বহু হইলেন (ছান্দোগ্য)। সুতরাং তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। তিনি সাংখ্য-নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির ন্যায় অচেতন নহেন। সাংখ্যমতে জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে, কিন্তু বেদান্তমতে জগতের সৃষ্টি পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতে। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি জগতের জ্ঞানময় কারণ ও আনন্দঘন। তাঁহার প্রশ্বাসে জগতের উৎপত্তি, ও নিঃশ্বাসে জগতের প্রলয়। তিনি প্রাণ, তিনি জ্ঞানময় পুরুষ, তিনি অমৃতস্বরূপ ও আনন্দঘন (ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি)। "ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সকল পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যময় ও মুক্ত।" উপনিষদে বর্ণিত আছে, "ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ও সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছেন। তিনি সকল বস্তু ও ব্যাপারে গূঢ় সন্নিবিষ্ট ও তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা।"

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

এইটী ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী মন্ত্র। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জগৎ পূর্ব্বে বিশুদ্ধ এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ ছিল। অর্থাৎ পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। এই জগৎ এখন আছে, কিন্তু পূর্ব্বে ছিল না। সেই অখণ্ড

এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি। ঐতরেয় উপনিষৎ অন্য কথায় ঠিক একই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ঐতরেয় উপনিষদের মন্ত্র, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা ছিল। পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাণ্ডুক্যোপনিষদের একটী মন্ত্র এই যে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" এই আত্মা ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূচিত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তাৎপর্য্যও তাহাই। ছান্দোগ্যের মন্ত্র, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" হে শ্বেতকেতু! তুমি তাই, অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। এই উপনিষদ্‌ই পুনরায় বলিতেছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকল উপনিষদ্‌ই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সকল উপনিষদ্‌ই একবাক্যে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পারমার্থিক ভাবের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, এবং বেদান্ত-দর্শন তাহারই মীমাংসা করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তভাষ্য অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে শাঙ্করভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই আছে; সত্তামাত্রই বস্তু। সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্ম, তিনি পরমাত্মা ও চৈতন্য-স্বরূপ। তবে এই যে জগতের ও জীবের সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা অবিদ্যা-বশতঃই হইতেছে। অবিদ্যাকে শঙ্কর ভ্রম বা অজ্ঞান অর্থেই বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক অন্য কিছুই নাই, তবে যে আত্মা ছাড়া অন্য কিছুর সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে তাহা অবিদ্যাজনিত মিথ্যা অধ্যাসবশতঃ হইতেছে। জগৎ নাই, জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যার অধ্যাসই আত্মায় জগদ্ভ্রমের কারণ। শঙ্করাচার্য্য এই অধ্যাসটী সর্ব্বপ্রথমে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাঁহার অধ্যাস ভাষ্যের আলোচনা না করিলে, তাঁহার মতটী ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

অধ্যাস শব্দের অর্থ মিথ্যা আরোপ। যাহা যাহা নয়, তাহাতে তাহার গুণের আরোপকেই অধ্যাস বলে। শুক্তি ও রজত পৃথক্। উহাদের মধ্যে একের গুণ অন্যের গুণ হইতে পৃথক্। রজতের গুণ শুক্তির উপর আরোপিত হইলে, শুক্তিতে রজত-ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ শুক্তিতে রজতের গুণ সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। আমরা ভ্রমবশতঃ, শুক্তির উপর রজতের গুণের মিথ্যা আরোপ করিতে পারি, এবং তাহার ফলে শুক্তিতে রজত-ভ্রম হইতে পারে। ইহারই নামান্তর অধ্যাস। এইরূপ অধ্যাস-বশতঃই ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অধ্যাস হইতে পারে কি না, ইহাই প্রথমে বিবেচ্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ জড়। চৈতন্যের উপর জড়ত্বের অধ্যাস হইতে পারে কি না? শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথমে দেখাইতেছেন, হইতে পারে না। জড়ত্ব ও চৈতন্য, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মাপন্ন। যেমন আলোকের অন্ধকারের উপর ও অন্ধকারের আলোকের উপর মিথ্যাধ্যাস অসম্ভব, সেইরূপ জড়ত্বের চৈতন্যের উপর, ও চৈতন্যের জড়ত্বের উপর মিথ্যাধ্যাস সম্ভব হয় না।

শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া অধ্যাস অসম্ভব দেখাইয়া, পরে দেখাইতেছেন যে যুক্তিতে অসম্ভব হইলেও কার্য্যতঃ অধ্যাস সম্ভব হইয়াছে। জড়ত্ব ও চৈতন্য এ উভয়ের পরস্পরের উপর পরস্পরের অধ্যাস অনাদিসিদ্ধ। যাহা অনাদিসিদ্ধ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাহা বিষয়, তাহাই জ্ঞান-গোচর হইতে পারে; যাহা কখনই বিষয় নহে, তাহা কখনই জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। বিষয় ও বিষয়ী অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে একের অভাবেই অন্যের ভাব হইয়া থাকে। ইহাদের পরস্পরাধ্যাস কেমন করিয়া হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আত্মা যে একান্তই অবিষয় তাহা নহে। অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা অবিদ্যা-কল্পিত হইয়া অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মায় পরিণত হন। জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ইহাতে

স্বীকৃত হয় না। জীবভাব পরমাত্মায় অধ্যস্ত হয়, এই মাত্র। শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসভাষ্যের সংক্ষেপ-মর্ম্ম এই। বিস্তৃতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার অধ্যাসভাষ্য আমরা পরে আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে দর্শন-শাস্ত্রের বিষয় কি, বেদান্তদর্শনের অবতারণার উদ্দেশ্য কি, আত্মা বলিতে কাহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, অবিদ্যা কাহাকে বলে ও অবিদ্যা কয় প্রকার, অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করে, বৈদান্তিকদিগের এবিষয়ে মতদ্বৈধ কি, ব্রহ্মের লক্ষণ কি এবং কয় প্রকার, লক্ষণ বলিতে কি বুঝা যায়, বস্তু কাহাকে বলে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত না বিকার, শাস্ত্রমতে বিবর্ত্ত ও বিকারের অর্থ কি—এই সকল বিষয়ে দু এক কথা বলিতে চেষ্টা করিব। এ সমস্ত বিষয় দু'এক কথায় আলোচনা চলে না, তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে কিছু ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিব। অধ্যাসভাষ্য বুঝিতে হইল পূর্ব্বে এই সকলের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসভাষ্যটী বড়ই উপাদেয় বিষয়। একদিকে যেমন উপাদেয় অপর দিকে সেইরূপ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। এই অধ্যাসভাষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। বেদান্ত-দর্শন গভীরতায় সমুদ্র-সদৃশ। প্রধান প্রধান দার্শনিকবৃন্দ, ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, গম্ভীর গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ মাত্র করিতে পারি। পৃথিবীতে যত প্রকার দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া অসীম প্রতিভাশালী ভাষ্যকারগণ সেই সমস্ত চিন্তার পরাকাষ্ঠা সাধন করিয়াছেন। দর্শন সম্বন্ধে মনুষ্য-চিন্তা যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, বেদান্তদর্শন-প্রণয়নে ততদূরই অগ্রসর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন না করা যায়, বোধ হয় দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ণ সার্থকতা হয় না। মানব-মনের যে কতদূর সূক্ষ্ম চিন্তা সম্ভব, তাহা বেদান্তালোচনায় প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য। যে সকল মনীষিবৃন্দ বেদান্তালোচনা করিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদিগেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। আমরা একটীও নূতন কথা বলিবার যোগ্য নহি, এবং নূতন কথা বলিবার কিছু আছে বলিয়া, আমরা বিবেচনাও করি না। এমন কি উপমা স্থলে, তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত রজ্জু, সর্প, রজত, শুক্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিবারও প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এই সকল উপমার যে স্থলে তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাদিগের সে স্থলে সেরূপ ব্যবহারের ত্রুটি হইলে সৌন্দর্য্যহানি দোষ সংঘটনের সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট্ জ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং সেই কারণেই তাঁহাদের তত্ত্বা-লোচনায় যতটুকু ত্রুটি হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক, এখন আমাদের পথ যেরূপ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, যদি তাঁহাদের পথ সেরূপ পরিষ্কার করিয়া দিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা আমরা যে আশা করিতে পারিতাম, তাহা স্মরণ করিলে দুঃখার্ণবে পতিত হইতে হয়। তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, যদি তাঁহারা তত্ত্বালোচনার পথে বিচরণ-কালে, আধুনিক বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক পাইতেন, তাহা হইলে, পাশ্চাত্য কোন দার্শনিকই যে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিতেন তাহা সংশয়ের বিষয়। তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন পথে, তত্ত্ব-পথের পথিক হইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহারা যেরূপ বিস্ময়-জনক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে সমধিক গৌরব-জনক। এসম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বলিব না। একথার উত্তর আমরা যথাস্থানে দিব। স্বীকার করি আজ বিজ্ঞান চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া জড়ের সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া শক্তিতত্ত্ববাদে উপনীত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিক শক্তির মূলে প্রবৃত্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সৃষ্টির মূলে চৈতন্যসত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বহুত্বের মূলে একত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত। তাই বলিয়া আজ গৌতম, কণাদ, কপিল পশ্চাতে পড়িয়াছেন, একথা বলিতে পারিব না। যাহা হউক আমরা প্রসঙ্গক্রমে বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রস্তাবিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সংশয় হইতে নির্ণয়ের প্রবৃত্তি হয়। আত্মার সম্বন্ধে নির্ণয়ের প্রবৃত্তির জন্য আত্মার সম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র আত্মার সম্বন্ধে নির্ণয়। যদি আত্মার সম্বন্ধে সংশয় না থাকে, তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজনীতা থাকে না। প্রথমে দেখিতে হইবে আত্মার সম্বন্ধে সংশয় আছে কি না। বলা যাইতে পারে প্রাণিমাত্রেই 'অসন্দিগ্ধ . আত্মজ্ঞানী।' সকলেই 'আমি' 'আমি' করে,—সকলেই 'আমি' বলিয়া আপনাকে জানে, অন্ততঃ মনুষ্যমাত্রেই আপনাকে জানে, 'আমি' বলিয়া আপনাকে অনুভব করে যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, তবে আর নির্ণয়ের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে মানুষ আপনার 'অব্যভিচরিত স্থিরতর রূপটী' জানে না। যদি তাহা না জানে তাহা হইলে তাহার আত্মা সম্বন্ধে সংশয় আছে বুঝিতে হইবে। মানুষ একবার বলে আমার দেহ, আবার বলে আমি অসুস্থ। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, মানুষ একবার মনে করে, আমি দেহ নহি—দেহ আমার; আর একবার মনে করে দেহই আমি। আমি অসুস্থ বলিলে আমার দেহের অসুস্থতা বুঝায়, আমি খঞ্জ বলিলে আমার দেহের খঞ্জতা বুঝায়। কিন্তু মানুষ যখন বলে আমি অসুস্থ, আমি খঞ্জ, তখন সে দেহ ও আত্মাকে একই বস্তু মনে করে। আমি-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন হইলে এরূপ মনে হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে মানুষের সংশয় আছে। এই সংশয় বিদূরিত করিবার জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের অবতারণা। অনেকে বলিতে পারেন,—মানুষ যখন 'আমার দেহ' বলে, তখন তাহার দেহ ও আত্মার পার্থক্যজ্ঞান থাকে। ইহা তো বেশ বুঝিতে পারা যায়। আবার যখন সে বলে, আমি অসুস্থ বা আমি খঞ্জ, তখন ভাষাতেই সে কথা বলে, কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিয়া থাকে যে তাহার দেহই অসুস্থ বা তাহার দেহই খঞ্জ; সুতরাং মানুষ নিঃসংশয়িত ভাবে আত্মজ্ঞানী। এরূপ স্থলে আত্মজ্ঞান-উপদেশ-পক্ষে বেদান্তের অবতারণার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি অসুস্থ, এইরূপ-ভাব প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখের অতীত। প্রকৃত আত্ম-জ্ঞান হইলে, সুখ দুঃখ প্রভৃতির ভাব-বিবর্জ্জিত অবস্থায় আত্মাকে দেখিতে হয়। অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে পৃথক্ অবস্থায় আত্মাকে না দেখিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় না। আমরা সাধারণতঃ আত্মাকে সেরূপ ভাবে দেখি না। বেদান্ত সেইরূপভাবে আত্মাকে দেখিতে উপদেশ দেয়।

আমি সুখী বলিতে বুঝা যায় যে আমার সুখ আছে। আমার সুখ আছে বলিতে বুঝিতে হয় যে, সুখ এবং আমি পৃথক্। দুঃখ আসিলে আমার সুখ থাকে না, অর্থাৎ তখন সুখ হইতে আমি পৃথক্ হইয়া পড়ি। সেইরূপ সুখ আসিলে আমার দুঃখ থাকে না, অর্থাৎ তখন দুঃখ হইতে আমি পৃথক্ হইয়া পড়ি। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, আমি সুখ-দুঃখের অতীত। এক বিষয়ের জ্ঞান উপস্থিত হইলে, আমার অন্য বিষয়ের জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমার জ্ঞান হইল বলিতে বুঝা যায়, আমার কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান হইল। আমার এক বিষয়ের জ্ঞান আসে, আর এক বিষয়ের জ্ঞান চলিয়া যায়। সকলই (সকল জ্ঞানই) যাতায়াত করে, কিছুই স্থির থাকে না। সুতরাং জ্ঞান হইতেও আমি পৃথক্, অর্থাৎ আমি জ্ঞানেরও অতীত। আমি কি আমাকে এইভাবে জানি? যদি আমাকে আমি এইভাবে না জানি, তাহা হইলে আমি আত্মজ্ঞানী হইলাম কেমন করিয়া?

আত্মা সকল বিষয়ের অতীত। কিন্তু অবিদ্যা-প্রভাবে আত্মা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। অবিদ্যা জিনিষটা কি? বেদান্তমতে অবিদ্যা অজ্ঞান বা ভ্রম। অজ্ঞান বলিলে তাহার মূলে জ্ঞান বুঝিতে হয়। পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞান হইতে পারে না। অজ্ঞানের দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। এক অর্থে অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের একান্ত অভাব বুঝায়। তাহা চৈতন্যের বিরোধী। যেমন প্রস্তর সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞান, অর্থাৎ

প্রস্তর জড়। আর এক অর্থে অজ্ঞান বলিলে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বুঝায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। এইরূপ অজ্ঞান ও ভ্রম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবিদ্যা বলিতে এইরূপ অজ্ঞান বা ভ্রম বুঝায়।

যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া 'আমি' জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের অতীত বলিতে, আত্মা জড় একথা বুঝায় না। আত্মা বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা জ্ঞানের অতীত, একথার অর্থ, আত্মা ব্যাবহারিক জ্ঞানের অতীত। কিন্তু আত্মার সহিত পারমার্থিক জ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ। আত্মা সুখ ও দুঃখের অতীত একথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে একথা বুঝায় না যে, আত্মার আনন্দ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা 'সচ্চিদানন্দ'। কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনটি পৃথক্ পদার্থ নহে। সৎ, চিৎ, ও আনন্দ পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইহাদের একের সহিত অপর দুইটীর সম্বন্ধ নিত্য, অর্থাৎ একটীকে ছাড়িয়া অপর দুইটী থাকিতে পারে না। আমাদের ব্যাবহারিক জগতের সুখ ও পারমার্থিক আনন্দে বিশেষ প্রভেদ আছে। ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞান ও সুখ কল্পিত ও অনিত্য। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান ও আনন্দ, চৈতন্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অবিদ্যা বলিতে যে অজ্ঞান বুঝায়, তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। বস্তুতঃ আমাদের যতকিছু জ্ঞান হয় তাহা পরমাত্মাকে অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। কারণ তিনি ছাড়া অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের বহির্ভাগ হইতে আমাদের কোন জ্ঞানই আসিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা তাঁহারই অংশবিশেষ। তিনি অখণ্ডস্বরূপ অনন্ত-জ্ঞানাধার, আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে জানিতে গিয়া ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বশবর্ত্তী হই। শ্রুতি ব্রহ্মাকে অবিভক্ত অখণ্ডসত্তা বলিয়াছেন, আরও বলিয়াছেন যে তিনি বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। এই যে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, তাহা মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে।

বৈদান্তিকদিগের মতে অবিদ্যা দ্বিবিধ। একটীকে মূলাবিদ্যা ও অপরটীকে তুলাবিদ্যা বলা হয়। মূলাবিদ্যা জগতের উপাদান কারণ ও তুলাবিদ্যা মিথ্যা-জ্ঞান জন্য সংস্কার। অবিদ্যাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ব্রহ্ম স্বভাবতঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি ব্রহ্ম হইতে সম্ভবপর নহে।

আমরা আপাততঃ জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি। সকল মনুষ্যই আপন আপন অস্তিত্বের সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করে। বৈদান্তিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবরণাচার্য্য, সংক্ষেপ-শারীরক-কার প্রভৃতি বৈদান্তিকেরা জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

তাঁহাদের বিবেচনায় ব্রহ্ম যেমন অবিদ্যার আশ্রয়, তেমনই তিনিই আবার অবিদ্যার বিষয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মই জীব-ভাবাপন্ন হন, এবং তিনি স্বয়ংই সেই জীব-ভাবাপন্ন নিজের বিষয় রূপে পরিণত হন। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ তাঁহার সেই অবস্থায় আপনাতেই জগদ্ভ্রম হয়। শ্রুতির মন্ত্রও আছে, 'তত্ত্বমসি,' 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ইহার তাৎপর্য্য, জীবই ব্রহ্ম। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে যে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। যদি জীব ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ না থাকে, আর যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তাহা হইলে, জীবভাবও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এই মিথ্যাভাব প্রতীয়মান হইবার কারণ যথার্থ জ্ঞানের অভাব। যথার্থ জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান, মায়া বা অবিদ্যা নামে অভিহিত। যখন অবিদ্যা চলিয়া যায়, তখন জীবত্ব ও জগদ্ভাব তিরোহিত হয়। তখন ব্রহ্ম একাকীই অবস্থান করেন।

বাচস্পতি-মতে জীবই অবিদ্যার আশ্রয়, এবং ব্রহ্ম অবিদ্যার বিষয়। অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিলে, রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ, জীবের ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে।

বিবরণাচার্য্য প্রভৃতির মত, ব্রহ্মের জীবভাব যে

অজ্ঞান নিবন্ধন, ইহা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। সুতরাং জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞান জীবের পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকিলে, অজ্ঞাননিবন্ধন জীবভাব হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন শ্রুতির মতে, অজ্ঞানই জীবত্বের প্রয়োজক। এরূপ স্থলে অজ্ঞানের সত্তা যে জীবের পূর্ব্বে আবশ্যক ইহা মানিতেই হইবে।

কিন্তু বাচস্পতি মতাবলম্বীরা বলেন, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অনাদি। তাঁহারা এসম্বন্ধে বৃদ্ধোক্তকারিকার বচনও উদ্ধৃত করেন,—'জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ'।

অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ, এই ছয়টী (বেদান্তিগণের মতে) অনাদি। উল্লিখিত বৃদ্ধোক্তকারিকা, বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং বলিতে হইবে, ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ যেমন অনাদি, জীবের সম্বন্ধও সেইরূপ অনাদি, এবং ইহা বিবরণাচার্য্য প্রভৃতিরও মত।

অজ্ঞান নিবন্ধনই যে জীবভাব, এমন কিছু নহে। জীবভাব অনাদি কালাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং অবিদ্যার যে ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে, 'এমন কথা নহে। সকলই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে; এ কথা সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম সকলেতেই অনাসক্ত। গীতা যে শ্রুতিপ্রতিপাদক শাস্ত্র, তাহা সকলেই জানেন। গীতা ব্রহ্মকে এই ভাবে বুঝিয়াছেন,—'অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভক্তৃ চ।' তিনি সকলেরই পোষণ-কর্ত্তা, গুণেরও তিনি পোষক, কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাসক্ত। এরূপ স্থলে জীবই যে অজ্ঞান বা অবিদ্যার আশ্রয়, একথা বলা অসঙ্গত নহে।

যদি বলা যায়, অজ্ঞানের আশ্রয় জীব, এবং ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়রূপে জগদ্রূপে পরিণত, তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শুক্তি স্বরূপতঃ রজত নহে, কিন্তু রজত রূপে প্রতীত হইতে পারে। সেরূপ স্থলে রজতকে যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীত হয় বলিয়া, জগৎকেও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলা যাইতে পারে। বস্তুর স্বরূপ বোধ না হইয়া, বস্তুর সম্বন্ধে অন্য যাহা বোধ হয়, তাহাই বস্তুর বিবর্ত্ত। শাস্ত্রেও তাহাই বলে, যথা, 'অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ'।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বটে, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে। বিকার ও বিবর্ত্ত এক নহে। বস্তুর স্বরূপান্তর প্রাপ্তির নামই বিকার। শাস্ত্রও তাহাই বলে, যথা, 'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ'। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে দধিকে দুগ্ধের বিকার বলা যাইতে পারে। জগৎকে ব্রহ্মের বিকার না বলিয়া যদি বিবর্ত্ত বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোনরূপ বিকার বা পরিবর্ত্তন হয় না বুঝিতে হইবে। শুক্তি যেমন রজতরূপে প্রতীয়মান হইলে শুক্তির স্বরূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপান্তর ঘটে না। ব্রহ্ম যেমন তেমনই থাকেন, কেবল একটী মিথ্যা অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অপরিণামী, শাস্ত্রেও তাহা উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা নহেন। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মের একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের দুইটী লক্ষণ কথিত হইয়াছে। একটী তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ, অপরটী তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম অপরিণামী, সুতরাং কোন কিছুর কারণ নহেন।

সৃষ্ট্যাদির কারণ ব্রহ্ম নহেন; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। বেদান্ত-পরিভাষায় তটস্থ লক্ষণ এইরূপে কথিত হইয়াছে;—'তটস্থলক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্যকালম্ অনবস্থিতত্বে সতি যদ্ ব্যাবর্ত্তকং তদেব, যথা গন্ধবত্ত্বং পৃথিবীলক্ষণম্। মহাপ্রলয়ে পরমাণুষু উৎপত্তিকালে ঘটাদিষুচ গন্ধাভাবাৎ'—

যাহাকে লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়, তাহাই লক্ষ্য। সুতরাং বস্তুই লক্ষ্য। বস্তুকে যাহা দ্বারা বুঝা যায়, তাহাই লক্ষণ। বস্তু মাত্রই কোন না কোন লক্ষণাক্রান্ত।

বস্তুতঃ লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বস্তুকে বুঝিয়া থাকি। যেখানে পৃথিবী লক্ষ্য সেখানে গন্ধই তাহার লক্ষণ। জলাদি হইতে পৃথিবী ভিন্ন, ইহা আমরা পৃথিবীর গন্ধবত্ব লক্ষণ দ্বারাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যাবৎকাল পৃথিবী থাকে, পৃথিবীর গন্ধবত্ব তাবৎকাল থাকে না। উৎপত্তিকালে ঘটাদিতেও গন্ধ থাকে না, মহাপ্রলয়ে পরমাণুসমূহেও গন্ধ থাকে না। সুতরাং গন্ধবত্ব লক্ষণ পৃথিবীর স্বরূপ লক্ষণ নহে, ইহা পৃথিবীর তটস্থ লক্ষণ। যাবৎকাল স্থিতি, তাবৎকাল যে লক্ষণ থাকে না, সে লক্ষণকে স্বরূপ লক্ষণ বলা যাইতে পারে না। তাহা বস্তুর তটস্থ লক্ষণ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে, কারণ তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব স্বরূপতঃ নাই—যেহেতু তিনি কোন বস্তুর কারণ নহেন।

এই সমস্ত ও এইরূপ বিষয় লইয়া বলিবার কথা যথেষ্ট আছে। সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন হিসাবে মুখবন্ধে কয়েকটী প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্র করা হইল। বিশেষ ও বিস্তৃত আলোচনা বিশেষ বিশেষ বিষয় আলোচনার সঙ্গে করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আলেকজান্দ্রার পীড়া।

অশ্রুকুমারের বাটী ফিরিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

সৌদামিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আজ এত দেরী হল কেন? তুমি একদিনও ত এত দেরী করে আস না!"

অশ্রুকুমার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা সৌদামিনীর অধর ধরিয়া কহিল, "তোমার মুখটি এমন শুকিয়ে গেছে কেন, সদু? এখনও কিছু খাওনি বুঝি?"

সৌদামিনী প্রেম-গর্ব্বে স্বামীকে দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "না।"

অশ্রুকুমার জানিত যে স্বামীকে না খাওয়াইয়া পতিব্রতা সৌদামিনী কখনও আহার করে না; তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সৌদামিনী আপন বিলোল নয়ন আনত করিয়া কহিল, "তোমার যে খাওয়া হয় নি।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার খাওয়া না হ'লে, তোমার কি খেতে নেই?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি স্বামীর দিকে নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ছিঃ!"

ঐ ক্ষুদ্র "ছিঃ" কথাটির ভিতর যে গভীর দাম্পত্য-শ্লীলতা নিহিত ছিল তাহা তোমরা আমাদের এই ভারত ব্যতীত কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। কিন্তু কি পরিতাপ! এক্ষণে এই মধুর শিষ্টাচার আমাদের এই পুণ্যময় দেশ হইতেও লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রণয়িনীর এই মহৎ শিষ্টাচরণের এখন নাম হইয়াছে 'পরাধীনতা'। স্বামীকে পর ভাবিয়া যে প্রেমময়ীগণ আপনাদিগকে পরাধীনা মনে করেন, এক্ষণে তাঁহারা এই পবিত্র শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে, তীক্ষ্ণধার খড়্গের ন্যায়, যে লেখনী সকল সঞ্চালন করিতেছেন, আমাদের শঙ্কা হয় এই লেখনীর আঘাতে কামিনীর সমস্ত কমনীয়তা, সমস্ত শ্লীলতা, সমস্ত পাতিব্রত্য সমূলে নির্ম্মূলিত হইবে। ভগবান! তুমি এ দুর্দ্দিন দূরে রাখিও।

অশ্রুকুমার অতি অল্পকাল মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইল। বলাবাহুল্য তাহার স্নানাহারের কখনই বিলম্ব হইত না।

তাহার পর সৌদামিনী অতি সত্বর আহার সমাপ্ত করিয়া, তাম্বুলরাগে রক্তাধর রঞ্জিত করিয়া, এবং অধরোষ্ঠের দ্বারা একটি সদ্যস্ফুট সৌরভময় অপার্থিব পুষ্প রচনা করিয়া স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল;—যেন একটি মধুরতা আর একটি মধুরতার সহিত মিলিত হইল।

অশ্রুকুমার মুগ্ধনেত্রে সৌদামিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আমি এখনি আবার একটা কাযের জন্যে পার্ক ষ্ট্রীটে যাব; আলেকজান্দ্রার সঙ্গে দেখা করা দরকার হয়েছে।"

কি দরকারে সুন্দরী ও যুবতী আলেকজান্দ্রার সহিত স্বামী সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে, অন্য স্ত্রী হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু সৌদামিনী সে কথা স্বামীকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই; এখনও করিল না। সে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কখন আসবে?"

আমি বৃদ্ধ লেখক, আমি আমার কন্যাস্থানীয়া পাঠিকাগণকে যদি একটা উপদেশের কথা বলি, আমার মনে হয়, তাহাতে তাঁহারা রাগ করিবেন না। আমার বিশ্বাস, আমার পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই, সৌদামিনীরই মত, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস লইয়া সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি এমন কোন দুঃখিনী থাকেন, যাঁহার অন্তর মধ্যে অবিশ্বাস বা সন্দেহের ছায়া পতিত হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে সৌদামিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। যে হৃদয় স্বামীর প্রতি বিশ্বাস বহন করে, তাহা নিয়ত নন্দনের ন্যায় প্রফুল্ল থাকে। মনে রাখিও, আপনি প্রফুল্ল বা পরিতুষ্ট না থাকিলে আমরা কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারি না; প্রফুল্লতাই স্বামী-পূজার শ্রেষ্ঠ প্রসূন।

অশ্রুকুমার সৌদামিনীর প্রশ্ন শুনিয়া কহিল, "আমার একটুও দেরী হবে না। আলেকজান্দ্রাকে এক জায়গায় পাঠিয়ে আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবো। পাঁচ হাজার টাকা পণ সংগ্রহ করতে না পারায় একটি ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না বলে আলেকজান্দ্রা আমার কাছ থেকে কাল টাকা নিয়ে গিয়েছিল। আজ হটাৎ জানতে পারলাম যে কৃষ্ণবাবু নামে একটী ভদ্রলোক পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়ে শোভাবাজারের এক মাতালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। তিনি হয়ত মেয়ের জন্য মনোনীত পাত্রকে মোটেই মাতাল বলে জানেন না। ঐ ভদ্রলোককেই যদি আলেকজান্দ্রা টাকা দিয়ে থাকে, তা হলে, তাঁকে সতর্ক করে দেবার জন্যে আলেকজান্দ্রাকে সেখানে পাঠাব। আর আলেকজান্দ্রা যাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে, যদি সেই ভদ্রলোক কৃষ্ণবাবু না হন তা হ'লে কৃষ্ণবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে। প্রথমে তাঁর মেয়ের বিয়েটা বন্ধ করতে হবে; তার পর তাঁর পরিচয় নিয়ে জানতে হবে তিনি তোমার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিনা।"

যতক্ষণ অশ্রুকুমার কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সৌদামিনী প্রিয়তমের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল; ভাবিতেছিল, আহা! বৈজয়ন্ত-নন্দন-পারিজাতে শোভিত অলকার ছবি কি ইহা অপেক্ষা সুন্দর; সুধা কি ইহা অপেক্ষা মিষ্ট? আমরা বলি, তোমরাও যদি এই পৃথিবীতে থাকিয়া ত্রিদেবের শোভা উপভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে শিখিও; শিখিয়া তোমাদের দয়িতের মুখমণ্ডলে একবার তোমাদের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিও।

সৌদামিনীর নিকট বিদায় লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্রুকুমার আলেকজান্দ্রার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে একটা অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আলেকজান্দ্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবাদ দিল যে, দিদি পূর্ব্ব রাত্র হইতে হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া একবারে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

আলেকজান্দ্রা দাসীর মুখে অশ্রুকুমারের আগমন-বার্ত্তা শ্রাবণ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে আপন শয়ন কক্ষে আহ্বান করিল।

অশ্রুকুমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটা পিত্তল-দণ্ড নির্ম্মিত সুন্দর খট্টাঙ্গে, সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কম্বলে আবৃত করিয়া আলেকজান্দ্রা ম্লান মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। শ্বেত শয্যা-মধ্যে তাহার অনাবৃত মুখ দেখিয়া অশ্রুকুমার ভাবিল, যেন ক্ষীরদসমুদ্রের উর্ম্মিমালা মধ্যে পূর্ণেন্দু ভাসিয়া উঠিয়াছে।

অশ্রুকুমারকে সমীপাগত দেখিয়া আলেকজান্দ্রার রোগম্লান মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আপন রোগ-ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে প্রফুল্লতা আনিতে পারিল না। সে কষ্টে কহিল, "কেন এসেছ?"

আলেকজান্দ্রার কণ্ঠস্বরের কাতরতা দেখিয়া অশ্রু-কুমারেরও কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়াছিল। সে গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "আমার একটু কায ছিল। কিন্তু সে কাযের কথা এখন থাক; তুমি ভাল হলে বলব।"

আলেকজান্দ্রা পূর্ব্ববৎ কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায, আমাকে বলবে না?"

অশ্রুকুমার রোগিণীর মানসিক উত্তেজনা ও আগ্রহ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কহিল, "মেয়ের বিয়ের জন্যে কাল ছয় হাজার টাকা তুমি যাকে দিয়েছিলে, একটু কারণ বশতঃ তাঁর নাম আর ঠিকানাটা তোমার কাছ থেকে জান্‌তে এসেছিলাম। তা তুমি ভাল হয়েই বোলো।"

আলেকজান্দ্রার রোগ-বিশুষ্ক অধর প্রান্তে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি মুখে বলিল, "ভাল ভাল অশ্রুবাবু, ভাল হবার আর কি আশা আছে? জান্‌বার তা এখুনি জেনে নাও, অশ্রুবাবু। তাঁর নাম কৃষ্ণবাবু,—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁরা আগে কোটালিগ্রাম বলে এক পাড়াগাঁয়ের জমীদার ছিলেন; পিতৃঋণের জন্যে জমিদারী বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এখন বাগবাজারে এসে, গলির ভিতর ৪৪ নং নম্বর বাড়ীতে বাস করছেন। তিনি এখন সওদাগরী অফিসে চাকরি করে' কোন ক্রমে সংসার চালাচ্ছেন। আর সেই মেয়ের"......

অশ্রুকুমার উৎকণ্ঠিত হইয়া আলেকজান্দ্রার বাক্যে বাধা দান করিয়া কহিল, "তুমি কথা কয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছ, আর কিছু বোলো না। যা বলেছ তাতেই আমাদের কায উদ্ধার হয়েছে। তোমার দ্বারায় কৃষ্ণবাবুর সন্ধান পাওয়ায় আমাদের খুব উপকার হয়েছে। কৃষ্ণবাবু সৌদামিনীর কাকা,—পিতৃকুলের একমাত্র আত্মীয়। আমরা প্রায় তিন বছর ধরে তাঁর অনুসন্ধান করেছি; কোথাও সন্ধান পাই নি। আজ তুমি তাঁর সন্ধান দিলে। এই খবরটা পেলে সৌদামিনীর কত আহ্লাদ হবে তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ?"

আলেকজান্দ্রা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে অশ্রুকুমারের মুখ-মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া বুঝিল যে আদরিণী পত্নীর ভাবী আনন্দের কথা ভাবিয়া অশ্রুকুমারের মুখ এখনই স্বর্গের মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "আর—আর, তার আহ্লাদে তোমারও আহ্লাদ হবে, অশ্রুবাবু?"

অশ্রুকুমার সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ, আমারও আহ্লাদ হবে। কিন্তু তোমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে; তুমি আর কথা কোয়ো না।"

আলেকজান্দ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিল।

অশ্রুকুমার ইউরোপীয় পরিচর্য্যাকারিণীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে ডাক্তার রাত্রে দুইবার এবং প্রাতে নয়টার সময় আসিয়াছিলেন; আবার বেলা তিনটার সময় আসিবেন। এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া আলেকজান্দ্রা চমকিয়া উঠিল; বিপদগ্রস্তার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "এখনি যাচ্ছ, অশ্রুবাবু?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি এখন একবার ডাক্তারের কাছে যাব। গিয়ে তোমার রোগের অবস্থা জানবো। তারপর পরামর্শ জানবার জন্যে অপর কোন ডাক্তারকে

দরকার হবে কি না তা জিজ্ঞাসা করব; তারপর তাদের নিয়ে তিনটের আগেই আসব।"

আলেকজান্দ্রা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "যাবার আগে আমার কপালে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যাও। আমি ভয়ানক পাপী; কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ করলে মৃত্যুর নরক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে না।"

অশ্রুকুমার আলেকজান্দ্রার রোগতপ্ত ললাটে আপন স্নিগ্ধ হস্ত স্থাপিত করিল। আলেকজান্দ্রা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবার মাত্র অশ্রুকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, শান্তিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিল। অশ্রুকুমার মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি ভয় পেয়ো না আলেকজান্দ্রা; তুমি শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে।"

আলেকজান্দ্রা নিমীলিত নয়নে কহিল, "না, অশ্রুবাবু, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার এ রোগ সারবে না। আর সারবার দরকারও নেই। আমি কাল বিকাল থেকে অনেক ভেবেছি; ভেবে বুঝেছি, এ পৃথিবীতে আমার কায ফুরিয়েছে; তাই ভগবান এই অনর্থক অপদার্থকে পৃথিবী থেকে আবর্জ্জনার মত সরিয়ে দিচ্ছেন। তবু—তবু আমি বলবো, এই পৃথিবী আমার স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ছিল! তুমি আমার কপালে যে হাত দিয়েছ—স্বর্গে পারিজাত আছে বটে—কিন্তু সেখানে ত এমন পবিত্র, এমন স্নেহময়, এমন নরম, এমন স্নিগ্ধ করুণ হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পাব না। ঐ হাত আমার কপালে রেখে, আমায় আশীর্ব্বাদ কর অশ্রুবাবু, আমি যেন তোমারই শিষ্যা হয়ে তোমারই উপদেশ মত কায করবার জন্যে যোগ্যতর হয়ে আবার এই পৃথিবীতে আসতে পারি।"

অশ্রুকুমার কষ্টে আপনার অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া কহিল, "তুমি এ সকল কথা বলো না, আলেকজান্দ্রা।"

আলেকজান্দ্রা নয়নোন্মীলন করিয়া অশ্রুকুমারের কাতর ও বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া, কি জানি কেন হৃদয় মধ্যে একটা মহাসুখ অনুভব করিল; বুঝি মনে করিল, একটী মহাপ্রাণ তাহার জন্য ব্যথিত হইয়াছে; অতএব সে প্রফুল্ল হইবে না কেন? তাহার পর সে প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "কেন বলবো না? এখন না বললে আর ত বলা হবে না। ভগবান আর কি আমাকে কথা বলবার অবসর দিবেন? কই তুমি ত আমাকে আশীর্ব্বাদ করলে না, অশ্রুবাবু? আমার শ্রবণশক্তি থাকতে থাকতে তোমার আশীর্ব্বাদটা আমাকে শুনতে দাও। বল, দেরী কোরো না। সে আশীর্ব্বাদ না শুনলে আমি মরণে শান্তি পাব না। বল!"

অগত্যা অশ্রুকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ভগবানের কৃপায় তুমি অক্ষয় স্বর্গ......

আলেকজান্দ্রা বাধা দিয়া কহিল, "না, না, ও আশীর্ব্বাদ নয়। আমার এই পৃথিবীতে আমি আবার ফিরে আসতে চাই।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তুমি স্বর্গের দেবী হয়ে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে।"

আলেকজান্দ্রা আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি কহিল, "না না; বল, যেন মানবী হয়ে, তোমার শিষ্যা হয়ে, তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা করবার জন্যে যেন এই আমার জন্মভূমিতে,এই সাধুদিগের পবিত্র আবাসভূমিতে, স্বর্গের চেয়ে বড় আমার এই দেশে, সকল তীর্থের চেয়ে বড় আমার এই তীর্থে, আবার যেন ফিরে আসি। আশীর্ব্বাদ কর আমার এই সাধ"......

রোগিণী আর বলিতে পারিল না। অশ্রুকুমার সভয়ে দেখিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে; তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; সে কম্পিত কলেবরে উঠিয়া বসিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছে। অশ্রুকুমার ত্বরিত হস্তে তড়িৎশিঞ্জিনীর চাবিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল; হলঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ইউরোপীয় শুশ্রূষাকারিণী সেখানে আলেকজান্দ্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া উভয়েই আলেকজান্দ্রার শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহারা কি হইয়াছে বুঝিবার পূর্ব্বে রোগিণী কতকটা রক্তবমন করিয়া ক্ষণিক সুস্থতা অনুভব করিল।

আলেকজান্দ্রা একটু সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া অশ্রুকুমার ডাক্তারের বাটীতে ছুটিল।

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না রোগটা কিরূপে ঘটেছিল। কাল রাত্রি নয়টার সময় কি জানি কেন মিসেস দত্ত একলা রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন। এই সময়ে এক দরিদ্রা রোগাক্রান্ত বালিকাকে রাস্তায় পড়ে' থাকতে দেখেন। তিনি বালিকাকে আমার বাড়ীতে বহন করে এনেছিলেন। তিনি আগে আরও দু'চারবার অসহায় রোগীকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কখনও এরূপ ভারী রোগীকে বোয়ে আনেন নি। এই ভার তাঁর পক্ষে এত বেশী হয়েছিল যে তিনি রোগীকে আমার বাড়ীতে দিয়ে নিজে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম যে তাঁর আভ্যন্তরিক রক্তকোষ ছিন্ন হওয়ায় বুকের ভিতর রক্তস্রাব হচ্ছে, আর সেই রক্ত মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ছে। আমি মনে করলাম তখনি তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর ভাইকে সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি একজন লোক পাঠিয়ে দিলাম; এবং নিজে সাধ্যমত তাঁর পরিচর্য্যা করিলাম। অল্পকাল মধ্যেই মোটরগাড়ী নিয়ে তাঁর ভাই এলেন এবং অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর জ্ঞান সম্পাদন করলাম এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করলাম। তার পর বাড়ীতে ফিরে দেখলাম সেই রোগী বালিকা আমার স্ত্রীর আমার শুশ্রূষায় জ্ঞানলাভ করেছে। শুনলাম ঐ বালিকা মেথরজাতীয়, আমারই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। এই মেথর জাতীয়া রোগিণীর জন্যই আপনার বন্ধু মিসেস দত্ত প্রাণ হারালেন।"

অশ্রুকুমার মহাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণ হারালেন?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "হাঁ, প্রাণ হারালেন; কেন না তাঁর জীবনের আর কোন আশাই নাই।"

অশ্রুকুমার কাতরস্বরে মিনতি করিল, "আপনি কলকাতায় অন্য কিম্বা সমস্ত ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে একবার চেষ্টা করে দেখুন।"

ডাক্তার সাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মিসেস দত্ত, সুবিখ্যাত ডাক্তার দত্তের পত্নী; এজন্য আমার আহ্বানে তাঁকে দেখবার জন্যে সকল ডাক্তারই আসবেন; আর তাঁরা তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টাও করবেন। কিন্তু যিনি সকল চিকিৎসার বাহিরে গিয়ে পড়েছেন তিনি কিছুতেই আরোগ্য হবেন না। আজ রাত্রের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি অন্য অন্য রোগীকে দেখে তিনটার পর সেখানে গিয়ে তাঁর মৃত্যুকালের যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা করবো। অন্য যে কোন ডাক্তারকে আপনি আহ্বান করলে, আমি আনন্দের সহিত তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করবো।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু।

অশ্রুকুমার ভূতগ্রস্তের ন্যায় টলিতে টলিতে আপন পাঠাগারে প্রবেশ করিল। কাহিনী-কথিত গ্রীকবীর স্যামসন আপন কেশকলাপ হারাইয়া যেমন বলহীন হইয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দস্যুরণে সব্যসাচীর গাণ্ডীব যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, অশ্রুকুমারের দেহ আজ তেমনই বলহীন ও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

সেই কক্ষেই সৌদামিনী স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। অশ্রুকুমারের পদ শব্দ শুনিয়া সহাস আননে সে দ্বারের নিকট ছুটিয়া আসিল। অশ্রুকুমারের বিষাদ-মলিন ও বিহ্বল মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস বিলীয়মান উল্কালোকের ন্যায় নিবিয়া গেল; তাহার নয়ন প্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে? অসুখ করেছে?"

অশ্রুকুমার অপ্রিয় সংবাদটা অকস্মাৎ সৌদামিনীকে শুনাইল না। সে বলল, "না, আমার কোন অসুখ হয়

নি। তুমি আমার কাছে একটু বস। আমি তোমাকে একটা শুভ সংবাদ শোনাব।”

অশ্রুকুমার একটি সেট্টীতে উপবেশন করিলে, সৌদামিনী তাহার পার্শ্বে বসিল। এবং স্বামীর মুখের দিকে অনুসন্ধানময় দৃষ্টি স্থাপিত করিল। তাহার পর তাহার মর্ম্মর ফলক সদৃশ ললাটে আপন কুসুমপল্লববৎ হস্ত স্থাপিত করিল, তাহার কুঞ্চিত কেশকলাপ মধ্যে আপন কোমল চম্পককলি নিন্দিত অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিল, দুইটি স্নিগ্ধ কোমল বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার আনত মস্তক আপন কোমল বক্ষে টানিয়া লইল,—মনে হইল যেন স্বামীর দুশ্চিন্তার গুরুভার সে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু সে একটি কথাও কহিল না।

অশ্রুকুমার প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি পাইল; ক্ষণকালের জন্য সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে কহিল, “তোমার কাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি বাগবাজারে বাস করছেন। তুমি এখনই তাঁদের বাড়ীতে যাও। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রথমেই সেই মাতালের সঙ্গে তোমার খুড়তুতো বোনের বিয়েটা বন্ধ করে দাও। তার পরে যাতে তাঁদের আর কোন অভাব না থাকে তাই কোরো। আমার ইচ্ছা যে কোটালিগ্রামের নূতন বাড়ী আর জমীদারী যা তোমার নামে কেনা হয়েছে, তা তুমি তাঁকেই লেখা-পড়া করে দাও।”

সৌদামিনী কহিল, “এখন আমি কাকার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারব না; তোমায় একলা ফেলে আমি কোথাও যাব না।”

অশ্রুকুমার কহিল, “কিন্তু, সদু, আমি ত এখন তোমার কাছে বসে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার অনেক কাষ আছে। এখুনি আবার আমাকে আলেকজান্দ্রার বাড়ীতে যেতে হবে।”

সৌদামিনী কহিল, “তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে তোমার সঙ্গে যাব। আজ আমি তোমাকে কোন মতেই একলা ছেড়ে দেবো না।”

অশ্রুকুমার কহিল, “তবে তাই চল। আলেকজান্দ্রার শক্ত অসুখ হয়েছে; তাকে দেখ্‌বে চল। কিন্তু তা হলে তোমার খুড়োর বাড়ী যাওয়া হবে না; আর তাঁর মেয়ের বিয়েও বন্ধ করা হবে না। এতে তোমার খুড়তুতো বোনের ভয়ানক অনিষ্ট হবে।”

সৌদামিনী এই খুল্লতাতকে পাইবার জন্য একদিন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন সে প্রসঙ্গের একটি কথাও কহিল না। খুল্লতাত কন্যার অমঙ্গলের কথাও চিন্তা করিল না। কেবলমাত্র ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, “দিদির অসুখ? এতক্ষণ সে কথা তুমি আমাকে বলনি কেন? চল, আমি এখনি যাব। তুমি কি ভুলে গেছ যে দিদির জন্যেই আমি সেই ভয়ানক রোগ থেকে সেরে উঠ্‌তে পেরেছিলাম। দিদির জন্যেই আমি জীবন পেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি, ঐশ্বর্য্য পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, ধর্ম্ম কি বস্তু তা চিনেছি। দিদি আমার সব। সেই দিদির অসুখ,—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—বড় বেশী অসুখ; আমি কি করে আগে তাঁকে না দেখে অন্য যায়গায় যাব? আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে যাও।”

ঘটক ঠাকুরকে এবং অন্যান্য লোককে প্রাতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা পাঠাইবার ভার ম্যানেজার বাবুকে অর্পণ করিয়া, অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে লইয়া আবার আলেকজান্দ্রার বাটীতে উপস্থিত হইল।

সৌদামিনী ত্বরিত পদে আলেকজান্দ্রার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং তাহার উপাধান পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার কোমল করতল দ্বারা তাহার ললাট স্পর্শ করিল।

আলেকজান্দ্রা মুদিত নয়নে শুইয়া ছিল। সৌদামিনীর সুখকর করস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিল। দেখিয়া তাহার মৃত্যুকালীন মুখও কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার বাক্‌শক্তি এখনও অব্যাহত ছিল। সে ধীরে ধীরে কহিল, “তুমি এসেছ সৌদামিনী? তুমি আমার কাছে বস। তোমাকে

আমার কিছু বলবার আছে; আমি তোমাকে কিছু কাযের ভার দিয়ে যাব।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামীর সম্বন্ধে কোনও কাযের ভার আমাকে কি দিতে চাও, দিদি?"

আলেকজান্ড্রা কহিল, "না, না; তার কোন ভার নয়। তার কোন ভার তোমাকে আমার দিতে হবে না। সে ভার তুমি আপনি নিয়েছ; আমি কাল বিকালে স্বচক্ষে তা দেখে এসেছি। আমি আমার ছোট ভাইয়ের ভার তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই। সে কতকটা হিন্দুভাবাপন্ন বলে, বাবা ওকে মোটেই দেখ্‌তে পারেন না। আর সে আমার স্বামীর জীবনকাল হতেই আমারই কাছে আছে; এখন সে আর বাপ মার আশ্রয়ে গিয়ে সুবিধে কর্‌তে পার্‌বে না। সে এই বাড়ীতেই থাকবে; তোমরা তাকে দেখো। আর, যদি সম্ভব হয় হিন্দু সমাজেই বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী কোরো।"

সৌদামিনী প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল।

আলেকজান্ড্রার নয়নদ্বয় তন্দ্রাঘোরে নিমীলিত হইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট হচ্ছে, দিদি?"

আলেকজান্ড্রা সে কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একলা এসেছ, সৌদামিনী?"

সৌদামিনী কহিল, "আমার স্বামী আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

আলেকজান্ড্রা নিমীলিত নেত্রেই জিজ্ঞাসা করিল, অশ্রুবাবু কোথায়?"

সৌদামিনী কহিল, "তিনি অন্য ঘরে ডাক্তারদের কাছে বসে আছেন! তাঁকে ডাক্‌বো কি?"

আলেকজান্ড্রা আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "না, থাক।"

অতঃপর দুইজনই কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। সৌদামিনী নীরবে রোগিণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুশ্রূষা জন্য সৌদামিনী তাহার পদপ্রান্তে হস্তার্পণ করিবা-মাত্র আলেকজান্ড্রা শিহরিয়া উঠিল; তন্দ্রাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ! ছিঃ! আমার পায়ে হাত দিও না। আমি জাতিচ্যুতা পতিতা—তুমি দেবী; তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।"

সৌদামিনী কহিল, "দিদি, দিদি, আমি কি ভুলতে পারি যে তুমি আমার স্বামীর জীবনদান করেছ?"

আলেকজান্ড্রা ক্ষীণ ও জড়িত কণ্ঠে কহিল, "জীবন? জীবন দান করেছি? মানুষে কি জীবনদান করিতে পারে? আর, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাই নি? আচ্ছা বোন, জীবনের চেয়েও, তুচ্ছ প্রাণের চেয়ে আমাদের এই পৃথিবীতে কি আর কোনও বড় জিনিষ নেই?"

সৌদামিনী বলিল, 'আমার মনে হয়, স্বামীর ভালবাসা জীবনের চেয়ে বড় বস্তু।"

আলেকজান্ড্রা কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া আবার ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল, "সাধ্বী সতী তুমি! তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু আমার মত পাপিনীরা ত ভাল-বাসার পুণ্যময় আস্বাদ পায় না। আমাদের একমাত্র গতি—ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও, প্রেমের চেয়েও বড় জিনিষ। এই মহৎ সামগ্রী আমাকে অশ্রুবাবু দিয়েছেন; আমি চাইনি, উপযাচক হই নি, তবু হেলায় আমাকে তা দিয়েছেন।—আকাশের সূর্য্য যেমন হেলায় অকাতরে দীপ্তিদান করে, অশ্রুবাবু তেমনই হেলায় অকাতরে আমাকে ধর্ম্মদান করেছেন। তাঁর রোগের সময় সামান্য যত্ন করে আমি যদি তোমাদের কৃতজ্ঞতা লাভ করি, বল দেখি, তাঁর কাছ থেকে প্রাণের চেয়েও বড় বস্তু ধর্ম্মলাভ করে, আমার কতটা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? যাঁর পায়ের তলায় কৃতজ্ঞতার ভারে আমার প্রাণ লুটিয়ে পড়েছে, তাঁর সকল আদরের আদরিণী স্ত্রী আমার পায়ে হাত দিলে আমার স্বর্গের পথ বন্ধ হয়ে যাবে যে বোন!"

সৌদামিনী আলেকজান্ড্রার বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিল না; বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রা নিমীলিত নেত্রে আবার মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। কতক্ষণ বাদে সে সহসা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং সৌদামিনীকে স্পর্শ করিয়া অসহায়ার ন্যায় কাতরস্বরে কহিল, "তুমি—তুমি বোন, এখনও এইখানেই বসে আছ? এত রাত্রি—এখনও বাড়ী যাও নি? তবে—তবে অশ্রুবাবুকে খেতে দেবে কে?—পৃথিবীতে এমন কে পুণ্যময়ী আছে যে, সে দেবতার ভোগ স্পর্শ করতে পারে? যাও, বাড়ী যাও, অশ্রুবাবুর ক্ষিধে পেয়েছে, খাবার দাও।"

সৌদামিনী আপন আর্দ্র নয়নদ্বয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কই, দিদি, এখন ত রাত্রি হয় নি, সন্ধ্যাও হয় নি; এখনও অনেকটা বেলা আছে। এখনও ত তাঁর খাবার সময় হয় নি।"

আলেকজান্দ্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আপনার বিহ্বল দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তবে—তবে, বোন, এত অন্ধকার কেন? আমি ত কিছু চেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় তুমি?"

সৌদামিনী আলেকজান্দ্রার তুষারবৎ শীতল ও শিথিল করতল আপন ঈষদুষ্ণ করপুটে গ্রহণ করিয়া কহিল, "এই যে দিদি, এই আমি তোমার কাছে বসে রয়েছি।"

আলেকজান্দ্রা কাতরকণ্ঠে কহিল, "দেবী, দেবী!—হাত ছেড় না—হাত ধরে সুপথ দেখিয়ে দাও। আমি যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।—বড় অন্ধকার!—না, ঐ আলো দেখেছি। ঐ—ঐ—আমি দেখেছি—অতি দীর্ঘ সচল দীপশিখা! না, না, ও যে অশ্রুবাবু। আর—আর ত পথ ভুল্‌বো না।"

অদূরোপবিষ্টা ইয়োরোপীয় শুশ্রূষাকারিণী ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিল; এবং ত্বরিত পদে ডাক্তার সাহেবকে সংবাদ দিল। ডাক্তার সাহেব অন্যান্য ডাক্তারকে এবং অশ্রুকুমারকে সঙ্গে লইয়া রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রোগিণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতেছে; তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া গিয়াছে। ললাটে স্বেদস্রুতি হইতেছে; কেবল এখনও তাহার কণ্ঠ হইতে দুই একটি অস্পষ্ট বাক্য নির্গত হইতেছে। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে অস্ফুট বাক্যও বন্ধ হইয়া গেল; যে কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস বহুবার মানবকর্ণকে মুগ্ধ করিয়াছে, আজ তাহা হইতে কেবলমাত্র মৃদু ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইল। তাহার পর সকল শব্দ বন্ধ হইল; সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জ্যোতিষ্ক জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল।

ডাক্তার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান, ইনি মানব রচিত কোন্ ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, তা আমি জানি না; কিন্তু যে মহিমময়ী নারী পরের জীবন রক্ষার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আপন জীবনপাত করিতে পারেন তিনি তোমার ধর্ম্মপালন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার অমল আত্মাকে গ্রহণ কর।"

সৌদামিনী কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল; ডাকিল, "দিদি, দিদি!"

অশ্রুকুমার সজল নয়নে কহিল, "দেবী! এ পৃথিবীতে আর কখনও কি তোমার মত লোক দেখ্‌তে পাব?"

আলেকজান্দ্রা তাহার অনতিদীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে ধর্ম্মাচরণ কি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল, তাহার বিচারভার বিজ্ঞ সমাজিকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা বলিব, যদি নির্ম্মল হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রফুল্লতায়, অনুরাগময় অন্তরের সুদৃঢ় সংযমে এবং পরহিতার্থ আত্মোৎসর্গে পুণ্য থাকে, তাহা হইলে সে সেই পুণ্য লাভ করিয়াছে, এবং সেই পুণ্যের বলে নিশ্চয়ই অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবে; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার বলিয়া ভগবান তাহাকে গ্রহণ করিবেন।

সৌদামিনীর ক্রন্দনবেগ কিছু প্রশমিত হইলে সে অশ্রুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির এমন রোগ হঠাৎ কেমন করে হল?"

অশ্রুকুমার ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "একটি গরীব মেয়ে রোগে অজ্ঞান হয়ে অসহায় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল, সে তাকে ডাক্তারের বাড়ী কোলে কোরে নিয়ে

যাওয়ায় অতিরিক্ত ভাবে তার রক্তকোষ ছিঁড়ে গিয়েছিল।"

সৌদামিনী কাঁদিয়া কহিল, "দিদি, দিদি! তুমি যে এ পৃথিবীর লোক ছিলে না তা বুকের রক্ত খরচ করে, বুঝিয়ে দিয়ে গেছ। তুমি দেবী; এ পৃথিবীতে দেবতার স্থান নাই তাই দেবলোকে চলে গেছ।"

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ফ্রান্সে ভারত-ইতিহাসের চর্চ্চা

(আচার্য্য সিল্‌ভ্যঁ লেভীর ফরাসী হইতে)

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ফরাসী দেশে ভারত-ইতিহাসের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথম যে ফরাসী পণ্ডিত ভারতের ইতিহাসে হাত দেন, তাঁর নাম A. Duperron। তাঁর বয়স মাত্র ২০ বৎসর হইলেও, তিনি ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী লইয়া ভারতে আসেন। ১৭৫৪ খৃঃ হইতে তিনি বেদ ও আবেস্তার আলোচনা আরম্ভ করেন। সেই হইতে ফরাসী দেশের সঙ্গে ভারতের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তাঁহার পরেই বড় ফরাসী পণ্ডিত Chezy—তিনি ফ্রান্সের বাহিরে না গিয়াও, পারী নগরীর জাতীয় লাইব্রেরীতে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া বড় পণ্ডিত হন। তিনি সংস্কৃত ভাষার এত অনুরক্ত ছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডে স্যর উইলিয়ম্ জোন্স সাহেব শকুন্তলা অনুবাদ করেন। তিনিও শকুন্তলার গোঁড়া ভক্ত ছিলেন বলিয়া, তিনি শকুন্তলার মূলটী ফরাসী দেশে প্রকাশিত করেন। তাঁহার সেই গ্রন্থ এখনও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাঁহার পরেই আর এক জন বড় পণ্ডিত দেখা দেন, তিনি—Eugene Burnouf। তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তাঁহার ভাষাজ্ঞানও ছিল গভীর। যে বিষয়েই তিনি আলোচনা করিতেন সেটীকে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিতেন। তিনি ভাগবত পুরাণ ও সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ প্রচার করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস'। তিনি ইহাতে দেখাইয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণতি কোথায়, চীনে, জাপানে কোরিয়াতে তিব্বতে, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি ভাবে আছে, এবং তাহাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে। তাহাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মমতে কি ভেদ আছে, তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাবে তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

মোক্ষমূলর যখন ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেন, ঠিক সেই সময় A. Regnier ফরাসীদেশে বেদের একটী সংস্করণ বাহির করেন। সেই সময় সাংখ্যের দর্শন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

১৮৬৮ সালে যখন গবেষণার জন্য School of Higher Studies নামে একটী নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তখন ভারত-ইতিহাসের গবেষণার একটী নূতন দিক খুলিয়া যায়। এ সময় Senart কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। Paul Regnany ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং A. Bergaigne "ভামিনী বিলাসের" একটী সংস্করণ বাহির করেন। Abel Bergaigne একজন শক্তিশালী লেখক। তিনি বেদে খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং এবিষয়ে অনেক আলোচনা করেন। গত শতাব্দীতে তাঁহার মত বড় পণ্ডিত কেহ ছিল না। তাঁর ছাত্রও ছিল অসংখ্য। ফরাসীদেশের বর্ত্তমান্ ঐতিহাসিকেরা তাঁহার

শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্যদল—Victor Henry, Sylvain Levi প্রভৃতি। আবার Levi সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে Foucher, J. Bloch, Pelliot প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। Bergaigne তাঁহার এক শিষ্যের সাহায্যে বৈদিক ব্যাকরণ রচনা করেন, উহা ফরাসী পাঠকের পক্ষে বেদপাঠ সহজ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি তাঁহার শিষ্যদের নিজের হাতে তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যদের এত খ্যাতি, এত সম্মান। তাঁর এক শিষ্য Victor Henry অগ্নিষ্টোম সম্বন্ধে এবং Sylvain Levi ব্রাহ্মণের যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। ফরাসীরা তখন নূতন ইন্দোচীন (Indo-china) জয় করিয়াছেন। একজন ফরাসী সেনাপতি Aymonier সেদেশে গিয়া অনেক নূতন শিলালিপি সংগ্রহ করেন। তিনি যুদ্ধব্যবসায়ী লোক, শিলালিপির ধার কোন কালেই ধারিতেন না, তবু সেই লিপির পাঠ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেন। যখন দেখিলেন, সে কায তাঁহার নয়, তখন তিনি সেগুলি পারী নগরে পণ্ডিতদের কাছে পাঠাইয়া দিলেন—তাঁহারা যদি কিছু করিতে পারেন। Abel Bergaigne সাহেবের উপর সেগুলির পাঠ উদ্ধারের ভার পড়িল। তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য লেভী সাহেবের সহায়তায় সেই লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়া শ্যাম কাম্বোজে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবের কথা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন। এ ছাড়া মধ্য এসিয়াতে ফরাসীরা যে নূতন নূতন আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের কথাই জানা যাইতেছে। লেভী সাহেবের গবেষণার মধ্যে (১) ভারতীয় থিয়েটার (২) নেপালের ইতিহাস ও (৩) মহাযান সূত্রালঙ্কার উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ধর্ম্মের বিষয়ের A. Berthএর "ভারতবর্ষের ধর্ম্ম" গ্রন্থখানি খুব উপাদেয়। ইহা পণ্ডিত সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান ভাষার প্রতিও ফ্রান্সের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। G. Tassy হিন্দুস্থানী ভাষা সম্বন্ধে ও Jules Bloch মারাঠী ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ চীনে ও তিব্বতে নীত হয় এবং তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সংস্কৃত গ্রন্থ অনেক লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সে গুলির তিব্বতী ও চীনা অনুবাদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফরাসী পণ্ডিতেরা মূল তিব্বতী ও চীনা ভাষা পড়িয়া সেগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এ সকল পণ্ডিতদের মধ্যে Foucaux—ললিত বিস্তার, Feer—কান্জুরের অংশের অনুবাদ, Cordier—তানজুরের তালিকা, Huber—সূত্রালঙ্কার ও Chavannes ত্রিপিটকের গল্প অনুবাদ করিয়াছেন।

এ ছাড়া মধ্য এসিয়াতে যে নূতন আবিষ্কার হইতেছে, তাহাতে ফ্রান্সের পক্ষ হইতে Pelliot গিয়া অনেক নূতন পুঁথি আবিষ্কার করিয়া আনিয়াছেন। সেখানে যে সব ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, ফরাসী পণ্ডিতেরা তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। Kontch ভাষার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন—লেভি সাহেব ও Meillet সাহেব।

সংস্কৃত সাহিত্যকে ফরাসীদের সঙ্গে পরিচিত করিবার জন্য, ফরাসী পণ্ডিতেরা প্রায় সব সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে রামায়ণ, মহাভারত মনুসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের সব নাটকই অনূদিত হইয়াছে।

যে সকল ফরাসী পত্রিকায় ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও আলোচনা বাহির হয়, তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য :—

[১] Journal Asiatique.
[২] Memoires de la societe de linguistique.
[৩] T' oung Pao.

[৪] Bulletin de l'Ecole Francaise de' E—Orient.

[৫] Journal des Savants.

সংক্ষেপে ভারতের ইতিহাসের আলোচনা সরল করিবার জন্ত ফ্রান্স এই কায করিতেছেন। এই কাযের জন্ত তদ্দেশীয় যোগ্য পণ্ডিতেরা বিশেষভাবে গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন, কারণ তাঁহারা ভারতের অন্ধকার-পূর্ণ ইতিহাসকে আলোকিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও অনেকটা সফল হইয়াছেন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু।

'সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব'

বিগত চৈত্র মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় "সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রমুখ ঔপন্যাসিকদিগকে বাংলা উপন্যাসে "নারী জন্ম সার্থক করিবার রেয়াজটা পুরাদমে চালাইতেছন" বলিয়া অভিযুক্ত করেন। অধিকন্তু শরৎবাবুর নিজের একটা উক্তির ও তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রের কয়েকটি উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, শরৎ বাবুর মতে নারীর সতীত্ব একটা বাজে কুসংস্কার মাত্র এবং ইহা তাহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের বাধা জন্মায়। যতীন্দ্র বাবুর এই উক্তির ও তিনি ঐ প্রবন্ধে নারীদের সম্বন্ধে যে কতগুলি মত ব্যক্ত করেন, সেগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

সতীত্ব নারীদের মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হইতে পারে কিনা, এই লইয়া যতীন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমাদের কোনও মতভেদ নাই; এবং শরৎ বাবুর কথারও অর্থ ঠিক এই নয় যে তিনি নারীর সতীত্বকে একেবারেই তুচ্ছ করেন, বা কুসংস্কার মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে চান। আসল কথা, বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সতীত্বের একটা বিশ্রী রকম conventionএর সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমরা প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ হারাইয়া, এই conventional আদর্শ অনুসারেই নারীদিগকে গড়িতে গিয়া তাঁহাদের মানুষ হইবার স্বাভাবিক ও সত্যকার দাবীটা অগ্রাহ্য করিতেছি।

আমাদের সমাজে নারীদের যে জন্মগত কোন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আছে ইহা তাঁহাদের একবারেই জানা নাই বলিলেই চলে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মনে এমন একটা ভাব ঢুকাইয়া দেওয়া হয় যে তাঁহারা সব বিষয়ে হীন, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য, যেহেতু তাঁহারা মেয়েমানুষ। অতএব তাঁহাদিগকে এটা করিতে নাই, ওটা করিতে নাই, তাহারা ৮বৎসরের খুকীই হউক আর ৪০ বৎসরের প্রৌঢ়াই হউক। এগুলিই তাঁহাদের সতীত্বের মাপ কাটি; ইহা হইতে একচুল নড়চড় হইলেই সমাজ-ধুরন্ধরেরা গগনভেদী চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন "গেল, সব গেল, গোল্লায় গেল, চুলায় গেল। স্ত্রীলোকের সতীত্বের ও ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ খাড়া ছিল কিন্তু এখন সব গেছে।"

নিজ নিজ গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম ছাড়া বাহ্য জগৎটা মেয়েদের কাছে একখানা "বন্ধপুঁথি"—তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনেকেরই মতে অনধিকার চর্চ্চা। তাঁহাদের সতীত্বটা, এমনই অসার পদার্থ যে কখন্ কোন ফাঁকে কর্পূরের মত হাওয়ার মুখে উড়িয়া যায় এই ভয়েই অস্থির। যতীন বাবু লিখিয়াছেন—"জীবিকা অর্জ্জনের জন্ত হিন্দু রমণী স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিলে, পরপুরুষের সহিত মেলা মেশা করিলে সমাজে তাঁহার নিন্দা হয়। কারণ উপার্জ্জন ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে তাঁহারা প্রবেশ করিলে পরপুরুষের সহিত মেলামেশা দ্বারা সতীত্বের হানি হওয়ায় আশঙ্কা আছে।" মোটের

উপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের যেমন কিছুতেই আনাড়িত্ব ঘোচেনা, তেমনই নারী যতই শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা, সংযতা হউন না, তাঁহার "স্ত্রী" নামের বদনাম ইহ জীবনে ঘুচিবার নয়। দিবারাত্রি সতীত্ব-হানিরূপ জুজুর ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকার দায় হইতে তাহাদের মুক্তি নাই। এরূপ ভয়ের অধীনে জীবনযাপন করিতে বাধ্য করিয়া, তাঁহাদের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া যে ভঙ্গপ্রবণ সতীত্ব রক্ষা করা হয়, তাহাকে আমরা কখনই "নারী জীবনের চরম ও পরম আদর্শ" বলিয়া মানিয়া নিতে রাজী নই। তাহা করাকে শরৎ বাবু কেন, নিশ্চয় অনেকেই কুসংস্কার মনে করিবেন। বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকে যদি সর্ব্বদা ঘোড়ার মত চোখে ঠুলি দিয়া, মুখে লাগাম বাঁধিয়া, চালনা করিবার চেষ্টা করা যায়, তবে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির উপর যে অন্যায় রকম আঘাত করা হয়, ভগবানের শ্রেষ্ঠদান বিচার শক্তিকে যে অবমাননা করা হয় ও তাহার বৃত্তিগুলিকে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া তাহাকে পূর্ণ মানবতার দিকে চালিতে করিতে যে বাধা দেওয়া হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নারীরা বাহিরের কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বর্ত্তমান জটিল কর্ম্মসমস্যা আরও জটিল হইবে, অধিকন্তু তাঁহারা পুরুষের মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকিলে 'কিম্ভূত কিমাকার জীব'এ পরিণত হইয়া যাইবে, যতীন্দ্রবাবু এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অন্নসমস্যা কত ভীষণ তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অথচ আমাদের জাতির অর্দ্ধেকটাই উপার্জ্জনে অক্ষম। এই ঘোর দুর্দ্দিনে নারী যথা-সম্ভব আয়বৃদ্ধির পথে পুরুষের সহায়তা করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ক্লেশ অনেক কমিয়া যাইবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে এখন "সহধর্ম্মিণীর" সঙ্গে "সহকর্ম্মিণী"ও হইতে হইবে। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রের গণ্ডী আরও প্রশস্ত করিতে হইবে। নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি পাইলে পুরুষের ভয় পাওয়ার কোনই কারণ নাই। কর্ম্মক্ষেত্র 'মানে' কেবল আদালত কাছারী নয়, আর কর্ম্ম মানেও শুধু ওকালতী, জজিয়তী বা কেরাণীগিরি নয়। নারীরা যদি বা তাই বুঝে, তবে অন্যের না হইলেও ডিপুটী, হাকিম, কেরাণী বাবুদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদ গুলির পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখল হইতে বঞ্চিত হওয়ায় যথেষ্ট শঙ্কা আছে, অতএব তাঁহা-দিগকে হেঁসেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যুক্তিটা মন্দ নয়!

নারী ও পুরুষের শিক্ষার আদর্শ সব দেশেই পৃথক, এক রকম শিক্ষার কল্পনা আজ পর্য্যন্ত কোন দেশেই হয় নাই। নারী ও পুরুষ উভয়েই মানুষ এবং উভয়েরই আত্মা এক এবং মানুষ হিসাবে উভয়ের মধ্যে কতগুলি বৃত্তি সাধারণ; সুতরাং যে শিক্ষা শুধু নারীর মাতৃত্বকেই ফুটাইয়া তুলে, তাঁহার আত্মার বা অন্যান্য বৃত্তিগুলির কোন উন্নতিই করে না, সে শিক্ষা কখনই পূর্ণাঙ্গ নয়। সেই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পাইতে তাঁহাকে যদি 'কিম্ভূত কিমাকার জীবে' পরিণত হইতে হয়, তাঁহাকে যদি কিঞ্চিৎ 'পুরুষভাবাপন্ন' হইতে হয়, তবে আমরা নাচার।

শ্রীযুত যতীন্দ্রবাবু তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিয়া-ছেন—"আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা", সুতরাং আমাদের সমাজে নারীরা প্রায় সব বিষয়ে পরাধীন হই-লেও, তাঁহাদের আত্মার পুরাপুরি স্বাধীনতা ভোগ করি-বার কোনও ব্যঘাত হয় না। এই সোজা কথাটা বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য এত পরিশ্রমের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তিনি যদি এই আধ্যাত্মিক দেশের নারীদিগকে স্পষ্ট করিয়া এই কথা কয়টী বলিয়া দিতেন তবেই যথেষ্ট হইত—"হে বঙ্গকুলললনাগণ! তোমরা সকল দুঃখ, সকল দৈন্য পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার অত্যাচার ও অশান্তিকে তুচ্ছ করিয়া নিজ নিজ আত্মার স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া দাও ও প্রাণে বিরাট শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর। যদিচ তোমরা ঘরে ও বাইরে, কথায় ও কার্য্যে পরাধীনতার গুরু শৃঙ্খলে নিপীড়িত, তবুও মনে রাখিও বাহিরের কোনও কিছুর উপরেই আত্মার স্বাধীনতা বা তজ্জনিত সুখশান্তি নির্ভর করে না—করিতে

পারে না। বাহ্যিক দুঃখ ক্লেশ সবই দেহের, আত্মার নয়। অতএব প্রার্থনা করি, তোমরা যেন এই প্রপঞ্চময় জগৎটাকে অবহেলা করিয়া এ ভবরঙ্গমঞ্চের সুখদুঃখের লীলাখেলাকে তিন তুড়িতে উড়াইয়া দিয়া চিরকালই এইরূপ অচিন্ত্য অব্যক্ত অসীম স্বাধীনতা নিজ নিজ আত্মায় রক্ষা করিতে পার!" স্বাধীনতাটা যখন আত্মার জিনিষ, আর পরাধীনতার দৈন্যটা যখন দৈহিক, তখন দেহের উপর পরাধীনতার শৃঙ্খলটা যত জোরেই কসিয়া বসুক না কেন, আত্মা যে স্বাধীন সেই স্বাধীন! অতএব সহযোগী অসহযোগী সকলেই স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ ইত্যাদি রবে হৈ চৈ না করিয়া, অনর্থক বাজে চিন্তায় মাথা না ঘামাইয়া, সটান নাকে তৈল দিয়া আত্মার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করুক ও নিছক স্বর্গীয় শান্তির অমৃত নিস্যন্দিনী ফোয়ারা প্রাণে ছুটাইয়া দিক। ব্যাস!!

যতীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "হিন্দুরমণীগণ স্বামীর সংসারে অথবা পিতামাতার সংসারে স্থল বিশেষ বহু প্রকার ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিলেও "স্বাধীন ভাবে" জীবিকা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন না। কারণ "স্বাধীনভাবে" জীবিকা অর্জ্জনে তাঁহার সতীত্ব হানির আশঙ্কা আছে। অতএব তিনি স্বামীকর্তৃক লাঞ্ছিতা, গৃহ বিতাড়িতা রমণীকে নিকট বা দুরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়া দাসীর মত খাটিয়া অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তথাপি সৎপথে "স্বাধীনভাবে" থাকিয়া নিজের পরিশ্রমের অন্ন খাইতে দিতে তিনি অসম্মত! দগ্ধ উদরের জন্য, দুই মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া নীচ ঘৃণ্য শিয়াল কুকুর অপেক্ষাও হীনতা স্বীকার করিয়া, বিনামূল্যে সকল স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, ঐহিক সমস্ত সুখ সম্ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের বাড়ী পড়িয়া থাকা কতদূর সমীচীন তাহা আমার" ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঢুকে না! ইহার একমাত্র কারণ ইহাতে "স্বাধীনতা" নাই! মোটের উপর "স্বাধীনতা" শব্দটার নামেই কেহ কেহ বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন! হায়রে, দাস মনোভাব!

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা এ দেশের নয়, অন্যান্য বাজে মালের সঙ্গে rights of woman ইত্যাদি মেকী ধরণের স্বাধীনতা জ্ঞাপক ভাব ও শব্দ পশ্চিম হইতে আমদানী হইয়াছে! বেশ সোজা কথা সন্দেহ নাই! ঐ ভাবটাও ওদের কাছে ধার করা, এ বড়ই আজগুবি! পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া কি কখনও আমাদের থাকিতে নাই? যাহা আমাদের ছিল না বা নাই, তাহা আমাদের ভাব ও চিন্তার ধারায় আনা কি দোষের?

তিনি আরও লিখিয়াছেন, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে প্রথমে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। বেশ কথা; কিন্তু ঐ অধীনতা শৃঙ্খল যদি ইহজীবনে না ঘোচে? আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোককে দড়ীছাড়া করিতে নাই। তাঁহাদিগকে কেবল ভাত রাঁধিতে, জিনিষপত্র সাজাইতে গোছাইতে, শরীরের যত্ন নিতে এবং টাকাকড়ি ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতে ও খুলিয়া দিতে নিযুক্ত রাখিবে।

স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা, Liberty অর্থে license নয়, এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

শরৎ বাবু অক্ষম কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে লক্ষ্য করিয়া, পণ দিয়া বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা মেয়েদিগকে অবিবাহিত রাখা ভাল এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ মতের উপর কটাক্ষ করিয়া যতীনবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "ইহা চোরের উপর রাগ করিয়া কলার পাতায় ভাত খাওয়ার মত।" কিন্তু যদি অবস্থানুসারে কাহারও কলার পাতার অতিরিক্ত কিছু না জুটে তখন? সক্ষমের বেলা কোন প্রশ্ন উঠে না। কেহ যদি কপর্দ্দকও দিতে সমর্থ না হয়, তখন সমাজের ভয়ে লোটাবাটী বিক্রী করিয়া মেয়ে বিবাহ দিতে বাধ্য হওয়া কি জুলুম নয়? যতীন বাবুর বিচারে মেয়েরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ স্বভাবতঃ বিবাহ করিতে বাধ্য, তাই তিনি লিখিয়াছেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা নারীজাতির উপর গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের ভার দিয়া তাঁহাকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল ও পুরুষের অধীন করিয়াছেন। অতএব যে নারী পুরুষনিরপেক্ষ হইয়া জীবন ধারণ করেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে

ইচ্ছা করেন না, তিনি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করেন।" সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনের ভার পাওয়াতেই নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল ও পুরুষের অধীন, অতএব তাঁহাকে বিবাহ করিতেই হইবে, পুরুষ-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা আশ্চর্য্য যুক্তি। আবার ইহা তোমার আমার ব্যবস্থা নয়; স্বয়ং "সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত।" আর বাক্যব্যয় বৃথা। যেরূপেই হউক ৮।১০ বছর হইতে না হইতেই মেয়েকে "পার" করিতেই হইবে। মনু "কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে......" শ্লোক দ্বারা অবস্থা বিশেষে মেয়েকে যাবজ্জীবন গৃহে রাখার ব্যবস্থা দিতে ত্রুটী করেন নাই। নচেৎ মেয়ের "অধঃপাতে যাওয়ার" যথেষ্ট আশঙ্কা আছে! কিন্তু পুরুষের বেলা ত কোন কথাই নাই। বিবাহ হাতের পাঁচ, তা বিংশতি বছরেই হউক আর অশীতি বছরেই হউক; অথবা একদম নাই হউক। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, মেয়েদের বেলা এত জবরদস্তি কেন, আর পুরুষের বেলাই বা এত উদারতা কেন? সব গণ্ডগোলই এইখানে।

অক্ষম পিতার সম্মুখে মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইলে তিনটী পথ খোলা আছে। মেয়েকে 'স্নেহলতা'র পন্থা অনুসরণ করিতে দেওয়া, পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, অবিচারী সমাজের খামখেয়ালীর মুখে, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাহাকে বলি দেওয়া, অথবা যে পর্য্যন্ত কেহ বিনা পণে বিবাহ করিতে রাজী না হয় সে পর্য্যন্ত নানাবিধ উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তোলা। প্রথম দুইটীকে যদি কেহ পছন্দসই মনে করেন তাহাতে আমাদের বলিবার অধিকার আছে মাত্র, 'আমার পাঁঠা আমি লেজে কাটিলে অন্যে জোর চালাইতে পারে কি?'

'নারী স্বেচ্ছায় বিবাহ না করিলে পাশ্চাত্য দেশের মত লোক সংখ্যা কমিয়া যাইবে' এই ভয়ের আমাদের কোন হেতু নাই। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্রই বিবাহ করা না করা নারীদের খোস মেজাজের উপর নির্ভর করে। পরন্তু সেখানে বিবাহের ধরাবাঁধা কোন বন্ধনও নাই। তবু ফ্রান্স ছাড়া আর কোথাও বাধ্যতামূলক বিবাহের আইন প্রণয়নের গুজবও আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাণে পৌঁছে নাই।

শরৎ বাবুর 'স্বামী'র নায়িকা সৌদামিনীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত 'মন্ত্রপড়া বিবাহ' সম্বন্ধে তাহার প্রণয়ী নরেন বলিতেছে, "এমন কোন্ সভ্য দেশ আছে, যেখানে এত বড় অন্যায় হ'তে পারত? ......কোন দেশের মেয়েরা ইচ্ছা করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুসী চলে যেতে না পারত?" ভালবাসা কখনও পাঁজিপুঁথি দেখিয়া জন্মায় না। কোন যুবতী যদি কোন যুবককে ভাল বাসিয়া আত্মদান করিয়া থাকে, তবে তাহার ব্যক্তিত্বের উপর অন্যায় আঘাত করিয়া তাহাকে জোর করিয়া অন্যের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার তোমার আমার কি অধিকার আছে? ইহাতে ধর্ম্মের বা শাস্ত্রের মর্য্যাদাই বা কতটা অক্ষুণ্ণ থাকে? যতীন বাবুর আদর্শ সতী বলিয়াছেন, "যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি। জীবনে মরণে সেই সত্যবান স্বামী।" তিনি নিজেও লিখিয়াছেন, "সেই আদর্শ সতীর (সাবিত্রীর) হৃদয় মুকুরে যে পতির চিত্র একবার প্রতিফলিত হইয়াছে, সেখানে অন্য মূর্ত্তি কি প্রকারে স্থান পাইবে?" একটু পরেই আবার লিখিয়াছেন "সাবিত্রী চরিত্রের শিক্ষা এই, যে নারী মনে মনেও পর-পুরুষের কামনা করেন তিনি অসতী। আবার এক-জনের প্রেমে পড়িয়া, যে নারী কোন কারণ বশতঃ তাহাকে বিবাহ করিতে না পারিয়া অন্য পুরুষকে বিবাহ করেন, তিনিও অসতী।" এখন যতীন বাবুই বলুন, সৌদামিনীকে তাহার প্রেমাস্পদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়া, জোর করিয়া পরপুরুষের হাতে মন্ত্র পড়িয়া সঁপিয়া দেওয়াতে তাহার সতীত্বের মর্য্যাদা কতখানি রক্ষিত হইল? আচ্ছা, যদি সাবিত্রীকে জোর করিয়া তাঁহার পিতা অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিতেন, তবে সাবিত্রী কি করিতেন? তিনি কি অল্পায়ু সত্যবানকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নবাগতের মূর্ত্তিকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া, হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত দিয়া নিতেন? না, এই 'ম

পড়া' বিবাহের মাথায় লাথি মারিয়া, নিজ সতীত্ব মহিমায় সত্যবানের পর্ণকুটীর আলোকিত করিতেন? এইরূপ সন্ধিস্থলে একটী কাষ করিলে উভয় দিকই বজায় থাকে। মনে মনে প্রেমাস্পদকেই আসল স্বামী জানিয়া, 'মন্ত্র পড়া' নকল স্বামীটীর সঙ্গে গৃহস্থালী পাতাইলে নেহাৎ মন্দ কি? শ্যামও রাখিলাম, কুলও ভাঙ্গিলাম না! যতীন্দ্র বাবুর প্রণীত উপন্যাস "ধ্রুবতারা"য় নায়িকা চারুলতা 'প্রেমেপড়া' ও 'মন্ত্রপড়া' বিবাহকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া শেষে উপেনকেই তাহার বাকী জীবনের 'ধ্রুবতারা' ঠাওরাইয়া লইল। চারুলতার চরিত্রের শিক্ষাটা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বাস্তব জীবনে এরূপ বিবাহের পরিণাম যে কতদূর বিষময় ও নিন্দাজনক হয়, তাহা বলা বাহুল্য। আর এমন কতগুলি লোক আছে যাদের কাছে অবোধ্য সংস্কৃত বুলির সম্মুখে সব যুক্তি তর্ককে মাথা হেঁট করিতেই হইবে।

মেয়েরা স্বভাবদুর্ব্বলা একথা সকলেই বলিয়া থাকেন এবং দুর্ব্বলতাটা তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক—উভয়তঃ। এই দুর্ব্বলতার অজুহাতে তাঁহাদের সামান্য ভুল বা পদস্খলনের বেলা তাঁহারা 'সবল'দের কাছে নিশ্চয়ই কিছু sympathy ও concession পাইতে পারে। সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলকে সবল অপেক্ষা একটু সহানুভূতির চোখে দেখা হয়। কিন্তু মেয়েদের বেলা—আমাদের মা, বোনদের বেলা—সমাজ তা করে কি? সংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়, নানাবিষয়িণী শিক্ষা দীক্ষায়, তাঁহারা পুরুষদের অপেক্ষা অনেক হীন হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের ত্রুটি বিচ্যুতির বেলা সমাজ একথা একবার খতাইয়া দেখে কি? নিজ দোষেই হউক বা অন্যের প্রলোভনেই হউক, নারীর যদি একবার পদস্খলন হয়—এমন কি যদি তাঁহার চরিত্রের উপর ঘুণাক্ষরেও একটু সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবেই সর্ব্বনাশ! বাসুকীর মত শত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমাজ তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিয়া যায়। নরম ব্যবহার ত দূরের কথা, সহানুভূতি সূচক একটা মিষ্ট কথারও ত যোগ্য তিনি থাকেন না! পরন্তু মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যে একটা সামান্য ভুল করিয়া বসিয়াছেন, সেটাকে শুধ্‌রাইয়া লইবার কোনও অবসর না দিয়া যাহাতে ঐ ভুল পথে ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে আরও গভীর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হন, তাহারই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দেয়। একবার পতন হইলে আর উত্থানের কোন আশা থাকে না, কোন অধিকার থাকে না; সমাজের বা আত্মীয় স্বজনের কাছে কোন মুখ থাকে না। যতীন্দ্র বাবু সত্যই বলিয়াছেন "যাঁহারা (নারীরা) এই সংসার পথে চলিতে চলিতে দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়ে অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহাদিগকে ত দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতেই হইবে। স্বামীর অসহ্য অত্যাচারে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় নিলেও নারীর "দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।" কিন্তু যদি একবার পুরুষদের কথা তোলা যায়?

তথাকথিত পতিতাদের সম্বন্ধে আমাদের সমাজ ত চিরকালই এমন ছিল না। অহল্যা, দ্রৌপদীরা কিরূপে আদর্শ প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চসতী হইলেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নয় কি? ডাঃ সেন মহাশয় এই অবিচারের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, সমাজের বিচারে চিরকালের জন্য পতিতা "শুভাকে" গৃহে স্থান দিয়া যথেষ্ট নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন।

আচ্ছা ধরিয়া নিলাম moralityটা শুধু নারীদেরই সম্পত্তি। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের শরীরটাও কি রক্ত মাংসের নয়? স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হয়, মদ্যপায়ী, ভণ্ড, কদাচারী হয়, আরও কত কিছু হয়—তবে স্ত্রী পূর্ব্বের মত তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তির, প্রীতির, শ্রদ্ধার, ভালবাসার অঞ্জলি সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে এরূপ স্বামীর পায়ে দিতে পারে কি? "ধ্রুবতারা"য় চারুলতার স্বামীর প্রতি ব্যবহার—স্ত্রীর বুক ভরা ভালবাসা ও আত্মদানের বিনিময়ে যদি সে কেবল উপেক্ষা, ঘৃণা, দুঃখ ও নির্য্যাতন পাইতে থাকে, তবে আঘাত খাইয়া তাহার প্রাণে ক্রোধ, ঘৃণা দ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়া উঠে না কি? যদি কেহ বলেন উঠে না, তবে তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী; নতুবা তিনি যীশুর বা গৌরাঙ্গের অবতার। আর

এরূপ স্বামী, সাধ্বী স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিলে তাঁহার নারী জীবনটাই ব্যর্থ হইবে ও তিনি কখনও সতীত্বের সার্টিফিকেট পাইবেন না ? বেশ ব্যবস্থা !

সমাজে এমন একশ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা এ শতাব্দীতে শরীর ধারণ করিলেও ভাব-জগতে তাঁহারা কয়েক শতাব্দী পেছনেই আনা গোনা করেন। এরূপ পুরাতনপন্থী লোকদের সঙ্গে হালের চালচলন কখনই খাপ খাইতে পারে না। তাঁহারা যত জোরেই পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নূতনপন্থীদিগের মুণ্ডপাত করুন না কেন, পরিবর্ত্তনশীল সমাজ সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার মনে, আপনার বেগে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবেই।

শ্রীক্ষিতিভূষণ ঘোষ।

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে যাহার হস্ত সর্ব্বদাই কল্যাণ বর্ষণের জন্য মুক্ত, কর্ম্মে আলস্যে দৈন্যে নৈরাশ্যে যিনি সমভাবে সঙ্গিনী, তাঁহাকে হিন্দু পণ্ডিতগণ অতি সূক্ষ্ম বিচারে দেবী রূপে অধিষ্ঠিত করিয়া মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তির চরম সীমাস্থল ও স্থানে উচ্চবেদী নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দু সমাজে দেবীপূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

যাহা মিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ তাহাই মাতৃনামে উচ্চারিত। নিজ বাসভূমি—যাহা জন্ম ও কর্ম্মের স্মৃতিতে বিজড়িত তাহার নাম মাতৃভূমি—যাহার সাহায্যে জীবন যাত্রার সর্ব্ব চলাচল নির্ভর করে তাহার নাম মাতৃভাষা। দেশ রক্ষক ও প্রজাপালক রাজা, বিদ্যাদাতা পণ্ডিত, জ্ঞানদাতা জ্ঞানী ও রক্ষাকর্ত্তা বীর—সবারই উৎপত্তি মাতৃগর্ভে, তাহাদের ও লালন সেই মাতৃহস্তে, তাহাদেরও পালন সেই মাতৃক্রোড়ে, ইহা হিন্দু পণ্ডিতগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে নীতি ও সমস্যা লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরা আজ দিশাহারা, তাহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু ঋষিগণ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সিন্ধুতট যেমন উর্ম্মিমালার ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিজস্ব অংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তেমনই এই ভারত, কালের ও অবস্থার নানা ঘাত প্রতিঘাতে স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়াছে। আজ নির্লোভ ত্যাগী ব্রাহ্মণ মাত্র পরোপকার ব্রতেই জীবন উৎসর্গ করেন না, মাত্র জিতেন্দ্রিয় পুরুষকেই গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত বিবেচনা করা হয় না, ধর্ম্মবলই শ্রেষ্ঠ বল গণনীয় নহে; রঘুবীরের ন্যায় সত্যরক্ষায় আত্মোৎসর্গ মানব ধারণার অতীত হইয়াছে, ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঔপন্যাসিক গল্পের আশ্রয় স্থল হইয়াছে।

বহুদিনাবধি বাঙ্গলার সকল কল্যাণ সকল শ্রী নষ্ট হইয়াছে। সমাজ প্রবল তরঙ্গাঘাতে কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় বিভিন্ন বায়ুর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে, তাহার বিচার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। নিজের নিজস্ব পদার্থের অন্বেষণ-অভাবে ক্রমে ক্রমে এইরূপে সোনার ভারত স্বর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। জগতের সেই নারীত্ব যাহার উপর মানব জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, অদ্য তাহার স্থান কোথায় ? তাহার জননী, পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী, গৃহের গৃহিণী নাম কোথায় ? সর্ব্বকর্ত্রী নারী অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, ভর্ৎসিত, পরমুখাপেক্ষী, গৃহাবদ্ধা, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের সম্পর্কিতা আজ্ঞাকারী ভৃত্যসম আদেশ পালনে রতা, অজ্ঞানতা মূর্খতা ও অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তিনী; স্বামীর ভোগের ও বিলাসের সামগ্রী হইয়া মাত্র দৈনিক তণ্ডুলাদির পরিমাণের প্রতিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই সর্ব্ব ধর্ম্ম সংরক্ষণ জ্ঞান করিতেছেন! এইরূপে নারীর নারীত্ব

লুপ্ত হইয়া সমস্ত হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্রমে ক্রমে শূন্যে বিলীন হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"একমাত্র দ্রৌপদীর অপমানের প্রায়শ্চিত্তই সমগ্র দেশ এখনও করে নাই।" কিন্তু কত শত শত দ্রৌপদী যে দেশের গৃহে গৃহে লাঞ্ছিত তাহার সংবাদ কয়জন রাখেন? গৃহে গৃহে যে হিন্দু নারী অশ্রুধারা দিবারাত্র মোচন করিতেছে, তাহার সংবাদ কয়জন রাখেন? যখন তাহারা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করে তখনই সে সংবাদ বাহিরে জনসঙ্ঘের কর্ণগোচর হয়।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা"—যে নারী প্রকাশ্য সভায় শাস্ত্রালোচনার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহ বরণীয় হইয়া আসিয়াছেন, অদ্য তাঁহার স্থান কোথায়? তিনি অদ্য অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া অজ্ঞানতার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পুরুষের সুবিধা অসুবিধার সামগ্রী হইতেছেন। ফলে তাঁহাদের সন্তানগণ পরপদ-দলিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, হীন জীবন যাপন করিতেছেন। ছাত্রজীবন গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে এখন বিলাসিতায় ভরপুর। চুরুটের ধূমরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোটা দুই ছাপ অঙ্গে লইয়া ছাত্রগণ মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। যে ছাত্রগণ সংযমী, বীর, শান্ত, পবিত্র-চরিত্র, সমাজের মুখোজ্জ্বলরূপে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারাই আজ বিলাসের দাস, অসহিষ্ণু, ভীরু, উদ্ধত, অপবিত্র, কলঙ্কিত জীবন যাপন করিয়া মহা দম্ভ প্রকাশ করিতেছে।

অসংযমী বালক বিবাহদ্বারা নিজেকে মহালাভবান্ এবং নিজেকে পতি দেবতার সম্মান লাভের অধিকারী জ্ঞান করিয়া হিন্দু সমাজকে স্বেচ্ছাচারের স্রোতে ভাসাইয়া চলিয়াছে। যাহাদের সংযম একগাছি কেশের অপেক্ষাও ক্ষীণ, তাহারাই পত্নীকে সংযমী হইয়া পতিসেবার সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া নিজেকে দেবপদবাচ্য রূপে প্রমাণ করিতেছে। পত্নীর ইহকাল ও পরকালেরও কর্ত্তা হইয়া তাহার দ্বারা নিজেকে বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের সমতুল্য স্থান করাইবার জন্য পুঁথি রচনা করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা ও দ্বিধা বোধ করিতেছে না।

এইরূপে অসংযমী, অজ্ঞান, অপরিণত বয়স্ক বালক কিংবা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি একটী অজ্ঞান, পুতুল খেলায় নিযুক্ত, দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে আনিয়া সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবনের সকল আনন্দ ও কল্যাণগুলিকে একে একে ধ্বংসের মুখে দিয়া সেই মাতৃমূর্ত্তিটীকে তাহার ন্যায্য আসন হইতে অপসারিত করিয়া তাহার প্রকৃত শিক্ষার পথ বন্ধ করিতেছে।

যে জাতি ও যে সমাজে সীতা সাবিত্রী ও দময়ন্তীর স্থায় সাধ্বী স্ত্রী, খনা লীলাবতী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর স্থায় বিদুষী এবং দ্রৌপদী কুন্তী ও গান্ধারীর নায় ধার্ম্মিকা রমণীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই আদর্শ লইয়া এই পুরুষগণ দাম্ভিকতা বশে স্ত্রীগণকে মাত্র বস্ত্রালঙ্কারে তুষ্ট রাখিবার সামগ্রী জ্ঞানে সেই আদর্শেরই লাঞ্ছনা করিতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয়, সত্যবাদী সত্যবান ও সহিষ্ণুতার আধার নলরাজার আদর্শ তাহাদের ধারণার অতীত হইয়াছে।

অন্যায় ও অত্যাচার নত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিলেই স্ত্রীগণ তাঁহাদের প্রদত্ত "সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান" দখল করিলেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহা স্বেচ্ছাচারিতা ভিন্ন আর কি? যে হিন্দুগণ স্ত্রীগণকে একদিন দেবীর আসন দিয়াছিলেন, ক্রমে সেই হিন্দুনামধারী বিজ্ঞগণই স্ত্রীকে সর্ব্বাবস্থায় আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া জীবন কাটাইবার জন্য বিধি ও ব্যবস্থার খাতা খুলিলেন। এমন কি হিন্দুস্ত্রী সংসারে গ্রাসাচ্ছাদনেরও দাবী সম্পূর্ণ রূপে পাইলেন না, দয়ার ভিখারী হইয়া সংসারের সমস্ত সুখ দুঃখ ও সুবিধার জন্য দুর্ব্বল দেহ লইয়া সবলের অত্যাচার বহন করিতে নিয়োজিতা হইলেন। নিজ মাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী, কন্যাগণকে জীবন্তে পোড়াইয়া একদিন সহমরণের পুণ্যলাভ করাইয়াছেন—তাহাদেরই নিকটেই দাবী করিতেছেন পিতার সম্মান, পতির ভক্তি, ভ্রাতার স্নেহ ও পুত্রের বাৎসল্য। নারী সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ সমাজ বিধান করিলেন যে,

নিজেদের মধ্যে যে সকল দোষ ত্রুটি অতি তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করেন, যদিই কোনও অবস্থায় বিপর্য্যয়ে নারীর এক তিলও সে সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যু ভিন্ন তাহার গত্যন্তর থাকে না! তখন পিতা পিতা নহেন, পতি পতি নহেন, ভ্রাতা ভ্রাতা নহেন এবং পুত্রও পুত্র নহেন।

যদি সমাজের কোনও বিষয়ে, কোনও কার্য্যে কিংবা কোনও শাস্ত্রে বা বিধি বিধানের সীমায় স্ত্রীগণের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইল, তবে কে তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী গ্রাহ্য করিবে? একের প্রয়োজনে বা একের সুখের জন্য অপরে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা অজ্ঞ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। "স্ত্রীর সতীত্ব মাত্র স্বামীর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত" ইহার তুল্য মূর্খতা আর নাই।

মনুষ্যত্বকে অধোগামী করিয়া বশুতার মর্য্যাদাকে ঊর্দ্ধগামী করার চেষ্টা বিংশ শতাব্দীতে বৃথা চেষ্টা। পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে যাঁহারা কলঙ্ক প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাঁহাদের গুণ অন্বেষণ করিবার শক্তি রাখেন না, মাত্র দোষান্বেষণই করিয়া থাকেন। যাঁহারা পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, যাঁহাদের স্বাস্থ্য আয়ু, শক্তি সর্ব্বজাতির বাঞ্ছনীয়, তাহাদের সমাজের মাতৃজাতিকে লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার উপযুক্ত পাত্র বঙ্গবীরগণই বটে! আত্ম-চরিত্রে বিশ্বাসবান্ হইতে পারিলেই পর চরিত্রে বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতেন।

যখন মহাত্মা রামমোহন রায়, হিন্দুসমাজের ঘৃণিত ও কলঙ্কিত প্রথার উচ্ছেদের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন তো এই হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাকর্ত্তা ও পণ্ডিত মণ্ডলীই সেই মত খণ্ডন এবং ঐ জঘন্য প্রথার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। অদ্যাবধিও বাল-বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া, তাহাকে অশুচিজ্ঞানে তফাৎ রাখিয়া, তাহারই চক্ষের সমক্ষে পিতা ভ্রাতা ও পরিজনেরা বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলেন, যত প্রকার বিলাস ও আমোদে মগ্ন থাকা সম্ভব তাহাতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, জীবন্তে ঐ বাল বিধবাকে পার্থিব সকল বিলাসের মধ্যে রাখিয়া এবং সমস্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া অবোধ বালিকাকেও বলপূর্ব্বক পুণ্য লাভ করাইতেছেন, ইহার সহিত সতীদাহের কতটা প্রভেদ?

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান এরূপ হীনতাপূর্ণ কখনই ছিল না। ভারতে নারী সর্ব্বাবস্থায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি সংগ্রহ করা যায়।

"ভারতীয় নারী সমাজ চিরকালই এমন উপক্ষিত ও অবরোধের মধ্যে বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞ হইয়া ছিলেন না। তাঁহারাও বিদ্যায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন এব্য তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়া ধিক্কৃত হইত না। যতদিন ভারত বর্ষ জ্ঞানগরিষ্ঠ বলিয়া পূজিত, ততদিন পর্য্যন্ত দেখা যায় যে ভারতীয় নারী-সমাজও সেই অর্ঘের অংশ লইয়াছেন এবং যখনই নারী-সমাজ অবরুদ্ধ ও উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন, তখনই ভারতও হীন হইয়া শুধু প্রাচীন কালের দোহাই দিয়া কোনও প্রকারে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।" *

হিন্দুশাস্ত্রকার, পতি পত্নী উভয়কেই তুল্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—তাঁহারা উভয়কে উভয়ের অধীন জ্ঞাপন করিয়াছেন, স্ত্রীকেই মাত্র অধীন করেন নাই এবং সতীত্বের মর্য্যাদা মাত্র পতির উদ্দেশে নিয়োজিত এ কথাও প্রচার করেন নাই। আশ্রয়স্থল তাঁহারা স্ত্রীকে দিয়া, আশ্রিতের স্থলই অধিক মাত্রায় পুরুষকে দিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রকার স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, অন্যের হস্তে পড়িয়াই শাস্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রের অধীন হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী—

"যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥৫৬॥

---

* "ভারতীয় বিদুষী"—শ্রীযুক্ত মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

ত্বং কলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতি যঃ পুমান্
সোঽহমেব চ ॥৬৮॥

অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকাক্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধঞ্চ ত্বাং বিনা॥ ৬৯॥
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা।
সংযুশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্॥ ৭০॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি॥ ৭১॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা॥ ৭২॥
অহং ধর্ম্মঞ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণী।
নাহং শক্তো ধর্ম্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা॥৭৩॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোঽপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা॥ ৭৪ ॥
কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদানালং ত্বয়া বিনা॥ ৭৫॥
ত্বঞ্চ সম্পৎ স্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিঃশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা॥ ৭৬॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা॥৭৭॥
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি॥ ৭৮॥
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুত্তৃষ্ণা চ পরা দয়া॥ ৭৯॥
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্চ্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী॥৮১॥
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতি পুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥ ৮১॥
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৬৭ অধ্যায়—"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ"॥

অর্থ—যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি সেখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশ কলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ তাহাই আমি। কলাদ্বারা আমি বহ্নি তুমি দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমানদিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তিমান হই, তুমি সঙ্গে না থাকিলে হই না। কলাদ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি, আমি কলাদ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলাদ্বারা ধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মিণী মূর্ত্তি; ধর্ম্মক্রিয়ার স্বরূপা, তুমি ব্যতীত আমি ধর্ম্মকার্য্যে সক্ষম হই না। কলাদ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলাদ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি তুমি আপনার অংশে স্বধা; তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎ স্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি শ্রেষ্ঠ, তুমি লক্ষ্মী তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ তুমি প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট করিতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই স্রষ্টা হইতে পারি না। আমি কলাদ্বারা শেষ, তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা; হে সুন্দরি! শস্যরত্নাধার স্বরূপা তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি! হে সতি! তুমি শান্তি কান্তি মূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং তুমি পরা দয়া, শুদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্ততি, ক্রিয়া, মুক্তিরূপা, ভক্তিরূপা এবং জীবের দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা, যেখানে তুমি সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইয়ের একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।"

স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত এই বাণী। কিন্তু সমাজকর্ত্তা প্রভুরা ইহাকে উড়াইয়া দিয়া আপন আপন ব্যবস্থার পুঁথিকে অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। যদি

সেই মত বা নিয়মের কোথাও লঙ্ঘন হয়, তাহা হইলে পুরুষের নিয়মভঙ্গ যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় ও নারীর নিয়মভঙ্গ বিশেষরূপে ধর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রবারের মত নয়—পতিত হইলে উভয়েই সমপরিমাণে পতিত ও পতিতা।

হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্রমে আত্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়াছেন। অদূরদর্শী লোকের অভিরুচি মত বিধিব্যবস্থা স্থাপন এবং তাহারই পালন মাত্র ধর্ম্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, জ্ঞান ও বিদ্যালাভের পথ চির রুদ্ধ, তাহা হইলে বিখ্যাত বিদুষী নারী সকল কি প্রকারে হীন ও জাতিচ্যুত না হইয়া শ্রেষ্ঠস্থান পাইয়াছেন? ভারতের হীনাবস্থার কালেই নানারূপ অস্ত্র শাস্ত্রবিধি দেখা যায়—যথা বেদ পাঠ এমন কি বেদ শ্রবণেও স্ত্রীগণের অধিকার নাই। কিন্তু ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় সে বৈদিক কালে বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত স্ত্রীগণ রচনা করিয়াছেন এবং সেই সকল মন্ত্র ঐ বিখ্যাত গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। নারীর স্বাধীনতা যখন পুরুষের অত্যাচারে খর্ব্ব করা হয় নাই, সেই সময়ে বিশ্ববারা ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাগের অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করেন। এই সূক্তে যে ছয়টী ঋক্ আছে তাহা ভাব সম্পদে অতুলনীয়। ইন্দ্রমাতৃগণ, অম্ভন ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী, আপালা দেবী, বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রা, অদিতি দেবী, অঙ্গিরার কন্যা শাশ্বতী দেবী, উর্ব্বশী, ঘোষা, সূর্য্যা, বৃহস্পতি ভার্য্যা জুহু, ইন্দ্রাণী, শ্রদ্ধাদেবী ইত্যাদি আরও বহু নারীর নাম উল্লেখ দেখিতে পাই। ভারতের সভ্যতার যুগে নারীকে উপযুক্ত আসন দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা ছিল না।

যে পতিভক্তি ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কর্ত্তারা গর্ব্ব ও দম্ভ প্রকাশ করেন, তাহা যদি কাহারও বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান ও স্বাধীনতা প্রত্যেককে আত্ম-বিচারে অন্বেষণ করিবার অবকাশ দিতে হইবে; নতুবা বৃথা চেষ্টা। বিদ্যানুরাগী ও উন্নতচিত্ত রাজকন্যারা যেরূপ স্বেচ্ছায় দরিদ্র ঋষিগণকে পতিত্বে বরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত অধুনা কোথায়? তাঁহারা স্বেচ্ছায় পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সানন্দ চিত্তে জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া চিরদারিদ্র্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। কিন্তু অধুনা কন্যার পিতার দৃষ্টি হীন ও ক্ষীণ হওয়ায়, তাঁহাদের কন্যাগণও পিতার পন্থানুসরণে ভোগ ও বিলাসের সাগরে ডুবিতেছেন। বর্ত্তমান কালে মূর্খ রাজপুত্র বা জমিদার পুত্রকে জামাতৃরূপে বরণ করিতে পারিলে বহু কন্যার পিতা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন।

পুরাকালে অশ্বপতি রাজা নিজ কন্যা সাবিত্রীকে নিজে পতি মনোনীত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ আস্থাবান ছিলেন, কন্যার প্রতিও তদ্রূপ ছিলেন। পরে পিতার নিষেধ সত্ত্বেও সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহে ইচ্ছুক জানাইতেছেন, আর সত্যবানের অল্পায়ুর জন্যই রাজা অনুমতি প্রদানে বিরত হইতেছেন। তাঁহার বিরাগের অন্য কারণ ছিল না এবং ইহার জন্য কন্যাকে শাসন অবরোধ ইত্যাদিও তিনি করেন নাই। অধুনা এরূপ ঘটিলে তাহাকে পাশ্চাত্য অনুকরণ বলিয়া লোকে ছি ছি করিত।

যে সমাজের শাস্ত্র সন্তানের সমস্ত জীবনব্যাপী সেবা-তেও মাতৃঋণের এক কণিকা পরিশোধ করা যায় না জানাইয়াছেন, সেই সমাজই এইরূপ অবস্থান্তরিত হইয়াছে যে, কবি নিত্য সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

"কচি মেয়ের একাদশী, জল চেয়েছে মা'র কাছে
বাপ এসে তা' কর্ব্বে আটক, ধর্ম্ম খসে যায় পাছে—
এও মানুষে ধর্ম্ম ভাবে। হায়রে দেশের অধর্ম্ম!
হায় মূঢ়তা—এর তুলনায় হত্যাও নয় কুকর্ম্ম।
হত্যা—সে লোক ঝোঁকেই করে, এক নিমেষে
সকল শেষ;
এযে কেবল দগ্ধে মারা, বাপ্য করা মৃত্যুক্লেশ
বিনা পাপে শাস্তি এযে, ধর্ম্ম এ নয়, হররাণী
এর স্বপক্ষে শাস্ত্র নেইকো, থাকতে পারে শয়তানী।"

আবার—

"কন্যা ঘরের আবর্জ্জনা, পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়;
পালনীয়া, শিক্ষণীয়া, রক্ষণীয়া মোটেই নয়।

ভদ্র ধাঙড় আছেন দেশে করেন যাঁরা বদ্গতি,
কামড় তাঁদের অর্দ্ধরাজ্য, পরের ধনে লাখপতি।
হায় অভাগ্য! বাঙ্গলা দেশের সমাজ বিধির তুল্য নাই
কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।"

ইহা হইতেই সমাজ-কর্ত্তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশের পুরুষ, স্বেচ্ছাচারের দণ্ড হস্তে, কপাটের কুলুপ লাগাইয়া চাবি হস্তে দণ্ডায়মান, সে দেশের গৃহাভ্যন্তরের নারীগণের কাঁদিয়া মাটী ভিজান ছাড়া অন্য উপায় কি আছে?

নেপোলিয়ান, নেল্‌সন, সেক্ষপীয়র ও মিলটন্‌ প্রকৃতই মাতৃসম্মান জানিতেন, তাই নেপোলিয়ান মুক্ত কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছেন—"The hope of France is on her mothers."

গৃহধর্ম্ম নারীর সহজাত সংস্কার, হিন্দুনারী ইহাকে জীবন পথের আনুসঙ্গিক জ্ঞানেই জীবন যাপন করেন এবং সেই জন্যই তাঁহারা গৃহের গৃহিনী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। বিদ্যা, স্বাধীনতা ও জ্ঞান ইহার প্রতিবন্ধকতা করে নাই, সার্থকতা সাধন করিয়াছে। গৃহধর্ম্মই হিন্দুনারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণনা করিতেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। যদি ইহার বিপরীত লক্ষণ কোথাও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে নারীকে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে—তাহার ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং ফলে তাহার প্রতিযোগিতা করার আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছে। নতুবা হিন্দু পুরুষ যতদিন ধার্ম্মিক ও বীরের ন্যায় আচরণ করিবেন, ততদিন হিন্দুনারীর জননী ও সহধর্ম্মিণীর পদ লুপ্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। যতদিন হিন্দুনারীর স্বামী ও পুত্র শাস্ত্রাদেশের দোহাই দিয়া জননী ও পত্নীর সর্ব্বশক্তি হরণ করিয়াও ধার্ম্মিক নামে বজায় থাকিবেন, ততদিনই স্ত্রীও অনুরূপ ধারণ করিবে; নতুবা হিন্দুসমাজে নারীর স্থান যেরূপ ছিল—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ।"

সেইরূপই থাকিবে॥

শ্রীস্বর্ণলতা সরস্বতী।

মুক্তিবাদ

দুঃখনাট্যের রঙ্গভূমি সংসারে জীব কখনও কৃমি, কখনও কীট পতঙ্গ, কখনও শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি পশুদেহ, কখনও বা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অনাদিকাল হইতে দুঃখের অভিনয় করিয়া আসিতেছে। সুতরাং দুঃখের প্রতিকূলতা সম্বন্ধে সকলেরই সম্যক্‌ অনুভব আছে। ঐ দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। দেহকে অধিকার করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহার নামই আধ্যাত্মিক; জ্বর, শিরোরোগ প্রভৃতিই তাদৃশ দুঃখ। প্রাণীকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই আধিভৌতিক; চোর দস্যু ব্যাঘ্র প্রভৃতি-জন্য দুঃখই তাদৃশ। বজ্রাঘাত প্রভৃতি-জন্য দুঃখ আধিদৈবিক; তাহা প্রতিকূল দৈবমাত্রকর্ত্তৃক আনীত বলিয়াই আধিদৈবিক।

শরীরধারণ করিলেই দুঃখের অনুভব অবশ্যই করিতে হইবে। জ্ঞানভাণ্ডার বেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"নহ বৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।"

অর্থাৎ শরীর ধারণ করিলেই সুখদুঃখের অনুভব অবশ্যই করিতে হইবে; শরীর ধারণ করিলে সুখদুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ঐ শরীর ধারণের কারণ অদৃষ্ট। অদৃষ্ট—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। অদৃষ্টের কারণ—রাগ এবং দ্বেষ।

আমরা অনুরাগ এবং বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি। সুতরাং ঐভাবে সম্পাদিত কার্য্যদ্বারা আমাদের অদৃষ্ট অহর্নিশ সঞ্চিত হইতেছে।

জীবন্মুক্তব্যক্তিগণ রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কোনপ্রকার অদৃষ্ট-সঞ্চয় হয়না।

ঐ রাগদ্বেষের কারণ মিথ্যা জ্ঞান। ঐ মিথ্যাজ্ঞান শব্দের অর্থ—জীবাত্মার স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞান। ঐ স্বরূপটী জানিবার জন্য এবং জানিয়া সর্ব্বদা ধারণা করিবার জন্য জ্ঞানসম্রাজ্যের অধীশ্বর বেদ আদেশ করিয়াছেন, যে,—

"আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা ষতিব্যঃ ॥"

আত্মশব্দের অর্থ দ্বিবিধ—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। বেদ ঐ দ্বিবিধ আত্মারই দর্শন, শ্রবণ, মননাদির বিধান করিয়াছেন।

আমরা জীবাত্মার স্বরূপটী বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই সংসার লবণসমুদ্রে ডুবিয়া অহর্নিশ দুঃখরূপ ঘোরতর নোনাজল পান করিতেছি।

আমাদের জীবাত্মার সম্বন্ধে অজ্ঞান সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সুতরাং আমরা সর্ব্বদাই অহং স্থূলঃ, অহং কৃশঃ, অহং কাণঃ, অহং বধিরঃ, অর্থাৎ আমি মোটা, আমি রোগা, আমি কাণা, আমি কালা ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি। অহং বা আমিশব্দের অর্থ আত্মা, আত্মার দেহ বা ইন্দ্রিয় নাই, থাকিলে আমি বা অহং মোটা, রোগা, কালা, এবং কাণা হইতে পারিত।

ঐ ব্যবহারের মূল দেহ বা ইন্দ্রিয়ের প্রতি আত্ম-স্বাধ্যাস। আত্মা, শরীর, এবং ইন্দ্রিয় একপদার্থ নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যখন দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝি, তখন দেহধর্ম্মের স্থূলত্ব এবং কৃশত্ব আত্মারপ্রতি প্রয়োগ করি। যখন আবার ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া বুঝি, তখন ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের কাণত্ব এবং বধিরত্ব আত্মার প্রতি অর্পণ করি। এই অজ্ঞান অনাদিকাল হইতে জীবের চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তজ্জন্য যে কুসংস্কার উপস্থিত, তাহা এত প্রবল যে শাস্ত্রপাঠ বা পণ্ডিতগণের উপদেশ ঐ সংস্কারকে দূর করিতে পারে না।

ধারাবাহিক নিদিধ্যাসনদ্বারা সম্যক্ জ্ঞান দৃঢ়তম হইলে তজ্জন্য সংস্কার দৃঢ়তম হয়। তাহার পর ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কুসংস্কারগুলি বিনষ্ট হয়। তাহার কারণ, শাস্ত্রপাঠ বা উপদেশ জন্য জ্ঞান দৃঢ়তম না হওয়ায় ঐ অজ্ঞান জন্য কুসংস্কারের নিকট পরাজিত।

পরমেশ্বর বিষয়ক অজ্ঞান সংসার-কারণ নহে। জীব-বিষয়ক অজ্ঞান সংসার-কারণ। সুতরাং বেদবিহিত তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মা জীবাত্মা, পরমাত্মা নহে। সুতরাং যে আত্মার ভ্রম সংসার-কারণ, সেই আত্মারই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলে ঐ সংসারকারণ এবং অনাদিকাল হইতে আগত মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে রাগদ্বেষ আর থাকে না। রাগদ্বেষ বিনষ্ট হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা আর অদৃষ্ট-সঞ্চয় হয় না।

পূর্ব্বসঞ্চিত অদৃষ্টের মধ্যে যেগুলি ফলোন্মুখ হয় নাই, সেইগুলির কার্য্যকারিতাশক্তি নষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানই ঐ নাশের কারণ। শরীরধারণ যে অদৃষ্টের ফল, অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর যে অদৃষ্টের ফলস্বরূপ, তাহাকে প্রারব্ধ বলে। ফলোন্মুখ অদৃষ্টের নাম প্রারব্ধ।

প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দেহের অবসান হয় না। বর্ত্তমান দেহের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত সুখদুঃখের সংস্রব থাকে। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে—

"অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

অর্থাৎ শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না হইলে সুখদুঃখের ভোগ হইতে অব্যাহতি নাই।

তত্ত্বজ্ঞ, অথচ প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়ায় অনিবৃত্ত শরীর জীবকে জীবন্মুক্ত বলে।

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ এই জীবন্মুক্ত অবস্থাকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাদ্ ধর্ম্মাদীনামকরণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ ধৃতশরীরঃ ॥

—অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উদয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগাদির কারণ হয়না। তখন কুলাল-ব্যাপার না থাকিলেও বেগরূপ

সংস্কার বলে কুলাল চক্র ভ্রমণের ন্যায় প্রারব্ধ ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ সংস্কারবলেই (কিছুদিন) শরীর ধারণ করিয়া থাকা ঘটে।—অর্থাৎ যেমন কুম্ভকার একবার ঘুরাইয়া দিলে কুম্ভকারচক্র বেগবশে অনেকক্ষণ চলে, সেইরূপ ক্ষয়োন্মুখ ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রারব্ধই স্বোৎপাদিত ঐ দেহ ধারণ করাইয়া দেয়।

প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে দেহনিবৃত্তি হয়, এবং দেহ-নিবৃত্তি হইলে চিরকালের মত দুঃখনিবৃত্তি হইয়া যায়। ঐ প্রকার দুঃখ নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ মুক্তি।

পরমেশ্বরের উপাসনা ঐ দ্বিবিধ মুক্তিরই কারণ। জ্ঞানের আকর বেদই ইহার প্রমাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ" অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর উভয়কেই সম্যক্ রূপে জানিবে। পরব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরমাত্মা (পরমেশ্বর), অপরব্রহ্ম শব্দের অর্থ জীবাত্মা। ঐ জ্ঞানের পর্য্যবসিত ফল মোক্ষ।

"বৃহত্বাদ্‌বৃংহনত্বাদ্বা আত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥"

বৃহ ধাতু বা বৃংহ ধাতু হইতে ঔনাদিক প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দের অর্থ আত্মা ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। "দ্বে ব্রহ্মণী" এই কথা বলায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মা যে পৃথক্ পদার্থ ইহাও বলা হইল।

পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে তাঁহার দয়ায় জীব নিজ স্বরূপটী বুঝিতে সক্ষম হয়। তত্ত্বজ্ঞানের পর প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে শরীরনিবৃত্তি হইয়া যায়; আর শরীর ধারণ করিতে হয়না। শরীরনিবৃত্তি হওয়ায় শরীরের নিয়ত সহচারী দুঃখ আর থাকে না।

দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য জীবের ইচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু একেবারে সংসার ছাড়িয়া দুঃখমুক্ত হইতে কাহারও ইচ্ছা দেখা যায় না। নিজ নিজ রুচি অনুসারে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সকলেই অনবিরত চেষ্টা করিতেছে। ইহার অপলাপ করিলে সত্যের অপলাপ করিতে হয়। দুঃখ কাহারও প্রিয় নহে। যাহা সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ।

দৃষ্ট উপায় চিকিৎসাদি দ্বারা রোগাদি-জন্য দুঃখ-নিবৃত্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ নিবৃত্তি চিরকালের জন্য হয়না; একবার নিবৃত্তি হইলেও পুনরায় আবৃত্ত দেখা যায়। সংসারে সুখ থাকিলেও দুঃখ তাহার নিকটে বর্ত্তমান। সুখ এবং দুঃখ দুইটীই পাশাপাশি বস্তু। এই জন্য কোনও ভাবুক কবি বলিয়া গিয়াছেন যে—

"ক্বচিদ্‌বীণাবাদ্যং ক্বচিদপি চ হাহেতি রুদিতং
ক্বচিন্নারী রম্যা ক্বচিদপি জরাজর্জ্জরবপুঃ।
ক্বচিদ্‌বিদ্বন্ মোদঃ ক্বচিদপি সুরামত্তকলহো
ন জানে সংসারং কিমমৃতময়ং কিং বিষময়ম্ ॥"

কিন্তু দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলে আর দুঃখ-ভোগ করিতে হয়না।

এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষপদবাচ্য। মুক্তি এবং অপবর্গ মোক্ষের অপর নাম। এই মোক্ষ সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপই মুক্তি। ইহা সর্ব্বদাই থাকে। ইহা নিত্য, সুতরাং ইহার ধ্বংস বা উৎপত্তি নাই। ব্রহ্মের স্বরূপই যদি মুক্তি হয়, তবে জীব মুক্তিলাভ করে, ইহা কিরূপে হয়? জীব আর ব্রহ্ম তো এক নহে! এইরূপ আশঙ্কাকারীদিগের প্রতি বৈদান্তিক গণের বক্তব্য এই যে, জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, কিন্তু বিশ্ববিমোহনকারিণী অবিদ্যার প্রভাবে, অবিদ্যার প্রভাবক্ষেত্র সংসার দশাতে সেই জীব ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে।

সংসারও সেই কল্পনাশক্তিময়ী অবিদ্যার রাজ্য। এ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই কল্পিত। সহসা তাহা বুঝা যায় না। যেরূপ ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রভাবে যে বস্তুটীকে সৃষ্ট করে, তাহা অসত্য হইলেও উক্ত ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, ইহাও তদ্রূপ।

শাস্ত্রচর্চ্চাদিদ্বারা যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপটী জ্ঞাত হওয়ায় সেই আবরণটী, অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর কল্পিত ভাবটী, মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় নিবৃত্ত হয়। সুতরাং তখন ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপটী প্রকাশিত হয়।

ইহার দৃষ্টান্ত রূপে দেখানো হয়-কোনও রাজপুত্র অতি শৈশবে যদি চণ্ডাল গৃহে পোষিত হয়, তখন সে আত্মজ্ঞানের অভাবে ক্রমেই নিজেকে চণ্ডাল বলিয়া মনে করে এবং তদনুরূপ কার্য্যও করিতে থাকে। তখন যদি কোন পরিজ্ঞাতা বিশ্বাসী ব্যক্তি সেই রাজপুত্রের নিকট আসিয়া তাহাকে বলেন যে, তুমি চণ্ডালের পুত্র নও, তুমি রাজপুত্র; তখন সেই রাজপুত্র সেই বিশ্বাসী ব্যক্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় রাজপুত্রত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়তর ধারণা বশতঃ, অজ্ঞান পূর্ব্বক আরোপিত সেই চণ্ডাল ভাবটী পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বাভাবিক সেই রাজপুত্র ভাব গ্রহণ করে। তখন সেই আরোপিত ভাবটী হইতে সে মুক্ত হইল।

সেই নিজ স্বাভাবিক ভাবটী যে তৎকালেই উৎপন্ন হইল, এই কথাও বলা চলে না। কারণ ঐ ভাবটী পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে তাহা আবৃত ছিল, এখন তাহা প্রকাশিত হইল মাত্র।

জীবের মুক্তি সম্বন্ধেও এই ভাব। এবং অজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র সংসারদশাতে রাজপুত্রের চণ্ডাল ভাবের ন্যায় ব্রহ্মের জীবভাব,—তখন ব্রহ্ম ভাবটী আবৃত।

সুতরাং মুক্তি নিত্য পদার্থ ইহাই বৈদান্তিকগণের অভিপ্রায়। (প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গৌতমাবতার পূজ্যপাদ ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন—"বরং নাস্তিকদর্শন অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের দর্শন সহ্য করিতে পারি, এবং তাঁহাদের দর্শন মত চলিলে যে পাপ হয়, তাহাও বহন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ মানিয়া ব্রহ্মকে কৃমি, কীট, শৃগাল, কুক্কুর বলিয়া ঘোরতর পাপ সঞ্চয় করিতে প্রস্তুত নহি।")

সকলেরই প্রমাণ রূপে আদৃত উপনিষৎসারসংগ্রহ-ভূত ভগবদ্‌গীতা, জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ মানেন নাই। তিনি জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥"

ইহার অর্থ—জীবগণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার সাদৃশ্যলাভ করিয়া সৃষ্টিকালে শরীর ধারণ করে না। এবং নিখিল অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে চিরকালের জন্য দুঃখহীন হয়।

সাধর্ম্ম্য শব্দের অর্থ 'সাদৃশ্য'। সাদৃশ্য শব্দের অর্থ উপমেয়ের উপমান হইতে ভিন্ন ভাবে থাকা এবং উপমেয়ে উপমানগত বহুবিধ ধর্ম্মসত্তা।

সুতরাং সাধর্ম্ম্য শব্দ প্রয়োগ থাকায় জীব এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান্ একবস্তু নহে ইহা ব্যক্ত হইতেছে। একবস্তু হইলে এখানে সাধর্ম্ম্য শব্দের প্রয়োগ হইত না। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের ভেদ না থাকিলে সাধর্ম্ম্য শব্দের প্রয়োগ হয় না। দুইটী বস্তুকে লইয়াই সাধর্ম্ম্য ব্যবহার হয়।

লক্ষণা দ্বারা সাধর্ম্ম্য শব্দের অভেদ অর্থ করা সঙ্গত নহে। অর্থবোধের অনুপপত্তি হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। এখানে কোন প্রকার অনুপপত্তি নাই।

মুক্তি লইয়া মতভেদ থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাধন এই সম্বন্ধে মতভেদ নাই। আর এ সকল, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে "নোপজায়ন্তে ন ব্যথন্তি" এই প্রকার বহুবচন তিঙ্ প্রয়োগ উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম এক। ব্রহ্ম এক হইলেও কল্পনাময়ী অবিদ্যা এবং জীব বহু বলিয়া বহুবচন প্রয়োগ হইতে পারে, এই কথাও বৈদান্তিকগণ বলিতে পারেন না। কারণ মুক্তির অবস্থায় বহুত্বাস্পদ অবিদ্যা এবং জীব কোথায়? তখন যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। "প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ইহার সমুদিত অর্থ অদৃষ্ট ক্ষয়কালীন দুঃখাভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই মুক্ত অবস্থা।

সুতরাং গীতার মতে অদৃষ্টাভাব বিশিষ্ট দুঃখাভাব মুক্তি। পরমেশ্বরে অদৃষ্ট নাই, সুতরাং অদৃষ্টাভাব সদাই বর্ত্তমান, এবং পরমেশ্বরে দুঃখও নাই, সুতরাং দুঃখাভাবও সর্ব্বদা উপস্থিত।

জীবেরও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিখিল অদৃষ্ট ক্ষয় হওয়া

অদৃষ্টাভাব এবং অদৃষ্ট ক্ষয় হওয়ায় অদৃষ্টফল দুঃখের নিবৃত্তি বশতঃ দুঃখাভাবও উপস্থিত।

অতএব পরমেশ্বর ও জীবের তথাকথিত অদৃষ্টাভাব এবং দুঃখাভাব লইয়া মুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। কেবল দুঃখ ধ্বংসকে মুক্তি বলা যায় না, কারণ সংসার দশাতেও দুঃখধ্বংস আছে।

সংসারী ব্যক্তিগণের নিয়ত কত শত শত দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে, এবং জলবুদ্‌বুদের মত প্রতিক্ষণে নষ্ট হইতেছে দুঃখ তো স্থায়ী পদার্থ নহে, যে, চিরদিন থাকিবে। সুতরাং সংসারী জীবকেও মুক্ত বলায় আপত্তি হইতে পারে। সেই জন্য দুঃখাভাবে অদৃষ্ট ক্ষয়কালীনত্ব বিশেষণ দিতে হইবে।

সংসার-কালে সত্বর ফলদায়ী এবং বিলম্বে ফলদায়ী বহুপ্রকার অদৃষ্ট থাকায় সংসার-কালীন অতীত দুঃখাভাবে নিখিল অদৃষ্ট ক্ষয় কালীনত্ব বিশেষণ থাকিতে পারে না।

নৈয়ায়িকগণের মতে আত্যন্তিক ভাবে দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। ঐ নিবৃত্তি শব্দের অর্থ ধ্বংস। ধ্বংস জন্য-পদার্থ। তত্ত্বজ্ঞান ঐ ধ্বংসের কারণ। সুতরাং ন্যায়-মতে মুক্তিও জন্য-পদার্থ।

সংসারী ব্যক্তিগণের দুঃখ অগণিত ভাবে সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে, এবং জলবুদ্‌বুদের মত প্রতিক্ষণে স্বয়ং নষ্ট হইতেছে, তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য কোন প্রকার আয়াস করিতেও হয় না। সুতরাং তাহার জন্য মোক্ষোপযোগী শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাহা অনায়াসসিদ্ধ, তাহাকে সম্পাদন করিবার জন্য বৃথা আড়ম্বরের আবশ্যকতা থাকে না— এই প্রকার আশঙ্কাকারীদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, দুঃখ ধ্বংস মাত্র মুক্তি পদার্থ নহে। কিন্তু স্বসমানাধিকরণ দুঃখ সমানকালীন দুঃখ ধ্বংস মুক্তি পদার্থ। অর্থাৎ যে সময় কোন প্রকার দুঃখ থাকে না, সেই সময় উৎপন্ন দুঃখ-ধ্বংস মুক্তি পদার্থ।

দুঃখ চিরস্থায়ী পদার্থ নহে, অর্থাৎ দ্বিক্ষণস্থায়ী বলিয়া সংসার কালে জীবের দুঃখ ধ্বংসও থাকে এবং অন্য কোন দুঃখও থাকে। দুঃখ থাকে না, অথচ দুঃখ ধ্বংস থাকে, এইরূপ অবস্থা ঘটে না। সুতরাং সংসার কালীন দুঃখধ্বংস কোন না কোন দুঃখের সহিত সম্পর্কিত থাকিবেই। সংসার কালে কোন জীবেরই দুঃখের সহিত নিঃসম্পর্কতা ঘটে না। সুতরাং সংসার কালীন দুঃখ ধ্বংস মুক্তি পদার্থ হইতে পারে না।

মোক্ষের পূর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখের উৎপত্তি নিবৃত্তি হওয়ায় মোক্ষস্বরূপ দুঃখ ধ্বংস, দুঃখের সহিত নিঃসম্পর্ক হইতে পারে। সুতরাং দুঃখের সহিত নিঃসম্পর্ক দুঃখ ধ্বংসই মুক্তি পদার্থ। তাহাই চরম পুরুষার্থ।

তাহা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান-সাধ্য। অতএব শাস্ত্রালোচনা না করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, সুতরাং শাস্ত্রালোচনা ব্যর্থ এই প্রকার আশঙ্কা সঙ্গত নহে।

পাতঞ্জল দর্শনেও, উৎপন্ন দুঃখ আপনা হইতে নষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং দুঃখ ধ্বংস মাত্র পুরুষার্থ হইতে পারে না। এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনাদি রূপ দুঃসাধ্য অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করিবার জন্য তথাকথিত অনুষ্ঠানসাধ্য তত্ত্ব জ্ঞানেরও আশ্রয় লইতে হয় না, এই রূপ আশঙ্কা করিয়া পরিশেষে "হেয়ং দুঃখ মনাগতম্" এই প্রকার কথিত হইয়াছে।

সংসার জীব অসংখ্য। সকল জীবের এক সময় মুক্তি ঘটে না। যখন যাহার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহারই পক্ষে মুক্তি হয়। অর্থাৎ তাহারই পক্ষে এইরূপ সময় ঘটে, যখন দুঃখ থাকে না, আবার উৎপন্ন দুঃখের ধ্বংস হয়।

সংসার কালে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে এইরূপ অবসর ঘটে না। কারণ তখন সর্ব্বদা জীবের একটা না একটা দুঃখ থাকেই, সুতরাং তখন অতীত দুঃখরাশির ধ্বংস থাকিলেও সেই ধ্বংস বর্ত্তমান দুঃখের সহিত নিঃসম্পর্ক হইতে পারে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যদর্শনে "সমাধি সুষুপ্তি মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা" অর্থাৎ সমাধি, সুষুপ্তি, এবং মোক্ষকালে জীব ব্রহ্মের মত দুঃখরহিত হ'ন, এই কথা বলিয়াছেন; অতএব সংসারী জীবের

পক্ষে সমাধি সুলভ না হইলেও, প্রতিদিন সুষুপ্তিলাভ কালে মোক্ষের আপত্তি হইতে পারে,—এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বক্তব্য এই যে, সমাধি এবং সুষুপ্তিকালে দুঃখের অনুভূতি না থাকিলেও, দুঃখের বিশেষ কারণের অন্যতম এবং দুঃখময় সংসারের বিশেষ কারণ অনাদিকাল হইতে আগত তথাকথিত মিথ্যাজ্ঞান জনিত কুসংস্কার প্রবাহ বর্ত্তমান থাকায় এবং মোক্ষকালে তাদৃশ কুসংস্কার দূরীভূত হওয়ায় সমাধি এবং সুষুপ্তিকালে মোক্ষের আপত্তি দোষ ঘটিতে পারে না। এই অভিপ্রায়েই বিজ্ঞান-ভিক্ষু "দ্বয়োঃ সবীজত্বমন্যত্র তদ্ধতিঃ" এই পরবর্ত্তী সূত্র দ্বারা এই কথা বলিয়াছেন।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি মোক্ষ। ইহাই চির শান্তি। আত্যন্তিক নিবৃত্তি শব্দের অর্থ, দুঃখের পুনরুৎপত্তি নিবৃত্তি সহিত দুঃখ ধ্বংস। অর্থাৎ আর দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, অথচ উৎপন্ন দুঃখের ধ্বংস হইয়া যাইবে; এই প্রকার দুঃখ ধ্বংস মুক্তি। ইহাই সাংখ্য পাতঞ্জল মত।

কোন কোন দার্শনিকের মতে পাপনিবৃত্তি মুক্তি। কুমারিল ভট্টের মতে নিত্য সুখ সাক্ষাৎকার মুক্তি। এই মতে মুক্তির নিত্যত্ব এবং অনিত্যত্ব সম্বন্ধে নানা তর্ক আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

ফল কথা, এই মত সমীচীন নহে। কারণ ঐ সাক্ষাৎকার নিত্য হইলে সংসার কালে ঐ প্রকার মুক্তির আপত্তি হইতে পারে। যাহা নিত্য, সংসার কালে তাহা থাকিবে না কেন? সর্ব্বদা না থাকিলে নিত্য অর্থাৎ সনাতন হইবে কি প্রকারে? এবং জন্য হইলে, জন্য জ্ঞান মাত্রের প্রতি শরীরের কারণত্ব থাকায় অথচ নির্ব্বাণ অবস্থায় শরীর থাকে না বলিয়া ঐরূপ সাক্ষাৎকার অসম্ভব হয়।

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে উত্তরভারত

যে সময়ে জৈনদের শেষ গুরু মহাবীর বর্দ্ধমান ও বৌদ্ধদের শেষ বুদ্ধ গৌতম সিদ্ধার্থ পবিত্র ভারতভূমি পবিত্রতর করিয়াছিলেন, সে আজ ২৫।২৬ শত বৎসরের কথা। পৃথিবীতে চিরকালই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ভারতেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল যে বাহ্য দৃশ্যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নহে, শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, রীতি নীতিতেও আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

পৌরাণিক কাল হইতে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ বহু স্বাধীন ছোট ছোট রাজ্যের সমষ্টি। কখন কখন এই রাজাদের মধ্যে একজন রাজা অন্য রাজাদের কাছে কর সংগ্রহ করিয়া, প্রাধান্য লাভ করিয়া, সম্রাট বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কখন বা তাঁহার বংশধর সম্রাট্ হয়, কখনও বা অন্যকোন বলবান রাজা সম্রাট্ হয়েন। এরূপ ছোট ছোট রাজ্যের প্রধান দোষ এই যে, কোনও বাহিরের প্রবল শত্রু আসিলে সমস্ত ভারতভূমিতে তাঁহাদের সমান বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। দেশের রাজারা একত্র মিলিয়া অনায়াসে বিদেশীকে তাড়াইতে পারেন, কিন্তু প্রায়ই প্রতিবেশী রাজাদের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ থাকে, বিদেশী শত্রু অনায়াসে এই বিবাদ বাড়াইয়া একে একে প্রত্যেক রাজাকে জয় করে। কখনও বা দুইজন প্রতিবেশী রাজাদের মধ্যে একজন একটু প্রবল হইলে দুর্ব্বলকে নির্ম্মূল করিয়া দেন। বুদ্ধ-দেবের জ্ঞাতি শাক্যরা সামান্য কারণে, শ্রাবস্তীর যুবরাজ বিরুদ্ধকের বিষনয়নে পড়িয়াছিল। শাক্যরা অহিংসা ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করে নাই, নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহারা নিয়ম করিয়াছিল, যে শত্রুর বিপক্ষে

অস্ত্র ধারণ করিবে তাহাকে শাক্যকুল ও দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। বিরুদ্ধক এই অহিংসা ব্রতধারী শাক্যদের স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু নির্ব্বিশেষে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, তাহার কাছে রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তবে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকালের রাজ্যের বিস্তার বুদ্ধদেবের গৃহ ত্যাগের গল্পে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কুমার সিদ্ধার্থ অশ্ব পৃষ্ঠে অর্দ্ধরাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া সূর্য্যোদয় সময়ে দেখিলেন, তিনি ১২ যোজন (৪৮ মাইল) পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ইতি মধ্যে তিনি একাধিক রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। সেকালের রাজাদের আজকালকার বা মোগল আমলের বঙ্গদেশের জমিদার বা বারভুঁইয়া রাজাদের সহিত তুলিত করা যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই, যখন রাজগৃহের রাজা বিম্বিসার ও বৈশালীর লিচ্ছবিদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন বিম্বিসার বৈশালীর এক বারবধূ আম্রপালিকার গৃহে লুকাইয়া বাস করিতেছিলেন। এই বাস ফলে আম্রপালিকার গর্ভে অভয় নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।

এই সময়ে উত্তর ভারতে দুইটি রাজ্য বলসঞ্চয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল। একটি শ্রাবস্তী ও অন্যটি রাজগৃহ। রামায়ণে দেখিতে পাই, শ্রীরামচন্দ্র আপন পুত্র লবকে উত্তর কোশলের রাজ্য দান করিয়া শ্রাবস্তীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন প্রাচীন শ্রাবস্তীর নিকট সাহেৎ মাহেৎ নামক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তী নগরের ধ্বংসাবশেষ [৮২ ডিঃ ৬ মিঃ পূঃ ও ২৭ ডিঃ ২৮'ডিঃ উ] রাপ্তী নদীর তীরে দেখা যায়। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক শ্রাবস্তীর রাজা [অরণেমী ব্রহ্মদত্ত পুত্র) প্রসেনজিৎ ছিলেন। অব্দ ৪৮০ খৃঃ পূঃ প্রসেনজিৎকে তাড়াইয়া তাঁহার পুত্র বিরুদ্ধক রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক কাল হইতেই মগধ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মহাভারতের সময়ে মগধে জরাসন্ধ সম্রাট্‌রূপে সম্মানিত। তখন রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। আধুনিক পাটনার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রায় ৩০ মাইল দূরে, গঙ্গাতট হইতে ১৪।১৫ মাইল দক্ষিণে রাজগৃহ এখনও পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। পাটনার উত্তরে, গঙ্গার অপর পারের অধিবাসীদের বৃজ্জী বলিত, ও দেশকে বৃজ্জীদের দেশ বলিত। কিন্তু দেশের শাসক ছিল আর্য্যকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় লিচ্ছবীরা। বুদ্ধদেবের শেষ জীবনকালে বৃজ্জীরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া রাজগৃহের রাজা অজাতশত্রুর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বর্ষকার গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীগ্রামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যখন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল সেই সময়ে বুদ্ধদেব এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর কার্য্যতৎপরতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই যে সামান্য পাটলীগ্রাম ও দুর্গ দেখিতেছ, ইহার চতুর্দ্দিকে এমন এক নগর উৎপন্ন হইবে যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধনে, মানে, বাণিজ্যে, শিল্পে, কারুকার্য্যে, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইবে। অগ্নি, জল ও আভ্যন্তরীণ বিবাদ উহার পতনের মূল হইবে।"

শোণ নদ এখন পূর্ব্ব স্থান হইতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে।

রাজধানী রাজগৃহের নিকট নালন্দা নামক একটি গ্রাম ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই নালন্দাই বৌদ্ধদের বিদ্যাপীঠ হইয়া সহস্র বৎসরের অধিককাল ভারতে বিদ্যা বিস্তার করিয়াছে। তখন নালন্দাতে প্রায় ২০,০০০ বিদ্যার্থী ও শিক্ষক বাস করিত। ইহারা সকলেই ব্রহ্মচারী, অতএব এত বড় নগরে একটিও স্ত্রীলোক ছিল না। তাহারা সকলেই রাজদণ্ড অর্থ হইতে আহার ও পরিধেয় পাইত। অনেকে চিরজীবন নালন্দাতেই কাটাইত।

আধুনিক এলাহাবাদের উত্তরে ও পূর্ব্বে গঙ্গা, ও দক্ষিণে যমুনা। পূর্ব্ব দিকে গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসী নামক গ্রাম আছে। পূর্ব্বে ইহাই প্রয়াগ ছিল। মোগল বাদশাহ আকবর বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গা পূর্ব্ব দিকে সরাইয়া কেল্লা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখন গঙ্গাতট হইতে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে, এলাহাবাদে, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। পূর্ব্বে এই আশ্রম গঙ্গার অপর পারে প্রয়াগে ছিল।

প্রয়াগের পশ্চিমে প্রায় ৩০ মাইল দূরে কৌশাম্বী নগর ছিল। ইহা এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক রাজা শতানীক ও বুদ্ধদেবের সময়ে তাঁহার পুত্র উদয়ন এখানে রাজ্য করিতেন।

আধুনিক মজফরপুর প্রাচীন ত্রিহুৎ ও প্রাচীনতর বিদেহ বা মিথিলা। এইখানে রাজর্ষি জনক প্রজাপালন করিতেন, মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, ও সতী-শ্রেষ্ঠা সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আধুনিক অযোধ্যার প্রায় ৪০ মাইল পূর্ব্বে প্রাচীন কপিলাবস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান ছিল, বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থাতেই শ্রাবস্তীরাজ বিরুদ্ধক কপিলাবস্তু সমূলে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের সময়ে উত্তর ভারতে ছয়টি বড় নগর ছিল—শ্রাবস্তী, সাকেত, চম্পা, বারাণসী, বৈশালী ও রাজগৃহ।

মগধ রাজ্যসীমা মধ্যে চম্পা বড় নগর ছিল। বুদ্ধদেব ও মহাবীর উভয়ে চম্পাতে কয়েকবার বর্ষার চতুর্ম্মাস কাটাইয়াছিলেন।

উজ্জয়িনী অদ্যনও প্রসিদ্ধ নগর। উহা তান্ত্রিক সাধকদের প্রধান স্থান ছিল। মহাবীর স্বামী উজ্জয়িনীর মহাশ্মশানে কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। তখন রুদ্র ও রুদ্রাণী তাঁহার তপস্যায় ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিলেন।

আধুনিক পাটনা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে। পাটনা হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে, উত্তর হইতে গণ্ডকী নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে গণ্ডকীর উত্তর তীরে বৈশালী নামে এক মহানগর ছিল। এখন বৈশালীর স্থানে বাসর নামে এক ছোট নগর জৈনদের তীর্থস্থান রূপে সম্মানিত দেখা যায়। যদিও সমস্ত নগরটি বৈশালী নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধরা এই নামই ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি নগরটি তিনটি বিশিষ্ট অংশে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ মতে আদি অংশ বৈশালীতে কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠদের বাস ছিল। সম্ভবতঃ এটা ধনবান রাজাদের (aristocaracy) বাসস্থান। ইহাতে ৭০০০ সুবর্ণচূড়াযুক্ত অট্টালিকা শোভা পাইত। দ্বিতীয় অংশে কেবলমাত্র মধ্য শ্রেণীর লোকেরা (gentry) বাস করিত। ইহাতে ১৪,০০০ রজতচূড়াযুক্ত অট্টালিকা ছিল। তৃতীয় অংশে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর ভদ্র পরিবার বাস করিত। ইহাতে ২০,০০০ তাম্র চূড়াযুক্ত অট্টালিকা ছিল। নগর মধ্যে শূদ্রদের বাস করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু শূদ্র না থাকিলে তিন বর্ণের সেবার অসুবিধা হয়। অতএব নগরের চারিদিকে শূদ্রদের এরূপ ভাবে বাস করান হইয়াছিল যে, যে কোনও অংশে যে কোনও জাতীয় শূদ্র সেবক সহজলভ্য ছিল। জৈন গ্রন্থে বৈশালীকে প্রায়ই কুণ্ডগ্রাম বলা হইয়াছে। জর্ম্মান পণ্ডিত জ্যাকোবির (Hermann Jacobi) ধারণা বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রাম একটি পল্লীমাত্র। কখন কখনও সমস্ত নগরকেও কুণ্ডগ্রাম বলা হইত।

বৈশালীর লিচ্ছবী সম্ভ্রান্ত অধিবাসী সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি একবার বৈশালীর উপকণ্ঠে এক বিহারে ছিলেন, তখন লিচ্ছবী রাজারা রথে চড়িয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি আপন শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "হে ভিক্ষুকগণ, তোমরা স্বর্গের দেবতা দেখ নাই। ইহারা রূপে গুণে বাহ্যদৃশ্যে বেশ ভূষাতে সেই দেবতার মত দেখিতে!" তিনি নানাস্থানে বলিয়াছেন, বৈশালী পৃথিবীতে স্বর্গতুল্য।

বৈশালী একটী ছোট রাজ্যের রাজধানী। নগরে এক এক গোত্রজেরা এক এক পল্লীতে, আপনার আপনার গোত্রপতির শাসনাধীন বাস করিত। সকল গোত্রপতিরা এক সভাতে একত্র হইত এবং আপনাদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ ক্ষত্রিয়কে রাজা, একজন কোনও জাতীয় মন্ত্রী ও একজন ক্ষত্রিয় সেনাপতি নিযুক্ত করিত। রাজা এই মন্ত্রী, সেনাপতি ও গোত্রপতিদের সভার সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেন।

বৈশালীর লোকেরা বৈশালীর কন্যা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত নিয়ম করিয়াছিলেন। বৈশালীর উচ্চ অংশে যে কন্যার জন্ম হইত, তাহার বিবাহ ঐ অংশেই সম্ভব ছিল। মধ্য অংশের কন্যা উচ্চ বা মধ্য অংশে বিবাহিত হইতে পারিত; তৃতীয় অংশের কন্যার যে কোনও অংশে বিবাহ হইতে পারিত। বৈশালীর কন্যা নগরত্যা

করিয়া যাইতে পারিত না। যদি কোনও কন্যা জন্মাবধি সুন্দরী ও হাবভাবযুক্তা বা শৈশবাবস্থা হইতে পূর্ণ যৌবনার লক্ষণযুক্তা হইত তবে তাহার বিবাহ হইত না; সে বারবধূরূপে সাধারণের ভোগ্যা হইত। এরূপ জীবন যাপন করায় তাহার পিতৃমাতৃকুলের নিন্দা হইত না।

ব্রাহ্মণেরা বর্ণের গুরু ছিলেন বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে তাঁহাদের সম্মান ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

দেশে নানা প্রকার চারুশিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। ৪৮০-৪৮৫ খৃঃ পূঃ মধ্যে মগধের রাজা অজাতশত্রু আপন পিতা বিম্বিসারকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ্ক নামক এক ধনবান্ বণিক রাজগৃহে বাস করিত। একদিন অজাতশত্রু নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যোতিষ্কের বাটী আসিলেন। জ্যোতিষ্কের বাটীতে বহু মূল্যবান সজ্জা ছিল, রাজা তাহাই দেখিতেছিলেন। রাজা দেখিলেন একটি বড় ঘরের মাঝখানে একটি ধারে নানা রঙ্গের মাছ খেলা করিতেছে। তিনি আপনার পরিধেয় বস্ত্র খুলিতে লাগিলেন দেখিয়া জ্যোতিষ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি করিতেছেন?" রাজা বলিলেন, "এই জলাধারে স্বচ্ছ জল দেখিয়া স্নান করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে সেই জন্য বস্ত্র খুলিতেছি।" জ্যোতিষ্ক হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ জল কোথায়? স্ফটিকের মেঝেতে আপনার জলভ্রম হইয়াছে, রাজা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "ঐ মাছগুলি কি স্ফটিকের মধ্যে সাঁতার দিয়েছে?" জ্যোতিষ্ক বলিলেন, "ওগুলি খেলনা মাত্র, কলে নড়িতেছে।" রাজা তথাপি আপন চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি আপনার একটি আংটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। যখন আংটি পড়িয়া সশব্দে ঠং করিয়া উঠিল তখন বিশ্বাস করিলেন।

শাক্যকুল নির্ম্মূলকারী বিরুদ্ধক স্ত্রীগণ সহ নৌকায় বিহার করিতেছিলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যখন সকলে গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত, তখন হঠাৎ সূর্য্য দেখা দিল। একটা বলিসের নীচে একটি অগ্নি উৎপাদক কাঁচ (Maginifying Burning glass) ছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। অল্প সময়ের মধ্যে তুলাতে আগুন ধরিয়া উঠিল ও সেই অগ্নিতে বিরুদ্ধক পুড়িয়া মরিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে বিশ্বকর্ম্মা নামক এক সম্প্রদায়ের শিল্পী ছিল, তাহারা নানাপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিত। কাঠের ময়ূরের কথা বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে; তাহার উপর উঠিয়া কল চালাইলে ময়ূর গগনে উঠিয়া সকল দিকে যাইতে পারিত, উপরে উঠিতে পারিত, বা নীচে নামিতে পারিত। ময়ূরের উপর তিন চারজন আরোহী বসিতে পারিত। ইহা বোধ হয় আজকালকার এয়ারোপ্লেনের মত কোনও যন্ত্র ছিল।

সে কালের রাজারা খুব সাদাসিদে ভাবে থাকিতেন। তবে অভিষিক্ত রাজার সহিত তাঁহার পঞ্চ রাজচিহ্ন সকল সময়েই থাকিত। এই চিহ্নগুলি ১ মুকুট, ২ ছত্র, ৩ তরবারি, ৪ চামর, ও ৫ রত্নখচিত জুতা। শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ একবার রথে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী দীর্ঘাচারায়ণ রথ চালাইতে ছিলেন। আর একটিও সেবক সঙ্গে ছিল না। রাজা শুনিলেন নিকটেই বুদ্ধদেব এক বিহারে আছেন। এই কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "অনেকদিন ভগবানকে দেখি নাই, এদিকে যখন আসিয়াছি তখন দেখা করিয়া যাইব।" আশ্রমে আসিয়া রাজা পঞ্চরাজ চিহ্ন মন্ত্রীর কাছে রাখিয়া, ভগবান বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। অনেকক্ষণ পরে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দেখেন, মন্ত্রী বা রথ কিছুই নাই। তিনি নগ্নপদে পদব্রজে শ্রাবস্তী আশ্রমে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইবার পর দেখিলেন তাঁহার দুই রাণী [বার্ষিকা ও মল্লিকা] ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছেন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" তাঁহারা বলিলেন, "দীর্ঘাচারায়ণ পঞ্চ রাজচিহ্ন হাতে পাইয়া বিরুদ্ধককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছে। সেই জন্য আমরা আপনার কাছে পলাইয়া আসিয়াছি।" রাজা বলিলেন, "মল্লিকা, তোমার পুত্র এখন রাজা, তুমি ফিরিয়া যাও, পুত্রের সহিত রাজ্যসুখ ভোগ কর, আমি বার্ষিকাকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে আশ্রয় লইব।"

মল্লিকা শ্রাবস্তী নগরে ফিরিয়া গেল। যখন প্রসেনজিৎ ও বার্ষিকা পদব্রজে প্রায় ১৭৫ মাইল পথ হাঁটিয়া রাজগৃহে পঁহুছিলেন, তখন পথশ্রমে রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। উভয়ে এক রাজ-উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। বার্ষিকা, রাজা অজাতশত্রুকে শ্রাবস্তীপতি প্রসেনজিতের আগমন সংবাদ দিতেই, অজাতশত্রু আপন সেনাপতি ও মন্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এতবড় রাজ্যের রাজা রাজধানীতে সৈন্যসহ প্রবেশ করিল, আর তোমরা কোনও সংবাদ রাখ না?" বার্ষিকা তখন সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন যে প্রসেনজিৎ রাজ্য হারাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। রাজা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। শ্রাবস্তীরাজ তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন জানিয়া বড় তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে সসম্মানে রাজবাটীতে আনিতে মন্ত্রিগণ ও সেনাপতিদের লইয়া বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিলেন। ইতিমধ্যে, প্রসেনজিৎ ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া এক ক্ষেত্রে গিয়া কৃষকের কাছে কয়েকটা মূলা চাহিয়া লইলেন ও পাতাশুদ্ধ খাইয়া ফেলিলেন। পরে সরেবরে জলপান করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথে তাঁহার উদরে শূল বেদনা উঠিল। তিনি পথের ধারে শুইলেন। পথে বহু রথ চলিতেছিল, তাহার ধুলা তাঁহার নাকে মুখে ঢুকিতে লাগিল। তিনি অল্পক্ষণেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যখন অজাতশত্রুর সেবকেরা তাঁহার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন তাঁহার শরীরের উপর অনেক ধূলি জমিয়া গিয়াছে।

রাজাদের সকল সময়েই প্রাণের ভয়ে দিন কাটাইতে হইত। তাঁহারা সকলকেই অবিশ্বাস করিতেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে পাই যে, রাজগৃহের অজাতশত্রু পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার এক পূর্ণিমার রাত্রে তিনি মনে শান্তিলাভ না করিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই সময়ে অজাতশত্রুর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জীবক কুমারভাণ্ড পরামর্শ দিলেন যে, নিকটেই ভগবান বুদ্ধদেব এক উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিলে শান্তি পাইবেন। অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে পাঁচশত সেবিকা হস্তিপৃষ্ঠে মশাল লইয়া চলিল। রাজ-অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না—এমন কি, এই পাঁচশত হস্তীও মাদী ছিল। হস্তী চালকও স্ত্রীলোক ছিল। বুদ্ধদেবের আশ্রমে ঢুকিয়া দেখিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ! রাজা জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের সহিত কত ভিক্ষু আছে? জীবক বলিলেন, ১২৫০র কম নহে; কিন্তু ভগবান গোলমাল ভালবাসেন না বলিয়া সকলে ধীরে কথা বলে, সেই জন্য আশ্রম নিস্তব্ধ। রাজা ভাবিলেন, জীবকের যদি কোন দুরভিসন্ধি থাকে তবে কি রূপে প্রাণ বাঁচাইবেন? তিনি এত ভয় পাইলেন যে ভয়ে তাঁহার ঘাম হইতে লাগিল। তিনি অতি কাতর ভাবে জীবককে বলিলেন, "জীবক তুমি আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিবে না ত? আমাকে বন্দী করিয়া ঘাতক অথবা আমার কোনও শত্রুর হস্তে দিবে না ত?" ভয়ে কাতর হইয়া এইরূপ বার বার বলিতে লাগিলেন।

সেকালে অনেকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইত। আপনার ধন, রত্ন ভিক্ষুকদের দান করিয়া গৈরিক বসন গ্রহণ করিত। একজন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন যে, সকলের মনেই যে বৈরাগ্য উদিত হইত, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে সেকালে ধনবানেরা আপনার ধনরত্ন ও সম্পত্তি যথেচ্ছাচারী প্রবল রাজার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। কাযে কাযেই লোকে আপনার ধন রাজাকে না দিয়া ভিক্ষুকদের দান করিত এবং গৈরিক বসনের আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে থাকিত। ধনবানদিগের মধ্যে ২।৪ জনের বৈরাগ্য যে হইত না তাহা বলা যায় না, কিন্তু ঐ ইংরাজ-লেখকের মতও মিথ্যা বলা যায় না। উপরে, রাজগৃহের ধনবান বণিক জ্যোতিকের কথা বলা হইয়াছে। অজাতশত্রু তাহাকে বন্ধুভাবে বলিলেন, "আইস, আমরা বাটী বদল করি,—আমার বাটী তুমি লও, তোমার বাটী আমাকে

দাও।" জ্যোতিষ্ক আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। এইরূপে সাতবার বাটী বদল করিবার পরও দেখিলেন যে, জ্যোতিষ্ক তখনও ধনবান। এই সময়ে জ্যোতিষ্কের সেবকেরা রাত্রিকালে এক চোর ধরিয়া ফেলিল। দেশের নিয়ম-মত গৃহকর্ত্তা এরূপ চোরকে প্রাণদণ্ড দিতে পারিতেন। চোর স্বীকার করিল, "আমি চুরি করিতে আসি নাই। রাজা অজাতশত্রু আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, জ্যোতিষ্ককে হত্যা করিতে পারিলে আমাকে পুরস্কৃত করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।" জ্যোতিষ্ক তখনও অল্প বয়স্ক, তাহার সন্তানাদি হয় নাই, সে মরিলে রাজাই তাহার উত্তরাধিকারী। কিছু পরে অজাতশত্রু এক দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "ঐ লোকটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আমিই প্রকৃত অপরাধী।" জ্যোতিষ্ক চোরকে ছাড়িয়া দিলেন ও আপনার ধন, রত্ন দান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের আশ্রয় লইলেন। এরূপ উদাহরণ দিতে পারিলেও সেকালের শিক্ষাগুণে বৈরাগ্য হইত। আধুনিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল। লোক বিদ্বান্ হইলেই কোন্ ব্যবসায়ে বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিবে তাহাই চিন্তা করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের অগ্রজ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার পিতা স্বয়ং বিদ্বান্ হইয়াও বালক বিশ্বম্ভরের পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পুত্র বিদ্বান্ হইলেই তাহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইবে, আর গৃহে থাকিবে না। এরূপ বৈরাগ্যমূলক শিক্ষার ফল বুদ্ধদেব স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। শ্রাবস্তীরাজ বিরুদ্ধক শাক্যদের আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে বিরুদ্ধকের মন্ত্রী অম্বরীষ বলিলেন শাক্যরা ধার্ম্মিক হইয়াছে, হিংসা বা জীবহত্যা করে না। তাহারা দাঁড়াইয়া মার খাইবে, কিন্তু হস্তোত্তোলন করিবে না। তাহাদের আক্রমণ করিতে ভয় কি? শাক্যরা নিয়ম করিলেন, কেহ শত্রুর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিবে না; যে অস্ত্র ত্যাগ করিবে, তাহাকে শাক্যসমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। শাক্যরা নগরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। বিরুদ্ধক বলিলেন, "আমি এখন তোমাদের শত্রু নহি, তোমরা এরূপ করিতেছ কেন?" তাহারা দ্বার খুলিয়া দিল। তখন বিরুদ্ধক এক স্থানে আসন করিয়া বসিলেন, বলিলেন, "শাক্যদের রক্ত যতক্ষণ নদীর মত গড়াইতে না দেখিব, ততক্ষণ আমি আসন ত্যাগ করিব না। যে শাক্যরা এক কালে অমিতবল যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহারাই কর্ম্ম ফল ভাবিয়া গলা বাড়াইয়া দিল। শাক্যরক্তের প্রবাহ দেখিয়া রাজা আসন ত্যাগ করিলেন। তিনি পাঁচশত শাক্যকুমারীকে বন্দী করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে রাজ-অন্তঃপুরে যাইতে বলিলেন। তাহারা একবাক্যে অস্বীকার করিল। রাজ-আজ্ঞায় তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া দেওয়া হইল। রক্তপাতে তাহারা মরিয়া গেল। বুদ্ধদেব তাহাদের মৃত্যুকালে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। শিক্ষার ফলে দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়েরা যে এত অল্পকাল মধ্যে এমন নিরীহ হইতে পারে, ইহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। বনবিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াই এইরূপ নিরীহ হইয়াছিলেন।

রাজার এক পুত্রই রাজ্য লাভ করিত। প্রায়ই বিবাহিতা ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ হইত। কিন্তু অন্য রাজপুত্রেরাও অবস্থা বিশেষে ভাইদের মারিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিত। রাজার অন্য পুত্রেরা আপনার জীবিকার জন্য কোনও ব্যবসায় শিক্ষা করিত। রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের তিন পুত্র ছিল। বৈশালীর নায়ক সিংহের কন্যা বাসবীর গর্ভে অজাতশত্রু, বৈশালীর বারবধূ আম্রপালিকার গর্ভে অভয় ও রাজগৃহের এক বণিকের পত্নীর গর্ভে জীবক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অভয়, জীবিকার জন্য রথনির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। জীবক, তক্ষশিলার অত্রেয় নামক কোনও চিকিৎসকের কাছে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়াছিল। বিম্বিসার লম্পট ছিলেন। রাজগৃহের এক বণিকপত্নী তাঁহার ঔরসে পুত্র প্রসব করিলে বণিক আপন পত্নীকে পুত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। বণিকপত্নী এক পেটিকাতে শিশুকে রাখিয়া ঐ পেটিকা রাজবাটীর দ্বারে রাখিয়া আসেন। বিম্বিসার সেই পুত্রের

নাম জীবক কুমারভৃত্যও রাখিয়াছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যা, নানাপ্রকার অনুলেপন ও ঔষধের কথা বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু অস্ত্র চিকিৎসার কথা পাই না। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়িভদ্রের একটি অঙ্গুলি পাকিয়া পূয জন্মিয়াছিল। বালক যন্ত্রণাতে ছটফট করিতেছিল। অজাতশত্রু পুত্রের অঙ্গুলি আপন মুখে পুরিয়া জোরে চুষিলেন, তাহাতে পাকা অংশ ফাটিয়া তাঁহার মুখে পূয ঢুকিয়া গেল। বালকের যন্ত্রণা কমিয়া গেল। অস্ত্রবিদ্যা প্রচলিত থাকিলে এরূপে ফোড়া ফাটাইতে হইত না। রাজবাটীতে নিশ্চয়ই চিকিৎসক ছিল; রাজার ভাই জীবক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তিনি বুদ্ধদেবের শেষ জীবনের নিত্য সঙ্গী ও সেবক আনন্দের মাথার এক ফোড়ায় চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার অনুলেপন দ্বারা বুদ্ধদেবের কয়েকবার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। রোগী দুর্ব্বল হইলে তাহাকে কোনও সবল সুস্থ ধাত্রীর দুগ্ধ পান করাইয়া রাখা নিয়ম ছিল। ব্যবসায় মধ্যে লেখকের ব্যবসায় সম্মানিত ছিল। সাধারণ লোক লেখাপড়া শিখিত না। কাহারও পত্র লিখিতে হইলে লেখককে দক্ষিণা দিয়া লেখাইয়া লইত। বিদ্যাশিক্ষাও কেবল ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণে নিবদ্ধ ছিল না। রীতিমত পুস্তক পাঠ না করিয়াও লোকে ধর্ম্মশিক্ষকের পদ পাইত। তাহারা যোগাভ্যাস দ্বারা নানা প্রকার ক্ষমতা লাভ করিত। এই সময়ে "অজীবক" নামক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল। এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা একজন সামান্য ভিখারীর পুত্র ছিল। অন্য স্থানাভাবে তাহার মাতা এক গোশালাতে তাহাকে প্রসব করিয়াছিল বলিয়া সে গোশালা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে পশুহত্যা সমর্থন করিতেন। ব্রাহ্মণদের "বৈষ্ণব" শব্দেই উল্লেখ পাই। সাধারণ লোকে পশুহত্যা বড় পছন্দ করিত না। দেশে লুটপাট, পরস্ত্রী হরণ প্রায়ই চলিত। জৈন সাহিত্যে একটি রাজকন্যার গল্প আছে যে, সে একদিন উদ্যানে বেড়াইতেছিল। পাশের পথ দিয়া একজন ধনবান লম্পট যাইতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া, ধরিয়া লইয়া গেল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে ভাবিল তাহার দুর্মুখী স্ত্রী এ সুন্দরী কন্যা দেখিলে ঝগড়া করিবে। অতএব পথে রাজকন্যাকে এক বনে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দস্যুরা তাহাকে ধরিয়া নিকটস্থ নগরে দাসী বলিয়া বিক্রয় করিল। ক্রেতার স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারে রাজকন্যা বিব্রত হইল। এমন সময়ে এক-দিন সংবাদ পাইল যে, মহাবীর স্বামী সেই নগরে আসিয়া-ছেন। সে পলাইয়া স্বামীর আশ্রয় লইল। তিনি তাহাকে সাধ্বী (সন্ন্যাসিনী) ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। এই রাজকুমারী বৈশালীর রাজবংশের কন্যা। রাজ-কন্যাদের যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ লোকের স্ত্রী কন্যা কত অরক্ষিতা অবস্থায় থাকিত বেশ বুঝা যায়।

বর্ণ বা জাতি বংশগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। লোকের কাছে পরিচয় দিবার সময়ে গোত্র পরিচয় দেওয়া নিয়ম ছিল। এখন মাতার নাম বা মাতৃকুলের পরিচয় দেওয়া হয় না, কিন্তু সেকালের সাহিত্যে, বিশেষতঃ জৈন সাহিত্যে, দেখিতে পাই যে অমুক লোক অমুক গোত্রজ অমুক পিতা ও অমুক গোত্রজা অমুক মাতার পুত্র। পিতা ও মাতা উভয়ের নাম ও গোত্র বলা হইত। বিম্বিসার রাজার পুত্র বৈশালীর এক বারবধূর গর্ভজাত অথবা এক বণিকের বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাৎ হইলেও সমাজে হীন ছিল না। তথাপি এক বিশ্বকর্ম্মার পুত্রের বিবাহ অন্য এক বিশ্বকর্ম্মার কন্যার সহিতই দেখিতে পাই। কৃষি-কর্ম্ম সকলেই করিত। যখন বিরূঢ়ক শাক্যদের নগর আক্রমণ করিলেন, তখন শম্পক নামক এক শাক্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ইনি শাক্যদের অস্ত্র ত্যাগের প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন না। যখন শম্পক বলদ লইয়া গৃহে ফিরিলেন তখন শ্রাবস্তীর সৈনিকদের দেখিয়া তাহা-দের মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। কয়েকজনকে প্রাণে মারিয়াছিলেন। শাক্যরা তাঁহাকে ত্যাগ করিলে তিনি কাবুল নদীর শাখা স্বাত নদী তীরে নূতন শাক্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

সাধু সন্ন্যাসী মাত্রেই শ্রমণ নামে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে কাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিত না। সাধারণের চক্ষে অন্য জাতীয় শ্রমণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ

সন্ন্যাসীর বেশী সম্মান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় রাজা অপেক্ষা হীন, ভিক্ষুক বলা হইত। ক্ষত্রিয় রাজারাই সমাজে শীর্ষস্থান পাইতেন, তাঁহাদের পর ধনবান্ বণিকেরা। বংশ বা জাতির গৌরব অপেক্ষা ধনের গৌরব বেশী ছিল। কন্যা সুন্দরী হইলে তাহার পিতা মাতার জাতি বা জারজতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিত না। খাদ্য সম্বন্ধেও জাতিবিচার ছিল না। বুদ্ধদেবকে সকল জাতীয় শিষ্য সহ বারবধূর বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণেরা অবশ্য মাংস খাইত। অহিংসাধর্ম্মধারী জৈনরা মাংস খাইত না কিন্তু বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংস খাইতেন। বুদ্ধদেবের খুল্লতাত-পুত্র দেবদত্ত আপনাকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে বুদ্ধদেবের চারিটী দোষ দেখাইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই যে—"শ্রমণ বুদ্ধ মাংস খান, আমরা মাংস খাইব না, কেন না মাংস খাইলে জীবহিংসা করিতে হয়।"

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

হেমচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় খণ্ড—অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শেষ জীবন

শেষ জীবন।—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হেমচন্দ্র সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। হেমচন্দ্র শেষ জীবনে কথঞ্চিৎ শান্তির আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়ের বিয়োগে হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা "প্রচার" সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। ইনি হেমচন্দ্রের পরমস্নেহভাজন ছিলেন এবং ইঁহার মৃত্যুতে হেমচন্দ্র অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

এই বৎসর ১১ই জুন দিবসে হেমচন্দ্রের একান্ত অনুগতা ভগিনী নৃত্যকালী দেবী কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। ইনি হেমচন্দ্রের সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন; ইঁহার বিয়োগে হেমচন্দ্র যে কতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। হেমচন্দ্রের অন্যতম দৌহিত্রী-পতি বর্দ্ধমানের সবজজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নৃত্যকালী দেবীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"নেত্য দেবী—আমাদের ছোড়দিদি—সংসারের গৃহিণী ও স্নেহময়ী। হেমবাবুর প্রতি তাঁর যে কিরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তা লিখিবার ক্ষমতা নাই। আজ এই ২০ বৎসর পরে ছোড়দির কথা স্মরণ হইয়া চক্ষু জলে ভাসিতেছে। তাঁর আদর ভালবাসা স্নেহ মমতা এজন্মে ভুলিতে পারিব না। হেমচন্দ্রের উপযুক্ত ভগিনী তিনি ছিলেন। আত্মীয়স্বজনকে আদর আহ্বান করিতে তাঁর মত আর দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিসে হেম বাবুর মান সম্ভ্রম রক্ষা হয় সে বিষয়ে ছোড়দিদির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সংসারের যত ঝড় ঝাপটা ছোড়দিদি নিজে সহ্য করিতেন, পারতপক্ষে তাহা হেমবাবুর কাণে তুলিতে দিতেন না।" নৃত্যকালীর মৃত্যু সম্বন্ধে বিনোদবিহারীর রোজনামচা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

Feby 25. *1899*. Alarmed to hear that two of my brothers-in-law had started for Benares last night. Wired to Purna

Babu at 11: 30. a. m. "Is father dangerously ill Should we go Wire."

June 13. Heard with regret of my পিসীঠাকুরাণীর death at Benares on 11th Augt. Received an invitation letter from Purna Babu. The poor lady has rest after all, but Khidderpore house would ever miss her.

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই দিবসে হেমচন্দ্রের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ মহাপ্রাণ স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র পরলোকগমন করেন। ইঁহার মৃত্যুতে হেমচন্দ্র শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন এবং "এবে কোথা চলিলে" শীর্ষক শোকগাথায় পরলোকগত বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—

ঢালি অশ্রু অবিরত
সখা বলে ডাকি কত,
নিদারুণ বধিরতা যে দেশে এমন,
কোন প্রাণে সেথা তুমি করিলে গমন ?
কেমনে বা ভোল আজ আবাল্য প্রণয়,
একত্রেতে সব হয়,
কোথাও পৃথক নয়,
বিদ্যার ভবন কিবা বিচার আলয়
কত নিরজনে বাস
কত হাস্য পরিহাস,
কত সুখ আলোচনা শোক পরিচয় ;
মন-কথা বলাবলি
প্রেমে কত কোলাকোলি,
মিষ্টালাপ শিষ্টাচার কত সুখময়,

যৌবনে যশের আশা,
একত্র বিজয়-তৃষা,
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়।
তুমি রোগে শয্যা'পরে
অন্ধ হয়ে আমি দূরে,
দেখিতে নারিনু শুধু যাবার সময়।
আমারো বার্দ্ধক্য-কষ্ট দেখিলেনা হায়।

কবিতাটি বোধ হয় "হিতবাদীতে" প্রকাশিত হয়। ইহাই কবিবরের শেষ 'প্রকাশিত' কবিতা।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হেমচন্দ্র বারাণসী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার সেই জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি বন্ধুগণের সাহচর্য্যের জন্য ব্যাকুল হইতেন। বাল্যবন্ধুগণকে প্রায়ই সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। কিন্তু বন্ধুগণের সহিত মিলন দীর্ঘ ব্যবধানে ঘটিত। তিনি যে চিত্তবিকাশে লিখিয়াছিলেন—

ভালবাসা বলি যাহে পরাণে যোগাই,
সে ভালবাসারে হায় কোথা কালে পাই ;
পরাণের বিনিময়ে পরাণ বিকাই
এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই ?

তাহার অর্থ তিনি শেষজীবনে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে হেমচন্দ্রের সৌভাগ্যদশায় সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, তাঁহার নিকটে বসিতে পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই হেমচন্দ্রের বার্দ্ধক্যে—অন্ধাবস্থায়, দারিদ্র্যদশায়—কেহ তাঁহার সমীপস্থ হইতেন না। হেমচন্দ্রের অন্ধাবস্থায় তাঁহার নিকট সংবাদপত্র পাঠ করিবার জন্য খিদিরপুরের একটী যুবককে বেতন দিতে হইত। তাঁহার জীবনের একটী বিষাদময়চিত্র আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয়বর্ষের "মানসী"তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালের মাঘ মাসের এক অপরাহ্ণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ তদীয় অগ্রজ দেবেন্দ্রপ্রসাদ, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি, রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন এবং নবীন লেখক মন্মথনাথ সেন মহাশয়গণের সহিত খিদিরপুরে হেমচন্দ্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই সাক্ষাতের চিত্র এইস্থানে পুনঃপ্রকাশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

"আমরা কয়জন তীর্থযাত্রী অপরাহ্ণে খিদিরপুরে উপনীত হইলাম। স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকার কূলে হেমচন্দ্রের ভবন—বৃহদায়তন, কিন্তু তাহার সংস্কারের অভাব গৃহস্বামীর দারিদ্র্য ঘোষণা করিতেছে। একদিন (

গৃহ আশ্রিত, অনুগত, বন্ধু, প্রার্থী প্রভৃতির কলরবে পূর্ণ থাকিত; সে গৃহ যেন জনহীন। আমরা ডাকিলে একজন যুবক আসিলেন। তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়া যাইয়া সংবাদ দিয়া আসিলেন ও আমাদিগকে কবির কক্ষে লইয়া যাইলেন।

"আমরা কবির কক্ষে উপনীত হইলাম। একখানি নেয়ারের খাটিয়ার উপর একটি মলিন শয্যা ছিল, তাহাই কবির শয্যা। তাঁহার বেশও শয্যারই মত মলিন। তিনি আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। তিনি মৃদুস্বরে আমাদিগের নাম ও আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ যথেষ্ট।" আমরা বলিলাম, "তাঁহাকে দেখা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ প্রচুর। আমরা দেশের কৃতিসন্তানদিগের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিতেছিলাম; তাঁহার প্রতিকৃতি সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন, 'বড়লোকের মধ্যে আমাকে কেন? আমি কি করিয়াছি?" আমরা বলিলাম, তিনি দেশের এক শ্রেষ্ঠ কবি।

"তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ। তিনি স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে চাহেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'এ অবস্থায় কি করিয়া বেড়াইব? গাড়ী রাখিবার সাধ্য নাই।' দৃষ্টিশক্তির কথায় তিনি বলিলেন, এক চক্ষু অস্ত্র করাইয়া নষ্ট হইয়াছে। অপরটীও নাই বলিলেই হয়। কেবল দ্বার বা বাতায়ন মুক্ত থাকিলে আলোক কি অন্ধকার বুঝিতে পারেন। আর একটি কেন অস্ত্র করান না, জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'মরিবার বয়স হইয়াছে। শরীরও ভাল নাই।'

"আমরা বলিলাম, 'সম্ভবতঃ কিছু পড়িয়া শুনাইলে সময় ভাল কাটে। আমরা দূরে থাকি, নহিলে আসিয়া কিছু পড়িয়া শুনাই। আপনার পুরাতন বন্ধুরা নিকটে আছেন, তাঁহারা বোধ হয় সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন?' কবি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, 'বন্ধু, আমার কি আর বন্ধু থাকিবার সময়? আর সকলে যে যাহার কায লইয়া ব্যস্ত; কেহ ত আর আমার মত নিকর্ম্মা নহেন!' তাঁহার দৃষ্টিহীন নয়ন দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"তাঁহার পরিজনবর্গের কথায় তিনি বলিলেন, 'তিন পুত্র বর্ত্তমান। কনিষ্ঠ মৃত। জ্যেষ্ঠের রক্তবমন হয়। মূর্চ্ছারোগও আছে। কয়দিন আছেন, জানি না। আপনারা জানেন কি না জানি না, আমার স্ত্রী আট দশ বৎসর পাগল।' এই দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া তিনি বলিলেন 'কেন যে বাঁচিয়া আছি জানি না।' তখনও তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিতেছিল।

"'ভারতসঙ্গীতে'র উপরে যে টীকা আছে প্রথমে তাহা ছিল না। একবার গবর্ণমেণ্টের তাড়নায় ঐ টীকা দিয়া কবিতাটির স্বরূপ প্রতিভাত করা হয়। কবিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কিছুই মনে নাই।'

"ইহার পর আমরা বিদায় হইলাম। তাঁহারই কবিতার কয়টি চরণ স্মরণ করিতে করিতে ফিরিলাম।

"হায় মা ভারতী চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে;
যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে!"

"হেমচন্দ্রকে দর্শনের কথা মনে করিলেই আমার ম্যাক্সমুলারের হায়েন দর্শন মনে পড়ে। সেও এমনই করুন—এমনই হৃদয় বিদারক দৃশ্য।"

পূর্ব্বসঞ্চিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্বজন আশ্রিতগণের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া, স্বয়ং ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া হেমচন্দ্র শেষ জীবন অতি কষ্টেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন এবং বলিতেন—"কেন আসিয়াছেন? এ হতভাগ্যের নিকট বসিলে কেবল কষ্ট পাইবেন মাত্র।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিবরের নামে যে অর্থ সংগৃহীত হইত তাহা সমস্ত তাঁহার হস্তে আসিত না। যিনি কখনও টাকাকড়ির হিসাব রাখিতেন না,

অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দুই হস্তে ব্যয় করিতেন, তাঁহার শেষজীবন কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। অধুনা বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী হেমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র সি-আই-ই মহোদয় কিছুদিনের জন্য কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কলেক্টর ছিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র একখানি পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

২৪ বৈশাখ ১৩০৮

"বাবা প্রভাস,

তোমার একজন ট্যাক্স সরকারকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন পত্রাদিও পাই নাই, কোন সরকারও আসে নাই। অনেক করিয়া টাকা কয়টি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছি, আবার কবে খরচ হইয়া যাইবে বলিতে পারি না সেইজন্য তোমাকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিতেছি। ইতি"

এই পত্র পাঠে প্রতীত হয়, যে হেমচন্দ্র কখনও টাকাকড়ির কোন সংবাদ রাখিতেন না, তিনি এখন "অনেক করিয়া টাকা কয়টি যোগাড়" করিয়াছেন এবং যিনি খরচ পত্রাদির কোনও তত্ত্ব লইতেন না, তিনি এখন "আবার কবে খরচ হইয়া যাইবে" বলিয়া আশঙ্কা করিয়া ট্যাক্সের টাকা শীঘ্র জমা দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

হেমচন্দ্র চক্ষু থাকিতে পৃথিবীর স্বরূপ দেখিতে পান নাই। উদারচরিত কবি বসুধার সকলকেই আত্মীয় ভাবিয়াছিলেন। অন্ধ হইয়া হেমচন্দ্র পৃথিবীর স্বার্থপরতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইয়া ধনী বন্ধুগণের সহিত সমভাবে আলাপ করা কতদূর তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য বন্ধুগণকে অতি দীনভাবে পত্রাদি লিখিতেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে লিখিত পত্রগুলিতে পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী বলেন, তাঁহাকেও কবিবর এরূপ ভাষায় পত্র লিখিতেন যে তাহা পড়িতে লজ্জা হইত। স্যর চন্দ্রমাধবকে একবার এরূপভাবে পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন —

"You are in great difficulties, but that, I humbly think, is no reason why you should address me in the way and in the language you have adopted. That shows that you have come to entertain of me a very different opinion than you had for years together entertained."

হেমচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা উপন্যাসের কাটতি দেখিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রে কবিবরকে উপন্যাস লিখিতে পরামর্শ দেন—

"I have a practical suggestion to make: I learnt from Umakali first that you had not been able to save enough to be above wants and you say the same thing yourself in your book. Could you not now turn your pen from poetry to novels, (though not at sixty) as Scott did? I do not know whether your previous training has been such—your study of men and character, that is, has been such as to qualify you to be a successful novelist, that supposing you could turn out a good novel of purpose, it would bring you a good deal of money. For one reader of poetry there are fifty readers of Romance, so that if you could bring out a good novel it would be a great help to you pecuniarily.

"You have been sick of life for sometime past. You longed for death even before you came to be afflicted with blind-

ness, but as your life has been spared, you will, I daresay try to make the best of it."

কিন্তু হেমচন্দ্র জীবনের সায়াহ্নে কবিতাদেবীর চরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যিনি যৌবনে কমলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাণীসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্যদশায় অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে বালকগণের জন্য বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক লিখিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। যে লেখনী হইতে 'ভারতসঙ্গীত' 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যা' বিনিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লেখনী অবশেষে শিশুগণের জন্য বর্ণপরিচয় রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ জন্য কবিবরের একখানি অপ্রকাশিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।
তব পদে বালকেরা করিছে প্রণতি।
অ আ ই ঈ উ ঊ, আদি স্বর বর্ণচয়
ক খ গ ঘ বর্ণাদি ব্যঞ্জন সমুদয়,
তোমার মহিমাগুণে শীঘ্র যেন শিখি
শতকিয়া গণকিয়া গণিতাঙ্ক লিখি।
বিদ্যার মন্দিরে পরে প্রবেশি সকলে:
সুখে থাকি তোমার কৃপায় ক্ষিতিতলে।

(২)

এক বিন্দু (ং) অনুস্বার বিসর্গ বিন্দু দুই (ঃ)
চন্দ্রবিন্দু চাঁদের উপর ঁ বিন্দু থুই ;
বর্ণের উপরে র লিখিবার বেলা
রেফের আকারে ধরে এইরূপে হেলা (´)
অল্পচ্ছেদে কমা চিহ্ন এইরূপে (,) আঁকে
বেশী ছেদে সেমিকোলন বিন্দু দিয়ে থাকে (;)
পূর্ণচ্ছেদে দাঁড়ি চিহ্ন (।) কথা সাঙ্গ তায়,
পয়ারে দুইদাঁড়ি চিহ্ন (॥) কভু দেখা যায় ।

অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ লঘুস্বর
হল বর্ণযোগে ি ু ৃ রূপান্তর,
ব্যঞ্জনের অন্ত যায় হলবর্ণ হয়,
অ ই উ ঋ ঌ কারে হ্রস্ব স্বর কয়।

আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ গুরুস্বর
া ে ৈ ো ৌ রূপান্তর
া ী রূপান্তর যুক্ত হলে
আ ঈ ঊ একটীরে দীর্ঘস্বর বলে।

(৩)

জয় জয় দয়াময় জগতের পতি
বালকেরা তব পদে করিছে প্রণতি।
বর্ণমালা পরে শিখি বানান এখন
দয়া কর দয়াময় দিয়া শ্রীচরণ।
পিতামাতা শিক্ষকের কাছে যেন কভু
কোন দোষে অপরাধী নাহি হই প্রভু।
সন্ধ্যাকালে সকাল বিকাল দিনমান
ভালবাসে ভালবাসি সকলে সমান।
খেলা করি খেলিবার সময় যখন
পাঠকালে সদা যেন পাঠে থাকে মন।
তোমার স্মরণে সদা থাকে যেন মতি
জয় জয় দয়াময় জগতের পতি।

(৪)

মোংরা কথা বলতে নাই।
মোংরা পথে যেতে নাই॥
পথিকে দেখাইও পথ।
বাক্য কাজে হৈও সৎ॥

গালি মন্দ দিও না।
পরদ্রব্য নিও না॥
মামা মাসী পিসে মেসো।
জননীরে ভালবেসো॥
বাঙ্গালী দেখিলে পরে।
ভিক্ষা দিও দয়া করে॥
তোমা হতে দুঃখী যেই।
তারে কষ্ট দিতে নেই॥
অতিথি আইলে ঘরে।
সেবা করো যত্ন করে॥

(৫)

রাত নাই উঠ তাই প্রভাত রজনী
মন্দ মন্দ সমীরণ খেলিছে আপনি।
চেয়ে দেখ পূর্ব্ব দিক জবার বরণ
তরু ডালে গৃহচালে পড়িছে কিরণ॥
পাখিগণ করে গান আনন্দে মগন
সুতাজালে মতি জলে কিবা শোভা পায়।

ইত্যাদি—

অনন্ত পথের যাত্রী কবির 'স্বজন আশ্রিতগণে'র জন্য অর্থ উপার্জ্জনের এই শেষ চেষ্টা দেখিয়া কাহার হৃদয় দুঃখে বিগলিত হইবে না?

হেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এ এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় হেমচন্দ্রের হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদবিহারী রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন—

December 7, 1900—Received sad intelligince from Kidderpore of Poorna Babu having died yesterday morning. Truly as Hem Babu writes, "What can be more sorrowful that this?" His last letter to me was sated 13th Nov. Sorry I could not see him.

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ভগিনী নৃত্যকালীর কন্যা মৃণালিনীর মৃত্যুতেও হেমচন্দ্র ভয়ানক আঘাত-প্রাপ্ত হন। পরবৎসর তিনি আরও একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন—তাঁহার আদরিণী জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাদেবীর মৃত্যুতে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সুশীলাদেবীর অন্যতম পুত্র প্রবোধ যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ইনি হেমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তখন সুশীলাদেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। প্রবোধের মৃত্যুর পরদিবস সুশীলাদেবীর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রসূতিও সূতিকা রোগে ভুগিয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১৩০৯, ২৭শে ভাদ্র) স্বর্গারোহণ করেন। হেমচন্দ্র এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার পর হেমচন্দ্র আর কয়েকমাস মাত্র জীবন্মৃত অবস্থায় ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন। সুশীলাদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে হেমচন্দ্রের স্বাস্থ্য অতি দ্রুত-ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি ইদানীং অহিফেন সেবন করিতেন। তাঁহার মূত্রযন্ত্রের রোগ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে মল মূত্রাদি নিঃসরণ হইত না। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র অতুলচন্দ্রের রোজনামচা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩০৯।৮ ফাল্গুন। বাবার কম্প দিয়া জ্বর হয়।

৯ই ফাল্গুন। শনিবার ভোররাত্রে ৩টার পর বাবার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছিল, এই জন্য সত্য ডাক্তার ১০ই ফাল্গুন রবিবার দিনই প্রস্রাবদ্বারে সলা দিয়া প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করেন. তাহাতে ঈষৎ প্রস্রাব হয়। ক্রমশঃ বড় কঠিন হয়ে উঠায় ভবানী-পুরের নীলমণি ডাক্তারকে আনান হয়। বাবার ব্যায়-রাম জন্য টাঁ্যাপা আসে।

১৭ই—বাবার ব্যারাম জন্য আমার ছোট ভগ্নী তনী তার পুত্রকে লইয়া পাইকপাড়া হইতে আসে।

২৭শে—Dr. Murray সাহেব of Medical College আনা হয় ও তৎসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থাকেন।

১৯ শে চৈত্র। বাবার জ্বর হঠাৎ অধিক হয় সেজন্য Dr, Harris of Medical College আসেন।

১৩০৯ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে তাঁহার রোগ বাস্তবিকই আশঙ্কাজনকরূপে বৃদ্ধি পায়। তিনি এই সময়ে বন্ধু উমাকালী দ্বারা একটি 'উইল' প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিনোদ-বিহারীকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভার দেখিতেন। পুত্রগণ উচ্ছৃ-ঙ্খল বলিয়াই বিনোদবিহারীকেই তাঁহার অভিপ্রায় মত বিষয়াদির ব্যবস্থা করিবার সমস্ত ভার প্রদান করেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুয়ারি দিবসে বিনোদবিহারী রোজনামচায় লিখিয়াছেন—

Went to Khidirpore to see Hem Babu who was ill. He began to cry when I went before him. Read out to him draft of a will drawn up by Umakali Babu. He approved with certain modifications. I am to be the sole executor. He is seriously indispsed.

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে (বাঙ্গালা ১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবা ২ ঘটিকার সময় তাঁহার খিদিরপুরস্থ ভবনে হেমচন্দ্র দেহরক্ষা করেন। * কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হিতবাদীতে কবির মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"নৈশ গগনে অপূর্ব্ব দীপ্তি-প্রকাশে ক্ষণমাত্র ক্ষণ-প্রভা তমোনাশ করিয়া যেমন অনন্তে মিশিয়া যায়, অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমি অল্পক্ষণের জন্য সমুজ্জ্বল করিয়া আমাদিগের হেমচন্দ্রও সেইরূপ অনন্তে বিলীন হইলেন।

"এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা আমাদিগের দেশে বলিয়া নহে, জগতে বিরল। উন্নত চরিত্রের আদর্শচিত্র প্রদর্শনে, কল্পনার উচ্চতায়, ভাবসন্নিবেশের পারদর্শিতায়, চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্য অনুসরণে, তাঁহার ক্ষমতা সর্ব্ববিষয়েই অনন্যসাধারণ ছিল। কি গাম্ভীর্য্যে, কি পরিহাস রসিকতায়, কি স্বদেশানুরাগে, কি ভক্তিভাবে কোন্ বিষয়ে হেমচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশ পায় নাই তাহা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ কৃত্রিম ছিল না। তিনি যখন দেশের দুঃখ অনুভব করিতেন, উন্নতির পথ দেখাইয়া দিতেন, তখন তাঁহার প্রাণের কথা বাহির হইত, কথাগুলি কাজেই মর্ম্মস্পর্শী, অসার বচনবিন্যাসের ভার ভাসিয়া যায় নাই, যে পড়িয়াছে তাহারই হৃদয় বিচলিত করিয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি হয় নাই, আশা মিটাইয়া প্রাণের কথা তিনি শুনাইয়া যাইতে পারেন নাই—হৃদয়ের আবেগে বলিয়া গিয়াছেন—'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নতুবা শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার।' হায়, সে বীণাঝঙ্কার এতদিনে নীরব হইল।"

মধুসূদনের স্বর্গারোহণের পর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে রাজটীকা পরাইয়া সদর্পে হেমচন্দ্রকে মহাকবির সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, সমস্ত বঙ্গবাসী কাব্য-সাম্রাজ্যের সেই নূতন সম্রাট্‌কে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু হেমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর সে সিংহাসন কে অধিকার করিলেন? একজন বঙ্গ মহিলা বিলাপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

হে বঙ্গ কোবিদ-কুল-রাজ-রাজেশ্বর।
কারে দিলে সিংহাসন স্বর্ণবীণা আর?
পতিত ভারত তরে
কাঁদিতে কাতর-স্বরে
"এখনো জাগরে" বলি করিয়া ঝঙ্কার
জাগাতে জগতবাসী কারে দিলে ভার?

অলস জোছনা রাতে কুসুম শয়নে,
প্রণয়িনী চিত্র আঁকি কল্পনা স্বপনে,
ফুলের পরশ মাখা
অঙ্গে পুষ্পরেণু ঢাকা
যাহে পুষ্পময়ী চাহে বসিয়া নয়নে,
বসিবে সে সব কবি তব সিংহাসনে?

অথবা যে পুরাণের পবিত্র আকৃতি
আঁকিছে সাহস ভরে করিয়া বিকৃতি,
শোক বার্দ্ধক্যেতে যাঁর
হয়েছে কবিত্ব তার,
কালবশে পূর্ব্ব বিভা এবে ম্লান ভাতি,
কবি সিংহাসনে তাঁরে বরিবে ভারতী?

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

* হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের রোজনামচা হইতে কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার যোগ্য।

১৩১০।৮ জ্যৈষ্ঠ বাবার অসুখ হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ। বাবার গত কল্য হইতে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গলায় দলিতে ঘা ও শোথ হইয়া আহার বন্ধ হইয়া ইত্যাদি হইতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে অদ্য বেলা ৯টা ১০ মিঃ সময়—দ্বাদশী—রবিবার—গঙ্গালাভ করেন।

মুক্তিনাথ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

বর্ত্তমান ধীরাজের নাম ত্রিভুবন বীর বিক্রম শাহ এবং প্রধান মন্ত্রীর নাম চন্দ্র সমসের জঙ্গ রাণা। উপাধি বর্জ্জিত কেবল পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত নাম দুইটীই লিখিলাম। প্রত্যেক নামে সমস্ত উপাধি সংযোগ করিতে হইলে "প্রবন্ধ গৌরব" হইয়া পড়িবে।

প্রধান মন্ত্রীর কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন নাই। কাস্কি ও লামজুঙ্গ নামক দুটী জেলা মহারাজের অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর খাস সম্পত্তি। এই দুটী জেলা একজন শাসন কর্ত্তার অধীন এবং পোখরায় তাঁহার সদর অফিস।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ১৯০২ খ্রীঃ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত নেপালের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ নির্ব্বিবাদে এত দীর্ঘকাল কোন রাজমন্ত্রীই নেপাল রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। তিনি ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সময়ে নেপাল রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাঠমণ্ডু সহরে বৈদ্যুতিক আলো, কলেজ, হাঁসপাতাল, টাউন হল (মজলিস খানা) প্রভৃতি তাঁহার পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ জনিত সুশিক্ষা ও বর্ত্তমান কালোপযোগী সভ্যতার প্রতি আসক্তির পরিচায়ক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিক্ষা লাভের জন্য তিনি মেধাবী ও উচ্চ বংশীয় নেপালী যুবকদিগের মধ্য হইতে কোন কোন যুবককে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন।

শিব চতুর্দ্দশীই নেপালের প্রধান পর্ব্ব। এই উপলক্ষে নেপালে নানাস্থান হইতে অনেক লোকের সমাগম হয়। এ বৎসর শেষাগিরি চন্দ্রগিরির পথে প্রায় ত্রিশ সহস্র যাত্রী আসিয়াছিল। ইহার মধ্যে নেপাল তেরাইএর অধিবাসী যাত্রীদিগকে বাদ দিলে, অন্য সকলেই ব্রিটীশ ভারতবর্ষের লোক এবং তাহাদের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থ ও সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল বাবু তারাকিশোর চৌধুরী, (বর্ত্তমান বৃন্দাবনের মোহান্ত সন্তদাসজী) উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার সহিত হাইকোর্টের উকীল প্যারীমোহন রায় এবং অপরাপর সাত আট জন আসিয়াছিলেন।

শিব চতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে নেপালে আগত সাধু সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের সহযাত্রীদের অবস্থান ও আহার সম্বন্ধে কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না। বাগমতীর কূলে আপাঞ্জী নামক স্থানে ১ উদাসী, ২ সন্ন্যাসী, ৩ বৈরাগী ও ৪ গোরক নাথী কন্‌ফটু সাধুদের চারিটী আশ্রম আছে। এতদ্ব্যতীত পিছলী ভৈরব নামক স্থানে আরও চারিটী আশ্রম আছে। আশ্রমগুলি সমস্তই নেপাল রাজ সরকারের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও রক্ষিত। প্রত্যেক আশ্রমে একজন মোহান্ত ও বারজন চেলা সম্বৎসর কাল রাজ সরকার হইতে খাদ্য—এমন কি গাঁজা, আফিম পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। শিবরাত্র উপলক্ষ্যে এই আট আশ্রমে ও পশুপতিনাথ দেবের মন্দিরের নিকট ধর্ম্মশালাতে সদাব্রত দেওয়া হয়। এই সদাব্রত শিবরাত্রির সাত দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া শিবরাত্র অন্তে যে পর্য্যন্ত মহারাজ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে বিদায় না করেন ততদিন চলিতে থাকে। এই সময় গাঁজা, ভাঙ্গ, আফিম ইত্যাদিও রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে। ভোজনের ব্যবস্থাও মন্দ নয়। কোন দিন পুরী হালুয়া, কোন দিন পুরী ক্ষীর, কোন দিন মালপুয়ার বন্দোবস্ত। নেপালে আসিবার ও যাইবার পথে ভীমফেদী হইতে পুনরায় ভীমফেদী পর্য্যন্ত সদাব্রত আছে।

যে সমস্ত তীর্থযাত্রীরা সদাব্রত গ্রহণ করে না, তাঁহাদের জন্য রাজ সরকার হইতে একটী প্রকাণ্ড

ত্রিতল বাড়ী আছে। যাত্রীরা সেখানে থাকিতে পারেন; অহারের বন্দোবস্ত নিজেদের করিতে হয়।

শিবরাত্রির পর কোন একদিন সাধু সন্ন্যাসীরা রাজ-সরকার হইতে বিদায় পাইয়া থাকেন এবং বিদায়ের পর সকল তীর্থযাত্রীকে নেপাল রাজধানী কাঠমণ্ডু পরিত্যাগ করিতে হয়। বিদায়ের পর রাজ-সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন যাত্রী কাঠমণ্ডু সহরে থাকিতে পারে না।

কাঠমণ্ডু সহরে রাত্রি দশ ঘটিকায় সময় একটী তোপধ্বনি হয়, ইহার পর কাহারও গৃহের বাহির হওয়ার অনুমতি নাই।

২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯২২। চারিদিনে ৭৫ মাইল পার্ব্বত্যপথ পদব্রজে অতিক্রম করায় কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। গত কল্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করায় শরীরের অবসাদ দূর হইয়াছে।

অদ্য প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পশুপতিনাথ দর্শনে যাত্রা করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে পথঘাটের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

পশুপতিনাথের মন্দির সহর হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বাসা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে কুচকাওয়াজের মাঠে (parade ground) আসিলাম। মাঠটী বড়ই সুন্দর ও অতিশয় বিস্তৃত। মাঠের পশ্চিম প্রান্তের রাস্তার পূর্ব্বধারে মহাকাল দেবের একটী ক্ষুদ্র মন্দির। মাঠের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ বেদী। সৈন্যদিগকে কোন রাজকীয় ঘোষণা শুনাইতে হইলে রাজকর্ম্মচারী এই বেদী হইতে ঘোষণা পাঠ করিয়া থাকেন। মাঠের পূর্ব্বদিকে একটী কালীমন্দির, মাঠের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে রাস্তার পশ্চিমধারে জেল, তাহার উত্তরে একটী উচ্চ মনুমেণ্ট। মনুমেণ্টটীর নাম বড়ই অদ্ভুত *—Bhim Sen's folly—মন্ত্রী ভীমসেন থাপ্পা এই মনুমেণ্টটী নির্ম্মাণ করেন। মনুমেণ্টের উত্তরে সৈন্যা-বাস, ডাক্তারখানা, টাউনহল, লাইব্রেরী এবং দরবার স্কুল।

মাঠের পূর্ব্ব প্রান্তের রাস্তার পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান প্রধান সচিবের বাড়ী, তাহার উত্তরে বৈদ্যুতিক আলোর আফিস, চৌরঙ্গীর সাহেবী দোকানের অনুকরণে একটী দোকান ও কলেজ।

বর্ত্তমান হিজ্ ম্যাজেষ্টী দি কিঙ্গ্ অব্ নেপাল ত্রিভুবন বিক্রম শাহ-এর "ত্রিভুবন" এবং প্রধান সচিব চন্দ্র সমসের জঙ্ বাহাদুর রাণার "চন্দ্র" একত্র করিয়া কলেজটীর নাম "ত্রিভুবনচন্দ্র" কলেজ হইয়াছে। কলেজের দালানের শীর্ষদেশে একটী প্রকাণ্ড ঘড়ী থাকায় সাধারণ লোকে কলেজটীকে "ঘণ্টাঘর কলেজ" বলে।

মাঠের উত্তর প্রান্তের রাস্তার উত্তরে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। দীঘির মাঝখানে একটী জলটুঙ্গি। মল্ল বংশের কোনও রাজা এই দীর্ঘিকা খনন করাইয়া জলটুঙ্গিতে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দীঘির পারে প্রস্তরে নির্ম্মিত হস্তী পৃষ্ঠে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তার দক্ষিণে নিম্নভূমি, তাহার দক্ষিণে বাজার থাপাথলী এবং পরে বাগমতী নদী। মাঠের স্থানে স্থানে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোনও রাজা ও মন্ত্রিগণের ধাতুনির্ম্মিত অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি।

সকাল হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত কেহ রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিতে পারে না। অপরাহ্ণে বায়ুসেবনার্থ সকলেরই মাঠে ভ্রমণের অধিকার আছে। সন্ধ্যার পর মাঠের চতুর্দ্দিকের রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান হয়, তখন মাঠের শোভা বড়ই সুন্দর হয়। এই মাঠ হইতে গোঁসাইথান শৃঙ্গের পূর্ব্বাংশ ও গৌরীশঙ্করের পশ্চিমাংশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মহাকালের মন্দির দর্শন করিয়া কলেজের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইয়া, কিয়দ্দূরে রাজপথ ত্যাগ করিয়া মাঠে নামিলাম। পদব্রজে পশুপতিনাথ যাত্রীদিগকে সাধারণতঃ এই মাঠের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। যাহারা যান বাহনে গমন করেন তাঁহাদিগকে অন্য রাস্তায় যাইতে হয়।

* It was not raised to commemorate any particular epoch or event but apparently merely for the purpose of "astonishing the natives" and it well deserves the name of Bhim Sen's folly."

(Oldfield's Sketches from Nepal.)

শিবরাত্রির এখনও তিন দিন বাকী, কাযেই যাত্রীর ভিড় হয় নাই। পশুপতিনাথের মন্দিরে যাইবার ও আসিবার পথে অতি অল্পসংখ্যক বিদেশী যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, কেহবা পশুপতিনাথের অর্চ্চনা শেষ করিয়া শূন্য পুষ্পাধার ও দুগ্ধপাত্র হস্তে বাড়ী বাড়ী ফিরিতেছেন, কেহবা দেবতার অর্চ্চনার জন্য পুষ্প ও দুগ্ধ নিয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। প্রত্যহ পশুপতিনাথ দর্শন, সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী লোকদের মধ্যে অনেকেরই একটী নিত্য কর্ম্ম।

নিম্ন মাঠ পার হইয়া আবার পাহাড়ে উঠিলাম। এখান হইতে পশুপতিনথে যাইবার পথে বামদিকে একটী উচ্চভূমির নাম "বত্রিশ পুতুলী"। আমাদের দেশে "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা" বা "বত্রিশ সিংহাসন" সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা প্রচলিত, এখানেও তাহাই।

ক্রমে পশুনাথ দেবের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তোরণ পার হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। এমন সুন্দর তীর্থস্থান পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্থানটী বড়ই গম্ভীর ভাবের দ্যোতক। মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিক দিয়া বাগমতী প্রবাহিতা, দক্ষিণ দিকে রাস্তা, উত্তরে একটী পাহাড়। দক্ষিণ দিকের রাস্তার পূর্ব্ব মাথায় পুল পার হইয়া গুহ্যেশ্বরীর বাড়ী যাইতে হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যাত্রীদের অব-অবস্থিতি জন্য রাজব্যয়ে নির্ম্মিত অনেক বাড়ী।

মন্দিরের জন্য নির্ব্বাচিত স্থানটীর নৈসর্গিক শোভা ও গাম্ভীর্য্য অতীব মহান্‌। মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটী প্রকাণ্ড বৃষমূর্ত্তি উচ্চ প্রস্তর বেদিকার উপর হাটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। আমার যতদূর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, তাহাতে বৃষটি পিত্তল নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হইল, সুবর্ণ হইতেও পারে।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটী চত্বরে সারি সারি সাজান একশত আটটী শিবলিঙ্গ। ইহা ব্যতীত হনুমান, গণেশ এবং বাঙ্গালীর অপরিচিত নানা ছোট ছোট অনেক মূর্ত্তি মন্দিরে ও মন্দিরের বাহিরে আছেন।

এখনও পর্য্যন্ত বিদেশী যাত্রীর সমাগম না হওয়ায় পশুপতিনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। প্রথমতঃ মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করলাম, মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ উচ্চ অলিন্দে নেপালীগণ কেহবা মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন, কেহবা স্তোত্রপাঠ, কেহবা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। প্রদক্ষিণান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির মধ্যেও পূর্ব্ববৎ পূজা পাঠ চলিতেছে, কেহ বা পশুপতিনাথের মস্তকে ফুল বিল্বপত্র কেহ বা দুগ্ধ প্রদান করিতেছেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে পশুপতিনাথ প্রদক্ষিণ করিলাম। এখানে কোনও পাণ্ডা নাই, পয়সা না দিলে মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মিবে না একথাও কেহ বলিল না, মন্দির মধ্যে দুই মিনিট স্থলে পাঁচ মিনিট থাকিতে পারা যাইবে না এ ব্যবস্থাও নাই। কেহ কিছু প্রার্থনাও করিল না। অনেকক্ষণ মন্দিরমধ্যে থাকিয়া পশুপতিনাথ দর্শন করিলাম। পশুপতিনাথ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহদাকার শিবলিঙ্গ, পঞ্চবক্ত্র ত্রিপঞ্চদৃক্‌। আবশ্যক হইলে পঞ্চমুখ পৃথক করিয়া রাখা যায়। মূর্ত্তির উপর স্বর্ণছত্র।

পশুপতিনাথ এবং অন্যান্য মন্দির ও দেবতা দর্শন করিয়া পাহাড়ের উত্তর দিকের গুহাতে সন্ন্যাসী দর্শনে গেলাম। সন্ন্যাসীটীর বয়স ৩০।৩২ বৎসর, দীর্ঘ, তপঃকৃশ শরীর। একমাত্র লেঙ্গটী দ্বারা কথঞ্চিত লজ্জা নিবারণ করিয়া এই শীতের মধ্যে নগ্নদেহে বসিয়া আছেন। জানা গেল তিনি পঞ্জাব দেশীয়। বদরীনাথের পথে যশী মঠে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া এগার বৎসর নেপালে এই গুফাতে আছেন, মাঝে এক বৎসর কাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীজীর সহিত কিছু আলাপ করিয়া পশুপতিনাথের পাহাড় ত্যাগ করিয়া গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বাগমতীর পুল পার হইয়া গুহ্যেশ্বরী আসিলাম। নদীতীর হইতে পর্ব্বতের অধিত্যকা পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে পর্ব্বতের অপর প্রান্তে নদীতীর পর্য্যন্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়ির অতি প্রশস্ত রাস্তা। উভয় দিকের নদী-

তীর হইতে অধিত্যকা পর্য্যন্ত পাহাড় কাটিয়া এই সিড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং উভয় পার্শ্বস্থিত উচ্চভূমি যাহাতে ধ্বসিয়া না পড়ে তাহার জন্য পাথরের উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

গুহেশ্বরীর পাহাড়ে অনেকগুলি মন্দির আছে। তন্মধ্যে গুহেশ্বরীর মন্দির ভিন্ন (১) মৎস্যেন্দ্রনাথ (২) গোরখনাথ ও (৩) কিরীটেশ্বর বা কিরাতেশ্বর শিবের মন্দিরই প্রধান।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখনাথের মন্দির দুটি পাহাড়ের অধিত্যকার উপর। কোনও সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের মঙ্গলদেবতা (Guardian Saint) ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ "নাথ" সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ সাধু এবং আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। গোরখনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। নাথ পন্থীদের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখনাথ উভয়েই বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।

কেহ বলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ নাম আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব। একদা শিব সমুদ্রবেলায় পার্ব্বতীকে যোগোপদেশ দিতেছিলেন, তখন আর্য্যাবলোকিতেশ্বর মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিজ্ঞাত হয়েন। পরে উচ্চারণভেদে মচ্ছিন্দ্রনাথ, মছন্দরনাথ, মকীন্দ্রনাথ, মীননাথ, ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে। কালে মৎস্যেন্দ্রনাথ যোগমার্গ ভ্রষ্ট হইয়া নারীরাজ্যের অধিশ্বরী রাণী প্রেমলার প্রেমাস্পদ হইয়া পড়েন, পরে স্বীয় শিষ্য গোরখনাথ পুনরায় তাঁহাকে বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে লইয়া যান।

নেওয়ার রাজাদের সময়ে প্রতিবৎসর মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দিরের সহিত একটী ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ দেওয়া হইত; এমন কি গোর্খা রাজাদের সময়ও কিছুদিন ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে রহিত হইয়া গিয়াছে।

গুহেশ্বরী পাহাড়ের পশ্চিমোত্তর কোণে অতি নিভৃত স্থানে কিরাতেশ্বর শিবের মন্দির।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখনাথের মন্দিরের পর হইতেই "উৎরাই"। পাহাড়ের শেষ উত্তর প্রান্তে নদীতীরে গুহেশ্বরী দেবীর মন্দির। সমস্ত পথ অতি নির্জ্জন।

ক্রমে নদীতীরে গুহেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়া পৌছিলাম। এ মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দিরের মধ্যস্থলে পাথরে বাঁধানো একটি চতুষ্কোণ স্থান, ঐ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যস্থানে স্বর্ণময় আবরণে একটি উৎসের মুখ আবৃত। পুরোহিত ঐ আবরণ অপসৃত করিলে একটী উৎসের মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ উৎসের জল স্পর্শ করিলাম। পশুপতিনাথের মন্দিরের ন্যায় এখানেও মন্দির ও মন্দির বাহিরে অনেক লোক পূজা, স্তোত্র, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

এখান হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে বৌদ্ধদিগের বোধনাথ স্তূপ। অনেকের মতে বোধনাথ ও আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্ম-পাণি বোধিসত্ত্ব অভিন্ন।

অনেক ঐতিহাসিকের মত যে, পর্ব্বতকন্দরে দুরধিগম্য হিন্দুতীর্থগুলি পূর্ব্বে বৌদ্ধ বিহার ছিল, শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ঐগুলি হিন্দুদের হস্তগত হইয়া হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এ অনুমান সত্য হইলে পশুপতিনাথ ভিক্ষুদের এবং গুহেশ্বরী ভিক্ষুণীদের বিহার ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

পশুপতিনাথ ও গুহেশ্বরী দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। অপরাহ্নে বন্ধুবর্গ সহ স্বয়ম্ভূনাথ দর্শনে গেলাম। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির কাঠমণ্ডু সহরের পশ্চিম প্রান্তে একটী উচ্চ টীলার উপর স্থাপিত। "স্বয়ম্ভূ" শব্দটী সাধারণ লোকের মুখে "শেম্ভু" রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

স্বয়ম্ভূনাথ পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে অধিত্যকা পর্য্যন্ত পাথরে বাঁধান সিঁড়ি। সিঁড়ির প্রথম ধাপের উভয় পার্শ্বে তাম্রনির্ম্মিত অতিবৃহৎ দুইটী ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি। সিঁড়ি এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে উঠিতে ও নামিতে মূর্ত্তিদ্বয়কে সর্ব্বদা আপনার দক্ষিণে রাখিয়া উঠা ও নামা যায়। কোন দর্শকই—কি হিন্দু কি বৌদ্ধ—মূর্ত্তিকে বামে রাখিয়া আসা যাওয়া করে না। মধ্যপথে আবার ঐরূপ দুইটী মূর্ত্তি, কিন্তু তত বৃহৎ নহে। সেখানেও সিঁড়ির তদ্রূপ ব্যবস্থা। সিঁড়ি শেষ করিয়া প্রাঙ্গণের প্রবেশ দ্বারে আরও দুইটী

মূর্ত্তি। সমস্ত অধিত্যকাটী পাথরে বাঁধান। মধ্যস্থলে স্বয়ম্ভু-নাথের মন্দির এবং মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিমে একটী দ্বিতল গৃহ। নিম্নতলে যাত্রীরা (প্রায়ই ভুটিয়া) অবস্থান করে, দ্বিতলে পুরোহিত এবং অন্যান্য বৌদ্ধ যাত্রীরা অবস্থান করেন। দ্বিতলেও অনেক মূর্ত্তি আছে।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির সম্বন্ধে কার্কপেট্রিক সাহেব লিখিয়াছেন :—

"Sumbhunath is a very ancient edifice * having it would seem been erected at a period when Nepal was ruled by a race of Tibetans who being subsequently expelled by the Newars obtained the name of Katbhutias (Bhutias of Kat mandu) which they preserve today, occupying at present the mountains of Kuchai but principally that part of the range situated in the Kootee quarters.

The possession of this temple has always been claimed by Dalai Lama and the pretension appears to have been yielded to by the existing Government of Nepal until 1792, when the rupture took place between Nepal and Tibet."

সাহেব স্বয়ম্ভুকেই "শুম্ভু" লিখিয়াছেন। স্বয়ম্ভু মহাদেবেরই একটী নাম, কিন্তু এখানে শিবলিঙ্গ কি মহাদেবের কোন বিগ্রহ নাই। মন্দির মধ্যে এক বিরাট ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ ও প্রশস্ত অলিন্দ। অলিন্দে উঠিবার চারিটী সিঁড়ি। এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়ি পর্য্যন্ত "ওঁ মেমে পেমে হুঁ" (ওঁ মণিপদ্মে হুঁ) অঙ্কিত তাম্রনির্ম্মিত প্রার্থনাচক্রের সারি।

টীলার উত্তর দিকে বঙ্গদেশীয় শীতলা দেবীর ন্যায় একটী দেবীর মন্দির। একজন নেপালী ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের পৌরোহিত্য করেন। এখানে বৌদ্ধ পুরোহিতেরই সম্পূর্ণ প্রাধান্য।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরে নেপাল সরকার হইতে কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয় না। নেপালী বৌদ্ধ অধিবাসীরা ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন এবং তিব্বত হইতে মাঝে মাঝে সাহায্য আসে শুনিলাম।

স্বয়ম্ভুনাথের টীলাটী ছোট, কাযেই চতুর্দ্দিক বেড়াইয়া দেখিতে অধিক সময় লাগিল না। স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির ও অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া দ্বিতলে পুরোহিতের প্রকোষ্ঠে গেলাম। পুরোহিতের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপের পর বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

২২শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে থাং জাং আসিয়া পৌছিল। অদ্য সহর হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে দক্ষিণাকালী যাওয়া পূর্ব্বেই স্থির ছিল। দক্ষিণাকালীর পাহাড়ে রাত্রিবাসের কোন সুবিধা নাই,আমাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিতে হইবে। পদব্রজে পার্ব্বত্য পথ ৬ ক্রোশ যদি শেষ করিতে না পারি এই আশঙ্কায় খাং জাং এ যাওয়া। এখানকার ক্রোশও আমাদের দেশীয় ক্রোশ হইতে দীর্ঘতর। এখানে ৪০০০ গজে এক ক্রোশ।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া মাধ্যাহ্নিক আহারের সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। কাঠমণ্ডু হইতে অনেকদূর পর্য্যন্ত রাস্তা ভাল। রাস্তাশেষ করিয়া একটা নদী এবং নদীর অপর কুলে হাতীবান্ধ্ পর্ব্বত। পর্ব্বতটী অতিশয় উচ্চ। নদী পার হইয়াই "চড়াই" আরম্ভ হইল। বিসর্জ্জন জন্য নীয়মানা প্রতিমার মুখ বাড়ীর দিকে এবং পশ্চাদ্দেশ গন্তব্য স্থানের দিকে যেমন রাখা হয়, আমাকেও থাং জাংএ বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কাঠমণ্ডু সহরের দিকে

---

* Very ancient কথাতে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের প্রাচীনত্ব ততটা বুঝা যায় না। শাক্য সিংহের নেপাল আগমনের পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

"Having travelled through the greater part of North Western India, he (Sakya) made a pilgrimage to Nepal accompanied by one thousand three hundred and fifty Bhikshus.......They had been introduced into the country by a distinguished teacher from Tibet named Manjusri who had led the first colony from China to Nepal and had built on a hill within the confines of the valley a temple to the Eternal self-existing spirit Swayambhu,...... During his stay Sakya paid his devotion at the shrine of Swayambhu on the sacred hill still known as the Hill of Swayambhu or Sambhunath."

(Oldfield)

মুখ করিয়া বসিতে হইল। বিশ্রজ্জনের ভয়ও যথেষ্ট কারণ পথটী ক্রমাগত সোজা ভাবে উঁচুতে উঠিয়াছে।

পর্ব্বতের প্রায় অর্দ্ধেক অধিরোহণের পর গোঁসাই থানের চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গ নয়নগোচর হইল। যতদূর দৃষ্টি চলে পূর্ব্ব পশ্চিমে দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী রজত গিরি। মধ্যাহ্ন সূর্য্যরশ্মি-সম্পাতে তাহার শোভা অতি অপূর্ব্ব! যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম ততই রজতগিরির বিশাল দেহ বিশালতর হইয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

"চড়াই" শেষ করিয়া অধিত্যকায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। প্রায় ১১ টায় একটী গ্রামে আসিলাম। এই গ্রামের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে যে পথ গিয়াছে সেই পথে কুলীখানি পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এবং চন্দ্রাগিরি উল্লঙ্ঘন করিতে হয় না।

গ্রাম হইতে দক্ষিণাকালীর মন্দির অর্দ্ধ মাইল। খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে একজন বাহক আমার সঙ্গে চলিল এবং অবশিষ্ট কয়েকজন তাহাদের মাধ্যাহ্নিক আহার প্রস্তুত জন্য গ্রামে রহিয়া গেল।

তিনটী পর্ব্বতের সংযোগ স্থলে অতি নির্জ্জন স্থানে দক্ষিণাকালীর মন্দির। পূর্ব্বে দক্ষিণে পশ্চিমে তিন দিকেই অতি উচ্চ পর্ব্বত। দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দির। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ হইতে দুইটী ছোট নদী আসিয়া মন্দিরের উত্তর প্রান্তে মিলিত হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের কোনও বিশেষত্ব নাই। কালী প্রতিমাও আমাদের দেশের প্রতিমার মত, নহে; একখণ্ড প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি। তৈল ও সিন্দুরে তাহার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে এখন কেবল মাত্র একখণ্ড সিন্দুরলিপ্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না।

কোন্ যুগে কে এই দেবী স্থাপনা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় কেহই জানে না। দেবীর কি ধ্যান, প্রণামের মন্ত্রই বা কি, কোন তন্ত্রানুসারে তিনি পুজিতা হয়েন কিছু জানিতে পারিলাম না।

বৌদ্ধ ও হিন্দু অভেদে দক্ষিণা কালিকার নিকট হাঁস মুরগী, ছাগল, ভেড়া ও শূকর বলিয়া দিয়া থাকে। নিহত জীবের রক্তে একটা তীব্র দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে।

স্থানটীর নৈসর্গিক গাম্ভীর্য্য মনে অকারণ ভীতির সঞ্চার করে। পশ্চিমের পাহাড়ে অর্দ্ধমাইল দূরে লোকালয়, অন্য তিন দিকে জনমানবের আবাস নাই। উচ্চ পর্ব্বতের আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যদেব স্থানটীকে যথেষ্ট আলোকিত করিতে পারেন না, তার পর তিন দিকে পার্ব্বত্য নদীর অবিশ্রাম ভীমগর্জ্জন!

দুই এক জন "জাপু" (নিম্ন শ্রেণীর নেওয়ার) পূজা দিতে আসিয়াছিল, তাহারা ও আমার সঙ্গীটি চলিয়া গেল। আমি পার্ব্বত্যনদীতে স্নান সম্পন্ন করিয়া সঙ্গে আনীত খাদ্যে উদরপূর্ত্তি করিলাম।

এই গম্ভীরস্থানে নিঃসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রায় দুইঘণ্টা কাল ছিলাম। এই সময়ে নিরর্থক ও বাধিতার্থক কত ভাবনাই মনে আসিতে লাগিল।

যখন উক্তরূপ ভাবনায় নিবিষ্ট ছিলাম তখন বাহক আসিয়া সংবাদ দিল তাহারা প্রস্তুত, এখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

শূন্য টিফিন ক্যারিয়ারটী বাহকের হস্তে দিয়া, দক্ষিণা কালীর মন্দির ত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিলাম এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় উপনীত হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

৺চন্দ্রশেখর-প্রসঙ্গ

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, মুরশিদাবাদ-খাগড়া-নিবাসী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনান্তে স্মৃতি-জলে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ তর্পণ করিতেছি।

সে আজ প্রায় ৪০।৪২ বৎসরের কথা। তখন আমি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়ি। একদিন চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে আমাদের ছাত্রাবাসে উঠিলেন। তাঁহারা উভয়েই আইন-পরীক্ষা দিবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমরা ত চন্দ্রশেখর বাবুর নাম শুনিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। বলা বাহুল্য, তখন তিনি সুলেখক বলিয়া এবং উদ্ভ্রান্তপ্রেম-রচয়িতা বলিয়া বঙ্গময় সুবিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—অহো, আমাদের কি সৌভাগ্য যে, যাঁহার "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" পড়িতে-পড়িতে হৃদয় নাচিয়া উঠিত, প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিত, কি যেন কি পড়িলাম ভাবিয়া মন কেমন-যেন-কেমন হইয়া যাইত; যাঁহার "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" মনে হইলেই মনে হইত, "আহা সেই মুখ খানি"—যে মুখ আমরা কখনও দেখি নাই, তবু তাঁহার লেখার গুণে মনে হইত—"আহা সেই মুখ খানি, কেমন করিয়া বলিব কেমন সেই মুখ খানি" ইত্যাদি, সেই চন্দ্রশেখর স্বয়ং আমাদের বাসায় উপস্থিত, তাঁহার সহিত একত্র ভোজন, একত্র বাস, একত্র কথোপকথন, কি সৌভাগ্য আমাদের! সুন্দর সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, হাস্তবদন ও মিষ্টভাষী। তিনি বয়সে আমাদের অপেক্ষা বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মধুর স্নেহগুণে তিনি আমাদের সহিত সমবয়সীর মত করিয়াই রসালাপ করিতেন। পাশ্চাত্য বিদ্যায় মহান্ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু একদিনও আমাদের কাছে পাণ্ডিত্য ফলাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যৌবনারম্ভেই যিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে অসামান্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও যাঁহার লেখায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আমাদের বাসায় কয়েকমাস ধরিয়া থাকিয়াও একদিনও ঘুণাক্ষরে তাঁহার আত্মগৌরবের কথা আমাদের কাছে পাড়িলেন না, ইহা অপেক্ষা নিরহঙ্কারতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

তিনি যে দিন আমাদের বাসায় উঠিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার পরে তাঁহার আত্মীয় ভদ্রলোকটী তাঁহাকে দু-একটা গান করিতে অনুরোধ করিলে, প্রথমেই তিনি কীর্ত্তন-অঙ্গের একটী পদ গাহিলেন:—

"নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিহি বিনি অপরাধ॥
মনে ছিল, প্রেমের অঙ্কুর হলো, শাখা পল্লব হবে;
তার ছায়াতে প্রাণ শীতল হবে;—
শীতল বলে শরণ নিয়েছিলাম,
প্রাণ জুড়াবে কি, জ্বলে গেল॥
চাতকী ধায় মেঘের পাশে,
পবন মেঘ নিয়ে যায় দূর দেশে;—
সেই দশা আমার হলো;
অক্রুর-পবন এসে শ্যাম-মেঘ নিয়ে যে গেল!
মনে ছিল, শ্যাম সায়র মাঝে আমি হব হংসিনী;
একবার ডুবিতাম, উঠিতাম, ভেসে যেতাম—
শ্যাম-প্রেম-হিল্লোলে একবার ডুবিতাম,
উঠিতাম, ভেসে যেতাম।
আমার মনসাধ মনে রৈ'য়ে গেল॥"

ইহার পূর্ব্বে কীর্ত্তন-অঙ্গের গান ভাল করিয়া শুনি নাই। ভাবিতাম, উহা বুঝি কেবলই "খচমচ"। রস-কীর্ত্তন যে এমন মধুর, তাহা আমি জানিতাম না। তাই চন্দ্রশেখর বাবু মধুর কণ্ঠে ঐ গানটী তখন বাস্তবিকই কাণের ভিতর দিয়া মরমেই পশিয়াছিল। এখানে একটা কথা বলি। পরে আমি যখন পদাবলী-সাহিত্য পাঠ করিলাম, তখন দেখিলাম যে ঐ গানটীর আরম্ভের দুই পংক্তি মাত্র বিদ্যাপতির। কিন্তু বাকী অংশ, পদাবলীর যত গুলি সংগ্রহ আমি দেখিয়াছি, তাহার কোনটীতেই পাই

নাই। তাই এক এক বার মনে হয় যে, বিদ্যাপতির পদ হইতে ঐ দুই পংক্তি লইয়া, বাকীটুকু চন্দ্রশেখর বাবু নিজে রচনা করেন নাই ত? তাঁহার পক্ষে, ভাষায় ও ভাবে ঐরূপ রচনা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না।

বাসায় থাকিতে মধ্যে-মধ্যে তাঁহার মুখে গান শুনিতাম। আর একদিন একটী গান করিলেন ;—

"এ কথা, তারি সনে, প্রিয় সখি, দেখা হলে,
মনে করে ব'লো ব'লো।
যে তোমার লাগি কাঁদে, তারে কি কাঁদান ভাল॥
যদি না সময় হয়, দাসীরে দিতে আশ্রয়,
(একবার) দেখা দিয়ে যেতে, বঁধু,
কিবা ধন লাগে বলো॥"

এ গানটীও পরে কোন সঙ্গীত পুস্তকে দেখিতে পাই নাই। তাই মনে হয়, এ গানটীও বোধ হয় তাঁহারই রচিত। এখন শুনিতেছি, তিনি গান রচনাও করিতেন। কোন উদ্যোগী ব্যক্তি সন্ধান করিয়া যদি তাঁহার রচিত গানগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। তবে এ কথাও বলিয়া রাখি—তিনি আমাদের বাসায় থাকিবার কালে একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কখন কবিতা লেখেন নাই ; কারণ কথার মিল করা তাঁহার আসিত না।

তিনি কয়েক মাস আমাদের বাসায় থাকিয়া পরীক্ষান্তে চলিয়া গেলেন। তাহার কিছুদিন পরে "বঙ্গবাসী" সংবাদ-পত্র বাহির হইল। বঙ্গবাসীর প্রায় আরম্ভ হইতেই তিনি উহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই রূপে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি বঙ্গবাসীতে বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বড়ই বাঞ্ছনীয়। এতদিন হইলে, ভালই হইত। যাহা হউক, অন্ততঃ এখন হওয়া উচিত। সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধ শুনিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে, উহা অবহেলার জিনিষ। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রথম কয়েক বৎসর বঙ্গবাসীতে নানাবিধ সাহিত্য-রচনা প্রতি সপ্তাহেই বাহির হইত। বাঙ্গালীকে সংবাদপত্র পড়িবার নেশা ধরাইবার জন্ত বঙ্গবাসীর প্রবর্ত্তক যোগেন্দ্র-চন্দ্র তাৎকালিক প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের রচনা সংগ্রহ করিয়া বঙ্গবাসীকে লোক-মনোহর করিতে শ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত রজনীকান্তের ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি একত্র হইয়া "আর্য্যকীর্ত্তি", ইন্দ্রনাথের "পঞ্চানন্দ" সংগ্রহিত হইয়া "পাচু ঠাকুর", যোগেন্দ্রচন্দ্রের সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখন "বাঙ্গালী-চরিত" নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত। চন্দ্রশেখরের অর্থসঙ্গতি সেরূপ ছিল না, আর ব্যবসাদারী বুদ্ধিও তাঁহার ভাল ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাই তিনি নিজ ব্যয়ে ঐ সব প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে পারেন নাই, অথবা কোন প্রকাশককে দিয়া প্রকাশ করাইতেও পারেন নাই। নতুবা সে সব প্রবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য বড় কম নয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটী প্রবন্ধের কথা বলি। ইলবার্ট-বিলের সময়ে যখন এদেশে তুমুল আন্দোলন হইতেছিল, তখন কলিকাতা টাউনহলে সাহেবদের এক সভায় ব্রান্সন্ নামে এক ব্যারিষ্টার বাঙ্গালীদিগকে গালিগালাজ করিয়া এক তীব্র বক্তৃতা করেন। তাহার কয়েকদিন পরে তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিবর লালমোহন ঘোষ মহোদয় ঢাকায় নর্থব্রুক হলে এক মহাসভায় জ্বালাময়ী ভাষায় এক তীব্রতর বক্তৃতায় ব্রান্সনের বক্তৃতার উত্তর দেন। আজও অনেকের মতে ঘোষ মহাশয়ের ঐ বক্তৃতা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা বলিয়া গণ্য। ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরে বঙ্গবাসীতে ঐ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তখন, আমার বেশ মনে আছে, বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র-লাল রায় এম-এ বি-এল মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজীতে যেমন লালমোহনের ঐ বক্তৃতা, বাঙ্গালায় তেমনি চন্দ্রশেখরের লিখিত বঙ্গবাসীর প্রবন্ধ। বরং চন্দ্রশেখরের প্রবন্ধটী আকারে ঐ বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া প্রবন্ধটিরই প্রশংসা বেশী করিতে হয়। আমিও তখন বঙ্গবাসীতে লিখিতাম। চন্দ্রশেখরের সকল প্রবন্ধগুলিই বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িতাম। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই স্থায়ী সাহিত্য-

রূপে পরিগণিত হইবার উপযোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অবশ্য প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নাম থাকিত না। সেগুলি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইলে, প্রবন্ধ বাছিয়া দিবার লোক এখনও পাওয়া যাইবে। আমিও তাহাতে সাহায্য করিতে পারিব। কিন্তু এখন না হইলে, আর হইবে না। পরে সে সব প্রবন্ধগুলি কালের করতলস্থ হইয়া পড়িবে।

সেকালে চন্দ্রশেখর বাবু "জ্ঞানাঙ্কুর" নামক মাসিক পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পরে, তিনি যখন বঙ্গবাসীতে লিখিতেন, তখন বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে তাঁহার পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া "সারস্বতকুঞ্জ" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎপরে তাঁহার লিখিত "স্ত্রী-চরিত্র" ও "কুন্তলতার মনের কথা" —এই দুইখানি পুস্তিকাও, বোধ হয়, বঙ্গবাসী হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"—উচ্ছ্বাসময় গদ্য-কাব্য, সুতরাং তাহার একটা বিশিষ্ট উন্মাদনা শক্তি আছে। তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে সেরূপ উচ্ছ্বাস থাকিবার কথা নহে। কিন্তু সেগুলিতে উন্মাদনা না থাকিলেও, ভাষার লালিত্য, রচনার মনোহারিত্ব এবং বক্তব্য বিষয়ের পরিস্ফুটন অতি চমৎকার। "সারস্বতকুঞ্জে" নানাবিধ প্রবন্ধের সমাবেশ। "স্ত্রী চরিত্রে" স্ত্রীলোকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, বিবর্ত্তবাদের নিয়মানুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থাদির প্রভাবে অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে স্ত্রী-চরিত্রে যে পরিবর্ত্তন ও পরিণতি সাধিত হইয়াছে, এই সব কথা এমন সুললিত ভাষায় কথিত হইয়াছে যে, তাহা কেবল উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের লেখকের কাছেই আশা করা যাইতে পারে। "কুন্তলতার মনের কথা" একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—সুন্দর রস-রচনা।

এই পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার পর কিছুকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং পুস্তকগুলির আদর হয় নাই, কেমন করিয়া বলি? বহুকাল হইতে এগুলি বাজারে অপ্রাপ্য। কাযেই আজিকালকার লোকে পড়িতে পায় না। সেই জন্য উঁহাদের নাম এখন অনেকেই জানেন না। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের স্বত্ব তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাই ক্রেতা এখনও উহা ছাপাইতেছেন—লোকেও পড়িতেছে।

সব শেষে আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বা কোন উদ্যোগী পুস্তক-ব্যবসায়ী চন্দ্রশেখরের গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকারসাধন করা হয়। অথবা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর, সাহিত্যানুরাগী, দীন-প্রতিপালক, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, যিনি চন্দ্রশেখরের বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়া দেশের কর্ত্তব্য নীরবে একাই সাধন করিয়াছেন,—তিনি তাঁহার সামান্য অঙ্গুলি হেলন করিলেই খাগড়ার এই অসাধারণ সাহিত্যিকের কীর্ত্তি সংরক্ষণ অতি সহজেই হইতে পারে। চন্দ্রশেখরের জীবনী লিখিত হউক, নানা স্থানে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, সাহিত্যপরিষদে তাঁহার তৈল চিত্র থাকুক, এ সবই সুখের বিষয়—এবং হয়ত হইবেও। কিন্তু তাঁহার রচনাবলীর প্রচার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। নতুবা ভবিষ্যতে লোকে কি গুণে তাঁহাকে স্মরণ করিবে?

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

আলোচনা

বিবাহ কি বিড়ম্বনা ?

গত বৈশাখ মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে দেখিলাম শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বিবাহকে প্রায়শঃ বিড়ম্বনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, পিণ্ডলোপ, বংশ লোপ বা বা নাম লোপের দোহাই দিয়া বিবাহ চলিতে পারে. না; বিশেষতঃ দরিদ্রের বিবাহ হইয়া দরিদ্র-বংশবৃদ্ধি আপত্তিজনক, আসজ লিপ্সা হইতে বিবাহ প্রথার উৎপত্তি, দাম্পত্য প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ বটে কিন্তু বিবাহের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না, বিবাহের কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, অবিবাহিতের পক্ষে এই সমস্ত সংসার তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এবং তিনিই সংসারের যত কিছু বড় কায করিবার অধিকারী করিয়াও থাকেন।

এই আসজলিপ্সা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাহার পরিতোষার্থ শাস্ত্র, সমাজ, দেশের আইন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য বলিয়া বিবাহ প্রথা চলিতেছে। সমাজ বিশেষ ও দেশের আইন, শাস্ত্র শাসন অপেক্ষাও বেশী উদার। ছোটলোকের ভিতর পত্নী বা স্বামী ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়ের সহিত নূতন সংসার পাতা বিরল ঘটনা নহে। আইনতঃ বিবাহিতার স্বামী ফরিয়াদি না হইলে যৌন ব্যভিচারের কোন্, বিচারই হয় না। এ ক্ষেত্রে বিবাহকে বিড়ম্বনা বলা যায় কিরূপে ?

দরিদ্রের বাঁচিয়া থাকাই বিড়ম্বনা, বিবাহ ত পরের কথা। তবে এ পর্য্যন্ত এমন নিয়ম কোন দেশে নাই যে দরিদ্র বলিয়াই ফাঁসীর হুকুম হয়,তাই অত লোক বাঁচিয়া যাইতেছে ও ধরাভার বাড়াইতেছে। পাশ্চাত্য সমাজে ভীষণ দারিদ্র্য আছে, সেখানে গরীবের বিবাহবন্ধের চেষ্টা দেখি না, তবে রুগ্ন দুষ্টব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতির বিবাহে বাধা দেওয়ার কথা হইতেছে। দরিদ্র ভদ্র-লোকের দুঃখ বেশী, সেটা দারিদ্র্য বশতঃ কি ভদ্রলোক বলিয়া তাহা বুঝা যায় না। প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ প্রায়ই দরিদ্রের সন্তান। দারিদ্র্য মনুষ্যত্ব বিকাশের যেমন অন্তরায়, তেমনি প্রবল সহায়।

বিবাহ-সংস্কার ব্যতীত মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বিবাহ না করিয়া যে স্বাধীনতা, সেটা সাধারণের পক্ষে উচ্ছৃখলতামাত্র! ভদ্রলোকেরা এখন অধিক বয়সে বিবাহ করেন, তৎপূর্ব্বে তাঁহারা কয়েক বৎসর দেশ সংস্কারক। অভি-ভাবকবর্গের সহিত বড় সংস্রব নাই, রুচি ও প্রবৃত্তির পথে চলিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল ভাগ্যবশতঃ ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পথ বাছিয়া লইতে হয়। অভিভাবকেরাও এই নূতন বিপ্লবে দিশা-হারা, দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন না। পুরাতনের মর্য্যাদা নাই, নূতনের অভিজ্ঞতা নাই, ধর্ম্মজ্ঞান সমাজ-বন্ধন শিথিল। কেবল অর্থ ই জাগ্রত দেবতা। দারিদ্র্য বাড়ীবে সুতরাং বিবাহে কায নাই। বড়লোকের উচ্ছৃখলতায় সমাজের তত ক্ষতি হয় না। গরীব সমাজের মেরুদণ্ড। দায়িত্ব-জ্ঞান, সৎপ্রবৃত্তিগুলি ও নীতিজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে দরিদ্রের বিবাহ সংস্কার প্রয়োজন।

লেখক মহাশয় অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতির পাতিব্রত্যে সন্দিহান। শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত মনে করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। ইঁহাদের সতীত্ব প্রমাণের জন্য নানারূপ যুক্তিবাদ আছে। তবে কুন্তী সম্বন্ধে দু এক কথা বলা যায়। কুন্তীর এক দোষ কানীন পুত্র কর্ণ, দ্বিতীয় দোষ যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম। কর্ণের জন্ম লালচাপল্যের ফল নহে বরং একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। যুধিষ্ঠিরাদির বেলা স্বামী-নিয়োগ। বংশরক্ষার দোহাই দিয়া আজকাল স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামী দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করেন। যেখানে পুরুষ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ সেখানে আর বংশরক্ষার চেষ্টা হয় না, ইহা কি পক্ষপাত নহে? সন্তান নারীজীবনের সার্থকতা, মৃতের পিণ্ডদান অপেক্ষাও জীবিতা স্ত্রীর অধিক প্রয়ো-জন। প্রাণাধিকা পত্নীর এই ব্যর্থতার জন্য কয়জন স্বামী কাতর? সপত্নীর পুত্র স্ত্রীলোকের শ্রদ্ধাধিকারী, স্নেহাধিকারী হইবে,এমন কি পিতামাত্রেই আশা করেন তাঁহার আত্মজ বলিয়া বিমাতা তাহাকে পূর্ণ স্নেহ করিবেন। সময়ে সময়ে বিমাতার স্নেহলাভ ঘটিয়া থাকে। অথচ প্রণয়ের বড়াই করিয়াও অক্ষম স্বামী নিঃসন্তান পত্নীর পুত্র কামনা করেন না। মাদ্রী ক্ষেত্রজ পুত্র সত্বেও, অক্ষম পাণ্ডুর সহমৃতা হইয়াছিলেন, মাদ্রীর পাতি-ব্রত্যে সন্দেহ আসে না। পতীর প্রেম যেন এইরূপই হওয়া উচিত। ভীষ্মের ন্যায় সংযমী থাকিতে পারে কিন্তু পাণ্ডুর মত পত্নী প্রেমিক দেখি না। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজপুত্র লাভেচ্ছা হয় ক্লীবত্বের চরম বিকাশ, নয় ত পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা।

আজকাল পণপ্রথার জন্য কন্যার বিবাহ দেওয়া বিড়ম্বনা মনে

হইতে পারে। কন্যার পিতা ভাল পাত্র খোঁজেন। ভাল পাত্র কি না—যে পাত্রের টাকা আছে, বা পাসকরা বলিয়া ভবিষ্যতে অনেক টাকা উপায় করিতে পারিবে। কুল শীল রূপ তিনি চাহেন না, বা সেগুলি উপরি পাওনা মাত্র মনে করেন। টাকা দিয়াই পাত্র স্থির হয়। পাত্রটির এমন সম্পত্তি থাকা চাই যাহাতে তাঁহার কন্যা ও ভবিষ্যৎ দৌহিত্রগণ আর্থিক স্বচ্ছলতায় থাকে। সেরূপ সম্পত্তি ধরিতে তাঁহার অর্থনিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে পণপ্রথার প্রতিবাদ করিলে ছেলের বাপ অবশ্যই বলিতে পারেন যে বৈবাহিক তাঁহা তাঁহাকে ঠকাইয়া পাত্রী গছাইয়া দিতেছেন ও সভায় মারিতেছেন। যতদিন দম্পতীর ভাবী আর্থিক সৌভাগ্য অনুসারে পাত্রের বাচাই হইবে, ততদিন টাকা পণ উঠিয়া যাইবে না। আর একটা সুবিধা আছে। বিবাহ সমান ঘরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় ছোট এখন টাকার মাপে। কাযেই বড়লোকে বড়লোকে কুটুম্বিতা হয় এবং গরীবে গরীবে বিবাহ হয়। এই টাকার জোরে কত বিকলাঙ্গ, কুৎসিতার বিবাহ হইয়া যাইতেছে। আবার গুণের আদর একেবারে লোপ পায় নাই, কতকগুলি বিবাহ বিনাপণে হয়। তবু অনেকে বলেন যে এই পণপ্রথার জন্য সৎপাত্র পাওয়া যায় না, এজন্য দরিদ্রের কন্যার বিবাহ দিয়া কায নাই, তাহাকে লেখাপড়া বা শিল্পবিদ্যা শিখাইয়া কৃতী করিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজের উপার্জ্জনে দিন কাটাইতে পারিবে। এদিকে পাত্র উপায়ক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবেন না বলেন। পাত্রীও উপায়ক্ষম, কাযেই বিবাহের দরকার নাই। বাহ্য সম্পদের পূজায় কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর হইতেছে।

পুরুষ কামপ্রবণ, নারী ভাবপ্রবণ। পুরুষের বিবাহ না হইলে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী, নারীর বিবাহ না হইলে সমাজের তত ক্ষতি নাই। সেই জন্যই বুঝি হিন্দুসমাজ বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত, বিধবা বিবাহে তাদৃশ ব্যগ্র নহে। পুরুষকে আঁটিতে না পারিয়া অবলা নারীর উপর জুলুম যে বিবাহ করিতেই হইবে। সেই জন্যই সতীত্বের এত গৌরব, মাতৃত্বের এত মর্য্যাদা দেওয়া হয়। নচেৎ এ গৌরব দেখানর কোনই প্রয়োজন ছিল না। নারীমাত্রেই স্বাভাবিক সতী ও সন্তানবৎসলা মাতা। ইহা পুরুষ স্বীকার করেন, তাই অপরোক্ষ ভাবে বর্ত্তমান পুরুষ রচিত সাহিত্যে চরিত্রহীনার একনিষ্ঠা ও সন্তান বাৎসল্যের এত ছড়াছড়ি। বিবাহ না করিয়াও নারীর প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, মমতার অনুশীলন চলিতে থাকিবে। কিন্তু হতভাগ্য পুরুষের দুর্দ্দান্ত বৃত্তিগুলি সমাজকে রসাতলে দিবে। দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী, কারণ পুরুষত্বের স্ফুরণ ও সার্থকতা ভোগে, স্ত্রীর ত্যাগে। মাতৃত্বও ত্যাগের নিদর্শন, নচেৎ সন্তান বাঁচিতে পারে না। এই ত্যাগ বা মাতৃত্ব, এই পরার্থপরতা নারীর শক্তি। এই শক্তির নিকট পুরুষের স্বার্থপরতা বা প্রভুত্ব উপেক্ষিত হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। বিশুদ্ধ দাম্পত্যে প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ থাকে না।

দেশের সৌভাগ্য যে প্রকৃত দাম্পত্য সুখের অধিকার প্রত্যেক নারীকে দেওয়ার জন্য সমাজ এখনও বদ্ধপরিকর। স্ত্রীলোকের এত বড় অধিকার পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী দেশেও নাই। সেখানেও নারী পৈতৃক সম্পত্তির অনধিকারিণী, স্ত্রীধনের নিশ্চয়তা নাই, এমন কি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাহারও দায় নাই—আত্মীয় স্বজনের করুণা ভিখারিণী। এদেশের নারীর বিবাহ হইবেই, স্ত্রীধনের অধিকতর সম্ভাবনা, ভরণ পোষণের জন্য স্বামী ও দায়াদগণ বাধ্য। স্ত্রীজাতির এই মঙ্গলকর ব্যবস্থা কি বিড়ম্বনা?

আধুনিক কষ্টের মূল আমাদের বিলাসিতা। এ জন্য সংযমের প্রয়োজন। বিবাহিত জীবন ভিন্ন সংযমের স্বাভাবিক সাধনা নাই। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রীয় বন্ধনগুলি শিথিল, এই যথেচ্ছাচারের যুগে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পথে যেটুকু উপকার পাওয়া যায় গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিবাহকে বিড়ম্বনা না ভাবিয়া, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই বয়স হইলে বিবাহ করা উচিত।

শ্রীচন্দ্রশেখর রায়।

"চিতোরের রাণা সমরসিংহ"

কার্ত্তিকের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় লিখিত উক্ত নামে একটি ছোট আলোচনা দেখিলাম। আলোচনাটি আমারই কথার ("মানসী ও মর্ম্মবাণী" ভাদ্র) প্রতিবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। অমৃতবাবু যেরূপ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই; কিন্তু সন্দেহ করিবার আছে। সত্য যেখানে বহুকাল ধরিয়া মিথ্যার আবরণে আবরিত হইয়া সত্য বলিয়াই লোক সমাজে প্রচলিত হয়, সে স্থানে সহসা প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইলেও তাহা বিশ্বাস করিতে প্রথমটা একটু সন্দেহ ও ভয় হয়। তাই অমৃতবাবু আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত, আমি নিঃসন্দেহে তাঁহার কথাগুলি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আশা করি অমৃতবাবু অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে আর একবার প্রয়াস পাইবেন।

আর একটা সন্দেহ হয়—অমৃতবাবুর স্থায় 'আশ্চর্য্য' বোধ হয় না; আজকালও অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক-লিখিত পুঁথিতে সময়কে পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়। যাহা বহুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে অমৃতবাবু বলিয়াছেন, তাহার ব্যবহার ত আজ পর্য্যন্ত বড় দেখি নাই। "পৃথ্বীরাজ রসো"কে তিনি আগাগোড়া কল্পিত বলিয়াছেন; কিন্তু আমি ত দেখিতেছি রসোর ঘটনাই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতেছে (সত্য হৌক মিথ্যা হৌক)। আমার বোধ হয় "পৃথ্বীরাজ রসো"কে অমৃতবাবুর স্থায় অনেকেই 'আগাগোড়া কল্পিত' বলিয়া বিশ্বাস করেন না এবং পৃথ্বীরাজের সভায় চন্দ বরদাইর অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

রসো আমার পড়া আছে। তবে উহাতে যে কল্পনা নাই এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু উহা যে "আগাগোড়া কল্পিত" নয়, এ কথা ঠিক।

রসোকে অমৃতবাবু সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আছে কি? তিনি লিখিয়াছেন—"রসোতে আতর শব্দ আছে; কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময়ে নূরজাহানের মাতা আতর আবিষ্কার করেন। তাহার পূর্ব্বে আতর নামক কোন বস্তু ছিল না।" আমার মতে কেবল ইহাতেই রসোকে সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে না। আমরা রসোর মূলগ্রন্থ নাও পাঠ করিয়া থাকিতে পারি। অমৃতবাবু অনুগ্রহ করিয়া চিতোরে প্রাপ্ত সমরসিংহের দানপত্রের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবেন কি?

শ্রীকামিনীমোহন দাস।

অধ্যাপকের দুর্ব্বলতা

(গল্প)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বিনয়কৃষ্ণের সহিত জয়রামপুরের বিখ্যাত ধনী যাদব বাবুর শিক্ষিতা ও রূপবতী কন্যা স্নেহলতার শুভবিবাহ প্রচুর ঘটার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। অর্থশালী লোকদিগের উপর বিনয়ের বরাবরই একটা ভয়-মিশ্রিত বিরাগ ছিল। তাহাদের চাল চলন এবং আচার-ব্যবহার তাহার চক্ষে ভাল লাগিত না এবং তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা যে পরিণামে সুখকর হইতে পারে না, এইরূপ তাহার একটা বদ্ধ ধারণা ছিল। সেই জন্যই এ বিবাহে তাহার তেমন মত ছিল না। কিন্তু পিতৃপ্রতিম জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবনকৃষ্ণের আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তাহাকে সম্মত হইতে হইয়াছিল।

কৈশোরেই বিনয়কৃষ্ণ পিতৃমাতৃহীন হয়। দাদা এবং বৌদিদি ব্যতীত সংসারে আর তাহার কেহই ছিল না। জীবনকৃষ্ণ কলিকাতায় এক সওদাগর আপিসে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেন। ভবানীপুরে তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র বাস-ভবন ছিল। বৃদ্ধ পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বিনয় তাঁহার অধীনে থাকিয়া গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা আসিল এবং দাদার অধীনে থাকিয়া ক্রমে এণ্ট্রান্স্ হইতে এম্, এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্তগুলি পরীক্ষাই খুব প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। এম্, এ পাশ করার কয়েক মাস পরেই তাহার এই বিবাহ হয়। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে অর্থের অভাব ছিল সত্য, কিন্তু সুখ শান্তির অভাব ছিল না। স্নেহময়ী বৌদিদির যত্নে বিনয়ের কোনও কষ্ট ছিল না। বিলাসের-ক্রোড়ে লালিতা স্নেহলতা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রবেশ করিয়া বিলাসের সামগ্রী পাইল না সত্য, কিন্তু বড় যায়ের বুকভরা স্নেহ পাইল।

বর্ত্তমান বাংলায় উমেদারের প্রাচুর্য্য হইলেও

চাকরীর জন্ত সৌভাগ্যক্রমে বিনয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। বিবাহের অব্যবহিত পর মাসিক দুই শত টাকা বেতনে সে ঢাকা কলেজে গণিতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইল। সুদূর এবং অপরিচিত স্থানে এই প্রথম যাত্রা—সুতরাং বিনয় একাকীই ঢাকা যাওয়া স্থির করিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা বৌদিদি তাঁহার বড় স্নেহের দেবরকে কিছুতেই বিরহ ব্যথা অনুভব করিতে দিবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়া বসিলেন। বিনয় অগত্যা স্নেহলতাকে সঙ্গিনী করিতে রাজী হইল। স্নেহলতার পিতা যাদব বাবু কোনওরূপ আপত্তি করিলেন না।

শুভদিনে নবীন অধ্যাপক নবপরিণীতা ভার্য্যাসহ ঢাকা যাত্রা করিল। জীবনকৃষ্ণ ভাই এবং ভ্রাতৃবধূকে রাত্রি দশটার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে ঢাকা মেইলে তুলিয়া দিয়া সাশ্রুনয়নে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ডাক গাড়ী গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছিল। দুকুলপ্লাবিনী পদ্মার সুবিস্তীর্ণ জলরাশি নিরীক্ষণ করিয়া এবং ঢাকার পথে এই বিপুল বারিধি পার হইতে হইবে ভাবিয়া বিনয় মনে মনে একটু ভীত হইল, কিন্তু এই মানসিক দুর্ব্বলতা যথাসম্ভব গোপন করিয়া বাহিক উৎসাহের সহিত তাহার মাল-পত্র বাঁধিতে লাগিল। বিস্তর কুলী জুটিয়া তাহাকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। বিদেশে চলা-ফেরায় সে যে নিতান্ত অনভ্যস্ত, চতুর কুলীগণ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিল এবং আটপয়সা স্থলে আট আনা চাহিয়া বসিল। বিনয় অগত্যা তাহাই দিতে স্বীকৃত হইল। কুলীর দল মহোল্লাসে তাহার মোটগুলি নারায়ণগঞ্জের ডাক জাহাজে পৌঁছাইয়া দিল।

বেলা সাড়ে ছয়টার সময় জাহাজ বিকট নিনাদ করিতে করিতে গোয়ালন্দ ঘাট ছাড়িয়া চলিল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল, সামান্ত বৃষ্টিও পড়িতে-ছিল। কূলহীনা পদ্মার চঞ্চল জলরাশি একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গরাশি লক্ষ রৌপ্যকণা উদ্গার করিতে করিতে জাহাজের সম্মুখে ও পার্শ্বে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বাষ্পীয় জলযান কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তরঙ্গের উপর নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কলিকাতায় স্থ্যান-বিহারী নবদম্পতী জলযানের এই আস্ফালন এবং পদ্মার এই রুদ্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। বিনয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার বাহির হইতে সাহস পাইল না। স্নেহলতা মনে মনে স্থির করিল যে ৺পূজার ছুটীতে বাড়ী ফিরিলে আর ঢাকা যাওয়ার নামটি করিবে না।

বেলা ১টার সময় জাহাজ নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিল। দম্পতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

২

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকাসহর দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্লান্ত আরোহিগণ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় সকলেই নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত লেমনেড্ পান করিয়া, পথক্লান্তি দূর করিল। বিনয় ও স্নেহলতা উভয়েই উহা পানে খুব তৃপ্তিলাভ করিল। জাহাজের আরোহী লইয়া বেলা প্রায় ২টার সময় ঢাকার ট্রেইণ্ নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল। ঢাকা ষ্টেশনে কলেজের কোন ভৃত্যকে রাখিবার জন্ত বিনয় পূর্ব্বেই কলেজের কেরাণী বাবুকে তার করিয়াছিল, এবং তদনুসারে কলেজের কৃষ্ণবর্ণ, অতিকায় দ্বারবানটি নূতন মাষ্টার মহাশয়ের অভ্যর্থনার জন্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

যথাসময়ে ট্রেইণ ঢাকা পৌঁছিল। দ্বারবানের সাহায্যে বিনয় ট্রেইণ হইতে অবতরণ করিয়া একখানা চারি-আনা-ভাড়ার ঢাকাই অশ্বযানে আরোহণ করিল। দুইটী কুলী মাল-পত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিল। খর্ব্বকায় গাড়োয়ানটি মোটগুলির সংখ্যা কিছু অধিক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু চাপরাশধারী দ্বারবান্ সঙ্গে থাকাতে বিনয়কে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ভাবিয়া গোলমাল করিতে সাহসী হইল

না। হারবাবু না থাকিলে অপরিচিত স্থানে বিনয়কে গাড়োয়ানের হাতে লাঞ্ছনা পাইতে হইত।

পনর মিনিটের পথ আধ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া অবশেষে গাড়ী কোর্টহাউস ষ্ট্রীটে আসিয়া থামিল। বিনয়ের জন্ম পূর্ব্বেই একখানা দোতালা বাসা ভাড়া করা হইয়াছিল; পাচক এবং ভৃত্যও নিযুক্ত ছিল। সুতরাং নূতন স্থানে আসিলেও দম্পতীর কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। গাড়োয়ান দুইআনা বক্‌শিস্ পাইয়া বিনয়কে বারংবার "মহারাজ" সম্বোধন করিয়া বিদায় হইল।

৩

ঢাকা কলেজ সরকারী বিদ্যালয়, অধ্যক্ষ একজন শ্বেতাঙ্গ। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনয়কৃষ্ণ সাহেবী পরিচ্ছদ ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে করিল। তাহার সম্বল ছিল একটি কালো আল্‌পাকার কোট, জিনের প্যাণ্টালুন বা পাজামা এবং এবং একটি অল্পদামী সাহেবী টুপী বা হ্যাট্। কালো আলপাকার কোট পরম উপকারী বস্তু। রজকের কৃপা ব্যতীত একবৎসর ব্যবহার করা চলে। বাংলা দেশের উকীল মোক্তার, আপিসের বাবু এবং স্কুলকলেজের শিক্ষকদিগের বহু পুণ্যফলে এই রজক-ব্যবসায়-ধ্বংসকারী আলপাকা নামক কৃষ্ণবস্ত্রটি আমেরিকা হইতে আমদানী হইয়াছিল।

কোর্টহাউস্ ষ্ট্রীট হইতে ঢাকা কলেজ প্রায় এক মাইল পথ। কলেজে যাওয়া-আসা করার নিমিত্ত বিনয় একটি সাইকেল্ বা দ্বিচক্রযান ক্রয় করিল এবং প্রতিবেশী হরিচরণ বাবুর সাহায্যে অনায়াসেই সাইকেল্ চালাইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। এই হরিচরণ বাবু একজন উচ্চ-পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী—বিনয় অপেক্ষা বয়সে বড়। সদাশয় এবং পরোপকারী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি নিঃসন্তান, গৃহে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুভাষিণী। সুভাষিণীর সহিত স্নেহলতার পরিচয় ক্রমে সখীত্বে পরিণত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকা নগরীতে প্রতি-বৎসর দুইদিন বিপুল আড়ম্বরের সহিত শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। এই জন্মাষ্টমীর মিছিল ঢাকার একটি গৌরবের বস্তু। প্রতিবৎসরই ঢাকা সহরে দর্শনাভিলাষী লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত সহরটি সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে ভরপুর থাকে। সেবার ছোটলাটবাহাদুর মিছিল দেখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আয়োজন এবং আড়ম্বরের মাত্রাটা সেবার কিছু বেশী। বিনয় ও স্নেহলতার মনে এই বলবিশ্রুত উৎসবটি দেখিবার প্রবল সাধ জন্মিল।

তখনও মিছিল বাহির হইতে সপ্তাহখানেক বাকী, কিন্তু ইতিমধ্যে সহরে লোক ধরে না। সস্ত্রীক মিছিল দেখার বিনয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে একখানা উপযুক্ত ঘরভাড়া করিতে পারিল না। মিছিলের পথে সমস্ত ঘরগুলিই সহরের গণ্যমান্য রাজকর্ম্মচারী কিংবা জমিদারগণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল। প্রতিদিনই ব্যর্থচেষ্টা করিয়া বিনয় ম্লানমুখে বাড়ী ফিরিত। মিছিল বাহির হওয়ার পূর্ব্বদিন শেষ চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া বেলা ১১টার সময় কলেজে চলিয়া গেল। স্বামীর এই অকৃত-কার্য্যতায়, গর্ব্বিতা স্নেহলতা যে মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিল তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিপ্রহরে স্নেহলতা সুভাষিণীকে জানাইল যে মিছিল দেখা তাহার অদৃষ্টে নাই, কারণ তাহার স্বামী শত চেষ্টা করিয়াও ঘরভাড়া করিতে পারেন নাই। ক্রমে এই সংবাদ হরিচরণ বাবুর কর্ণে পৌছিল। বৈকালে বিনয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাসিতে তিনি বলিলেন —"এসময়ে ঘর ভাড়া করা মাষ্টারের কার্য্য নয়। যা হোক, আমি যে ঘর ভাড়া করেছি সেখান থেকে সবাই দেখ্‌তে পারবো। আপনি আর বাড়ীর জন্যে মিছা-মিছি ছুটোছুটি করবেন না।" বিনয় আশ্বস্ত হইয়া হরিচরণ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইল।

পরদিন বাড়ীর স্থায় গাড়ী পাওয়াও দুর্ঘট হইল। শত

চেষ্টা করিয়াও বিনয় একখানা গাড়ী ভাড়া করিতে পারিল না। অবশেষে হরিচরণ বাবু অনায়াসেই বিনয়ের জন্ত একখানা গাড়ী ঠিক করিয়া ফেলিলেন। স্বামীর অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে স্নেহলতার আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

বেলা ১টার সময় দুইখানা স্বতন্ত্র গাড়ীতে হরিচরণ বাবু এবং বিনয়কৃষ্ণ উভয়ে সস্ত্রীক মিছিল দেখিতে বাহির হইলেন। রাজপথের জনতা ভেদ করিয়া শকটদ্বয় যথাস্থানে পৌঁছিল। যে ঘরখানা হরিচরণ বাবু ভাড়া করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অপ্রশস্ত ছিল না। সম্মুখে একখানা পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল। স্নেহলতা এবং সুভাষিণী পর্দ্দার পশ্চাতে আশ্রয়গ্রহণ করিল। বিনয় পর্দ্দার সম্মুখে একখানা কেদারায় উপবেশন করিল। দুইজন ভৃত্য এবং একজন কনষ্টেবল তথায় নিযুক্ত রহিল। হরিচরণবাবু সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া স্বকার্য্যে চলিয়া গেলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীদের সেদিন আর নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না।

একাকী অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকা বিনয়ের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। রাজপথের জনতার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে তাহারও মনে একটু ভ্রমণের সাধ জন্মিল এবং ভৃত্যের বিনীত নিষেধসত্ত্বেও সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের ভিতর সেই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। তৃণ যেমন স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যায়, বিনয়ও সেইরূপ কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতদূর এইভাবে চলিয়া যাওয়ার পর সে ফিরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই বিপুল জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তাহার মত ক্ষীণদেহ পুরুষের সাধ্যাতীত হইল। দুই তিনবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, প্রচুর কষ্ট পাইয়া অবশেষে সে রাস্তার এক পার্শ্বে নিশ্চেষ্ট লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিশ্চেষ্ট হইল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বিশাল দেহ, শীর্ণকায় প্রভৃতি নানা আকারের লোক তাহাকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে স্কুল কলেজের দলবদ্ধ ছাত্রগণ বিকট শব্দ করিতে করিতে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে লাগিল। প্রত্যেকের হাতেই একখানা ঢাকাই "গেণ্ডারী" বা ইক্ষুদণ্ড। উহা দ্বারা দুই কার্য্যই সাধিত হয়—তৃষ্ণাও নিবারিত হয়, আবার প্রয়োজন হইলে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করাও চলে। অনেক কষ্টে শরীরটি বাঁচাইয়া বিনয় কোনওমতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার স্কন্ধের উত্তরীয়টি যে কোথায় উড়িয়া গেল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

বেলা প্রায় ৪টার সময় মিছিল বাহির হইল। হস্তিপৃষ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেব, অশ্বপৃষ্ঠে সার্জ্জনগণ, এবং লাঠিধারী পদাতিক সিপাহীগণ মিছিলের জন্ত রাস্তা পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আড়াইঘণ্টাকাল মিছিল চলিল। বিনয়কৃষ্ণ সকলের পিছন হইতে যথাসম্ভব উচ্চ হইয়া যতটা পারিল দেখিয়া লইল।

মিছিল শেষ হইলে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিনয় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া স্নেহলতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। হরিচরণ বাবুর সাহায্যে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বিনয় সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিল। পথে স্বামী স্ত্রীতে কোন কথা হইল না। গৃহে ফিরিয়া বিনয় এক নিশ্বাসে প্রায় এক ঘটী জল খাইয়া ফেলিল। স্বামীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া স্নেহলতা খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন পরজন্মে হাকিম কিংবা অন্ত কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী হয়ে জন্মাতে পার। সংসারে তোমাদের মত মাষ্টারের স্থান নেই।"

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর স্ত্রীর এই শ্লেষবাক্যে বিনয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল —"তোমার উপদেশ আমি শুনতে চাই না। ভগবান আমায় যে অবস্থায় রেখেছেন তাতেই আমার সুখ। জন্মে জন্মে আমি এই সুখটুকুই চাই।"

স্নেহলতার দমিবার পাত্রী নয়। একটু সুর চড়াইয়া কহিল, "বেশ, তাহলে জন্মে জন্মে এ মনিভাবে

মানুষের কাছে হেয় হয়ে থাক।" বিনয় পূর্ব্বের ন্যায় বিরক্তির সহিত উত্তর দিল, "তোমার মত স্ত্রীলোকের চক্ষে হেয় হতে পারি, কিন্তু যার মনুষ্যত্ব আছে, যে গুণের আদর জানে তার কাছে যে সম্মান পাব,সে সম্মান আর কেউ আশা করতে পারে না।"

একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া স্নেহলতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "চক্ষুলজ্জার খাতিরে যে সম্মান, তা অপমানের নামান্তর মাত্র।"

আর কোন উত্তর না দিয়া বিনয় একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সুভাষিণীর সহিত স্নেহলতা মিছিল দেখিতে গেল। শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া বিনয় বাড়ীর বাহির হইল না।

৪

কিছুদিন স্বামী স্ত্রীতে বড় একটা কথাবার্ত্তা হইল না। বিনয় আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া স্ত্রীর সহিত রহস্যালাপ করে না। যতক্ষণ গৃহে থাকিত, পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। পুস্তকের প্রতি স্বামীর হঠাৎ অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ স্নেহলতা সহজেই বুঝিতে পারিল। উত্তেজনার বশে স্বামীর প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সে যথেষ্ট অনুতপ্তা হইল এবং বিনয়ের নিকট বারংবার ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

কয়েক দিবস পর বিনয়ের ধনাঢ্য প্রতিবেশী রায় সাহেব মহেশচন্দ্র সরকার তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিনয় এবং তাহার স্ত্রী উভয়কেই নিমন্ত্রণ করিলেন। মহেশ বাবু বিগত যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থলাভ করিয়াছিলেন। সরকারকে প্রচুর সমর ঋণ দান করিয়া এবং নিজের নীরোগ ছেলেকে অসুস্থ বলিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনে পাঠাইয়া পরের ছেলের দ্বারা বাঙ্গালী পল্টনের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, লাট বাহাদুরের কৃপায় বহুমূল্য রায়সাহেব উপাধি লাভ করিয়াছেন। সহরের ছোট বড় রাজকর্ম্মচারী সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষ পরিচিত এবং তাঁহার বদান্যতায় ও ভদ্রতায় মুগ্ধ। রাজকীয় ব্যাপারে চাঁদা দিতে তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত আর দ্বিতীয়টি ছিল না বলিলেই চলে। রাজনৈতিক আন্দোলনকে তিনি বিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিতেন এবং আন্দোলনকারীদিগের সংস্রব বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন।

অনুষ্ঠানের দিন রাজকর্ম্মচারী এবং আপিসের বাবুদের জন্য নৈশ-ভোজনের বন্দোবস্ত হইল। বিনয় সেই দিন যথা সময়ে কলেজে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্নেহলতা সুভাষিণীর সহিত বেলা ১টার সময় রায় সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

রায় সাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে ভদ্রমহিলাগণের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। স্থানীয় ক্ষমতাপন্ন রাজকর্ম্মচারীদিগের পরিবারভুক্তা মহিলাগণ সকলেই এই ঘরে সমবেত হইয়াছিলেন। স্নেহলতা সেই ঘরে প্রবেশ মাত্র সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বেশভূষার পারিপাট্যে এবং সৌন্দর্য্যের ছটায় এই অধ্যাপক-পত্নী সকলকেই নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিল। সকলেই গল্পগুজব বন্ধ করিয়া এই অপরিচিতা রূপবতী যুবতীর সৌন্দর্য্যের এবং রুচির প্রশংসা করিতে লাগিল। কাহারও হৃদয়ে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল। কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সুভাষিণীর হাত ধরিয়া সর্ব্বোন্নত মস্তকে স্নেহলতা সেই প্রকোষ্ঠের অপরপ্রান্তে চলিয়া গেল। দুইজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলার সহিত তাহার পরিচয় হইল। তন্মধ্যে একটী ডিপুটী রমেশ বাবুর এবং অপরটী মুন্সেফ আশু বাবুর স্ত্রী। সুভাষিণী উভয়েরই নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিল।

চারিজনের ভিতর গল্প বেশ জমিয়া গেল। সাংসারিক সুখ দুঃখের নানা কথা চলিতে লাগিল। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া ডেপুটি রমেশ বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"এমি চাকরীই কচ্ছেন যে দিনান্তে একটী কথা পর্য্যন্ত কইতে পারি না। সমস্ত দিন আপিসে পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যে-বেলা বাড়ী ফেরেন; একটু জলটল খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়েন। ক্লাবে না গেলে নাকি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।"

ডিপুটী পত্নীর আক্ষেপোক্তি শেষ হইলে দারোগা-পত্নী সুভাষিণী কহিল—"আমি কিন্তু দেখাটা পর্য্যন্ত পাই না। মাসের ভিতর পনর দিন মফঃস্বলেই কাটান। যে কয়টা দিন সহরে থাকেন, মোকর্দ্দমা নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত। দুপুর রাত্তের আগে বড় একটা বাসায় ফেরেন না।"

সুভাষিণীর কথা শেষ হইলে মুন্সেফ-পত্নী কহিলেন—"তবু তোমাদের একটা সুখ আছে—তোমরা ইচ্ছামত খরচ কর্ত্তে পার। তোমাদের দুঃখগুলো ষোল আনাই পাচ্ছি, অথচ তোমাদের সুখটুকুর একবিন্দুও পাই না। আপিস হ'তে বাসায় ফিরে' রোজই একবার হিসাব দেখা চাই। আর একটী পয়সা বেশী খরচ দেখতে পেলেই চেঁচামেচি ক'রে বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির করেন। একটী পয়সা নয় যেন শরীরের এক টুক্‌রা মাংস।"

স্নেহলতা চুপ্‌ করিয়া এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। মুন্সেফ-পত্নীর খেদোক্তি শেষ হইলে সে নিজের অবস্থার সহিত তাহার সঙ্গিনীদের অবস্থা তুলনা করিয়া ভাবিয়া দেখিল যে, সে তাঁহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাগ্যবতী। তাহার কোন কষ্ট, কোন অভাব নাই। অর্থসুখ এবং পতিস্নেহ সে যথেষ্ট পাইয়াছে এবং পাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর প্রতি অতীত ব্যবহার স্মরণ করিয়া প্রাণে বিষম বেদনা অনুভব করিল।

স্নেহলতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সুভাষিণী কহিল, "প্রোফেসারের চাকরী খুব সুখের। মফঃস্বল নেই, মোকর্দ্দমা নেই—যথেষ্ট অবকাশ, অথচ মোটা মাইনে।" অপর মহিলাদ্বয় একবাক্যে সুভাষিণীর কথা সমর্থন করিলেন। আহারের আহ্বান আসিলে মহিলাদের সভাভঙ্গ হইল।

৫

কলেজের কার্য্য শেষ হইলে বিনয়কৃষ্ণ সেই দিন বেলা প্রায় তিনটার সময় সাইকেলে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সাইকেল ঈষৎ বেগে চলিতেছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বিনয় সম্মুখে একটা বিরাট জনতা দেখিতে পাইল। কি এক উৎসব উপলক্ষে নবাবপুরের পথে সেইদিন যথেষ্ট লোকসমাগম হইয়াছিল। অনবরত ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে জনতার ভিতর দিয়া বিনয় সাইকেল চালাইতে লাগিল, কিন্তু সাইকেলের বেগ থামাইতে না পারিয়া হঠাৎ সাইকেলসহ এক বৃদ্ধার উপর গিয়া পড়িল। বৃদ্ধা ভূপতিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার কপালের কতকাংশ কাটিয়া গিয়াছিল এবং ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতেছিল। সাইকেল্‌ ফেলিয়া বিনয় তাড়াতাড়ি বৃদ্ধাকে ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বৃদ্ধার চীৎকার শুনিয়া বিস্তর লোক আসিয়া জুটিল। তাহার দুই পুত্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বসিল এবং ক্ষত স্থানে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। বিনয় তখন বৃদ্ধাকে ছাড়িয়া সাইকেল্‌ ধরিয়া রাস্তার এক পাশে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সাহেবী বেশ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না, চারিদিক্‌ হইতে ক্ষুব্ধ জনমণ্ডলী তাহার প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল।

অদূরে জনৈক পাহারাওয়ালা অর্দ্ধলুক্কায়িতাবস্থায় এই দৃশ্য দেখিতেছিল। যখন বিশেষ কোন গোলমালের সম্ভাবনা দেখিল না, তখন ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আসামীর সাহেবী পোষাক দেখিয়া সিপাহী অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সসম্ভ্রমে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। জনতার ভাব গতিক এবং পুলিশের আগমন দেখিয়া বিনয় কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিল, কিন্তু পাহারাওয়ালার প্রশ্নে কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সাহেবী মেজাজে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে কহিল—"হাম্‌কো নাম্‌সে তোম্‌কো ক্যা কাম?" পাহারাওয়ালা পূর্ব্ববৎ সসম্মানে উত্তর করিল—"আপ্‌কো কুছ্‌ কসুর হুয়া, নাম আউর ঠিকানা পুছনা চাই।" বিনয় আর আপত্তি না করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিল। যখন পাহারাওয়ালা বুঝিতে পারিল যে আসামী একজন মাষ্টার—কলেজে ছাত্র পড়ায়—তখন

সে তাহার ক্ষুদ্র লোচনদ্বয় যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া এমন ভাব দেখাইল যেন সে এতক্ষণ কতবড় একটা মূর্খতা করিতেছিল। পূর্ব্বের বিনীত ভাব হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া কহিল—"আপ্ মাষ্টার হ্যায়? আপ্‌কো বহুৎ কসুর হুয়া; আভি হামারা সাথ্ থানাপর্ চলিয়ে।"

ঠিক এই সময়ে গোলমাল দেখিয়া কয়েকজন কলেজের ছাত্র তথায় উপস্থিত হইল এবং পলকে অধ্যাপক মহাশয়ের বিপত্তির কারণ জানিয়া লইল। যাহার পকেটে যাহা ছিল তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া বৃদ্ধার হাতে এবং পাহারাওয়ালার হাতে কিছু সেলামী দিয়া, শিক্ষক মহাশয়কে মুক্ত করিল। লজ্জায় এবং অপমানে বিনয় এতদূর অভিভূত হইয়াছিল যে তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইল না। তাহার ছাত্রদের সহিত একটা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিল না।

রায় সাহেবের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্নেহলতা ইতঃপূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছিল। স্বামীর মুখ দেখিয়া স্নেহলতার মনে একটা আশঙ্কার উদয় হইল। স্ত্রীর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বিনয় টেবিলের উপর তাহার টুপী এবং বই রাখিয়া একটা আরামকেদারায় বসিয়া পড়িল। স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া স্বামীর জন্য সরবৎ এবং খাবার আনিতে চাহিল, কিন্তু বিনয় হঠাৎ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"শোন, আজ রাস্তার সামান্য একটা পাহারাওয়ালার কাছে অপমানিত হ'য়ে একটা মস্ত শিক্ষালাভ করেছি। একদিন তুমি যা' বলেছিলে, আজ তা'র সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছি। বাস্তবিক, মানুষ লেখাপড়াই শিখুক, আর টাকাই রোজগার করুক, ক্ষমতাপন্ন না হ'লে সংসারে তার মর্য্যাদা নেই। আজ সত্যি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করছি যে পরজন্মে যেন একটা উচুদরের রাজকর্ম্মচারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি।"

স্বামীর এই আকস্মিক এবং বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনের কারণ স্নেহলতা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করিয়া সকাতরে কহিল—"তোমার পায়ে পড়ি, অমন প্রার্থনা করো না। এই সাময়িক দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। আমিও আজ এক শিক্ষা লাভ করেছি। বুদ্ধির দোষে তোমাকে অনেকবার অন্যায় এবং অপ্রীতিকর কথা বলেছি। সে সব ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা কর। আজ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যে যদি আবার নারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করি তবে তোমাকেই যেন পতিরূপে এবং শিক্ষকরূপেই পাই।"

স্নেহলতার মুখে আজ এ কি কথা! বিনয় একেবারে অবাক্ হইয়া গেল।

শ্রীবনওয়ারীলাল বসু।

আজি

বুকের মধ্যে জড়িয়ে গেছে
ফুলের সুবাস,
সারা প্রাণে জাগ্‌ছে গো তার
পুলক উছাস।
কে এলো এই বিজন ঘরে,
কার হাসিটি এমন করে
চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিল
অবশ বুকে?

কোন্ সেফালি ফুলের রাশি,
আজ্‌কে ফুটে উঠলো হাসি;
কোন্ গোলাপটি ফুটলো আজি
মনের সুখে?
বাজ্‌ছে বীণা আজ্‌কে রে কোন্
গানের ছন্দে?
হৃদয় মম আকুল হল
কি আনন্দে?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বিধবা

(গল্প)

স'বে প্রভাত হইয়াছে। ম্লান রৌদ্র এখনও বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ হইতে শ্যামল ধরণীর বুকে লুটাইয়া পড়ে নাই। সুপ্ত জগৎ সহসা জাগ্রত হইয়া চারিদিকে কলরব তুলিয়াছে। এমন সময় প্রাঙ্গণ হইতে ছোট বৌয়ের কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে বাড়ীখানা মুখরিত হইয়া উঠিল—"এখনো বাসী উঠোনে ঝাঁড় পড়েনি; এঁটো বাসনে বালী পড়েনি; এতক্ষণে নবাবের মত যে ঘুম থেকে উঠ্‌লে, কাষ সেরে আফিসের রান্না রাঁধ্‌বে কখন? ঘুমুলেই পেটের ভাত পরণের কাপড় জুটবে কি না!"

স্ত্রীর উচ্চ চীৎকারে ছোট বাবু ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গা?"

"আমার মাথা আর মুণ্ডু হয়েচে! এতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হল। আজ তোমার খেয়ে আফিসে যাবার দফা রফা হয়েছে। কাষ আমিও করতে জানি গো, খোকার ঠাণ্ডা লাগবে ভয়েই সকালে উঠ্‌তে পারিনে।"

"তুমিই যদি সব কাষ করবে তা হ'লে ওঁকে ভাত কাপড় দিয়ে পুষ্‌চি কেন; টাটে বসিয়ে পুজো করবার জন্তে তো নয়! সেইটে বুঝে ওঁর পথ উনি দেখুন।"—কহিয়া ছোট বাবু ক্রোধভরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ছোট বৌ স্বামীর অনুসরণ করিল।

যে হতভাগিনীর প্রতি এ বিষবাণ নিক্ষেপ করা হইল, সে এবাটীর বিধবা বড়বৌ। দুঃখে অপমানে তাহার হৃদয়খানি ধূলায় লুটাইতে লাগিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বাসন মাজিতে বসিল।

কিয়ৎক্ষণেই তাহার বাসন মাজা ঘর নিকানো হইয়া গেল। বারান্দায় চৌকি পাতিয়া ছোট বৌর জন্য গরম হালুয়া, চা সাজাইয়া দিয়া, সে রান্না চড়াইল। কিয়ৎকাল পর চা পানান্তে ছোট বৌ রন্ধনরতা যায়ের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "আজ দুখানা পিঠে খাবার ইচ্ছে হয়েছিল; তা এত বেলায় আর হয়ে উঠ্‌বে না। বিকেল বেলাই তৈরি করো। এখন একটা পাণ দাও; কোমরের ব্যথায় উঠ্‌তেই পারচি না।"

বড়বৌ হাত ধুইয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে পাণ সাজিয়া আনিলেন। ছোট বৌ পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিল, "কাল বুঝি তোমার একাদশী গেছে? আজ আবার রান্নার চাল চাই। হাটের দিন আড়াই পো চাল এনে দিয়েছিলেন; চার দিনেই তো ফুরিয়ে বসে আছ। বিধবা মানুষের হিসেব ক'রে চালাতে হয়। এখন চা'ল না কিনলে আবার খাওয়াই হবে না।" বড়বৌ যেন কি বলিবার জন্ম মুখ তুলিয়া, হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

২

প্রতিদিনের মত বাঁধা নিয়মে স্বামীর পাতে প্রসাদ খাইয়া, ছেলে কোলে লইয়া ছোট বৌ যখন দিবানিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। শান্ত প্রকৃতি রুদ্র মহাকাশের তলে উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পাখীরা আপনাদের নিভৃত নিরাপদ শান্তির নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। শীর্ণকায়া নদীর বুকে খেয়া নৌকা বন্ধ হইয়াছে। কেবল বাঁশের বনে চাপা হাসির অস্ফুট শব্দ হইতেছিল। একটি গাভী বিরাম সুখে শয়ন করিয়া অদূরে পানীয় জলের কূপটির দিকে পিপাসিত নয়নে চাহিতেছিল।

রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া, বড়বৌ স্নানান্তে সিক্ত বসনেই আপনার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্ম একখানা ছিন্ন বস্ত্র

লইয়া দেখিলেন, সেখানা এতই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে কোন প্রকারেই লজ্জা নিবারণ হয় না। বিদীর্ণ হৃদয়ে কাপড়খানা রাখিয়া, দুটি শুষ্ক আলোচাউল মুখে ফেলিয়া দিয়া তিনি এক ঘটী শীতল জল পান করিয়া একটি আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। কাল একাদশীর উপবাসের পর আজ এতক্ষণে তাঁহার তৃষাতুর অধর জল স্পর্শ করিল।

কিয়ৎকাল পর একটি ১২।১৩ বছরের কালো মেয়ে আঁকাবাঁকা পথে সেই বাড়ীর দিকে আসিল।

বাগানে শ্যামল তৃণদলের উপর বসিয়া বালিকা একটি গাভীকে আদর করিতে লাগিল। কূপ হইতে এক বালতি জল তুলিয়া গাভীর মুখের কাছে ধরিল। বাগানের টগর গাছে টুনী পাখী বাসা বাঁধিয়া ডিম প্রসব করিয়াছিল, মেয়েটি দৌড়িয়া গিয়া ডিম কয়েকটা দেখিয়া আসিল। ক্ষণকাল বৃক্ষ পল্লবের মধ্যে তাহার সরল আয়ত নেত্র নিবদ্ধ করিয়া কোমল মধুর স্বরে কহিল—"কুহু কুহু"—কিন্তু কুহু তখন সেস্থানে উপস্থিত ছিল না; নিস্তব্ধ কাননের শুষ্ক পত্র উড়াইয়া দুষ্ট বাতাস বালিকার 'কুহু'র প্রতিধ্বনি করিল "সর্ সর্ মর মর"।

বড়বৌ তাঁহার স্নেহ নির্ঝরিণীর সাড়া পাইয়া, স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—"পাগলী, পালু, আয় মা!" "আসছি রাঙ্গা মা; আজ তুমি একটু ঘুমও নি; এখনো বসেই র'য়েচ?"—কহিতে কহিতে বালিকা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কোলের উপর শয়ন করিল, তিনি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। মেয়েটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাপড়খানা ভিজে কেন রাঙ্গা মা? ও, বুঝেছি আর কাপড় নেই! আচ্ছা রাঙ্গা মা, তোমার মুখ আজ্‌কে বড্ড শুক্‌নো কেন? এখনো বুঝি খাওয়া হয় নি? কাল তো উপোস করেছিলে!"

এ মমতা ভরা কথা শুনিয়া বিধবার দুটি চক্ষে জল আসিল। তাহা গোপন করিবার জন্য তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। "ওমা কি হবে গো; এখনো তোমার খাওয়া হয় নি? আমি মজা ক'রে তোমার কোলে শুয়ে রয়েচি! চল রাঙ্গা মা, আমি তোমার রান্নার যোগাড় ক'রে দিই গে।" কহিয়া পাগলী হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিরামিষ রান্নাঘরে লইয়া গেল।

ক্ষিপ্রহস্তে উনুন ধরাইয়া, চাউল ধুইয়া কহিল, "ছোট খুড়ী খেয়ে দেয়ে মনের সুখে শুয়ে আছে; তোমার খাওয়া হ'ল না হ'ল তাও একবার দেখে না! মানুষ আবার এমন হয় গা? ছোট খুড়ী ম'লে নিশ্চয় শকুনী হবে তুমি দেখে নিয়ো রাঙ্গা মা। সয়ন্ বলে, যারা কেবল নিজের খাওয়াটাই বোঝে, তারা ম'লে শকুনী হ'য়ে সৃষ্টির পচা মাংস খেয়ে বেড়ায়।"

কল্পনায় ছোট বৌর শকুনত্বে পাগ্‌লী খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। বড়বৌ ভীত হইয়া কহিলেন, "খুড়ীমাকে এ সব কথা বল্‌তে নেই পাগলু, শুনলে তিনি রাগ ক'রে তোমার মার কাছে ব'লে দেবেন।"

বালিকা বলিল, "বলুক গে, কাউকে ভয় ক'রতে আমার বয়েই গেচে। ছোট খুড়ীকে আমি দেখতে পারি নে, একশোবার দেখতে পারি নে; ও কেন তোমায় এত কষ্ট দেয়?"

রাগে ঠোঁট ফুলাইয়া বঁটি টানিয়া লইয়া পাগলী কুট্‌না কুটিতে বসিল। কিন্তু তরকারীর ডালায় হাত দিয়া দেখিল তাহাতে একটি তরকারীর নাম গন্ধও নাই। বাজারের যাহা কিছু ছোট বৌ রান্নাঘরে তুলিয়া রাখিয়াছিল। আজ যে এ ঘরে একটি প্রাণীর রান্না খাওয়া আছে তাহা বোধ হয় তাহার স্মরণই ছিল না। পাগলী বঁটি ফেলিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ীর পথ ধরিল। পশ্চাৎ হইতে বড়বৌ ডাকিলেন—"পাগলু, কোথায় যাচ্চিস? ফিরে আয়!" বালিকা ফিরিল না। বড়বৌ ক্ষুণ্ণমনে বসিয়া রহিলেন।

*পাগলী ইঁহাদের প্রতিবেশী গৃহের কন্যা; কেন যে মেয়েটির নাম পাগলী রাখা হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। সাধারণ বালিকা হইতে ইহার স্বভাব একটু ভিন্ন প্রকৃতির বুঝিয়াই হয় তো মেয়েটির উক্ত নামকরণ হইয়াছিল। পিতার অর্থাভাবে আপনার রূপহীনতার পাগলী এখনো অনূঢ়া। তাহার কালো দেহের মধ্যে

সরলতায় চল্ ঢল করুণায় সমুজ্জল অন্তঃকরণের খবর কেহ জানিতে চেষ্টা করিত না। শুক্তির মুক্তার ন্যায় এই বিধবাই কেবল তাহার মূল্য বুঝিতেন। সমস্ত গ্রামের মধ্যে ব্যথিতের ব্যথার সাথী, দুঃখীর দুঃখের দোসর এমন স্ত্রীর একটিও ছিল না। গ্রাম্য সম্বন্ধে ইনি উহার খুড়ীমা হইতেন। কিন্তু পাগলী তাঁহাকে রাঙ্গা মা বলিয়া ডাকিত। অকপট হৃদয়ে ভালবাসিত।

কিয়ৎকাল পরে অঞ্চল ঢাকা দিয়া কয়েকটা তরকারী, ছোট একটা পাথরের বাটীতে একটু ঘি লইয়া পাগলী ফিরিয়া আসিল। রাঙ্গা মার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "উমুন যে পুড়ে যাচ্ছে, ভাত দুটো চড়িয়ে দাও, আমি একটু ডালনার ঝোল কুটে দিচ্চি।"

বড়বৌ বলিলেন, "তোমার কিছুই কুটতে হবে না পালু, ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যাও। অমন ক'রে ঘরের জিনিস আন্‌লে আমি তোমার ওপর রাগ করে একটা কথাও বোল্‌ব না।"

পাগলী অঞ্চলের আলু, পটোল মেঝেয় নামাইয়া ক্ষণকাল অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল। বড়বৌ অপ্রতিভ ভাবে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন, "কেঁদে ফেল্লি কেন পালু? তোর আবার কি হ'লরে? চুপ কর কাঁদিস নে।"

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না কেন বলছিলে রাঙ্গা মা? আমার আনা জিনিস ফিরিয়ে নিতে বল্‌ছিলে। রাগ করে আমায় তুমি, তুমি বল্লে কেন? তাই আমি কাঁদ্‌চি, আরো বেশী ক'রে কাঁদবো। আজ আমি কখ্‌খনো চুপ করবো না।"

"আমি আর তোকে কিচ্ছু বোল্‌ব না, মা আমার, সোণা আমার, তুই চুপ কর লক্ষ্মী মেয়ে।" কহিয়া বড়বৌ স্নেহভরে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। এক পশলা বৃষ্টির পর নির্ম্মল আকাশের মেঘ কাটিয়া শান্তশ্রী ধারণ করিল। বড়বৌ পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন।

৩

পরদিন ছোট বৌ আপনার শয়ন কক্ষে স্বামীর সহিত কলহ বাধাইয়াছে। বড়বৌর কায কর্ম্ম অনেক শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বারান্দায় তোলা উমুনে খোকার জন্য দুধ জ্বাল দিতেছিলেন। এমন সময় একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "তোমরা সব কোথায় গো? কাউকে তো দেখ্‌চি নে।"

"দাদা এসেছেন," কহিয়া বড়বৌ সহাস্য মুখে আগন্তুককে প্রণাম করিয়া বসিতে দিলেন। বহু দিনের পর একমাত্র পিতৃকুলের স্নেহের বন্ধন দাদাকে দেখিয়া তাঁর উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত হইল। তিনি মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলেন—অভাগিনী ভগিনীর দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া দাদা বুঝি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভুল ধারণা তিরোহিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। শ্যালিকার বিবাহে দাদা শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলেন, তাই পথে নৌকা বাঁধিয়া বোনটিকে একবার দেখিয়া গেলেন। বোন মিনতি ভরা চোখ দুটি দাদার মুখের উপর প্রসারিত করিয়া পিতৃভবনে গিয়া দাদার ছেলে মেয়েকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, দাদা বোনকে বুঝাইয়া বলিলেন, কাঁচা বয়সের বিধবা মেয়েদের বাপের বাড়ীর স্বাধীনতার মধ্যে লইয়া যাওয়া অতিশয় অন্যায়। একমাত্র শ্বশুর ঘরই তাহাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান। বড়বৌ এ কথায় একটিও প্রতিবাদ করিলেন না। দাদাকে বিদায় দিয়া তাঁহার চক্ষের জল অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল। আজ একটি মুহূর্ত্তের জন্য আপনার জনকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল। পিতামাতার মমতা বিজড়িত স্মৃতি, স্বামীর অনন্ত অসীম প্রেমোচ্ছ্বাস—তাঁহার হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিতেছিল। তিনি বারান্দার কোণে বসিয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

স্বামীর সহিত কলহে মনের মত উত্তর না পাইয়া ছোট বৌয়ের রুক্ষ মেজাজ আজ আরও একটু বেশী রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঝাল ঝাড়িবার জন্য বড় যায়ের সন্ধানে আসিতেই সম্মুখে তাঁহাকে অশ্রু মোচন করিতে

দেখিয়া ছোট বৌ এমন স্থযোগ হেলায় হারাইতে পারিল না। হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া কহিল, "কান্না হচ্ছে নাকি? সকাল নেই, দুপুর নেই, তুমি যখন তখন এমন করে কেঁদে আমার অমঙ্গল ডেকে এনো না বলচি। ভাইয়ের কাণে কাণে আমাদের এত নিন্দে করলে, তবু ভাই বাঁ পা দিয়েও জিজ্ঞেস করলে না, সে দোষ কার বাপু?"

পতিবিয়োগের সাথে সাথেই বিধবা মুখ তুলিয়া মানুষের সহিত কথা বলা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেহ পদতলে পিষিয়া মাড়াইয়া গেলেও তিনি কথা কহিতেন না। ছোট বৌর ঝঙ্কারে আস্তে আস্তে শুধু কহিলেন, "আমার দুঃখের কান্না আমি কাঁদ্‌ছি বোন, এতে তোমার অমঙ্গল হবে কেন? যাদের দুঃখ তারাই কেঁদে থাকে।"

"আহা, দুঃখের কি আর সীমা আছে। নিজের সবগুলোকে তো পেটে পুরেছেন, এখন চোখের জল ফেলে ফেলে আমাদের ক'টিকে পেটে পুর্‌তে পারলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। কাঁদতে হয় এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাঁদো গে!"

"এ বাড়ী তুমি বুঝি বাপের দেশ থেকে মাথায় ক'রে এনেছিলে ছোট খুড়ী? রোজই যে রাঙ্গামাকে তাড়িয়ে দিতে চাও। রাঙ্গা মা রাক্ষস নয় যে, তোমাদের পেটে পুরবে। সেটা বরং তোমায় বল্লেও শোভা পায়।"

ছোট বৌ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, পাগলী কখন নিঃশব্দে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অগ্নিভরা দৃষ্টি পাগলীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তীব্রকণ্ঠে ছোট বৌ কহিল, "হতচ্ছাড়া মেয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দিচি। চল তোর মার কাছে, অমন মেয়ের মুখে আগুন।"

"ছোট মুখে বড় কথা—ছাগলের মুখে মরার পাতা।" কহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে পাগলী একদৌড়ে পলাইয়া গেল।

৪

মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। ঝুরঝুর করিয়া বৃষ্টি ঝরিতেছিল। পুঞ্জীভূত মেঘের মধ্য হইতে চাঁদ এক একবার উঁকি দিয়া পুনরায় মেঘের আড়ালে লুকাইতেছিল।

ছোট বাবু আফিস হইতে ফিরিয়া মুখ হাত ধুইয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, "কাল সকাল বেলা সেক্‌রা আসবে, তাকে খবর দিয়ে এসেছি। খোকার অন্নপ্রাশনের হার, বালা কি প্যাটার্ণের হবে ঠিক করেছ তো?"

"ফিতে বালা হবে, মটর দেওয়া সরু বিছে হার হবে; সে আমার ঠিক করাই আছে। আর একটা জিনিসের আমার সাধ ছিল।" কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ছোট বৌ স্বামীর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

স্ত্রীর সাধের কথা শুনিয়া ছোট বাবু ভীত হইলেন। তাঁর সঙ্গতি কম, কিন্তু স্ত্রীর সাধটি খুবই প্রবল। বার দুই কাসিয়া, তামাক সাজিতে সাজিতে ছোট বাবু নরম সুরে কহিলেন, "তোমার আবার কি সাধ হল বলই না, শোনা যাক্‌।"

"বেশী টাকা পয়সার সাধ নয় গো, ভয় নেই। পালিষ পাতের উপর 'পতি পরম গুরু' লেখা একখানা চিরুণী দিয়ে চুল বাঁধবার সাধ হয়েছে। এক ভরি সোণা হলে চিরুণীও এই সঙ্গে গড়্‌তে দিতাম।"

"এখন তো আমার হাতে এক ভরি সোণা কেন্‌বার টাকা নেই; তা—তোমার পুরোণ চিরুণী খানা ভেঙ্গে একখানা নতুন গড়ে নাও।"

"তা নয় তো কি, এক ভেঙ্গে আর কোরব আমায় তেমন বোকা পাওনি; একরত্তি সোণা বাড়াতে পারি নে, আমি মনে ভাব্‌চি দিদির কাছে যে ভরিটেক সোণা আছে, সেইটে চেয়ে নেব।"

"তাঁর কাছে আবার সোণা এল কোথায় থেকে? গয়না যা ছিল সব তো আমাদের কাছেই।" কহিয়া ছোট বাবু উৎসুক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন।

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সোণা তাঁর কাছে আছে। রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে বঠ্‌ঠাকুরের ফটো লকেটটি, আর তাঁর

হাতের আংটিটা দিদির কাছেই আছে। সে দুটো আমাদের দেন নি তো। দুটো মিলিয়ে এক ভরির উপরেই হবে।"

"তা নিয়ে উনি আর কি করবেন? আজই চেয়ে নিয়ো, কাল সকালে সেকরাকে দিয়ে দেব।"

ছোট বৌ প্রফুল্ল হৃদয়ে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া, তাহার অন্নপ্রাশনে কাহাকে কাহাকে আনা হইবে, কি পরিমাণে খরচপত্র করিতে হইবে, স্বামীর সহিত তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল।

সকলের আহারাদির পর রান্না ঘরের কায সারিয়া বড়বৌ নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হাতের প্রজ্জ্বলিত কেরোসীনের ডিবাটী পিতলের পিলসুজের উপর রাখিয়া, ঘরের মেঝেয় ছিন্ন শয্যাটি বিছাইলেন। দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ছোট বৌ ডাকিল, "দিদি!"

অনেক দিনের পর মৃদু কোমল স্বরের দিদি ডাকে তিনি বোধ হয় বিস্মিত হইলেন। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আমায় ডাকচ?"

"হ্যাঁ, তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে এসেছি।" বড়বৌর অধরোষ্ঠে বিষাদের ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভাগ্যবিধাতা যাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছেন, তাহার নিকটে এ গৃহের সৌভাগ্যবতী গৃহিণীর কি চাহিবার আছে? তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ছোট বৌ কহিল, "জিনিসটা হচ্চে তোমার গলার লকেট, আর বঠ্‌ঠাকুরের আংটি। ও দুটো ভেঙ্গে আমি চিরুণী করে নেব।"

বড়বৌ কৃপণের ধনের মত লকেটটি বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। সংসারের পথহারা পথিকের ঐ টুকুর মধ্যে কত পাথের কত সম্পদ যে নিহিত আছে তাহা কে বুঝিবে? চিরবিদায় লইবার অল্পদিন পূর্ব্বে প্রেমময় স্বামী প্রথম উপার্জ্জনের অর্থে ঐ ক্ষুদ্র মহামূল্য বস্তুটি প্রস্তুত করিয়া সাদরে স্ত্রীর বক্ষে দোলাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন প্রিয়তমের আলেখ্য উপহার পাইয়া প্রীতিবিহ্বলা মুগ্ধা তরুণী কত যে আনন্দ লাভ করিয়াছিল, তাহার সীমা হয় না। তাহাকে পৃথিবীর রাণী করিয়া দিলেও সে বুঝি ইহা অপেক্ষা সুখী হইতে পারিত না। হায়, আজ কে তস্কর-বেশে সর্ব্বহারা বিধবার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত, অশ্রুজলে বিধৌত শেষ রত্নটির সন্ধান লইতে আসিয়াছে? তিনি ধরা গলায় কহিলেন, "তাঁর—তাঁর এ দুটি চিহ্ন আমি তোমায় কখ্‌খনো দিতে পারবো না বোন!"

"দিতে পারবে না? যার গয়না পরবার অধিকার নেই, তার আবার ঢং করে বুকের ওপর আংটি, লকেট ঝুলিয়ে রাখা কেন? ও দুটো আমায় দিতেই হবে, আমি তাঁকে ডাকৃছি।"—তাঁকে ডাকিতে হইল না—তিনি স্ত্রীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার সম্মুখে আসিয়া ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় দিতেই হবে। বিধবার গয়না পরার সাধে আমি প্রশ্রয় দেব না। আমার ভাইয়ের জিনিস, শীগ্‌গির ফেলে দাও বলচি, নইলে ভাল হবে না।"

অবিচলিত দৃঢ় কণ্ঠে বড়বৌ উত্তর করিলেন "আমার স্বামীর জিনিস, আমি কিছুতেই দেব না।"

এই উত্তরে ছোট বৌ, ছোট বাবু মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে ব্যক্তি শত অপমানে, বাক্যবাণে কথা কহে না, মুখ তুলিয়া চাহে না পর্য্যন্ত —এ কি সেই? এ তেজোব্যঞ্জক কঠোর কণ্ঠস্বর কি তাহারই? ছোট বাবু রাগে দিশাহারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"দেবে না? বেশ, কিন্তু আমার বাড়ীতে তোমায় আর স্থান হ'বে না। স্বামী স্বামী করচ, আমার ভাত যদি ফের মুখে দাও তবে তোমার স্বামীরই দিব্যি লাগ্‌বে।"

"আমি ম'লেও তোমার ভাত মুখে দেব না ঠাকুরপো, তোমার চিন্তা নেই। বাড়ী থেকে আমার বের করবার ক্ষমতা তোমার হবে না, কারণ বাড়ী কেবল তোমার নয়, আমারও।" কহিয়া অবসন্ন হৃদয়ে তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

উচ্চ চীৎকারে পাড়া সচকিত করিয়া পত্নীর সহিত ছোট বাবু সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনের সহিত প্রবল বেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল। বারান্দার কোণে যেখানে বড়বৌ স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া ছিলেন—বাতাসের বেগ বৃদ্ধি হইয়া বৃষ্টির ছাঁটে সে স্থান ভিজিয়া গেল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া সর্ব্ব শরীর জলকণায় পরিসিক্ত হইল; কিন্তু তিনি উঠিলেন না। বাহ্যজ্ঞান রহিতা অভাগিনী নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন। সে নীরব মর্ম্মভেদী দৃষ্টি বিধাতার চরণে কি বর কামনা করিতেছিল তাহা জানি না। এ জগতে কাম্য বস্তু তাঁহার কিছুই ছিল না। কেবল একটি আশা বিধবার চির অন্ধকার হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল—

জীবনান্তে উষালোকে—বহে যদি সুমলয়,
ঘুম পাড়াইয়া দিবে—মরণ অমৃতময়।

৫

পরদিন প্রাতঃকালে বড়বৌ শয্যা ত্যাগ করিলেন না। সিক্তবস্ত্র গায়ে শুকাইয়া অনবরত বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি ক্রমেই পীড়িতা হইয়া পড়িতেছিলেন।

কিয়ৎকাল পর প্রতিদিনের মত অনেক বেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর ছোট বৌ বাহিরে আসিয়া স্তম্ভিত হইল। আজ কেহ তাহার উঠিবার পূর্ব্বেই ঘর, দ্বার পরিষ্কার করিয়া, বাসন ধুইয়া, উনুন ধরাইয়া চা তৈরীর হুকুমের অপেক্ষায় বসিয়া নাই। একবেলা একমুষ্টি অন্নের পরিবর্ত্তে কত সুবিধা যে পাওয়া গিয়াছে—আজ তাহার মূল্য ছোট বৌয়ের মনের মধ্যে বারবার জাগিতে লাগিল। সমস্ত কাষ সারিয়া স্বামীর আফিসের রান্নার কথা ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিল।

রুদ্ধ দ্বার ঈষৎ মুক্ত করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ছোটবৌ যার কক্ষে প্রবেশ করিল। একবার ইতস্ততঃ করিয়া ডাকিল 'দিদি!'

দিদির সাড়া না পাইয়া তাঁহার জ্বরতপ্ত শরীরে প্রবলবেগে একটা ধাক্কা দিয়া পুনরায় ডাকিল—"অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, ওঠো না, কত ঘুমুচ্চো?" এ ডাকেও তিনি কথা কহিলেন না; কেবল ক্ষণিকের জন্ম বিহ্বল আঁখি দুটি অর্দ্ধ মেলিয়াই মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। আপন মনে গজর গজর করিতে করিতে ছোট বৌ নিজের কাযে চলিয়া গেল। চেতনা-হীন দুঃখিনী শূন্য ঘরে রোগশয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

স্ত্রীর মুখে ভ্রাতৃজায়ার পীড়ার কথা শুনিয়া ছোট বাবু তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "রোগ না—রোগ হ'য়েচে! আমাদের জব্দ করতে ন্যাকামী ক'রে প'ড়ে রয়েছে। তুমি এত বুদ্ধিমতী হ'য়েও সেটা বুঝতে পারচ না?" স্বামীর মুখে নিজের বুদ্ধির উল্লেখে ছোট বৌ প্রসন্ন হইযা যায়ের আর কোন খবর লওয়া দরকার বোধ করিল না।

"রাঙ্গা মা ও রাঙ্গা মা; তুমি কোথায় গো?" কহিতে কহিতে পাগলী কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অসময়ে তাঁহাকে শয্যায় শয়ান দেখিয়া কোলের কাছে বসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "আহা, অসুখ হ'য়ে পড়ে আছ? কখন জ্বর হ'য়েছে রাঙ্গা মা? মাথায় বড্ড যন্ত্রণা হচ্চে? আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।" বড়বৌ অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "পালু, এসেছিস মা? আমার প্রাণ যে এতক্ষণ তোকেই চাচ্ছিল। বড় পিপাসা, একটু জল খাওয়া, এ বাড়ীর কিছু কিন্তু আমায় খাওয়াসনে পালু। তোদের ঘর থেকে জল নিয়ে আয়।" পাগলী রাতের ঘটনা জানিত না। রাঙ্গামার আদেশ, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ী হইতে শীতল জল ও মিছরি লইয়া আসিল।

অপরাহ্ণে মেয়ের খবর করিতে আসিয়া পাগলীর মা দেখিলেন, তাঁহার বালিকা কন্যা মায়ের হৃদয় লইয়া নারীর সেবানৈপুণ্য লইয়া অনাথিনীর শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে। মুগ্ধ হৃদয়ে তিনি ডাকিলেন, "পালু এইবার ঘরে যেতে হ'বে। সন্ধ্যে যে হয়ে এল।"

"রাঙ্গামাকে এ অবস্থায় রেখে কেমন করে ঘরে যাব মা? সমস্ত দিন রাঙ্গামা কিছু খান নি, এখনো চাইছেন

না; কথা বলছেন না। গা আগুনের মত গরম। আমি আজ এখানেই থকবো মা।"

করুণ হৃদয়া জননী মেয়ের মিনতি অবহেলা করিতে পারিলেন না। স্নেহ বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা তাই থাকিস পালু; আর একটু বাদে চট করে গিয়ে ছুটো খেয়ে আসিস।"

"তুমি বাড়ী গিয়ে রাঙ্গামার জন্যে একটু সাবু রেঁধে রাখ গে মা, আমি খেয়ে আসবার সময় নিয়ে আসবো।" মা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

৬

অস্তমান সূর্য্যের ম্লান আলোকের মত বড়বৌ প্রভাহীন হইয়া গিয়াছেন। ঘরের ক্ষীণ সন্ধ্যা প্রদীপটির মত তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। নিশ্বাস প্রখর হইয়াছে, চক্ষুতারকা কেমন যেন স্থির অচঞ্চল। পাগলী মাথার কাছে বসিয়া, তাঁহার তপ্ত ললাট শীতল জলে সিক্ত করিয়া দিতেছিল। পাগলীর মা আজ মেয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া অভাগিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

রাত্রি দশটার পর রোগিণী একটু জল পান করিয়া ধীরে কহিলেন, "পালু, তোর সঙ্গে আমার ক'টা কথা আছে এইবার শেষ ক'রে রাখি!"

"কি কথা আছে রাঙ্গামা? একটু দুধ খেয়ে তারপর বল। দুধ খাবে না, কদিনের ভিতর এক জল ছাড়া কিছুই যে তোমায় খাওয়াতে পারলাম না!"

"আর কিছু খাওয়াসনে পালু, তোর হাতের জলই আমার অমৃত রে। তুই বড় লক্ষ্মী মেয়ে, ভগবান তোকে চিরসুখী করবেন। আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করচি—তুই যাঁর হাতে পড়বি, তার পায়ের কাছেই যেন তোর জীবন শেষ হ'য়ে যায়।"

পাগলী তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি ওসব কথা আর বোল না রাঙ্গা মা। তোমার কথা শুনে আমার খুব কান্না পাচ্ছে।"

মধুর হাসি হাসিয়া বড়বৌ উত্তর করিলেন, "কান্না কিসের পালু? এ নরক থেকে ভগবান যদি তাঁর চরণে আমায় তুলে নেন, সে তো আনন্দের কথা। দেখ পালু, তোর গরীব রাঙ্গামার একটি জিনিস তুই নিস মা। তোর কাকার আংটিটে আর ফটো লকেটটি আমার রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে আছে, ওদুটো আমি তোকে দিলাম। তুই আমায় ভুলে যাসনে।" এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা কহিয়া তিনি শ্রান্ত হইয়া পুনরায় জল চাহিলেন। পাগলী তাঁহার মুখে কয়েক চামচে জল ঢালিয়া দিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে রজনী অবসান হইতে লাগিল। উজ্জ্বল চন্দ্রমা মলিন বেশ ধারণ করিল। এমন সময় একটি সকরুণ কণ্ঠের গভীর আর্ত্তনাদ উঠিল---রাঙ্গামা রাঙ্গামা বলিয়া পাগলী ধূলায় লুটাইতে লাগিল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

মায়ের আসন

নানা রকম জাঁক জমকে সবাই পূজে মাকে,
গর্ব্ব যেথা উথলে ওঠে মা কি সেথায় থাকে?
প্রীতিভরা হৃদয় কোণে শান্তি আলো মাঝে,
মায়ের চরণ-রেণু মাখা আসনখানি রাজে।

শ্রীছায়া দেবী।

প্রেমাশ্রু

ওরে আমার অবোধ হিয়া, বৃথাই কেন মরিস ঘুরে?
ধরবি যদি অচিন্ পাখীটারে,
প্রেম-অশ্রু-শস্য-কণা মুঠা মুঠায় ছড়িয়ে দেনা,
ভক্তি ফাঁদে বাঁধ্‌বিরে ঠিক তারে! (হাফেজ)

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোরের কথা

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা।

সারাজেভো হত্যাকাণ্ডের পর সমগ্র ইয়োরোপময় যে মহাসমর জলিয়া উঠে, প্রায় এক বৎসরের মধ্যে তাহা পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জে, চীনের প্রান্ত ভাগে, আফ্রিকার অরণ্যে, আটলান্টিকের নীলাম্বুবক্ষে সর্ব্বত্রই এই যুযুৎসু জাতিসমূহের ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে। যেদিন ভারতীয় ফৌজের তিনটী বাহিনী সর্ব্ব প্রথম ফ্রান্সের তটে অবরোহণ করে, সেদিন হইতে ভারতবর্ষও এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ ঘোষণার অনতিকাল পর হইতেই আমাদের বাঙ্গলা দেশেও এই যুদ্ধ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিবার ইচ্ছা অনেকের মনেই প্রবল হইয়া উঠে। তখন সংবাদপত্রে দেখা যাইত যে প্রায় প্রতি সহরেই যুবকেরা ও দেশের নেতৃস্থানীয়েরা সভা সমিতি করিয়া এই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা রাজ প্রতিনিধিগণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। এই যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছার মূলে কি ভাবের প্রেরণা ছিল, তাহার আলোচনা বোধ হয় বোধ হয় আজ পাঁচ বৎসর পরে অবান্তর হইবে না। এই যুদ্ধের নৈতিক প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকগণ ব্যতীত অন্য কেহ করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইবারই কথা। যাহারা কয়েক পুরুষ যাবৎ ব্রিটিশ পতাকা মূলে শস্ত্রচর্চ্চা করিয়াছে, ভারতীয় এইরূপ কয়েকটী জাতির এই যুদ্ধ যোগদানের মূলে যথেষ্ট রাজভক্তি বর্ত্তমান ছিল, সে কথাও আমরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। কিন্তু বঙ্গীয় যুবকেরা এ যুদ্ধে যোগদান করিতে কেন উন্মুখ হইল?

বাঙ্গলাদেশে শিক্ষার প্রসার ও দেশাত্মবোধের জাগরণের সময় হইতেই সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের আগ্রহ দৃষ্ট হয়।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবের ব্যাপারের সময়ও বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিকট এইরূপ আবেদন করিয়াছিল, তাহাদের আবেদন সে সময় গ্রাহ্য হয় নাই। তাহার পর হইতে বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা নানা প্রকারে আপনাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছে। মোহনবাগানের শীল্ড ম্যাচ, অর্দ্ধোদয় যোগ ও বর্দ্ধমান জলপ্লাবনে স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্য প্রভৃতি তাহার পরিচয় দিতেছে। নিজেদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্যই বাঙ্গালী যুবকেরা এ যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য এতটা উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক আমরা সকলেই জানি যে এ সম্বন্ধে আগ্রহ তখন সফল হয় নাই। প্রয়োজন হইলে সাহায্য লওয়া হইবে, রাজপুরুষদের এই উত্তরে একটা নিরুৎসাহতার ভাব আসিয়া পড়ে। তাহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি একটী আহত সেবকের দল গঠনের চেষ্টা করেন এবং প্রায় ২০,০০০ বাঙ্গালী যুবক তাহাতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু এবারেও ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট উত্তর দেন যে এতগুলি আনাড়ী লোক লইয়া সামরিক বিভাগ বিব্রত হইয়া পড়িবে। ইহার পর নিরুৎসাহতার ভাব আরও প্রবল হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনেই যুদ্ধের প্রথম বৎসর কাটীয়া যায় এবং দ্বিতীয় বৎসরের কয়েক মাস পরেই তুরস্কের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা হয়।

যুদ্ধের প্রথমিক অবস্থা হইতেই একজন নীরব কর্ম্মবীর এ যুদ্ধে বাঙ্গালীরা যাহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও যোগ দিতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯১৫ সালে নবেম্বর মাসে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ইনি স্বর্গীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে বাঙ্গালীদের কোনও বাধা ছিল না, এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বুঝিয়াছিলেন যে বাঙ্গালী যদি কিছু করিতে চায় তবে

পরলোকগত ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাস হইতেই দল গঠনের কার্য্য আরম্ভ হয়। এক দিন ভোর বেলায় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আরও কয়েকজন যুবক একই অভিপ্রায়ে বসিয়া আছে। আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লওয়া হইল এবং বলা হইল, মার্চ্চ মাসে প্রকৃত enrolment অথবা দলগঠন হইবে। মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই সকলের নিকট সংবাদ দেওয়া হয় যে ২৪শে মার্চ্চ অপরাহ্নে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে উপস্থিত হইতে হইবে।

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় ১২।১৪ জন যুবক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের দুইজন উপাধিধারী ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। যথাসময়ে সৌম্যদর্শন কর্ণেল A. H. Nott I. M. S. মহোদয় উপস্থিত হইলেন। মাননীয় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইঁহাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন। তারপর সেই দিনই উপস্থিত সকলের শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার পর অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর লওয়া হইল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিয়ম করিয়াছিলেন যে, স্কুল কলেজের ছাত্রেরা যদি ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহাদিগকে তাহাদের পিতা অথবা অন্যান্য অভিভাবকদের অনুমতিপত্র আনিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় নাই, এবং ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে, "তোমার পিতার পত্র কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাইয়া এই দল গঠনে অনেক সহায়তা পাইয়াছি।" যাহা হউক এইরূপে কয়েকদিনে প্রায় ৩০ জন যুবক ভর্ত্তি হইলে, মার্চ্চ

এই দিক দিয়াই করিতে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে এই অনুমোদন করেন যে, একজন ইংরাজ নেতার অধীনে বৃটিশ কমিশন প্রাপ্ত চারিজন বাঙ্গালী চারি জন ভারতীয় কমিশনধারী ও ৬৪ জন সাধারণ লোক লইয়া একটী হাঁসপাতাল গঠিত হইয়া উহা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাইতে পারিবে। এই দলটীর তখনও কোন নামকরণ হয় নাই। তবে দেশের সংবাদপত্র সমূহ ইহার Bengal Volunteer Field Ambulance Corps নামকরণ করে।

আমি এই দলভুক্ত ছিলাম। এবং এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা এই প্রবন্ধের বিষয়।

মাসের শেষ হয় এবং ১লা এপ্রিল তারিখে আমাদের আলিপুরে পদাতিক সৈন্যদিগের থাকিবার শিবিরে গমন করিবার আদেশ দেওয়া হয়।

১লা এপ্রিল তারিখে আমরা আলিপুরের Infantry lines বা পদাতিক সৈন্যদের শিবিরে উপস্থিত হইলাম। Officers' mess cote বা সেনানীদের আড্ডা গৃহে আমাদের আফিস স্থাপন করা হইয়াছিল। সেখানে উপস্থিত সকলকে কম্বল, বালিশ, বিছানার চাদর এক এক প্রস্থ দেওয়া হয়, এবং সেই শিবিরস্থ ১৬ সংখ্যক রাজপুত সৈন্যদলের দুইজন হাবিলদার আসিয়া আমাদের ভার গ্রহণ করে। আমাদের জন্য সামরিক বিভাগের নির্দ্দেশ মত তিনটী ব্যারাক এবং তৎসংলগ্ন পাক ঘর ও ভাণ্ডার ঘর প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আমরা ব্যারাকে আসিয়া দেখিলাম, প্রতি ব্যারাকে ২০টী করিয়া খাটিয়া রাখা হইয়াছে। ব্যারাক্কের বারান্দায় আমরা সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ পরে মাননীয় কর্ণেল নট আসিয়া আমাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে রাজপুত হাবিলদারের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। কায কর্ম্মের সুবিধার জন্য উপস্থিত ৩০ জন যুবককে ১০ জন করিয়া তিনটী সেকসন অথবা বিভাগে বিভক্ত করা হইল এবং তাহাদের নিকট কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ জ্ঞাপন ও তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অধিক বয়স দেখিয়া কয়েকজন যুবককে নির্ব্বাচিত করা হইল। এ আয়োজন অবশ্য সাময়িক ভাবে হইল।

বেলা ৬টার সময় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেলে আমরা সেদিনকার মত ছুটী পাইলাম এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট খাটিয়ার উপর সদ্যপ্রাপ্ত কম্বল প্রভৃতি ও স্বকীয় জিনিষ-পত্র রাখিয়া, সম্মুখের খোলা মাঠে সমবেত হইলাম।

প্রথম দিন আমরা প্রায় ৩০ জন ব্যারাকে উপস্থিত হইয়াছিলাম। একই পন্থাবলম্বী এই কয়জনের ভিতর অতি শীঘ্রই আত্মীয় ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। একটু বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম

'Stand to stretcher''

(২০-৬ ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজে ষ্ট্রেচার কাওয়াজ প্রদর্শনের সময় এই ফটো গৃহীত হয়)

"Lift wounded"
(আহতকে উঠাও)

যে সমবেত ৩০ জনের মধ্যে মাত্র কয়েকটী ছাত্র, অন্যান্য সকলেই অনেক পূর্ব্বে স্কুল ছাড়িয়াছে। কেহ কলিকাতার পাটের আফিসে কায করে, কেহ দোকান বন্ধ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের প্রথমে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন কলেজের ছাত্রদের এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়া আশা করিয়াছিলাম অনেকছাত্রই আমাদের এই দলে যোগদান করিবে ; কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। যখন পরিবারের ডানপিটে ছেলেগুলি অর্থাৎ Bad boys of the family একে একে তাহাদের দেশের সম্মান রক্ষার জন্য অ্যাম্বুলান্স কোরে যোগদান করিতেছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ইনষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের গ্রীক যোদ্ধার ভূমিকার রিহার্সাল দিতেছে। যাহা হউক দেশের গৌরব Bad boys of the familyদের দ্বারা রক্ষা হওয়ার দৃষ্টান্ত এই প্রথম নহে। অনেক দেশেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় কমিটি নিযুক্ত কণ্ট্রাক্টারের আহারের আহ্বান আসিল। কণ্ট্রাক্টর ৮ পয়সার হোটেলের খাবার খাওয়াইয়া বিদায় লইল। আমাদের সামরিক জীবন আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী বহুদিন যাবৎ যে অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, আমরা তাহার কথঞ্চিৎ পাইতে যাইতেছি, এই ভাব উপস্থিত সকলের মনেই উদয় হইতেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলিপুর

আলিপুর Infantry Linesএ আমরা এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত শিক্ষানবিস ভাবে থাকি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিবরণ এই অধ্যায়ের বিষয়ীভূত।

অতিপ্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া মেস্‌কোর্টের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে সমবেত হইতে হইত। বেলা ৬ঘটিকার সময় ভোর বেলার ড্রিল আরম্ভ হইত। প্রথম সপ্তাহে অনভ্যাসের জন্য আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইত, কারণ অন্যান্য পল্টনের ন্যায় আমাদের জন্য ঘুম ভাঙাইবার রেভিলি বাজিত না, ভোরে উঠিয়া হাত মুখ ধুইতে না ধুইতে ময়দান হইতে হাবিলদারদের বাঁশীর আওয়াজ আসিয়া পড়িত। আমরা প্রথম মাস কোন উর্দ্দি পাই নাই, কাযেই সেই বাঁশী শুনিয়া কাছা কোঁচা গুঁজিতে গুঁজিতে ছুটিতে হইত। ড্রিল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভোরবেলার জলযোগ করিতাম। কণ্ট্রাক্টররা কিছুতেই ৬টার পূর্ব্বে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতে পারিত না। সংবাদটি কর্ণেল নট্টের কর্ণগোচর হইলে তিনি একদিন পর্য্যবেক্ষণজন্য হঠাৎ পাকশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং পাকশালা, ভোজনালয় প্রভৃতির দুর্দ্দশা দেখিয়া, ১২ঘণ্টার মধ্যে কণ্ট্রাক্টরদের ব্যারাক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমরা নূতন কণ্ট্রাক্টর চাই, না নিজেরা কায চালাইতে পারিব? কণ্ট্রাক্টরের অভিজ্ঞতা আমাদের চূড়ান্ত হইয়াছিল। লোকটি আমাদের আহারের সময় কলাইর দাইল ও বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডের ডাঁটা পরিবেশন করাইত এবং কেহ কিছু বলিলে বলিত যে আপনারা দেশের কাযের জন্য যুদ্ধে যাইতেছেন, সামান্য আহারের বিষয়ে গোলযোগ আপনাদের শোভা পায় না। কর্ণেলের আজ্ঞামতে দলের ভিতর হইতে একজন Kitchen Supdt. নিযুক্ত হইল। প্রতিদিন ১২জন করিয়া Kitchen dutyর জন্য নিযুক্ত হইত। পাকশালার বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাত্রে পাহারা দিবার বন্দোবস্ত হইল। সাড়ে নয় ঘটিকা হইতে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রতি ২ঘণ্টায় এক একজন করিয়া তিনটী ব্যারাকের জন্য তিনজন করিয়া পাহারা দিত। শেষের পাহারাওয়ালা পাঁচটায় সময় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিত এবং সকলে Kitchen doorএ সমবেত হইয়া চা ও মোহনভোগ গ্রহণ করিয়া ৬টার সময়ে ড্রিল করিতে যাইত। ব্যারাকের সমস্ত কার্য্যেই স্বাবলম্বন অনুসরণ করাতে শীঘ্রই ব্যারাকগুলির দুর্গন্ধ দূর হইল, সমস্ত ময়দানে বোধ হয় একটিও মাছি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, এবং দল হইতে নির্ব্বাচিত হরামিদের কৃপায় রাস্তা ঘাট, পুষ্করিণীগুলি ও ছোট ছোট সাঁকোগুলি ভদ্রসাধারণের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল। পূর্ত্ত বিভাগের জন্য ও পাকশালার ন্যায় ১০জন করিয়া যুবককে নিযুক্ত করা হইত।

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের Squad drill বা প্রাথমিক কাওয়াজ প্রায় ১৫দিন ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হয়, কিরূপভাবে সোজা হাঁটিতে হয়, এবং শ্রেণীটী সর্ব্বদাই সরল রেখায় রাখিতে হয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইল। ব্যায়ামের জন্য প্রতিদিন প্রায় আধঘণ্টা করিয়া ডবলমার্চ্চ বা দৌড়াইবার ব্যবস্থা করা হইল। ড্রিল আরম্ভ হইবার প্রথম দিনই কর্ণেল নট্ আসিয়া ড্রিল শিক্ষার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না সত্য, কিন্তু তোমরা যে কার্য্যের জন্য যাইতেছ, তাহাতেও ড্রিল শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ড্রিলের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে একত্রে বহুলোক নিয়মাবদ্ধ ও শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে কার্য্য করিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং আদেশানুবর্ত্তিতা বা discipline সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো। Squad drill শিক্ষা করিতে যে সময় লাগিয়াছিল তাহার মধ্যেই আমাদের দলের ৬৪জন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আলিপুরে আসিবার ৫।৬ দিনের মধ্যেই পুলিসকোর্টের উকীল অমরেন্দ্রনাথ চম্পাটী আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করেন। ইঁহার আগমনে আমাদের দলে একটা নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। সকলকে উৎসাহ দিতে, মন প্রফুল্ল রাখিতে ও কর্ম্মে তৎপরতা দেখাইতে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

Squad drill শেষ হইয়া যাইবার পর আমাদের
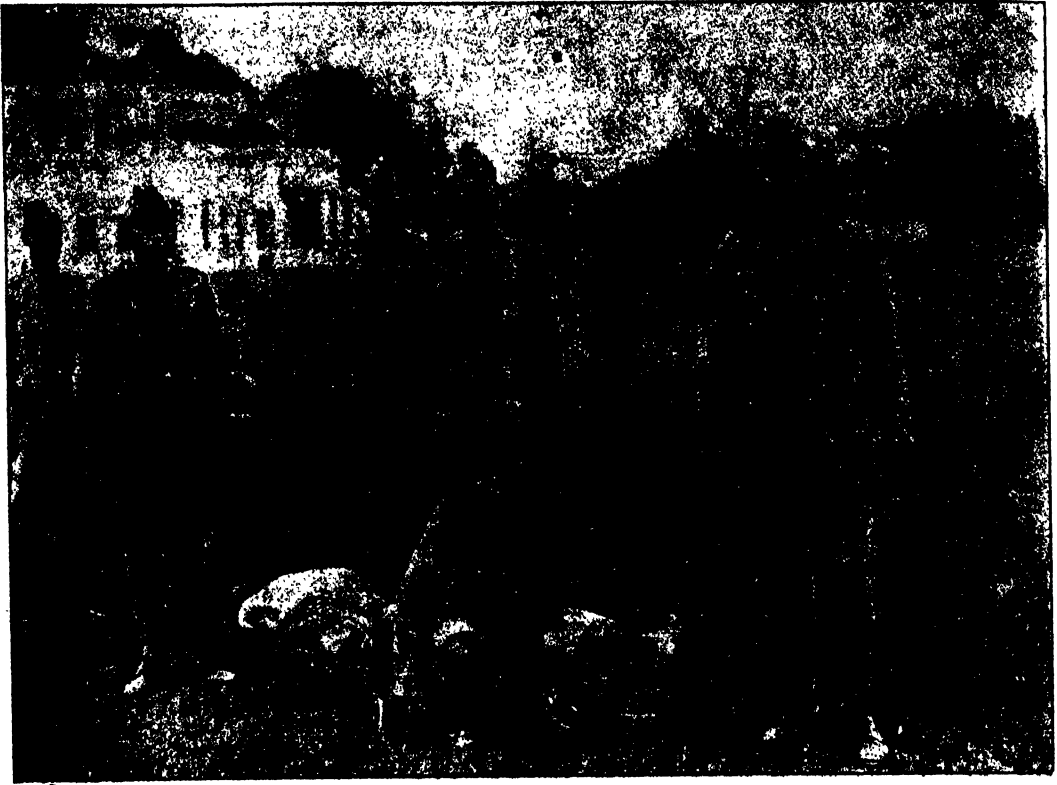
"Lift Stretcher" (খাটিয়া তোল)

Section drill, strecher drill, Company drill প্রভৃতি আরম্ভ হয়। প্রথম কয়েকদিন রাজপুত সৈন্যদের মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন তারাপোরওয়ালা আসিয়া নিজে আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল শিক্ষা দিতেন এবং পরে ইহার জন্য আর একজন বিশেষ হাবিলদার নিযুক্ত হয়। প্রতিদিন ৭টা ৭॥০টার সময় কর্ণেল সাহেব আমাদের ড্রিলের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তাহার পর অর্ডারলি অফিসার, অর্ডারলি এন-সি-ও প্রভৃতির সহিত ব্যারাক দেখিতে যাইতেন। নিয়ম ছিল যে ড্রিলে যাইবার পূর্ব্বেই সকলে বিছানা রৌদ্রে দিয়া অথবা বৃষ্টি হইলে খাটিয়ার উপর নিয়মমত ভাঁজ করিয়া রাখিয়া যাইবে, তাহার পর অর্ডারলি এন-সি-ও-রা কার্য্য পরিচালক হাবিলদার মেথর দিয়া ব্যারাক গুলি ধুইয়া পুঁছিয়া ঠিক করিয়া রাখিবে। দুইজন করিয়া ব্যারাক রুম পাহারা দিবার জন্য থাকিবে। যাহাদের কিচেন ডিউটি পড়িয়াছে তাহারা যথাসময়ে পাকের আয়োজন করিবে। পূর্ত্তবিভাগের লোকারাও এই সময় রাস্তা পরিষ্কার, রাস্তা বাঁধান, পুষ্করিণীর কচুগাছ ও পানা উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করিত। অর্ডারলি এন-সি-ওকে দেখিতে হইত যে ইনফ্যান্ট্রি লাইন্‌সের স্বাস্থ্য বিভাগের লোকেরা আসিয়া ঠিক সময়মত আবর্জ্জনার স্তূপ স্থানান্তরিত ও পায়খানায় ফিনাইল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করে কি না। প্রথমতঃ কর্ণেল নট প্রতিদিন নিজে পরীক্ষা করিয়া অথবা অর্ডারলি অফিসরের নিকট রিপোর্ট শুনিয়া, সেই দিনকার ভৃত্যদের দ্বারা ক্রীত মাছ ডিম প্রভৃতি ব্যবহার-যোগ্য কি না বিবেচনা করিতেন. কয়েকদিন পচা মাছ, পচা ডিম প্রভৃতি ধরা পড়ায় শেষে কিচেন ডিউটী ওয়ালা-দেরই একজনকে বাজারে যাইয়া সমস্ত জিনিষ ক্রয় করিতে হইত। তাহার পর ষ্টোর অর্থাৎ যেখানে মাসের

ব্যবহার্য্য ময়দা ঘি, সুজী, চিনি প্রভৃতি থাকে তাহা দেখিয়া, প্রায় ৯টার সময় পুনরায় ময়দানে যাইয়া কিছুক্ষণ আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল দেখিতেন এবং পরে ডিসমিসের হুকুম হইত।

প্রতিদিন যাহারা অসুস্থ হইত তাহারা ড্রিল আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই sick parade (অসুস্থ কাওয়াজ) এ সমবেত হইলে যাহার যেরূপ অসুখ সেইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইত, এবং যাহারা বিনা অজুহাতে ড্রিলে যাইতে অনিচ্ছুক তাহাদের ড্রিল করিতে আদেশ দেওয়া হইত।

ড্রিলের ব্যাপারটী যত সহজে লিপিবদ্ধ করিলাম, ঠিক সে সময় ততটা সহজ বোধ হইত না। সার বাঁধিয়া দাঁড়াইবার পরই যে আধঘণ্টা ধরিয়া "ডবল"এর আদেশ হইত, তাহাতে প্রথম প্রথম বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডও ভীষণ বেগে ডবল করিতে আরম্ভ করিত। কেহ বা সূর্য্যরশ্মি মসীবৎ দেখিতেন, কেহ বা চক্ষের সম্মুখে শর্ষপ পুষ্পের নৃত্য দেখিতে পাইতেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা হইত অবশ্য ড্রিল ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, ড্রিলের সময় টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিবার যো ছিল না। যতক্ষণ না stand easy (ষ্ট্যাণ্ড ঈজি) হুকুম হইতেছে ততক্ষণ কেহ রুমাল বাহির করিয়া ঘাম পর্য্যন্ত মুছিতে পারিত না। এবং কেহ পিছাইয়া পড়িলেই পিছন হইতে হাবিলদারদের অথবা কর্ণেল সাহেবের dress up, dress up শব্দ ঘাড়ে ধরিয়া স্বস্থানে ঠেলিয়া দিত। এই ডবল মার্চ্চের পর প্রায় ৫ মিনিট ষ্ট্যাণ্ড ঈজির হুকুম হইত এবং কর্ণেল উপস্থিত না থাকিলে রাজপুত হাবিলদারেরা দুই একটা গল্পগুজব ও রসিকতাও করিত।

তাহার পর সোজা হাঁটাও এক দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত। আমরা বাঙ্গালী, রাস্তায় হাঁটার সময় এত সোজাসুজির ধার ধারি না। রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইলে অথবা সাইকেলে চড়িয়া রাস্তায় আসিলে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আপনারা সকলেই দেখিবেন যাহারা হাঁটিতেছে, একবার রাস্তার বামে একবার রাস্তার ডাহিনে এইরূপ করিয়া হাঁটিতেছে। অর্থাৎ এক মাইল হাঁটিতে হইলে প্রতি বাঙ্গালী ২ মাইল করিয়া হাঁটে। যাহা হউক ইনফ্যান্ট্রি ট্রেনিংএর নির্দ্দেশ মত, সকলেই মার্চ্চ করিবার সময় মার্চ্চে দুইটী point ঠিক করিয়া লইতাম। এইরূপে ক্রমে ব্যাপারটী সোজা হইয়া গেল।

ফর্ম্ম ফোর্সের প্যাঁচ বুঝিতে বুঝিতে আমাদের ড্রিল শিক্ষার একমাস অতীত গেল, এবং আমরা company drill এর উপযুক্ত বিবেচিত হইলাম। রাজপুত হাবিলদারের এবং ক্যাপ্টেন তারাপোরওয়ালার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, অন্য কোন পল্টনের লোক তিন মাসের কায এইরূপে একমাসে শিখিতে পারে না। ড্রিল শিক্ষার দ্রুততার জন্য পরে বাঙ্গালী রেজিমেণ্টও সুনাম লাভ করিয়াছিল।

কর্ম্মচারীদের প্রাতঃকালীন কার্য্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কতকগুলি নূতন শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। সে গুলির বিস্তারিত বিবরণ এইখানে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়। মাসখানেক ড্রিল শিক্ষার পর প্রতি দশজন লোকের উপর কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া এক একজন non commissioned officer নিযুক্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে এক একজন প্রতি দিনের কার্য্যানুষ্ঠান গুলির তত্ত্বাবধান করিতে নিযুক্ত হইত। ইহাদিগকেই Orderly N. C. O. অথবা N. C. O. of the day বলা হইত। যে চারিজন ডাক্তারকে লেফটেনেণ্ট পদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ রসদ বিভাগ, কেহ শিক্ষা বিভাগ, কেহ অফিস ও কেহ শরীরতত্ত্ব (Physiology) প্রভৃতির সম্বন্ধে কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীতও ইঁহাদের প্রত্যেককে একদিন করিয়া সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। ইঁহাদের নাম ছিল Orderly officer বা Officer of the day। ইহা ব্যতীত চারি জন সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনকে জমাদারের পদ দেওয়া হইয়াছিল। ইঁহারাও ড্রিলের সময় উপস্থিত থাকিতেন এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রভৃতি শিখাইতেন।

প্রথমে কর্ণেলের আদেশ মত লেফ্‌টেনেণ্ট এবং জমাদারেরাও আমাদের সহিত ড্রিল শিখিতেন। পরে শুধু জমাদারেরাই শিখিতেন, লেফ্‌টেনেণ্টরা তাঁহাদের মেস্‌কোটে শিখিতেন। যখন Company drill আরম্ভ হয়, তখন কর্ণেল আদেশ করিলেন যে অর্ডারলি অফিসরকে প্রতিদিন কিছুক্ষণ করিয়া প্যারেড লইতে হইবে। লেফ্‌টেনেণ্ট যখন প্যারেড লইতেন তখন মধ্যে মধ্যে হাস্যকর ঘটনার আবির্ভাব হইত। কর্ণেল ক্রুদ্ধস্বরে তিরস্কার করিতেছেন এবং লেফ্‌টেনেণ্ট তুবড়ির মত ইংরাজীতে তাঁহার দোষ সামালের চেষ্টা করিতেছেন, এ ঘটনা প্রায়ই হইত।

প্রাতঃকালীন ড্রিল প্রায়ই ৯ ঘটিকার সময় শেষ হইত। যে দিন রুট (Route) মার্চ্চ বা লম্বা কুচ হইত সেই দিন ইহার কিছু পরেও হইত।

কিছু বিশ্রামের পর স্নানের পালা। ব্যারাকের নিকটেই একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। সেখানে আমাদের স্নান হইত। যাহারা সাঁতার জানে না তাহাদের জন্য Swimming belts (বা সাঁতার শিক্ষা ভিস্তি) ছিল, ইহা ব্যবহার করিয়া, যাহারা সাঁতার দিতে জানিত না তাহারা একপক্ষ কালের ভিতরেই বেশ সাঁতার শিখিয়াছিল। যাহারা সাঁতার জানিত, তাহাদের জন্য Water polo খেলার বন্দোবস্ত ছিল।

১০—৩০ মিঃ সময় খাবারের ঘণ্টা পড়িত। সকলে নিজ নিজ সেকসন মত আহার করিত। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান প্রভৃতি পৃথক বসিয়া আহার করিতে চাহিত, কিন্তু এ ভাবটী বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং মেসোপটেমিয়ার Stationary হাঁসপাতালে আমাদের কিচেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিল পরম বন্ধু আবদুল হায়েত। আহারের ব্যবস্থা বাঙ্গালী প্রথা মতই হইয়াছিল। নিজেদের হাতে বন্দোবস্তের ভার থাকায় জন প্রতি দৈনিক যে ৷৶৹ দশ আনা নির্দ্দিষ্ট ছিল, আমরা তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট আহারই পাইতাম। মধ্যে কর্ণেল বলিয়াছিলেন যে ফিল্ডে অনেক সময় তোমাদের শুধু আটা দেওয়া হইবে। অতএব এখন হইতেই চাপাটী খাইতে অভ্যাস কর। কয়েক রাত্রি আটার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কিন্তু চাপাটি

'Halt" (থামো)
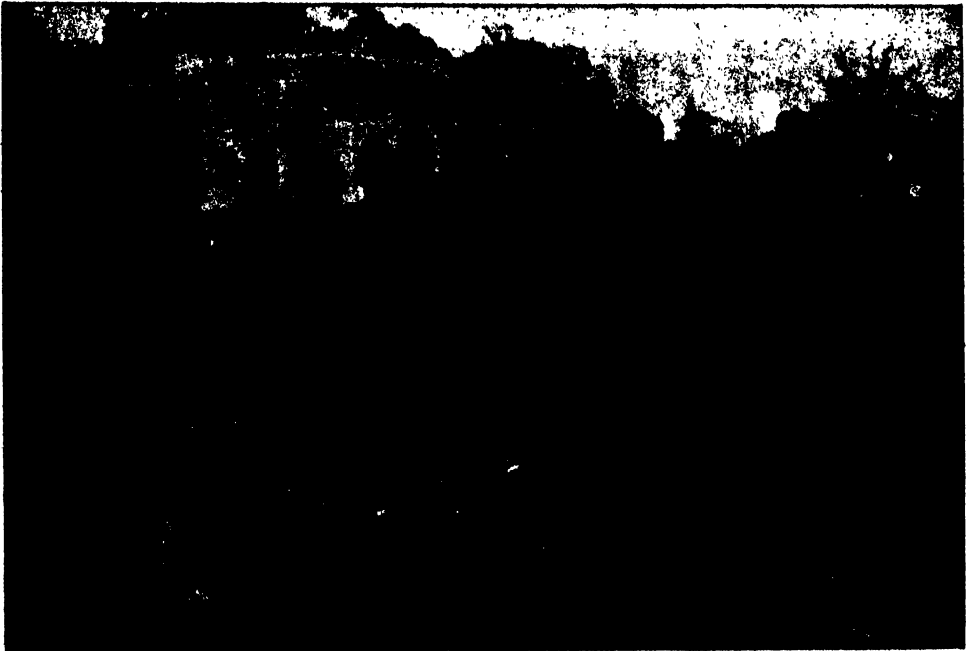
প্রস্তুতের গুণেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক অনেকেরই উদরাময় হওয়াতে, কলিকাতায় অন্ততঃ আটা বন্ধ করা হইয়াছিল। এই স্থানে বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সর্ব্ব অবস্থাতেই জাতীয় আহারই স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মেসোপটেমিয়ায় দেখিয়াছি গুর্খা ও মান্দ্রাজী পল্টনদিগকে পারত পক্ষে কখনও আটা দেওয়া হইত না। কয়েক দিন আটা খাইয়া একটী গুর্খা কোম্পানির অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

যাহা হউক, একমাস পর সকলের ওজন লইয়া ডাঃ সর্ব্বাধিকারী দেখিলেন যে যাহারা দুর্ব্বলকায় ছিল, তাহারা সকলেই ওজনে বাড়িয়াছে। এবং যাহারা অতিস্থূল ছিল তাহারা অনেকটা মেদমুক্ত হইয়াছে। শ্রীমান্ রণদাপ্রসাদ ৫ সের ওজনে বাড়িয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নকাল।

প্রথম প্রায় দুই সপ্তাহ,আহারের পর মধ্যাহ্নে আমাদের ছুটী ছিল। কিন্তু তাহার পর, ১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মেসকোটের আফিস গৃহে সমবেত হইয়া আমাদের শরীর-তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে হইত। একটী কঙ্কাল ও খান চার পাঁচেক মানচিত্রের দ্বারা শরীরের গ্রন্থি, অস্থি শিরা, ধমনী ও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যাদি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। মাননীয় কর্ণেল নট বক্তৃতা দিতেন ও প্রতিদিন বক্তৃতান্তে সে দিন কি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল তাহার সার মর্ম্ম বলিবার জন্য এক একজনকে উঠিতে বলিতেন। এই ব্যবস্থার গুণে ভাতের যে নিদ্রাগুণ আছে তাহা অনেক সময় জোর করিয়া অস্বীকার করিয়া, তিনি যাহা বলিতেন তাহা শুনিতে হইত। কর্ণেল নট চলিয়া যাইলে, যাহারা ইংরাজী ভাল বুঝেনা তাহাদের জন্য লেফ্‌টেনেণ্ট গুপ্ত বাংলায় বক্তৃতা করিতেন।

যে কঙ্কালটী আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আনা হইয়াছিল, সেটী অতি দীর্ঘাকৃতি ছিল এবং এ সম্বন্ধে একটী গল্প আমাদের ভিতরে চলিত ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের রাত্রে পাহারা দিতে হইত। চারিজন করিয়া মেস কোটে পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইত। মধ্যে মেসকোট হইতে মূল্যবান একটী ডাক্তারি যন্ত্র চুরি যাওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদিন আবদুল্লা হায়েতের পাহারা দিবার পালা আসে, রাত্রি ১২টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত। হল ঘরের নিকটে সিঁড়ির নিকট পায়চারি করিয়া পাহারা দিতে হইত। রাত্রি প্রায় ১২॥ টার সময় হায়েত ভায়ার মনে হইল যে হলঘরে সেই কঙ্কালটী আছে। ইহা মনে হওয়া অবধি সে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। সে আমাদের কাছে পরে বলিয়াছিল যে, তাহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যদি বদখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কঙ্কালটা তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কি করিয়া Halt who comes there ডাকিবে? অনেক বিবেচনার পর সে লণ্ঠন হাতে ঘরে প্রবেশ করিয়া, দড়ি দিয়া কঙ্কালটাকে শক্ত করিয়া খুঁটার সহিত বাঁধিয়া, তাহার গতিহীনতার বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া পরে পাহারা আরম্ভ করিল।

ফিজিওলজির লেকচার শেষ হইয়া গেলে First aid to injured (আহত ব্যক্তির প্রাথমিক শুশ্রূষা) সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ হইল। কর্ণেল নট নিজে জল-নিমজ্জিত ও সর্দ্দিগর্ম্মি আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা প্রণালী শিখাইলেন। পুলিশ ট্রেণিং কলেজের একজন ডাক্তার আসিয়া শরীরের কোন্ কোন্ স্থান আহত হইলে কিরূপ ভাবে রক্তস্রাব নিবারণের জন্য পটি বাঁধিতে হয় তাহা শিখাইলেন। অ্যাম্বুলান্স দলের প্রধান কার্য্যই হইতেছে, আহত ব্যক্তিদের রক্ত নির্গমন বন্ধ করা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে লিখিব। রুমালের ব্যাণ্ডেজ, ফিতার ব্যাণ্ডেজ, Splints এর ব্যবহার এবং একটার অভাব অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে কিরূপে পূরণ করিতে হয় প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এই শিক্ষার মধ্যে সজীব অভিনয় চলিত। মাঠের মধ্যে কয়েক জনকে শোয়াইয়া রাখা হইত, প্রত্যেকের বোতামে যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রথামত এক একটী ট্যালি মার্ক বা টিকিটে

ডাক্তারেরা লিখিয়া দিয়াছেন কাহার কি স্থানে জখম হইয়াছে। আমাদের হাবিলদারেরা হুকুম দিত Collect woodent advance (তাহারা wounded কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিত না।) আমাদিগকে তাহাদের নিকট গিয়া সেই টিকিট দেখিয়া যথাস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ড্রেসিং ষ্টেসনে উপস্থিত করিতে হইত।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শিক্ষা শেষ হইয়া যাইবার কিছু পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে যাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা হইত। সেখানে প্রায়ই একটী ইংরাজ নার্সের দলের সহিত দেখা হইত। ইঁহারাও স্বেচ্ছাসেবিকার কার্য্যের জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন।

ইহার পর হাইজিন, স্যানিটেশন প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ হয়। শিবির সন্নিবেশ কিরূপ স্থানে কিরূপ প্রণালীতে করা উচিত, যুদ্ধক্ষেত্রে জল বহির্গমনের বন্দোবস্ত ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, নদীর জল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় প্রভৃতি এই সময়কার বক্তৃতার বিষয়ীভূত ছিল।

ইহার মধ্যে একদিন মধ্যাহ্নকালে আমাদের ইউনিফর্ম্ম বিতরিত হইল। পূর্ব্বে যেগুলি দেওয়া হইয়াছিল, সে-গুলি ব্যারাকপুরের এক দেশীয় সিপাহীর দলের নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের চেহারার হাস্যজনক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, পরে দর্জ্জি ডাকিয়া প্রত্যেকের শরীরের মাপ লইয়া পোষাক তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের পোষাক তখন হইল ফেটিগ ক্যাপ নামক বাঁকান টুপি, Tunic, Shirts, Shorts, Boots এবং Puttis। পরে অনেক লেখা-লেখির পর ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদের মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্ম Gurkha Hat বা Bushranger Hatএর ব্যবস্থা করেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল আমাদের পাগড়ী দেওয়া হইবে। বাঙ্গালী পাগড়ীতে অভ্যস্ত নয় বলিয়া দলের সকলে আপত্তি করায় এই টুপির নির্দ্দেশ হইল। এই নজিরেই ইহার পর বাঙ্গালী পল্টনের জন্তও এই টুপি দেওয়া হয়।

ইউনিফর্ম্ম পাওয়ার পর হইতে আমাদের দৈনন্দি[illegible] কায বাড়িয়া গেল। প্যারেডের সময় ঝকঝকে বোতা[illegible] ও চকচকে বুট না হইলে শাস্তি পাইতে হইত, দাড়ি না কামাইলে তো কথাই নাই। যাহাদের পূর্ব্ব হইতে French cut দাড়ী ছিল তাহাদের অবশ্য কামাইতে হইত না।

মধ্যাহ্নে শিক্ষার আর এক পর্য্যায় ছিল ব্যারাক রুমে রাজপুত শিক্ষকেরা আসিয়া কিরূপে পটি বাঁধিতে হ[illegible] রুট মার্চ্চের সময় কি নিয়ম অনুসারে চলিলে পায়ে ফো[illegible] পড়ে না প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিত। তাহার [illegible] বাঁশির সঙ্কেত শিখান হইত, কি ধ্বনির কিরূপ [illegible] ইত্যাদি। আর একটী বিষয় ছিল বন্দুক ভর্ত্তি ক[illegible] শিক্ষা। যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের বন্দুক প্রভৃ[illegible] নাড়িতে চাড়িতে হইবে, সে জন্ম পাছে ভর্ত্তি বন্দু[illegible] গুলি ছুটিয়া কাহাকেও আঘাত করে সেই জন্য [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা। এই সুযোগে অল্পবয়স্ক কয়েক [illegible] হাবিলদারের নিকট বন্দুকের ড্রিল শিখিত।

রাজপুত হাবিলদারগুলি অতিশয় ভদ্র ও স[illegible] স্বভাবের ছিল। হাবিলদার বাঘ সিং ভদ্রবংশের [illegible] ও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। সে আমাদের নিকট ইংর[illegible] শিখিত এবং আমাদের শিক্ষা ও শারীরিক [illegible] প্রভৃতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিত। হাবিলদার [illegible] সিং একটু বয়স্থ লোক, সে আমাদের ষ্ট্রেচার ড্রিল শি[illegible] দিত। ইহারা দুজনেই আমাদের সহিত মেসোপটে[illegible] গিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সে[illegible]

বঙ্গের নাট্যশালা।

(বিগত ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সাল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুটে বঙ্গীয় নাট্যশালার অর্দ্ধশতাব্দ জন্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ)

মহাকালের জটাকলাপ নিস্যন্দিনী জাহ্নবীর অমৃতোপম পূতধারা একদিন যেমন ব্রহ্মশাপবিদগ্ধ সগরসন্তানগণের মুক্তির উপায় করিয়া দিয়াছিল, তেমনি আর এক দিন ঋষির অনুকম্পায় স্বর্গ হইতে সমাহৃত নন্দন-বন-মধুকল্প নাট্যকলা এই পুণ্যক্ষেত্র ভারত ক্ষেত্রে সমানীত হইয়া আজিও তাপদগ্ধ মানব জীবনের ক্ষতজ্বালার উপরে অমৃতলেপের কার্য্য করিতেছে। ভরত মুনির দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কে জানে? যুগে যুগে এই সুকুমার নাট্যকলা তত্তৎকালোচিত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া দর্শকের চিত্তে নিরতিশয় আনন্দ বিধান করিয়াছে ইহা নিঃসংশয়ে অনুমান করা যাইতে পারে, নতুবা অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীর চরিত, উত্তররামচরিত বিক্রমোর্ব্বশী, নাগানন্দ, চণ্ডকৌশিক, বেণীসংহার, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সমন্বিত নাটক নাটিকা, ত্রোটক প্রকরণাদি লিখিত হইতে পারিত কিনা, সন্দেহ। কলাপটু অভিনেতার অস্তিত্ব না থাকিলে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রকের মনে নাটক রচনার প্রবৃত্তি জন্মিত কিনা সন্দেহ, সুতরাং ভগবতী ভারতীর মণিমন্দিরের একদেশ অন্ধকারাচ্ছন্নই রহিয়া যাইত। কলাকুশল নটশ্রেষ্ঠগণের অভাবে কেবল সাহিত্যশিল্পিদিগের সুবর্ণ লেখনিগুলি স্তব্ধ হইয়া থাকিত তাহাই নহে, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যখন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই রঙ্গমঞ্চের সহায়তায়, কলাপটু নটের অভিনয় কৌশলে সমস্ত উপপ্লবের শান্তি হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী, এবং বর্ত্তমানে দেশ বিদেশে তাহার বহু উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে।

চীন সাম্রাজ্যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব কোন্ সময়ে হইয়াছে সে ইতিহাস আমি অবগত নহি। মিশর রাজ্যে অভিনয় কলা কৌশল দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন এবং হিতসাধন কবে হইতে আরম্ভ হয় তাহাও বোধ করি বিশেষ বিচার এবং গবেষণা-সাপেক্ষ। ভরত মুনির দিনে অভিনয় সাধারণের দৃষ্টির সমক্ষে হইত কিংবা তপোবনের নেপথ্যে, অথবা রাজপ্রাসাদের মণিকুটিমে কিংবা প্রাকার-পরিবেষ্টিত শুদ্ধান্তঃপুরে হইত তাহা বলিতে পারি না; তবে কালিদাসাদির সময়ে রাজ্যের সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকল্পে অভিনয়াদি অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভরত বাক্যে বোধ করি তাহার ইঙ্গিত পাইতে পারি—"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্" বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। রাজাকে প্রজাপুঞ্জের হিতানুষ্ঠানে চেষ্টিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, সরস্বতীর সমৃদ্ধি হীনতাপ্রাপ্ত না হয় তাহার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, যুগে যুগে কালে, কালে, রঙ্গমঞ্চের উপরে কলানিপুণ নটগণের কৃতিত্বের সহায়তা গ্রহণ করিয়া সমাজের নানাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াই থাকিবে।

যখন ভারতের গৌরব-সূর্য্য অস্তশিখরীর অন্তরালে ডুবিয়া গেল, সর্ব্বপ্রকার অগৌরবের অন্ধকারে যখন ভারতবাসী চেতনাবিহীন মূর্চ্ছার মধ্যে অসাড় ও মৃতকল্প, তখন আমরা সমস্তই হারাইলাম। নাট্য, নাটক, নট কিছুই আর রহিল না। তাহার পরে যখন অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন পূর্ণ হইল, পশ্চিমের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যখন তাহার পরিপূর্ণ তেজে প্রাচী দিগ্‌বিভাগকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, প্রতীচির কাব্য, নাটক, নট যখন আমরা দেখিতে পাইলাম, তখন আমাদের মূর্চ্ছাপ-

হত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল। শেক্সপিয়রের অমর নাটকাবলী পাঠ করিয়া, রিচার্ডসন, ডিরোজিও প্রভৃতি আচার্য্যগণের অধ্যাপনাগুণে সুকুমার নাট্যকলার অনুশীলনের জন্য বাঙ্গলার যুবকবৃন্দের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভারতীয় কলানৈপুণ্যের গৌরবান্বিত দিনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইলাম। ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার বিঘ্ন বাধা প্রচুর, বিশেষতঃ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া সাফল্য লাভ দারিদ্র্যনিপীড়িত মধ্যবিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণের পক্ষে সহজ কথা নহে—"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দারিদ্র্যাণাং মনোরথাঃ" প্রভৃতি শ্লোক বহু অভিজ্ঞতারই ফল। নাট্য-প্রিয় ধনিসন্তানের অর্থানুকূল্যে সুকুমার অভিনয় কলার চর্চ্চা যাঁহারা আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগকে কত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ দুর্দ্দৈব, অবসাদ নিরাশার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহা তাঁহারাই জানিতেন। বহু সখের সম্প্রদায় সংগঠিত হইল ও ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয়ের অদম্য উৎসাহে যে সকল শিক্ষিত যুবক প্রাণপণে নাট্যকৌশলে কুশলী হইয়াছিলেন, অভিনয়োপ-যোগী উৎকৃষ্ট নাটকের অভাবে তাঁহাদের কলানৈপুণ্য দেখাইবার অবসর মিলিত না এইরূপে বহুকাল কাটিয়া গেল। যে সকল ধনিসন্তান অর্থানুকূল্যে অভিনয়ের সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা সহায় না হইলে সখের সম্প্রদায় গঠিত হইত না, সখের দল না হইলে আজ যে সাধারণ রঙ্গালয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা সমবেত হইয়াছি তাহা সম্ভব হইত কি না, সর্ব্ব কার্য্য-কারণের নিয়ামক যিনি তিনিই তাহা জানেন। কিন্তু অল্প সংখ্যকের সহায়তায় যে কার্য্য হয় তাহা স্থায়ী হওয়া কঠিন ইহাই বিবেচনা করিয়া এবং বহু ব্যয়সাধ্য অভি-নয় ব্যাপারের খরচ সঙ্কুলানের নিমিত্ত, যাঁহারা সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা সমগ্র জাতির হৃদয়োত্থিত অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার একান্ত অধিকারী। একদিন ছিল যখন ক্রমে ক্রমে অভিনয়পটু নটের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু দীনবন্ধু এবং মধুসূদনের কয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত অভিনয়োপযোগী নাটকের একান্ত অভাব অনুভূত হইল। অভাব এমনই সামগ্রী যে তাহা একবার অনুভব করিলে তাহার পূরণ করিবার চেষ্টা মানুষ না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চেষ্টার ফল হইবেই ইহাও স্বাভাবিক। তাই দিনে দিনে বঙ্গ-ভারতীর নাট্য-সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরাণ-সমুদ্র-মন্থনোত্থিত অমৃতের পরিবেষণে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং অমর হইয়াছেন এবং বঙ্গ ভারতীর সাহিত্য ভাণ্ডারের একদেশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; অমৃতের লেখনিমুখে কখনও অমৃত নিস্যন্দিত হইয়াছে, কখনও বা হলাহল উদ্গীর্ণ হইয়া সর্ব্ব সম্পূর্ণ লক্ষণোপেত সন্নিপাতগ্রস্ত মুমূর্ষু সমাজের বিনষ্ট চৈতন্যকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় অমৃতেরই ন্যায় কার্য্য করিয়াছে; বীরত্বের রঙ্গভূমি রাজ-স্থানের ঐতিহাসবিশ্রুত রাজপুত রাজন্যবর্গের বলবীর্য্যের কাহিনী দ্বিজেন্দ্রের স্বর্ণলেখনিমুখে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়াছে; মোগলের রঙ্গমহলে নূরমহল এবং শাহাজাদী জাহানারার অপ্রতিহত প্রভাবের আলেখ্য দ্বিজেন্দ্রেরই তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে; প্রতাপ এবং দুর্গাদাসের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহারই প্রোজ্জ্বল প্রতিভার অমলিন ছবি। সুতরাং সুকুমার নাট্যকলার অনুশীলনে যাঁহারা স্বীয় শক্তিকে সমগ্রভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বতঃ পরতঃ বঙ্গসরস্বতীর সাহিত্য ভাণ্ডারের অভাব পরিপূরণকল্পেই জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

আজি হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে প্রথম রজনীতে যাঁহারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সৎসাহসের কতদূর পরিচয় দিয়াছিলেন, কত ক্ষোভেই তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে, কত ক্ষতিই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, এতকাল পরে আজ তাহার যথাযথ পরিমাপ একান্ত দুঃসাধ্য, অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই উপলক্ষে রঙ্গ রহস্য, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জন্য সেদিনে কত গীত, কত ছড়া, কত পাঁচালীই রচিত হইয়াছে, কত অন্তরঙ্গ আবাল্য বন্ধুর একান্ত বেদনাময় চির-বিচ্ছেদ

তাঁহাদিগকে সাশ্রুনয়নে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় কি আজ আছে? সেই সকল মহানুভব মহাশয়জনের স্বার্থত্যাগের, সাধারণের মঙ্গল-যজ্ঞ-বেদিকায় আত্মাহুতি প্রদানের ফল হইয়াছে, বঙ্গনাট্য সাহিত্যের উন্মেষ, সুকুমার নাট্যকলার উৎকর্ষ এবং চিত্রশিল্পের বিকাশ ও উন্নতি।

১২৭৯ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণের রজনীমুখে যাঁহারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত সকলেই আজ লোকান্তরে; চির-অনাবিষ্কৃত নেপথ্যস্থিত যে নটরাজের ইচ্ছায় এবং ইঙ্গিতে আমরা এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে নিজ নিজ ভূমিকার যথাসাধ্য অভিনয় করিয়া থাকি, তাঁহারই অমোঘ বিধানে সে দিনের প্রায় সকলগুলি মহাজনকেই আমরা হারাইয়াছি—তাঁহাদের ক্ষণবিধ্বংসি-শরীর আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আর নাই। কিন্তু আমাদের মনের সম্মুখে কল্পান্তস্থায়ী তাঁহাদের গুণাবলী জাজ্জল্যমান রহিয়াছে; সেই কথা স্মরণ করিয়া এই অভিনন্দন সভায় সমবেত সজ্জন মণ্ডলীর শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তাঁহাদের উদ্দেশে আজ আমরা ঊর্দ্ধে প্রেরণ করিতেছি, এবং অমৃতের যে শুদ্ধ শুভ্র তাপসমূর্ত্তি আমাদের সৌভাগ্যবলে এই সভায় জীবন্ত সমাসীন, তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষেরও ঊর্দ্ধকালব্যাপী একনিষ্ঠ তপশ্চরণের জন্য, তাঁহার আধিব্যাধিবিহীন অপরিম্লান শতায়ুঃ কামনা করিতেছি। যে অঘটন-ঘটন-পটু আনন্দময় নটরাজের করধৃত রজ্জুর ইঙ্গিতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব চিরনৃত্যরঙ্গে চলচঞ্চল, তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চগুলি আনন্দ কলরবে চিরমুখর হইয়া থাকুক, বঙ্গের কলাপটু নটসঙ্ঘ সর্ব্বদুঃখাতিগ হইয়া আনন্দে অবস্থিত হউক, বঙ্গের উপচীয়মান নাট্য সাহিত্য পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গ-সরস্বতীর অপরিম্লান যশোরশ্মি দিগ্‌দিগন্তে বিকীরিত করুক—

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ধুবিয়োগ

ভোরের বেলাতেই একটু আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইবামাত্র অশোক একটুও বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি শরৎদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্তরাত্রি যন্ত্রণাভোগ ও অনিদ্রায় শরতের মুখখানা অত্যন্ত পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। সমস্ত শরীরটার কে যেন নাড়া দিয়া দিয়া একেবারে অবসন্ন করিয়া দিয়াছে। অশোক ঘরে ঢুকিতে শরৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাত দিয়া শুধু আসনখানা দেখাইয়া দিল।

'কেমন আছ?' প্রশ্নটা আজ যেন মুখে বাধিয়া গেল।

স্ত্রীর সঙ্গে সেই সাক্ষাতে শরৎকে যেন সেই দিনেই মরণের দিকে অনেকখানি পথ অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। তারপর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে শরৎ এমন যায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখান হইতে মরণের দেশের তুষার-শীতল বাতাস মৃত্যুদূতেরই মত আহ্বান করিয়া লয়। ডাক্তারেরা তিন দিন পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, আর আশা তো নাই-ই, চেষ্টাও বৃথা। কবিরাজ কাল ভিজিট ও ঔষধের দাম শোধ করিয়া লইয়া বলিয়া গিয়াছেন,—আর সপ্তাহখানেক আগে হইলেও চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত; একেবারে নাভিশ্বাসের

পর ডাকিলে আর আয়ুর্ব্বেদের কি করিবে? ভাঙ্গা নৌকা ভরিয়া এক নৌকা জল উঠিলে তাহাকে কূলের কাছে তুলিতে পারে এমন মাঝি কয়জন আছে?

অশোক আসনে না বসিয়া শরতের বিছানার উপরে মাথার কাছটিতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আজ কি বেশী কষ্ট হচ্চে শরৎ?"

শরৎ একটু যেন হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"আগের মত নয়। এবার কষ্ট শেষ হয়ে আসছে।"

অশোক বড় দুঃখে আজ চুপ করিয়া গেল। আর একটুপরে শরৎ বলিল, "দেখ অশোক, নতুন যায়গায় যাবার আগে যেমন একটু আনন্দ অথচ কেমন একটা বেদনা বোধ হয়, বুকের মধ্যেটায় কি রকম করে—কাল থেকে তেমনি হচ্চে। আজ সকালে এদিকটায় সরে এসে শুয়ে শুয়ে জানালার গরাদে দুটো দুহাতে ধরে বাইরের বাতাস ও খোলা আকাশটার পানে তাকিয়ে কেবলি মনে হচ্ছিল—এই জীর্ণ লোহা দুটো ভেঙ্গে মুক্ত আকাশের পানে ছুটে চলে যাই। আমার ভিতরকার প্রাণটায়ও আজ ঠিক এই অবস্থা। এই শীর্ণ দেহের জীর্ণ হাড়ক'খানা ধরে সেও আজ ভাব্‌ছে—তার এই ২২ বছরের ঘর খানাকে ভেঙ্গে ফেলে সেও ঐ আকাশের শীতল মেঘটার পানে ছুটে যায়।"

অশোক এবার একটু অনুযোগের স্বরে বলিল,—"ওসব কথা এখন কেন শরৎ?"

শরৎ একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—"এখন যদি না বলি ভাই, আর তো সময় হবে না।"

তার পর হঠাৎ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—"আর কপটতা কেন ভাই? এখন যদি তোমার মেডিকেল কলেজের প্রিন্‌সিপাল সাহেব এসে বলেন—তুমি বাঁচবে ভয় নেই; তাহলেও আমি আর সেকথা বিশ্বাস করিনে।"

তারপর বাহিরের দিকটায় একদৃষ্টে চাহিয়া শরৎ যেন আপন মনেই অতি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"এ যে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছি। আর কি কারো কথা শুনি? এ তো আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া নয়, যেন মনে হচ্চে রাতের প্রদীপজ্বালা ঘর থেকে বেরিয়ে ভোরের আলোভরা বাইরের দিকে চলেছি।"

অশোক ব্যাকুলভাবে শরতের শীর্ণ বামহস্তখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—"শরৎ, ওরকম করে বলিস্‌নে ভাই!"

অশোকের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা কাতরতা ছিল যে, শরৎ চোখের সাম্‌নে যে দৃশ্যটা দেখিতেছিল বলিয়া অনুভব করিতেছিল, তাহা আর না বলিয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল।

দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা কহিল না।

শরৎ বলিল—"অশোক, একটা অনুরোধ যে তোমার কাছে আছে আমার। সেটা না বল্‌লেই যে নয় ভাই।"

অশোক শুধু বলিল—"কি কথা বল ভাই।"

শরৎ বলিল—"মায়ের তো কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। শ্বশুরের অর্থলোভের পরিণাম শেষে কি হবে জানিনে। মাকে আমার তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। মায়ের ভার তোমার। আমি গেলে মায়ের তুমি একটি-মাত্র ছেলে এই মনে কোরো। আমার মা তো অর্থের কাঙ্গাল নন্‌। মা যে স্নেহের কাঙ্গাল।"

শরৎ এবার কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক সযত্নে শরতের চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল—"তুমি ভেবো না ভাই—খুড়িমাকে আমি আমার নিজের মার মত চিরদিন মনে করব। আমি আমার মাকে ছাড়ব তবু খুড়িমাকে ছাড়্‌ব না। তুমি ওসব কিছু ভেবো না ভাই, শান্ত হও।"

অশোক অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দুপুর বেলা হইতে শরতের নাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্যও ঘটিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শরৎ মায়ের কোলে মাথাটা রাখিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"মা, আর তুমি আমার কাছ থেকে উঠো না। আমার গায়ে হাত দিয়ে বোসো মা।"

যোগমায়া কণ্ঠে ও বক্ষে পরম স্নেহে হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিলেন—"না বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে আর উঠ্‌ছিনে, তোকে ছেড়ে আর কোথায় যাব বাবা!"

মায়ের একখানি হাত আপনার জীর্ণ বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া শরৎ বলিল—"কিন্তু আমি যে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি মা!"

যোগমায়ার মনের ভিতরটা তোলপাড় হইয়া গেল। তবু বাহিরে তিনি স্থির থাকিয়া বলিলেন, "অধীর হোস্‌নে বাবা। তুই যেখানেই যাস্ তোকে ছেড়ে আমি কোন খানেই বেশী দিন 'তো থাক্‌ব না। এখন আমার কথা আর ভাবিস্‌নে—একটু ভগবানের নাম কর্।"

শরৎ মায়ের পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"না মা, তোমার ছেলে হয়ে অধীর হব না মা। তুমিই আমার ভগবান্, মা! কিন্তু তুমি বলছ তাই ভগবানের নামও নিচ্ছি।" বলিয়া শরৎ কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিল। শুধু ঠোঁট দুটি একটু একটু নড়িতে লাগিল।

একটু পরে আবার চক্ষু মেলিয়া শরৎ বলিল—"আচ্ছা মা, তোমার পেটে জন্মে আমি কিছুই ভাল কায করতে পারলাম না কেন? তোমার উপযুক্ত সন্তান তো হলাম না মা!"

যোগমায়া অতিকষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া প্রগাঢ় স্নেহে পুত্রের ললাটের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"কেন হবিনে বাবা? তোকে যে ভগবান্ আপনার কাছে ডেকে নিচ্ছেন। নইলে তুই যে তাঁর চেয়েও বড় হতিস্—তাঁর চেয়ে বড় তো আমি কাউকে স্বীকার করিনে। ওকি, কষ্ট হচ্ছে বাবা?"

শরৎ একটু সামলাইয়া বলিল—"বুকের ভিতর এক একবার কি রকম করছে। সব কথা যেন কি রকম ভুলে যাচ্ছি।" বলিয়া শরৎ এবার চক্ষু মুদিল।

"তবে একটু চুপ করে থাক" বলিয়া যোগমায়া পুত্রের কপালটিতে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

খানিক পরে চক্ষু খুলিয়া শরৎ বলিল—"দেখ মা তোমাকে সত্যিই বলছি, এ জন্মে তোমার কাছে থেকে তোমার ভালবাসা পেয়ে আমার আশা মেটেনি। আমি যেখানে যাব, ভগবানকে শুধু বল্‌ব ঠাকুর আমি আর কিছু চাইনে, আমাকে শুধু আমার মায়ের গর্ভে আবার জন্মাবার অধিকার দিও। যতবার পৃথিবীতে আসিনা কেন, তোমাকে যেন মা বল্‌তে পাই। মা, তুমিও ভগবানের কাছে এই চাইবে তো?"

চোখের পল্লব দুটী ভিজিয়া উঠিতেই উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া যোগমায়া বলিলেন—"চাইব বৈ কি বাবা! তুই যে আমার অনেক তপস্যার ধন!" অশ্রু ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে যোগমায়া পুত্রের অলক্ষ্যে তাহা মুছিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বকার দিনের মত আহারাদি করিয়া রাত্রি ৯টায় অশোক যখন শরৎদের বাড়ী আসিল, তখন শরৎ সব মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে, এই মত তাহার শীর্ণ হাত দুখানা বিছানায় বার বার কি খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

অশোক ডাকিল—"শরৎ, ও শরৎ—আমি অশোক, চিনতে পার্‌ছনা?"

শরৎ একবার অশোকের মুখের পানে চাহিল। চিনিতে পারার কোন ভাব তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। সেই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল। কাহারও পানে না চাহিয়াই শরৎ একবার বলিল—"না মা, আর জন্মে তুমি আমার মা হোয়োনা, আমার মেয়ে হয়ো। এ জন্মে তোমার স্নেহের ঋণ যে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠ্‌ল মা, তার একটুও যে শোধ দিতে পারলাম না। আস্‌ছে বার তুমি আমার মেয়ে হয়ো, আমি তোমার মত করে ভালবাস্‌ব।"

একবার বলিল—"মা, বৌকে কেন আমার এই হাড় ক'খানার সঙ্গে বেঁধে রাখলে মা? বৌকে ছেড়ে দাও। যাবার সময় ওর বুকে টান পড়ছে, জোর লাগছে, বাঁধনটা খুলে দাও না মা বৌ ছাড়া পাক্।"

রাত্রিশেষের দিকে শেষ বারের মত শরতের একটু যেন জ্ঞান হইল। যোগমায়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ একটু ঠাকুরদের নাম শুন্‌বি?" শরৎ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল শুনিবে।

যোগমায়ার কথানুসারে অশোক অশ্রুর সহিত স্বর মিলাইয়া গাহিল :—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
হরে-কৃষ্ণ হরে রাম।

অশোকের সুমিষ্ট-সুরে গীত অশ্রুসিক্ত কথাগুলি সচন্দন পুষ্পের মত সেই কক্ষের মধ্যে বর্ষিত হইতে লাগিল। করযোড়ে ঐ একই মন্ত্র বারে বারে সে বলিতে লাগিল।

যোগমায়া জানু পাতিয়া পুত্রের শিয়রের কাছে বসিয়া মনে মনে ঐ এক মন্ত্রই উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শরৎ হাতদু'খানি বুকের উপর যুক্ত করিয়া নিমীলিত নেত্রে শুনিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ রক্তহীন শীতল ওষ্ঠ দুটী কয়েক বার নড়িয়া উঠিল।

একটু পরেই মুক্তি-লালায়িত সেই ক্ষুদ্র পাখীটি পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া বুঝি মুক্ত আকাশের পানে উধাও হইয়া ছুটিয়া গেল।

অশোক তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ার জানালা খুলিয়া দিতেই বাহিরের ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস ও আলোক আসিয়া ঘরের মধ্যকার দীপশিখাকে মুহূর্ত্তে ম্লান করিয়া নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

যোগমায়া এতক্ষণে পুত্রের প্রাণহীন দেহ দুইহাতে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পিতৃমাতৃহীনা।

শরতের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে অশোক আসিয়া ডাকিল—"খুড়িমা!"

"এস বাবা" বলিয়া যোগমায়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখাকৃতির সেই স্নেহপূর্ণ কোমল ভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল একটা সকরুণ কৃশতা তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধনের জ্যোতিঃ মাখিয়া তাঁহার সর্ব্বদেহ ঘিরিয়া রহিয়াছে।

অশোক সভক্তিতে যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া, বসিল। যোগমায়া বলিলেন—"এবার যে অনেকদিন আসনি বাবা। বোধ হয় দুমাসের উপর হবে।"

অশোক বলিল—"মেডিকেল কলেজে ছুটি খুব কম কিনা। আর এবার দ্বিতীয় বর্ষে আরও কায বেড়ে গেছে।"

"আচ্ছা, বস বাবা। এখনি আসছি"—বলিয়া যোগমায়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

এই বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার অর্থ অশোক বেশ জানিত। একটু পরেই ক্ষিপ্রহস্তে জলখাবার লইয়া, অন্নপূর্ণার মত তিনি যে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে খাওয়াইবার সময়, অন্তরের কোনও গোপনকক্ষে লুক্কায়িত পুত্রবিরহে মাতৃহৃদয়ের যে গভীর বেদনা বাড়িয়া উঠিবে তাহা কল্পনা করিতে গিয়া তাহার চক্ষুদ্বর্য় সজল হইয়া উঠিল।

এফ্‌ এ পাশের পর অশোকের ডাক্তারি পড়াই স্থির হইয়াছিল এবং মেডিকেল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী আরম্ভ হইতেই সে কলেজে উপস্থিত হইল। এই চিকিৎসা-বিদ্যাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে অশোকের পিতা অতুলকৃষ্ণ বসুকে এত প্রবল সুপারিশের আয়োজন করিতে হইয়াছিল, যাহাতে পূর্ব্বকালে অভাবপক্ষে একটা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অনায়াসে মিলিয়া যাইত।

যতদিন কলিকাতা যাইতে হয় নাই ততদিন অশোক অনেকক্ষণ ধরিয়া যোগমায়ার কাছে পুত্রস্নেহের দাবী লইয়া বসিয়া থাকিত। একমাত্র পুত্ররত্নে বঞ্চিত বিধবার শোকবিহ্বল অশ্রুহীন পাষাণ মূর্ত্তির পদপ্রান্তে বসিয়া অভিজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের মত অশোক মৃত পুত্রের চরিত্র মাধুর্য্যের কথা, তাহার অনন্যসাধারণ মাতৃভক্তির বিষয় কহিয়া যোগমায়ার বক্ষের গভীর দুঃখের কঠিন পাষাণ গলাইয়া দিয়া অশ্রুর নদী বহাইয়া

তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিল। তারপর পনেরো দিন অন্তর যখন বাড়ী আসিয়াছে তখনি যোগমায়ার নিকটে আসিয়া পুত্রের মত তাঁহার নিকট আবদার করিয়া তাঁহার বুভুক্ষিত মাতৃ হৃদয়ের ক্ষুধা কথঞ্চিৎ শান্ত করিত। তাঁহার যা কিছু অসুবিধা তাহা পুত্রের দৌরাত্ম্যে যোগমায়ার নিকট হইতে জানিয়া লইয়া অবিলম্বে দুর করিয়াছে।

আজ তিনমাস পরে বাড়ী আসিয়া খানিকক্ষণ শরতের সেই ঘরটিতে বসিয়া পরলোকগত বন্ধু ও পুত্রশোকাতুরা জীবন্মৃতা মাতার কথা অশোক ভাবিতেছে, এমন সময় যোগমায়া খাবার হাতে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি তেরো বছরের বালিকা আসিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া একখানি আসন পাতিয়া দিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

অশোক আবার খাইতে খাইতে যৌবন সুলভ লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে খুড়িমা?"

যোগমায়া মেয়েটির ম্লান অথচ সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া কহিলেন—"ও আমার ছোট বোনের মেয়ে। ওরও নেহাৎ অদৃষ্ট খারাপ, তাই আমার কাছে এসে পড়েছে। যাওতো মা, গোটাকতক পাণ সেজে নিয়ে এস।"

মেয়েটি চলিয়া যাইতে যোগমায়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"কি অদৃষ্ট, এই সে দিন—এখনও এক বছর হয়নি—বাবাকে হারিয়ে মার সঙ্গে মামার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিলে। বাবা মারা যেতেও আমার বোন একে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সেখানেই পড়ে ছিল। একমাস এগার দিন হ'ল সেও মারা গেছে। খবর পেয়ে আমি গিয়ে একে কোন রকমে শুদ্ধ করে তুলে, সঙ্গে করে নিয়ে আসি। ওর তো আর কেউ নেই।

অশোকের তরুণহৃদয় এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকার জন্ম সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। মুখ দিয়া শুধু একটা আহা বাহির হইল।

যোগমায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমিই এক অসহায়। ঈশ্বর কেন যে অসহায়ার উপর আর এক অসহায়ার ভার দিলেন তিনিই জানেন।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল—"মেয়েটির বাপ কিছু রেখে যাননি বোধ হয়?"

যোগমায়া। রেখে গিয়েছিলেন সবই। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে স্বামীর সঙ্গে সবই গেল। কথায় যে বলে বিধবার টাকায় শ্রাদ্ধ হয় সে কথা ঠিক। বাবা যখন আমার ভগ্নীপতি মারা যাওয়ার খবর পেয়ে গেলেন, তখন তাঁরা দেনার এমন ফর্দ্দ বার করে দিলেন যা শোধ করে আসবার সময় বিধবা মেয়ে আর বারোবছরের নাতনীটি ছাড়া বড় একটা কিছুই আনতে পারলেন না।

অশোক। আপনার বাবা মারা যেতে তাঁরা আর কোন খোঁজখবর নেন নি?

যোগমায়া। মামারা খোঁজ নিয়ে তাঁদের জানিয়েছিলেন। তাঁদের আশ্রয়ে ফিরে যেতে চাইলে তাঁরা বলেছিলেন, বড় বৌয়ের ভার নিতে তো তাঁদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু তেরো বছরের মেয়ের ভার তাঁরা কি করে নেন্? তবে বড়বৌয়ের বাবা কি রেখে গেছেন জানতে পারলে এবং সে সব যদি ওঁদের হাতে দেওয়া হয় তাহলে এ বাড়ীঘর বিক্রি করে স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। সে বিধবা হয়ে তাঁদের যে পরিচয় পেয়েছিল তা খুবই মনে ছিল, সে জন্ম আর তাঁদের হাতে যেতে রাজী হল না।

এমন সময় মেয়েটি ডিবা করিয়া কয়েকটা পাণ লইয়া অশোকের কাছে রাখিয়া, মসীমার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

যোগমায়া মেয়েটির ছোট কপালের উপর যে চুলগুলি পড়িয়াছিল তাহা সস্নেহে সরাইয়া দিয়া অশোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"শেষ সময় বুঝে সে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল, আর অনুকেও বলে গিয়েছিল আমারই কাছে আসতে।"

তারপর একটু থামিয়া যোগমায়া বলিলেন—"তিনি যদি থাকতেন তা হলে তো এ ভার বলেই মনে হ'তনা। —অন্ততঃ শরৎও যদি থাকত। আমার কাছে বাছা এমন সময় এল যে কোন সুখেই বাছাকে রাখতে পারব না।"

অশোকের চোখ দুটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একটু আবেগের সহিত বলিয়া ফেলিল—"না খুড়িমা ও কথা বোলো না। তোমার কাছে থেকে কেউ কষ্ট পাবে না বা কারও কষ্ট হবে একথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করিনে। সত্যি বলছি খুড়িমা, আমি যদি এই বয়সেও মরুভূমির মাঝখানে অসহায় হয়ে তোমার কোলে ঠাঁই পাই, তাহলে আমার আর কোনও ভয় থাকে না। এর চেয়ে বড় আশ্রয় তোমার বোনঝি আর কোথাও পেত না আমার তো মনে হয়। খুড়িমা, শরৎ ত চলে যায়নি, সে যেন এই আমাদের সবারই মাঝখানে মিশে গিয়েছে। তোমার ও অফুরন্ত স্নেহ তো একজনের নয়, ও যেন পৃথিবীর সবারই প্রাপ্য। পাছে একজন অধিকার করে বসে তাই ভগবান্ তোমার সন্তানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

বলিয়া অশোক কাঁদিয়া ফেলিয়া, পরম ভক্তিভরে যোগমায়াকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

যোগমায়া পুত্রোপম অশোকের প্রশংসায় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"মাকে কোন্ ছেলে কম ভাবে বাবা?—কিন্তু কথায় কথায় তোমার যে খাওয়া হল না।"

খাওয়াতে যেটুকু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেটুকু সারিয়া লইয়া অশোক বলিল—"খুড়িমা, আমি তোমার কাছে এইটুকু চাই—শরতের অধিকারটুকু আমাকে দিতে তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না।"

এই কথা কয়টা বলিতে শিশুর মত ভাবপ্রবণ যুবকের চক্ষে যে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিলেন—"শরৎ গিয়ে পর্য্যন্ত তুই তো আমার শরতের জায়গা পেয়েছিস্ বাবা। তোর ভিতরই যে শরৎ সবচেয়ে বেশী করে বেঁচে আছে।"

বলিয়া যোগমায়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষুমার্জ্জনা করিলেন। মেয়েটির চক্ষু দিয়াও তখন টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু পড়িতেছিল।

বাড়ী ফিরিবার সময় বালিকার অশ্রুসজল ম্লান মুখ একটি মধুর সুখ স্বপ্নের মত অশোকের মনে হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়।

রথের কয়েকদিন পূর্ব্বে পাড়ার অনেকেই সেবার পুরীধাম যাওয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অম্বুপ্রভা শিবপ্রসাদের স্ত্রী রুক্মিণীর নিকট তাহা শুনিয়া বাড়ী আসিয়া কহিল, "মাসীমা, ওঁরা সকল পুরী যাচ্ছেন। তুমিও যাওনা কেন?"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা যাচ্ছেন মা? তুই কোথা থেকে শুনলি?"

অম্বুপ্রভা বলিল—"এ পাড়ার গিন্নিবান্নি প্রায় সবাই যাবেন। খুড়িমার মাও যাবেন। খুড়িমার কাছেই সব শুনলাম। তুমিও যাও না মাসীমা। গেলে একটু শান্তি পাবে।"

রুক্মিণীর মাতা রুক্মিণীর কাছেই অধিকাংশ সময়েই থাকিতেন। যোগমায়া একটু ভাবিয়া বলিলেন—"না মা, আমি যাব না। জগন্নাথ যদি শান্তি দেন তো তাঁকে ঘরে বসে ডাকলেই দেবেন।"

অম্বুপ্রভা বলিল—"আর মাসিমা, তীর্থ মাহাত্ম্য তো একটা আছে। জগন্নাথ গিয়ে যারা জগন্নাথ দর্শন করে আসে তারা কি বেশী শান্তি পায় না?"

যোগমায়া বলিলেন—"তা বোধ হয় পায়। কিন্তু যারা গরীব তারা কি করবে মা?"

অম্বুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—"খুড়িমা বলছিলেন, দিদি গেলে মনটার একটু শান্তি পেতেন। তাই শুনে তাঁর মা বল্লেন, ও কি করে যাবে? ওর—ওর বোনঝি অম্বুরে কোথায় থাকবে?"

শেষের কথা কয়টা বলিবার সময় অম্বুর চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল এবং কি একটা কথা সে সামলাইয়া লইল তাহা যোগমায়া বেশ বুঝিলেন।

অম্বুপ্রভার মুখপানে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছোট বৌয়ের মা বুঝি আর কোন কথা বলেছিলেন, না মা?"

অম্বুপ্রভা মুখ নত করিয়া রহিল। যোগমায়া মেয়ে-

টির কোন্ কথাটিতে আঘাত লাগিয়াছে তাহা মনে মনে বুঝিয়া সস্নেহ স্বরে কহিলেন—"তিনি তোর সম্বন্ধে যাই বলুন মা, তুই তার জন্যে কিছু ভাবিস্‌নে। তুই খুব জেনে রাখিস্ মা, তুই এসে আমার কাছে বোঝার মত হস্ নি। কি করে কাকে নিয়ে সময় কাটাব তাই ভাবতাম, তাই ভগবান তোকে কাছে আনিয়ে দিলেন!"

বলিয়া যোগমায়া নতমুখী অনুপ্রভার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

অনুপ্রভা মাসীমার আদরে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"না মাসীমা আমি তা ভাবব না। কিন্তু তুমি কেন আমাকে অশোক দাদাদের ওখানে কি খুড়িমার কাছে দিন কতকের জন্যে রেখে পুরী ঘুরে এস না?"

যোগমায়া সস্নেহে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন —"আচ্ছা, দেখি মা কি হয়।"

রাত্রে ক্রোড়ের কাছটিতে শায়িত অনুপ্রভার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে যোগমায়ার মনে হইল, এই যে অভাগী মেয়েটি বাপ মা সব হারাইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহারই জন্য আবার তাঁহাকে নূতন করিয়া সংসার বাঁধিতে হইবে। না হইলে শরৎকে হারাইয়া তিনি আবার সংসারে মন দিবেন তাহা কখনও ভাবেন নাই।

অনুপ্রভা মাসীমার স্নেহস্পর্শে বিগলিত হইয়া মৃদু স্বরে একবার ডাকিল---মাসীমা।

"কেন মা! এখনও জেগে আছিস্?"

অনুপ্রভার বিশেষ কিছু উত্তর দিবার ছিল না। তাই আর কিছু না বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

যোগমায়া একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"আচ্ছা অনু, আমি যদি যাই, আমার সঙ্গে গেলে তুই সুখী হস, না থাক্‌লে? ঠিক সত্যি করে বল্‌তো মা।"

অনুপ্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"তোমার সঙ্গে গেলেই মাসীমা বেশী সুখী হই নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহলে একেবারে দ্বিগুণ খরচ; সে জন্যে তোমার একা যাওয়াই ভাল।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া যোগমায়া জগন্নাথধাম যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলেন এবং দুই দিন পরে ঘর দুয়ার বন্ধ করিয়া অনুপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া তিনি পাড়ার অন্যান্য সকলের সহিত পুরী যাত্রা করিলেন।

পুরীধাম পৌঁছিয়া যোগমায়ার মনে হইল, তিনি যেন এক নূতন জগতে আসিয়াছেন। সুশীতল প্রলেপের মত সমুদ্রের মুক্ত বাতাস তাঁহার বেদনাবিদ্ধ হৃদয়কে প্রচুর পরিমাণে শান্তি দান করিল। সেই কোটি কোটি নর-নারীর ভক্তিনিবেদিত মন্দির দুয়ারে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মন হইতে অনেকখানি শোক দুঃখ সরিয়া পড়িল। জগন্নাথ মূর্ত্তির চরণতলে প্রণাম করিতে তাঁহার দুটি চক্ষু ছাপাইয়া জলধারা ছুটিল। ভগবানের কাছে যোড়করে প্রণত শিরে প্রার্থনা করিলেন—হে প্রভু! হে জগন্নাথ! শরতের আত্মার কল্যাণ কর। আমার স্বামীর আত্মার কল্যাণ কর। হে ঠাকুর! তোমার চরণে মতি রাখিয়া আমি যেন তাঁহাদের জন্য শোক না করি। আর যাহার ভার আমার উপরে তুমিই দিয়াছ তাহার একটা গতি করিয়া, তোমার চরণপ্রান্তে তাঁহাদের কাছে গিয়া যেন জুড়াইতে পাই!

সমুদ্রের মুক্ত বাতাস সুশীতল প্রলেপের মত তাঁহার বেদনাদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত করিল। সমুদ্রের সেই অবিশ্রান্ত গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার কাছে যেন স্বর্গ মর্ত্তকে মিলিত করিয়া দিতেছিল। সেই বেলাভূমে বিচ্ছুরিত তরঙ্গজড়িত কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ফল, কত ফুল কত নানা বর্ণের নানা আকারের তুচ্ছ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেখিয়া যোগমায়ার মনে হইল, এ সংসারে কোন কিছুই নষ্ট হয় না, এই পৃথিবীর ক্লিষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব নরনারীর যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে বা হারাইয়াছে, সব একদিন মরণ-সমুদ্রের কূলে এমনি করিয়া তাহাদের তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে।

প্রত্যহ দেবমূর্ত্তি, মন্দির ও সমুদ্র দেখিয়া কোথা দিয়া যে যোগমায়াদের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল তাহা যোগমায়া অনুভবই করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহযাত্রিগণের মধ্যে এক দলের মত হইল আর দেরী করিয়া কায নাই, এবার ফেরা যাউক। আর এক

দলের মত হইল আরও দিন কয়েক থাকিয়া যাওয়া যাউক; আর কখনও এত খরচ পত্র করিয়া আসা হইবে কিনা সন্দেহ। শেষে একদল একদিন পরে যাত্রা করা, একদল আর সপ্তাহ পরে যাত্রা স্থির করিলেন। যোগমায়া শেষোক্ত দলের সঙ্গে ফিরিবেন ইহাই মনস্থ করিলেন। ঠিক সেই দিন অশোকের এক টেলিগ্রাম আসিল—শীঘ্র ফিরিয়া আসুন। বিশেষ প্রয়োজন।

যোগমায়াকে অগত্যা প্রথমোক্ত দলের সহিত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ফিরিতে হইল। কি এমন প্রয়োজন যাহার জন্য অশোককে টেলিগ্রাম করিতে হইল? তবে কি অশোকেরই কোন অসুখ হইল, এবং সে তাহা গোপন করিয়া এই ভাবে সংবাদ পাঠাইল? "আর দিন কয়েক তোমার চরণ দর্শন হইতে কেন বঞ্চিত করিলে প্রভু?" বলিয়া দেবতাকে সজল চক্ষে শেষবার প্রণাম করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন।

অনেকখানি আশঙ্কা লইয়া যোগমায়া যখন দেশের ষ্টেশনে পৌছিলেন তখন ভোর হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে তিনি রুক্মিণীর মা ও অনুপ্রভাকে লইয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বাড়ীর সম্মুখে পৌছিলেন। রুক্মিণীর মা গাড়ী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি কন্যা জামাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। যোগমায়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বজ্রাহতের মত দাঁড়াইলেন।

তিনি দেখিলেন, বাড়ীর দরজা একটা নূতন তালা দিয়া বন্ধ, আর একখণ্ড কাগজে খুব বড় করিয়া লেখা—এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে। বাবু হেরম্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট সন্ধান করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

গায়কের প্রতি

আজি ধীর গুঞ্জনে মম হৃদি-রঞ্জন
ঝঙ্কারি' তোল নব ছন্দ!
মম স্তব্ধ মানস-নীরে গীতি-হিল্লোল তব
ঊর্ম্মি জাগাবে মৃদু মন্দ!
আজি সন্ধ্যা আসিবে হাসি' হেম-মেঘাভরণা,
আজি আসিবে নীরব রাতি কৌমুদী বরণা,
আজি হর্ষে জাগিবে ঊষা কুসুমিত-চরণা
বিশ্বে ছড়ায়ে মধু গন্ধ!

ভুলে যাব সঞ্চিত- অমানিশা-কালিমা,
রুক্ষ দিবসভরা ক্লান্তি,
ভুলে যাব অম্বরে ম্লান জলদের মত
চঞ্চল পথহারা ভ্রান্তি!
আজি তব সুমধুর সঙ্গীত সরসে
বিশ্ব উঠিবে জাগি' নব নব হরষে,
ক্ষুব্ধ সমীর বহি' সে মাধুরী পরশে
দিশি দিশি জাগাবে আনন্দ!

শ্রীঅরিন্দমচন্দ্র বসু।

ইউসুফের প্রতি জুলেখা

(জামী)

দেবতা, তোমার দেছেন বিধাতা
গুলভাতি তব কপোলে ফুটে,
রূপ চঞ্চল ছনিয়া পাগল
হের তব পদযুগলে লুটে।
ও ললাট তটে যে দ্যুতি প্রকটে
চন্দ্রমা তায় পাণ্ডু ম্লান,
তব অপাঙ্গে চারু ভ্রূভঙ্গে
পেল অনঙ্গ ধনুর্ব্বাণ।
তোমার তনুর বসনে ভূষণে
অই সুষমার আলোক লাগে,
লোহিত সুসিত কুসুম অযুত
ফুটে যেন তায় দ্যুলোক বাগে।
মধুর অধরে মদির হাসিটি
চারু কোরকের বিকাশ সম,
গুলের পাপড়ি-ঝরার মতন
তব পদক্ষেপ মানসরম।
তুমি আছ বলি সর্ব্বংসহা
সব গুরুভার বহিতে পারে।
তোমারে হারালে সে বুঝি পাতালে
অতলে ডুবিবে ভূধর ভারে।

তুলে' ধর' মোরে—ডাকি করযোড়ে
পরাণবন্ধু করুণা কর।
শুন এ কাকু'ত প্রাণের আকুতি
ব্যথা হর, দুর্নিয়তি হর'।
তপ্ত শ্বসনে বহ্নি শোষণে
ভীষণ অশ্রুলহরী ধায়
অশনি-আহত অশথের মত
অন্তর মোর বিদরি যায়।
প্রলেপ স্নিগ্ধ করি নিদিগ্ধ
ভুলাও দগ্ধ-হৃদয় জ্বালা।
দুলাও বন্ধু দুলাও কণ্ঠে
তোমার বাহুর নিবিড় মালা।
নিরাশা তপন দহেছে স্বপন
হয়েছে জীবন সাহারা যেন।
খোস্ বাগানের খোস্‌বো এমন
বহাইলে তায় আহা রে কেন?
বহাইলে যদি ঝলসিত হৃদি-
কুটীরে ঢালো সোমের সুধা,
চির অনশনক্লিষ্ট জীবন,
মিটাও মোহন, প্রেমের ক্ষুধা।

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মুদ্রাদোষ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত। কলিকাতা "মানসী" প্রেসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১২১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই মূল্য, ১৲

খগেন্দ্র বাবু ইতঃপূর্ব্বে ছোট গল্প রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার "নীলাম্বরী" ও "কাণের দুল" সুধী পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত রচনাগুলি ছোট গল্প নহে; কোনও গম্ভীর বিষয়ের গভীর আলোচনাও নহে—"পূর্ণিমা সম্মিলন" "সাহিত্য-সঙ্গত" প্রভৃতি সভায় তিনি যে সকল লঘু রস-রচনা নানা

সময়ে পাঠ করিয়াছেন, সেইগুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই রচনাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, প্রত্যেকটি এমন সুগঠিত, এমন সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, সেগুলিতে একজন প্রথম-শ্রেণীর শিল্পীর নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়গুলি শুভ্র পূত হাস্যরস-ধারায় এমনভাবে অভিষিক্ত যে, পাঠে হৃদয়ের কূলে কূলে একটা আনন্দহিল্লোল জাগিয়া উঠে এবং লেখকের সূক্ষ্মবুদ্ধি, সহৃদয়তা ও রস-সঞ্চারের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

ভাঁড়ামি আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সুরুচিসম্মত শুভ্রোজ্জ্বল হাস্যরসের স্ফুরণ অত্যন্তই দুর্লভ। খগেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে আমাদিগকে সেই দুর্লভ বস্তু দান করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের একথা সপ্রমাণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি, কারণ সমগ্রের সৌন্দর্য্য, অংশ-বিশেষ দ্বারা প্রদর্শনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু একটা কথা বলিতে আমাদের কোনও দ্বিধা নাই। আমরা জানি কথাটা অত্যন্ত বড় শুনাইবে—হয়ত বা কেহ এটাকে আমাদের অমার্জ্জনীয় অতিশয়োক্তি মনে করিতে পারেন—তথাপি আমরা বলিব, কমলাকান্তের দপ্তরের পর, সুবিমল হাস্যরসে ওতপ্রোত এমন সুন্দর রস-রচনা আমরা আর পাঠ করি নাই।

ভজহরির বাঁশী—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস প্রণীত। শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক চিত্রাঙ্কিত। কলিকাতা ইউ রায় এণ্ড সন্সের প্রেসে মুদ্রিত এবং এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ক্যাপ ৮ পেজি, ৫৬ পৃষ্ঠা, বোর্ডে বাঁধাই, মূল্য ১।০

এখানি শিশু-পাঠ্য অথবা শিশুগণ কর্ত্তৃক আবৃত্তি করিবার যোগ্য ছড়ার বই। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক জাতীয় ছড়া প্রচলিত ছিল, সেগুলি ছেলে ভুলানো ছড়া। সে ছড়া আবৃত্তি করিবেন মা, তাহা শুনিয়া ভুলিবে বা ঘুমাইবে ছেলেমেয়ে। কিন্তু এ ছড়াগুলি সে ধরণের নহে—অপেক্ষাকৃত একটু অধিক বয়স্ক ছেলেমেয়েরা নিজেরা আবৃত্তি করিয়া আমোদ পাইবে—এই উদ্দেশ্যেই রচিত। ঠিক এধরণের জিনিষ বাঙ্গালায় পূর্ব্বে কেহ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ কয়েকজন শিশুসাহিত্য-রচয়িতার বহিতে ছড়ার মত জিনিষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি বর্ণমালা বা ভাষা শিক্ষার জন্য রচিত; এগুলির মত নিছক আমোদ দিবার জন্য নহে। ইংরাজিতে এই জাতীয় ছড়ার বহুল প্রচলন আছে, এ ছড়াগুলি দত্ত মহাশয় সেই ছাঁচেই ঢালিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বাঙ্গালা গানে ইংরাজি সুরের ঢং আনিয়া, বাঙ্গালা সুরের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছিলেন, দত্ত মহাশয়ও সেইরূপ বাঙ্গালা ছড়ায় ইংরাজির ঢং প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে একটা অভিনব রূপ দান করিয়াছেন। একটা নমুনা দিই—

> বিড়াল আপন মাকে বলে,
> "ঘরের বাঁধন সইব না,
> গভীর বনে গিয়ে আমি
> দস্যু হয়ে রইব না,
> রইব না! রইব না!
> দস্যু হয়ে রইব না!

শেষটায় ঐ যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, উহা ইংরাজি Nursery rhymes-এর একটা বিশেষ লক্ষণ। যথা

> There once was a black bird gay,
> A splendid fellow was he ;
> And though he went out every day,
> He always came home to tea
> To tea—to tea—to tea.

শুধু ঢং ও সুরে নয়, ভাবের দিক দিয়াও অনেক পরিবর্ত্তন এই ছড়াগুলিতে লক্ষিত হইতেছে। আমরা ছেলেবেলায় শুনিতাম—

> বেটা ছেলেটা সোণা ডেলাটা
> টপ্ করে নিয়ে কোলে ফেলাটা।
> মেয়েছেলেটা কাদা ডেলাটা
> টপ্ করে নিয়ে জলে ফেলাটা।

সেই এক দিন ছিল। কিন্তু কালধর্ম্মে কি পরিবর্ত্তন আসিয়াছে দেখুন। "ভজার বাঁশী"তে পড়িলাম :—

> "ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা সব কি দিয়ে হয় তৈরি ?
> ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা সব কি দিয়ে হয় তৈরি ?
> শামুক ঝুঁটো ব্যাঙ আর পিঁপড়ের ঠ্যাং
> তাই দিয়ে হয় ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা সব তৈরি।
>
> ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা সব কি দিয়ে হয় তৈরি ?
> ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা সব কি দিয়ে হয় তৈরি ?
> বর্ণনা কলি ফুলো আর যা কিছু ভাল,
> তাই দিয়ে হয় ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা সব তৈরি।

মাত্রৈব উপরে "ভজার বাঁশী" বাঙ্গালা শিশুসাহিত্যে যে নূতন সুরটি বাজাইয়াছে তাহা অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে। এই ছড়াগুলি যে বালকবালিকাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বহিখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই খুব সুন্দর হইয়াছে। ছবি-গুলি দুইজন বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত এবং সুপ্রসিদ্ধ ইউ রায় এণ্ড সন্সের প্রেসে ছাপা, সুতরাং ছবিগুলি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

সাধন সমর বা দেবী মাহাত্ম্য—২য় খণ্ড মহিষাসুর বধ—বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। কলিকাতা বিদ্যোদয় প্রেসে মুদ্রিত এবং হাটখোলা ১৮।১ বেনিয়াটোলা হইতে শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজি ৩৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ সমালোচনা কালে আমরা ইহার সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছিলাম, সেই প্রশংসা এই ২য় খণ্ড সম্বন্ধেও করা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "দেবী মাহাত্ম্য" গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি (বঙ্গাক্ষরে), অনুবাদ এবং সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ এই পুস্তকের খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই দ্বিতীয় খণ্ডে মহিষাসুরসৈন্য বধ, মহিষাসুর বধ এবং শক্রাদি স্তুতি সমাপ্ত হইয়াছে। অনুবাদের সাহায্যে মূল শ্লোকগুলি বেশ বুঝা যায়। প্রত্যেক শ্লোকের সঙ্গে যে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া ব্যাখ্যাকার মহাশয় নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বহু জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাই এই পুস্তকের প্রধান বিশেষত্ব। ব্যাখ্যাকার মহাশয় যে শুধু সুপণ্ডিত তাহা নহে, তিনি যে এক-জন পরম ভক্ত তাহা এই ব্যাখ্যাগুলি পাঠে প্রতীতি জন্মে। যাঁহারা "দেবী মাহাত্ম্য" পুরাণের ভিতরকার রহস্যটি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন।

কায়স্থ পরিচয় (সচিত্র) কলিকাতা খণ্ড, প্রথম ভাগ (অ হইতে ত পর্য্যন্ত) শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত। কৌমুদী প্রেসে মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার কর্তৃক শ্রীরামপুর কায়স্থ পরিচয় কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ৮ পেজী ১৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৹

"নির্ম্মাল্য" ও "শ্রীরামপুর" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও "শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস", "স্যর জজ বাহাদুর" প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন আমরা ভেনিশ কনকোয়েষ্ট হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজগণের বংশাবলী ধারাবাহিকরূপে কণ্ঠস্থ করিতে পরাঙ্মুখ নহি কিন্তু আমাদের পিতৃপিতামহগণের কোন পরিচয় দিতে পারি না। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন ও সম্রান্ত কায়স্থ বংশগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থে কলিকাতার ৩১টি বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল বংশে উদ্ভূত খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিতও এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এইগুলি ভবিষ্যতে আমাদের সামাজিক জীবনের ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহাতে বত্রিশটি প্রাচীন ও আধুনিক ব্যক্তির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ চিত্রই আমরা পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। বসন্তবাবু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং সম্পূর্ণ করা কেবল দুরূহ নহে—বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু তিনি যতটুকু প্রকাশিত করিয়াছেন, ততটুকুর জন্যই তিনি কায়স্থ সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। প্রত্যেক খণ্ডই স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কায়স্থ সমাজে আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

আহুতি (উপন্যাস)—শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত একখানি গ্রন্থ।

পুস্তকখানিতে বাঙ্গলার আধুনিক নিষ্ঠুর বরপণের ফলে দুঃস্থ পিতামাতার কষ্ট ও বিকার দেখিয়া শুনিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনূঢ়া বালিকার কেরোসিন তৈলে আত্মোৎসর্গ সুন্দরভাবে চলিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে লেখিকা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"বরের বাপ মায় রক্ততৃষ্ণা মিটবে কি? "সমা-জের কি ঘোর লজ্জার বিষয় যে, উহাতে ঐ প্রকার লোমহর্ষণ-কারী নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিতে থাকে, আর সমাজ তাহার প্রতী-কারের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, লেখক লেখিকাকে ব্যঙ্গোক্তির অধিকারও দেয় না? আবার আমরা নিজেকে সভ্য বলিয়া পরি-চয় দিতে সাহস করি? যাহা হউক, আশা করি এই পুস্তক মার্কিনে টম কাকার কুটীরের (Uncle Tom's Cabin) ন্যায় আমাদের সমাজের ঈপ্সিত ফল প্রদান করিবে।

পুস্তক খানির উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও উহাতে চরিত্রাঙ্কনের ত্রুটি এবং "ভোরের দিকে" (পৃঃ ১), "আগে ভাগে" (পৃঃ ৩), "হাসি টানিয়া" (পৃঃ ৬), "তিনি...আসিয়াছিল" (পৃঃ ২৬) আদি কতিপয় অব্যবহৃত বাক্য লক্ষিত হইল।

সাহিত্য-সমাচার

শোক-সংবাদ

(১) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, "হিন্দুনারীর কর্ত্তব্য", "বেহারচিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয় ৪৯ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু মুঙ্গেরে ওকালতী করিতেন। গত বৈশাখ মাস হইতে তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন। তাহার পর তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। তখন তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম মুঙ্গের হইতে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হয়; মৃত্যুর মাসাধিক পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়; কিন্তু দুর্ব্বলতা ও অন্যান্য উপসর্গ বশতঃ শয্যাশায়ী থাকেন। অবশেষে, বিগত ২৬শে কার্ত্তিক রবিবার বেলা ৯টা ১০ মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ কাছে ছিলেন এবং যথারীতি পিতার শেষ কার্য্য সম্পাদন করেন।

যতীন্দ্র বাবু নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে লিখিতে আরম্ভ করিয়া সুলেখক বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মানসীতেও তাঁহার বহু রচনা—বেহারচিত্র,সমাজচিত্র,গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। যতীন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন ভাল লেখক হারাইলাম। ঈশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের হৃদয়ে শান্তিবিধান করুন।

(২) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রে এক সময় লিখিতেন। "মধুমতী" ও "শৈশব-সহচরী" নামক তাঁহার রচিত দুইখানি উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর জীবনী সংক্রান্ত কতকগুলি প্রবন্ধও তিনি "সাহিত্য"পত্রে লিখিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম যে, তিনি বঙ্কিম বাবুর একখানি জীবনী লিখিতেছিলেন; কালের কঠোর শাসনে তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

আমাদের একজন গ্রাহিকা, আমাদিগকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন—

"সবিনয় নিবেদন

"আপনাদের পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রায় এমন অনেক প্রবন্ধ বাহির হয়, যাহা ইংরাজি ও বাঙলা-মিশ্রিত। কিন্তু অনেকস্থলে প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হইলেও ইংরাজির অনুবাদ বাঙলায় না থাকায় আমার ন্যায় ইংরাজি-না-জানা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ২।১টা ইংরাজি কথার ভাব আন্দাজ করিয়া অনেক সময় বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু বেশী কথা থাকিলে তাহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মানে না বুঝিলেও প্রবন্ধ পাঠ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। অবশ্য কতকগুলা প্রবন্ধের ইংরাজির মানে পুরুষদিগের নিকট বুঝিয়া লইতে পারি; কিন্তু সকলগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে বুঝিয়া লইবার সময় ও সুবিধা হয় না। ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "আমার দেখা লোক" প্রবন্ধগুলি যে ভাবে লেখা, সেই ভাবে যদি অন্যান্য লেখক-মহাশয়েরাও অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রবন্ধগুলি লেখেন,তাহা হইলে আমাদের আর কোন অভিযোগ থাকে না। আজ কাল যখন দেশের ইংরাজিশিক্ষিত লোকের বাঙলা ভাষার প্রীতি আদর বাড়িয়াছে ও যখন বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ভাষার প্রাধান্য হইয়াছে, তখন আশা করি, আমার এই অনুরোধ অসঙ্গত মনে করিবেন না। ইংরাজি উঠাইয়া দেওয়া ঠিক নয়, কেবল তাহার পাশে বাঙলা অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে এবং ইহাতে অনেক ছেলেরও ইংরাজি শিখিবারও সাহায্য হইবে ও পরোক্ষ ভাবে পত্রিকার আর একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আশা করি, আমার এই পত্রের মর্ম্মাংশ আপনার পত্রিকায় অনুগ্রহ করিয়া একটু স্থান দিয়া অন্যান্য পত্রিকার লেখক মহাশয়গণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

গ্রাহিকা নং ৩৩৩১"

গ্রাহিকা মহাশয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সুযুক্তি-পূর্ণ। আশা করি, অতঃপর আমাদের লেখক-লেখিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন।

মাঃ মঃ সঃ

কলিকাতা
১৪এ, রামতনু বসুর লেন "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রার্থনা

(চিত্রকর—শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুমার)

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৪শ বর্ষ } ২য় খণ্ড } ৭ মাঘ, ১৩২৯ { ২য় খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"আমার দেখা লোক"

সার হেনরী কটন।

উদার-হৃদয়, মানব-প্রীতিতে পূর্ণ চিত্ত, কোমৎমতাবলম্বী সার হেনরী কটন্ মহোদয় ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন (২৩।১০।১৫)। তিনি আসাম চা বাগানের কুলিদিগের দুঃখে একান্ত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন এবং আসাম কুলি আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিনা আইনে অধিক মাহিনা দিয়া কুলি সংগ্রহ করা উচিত ইহাই তাঁহার মত ছিল। এ জন্য চা-কর প্লাণ্টার প্রভৃতি বেসরকারী ইংরাজ দল তাঁহার বিরুদ্ধ হয়েন, এবং তাঁহাকে আসামের চীফ কমিসনারের পদ হইতেই পেনসন লইতে হয়; বাঙ্গালায় ছোটলাটের পদ তাঁহার প্রাপ্য হইলেও তিনি তাহা পান নাই। বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহাতে একান্ত আশাভঙ্গ হয়—তিনি এতই লোকপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার "নিউ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত এবং কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ জন্যও তিনি প্রায় সকল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে "বাবু কটন" আখ্যাও দিয়াছিলেন। তিনি ছোট লাট হইলে নেটিভদিগের বড়ই বাড় হইবে উঁহাদের এই সন্দেহ হইয়াছিল। হয়ত কালে তাঁহার সম্মান ইংরাজ মহলেও হইবে। যাঁহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান, তাঁহাদের গৌরব সমসাময়িকেরা করিতে পারে না; বড়কে বুঝিতে মন একটু বড় হওয়ার প্রয়োজন। স্থায়ী প্রকৃত স্বার্থ এবং পরার্থ যে অভিন্ন তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধের মনে ঢুকিতে পারা সম্ভব নহে।

কটন সাহেব যখন চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন, তখন ঐ জিলা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া এক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমার নওয়াখালিতে

চাকরীর সময় ডেপুটী কলেক্টর বাবু কালীশঙ্কর সেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতির মূল কটন সাহেব। তিনি যখন আফিসের এক সামান্ত কেরাণী মাত্র, তখন তাঁহার মধ্যে একটু কার্য্য-দক্ষতা লক্ষ্য করিয়া কটন সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ক্যাম্বেলি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বলেন। সেই উৎসাহের ফলে কালীশঙ্কর বাবু উক্ত পরীক্ষা দিয়া সবডেপুটী ও পরে ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমি গয়ার আরঙ্গাবাদ সবডিভিজনে থাকা কালে কটন সাহেব ইরিগেশন কমিশনে শোণ নদের খালের তীরবর্ত্তী দাউদনগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতার কথা কালীশঙ্কর বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া, কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তথায় গিয়া দেখা করিলাম। প্রায়ই ভারতবাসী কেহ বিনা প্রয়োজনে ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের নিকট যান না। এবং যাওয়ার কারণটা সর্ব্ব শেষেই প্রকাশ করেন। কটন সাহেব আমার আসার কারণ বারবার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষে আমাকে প্রকৃত কারণ বলিতে হইল যে, বাবু কালীশঙ্কর তাঁহার প্রশংসা শতমুখে করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমায় কিছু কৌতূহলাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই।

কটন সাহেব বলিলেন, "সে তোমাকে ভালবাসে।"

বৈকালে দেখি কটন সাহেব আমার তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ডাকিতেছেন। বলিলেন, "চল, খালের ধারে খানিকটা বেড়াইয়া আসি।"

সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কত বিষয়ের কত কথাই হইল, যেন কতকালেরই বন্ধুত্ব! যেন সহপাঠীরই সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি। তিনি যে সিভিলিয়ান উচ্চকর্ম্মচারী তাহা একেবারেই ভুলাইয়া দিলেন। কমিসনে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অন্ততম সভ্য ছিলেন; তাহার উল্লেখে হাসিয়া বলিলেন, "যাহার বিভাগের সম্বন্ধে তদারক সেই ব্যক্তি সহযোগিভাবে সঙ্গে থাকিলে রিপোর্ট লেখার বড় অসুবিধা।"

আরঙ্গাবাদ সবডিভিজন হইতে ছুটী লইয়া বাটী আসিবার পর একদিন রেভিনিউ বোর্ডে কটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। কাযে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। বলিলেন, "তোমাকে সুস্থাবস্থায় দেখিয়া সুখী হইলাম। কোন বিশেষ কথা আছে?"

বলিলাম, "আপনাকে একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।"

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "আমরা যে দাউদনগরের খালের ধারে বড়ই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমায় আমার বরাবরই স্মরণ থাকিবে। যখন তোমার কোন প্রয়োজন মনে হইবে, আমায় বলিও, অথবা লিখিয়া জানাইও।"

এমন সুন্দর সুমিষ্ট ধরণ আমি উচ্চমনা শ্রীযুক্ত ডব্লু, বি, টমসন সাহেব ভিন্ন অন্ত কোন ইংরাজে দেখি নাই; সেই একটী নিমেষের মধ্যেই আমাকে প্রকৃত পরিতৃপ্ত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন, এবং কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

যখন হুগলীতে কার্য্য করিতেছিলাম, তখন কটন সাহেব চীফ সেক্রেটারী হইয়া আমাকে মেহেরপুরে বদলী করিলেন। তথায় কিছুকাল কাষ করিবার পর পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার সূত্রপাতে ছুটী লইলাম। ছুটীর মধ্যে একদিন দেখা করায় বলিলেন, "তোমার কি চাকরীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটুও নাই? আমি তোমাকে মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা দুইটা সবডিবিজনের ভার দিলাম; সেখানে সর্ব্বদা সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী থাকেন, সেস্থলে তোমাকে ঐরূপ বিশিষ্টভাবে বসাইলাম যে পরে উপযুক্ত বলিয়া উল্লেখে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়াইতে পারিব; আর তুমি সেখান হইতে ছুটি লইলে?"

আমি বলিলাম, "পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শরীর অসুস্থ, তাঁর সেবা যাহাতে করিতে পারি সেই সাহায্যই করিবেন।"

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহিত ৺বৈদ্যনাথে গেলাম। তিনমাস ছুটীর শেষাশেষি একদিন লাণ্ড রেকর্ডস আফিসের অধ্যক্ষ মিষ্টার ডব্লু, সি, ম্যাকফার্সনের এক টেলি-

গ্রাম পাইলাম যে আমি তাঁহার পার্সন্যাল আসিষ্টাণ্ট হইতে রাজী আছি কি না?"

পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলিলেন, "বাড়ী হইতে যাতায়াত চলিবে; আমার এ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী; অন্যত্র চাকরীতে গেলে অসুবিধা; চাকরী না করাও ঠিক নয়। বরং একজনের প্রত্যহ বাটী হইতে কলিকাতায় যাতায়াতে ঔষধ পথ্য ডাক্তার কবিরাজ সম্বন্ধে সুবিধাই হইবে।"

পিতৃদেব সকল বিষয়ের ভাল দিকটাই দেখিতেন ও দেখাইতেন। ঐ চাকরী লইলাম।

আফিসে নিজের নিয়োগ সম্বন্ধীয় ফাইলে দেখিলাম, কটন সাহেবের স্বহস্ত লিখিত ডেপুটীদিগের নামের ফর্দ্দে আমার নাম রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই সকল অফিসরেরা কলিকাতায় যে কোন চাকরী পছন্দ করিবে ইহারা মফঃস্বল হাকিম হওয়ার জন্য বিশেষ ব্যগ্র নয়।" দেখিলাম কার্য্যদক্ষ ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কর্ম্মচারীদিগকে বেশ চিনিয়া রাখেন এবং সেইজন্য এমন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন।

সেক্রেটারীয়েট আফিসের ঐ চাকরী করিতে করিতে একদিন দেখা করিতে গেলাম। কটন সাহেব বলিলেন, "আজ আমার কাছে তোমার পূর্ব্বে ৪৪ জন দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

একটু ক্লান্ত হইয়াছিলেন স্পষ্টই দেখিলাম। বলিলাম, "পেনালটী অফ গ্রেটনেস্"—উচ্চপদ প্রাপ্তির দণ্ডই এই।

খুব হাসিলেন। আমি বলিলাম, "আমার কায হইয়াছে; বলার বিশেষ কিছু ছিল না, আপনাকে ক্লান্ত বোধ হইতেছে; যাই।"

তিনি বলিলেন, "বস। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম; কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ঠিক করি নাই; তোমার কাছেই ঠিক খবর পাইব। এখনকার নূতন অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত প্রাচীন ডেপুটিদিগের কিরূপ সম্বন্ধ? আমি যখন মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলাম, সকল কথা গিয়া প্রাচীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিতাম। প্রথম প্রথম রায় লিখিয়া লইয়া গিয়া নথিসহ তাঁহাকে একবার দেখাইয়া লইতাম।"

আমি বলিলাম, "সেদিন আর নাই। ইংরাজ এবং ইংরাজী-শিক্ষিত এদেশীয় যুবকমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করে না।"

খুব হাসিলেন। পরে দুঃখিত ভাবেই বলিলেন, "এখন সকলেই নভেল পড়িয়া অল্পায়াসেই মানব জীবনের জটিল ব্যাপার সমস্ত আয়ত্ত করিতে পারা যায় মনে করে! ইতিহাস পড়িয়া তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িয়া এবং সকল লোকেরই সহিত একান্ত সহানুভূতির সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া, মানবসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন আছে মনে করে না।"

পূজ্যপাদ পিতৃদেব অন্তিম রোগশয্যা হইতে বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ একান্ত নিকট আত্মীয় এবং সুচরিত্র একটী যুবকের চাকরীর জন্য অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন। তখন ডেপুটিকালেক্টর দিগের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা লওয়া হইত। পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান যাঁহারা পাইতেন তাঁহাদের কয়েক জনকে নির্দ্ধারিত ভাবেই লওয়া হইত। বাকী খালি চাকরীগুলি পরীক্ষার্থীদিগের মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত বাছিয়া লওয়া হইত। ঐ উপলক্ষ্যে একদিন দেখা করিতে গেলে কটন সাহেব বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতার সুপারিস সম্বন্ধে আফিসে খবর লইয়াছিলাম। দীর্ঘকাল উচ্চপদে থাকিয়া এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের এরূপ সম্মান আকর্ষণ করিয়াও, আপনার লোকের জন্য সুপারিস যে একবারমাত্র করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী পাইয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার সুপারিস রক্ষা করিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট-সার্ভিসের উপকার করিলাম বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।"

যে সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত এই প্রকৃত কথাগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন।

যখন পিতৃবিয়োগের পরে ভ্রাতৃবিয়োগে একান্ত ভগ্ন-

হৃদয় হইয়া পড়ি এবং বড় বড় ড্রাফট চিঠির মুসাবিদা করা যেন বিষম ভারবোধ হইতে থাকে, তখন শ্রীযুক্ত ম্যাকফার্সান সাহেব আমার কথা কটনসাহেবকে বলায় কটন সাহেব আমাকে হুগলীতে বদলী করিয়া দেন। নিজেই বলেন, "উহার এখন বাড়ীতে থাকা দরকার।" কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গেলে বলিলেন, "তোমার দুঃখে আমি একান্তই দুঃখিত। দাউদনগরের খালের ধারে যে সদানন্দ ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম—সে চলিয়া গিয়াছে। ভারগ্রস্ত ভগ্নহৃদয় এক মানবকে সম্মুখে দেখিতেছি! পৃথিবীর গতিই এই। ভার যাহা পড়িল তাহাকে সমুচিত ভাবে গ্রহণ জন্য মেরুদণ্ডে জোর কর।"

সেই অসাধারণ সহানুভূতি হইতে (সাধু সন্ন্যাসীর নিকট আজ যেমন পাইয়া থাকি) অনেকটা বল হৃদয়ে পাইয়াছিলাম। উদার হৃদয় মহাত্মা কটন আজ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে—তাঁহার প্রকৃত স্থানে গিয়াছেন।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

বাসরে

তোমার সনে আমার মিলন নয়কো এগো
প্রথম আজ,
আদিম নিশার প্রথম প্রাতে পরেছি এই
বাসর সাজ!
আধেক-ভাঙা ঘুমের মাঝে প্রথম মোদের
আলিঙ্গন,
আজীবন তাই হৃদয় ভরে' জাগ্‌ছিল এই
আকিঞ্চন।
ফুলের বুকে সুবাস মত স্মৃতি ছিল
আধেক জাগি,
কে যেন কোন্ তরুণ আলোয় গাঁথ্‌ছে মালা
আমার লাগি।
হাসত চাঁপা,—ছায়ার সম মুখ যেন তোর
পড়ত মনে,
লুট্‌ত মলয় কণ্ঠে বুকে যেন গো তোর
পরশ সনে!

আজ্‌কে তোমার নীল বসনে উঠ্‌ছে দুলে
কি উচ্ছ্বাস,
হর্ষে নাচে এতদিনের রুদ্ধ শত
দীর্ঘশ্বাস!
শত ফাগুন বিরস মুখে ফিরিয়ে নেছে
পুষ্পডালা,
আজ্ যে সখি,—মালায় তব তাদের সবার
গন্ধ ঢালা!
যাইনি ভুলে তোমার দুটী নীলোৎপলের
উন্মাদনা,
অধর হ'তে যায়নি মুছে তোমার প্রেমের
আলিপনা!
বিফল শত সাধন আমার উঠ্‌ল দুলে
পুষ্পে ফলে,
আবার যে গো তরুণ আলো আঁধার পথে
উঠ্‌ল জ্বলে!
ধরার প্রথম বোধন হ'তে মোদের দোঁহার
এ বন্ধন,
ধরার শেষেও এমনি র'বে—অটুট অটল
চিরন্তন!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

মুক্তিনাথ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

২৩শে ফেব্রুয়ারী। অদ্য প্রাতে পশুপতিনাথ হইয়া গুহেশ্বরীর পাহাড়ে কিরাতেশ্বর শিবের মন্দিরে আসিলাম। স্থানটী অত্যন্ত নির্জ্জন। পশুপতিনাথদেবের অতি নিকটে থাকায় কিরাতেশ্বরের প্রতিপত্তি অতি কম। প্রাঙ্গণের মধ্যে একখানা খোলো টিনের ঘরের মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ। প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে যাত্রী থাকিবার একটী ঘর ও তোরণদ্বার দর্শনে মনে হয়, কোনও সময় কিরাতেশ্বর শিবেরও প্রতিপত্তি ছিল। যাত্রী নিবাসে কয়েকজন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন।

রাজসরকার হইতে কিরাতেশ্বর শিবের পূজার জন্য কোনও বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট নাই। ভক্তের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপরই পুরোহিতকে নির্ভর করিতে হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে পশুপতিনাথে যে সমস্ত যাত্রীর সমাগম হয় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কিরাতেশ্বর দর্শন করিয়া কিছু দান করেন তদ্দ্বারাই সম্বৎসর চলে। কিরাতী অধিবাসীরা মাঝে মাঝে পূজা দিয়া থাকে, তাহাতেও কিছু আয় হয়।

কিরাতেশ্বর দর্শন করিয়া এখান হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে বৌদ্ধদেবতা বোধনাথ দর্শনে গেলাম। একটী ভূটীয়া বস্তির মধ্যে বোধনাথের মন্দির। মন্দিরটীকে মধ্যবিন্দু করিয়া চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি বাড়ী। স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরটী নির্জ্জনে স্থাপিত নহে। জমি হইতে প্রায় একতালা দালানের ন্যায় উচ্চ পোস্তা, তাহার উপর একটী গম্বুজ। পোস্তার উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

প্রথমে সমস্ত পোস্তাটী প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পোস্তাটী বেষ্টন করিয়া তাম্রনির্ম্মিত প্রার্থনাচক্র। পোস্তার উপরে উঠিয়া পুনরায় মন্দির (গম্বুজটী) প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মন্দিরমধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি। মন্দির গাত্রেও অনেক রকম মূর্ত্তি খোদা আছে।

দেবদর্শনান্তর নিম্নে অবতরণ করিলে ভুটীয়া পোষাক পরিহিত একব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমার পরিচয় দিলে সে ব্যক্তি বলিল, তাহার নাম খাম্বা ইমা এবং সে চীনদেশীয়। (গাত্রের রং চীনাদের মত নহে, এবং চেহারা বা পোষাকে তাহাকে চীনা বলিয়া চেনা যায় না।) সে লাসাতে তাসিলামার ভৃত্য ছিল। তিব্বতের গোলযোগে তাসিলামার সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ আসে এবং বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং বৌ বস্তির অধিবাসী। কয়েকজন তিব্বতীয় সদাগর তীর্থভ্রমণে আসিয়াছে এবং সে তাহাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক ও দোভাষীরূপে আসিয়াছে। শিবরাত্রির পর কুটী পাসের পথে লাসা যাইবে।

তিব্বতীয় তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য খাম্বা আমাকে নিকটবর্ত্তী একটী দালানে লইয়া গেল। সেখানে একটী প্রকোষ্ঠে চারি পাঁচজন তিব্বতীয় মণ্ডলাকারে, কেহ উপবেশনে কেহ অর্দ্ধোপবেশনে কেহ বা শয়নে ছিল, মধ্যস্থলে একটী ছোট অগ্নিকুণ্ড। ২।৪টী ধূপশলাকা জ্বলিয়া সুগন্ধ দান করিতেছিল। প্রত্যেকের সম্মুখেই একটী পাত্রে চা ও অপর একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ খাদ্য।

আমার অবোধ্য কোনও ভাষাতে খাম্বা তাহাদিগকে কিছু বলিল, এবং তদ্রূপ অবোধ্য ভাষায় তাহারা উত্তর করিল। খাম্বা আমাকে হিন্দিতে বলিল, আমি খাম্বাকে হিন্দিতে উত্তর দিলাম। আলাপের সারাংশ যে, লাসা অতি সুন্দর ও পবিত্র স্থান, আমি যেন একবার লাসা

দর্শন করিয়া আসি এবং সেখানে গেলে যেন তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি।

আমাকে চা পানের জন্য অনুরোধ করিল, আমি ধন্যবাদের সহিত তাহা অস্বীকার করিলাম।

আমার সহিত খাম্বা নীচে আসিল এবং বাসা যাইবার কালে যেন দার্জ্জিলিঙ হইতে তাহাকে সঙ্গে নিয়া যাই এই অনুরোধ করিল।

বোধনাথ দর্শন করিয়া পশুপতিনাথের পথে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আগামীকল্য শিবরাত্রি। পশুপতিনাথ ও গুহ্যেশ্বরীর পাহাড়ে অনেক বিদেশী যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। পশুপতিনাথের পথে অবিরল জনস্রোত। ক্রমে সহরে আসিলাম। সহরময় কেবল তীর্থযাত্রী—যে যেখানে সুবিধা পাইতেছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কোনও দল আহার করিতেছে, কেহ বা নিদ্রা যাইতেছে, এক আনন্দোৎসব।

বৈকালে স্বয়ম্ভূনাথ ও সেখান হইতে এক মাইল উত্তরে বালাজীউ দর্শন করিয়া আসিলাম। বালাজীর মন্দিরটী অতি নিভৃতস্থানে।

মন্দির সম্মুখে একটী পুষ্করিণী ও তাহাতে অনেক রকম রঙ্গিন মৎস্য। কেহ মাছ না ধরে সেইজন্য সরকার হইতে পাহারার বন্দোবস্ত আছে।

বালাজীর মন্দিরের পশ্চিম দিকে এক পর্ব্বতে মহারাজের শিকারজন্য হরিণ ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হয়। এখানে অন্য কাহারও শিকার করিবার অধিকার নাই। এই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অন্য এক পর্ব্বতে "বাগ্ দোয়ারা"—বাগমতীনদীর অবতরণস্থান এবং সেস্থান হইতে কাঠমণ্ডু সহরে নলের জল (pipe-water) সরবরাহ করা হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য শিব চতুর্দ্দশী। অতি প্রত্যুষে পশুপতিনাথের মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। প্রথম দর্শনের দিনে পশুপতিনাথের পথে ও মন্দিরে নির্জ্জনতা—আর আজ সজনতা। কেবল "জয় শিও জয় শিও", "জয় পশুপতিনাথকি জয়" শব্দ সহস্র কণ্ঠ হইতে একত্র ধ্বনিত হইতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণে ও মন্দিরাভ্যন্তরে কত যে লোক তাহার সংখ্যা করা যায় না। যাত্রীদের মন্দির প্রবেশের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য মন্দিরের চারিদ্বারে উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত। তাঁহারা শৃঙ্খলা রক্ষা করিবেন কি? যে যেমন সুবিধা পাইতেছে জোর জবরদস্তি করিয়া মন্দিরে ঢুকিতেছে। সে যে কি এক অদ্ভুত ব্যাপার, স্বচক্ষে না দেখিলে কোনই ধারণা হয় না—বর্ণনা করা অসম্ভব। কাহারও হস্ত হইতে, পশুপতিনাথের মস্তকে প্রদান জন্য আনীত দুগ্ধ মন্দির প্রবেশ কালে লোকে সংঘর্ষে মন্দিরদ্বারেই পতিত হইল, কাহারও আনীত ফল ও ফুল দেবতার মস্তকে অর্পিত হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরে পড়িয়া গেল, কেহ বা অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দান করিয়া কৃতার্থ হইল। দুগ্ধে ফুলে বিল্বপত্রে জলে এক ঘণ্টার মধ্যেই বিগ্রহ লুক্কায়িত হইয়া পড়িলেন। সে সব অর্ঘ্য অপসারিত হইল; আবার অর্ঘ্য পড়িতে লাগিল—এক মহাসমারোহ ব্যাপার।

নানা দেশীয়, নানা পন্থী বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদধারী বিভিন্ন বয়সের কত যে স্ত্রী পুরুষের একত্র সম্মিলন হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। পার্ব্বত্য সুন্দরীগণ সকলেই আপন আপন সামর্থ্যানুসারে মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া দেবদর্শনে আসিয়াছেন। শিব চতুর্দ্দশীই নেপালের সর্ব্বপ্রধান উৎসব।

এক এক দল পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া গুহ্যেশ্বরী ও অন্যান্য মন্দিরে যাইতেছে, আবার নূতন লোক আসিতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে মেলা মিলিয়াছে। নানা জাতীয় পশুচর্ম্ম, তাম্র ও পিত্তল-নির্ম্মিত বাসন, লৌহ-নির্ম্মিত পশুপতিনাথের বলয়, পার্ব্বত্য ধূপ, বালক বালিকাদের নানারকম অদ্ভুত খেলানা, পরিচিত ও অপরিচিত বিবিধ দ্রব্যে দোকানগুলি পূর্ণ। কেহ দেখিতেছে, কেহ দরদস্তর করিতেছে, কেহ কিনিতেছে। কোথাও কেহ গান করিয়া, কেহ নর্ত্তন করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। কোথাও বা বিনা কারণে অনেকে সম্মিলিত হইয়া জটলা করিতেছে। প্রায় সমস্তদিন পশুপতিনাথ, গুহ্যেশ্বরী ও কিরাতেশ্বর দর্শন করিয়া থাপাথলীর সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রমে গেলাম।

আমরা (গৃহীরা) শিব চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া থাকি, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের ব্যবস্থা উল্টা। আজ তাঁহাদের ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা। নেপালী গৃহীদের বিষয় কিছু জানিতে পারিলাম না।

বৈকালে কুচ কাওয়াজের মাঠে (জায়গাটীর নাম মহংকল থান, মহাকালের মন্দির থাকাতে মহাকাল এবং উচ্চারণ দোষে মহংকল হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়) নেপালী সৈন্যদের রিভিউ। অশ্বচালনা ও নানাবিধ বীরোচিত ক্রীড়া তাহারা দেখাইয়া থাকে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—কোন নিষ্কর্ম্মা বিদেশী, রাজাদেশ ব্যতীত ৭ দিবসের অধিককাল নেপালে থাকিতে পারে না। আমার এখানে পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। মুক্তিনাথ সম্বন্ধে যদিও কোন তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তথাপি সেখানে যাওয়ার আশা একেবারে পরিত্যাগ করি নাই। নেপালে অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতেও আরও কয়েকদিন লাগিবে। দুই দিনে শেষ হইবে না। এই সব কারণে আমার আরও কয়েকদিন নেপালে থাকিবার ইচ্ছা এবং তদ্রূপ অনুমতি প্রাপ্তির জন্য অদ্য সকালে কলেজের অধ্যক্ষ বাবু বটকৃষ্ণ মৈত্রেয় এম্-এ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। মহারাজ বাহাদুরের নিকট হইতে তিনি অনুমতি আনাইয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

বটকৃষ্ণ বাবুর বাসা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি এখানকার পুলিস সুপারইনটেন্‌ডেণ্ট্‌ ক্যাপ্টেন্ এস্, পি, (শিওপ্রতাপ) থাপ্‌পা বি, এস্‌-সি মহোদয় আমাদের বাসায় উপস্থিত। তিনি বলিলেন যে আমার আগমন বার্ত্তা মহারাজ বাহাদুরের নিকট পৌঁছিয়াছে এবং এখানে আমার কোন রকমের কোন অসুবিধা হইতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য মহারাজ বাহাদুর তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমার কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা থাকিলে আমি কাপ্তান সাহেবকে জানাইতে পারি এবং সরকার হইতে আমার সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

অধ্যাপক সঙ্ঘে আমি অতি সুখে আছি এবং আমার অভাব কিছুই প্রথিতব্য নাই। আমার মত একজন ক্ষুদ্র মনুষ্যেরও তত্ত্ব যে মহারাজ বাহাদুর নিয়াছেন তাহার জন্য মহারাজ বাহাদুরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

২৬শে ফেব্রুয়ারী। কয়েক জন বন্ধু সহকারে অদ্য সকালে নেপালের প্রাচীন রাজধানী ললিতপাটন বা পাটন দর্শনে চলিলাম।

ঠাকুরী বংশীয় পঞ্চম রাজা বীরদেব ললিতপত্তন প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথ্বী নারায়ণের নেপাল অধিকারের সময়ে ইহা নেপালের একতম রাজধানী ছিল। তিনটী রাজধানীর মধ্যে এইটীই অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল।

১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে পৃথ্বী নারায়ণ পাটন অধিকার করিলে পাটনের কি দশা হইয়াছিল সে ইতিহাস আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। তখন হইতেই নগরটী শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

নগরটী মণ্ডলাকার এবং আকৃতিতে বিষ্ণুচক্রের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। প্রাচীন নগর-প্রাকার ও তোরণ দ্বার এখন প্রায় সর্ব্বত্রই ধ্বংসমুখে পতিত, স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ তিরোহিত।

রাজবাটীকে কেন্দ্র করিয়া নগরটী নির্ম্মিত। রাজবাটীর উত্তর অংশ এখন সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজবাটীর পশ্চিম দিকে একটী উন্মুক্ত চত্বর। এই চত্বরে নানা আকারের এবং নানাবিধ স্থাপত্য আদর্শের অনেকগুলি হিন্দু দেবমন্দির। এক মন্দিরে একটী বিরাট্ তাম্র ঘণ্টা দোদুল্যমান। চত্বরের এক স্থানে একটী অতি উচ্চ প্রস্তর ফলক মৃত্তিকায় প্রোথিত।

যদিও পাটনের নেওয়ারগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, রাজ পরিবার হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই নিমিত্তই রাজবাটীর নিকট হিন্দু মন্দিরের আধিক্য।

রাজবাটীর উত্তর দিকে একটী অতি উচ্চ বৌদ্ধ মন্দির এবং মন্দির প্রাঙ্গণে একটী পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর জল বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র।

নগরের বিভিন্ন অংশে অনেক গুলি উন্মুক্ত চত্বর (square) এবং অনেক বৌদ্ধ মন্দির আছে।

রাজবাটী দর্শনান্তর কয়েকটী বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করিলাম। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরকে মধ্যবিন্দু করিয়া চতুর্ভুজ আকারে অট্টালিকা। প্রাচীন সময়ে এইগুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিহার ছিল, এখন এখানে নেওয়ারেরা স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে বাস করে। পাটনে এইরূপ পঞ্চদশটী বৃহৎ ও অনেকগুলি ক্ষুদ্র বিহার আছে।

নগরের পশ্চিম প্রান্তে একটী প্রকাণ্ড সরোবরের পশ্চিম তীরে একটী অতি প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্য, দক্ষিণ তীরে একটী হিন্দু মন্দির।

পাটন নগরের আয়তন অনুপাতে লোক সংখ্যা অনেক কম। রাজবর্ত্ম সমুদয় প্রশস্ত, উভয়পার্শ্বে দোকান, বাড়ী এবং দেবালয়। পাটনে পিত্তল ও তাম্র বাসন অনেক প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। পিত্তল নির্ম্মিত ছোট বজ্র ওখানকার একটী বিশেষ জিনিষ।

নগর-প্রাকারের বহির্দ্দেশে অতি বৃহৎ চারিটী বৌদ্ধ মন্দির। ইহাদের স্থাপত্য আদর্শ নেপালের অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পশ্চিম প্রান্তরের কিঞ্চিৎ দূরে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী এবং নিকটবর্ত্তী একটী টিলার উপর একটী বৌদ্ধ মন্দির।

পাটন নগরে রোমান্ ক্যাথলিক মিশনরীদিগের একটী আশ্রম ছিল। রাজা রাজ্যপ্রকাশ মল্লদেবের রাজত্ব কালে এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃীষ্টীয়ানগণ প্রথমতঃ চীন রাজধানী পিকিং হইতে তিব্বতের রাজধানী লাসায় এবং পরে তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া নেপালে আগমন করেন। পাটনের রাজা ইহাদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।

গোর্খারাজ-কর্ত্তৃক পাটন অধিকৃত হইলে খৃীষ্টীয়ানগণ পাটন ত্যাগ করিয়া বৃটিশ ভারতবর্ষে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয়ী গোর্খা সৈন্যগণ নগর অধিকারের পর লুণ্ঠন ও হত্যা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও পৃথ্বী নারায়ণের এক পুত্রের আনুকূল্যে ক্যাথলিক পুরোহিত ফাদার গুই সেপ্পে সশিষ্যে সমস্ত সম্পত্তি সহ বেতিয়ায় আগমন করিতে পারিয়াছিলেন। বেতিয়ার রাজা ইহাদিগকে আশ্রয় দান করেন এবং তদবধি এই নেওয়ার খৃীষ্টীয়ান মণ্ডলী বেতিয়া রাজ্যে আছে।

পাটন নগর ও নগরের বহির্ভাগ দর্শন করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির দর্শনে আসিলাম। নগরের উপকণ্ঠে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির।

এই মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহ আছে। তোরণযুক্ত একটী চত্বরের মধ্যস্থলে মন্দিরটী নির্ম্মিত। মন্দিরের চারিদিকে একটী অনুচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীরের উপরে ও চত্বরের স্থানে স্থানে স্তম্ভের উপর নানারকম ছোট ছোট পাথরের পুতুল। পুতুলগুলি অত্যন্ত সুন্দর ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট। স্থানে স্থানে দুই একটী পুতুলের স্থান শূন্য দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, কোন কোন যাত্রী উহাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মসাৎ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই।

বৈশাখী শুক্লা প্রতিপদে মৎস্যেন্দ্রনাথের স্নানযাত্রা। তাহার দশ দিন পরে তাঁহার রথযাত্রা।

গোরখ্‌নাথ নেপালে জলকষ্ট উৎপাদন করিলে পাটনের রাজা নরেন্দ্রদেব মৎস্যেন্দ্রনাথকে পাটন নগরে আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বীয় গুরুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে গোরখ্‌নাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাটনে আগমন করিয়াছিলেন। যে বৃক্ষতলে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখ্‌নাথের সহিত রাজা নরেন্দ্রদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, রাজা সেই স্থানে একটী মণ্ডলাকার প্রস্তর বেদিকা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথের মাতা জ্ঞানদায়িনী দেবীর স্মৃতিতে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

স্নান যাত্রার দিবসে মৎস্যেন্দ্রনাথের বিগ্রহটীকে মন্দির হইতে এই প্রস্তর মণ্ডলে আনয়ন করা হয় এবং পবিত্র জলে স্নান করান হয়। স্নানান্তে বিগ্রহটীকে পুনরায় মন্দিরে আনয়ন করা হয়। দশদিন পর্য্যন্ত বিগ্রহের অঙ্গরূপ এবং বস্ত্রালঙ্কার সজ্জা হয়, তৎপরে পত্র পুষ্প সুশোভিত রথে আরোহিত করাইয়া রথ পাটন সহরে এবং তথা হইতে পুনরায় মন্দিরে টানিয়া আনা হয়। স্নান যাত্রা হইতে বিগ্রহকে মন্দিরে পুনরানয়ন পর্য্যন্ত উৎসব প্রায় দুই মাস কাল স্থায়ী।

এই স্নান যাত্রা ও রথ যাত্রা নেওয়ারদের (হিন্দু বৌদ্ধ অভেদে) জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের অনুকরণে কাঠমণ্ডুতে গোর্খারাও মৎস্যেন্দ্রনাথের একটী উৎসব করে। সে উৎসব চৈত্রমাসে এবং চারি দিন স্থায়ী। কাঠমণ্ডুতে মৎস্যেন্দ্রনাথ সামন্তভদ্র এবং বিগ্রহ শ্বেতবর্ণ; পাটনে তিনি আর্য্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ব এবং বিগ্রহ রক্তবর্ণ।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নেপাল কলেজের লাইব্রেরীয়ান্ মুক্তিনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। সুধীর বাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অদ্য দুই প্রহরে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিনাথের রাস্তা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলাম। পথের দুর্গমতা এবং আনুসঙ্গিক সর্ব্ব রকমের অসুবিধার কথা বলিয়া এই সকল কষ্ট স্বেচ্ছায় আমার বরণ করা সঙ্গত হইবে কি না তাহা বিশেষ রূপে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়া পণ্ডিতজী বিদায়গ্রহণ করিলেন।

অদ্য কোথাও বাহির হই নাই। বৈকালে মাঠে বাহির হইলাম। অপরাহ্ণ ভ্রমণ সময় ক্যাপ্‌টেন্ থাপ্‌পা সংবাদ দিয়া গেলেন যে, মহারাজ বাহাদুর আমাকে দর্শন দানে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং আগামী ১লা মার্চ্চ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আমাকে দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়াছেন।

নেপাল রাজ-দরবারের কায়দা কানুন আমি কিছুই জানি না। আমাকে কি ভাবে অভিবাদন করিতে হইবে, কি ভাবে মহারাজের সম্মুখীন হইতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে বন্ধুবর্গ রাত্রে আমাকে উপদেশ দিলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—গত রাত্রে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল। আকাশ এখন বেশ পরিষ্কার। অদ্য নেপালের অন্যতম রাজধানী ভাটগাঁও দর্শনে চলিলাম। দক্ষিণা কালী যাইতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অদ্যও সেইরূপ বন্দোবস্ত।

কাঠমণ্ডু হইতে ভাটগাঁওয়ের রাস্তা প্রায় সমতল—অবশ্য পার্ব্বত্য রাস্তার হিসাবে। প্রায় ১১টার সময় ভাটগাঁও পৌছিলাম। পাটন অপেক্ষা এ সহরটী অনেক হীন। এখানকার স্থাপিত দেবতা "দত্তাত্রেয়ী"। প্রথমতঃ দত্তাত্রেয়ীর মন্দিরে দেবীদর্শন করিলাম। তাহার পর সহরটী দেখিয়া পুরাতন রাজবাটী আসিলাম। ভাটগাঁও সহরটি নারায়ণের শঙ্খাকৃতি বলিয়া প্রবাদ। গোর্খারাজ কর্তৃক নেপাল বিজয়ের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাটগাঁও রাজা কাঠমণ্ডু ও পাটনের রাজার উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেন। ভাটগাঁওয়ের রাজাকে পরাজিত করিয়াই পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল বিজয়-কার্য্য সম্পূর্ণ করেন।

ভাটগাঁওয়ের রাজা বিনা যুদ্ধেই পৃথ্বীনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করেন, এই জন্য ভাটগাঁও বিজেতা গোর্খার হস্তে পাটন কিংবা কীর্ত্তিপুরের ন্যায় বিধ্বস্ত হয় নাই। বিশেষতঃ ভাটগাঁওয়ের নেওয়ার রাজা ও অন্যান্য নেওয়ারেরা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।

ভাটগাঁওয়ের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সূর্য্যবিনায়ক গণেশের মন্দির।

কাঠমণ্ডু ভাটগাঁওয়ের পথে, ভাটগাঁও হইতে অল্প পশ্চিমে রাস্তার উত্তর পারে একটি অতি সুন্দর ও প্রকাণ্ড সরোবর—নাম "সিদ্ধ পোখ্‌রী"। সরোবরটি ৩০০ গজ দীর্ঘ ও ১০০ গজ বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ দেওয়াল ও চারি পারে চারিটি তোরণ। ১৬৪০—৫০ খৃীঃ রাজা প্রতাপ মল্ল এই সরোবর খনন করান এবং পরে মন্ত্রী ভীমসেন থাপ্‌পা ইহার পঙ্কোদ্ধার ও জীর্ণসংস্কার করাইয়া চীন হইতে আনীত সুবর্ণ মৎস্যে সরোবরটি পূর্ণ করেন। রাস্তার দক্ষিণ পারে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র কানন পোখরা নামে আর একটি সরোবর। এই দুইটি সরোবরের চতুর্দ্দিকে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পার্ব্বত্য প্রদেশে এত বড় বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি অতি সুন্দর দৃশ্য।

ভাটগাঁও দর্শন করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

১লা মার্চ্চ। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করি। কলেজের অধ্যক্ষ বাবু বটকৃষ্ণ মৈত্রেয় এবং ক্যাপ্টেন্ থাপ্‌পার মধ্যবর্ত্তিতায় মহা-

রাজের সহিত আমার সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

প্রায় ৩-৩০ মিনিটের সময় আমি মহারাজের বাড়ীর সিংহ দরজায় উপস্থিত হইলাম। আমাকে কিছুক্ষণ সিংহ দরজার বাহিরে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অর্দ্ধঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন্ থাপ্পা আসিয়া আমাকে সিংহ দরজার পরপারে লইয়া গেলেন এবং এক স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সেই স্থানটাকে ইংরাজী ভাষায় গার্ড রুম বলা যাইতে পারে। সেখান হইতে মহারাজের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হয়। মহারাজের প্রাসাদ এবং সিংহ দরজার মধ্যে অনেকটা বিস্তৃত খোলা যায়গা। এই অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে গাড়ীর ও লোক চলাচলের রাস্তা। মহারাজের কিংবা ধিরাজের অথবা অত্যুচ্চ মর্য্যাদা বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ভিন্ন অপর সাধারণের যানবাহন সিংহ দরজা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আরোহীকে সিংহ দরজায় অবতরণ করিয়া পদব্রজে আসিতে হয়।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বাদ্যমঞ্চ। সমস্ত অঙ্গনটীতে মখমলের গালিচার ন্যায় দুর্ব্বাদল—সমানি, সমশীর্ষাণি, ঘনানি। এই দুর্ব্বার গালিচার উপর দুই একখানি ইংরাজী আসন ইতস্ততঃ স্থাপিত।

মহারাজ বাহাদুর সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাজ্যসংক্রান্ত অতীব প্রয়োজনীয় কার্য্য না থাকিলে কোন অমাত্যেরই সে দিন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অধিকার নাই। মন্ত্রণা সভার অবসানে মহারাজ বাহাদুর স-পারিষদ্ কিছুক্ষণ এই দুর্ব্বাদলের উপর পদচারণ করেন এবং পরে অপরাহ্ণ ভ্রমণ জন্য মোটর গাড়ীতে পুরীর বাহিরে আসেন।

আমার গার্ডরুমে উপবেশনের অল্পকাল পরে মহারাজ বাহাদুর প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অঙ্গনে আসিলেন। যে অল্প রৌদ্রটুকু আছে তাহা হইতে মহারাজের মস্তক রক্ষা করিবার জন্য মখমলের কাপড়ে জরীর কাষ করা একটী প্রকাণ্ড ছত্র বহন করিয়া ছত্রধর মহারাজের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। পারিষদ্‌বর্গ সকলেই ছত্র-পরিধি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া মহারাজের অনুসরণ করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পর কাপ্তান সাহেব আসিয়া আমাকে রাজাদেশ জানাইলেন যে আমি মহারাজের নিকট যাইতে পারি। আমি তখন মহারাজের সম্মুখীন হইলাম এবং সৈনিক প্রথামত অভিবাদন করিলাম। মহারাজ বাহাদুরও সৈনিক প্রথামত প্রত্যভিবাদন করিলেন।

শিরস্ত্রাণ-বিহীন অবস্থায় মহারাজের সম্মুখীন হওয়া ভদ্রনীতি-বিরুদ্ধ। আমি সাহেবী পোষাকের উপর মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া গিয়াছিলাম। নেপালীরা কিংবা নেপাল প্রবাসী বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ টুপি (cap) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালরাজের বৃত্তিভোগী অথবা নেপালরাজ্যের প্রজাদিগকে মহারাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুসারে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য মুদ্রা "নজর" দিতে হয়। মহারাজ তাহা গ্রহণ করেন না, যাহার মুদ্রা তাহাকেই প্রত্যর্পণ করা হয়।

আমি ভিন্নরাজ্যের প্রজা—তীর্থযাত্রী। তদুপরি মহারাজ ক্ষত্রিয় আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সুতরাং "নজর" দেওয়ার রীতি আমার প্রতি প্রযুজ্য নহে বিবেচনা করিয়া আমি মহারাজকে কোন "নজর" দিই নাই।

আমার অনুমান অনুসারে মহারাজ বাহাদুরের বয়স ষাট বৎসরের উর্দ্ধে। শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মঠ, বার্দ্ধক্যের কোনও লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায় নাই। মহারাজের পরিধানে নেপালী পোষাক, তাহার উপর পুরু শীত কাপড়ের সাহেবী ফ্যাসানের একটি কোট, পায়ে নেপালী জুতা, মাথায় রক্তবর্ণ 'ফোরেজ্ ক্যাপ'। এই রক্তবর্ণ শিরস্ত্রাণ মহারাজের মর্য্যাদাজ্ঞাপক বিশেষ চিহ্ন। কোনও প্রকার মণিমুক্তার অলঙ্কার নাই।

অভিবাদন অন্তে আমি প্রথমেই মহারাজ বাহাদুরকে জানাইলাম যে আমার শ্রুতি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল।

আমার সঙ্গে আলাপ ও পদচারণ সুবিধাজনক হইবে না বোধ হয় এই আশঙ্কায় মহারাজ বাহাদুর একখানি আসনে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ বাহাদুর ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। আমার সহিত

ইংরাজীতেই আলাপ করিলেন, কাযেই কোন দোভাষীর প্রয়োজন হইল না।

প্রথম অল্প কিছু আলাপের পরই মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি স্বেচ্ছায় মুক্তিনাথ যাত্রার কষ্ট ও বিপদ কেন বরণ করিতে যাইতেছি? কাঠমণ্ডু হইতে মুক্তিনাথ প্রায় ১৮ দিনের পথ। সমগ্র পথ অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া, সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে তুষার স্তূপও অতিক্রম করিতে হইবে। হাঁটিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য রকম সহজ ও সুলভ উপায় নাই। (কাঠমণ্ডু হইতে পোখ্‌রা পর্য্যন্ত ১০ দিনের পথ ঘোড়া বা কাণ্ডিতে যাওয়া যায় কিন্তু তাহা অতীব ব্যায়সাধ্য)। পথে পোষ্ট অফিস নাই, টেলিগ্রাফ নাই (ত্রিশূলী ও পোখরাতে মাত্র পোষ্ট আফিস আছে) যে কোন রকম সংবাদ পাঠাইতে পারিব। ডাক্তার নাই কি চিকিৎসালয় নাই যে, অসুস্থ হইলে কোন প্রকার চিকিৎসা হইবে। ইহার উপর আমার বয়সও হইয়াছে, এবং শরীরটিও কিছু স্থূল।

মহারাজ বাহাদুর যে সমস্ত অসুবিধার কথা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য। আমি যে কেন এ সব কষ্ট ও অসুবিধায় নিজেকে ফেলিতে যাইতেছি, তাহার কোন কারণ আমি বলিতে পারিলাম না। মহারাজ বাহাদুরকে এই মাত্র জানাইলাম যে, আমার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা জন্মিয়াছে যে একবার মুক্তিনাথ দর্শন করিয়া আসিব।

মহারাজ বাহাদুর আমার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, তাঁহার রাজ্যে আমাকে ভ্রমণের অনুমতি প্রদাম করিলেন এবং সরকার হইতে একজন পথ-প্রদর্শক আমার সঙ্গে দিতে আজ্ঞা দিলেন। এতদ্ব্যতীত কাঠমণ্ডু হইতে মুক্তিনাথ এবং তথা হইতে বটেল-এর পথে ব্রিজম্যানগঞ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, তাঁহাদের নিজ নিজ জেলার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত একজন পুলিশ প্রহরী আমার সঙ্গে দিতে হইবে। সর্ব্বত্রই সরকার হইতে আমার জন্য জ্বালানী কাঠের সরবরাহ করিতে হইবে এবং আমার প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

মহারাজ বাহাদুরের এই দয়ার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বাসায় আসিলাম ও বন্ধুবর্গকে সংবাদ দিলাম।

২রা—৭ই মার্চ্চ। এই কয়দিন আর বিশেষ কোথাও বাহির হই নাই। ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে কীর্ত্তিপুর এবং তীর্থ হিসাবে "বুড়া নীলকণ্ঠ" ও "বজ্র যোগিনী" দর্শন বাকি রহিল।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় "বদর জুগ্‌নী" (শুদ্ধ ভাষায় বজ্রযোগিনী) নামে একটা গ্রাম আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক দীপঙ্কর বজ্রযোগিনী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা তাঁহার আরাধ্যা দেবীর নামানুসারে তাঁহার জন্ম গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী রাখেন। কাহারও কাহারও মতে দীপঙ্কর বাঙ্গালী ও বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের অধিবাসী। রাজা রায় বল্লভের জীবনচরিত-প্রণেতা উকীল বাবু রসিকলাল গুপ্ত বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" নামে দীপঙ্করের বসত বাটীও আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। নেপালে আসিয়া জানিলাম যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান তিব্বতের অতি নিকটে এবং দুই শতাব্দীরও কিঞ্চিৎ অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবিত ও বৌদ্ধ রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত নেপালে বজ্রযোগিনী নামে একটা গ্রাম আছে এবং তথায় বজ্রযোগিনী নামে স্থাপিতা এক দেবী আছেন। নেপালীরা দীপঙ্করকে দাবী করে কিনা জানিনা।

যাক্ সব ঐতিহাসিক গবেষণার কথা। হিমাচল লঙ্ঘনে আমার একটী সঙ্গীর প্রয়োজন এবং সহযাত্রীও একজন জুটিলেন। তিনি শ্রীহট্টদেশীয় ব্রাহ্মণ। এফ্, এ, পর্য্যন্ত অধ্যায়ন করিয়া শিলং একাউণ্টেণ্ট্ জেনেরল আফিসে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। কিছুদিন চাকুরী করিয়া এবং তদপেক্ষ অধিক দিন "মেডিকেল ছুটী" ভোগ করিয়া দশ বৎসর হইল চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অকৃতদার ব্রহ্মচারী, শন্ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল বাবু তারাকিশোর চৌধুরী কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে স্থাপিত বিগ্রহের পূজারী। তারাকিশোর বাবুও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য লোকদিগের

সহিত পশুপতিনাথ দর্শনে আসিয়াছেন। তারাকিশোর বাবু কাঠমণ্ডু ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচারীজী আমার সঙ্গী হইবেন।

৫ই মার্চ্চ সাধু সন্ন্যাসিগণ রাজ সরকার হইতে 'বিদায়" প্রাপ্ত হইবেন, তাহার পর তাঁহাদিগকে কাঠমণ্ডু ছাড়িতে হইবে। সুতরাং ৬ই মার্চ্চের পর আমাদিগকে কোনও দিন মুক্তিনাথ অভিমুখে রওয়ানা হইতে হইবে।

ধর্ম্মঘট যেন একটা সংক্রামক ব্যাধি। সাধু সন্ন্যাসীরাও ইহার আক্রমণ হইতে ত্রাণলাভ করিতে পারেন নাই। ৪ঠা মার্চ্চ বৈকালে কোন কোনও সাধু সন্ন্যাসী মৎলব আঁটিলেন যে উর্দ্ধতম দান পঞ্চদশ ও নিম্নতম দান সপ্ত মুদ্রা না হইলে তাঁহারা রাজদান গ্রহণ করিবেন না। ধর্ম্মঘট-প্রস্তাবকারীরা তাঁহাদের এই মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া প্রায় সকল সাধু সন্ন্যাসীদের নিকটেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশের মত না হওয়াতে ব্যাপকরূপে ধর্ম্মঘট হইতে পারিল না। তবে কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী দান গ্রহণ করেন নাই।

৫ই মার্চ্চ রাত্রি হইতেই সাধু সন্ন্যাসিগণ কাঠমণ্ডু ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। গৃহস্থ যাত্রীরা ইহার বহু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। ৬ই প্রাতে তারাকিশোর বাবু ও তাঁহার সঙ্গী সকলে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্থির করিলাম যে আমি ও ব্রহ্মচারী ৮ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে মুক্তিনাথ অভিমুখে যাত্রা করিব।

৭ই মার্চ্চ সকালবেলা বটকৃষ্ণ বাবু গাইডকে সঙ্গে লইয়া নিজেই আমাদের বাসায় আসিলেন। আমারই সঙ্গে গাইডকে যাইতে হইবে এই বলিয়া আমাকে চিনাইয়া দিলেন। গাইড দুই খানি লিখিত রাজাদেশ আমার হস্তে দিল। আগামী কল্য প্রত্যুষে আমি রওয়ানা হইব সে যেন অদ্য রাত্রেই আমাদের বাসায় আসিয়া থাকে তাহাকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলাম।

বটকৃষ্ণ বাবু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল নেপালে আছেন। তাঁহার নেপালে প্রথম আসা অবধি অদ্য পর্য্যন্ত অনেক ঘটনার কথা—বলিলেন। অনেক প্রকার উপদেশ দিলেন। শেষে রহস্য করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার এই দীর্ঘ নেপাল-প্রবাসের মধ্যে কোনও বাঙ্গালী মুক্তিনাথ গিয়াছেন তিনি অবগত নহেন; আমি যদি দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি তবে খুব একটা "বাহাদুরীর" কায করিয়াছি বলিয়া গল্প করিতে পারিব।

বটকৃষ্ণ বাবু চলিয়া যাওয়ার পর যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। আয়োজনে লাগিয়া পড়িলেন বন্ধুবর্গ এবং তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুধীর বাবুর দুইটী নেওয়ার ছাত্র ও বাবু অমরনাথ বসু। অমর বাবুর নেপালে কোন বিষয়কর্ম্ম নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এখানকার মহিলা ডাক্তার, অমর বাবু তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ থাকেন। যে কোন বাঙ্গালীর বাসাতে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক্ না কেন, তাহাই অমর বাবুর নিজের কার্য্য।

নেপাল হইতে মুক্তিনাথ ১৮ দিনের পথ। সমুদ্রবক্ষ হইতে ১১০০০ হাজার ফিট উচ্চ। তিব্বতের রাজধানী লাসা (৯৩৪১ ফিট) ও বদরিকাশ্রম (১০২৮৪) হইতেও উচ্চ, এই মাত্র জানা আছে। অত্যন্ত শীতের আশঙ্কায় তিনখানা কম্বল ও একখানা লেপের উপর আরও এক খানা কম্বল ক্রয় করিলাম। দুই যোড়া রোপসোল জুতার উপর তৃতীয় আর এক যোড়া নেপালী রোপসোল্ জুতা, ছাতা, দেশলাই, মোমবাতি, পিতলের পাতলা বাসন, কুইনিন, গা ব্যথার ঔষধ, কার্ব্বলিক এসিড্, ইউকেলিপ্টাস অয়েল ইত্যাদি আবশ্যক ও অনাবশ্যক জিনিষ ক্রয় করা গেল।

কুলী কন্ট্রাক্টার গণেশদাস সুভার আফিসে যাইয়া কুলী ঠিক করা হইল। কুলীর নেপালী আখ্যা ভারিয়া। কাঠমণ্ডু হইতে মুক্তিনাথ এবং তথা হইতে ত্রিজম্যানগঞ্জ পর্য্যন্ত মজুরী বাট মোহর অর্থাৎ চব্বিশ টাকা, "আপন খানু"—খাওয়া তাহার নিজের খরচে। আমাকে নেপালীর চারি পয়সা অর্থাৎ অর্দ্ধআনা ভারিয়ার "খাজা খাবার" (জল খাওয়ার) জন্য দৈনিক দিতে হইবে।

গণেশদাস সুভাকে ১২ টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে নেপালী ভাষায় নেপালী কাগজে ছাপান "ফরমে"

রসীদ গ্রহণ করিলাম। ত্রিজম্যানগঞ্জ পৌঁছিয়া ভারিয়াকে বাকী ১২ টাকা দিতে হইবে এবং এই রসীদে "মাল বুঝিয়া পাইলাম" লিখিয়া রসীদ দিতে হইবে। ভারিয়া এই রসীদ দেখাইয়া জমা ১২ টাক. পরে লইবে।

রাত্রে নেপালপ্রবাসী আরও কয়েকজন বাঙ্গালী আসিলেন। নানা প্রকার আলাপের মধ্যে একজন বলিলেন, "আপনারা পাঁচ জন (আমি, ব্রহ্মচারী, গাইড, ভারিয়া নিত্যসঙ্গী, আর এক জেলার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত একজন পুলিশ প্রহরী) মহাপ্রস্থান করিলেন, আপনি যেন দলের অগ্রে গমন না করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা পিতা পুত্রে এক পথে চলিবার সময় পিতার পায়ে কাঁটা ফুটিলে তিনি "উহু" করেন না, পাছে পুত্রটি সাবধান হইয়া কাঁটাটী এড়াইয়া যায়। আপনি দলের প্রথমে চলিলে আপনার পশ্চাদ্‌গামী ব্যক্তির কোনই উপকার হইবে না, কিন্তু অন্য কেহ অগ্রে গেলে সে "উহু" করিবে এবং আপনি সাবধান হইতে পারিবেন।"

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

আমাদের এরূপ একটা খ্যাতি আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং সে খ্যাতিটা যে কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত তাহাও ঠিক জানা যায় না।

গল্প প্রচলিত আছে যে বারেন্দ্রকুলতিলক বিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিত উদয়ন-আচার্য্য একদিবস ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন যে, পরলোকে স্বর্গলাভ নিমিত্ত ইহকালে যাগযজ্ঞ করা এবং কৃচ্ছ্রসাধন এ সমস্ত বিফল নহে*। উপদেশান্তে তিনি ছাত্রদের মুখের ভাবে বুঝিতে পারিলেন যে ছাত্রগণ তাঁহার এ মতটি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তখন আচার্য্য ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা কি মনে করে "কেনচিৎ প্রতারকেণ স্বর্গাদি ফলকতয়া যাগাদিকং প্রকল্প্য স্বয়মন্থ্যায় ধন্বিতো লোকঃ প্রবর্ত্ততে" "ক এবং লোকোত্তর যঃ পরপ্রতারণার্থ নানাবিধ ক্লেশহেতুক কর্ম্মভিরাত্মানমবসাদয়েৎ ?"

পশ্চাৎ হইতে কোন ছাত্র অনুচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল, "কশ্চিৎ বারেন্দ্রঃ !"

নানারকম গল্পগুজব ও কথাবার্ত্তার পর সকলে স্ব স্ব আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নির্ব্বিঘ্নে মুক্তিনাথ দর্শন করিয়া যেন দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি এই শুভ ইচ্ছা সকলেই জ্ঞাপন করিলেন।

গাইড, ভারিয়া এবং ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারীজী আজ অধ্যাপক বন্ধুদের অতিথি। তিনি আজ স্বপাকভোজী। তাঁহার জন্য অতন্ত্র পাকের আয়োজন হইল। গাইড ও ভারিয়া আহার শেষ করিয়া আসিয়াছিল।

আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র আচার্য্য।

* বিফলা বিশ্ববৃত্তির্নো ন দুঃখৈক ফলাপি বা।
দৃষ্টলাভফলা নাপি বিপ্রলম্ভোঽপি নেদৃশঃ।
কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক ৬ কারিকা।

অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শালকত্রয়ের শেষ লীলা ও সুভাষিণীর বিবাহ।

বিচারক বিচার করিয়া, মদ্যপান অপরাধ জন্য, সুধীরনাথের দণ্ড প্রদান করিলেন,—দশ টাকা জরিমানা অথবা ভদভাবে দশ দিন কারাবাস। সুধীরনাথের ভ্রাতারা আপনাদের সাময়িক আর্থিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া জরিমানার অর্থ প্রদান করিল না; সুতরাং সে কারাগারে প্রেরিত হইল।

এই সময় কৃষ্ণবাবু কেদারনাথের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, পরবর্ত্তী শনিবারে সন্ধ্যাকালে

তিনি দুই চারিজন বন্ধুর সহিত পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন।

বুদ্ধির কি কৌশলে আশীর্ব্বাদ কার্য্যটা আরও কয়েকদিন পরে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, কেদারনাথ তাহা দুইদিন ধরিয়া চিন্তা করিল। কিন্তু তাহার সকল কৌশল কৌশলময়ের অমোঘ কৌশলে ব্যর্থ হইয়া গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে অঘোরনাথ সংবাদ দিল যে, সুধীরনাথের প্রবল জ্বর ও যকৃৎ বিকার ঘটায় সে কারাগার হইতে হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে সে পলতা নামক লতার ফল তুলিতেছে। সে আর বিবাহ করিবে না। অঘোরনাথ আরও সংবাদ দিল যে, বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়ার বাকী টাকা আদায় জন্য নালীশ রুজু করিয়াছে।

শুনিয়া ভ্রাতৃশোকাতুর কেদারনাথ অন্যস্থানে আপনার বুদ্ধির মহিমা প্রচার করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাকালে অঘোরনাথ সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলে ব্যবহার-উপযোগী বস্ত্র তৈজস এবং অবশিষ্ট অর্থ একটা পেটক মধ্যে সংগ্রহ করিয়া কেদারনাথ ভৃত্যকে ও পাচককে কার্য্যান্তরে পাঠাইল; এবং তাহাদের অনুপস্থিতিকালে একটি মুটে ডাকিয়া তাহার মাথায় পেটকটি স্থাপিত করিল। পরে মুটিয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া সে বাটী ত্যাগ করিল; এবং কিছুদূরে আসিয়া একটা অশ্বশকট ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অনেক বুদ্ধি চালনা করিয়া হাওড়ার পরবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য একখানি তিন পয়সা মূল্যের হরিদ্রাবর্ণের টিকিট ক্রয় করিল। এবং পেটকটি ষ্টেশনের একটি বেঞ্চের উপর স্থাপিত করিয়া উহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

অল্পকাল মধ্যে দিল্লীযাত্রী এক পশ্চিম দেশীয় নিরক্ষর ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া, একটি স্থানত সেলামদ্বারা তাহাকে আনন্দিত এবং সম্মানিত করিল, এবং আপন টিকিটখানি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া, উহা কোন স্থানের টিকিট তাহাকে পড়িয়া দিতে বলিল।

কেদারনাথ দেখিল দিল্লীর টিকিট। দেখিয়া সহসা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল যে, ভারতের পুরাতন রাজধানী কলিকাতা অপেক্ষা দিল্লীর নূতন রাজধানীতে, তাহার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিচালনার অধিক সুযোগ ঘটিবে। এতএব সে দিল্লীযাত্রীর টিকিটখানি ভালরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য উহা আলোকের দিকে ফিরাইয়া ধরিল। ইত্যবসরে তাহার হস্তস্থিত লিলুয়ার হরিদ্রা বর্ণের টিকিটের সহিত দিল্লীর হরিদ্রাবর্ণের টিকিটের বিনিময় হইয়া গেল।

দিল্লীযাত্রী কেদারনাথের নিকট লিলুয়ার টিকিট পাইয়া, পরম আনন্দিত হইয়া শুনিল এবং বুঝিল যে, সে প্রবঞ্চিত হয় নাই; উহা যথার্থ দিল্লীর টিকিটই বটে।

কেদারনাথ তাহাকে একটি লোকাল গাড়ী দেখাইয়া বলিল যে ওই দিল্লীর গাড়ী।

প্ল্যাটফরমের প্রবেশ দ্বারে টিকিট কলেক্টার টিকিটখানি পরীক্ষা করিলে, সে নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, টিকিট ঠিক হ্যায়?"

টিকিট বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ ঠিক হায়।"

অতঃপর কেদারনাথ দিল্লীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, এবং বসিয়া নিজের কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিজের অগাধ বুদ্ধির গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

হায়, সে যদি জানিত যে সেই গাড়ীতে আরোহণ জন্য সে জীবন সঙ্কটে পতিত হইবে, তাহা হইলে, নির্ব্বোধের ন্যায় বরং সেই ব্যাণ্ডেলের গাড়ীতেই আরোহণ করিত; তথাপি দিল্লীর গাড়ীতে চড়িয়া নূতন রাজধানীর স্বপ্ন দেখিত না।

গাড়ী ছাড়িল। অন্ধকার পথে যেন কোন অজানা নিরুদ্দেশের উদ্দেশে দিক্ সকলের অন্ধকার দেহ কৃষ্ণ ধূমে গাঢ়তর করিয়া ছুটিল। সেই অন্ধকারের মরুভূমিতে, মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের ন্যায় কদাচিৎ দুই একটি আলোকান্বিত ও কলরবপূর্ণ ষ্টেশনে ট্রেণখানি দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া, একটু যেন বিশ্রাম লাভ করিয়া

পুনরায় বেত্রাহত সরীসৃপের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করে। এইরূপে গাড়ীখানি কয়েকটা ষ্টেশন নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিল। তাহার পর, পরের ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কেদারনাথের সুখস্বপ্ন একটা ভয়ঙ্কর শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। পরক্ষণে সে দেখিল, কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডের স্তূপের মধ্যে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে অনেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিল; কিন্তু ঘোর অন্ধকারে অসম্ভব আর্ত্তনাদের কোলাহলে তাহার কোনও বুদ্ধি দীপ্তি পাইল না। কাষ্ঠবন্ধন ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। হায় সে যদি লিলুয়াতেই যাইত, তাহা হইলে, তাহার নূতন রাজধানীতে যাওয়া হইত না বটে, কিন্তু সে জীবন ধারণ করিয়া বুদ্ধির খেলা দেখাইবার আরও অবকাশ পাইত।

অঘোরনাথ একপ্রহর রাত্রে বাটী ফিরিয়া বুদ্ধিমান বড়দাদাকে না দেখিয়া, এবং তাহার সহিত একটি বড় ট্রাঙ্ক অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া, দাদার বুদ্ধির দৌড়টা বুঝিয়া লইল। সে কিছুক্ষণ বসিয়া চিন্তা করিল; কিন্তু চিন্তা দ্বারা ক্ষুধা বৃদ্ধি ব্যতীত অপর কোন ফলপ্রাপ্ত না হওয়ায়, বামুন ঠাকুরকে রাত্রের আহার দিতে বলিল।

বামুন ঠাকুর খাদ্য দিবার জন্য থালা বাটী ইত্যাদি তৈজস খুঁজিয়া না পাইয়া একটা সোরগোল বাধাইল।

অঘোরনাথ ইহাতেও দাদার বুদ্ধির খেলার সন্ধান পাইয়া বলিল, "কুছ পরোয়া নেই! তিনখানা সরা করে ডাল ভাত তরকারি নিয়ে এস,—নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।"

অগত্যা বামুন ঠাকুর তাহাই করিল।

অঘোরনাথ কিছু খাদ্য উদরস্থ করিয়া পাচক এবং পরিচারককে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, দাদাকে শীঘ্র খুঁজিয়া আনিতেছে। এই বলিয়া সে বাটী ত্যাগ করিল। কিন্তু বাটীর বাহিরে আসিয়া দাদার অনুসন্ধানে কিছুমাত্র উৎসাহ দেখাইল না। পরন্তু নিকটবর্ত্তী একটা পোদ্দারের দোকানে আপনার আংটি বিক্রয় করিয়া সে বিংশতি মুদ্রা সংগ্রহ করিল। এই সংগৃহীত মদের দোকানে দিয়া উচ্চ মূল্যে অসময়ে তিন বোতল হুইস্কি ক্রয় করিল। তাহার পর কোনও লোকের বাটীর সম্মুখে সিঁড়িতে বসিয়া, ঐ বাটীর লোকের অগোচরে একে একে বোতলগুলি শূন্য করিয়া সমস্ত সুরা গলাধঃকরণ করিল। ইহার ফলে তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ সিঁড়ি হইতে লুটাইয়া পড়িল। সে আর ইহ জীবনে কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারিল না। এইরূপে শালক ভ্রাতৃত্রয়ের ভবলীলা শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণবাবু সম্ভাব্যকাল মধ্যে শালক ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে আপন পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে উহাতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে; এবং উহার উপরে "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে" এইরূপ একখণ্ড বিজ্ঞাপন লম্বিত রহিয়াছে। তিনি উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পার্শ্বস্থ বাটীর অধিবাসিগণের নিকট সন্ধান লইলেন; কিন্তু তাহারা কোন সন্ধানই দিতে পারিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি কন্যার বিবাহের একটি শুভ সুযোগ পাইয়াও শেষে এইরূপ ব্যর্থ মনোরথ হইলে আপনাকে কতটা বিপদগ্রস্ত মনে করে তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ অনুমান করিতে পারিবে না। মঙ্গলময় বিধাতা কি অসীম মঙ্গল কামনায় আমাদিগের কামনাগুলি ব্যর্থ করিয়া দেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা কত অনর্থক হৃদয় ব্যথা উপভোগ করিয়া থাকি। কৃষ্ণবাবুও কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কত হৃদয়ব্যথা উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার উপর আরও কষ্ট হইল, কন্যার বিবাহ না হইলে, যে ছয় সহস্র মুদ্রা তাঁহার পত্নী অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া। ঐ টাকা একবার হস্তচ্যুত হইলে তিনি ত কন্যার বিবাহে আর কখনই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

অশ্রুকুমার কালক্রমে জানিতে পারিল যে ঐ মণ্ডপ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ তাহারই জ্যেঠামহাশয়ের শ্যালক। সুতরাং তাহাদিগকে সৎপথে আনিয়া, যাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহার সুবিধা করিবার

জন্য সহজেই তাহার করুণ হৃদয় আগ্রহান্বিত হইল। আলেকজান্দ্রার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে সে আবার তাহাদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু কৃষ্ণবাবুর ন্যায় সেও উহা বন্ধ অবস্থায় দেখিল। সে নিকটবর্ত্তী থানায় এবং অন্যান্য স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহারা সকলেই মৃত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান সময়ে অশ্রুকুমার আরও জানিতে পারিল যে, অনেক লোক তাহাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের নিকট অনেক দিনের বাড়ীভাড়া বাকী পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য সে বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য পাওনা যাহা জানিতে পারিল, সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিল।

ইহার পরে সৌদামিনী একদিন অশ্রুকুমারের সহিত বাগবাজারে যাইয়া খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তাহার পরিচয় পাইয়া কৃষ্ণবাবু অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহাদের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়া, কন্যার বিবাহ না হওয়ায় আর তাহার মনে দুঃখ রহিল না।

ইহার পর সৌদামিনী ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং তিন চারিদিন তাঁহাদের সকলকে আহারে নিমন্ত্রণ করিল।

এইরূপে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সৌদামিনী কোটালীগ্রামের সমুদয় সম্পত্তি এবং নবনির্ম্মিত বাটী খুল্লতাতকে দান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কৃষ্ণবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন যে, যে পক্ষ হইতে নষ্ট সম্পত্তির পুনরায় উদ্ধার পাইয়াছে, তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে, আবার যদি উহা হস্তচ্যুত হয় তবে কে তাহা উদ্ধার করিবে? অতএব তিনি কোনক্রমে সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন না; কেবলমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন।

অগত্যা সৌদামিনী অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিজে রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক কাকাকে লেখাপড়া করিয়া দিল।

কৃষ্ণবাবু চাকুরী এবং বাগবাজারের বাটী ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কোটালীগ্রামে যাইয়া বাস করিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য অশ্রুকুমারের নিকট রহিল।

সুভাষিণীর সহিত সৌদামিনী আলেকজান্দ্রার ভ্রাতার বিবাহ দিল। এই বিবাহে সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে, প্রথমে কৃষ্ণ বাবু আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সৌদামিনী বুঝাইয়া দিল যে প্রফেসর বানার্জ্জি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই হিন্দু পিতামহের গৃহে পাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তিনি তাহার যথাবিধি উপনয়ন দিয়াছিলেন। পরন্তু ব্রাহ্ম পিতার গৃহেও সে কখনও অখাদ্য খায় নাই। বাল্যকাল হইতেই সে নিরামিষভোজী এবং এখন পর্য্যন্ত ভগিনীর গৃহে থাকিয়া সে ব্রাহ্মণের পাক করা খাদ্য আহার করিয়া থাকে। সুতরাং সে ধর্ম্মতঃ পতিত হয় নাই। আর সমাজে অর্থ থাকিলে পতিত হইতে হয় না।

আলেকজান্দ্রার ভ্রাতা সৌদামিনীর উদ্যোগে আবার হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যময় শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এবং সুভাষিণীর প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের ব্রীড়ানিপীড়িত স্নিগ্ধ মধুর ভালবাসা পাইয়া অপেনাকে ধন্য মনে করিল। সে ভালবাসায় হারমনিয়মের ঝঙ্কার ছিল না, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস ছিল না, রসকথার প্রাবল্য ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের—হিন্দু ধর্ম্মের—পুণ্যময় পাতিব্রত্য ছিল। তাহা হয়ত তোমাদের মতে প্রণয় নয়, প্রেম নয়। কিন্তু আমরা বলিব, তাহাই পুণ্য, তাহাই পাতিব্রত্য! তাহা সোহাগিনীর সোহাগ নহে, তাহা ভক্তিমতীর স্বামিভক্তি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সহধর্ম্মিণী।

প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ। বৃহৎ গবাক্ষপথে, আনন্দের বন্যার ন্যায় তরুণ তপনের প্রথম রশ্মি প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাহা সৌদামিনীর বিশ্রামাগার। সৌদামিনী প্রত্যহ প্রভাতে সেখানে বসিয়া প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত;—কখন কি কায করিতে হইবে, সাংসারিক ধর্ম্ম যজ্ঞে কখন কোন আহুতিটি প্রদান করিতে হইবে, স্বামিপূজায় কখন কি ফুলটি অর্পণ

করিতে হইবে তাহা সে সেই ঘরে বসিয়া স্থির করিয়া লইত। এই কক্ষটি আপন রুচি অনুযায়ী সৌদামিনী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। কক্ষকুট্টিম তুষারশুভ্র মর্ম্মরফলকে আচ্ছাদিত ছিল। তাহার উপর, ইরাণদেশজাত শ্বেত রেশম রচিত, অতি কোমল নাতিবৃহৎ গালিচা সকল বিস্তৃত ছিল, এই সকল গালিচার উপর নির্ম্মল স্ফটিক বিগঠিত এক একটি গৃহসজ্জা ও বিভিন্ন আকারের আসন সকল স্থাপিত ছিল। গৃহসজ্জা ও আসনগুলি প্রত্যেকটিই শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল স্ফটিকে, বিচিত্র শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত ছিল। স্ফটিক আসনগুলি সুখস্পর্শ কোমল, বিচিত্র রেশমী শয্যায় আবৃত ছিল। কক্ষভিত্তিতে, রজতময় ফ্রেমে সৌদামিনীর পিতামহের, পিতার, মাতার, দাদা মহাশয়ের, অশ্রুকুমারের এবং অশ্রুকুমারের পিতার, জ্যেষ্ঠতাতের, এবং মাতার পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র লম্বিত ছিল। অশ্রুকুমারের চিত্রের নিম্নে রৌপ্য ও স্ফটিক রচিত পুষ্পাধারে সদ্য আহৃত শিশিরসিক্ত শ্বেত কুসুমগুচ্ছ সৌদামিনী আপন নিপুণ হস্তে সাজাইয়া দিয়াছিল।

প্রভাতের অরুণালোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধবল কক্ষকুট্টিমের উপর স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহসজ্জার উপর প্রতিফলিত হইতেছিল; যেন মনে হইতেছিল, ক্ষীরোদ সমুদ্রে মণিময় শতদল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে।

অশ্রুকুমার শ্বেত ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সৌদামিনী আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিল, তাহার ইষ্টদেবতা যেন রৌদ্রময় রথে চড়িয়া তাহার পূজা লইতে আসিয়াছেন। সে ভক্তিময় হৃদয় লইয়া আনতাননে নিকটে আসিল;—আরাধনা যেন আরাধ্যের সহিত মিলিয়া গেল; ভক্তির ঢেউ আসিয়া যেন উপকূলস্থিত দেবমন্দিরের পাদদেশে প্রহত হইল। সে মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কেন এসেছ?"

অশ্রুকুমার সস্মিত আননে কহিল, "আজ ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছ; জেগে তোমায় দেখতে পাই নি। তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।"

সৌদামিনী প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তোমার কাছে ডেকে পাঠালে না কেন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তোমার ঘরটিতে তোমাকে যেমন সুন্দর দেখি, তেমন আর কোথাও দেখি না; তাই খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি।"

সৌদামিনী কহিল, "কেন? এ ঘরে আমাকে সুন্দর দেখ কেন? আমি ত এখানে আলাদা লোক হয়ে যাই না।"

অশ্রুকুমার হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সূর্য্যের কিরণমাখা সরোবরের সোণার জলে পদ্ম যখন ভাসে, তখন তাকে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমন আর কোথাও দেখায় না। তোমাকে সকাল বেলা তোমার রোদমাখা এই ঘরে দেখলে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়; আমার সরোবরে পদ্ম দেখা হয়।"

সৌদামিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ঠাকুর পূজার সময় পুষ্পপাত্রে পদ্ম থাকলে আমি সেই পদ্ম সব চেয়ে সুন্দর দেখি। তখন মনে হয় পদ্মের ফোটা সার্থক হয়েছে।" এই বলিয়া সৌদামিনী পুষ্পাপাত্রের পদ্মটির মত তাহার কোমল আরক্ত অধরদ্বয় যেন দেবপূজায় উৎসর্গ করিবার জন্য উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল।

অশ্রুকুমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে সেই ভক্তির পূজা গ্রহণ করিল। তাহার পর সৌদামিনীর পদ্মসন্নিভ করদ্বয় আপন করপুটে গ্রহণ করিয়া কহিল, "এস সুদু, দুজনে মিলে একটু বসি। একটু বসে' আবার কাযে যাব।"

একটা দীর্ঘাকার স্ফটিকাসনে কোমল শয্যার উপর অশ্রুকুমার উপবেশন করিলে, সৌদামিনী সেই আসনে অশ্রুকুমারের পার্শ্বে আপনার স্থান করিয়া লইল। তাহার পর অশ্রুকুমারের আদরমাখা, রক্তকমলের মত ঢলঢলে মুখখানি তুলিয়া বলিল, "তুমি আজ কি কি কাযে যাবে তা আমাকে বল।"

অশ্রুকুমার পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া আদরপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন দিন আমি কোন কাযে যাই তা ত তুমি একদিনও জিজ্ঞাসা করনি। তবে আজ কেন সে কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

সৌদামিনী উত্তর করিল, এতদিন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি; তোমার কায এখন আমার কায হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

অশ্রুকুমার পূর্ব্ববৎ আদরমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমার কায কেন তোমার কায হয়েছে, সদু?"

সৌদামিনী কহিল, "কেন আমাদের দুজনের কায আজ এক হয়ে গেছে, তাকি তুমি জান না?"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? তুমি আমার স্ত্রী—এক আত্মা—তাই?"

সৌদামিনী কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "তা কেন?"

অশ্রুকুমার বলিল, "তবে, তুমি আমার আদরিণী বলে, আর আমার সমস্ত প্রাণটা অধিকার করেছ বলে, তাই কি আমার কাযগুলি তোমার কায হয়ে দাঁড়িয়েছে?—আমি তোমার বলে আমার কাযও কি তোমার হয়েছে?"

সৌদামিনী বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর মুখে বলিল, না, তুমি বল্‌তে পারলে না। আমি শুধু তোমার স্ত্রী নই—তোমার আদরিণী গৃহিণীও নই।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি আমার কি?"

সৌদামিনী স্মিতমুখে কহিল, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।"

অশ্রুকুমার হাসিল। হাসিমুখে কহিল, "কিন্তু আমি যে কায করতে যাচ্ছি, তুমি কি করে জানলে যে সেটা ধর্ম্মকার্য্য? আমার কাযে যোগ দিলে ত তোমার ধর্ম্মকার্য্য করা হবে না।"

সৌদামিনী কহিল, "তোমার কার্য্য যাই হোক আমার পক্ষে তাই ধর্ম্ম।—ইহকালের ও পরকালের সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম!"

সমাপ্ত

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব"

(প্রত্যুত্তর)

গত চৈত্রমাসের "মানসী"তে আমার "সতীত্ব বনাম মনুষ্যত্ব" প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই পৌষের "মানসী"তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ঘোষ তাহার একটি প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া এই বিষয়টি চিন্তা করিলেও, তাঁহার প্রবন্ধে সেই চিন্তাশক্তির বিশেষ কোন পরিচয় পাইলাম না। সেই জন্য আমাকে আবার সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে।

ক্ষিতি বাবু প্রথমেই বলিয়াছেন, সতীত্ব নারীর মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে আমার সহিত তাঁহার কোন মতভেদ নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও নাকি নারীর সতীত্বকে তুচ্ছ করেন না বা কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন না। অতি উত্তম কথা, তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য হিন্দুসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ক্ষিতিবাবুর মতে নারীর সতীত্ব যদি তাঁহার মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় না হয়, আর শরৎ বাবুও যদি সতীত্বকে কুসংস্কার মনে না করেন, তবে ত তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কোনই মতভেদ নাই। সুতরাং আমার এখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত।

কিন্তু ইহার মধ্যে আবার একটা "আসল কথা" আছে। সেই আসল কথাটা এই—"বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সতীত্বের একটা বিশ্রী রকম conventionএর সৃষ্টি হইয়াছে এবং আমরা প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ হারাইয়া এই conventional আদর্শ অনুসারেই নারী-

দিগেক গড়িতে গিয়া তাঁহাদের মানুষ হইবার স্বাভাবিক ও সত্যকার দাবীটা অগ্রাহ্য করিতেছি।" সতীত্বের প্রকৃত আদর্শটা কি তাহা ক্ষিতি বাবু কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তবে convention বা দেশাচারের উৎপীড়ন সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু এই convention কোন সমাজে নাই? সতীত্বের উচ্চ আদর্শ (আমরা যেরূপ বুঝি) রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে নানা প্রকার সামাজিক আইন কানুনের বাধ্য হইয়া থাকিতে হইবে। যেখানে যত অধিক উৎকর্ষ (high standard of excellence) আশা করা যায়, সেখানেই আইন কানুনের তত কড়াকাড়। সেই আইন কানুন শিথিল হইলে সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ আদর্শও খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার ষ্টাণ্ডার্ড (standard) যদি খুব সোজা করিয়া দেওয়া-হয় তবে সেই এম্ এ পাশের মূল্য কি? ইংরেজ সমা-সমাজেও স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে —"Cœsar's wife should be above suspicion." *

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কঠিন নিয়মে কোনও ছাত্র যদি অন্যায়রূপে ফেল হয়, তবে, এরূপ শুনিতে পাই সদাশিব আশুতোষ তাহার জন্য নিয়মের কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হন না। সেইরূপ দেশাচারের পীড়নে যদি কোনও নারী অত্যন্ত বিপন্না হন, তবে কোন না কোন কারুণিক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহায় হন। এই কারণে সমাজে অবশ্য একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়, আবার কিছুদিন পরেই তাহা মিটিয়া যায়, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলকণ্ঠের ন্যায় সমাজ সেই বিষ হজম করিয়া ফেলে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের সমাজ জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার এই কথায় সমর্থন করিবেন। প্রাচীন কালেও স্বামিপরিত্যক্তা সীতাদেবীকে আশ্রয় দিবার জন্য বাল্মীকির অভাব হয় নাই, আবার পতিপ্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাও স্বর্গলোকে ঋষির আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

সতীত্বের উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করা যদি বাঞ্ছনীয় হয় তবে বাল্যকাল হইতেই নারীকে সতীত্বের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি (standard) অনুসারে গঠিত হইতে হইবে এবং যে যে স্থানে ও যে যে অবস্থায় সতীত্বের বিন্দুমাত্র বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে হইবে। ইহারই নাম দেশাচার বা convention। ইংরেজ সমাজে, স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনভাবে মেলামেশার মধ্যেও নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য কত রকম সমাজ নীতি (convention) আছে, তাহা না মানিলে সমাজে নিন্দা হয়। আবার কোন কোন স্থলে সেই সমাজ নীতি অত্যন্ত কঠোর, নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মিঃ হাচিন্‌সন্ (Hutchinson) প্রণীত "If Winter Comes" নামক জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসে দেখা যায় তাহার নায়ক সেবর (Sabre) যুদ্ধে যাইবার সময় এফি (Effie) নাম্নী একটি অনূঢ়া বালিকাকে তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে থাকিবার জন্য বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। কোন কোন কারণে তাঁহার স্ত্রী মেব্‌লের (Mabel) মনে স্বামীর প্রতি ঐ বালিকা সম্বন্ধে মিথ্যা সন্দেহ হয়। সেবর যুদ্ধে আহত হইয়া যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রী এফিকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে এফি একটী সন্তান প্রসব করিল। সে সেই সন্তানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া মেব্‌লের শরণাপন্ন হইল। মেব্‌ল তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি-

* যাঁহারা বলেন পুরুষের বেলায় সেই ষ্টাণ্ডার্ড বা মাপকাঠি খাটে না কেন, তাহার উত্তরে 'প্রবাসী" সম্পাদকের সুযুক্তিপূর্ণ একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি:—"দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সমাজে বেশ চলিয়া যায় তা বলিয়া দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদিগকেও কি সমাজে চালাইতে হইবে? নরনারীর সাম্যের মানে এই নয় যে উভয়েরই দুর্নীতকে সমাজে প্রশ্রয় দিতে হইবে। সেই সাম্য বিধানই কল্যাণকর যাহাতে পুরুষ ও নারীর সাধুজীবনের ও আদর্শের সমান আদর করা হয়, এবং পুরুষ ও নারীর অসাধুতাকে সমান গর্হিত মনে করিয়া উভয়ের সম্বন্ধেই সমান কঠোরতা অবলম্বিত হয়।" প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯. ৪২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

লেন। কিন্তু তাঁহার সদাশয় স্বামী করুণাপরবশ হইয়া স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া একিকে স্বগৃহে আশ্রয় দিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রীর মনে সেই পূর্ব্ব সন্দেহ আরও প্রবল হইল এবং তিনি ক্রোধভরে গৃহত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাসীরাও চলিয়া গেল। সেবর নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তাঁহার খোঁড়া পা লইয়া সেই বালিকাটির সঙ্গে গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিবেশীরাও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চাকরিও গেল। তাঁহার এই ঘোরতর বিপদের সময় তাঁহার এক বন্ধু হ্যাপগুড তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নিম্নে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে—

"And Sabre, mind you—this is Sabre's extraordinary point of view : He is not a bit furious with all these people. He's feeling his position most frightfully, it's eating the very heart out of him, but he's working up not the least trace of bitterness over it. He says they are all supporting an absolutely right and just convention and that is not their fault if the convention is so hideously cruel in its application. He says the absolute justice and the frightful cruelty of convention has always interested him and that he remembers once putting up to a friend of his as an example this very instance of society's attitude towards an unmarried girl, who got into trouble—never dreaming that one day he was going to find himself up against the full force of it. He said, "If this poor girl, if any girl, didn't find the world against her and every door closed to her, just look, where you'd be, Hapgood. You'd have morality absolutely gone by the board. No, all these people are right—absolutely right in their principle; it's their practice that's sometimes so terrible. And when it is, how can you turn round and rage ? I can't."

আমরা এখানে দেখিলাম ইংরাজ সমাজেও দেশাচার কত কঠিন—অবশ্য এই উপন্যাস যদি ইংরেজ সমাজের প্রকৃত চিত্র হয়। কিন্তু সদাশয় সেবর তাই বলিয়া সেই সমাজের দোষ দিতেছেন না। তিনি বরং বলিতেছেন, "ঐ বেচারি বালিকার উপর সমাজের লোক খড়্গহস্ত না হইয়া উহাকে যদি গৃহে আশ্রয় দিত, তবে আমরা অধঃপাতে যাইতাম, সুনীতি রসাতলে যাইত। সমাজের লোক ঠিক বুঝিয়াছে। মূলতঃ সমস্ত দেশাচারই ঠিক, কিন্তু কার্য্যতঃ কখন কখন তাহায় দুঃসহ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া উপায় কি ?" উদার-হৃদয় সেবর মনে করিলেন, আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজের কল্যাণ হউক, সমাজ বাঁচিয়া থাকুক। একজন প্রকৃত সমাজ-হিতৈষীর এইরূপই তন্মনের ভাব হওয়া উচিত।

এখানে হয়ত কেহ বলিবেন, ইংরেজের সমাজনীতি হাজার কঠোর হউক, তাহাতে নারীর মনুষ্যত্ব বিকাশের বাধা হয় না। কিন্তু আমাদের সমাজনীতি কি প্রকারে বাধা দেয় ? আমাদের সামাজিক বিধিনিষেধ নারীকে লজ্জাশীলা, ধৈর্য্যশীলা, ক্ষমাশীলা, ভক্তিমতী, প্রীতিমতী, গৃহকর্ম্মকুশলা, সেবাপরায়ণা, পতিব্রতা করিয়া গঠিত করে—এক কথায় নারীকে গৃহলক্ষ্মী হইতে শিক্ষা দেয়। নারীচরিত্র যদি প্রকৃতই এইরূপে গঠিত হয় তবে মনুষ্যত্ব বিকাশের আর বাকী থাকিল কি ? এরূপ সচ্চরিত্র হওয়াটা কি নারী জীবনের সার্থকতা নহে ?

ক্ষিতি বাবু বলেন, আমরা আরও চাই। আমরা চাই নারীর বিদ্যাশিক্ষা, সমাজে স্বাধীনতা, কর্ম্মক্ষেত্রে

পুরুষনিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতা। এগুলি না হইলেই নয়—অর্থাৎ compulsory; আর বিবাহটা হইবে optional অর্থাৎ স্বেচ্ছাধীন।

নারীর বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক ইহা কে অস্বীকার করে? তবে সেই শিক্ষাটা কোন্ প্রণালীতে হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের যুবকদিগেরও মনুষ্যত্ব বিকাশের সাহায্য করিতেছে না সর্ব্বদা এরূপ কথা শুনা যায়। নারীদিগেরও কি সেই প্রণালীতে শিক্ষা হইবে? আমার মতে, সংসার ক্ষেত্রে যেরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, নারীদের সাধারণতঃ সেইরূপ শিক্ষা হইলেই চলে। তাহার মধ্যে যদি কেহ বেশী শিখিতে ইচ্ছা করে, বা সেরূপ শিক্ষা দেওয়া সুবিধাজনক বা সম্ভবপর হয়, তবে সে অতি উত্তম। বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ শিক্ষা যে না হইতেছে এরূপ নহে। ভূদেব-পৌত্রী সংপ্রতি স্বর্গগতা সুরূপা (ইন্দিরা) ও শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহার আদর্শ।

স্ত্রী-স্বাধীনতা আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে যথেষ্ট আছে, কিন্তু সহরে নাই। বাঙ্গালী জাতির শতকরা ৯০ জন পল্লীগ্রামে বাস করে। পল্লীগ্রামে সকলেই সকলকে চেনে, সে জন্য পরস্পর মেলামেশার কোন বাধা হয় না। কিন্তু সহরের লোক অধিকাংশই অপরিচিত, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের দেশের পুরুষগণ যতদিন নারীদিগের উপযুক্ত সম্মান করিতে না শিখিবে, ততদিন এবিষয়ে সাবধনতা একান্ত আবশ্যক। ততদিন নারীদিগকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অন্তঃপুরেই থাকিতে হইবে। এ দেশের অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগের হস্ত হইতেও নারীদিগের আত্মরক্ষার প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুইটি ব্রাহ্ম মহিলা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাদিগের কিরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল সকলে একবার স্মরণ করুন। আমরা নারী মাত্রকেই জগন্মাতার মূর্ত্তি মনে করিয়া পূজা করিব, সেই সত্যযুগ আবার কতদিনে ফিরিয়া আসিবে?

নারীকে যে কারণে সহরে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়, সেই কারণেই তাঁহার আফিস আদালতে হৌসে দোকানে চাকুরী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করাও নিষিদ্ধ। তবে সে জন্য তাঁহাকে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না, কারণ পুরুষ স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। তবে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। এই কারণে আমাদের দেশে unemployed question (বেকার সমস্যা) এখনও তীব্রভাব ধারণ করে নাই। "আমাদের জাতির অর্দ্ধেকটা উপার্জ্জনে অক্ষম"—ঠিক কথা। তাহাতে সমাজের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইতেছে না। চাকুরি বা ব্যবসায়ের কর্ম্মসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট; এখন যতগুলি আছে, নারীগণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেও ততগুলিই থাকিবে। সুতরাং একজন নারী যে কর্ম্মটি গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই কর্ম্মটি হইতে একটী পুরুষকে, সম্ভবতঃ স্ত্রীপুত্রাদি সমন্বিত পুরুষকে বঞ্চিত করিবেন। ক্ষিতি বাবু বলেন, স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে চাকুরি করিলে পরিবারের আয় বৃদ্ধি হইয়া অধিকতর স্বচ্ছলতা আসিবে। স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে অর্থোপার্জ্জন করা ইংরেজদিগের সমাজেও বড় বেশী দেখা যায় না। তাহাতে এক পরিবারের স্বচ্ছলতা যে পরিমাণে বাড়িবে, অন্য পরিবারের সেই পরিমাণে কমিবে। লাভের মধ্যে নারী তাঁহার নারীসুলভ গুণগ্রাম হারাইয়া পুরুষভাবাপন্ন হইবেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের আচার ব্যবহার আমাদের অনুকরণীয় নহে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পুরুষজাতির স্বার্থপরতার জন্য স্ত্রীজাতি কোণঠেসা হইয়া পড়িয়া, বাধ্য হইয়া নিজেদের উদরান্নের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে কেহ কেহ স্বাধীনতা-প্রয়াসী হইয়া যে এরূপ না করেন এমন নহে। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার Nationalism পুস্তকে পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

"It is just posible that you have lost through habit the consciousness that the living bonds of society are breaking up and giving place to mechanical organisa-

tion. But you see signs of it everywhere. It is owing to this that war has been declared between man and woman, because the national thread is snapping which holds them together in harmony; because man is driven to professionalism, producing wealth for himself and others, continually turning the wheel of power for his own sake, or for the sake of universal officialdom, leaving woman alone to wither and to die, or to fight her own battle unaided. And thus there, where co-operation is natural, has intruded competition. * * * * * "The very psychology of men and women and about their mutual relation is changing and becoming the psychology of the primitive fighting elements, rather than of humanity seeking its completeness through union based on mutual self-surrender."

অর্থাৎ পাশ্চাত্য সমাজে পুরুষজাতি স্ত্রী জাতির মধ্যে উদরান্নের জন্ম ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে জাতীয় মিলনের সূত্র ছিন্ন হইয়া অশান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরুষ জাতি কেবল নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্ম ধন উপার্জ্জন করিতেছে, স্ত্রী জাতিকে শুকাইয়া মরিবার জন্ম অথবা নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য ঠেলিয়া ফেলিতেছে। এই রূপে সেই সমাজে, যেখানে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সহযোগিতা ছিল, সেখানে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। সে সকল দেশে স্ত্রী পুরুষের মানসিক অবস্থা বদ্‌লিয়া গিয়া, যেখানে পরস্পর নির্ভরশীলতা ও স্বার্থত্যাগ জনিত মিলন দ্বারা সুখশান্তি বিরাজ করিত, সেখানে সৃষ্টির আদিম অবস্থায় সংঘটিত দেবাসুর-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা সমাজের যে এইরূপ ভীষণ অবস্থা তাহা কোনও দেশে কোনও কালে বাঞ্ছনীয় কি না তাহা সকলে বিবেচনা করিবেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই স্ত্রী জাতিকে ও পুরুষজাতিকে এইরূপ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের জন্ম সৃষ্টি করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যে union based on self-surrenderএর কথা বলিয়াছেন, তাহা ত আমাদের সমাজে পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে। স্ত্রী পুরুষের এইরূপ পরস্পর স্বার্থত্যাগমূলক মিলন, বিবাহ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এ কারণে আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ স্বেচ্ছাধীন নহে, অবশ্যকর্ত্তব্য। বিবাহ এইরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া এক সঙ্গে জাতি রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও স্ত্রী জাতির ভরণপোষণের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমাজে সুখশান্তি বর্দ্ধনের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পৌষের "বঙ্গবাণী"তে প্রকাশিত তাঁহার "মার্কিনে চারি মাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"মোটের উপর আজি কালিকার ইংরাজ বা মার্কিনীয় স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বতোভাবে প্রায় পুরুষদিগেরই মত স্বাধীন স্বাবলম্বী এবং স্বানুবর্ত্তী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আর একটা নূতন দাসত্ব শৃঙ্খল গড়িয়া উঠিতেছে। আগে ছিল পরিবারের দাস্যতা; এখন হইতেছে দোকানের বা কল কারখানার দাস্যতা। আগে স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ পরিবারের পুরুষদিগের অধীন হইয়া থাকিতেন। এই অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কোনও বিষয়ে তাঁহাদের পক্ষে স্বাবলম্বন ও স্বানুবর্ত্তন করা সম্ভব ছিল না। সে শৃঙ্খল এখন আর নাই। কিন্তু অন্যদিকে স্বাবলম্বন এবং স্বানুবর্ত্তন আশ্রয় করিতে যাইয়াই স্ত্রীলোকেরা কঠোর জীবনসংগ্রামের মাঝখানে যাইয়া পড়িয়াছেন। উপার্জ্জনের অধিকার পাইলেই উপার্জ্জনের শক্তি জন্মে না। পরিবারের মধ্যে থাকিয়া উপার্জ্জনশীল পুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস করাতে আগেকার স্ত্রীলোকদিগকে হাটে বাজারে যাইয়া জীবন সংগ্রামের চেষ্টা করিতে হইত না। অতি অল্প স্ত্রীলোকেই বেতনভুক্

ছিলেন। এমন অধিকাংশ স্ত্রীলোককেই জীবিকার জন্য পরের চাকুরী করিতে হয়। অথচ প্রায় সকল চাকুরির পথই পুরুষেরা দখল করিয়া বসিয়া আছেন—অন্ততঃ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বসিয়া ছিলেন। গ্রাহকদিগের মনস্তুষ্টি-সম্পাদন বিক্রেতার একটা প্রধান ধর্ম্ম। আমেরিকায় বড় বড় দোকানের মালিকেরা এই জন্য রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রীলোকদিগকেই তাঁহাদের দোকানে চাকরি দিতেন। আবার কেবল রূপযৌবন থাকিলেও চলিবে না; পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্যও থাকা চাই। অথচ গরিব বেচারিরা যে বেতন পাইত, এইরূপ ফিটফাট পোষাক পরা একরূপ অসম্ভব ছিল বলিলেও চলে। অনেক সময়ে ঘর ভাড়া ও পোষাকের খরচ দিয়া ইহাদের অন্নসংস্থানের জন্য মাহীয়ানার কিছুই প্রায় থাকিত না। এ অবস্থায় এ সকল হতভাগিনীরা করে কি? দোকানের চাকুরি ছাড়া ইহারা আর কিছুই করিতে পারে না। সেরূপ কোন শিক্ষাই ইহাদের নাই। অথচ দোকানের চাকুরির ত অবস্থা এই। এ অবস্থায় নিজের শরীর বেচিয়া অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা ভিন্ন এ হতভাগিনীদের আর কোন প্রকারের গত্যন্তর ছিল না। এ কথাটা শিকাগোতে যাইয়াই ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম।"

যাঁহারা এ দেশের নারীদিগের পরিবারের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের পক্ষপাতী, আশা করি তাঁহারা মার্কিন রমণীগণের অবস্থা একবার ধীর চিত্তে বিবেচনা করিবেন।

ক্ষিতি বাবু অনেক অক্ষম পিতার কন্যাদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, কন্যার বিবাহ স্বেচ্ছাধীন হওয়া উচিত। বরপণ প্রথা আমাদের সমাজের একটা কলঙ্ক সন্দেহ নাই। ইহা সমাজের একটা কঠিন সমস্যাও বটে। কিন্তু কন্যার বিবাহ না দিলেই কি কন্যার পিতা নিষ্কৃতি পাইবেন? অবিবাহিতা কন্যাকে তাঁহার যাবজ্জীবন ভরণপোষণ করিতে হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে এক সময়ে কুলীন সমাজে যেরূপ দুর্গতি প্রচলিত ছিল, তাহা আবার প্রচলিত হইবে। নানা কারণে হিন্দু সমাজের জনসংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে—কেহ কেহ হিন্দু জাতিকে dying race (মৃতপ্রায় জাতি) বলেন; মেয়েদের বিবাহ বন্ধ করিলে জনসংখ্যা আরও কমিবে। বরপণ প্রথা নিবারণের একমাত্র উপায় আবার আমাদের মানুষ হওয়া। সুশিক্ষা দ্বারা আমাদের চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্ব লাভ ভিন্ন ইহার অন্য প্রতিকার নাই।

আমি একস্থানে লিখিয়াছি, "আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।" এই সম্পর্কে আমি আর যাহা লিখিয়াছি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, এবং আমি যাহা লিখি নাই তাহা আমার ঘাড়ে চাপাইয়া ক্ষিতিবাবু খুব একহাত লইয়াছেন। "সুতরাং আমাদের সমাজে নারীরা প্রায় সব বিষয়ে পরাধীন হইলেও তাঁহাদের আত্মার পুরাপুরী স্বাধীনতা ভোগ করিবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই"—এ কথা আমার নহে, তাঁহার নিজের। ইহার পরে লিখিতেছেন, "হে বঙ্গললনাগণ, তোমরা সকল দুঃখ দৈন্য সহ্য কর, কেননা তোমাদের আত্মা স্বাধীন।" আবার ইহা হইতে স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ প্রভৃতিও আসিয়াছে। ক্ষিতি বাবুর এই যুক্তিপ্রণালী দেখিয়া ডাঃ জেরল্ড প্রণীত "Mrs. Caudle's Curtain Lectures" মনে পড়িল। কডল সাহেব তাঁহার একটি বন্ধুকে পাঁচ পাউণ্ড ধার দিয়াছিলেন, সেই জন্য বিবি কডল নিতান্ত খাপ্পা হইয়া তাঁকে বলিতেছেন, "তুমি কেন পাঁচ পাউণ্ড আর একজনকে দিলে? তুমি জান না জ্যাকের শয়ন ঘরের একটা শাসি ভাঙ্গা? টাকা অভাবে আমি তাহা মেরামত করিতে পারিতেছি না। থাক সে জানালা যেমন ভাঙ্গা আছে, সেইরূপ থাক্। ঐ জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসুক। ঠাণ্ডা আসিয়া শ্বাসের ব্যারাম হউক। ব্যারাম হইয়া জ্যাক মরুক! সে মরিলে নিশ্চয়ই তুমি দায়ী হইবে। ঐ পাঁচ পাউণ্ড তুমি আর একজনকে ধার না দিলে সে মরিত না।" ঝগড়া করিতে হইলে বুঝি এইরূপেই পাঁচ পাউণ্ড ধার দেওয়ার জন্য জ্যাককে মরিতে হয়!

আমি লিখিয়াছিলাম, আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহা সর্ব্বভূতে সমদর্শনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, আত্মার সেই প্রকৃত স্বাধীনতা বিকাশের অপর নাম

মুক্তি। এইরূপ স্বাধীনতা লাভ করাই কি পুরুষ কি নারী সকলেরই জীবনের সার্থকতা এবং ইহাই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে অনেক তপস্যা করিতে হয়। অতএব "হে বঙ্গললনাগণ! তোমরা যদিও ঘরে ও বাইরে কথায় ও কাযে পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিপীড়িত, তবুও তোমরা মনে রাখ বাহ্যিক সুখ দুঃখ সবই দেহের, আত্মার নয়, তোমরা ভবরঙ্গমঞ্চের সুখ দুঃখের লীলাখেলা তিন তুড়ীতে উড়াইয়া দিয়া আত্মার অচিন্ত্য অব্যক্ত অসীম স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পার!" ইহা আমার এই কথা হইতে কি প্রকারে আসে?

ক্ষিতিবাবু বলেন, আদর্শ সতী সাবিত্রী যখন বলিয়াছিলেন "যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি। জীবনে মরণে সেই সত্যবান স্বামী॥"—সেই যুক্তিবলে শরৎবাবুর "স্বামী"র নায়িকা সৌদামিনীও ত স্বচ্ছন্দে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘটিত মন্ত্রপড়া বিবাহ লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতে পারিত। "সৌদামিনীকে তাহার প্রেমাস্পদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিয়া জোর করিয়া পরপুরুষের হাতে মন্ত্র পড়িয়া সঁপিয়া দেওয়াতে তাহার সতীত্বের মর্য্যাদা কতখানি রক্ষিত হইল? সাবিত্রীকে এইরূপ জোর করিয়া অন্যের সহিত বিবাহ দিলে তিনি কি করিতেন?"

সাবিত্রী কি করিতেন তাহা জানি না, তবে তিনি নিশ্চয়ই ঘোরতর আপত্তি করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে দেহত্যাগও করিতেন। কিন্তু সৌদামিনীর সহিত তাহার তুলনা হয় কিসে? সাবিত্রী পিতার আদেশে সত্যবানকে বর নির্ব্বাচন করিয়া ছিলেন, সৌদামিনী তাহার অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে নরেনের সহিত "প্রেমে" পড়িয়াছিল। তাহার এরূপ অবস্থায় প্রেমে পড়া বিলাতী নারীসমাজে প্রচলিত থাকিলেও হিন্দু সমাজে নিন্দনীয়। সৌদামিনী তাহার বিবাহের সময় কি কোনও আপত্তি করিয়াছিল? তাহার মামা নাকি তাকে দর্শন শাস্ত্র পড়াইতেন, তাহার মামাকে জানাইলে তিনি অবশ্যই পরপুরুষের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতেন না। তাঁহাকে যেরূপ উদারনৈতিক করিয়া দেখান হইয়াছে তাহাতে তাঁর পক্ষে ঐরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইত। আর তাঁহার নিজের দোষেই সৌদামিনী নরেনের সহিত "প্রেম" করিবার সুবিধা পাইয়াছিল, সুতরাং তিনি তাঁহার ভুল সংশোধন করিতে বাধ্য ছিলেন।

আমার "ধ্রুবতারা"র চারুলতাকে ত আমি আদর্শ সতী করিয়া অঙ্কিত করি নাই। সে স্বাধীনভাবে প্রতিপালিতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ব্রাহ্ম বালিকা। সে সাবিত্রীর আদর্শ মানিবে কেন? এই প্রসঙ্গে তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া আনিবার সার্থকতা বুঝিলাম না।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ক্ষিতিবাবুর সব কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও দেখি না। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধটী একটু ধীর চিত্তে পড়িয়া দেখিলে তাঁহার অনেক কথারই জবাব পাইবেন। আমার সময় নিতান্ত কম, আমি তাঁহার সঙ্গে অনর্থক বাদানুবাদ করিতেও ইচ্ছা করি না। ইহার পরে তিনি আমাকে লগুড়াঘাত করিলেও আমি আর কিছু বলিব না।

প্রবন্ধ শেষে তিনি লিখিয়াছেন, আমি একজন পুরাতন পন্থী, আমি পুরাতনকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাই; সুতরাং আমার আর আশা ভরসা নাই। আমি পুরাতন পন্থী হওয়া নিতান্ত গৌরবের মনে করি। কারণ এই পুরাতনই প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিকে মনুষ্যত্ব লাভের প্রকৃত ও প্রশস্ততর পন্থা বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াই সমাজনীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পথে চলিয়া হিন্দুসমাজ বহুশতাব্দীব্যাপী ঘোরতর বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়িয়াও এখনও পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাই ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় শুনাইয়া আসিয়াছেন:—

"The lamp of ancient Greece is extinct

in the land where it was first lighted, the power of Rome lies dead and buried under the ruins of its vast empire. But the civilization whose basis is society and the spiritual ideal of man is still a living thing in China and in India. Though it may look feeble and small judged by the mechanical power of modern days, yet like small seeds it still contains life, and will sprout and grow and spread its beneficent branches producing flowers and fruits when its time comes and showers of grace descend upon it from heaven."

(*Nationalism*—by Tagore)

আমরা যেন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রদর্শিত সংযম ও তপস্তার পবিত্র পথে চলিয়া, আপাতমনোরম প্রকৃতির প্রলোভনময় পথ উপেক্ষা পূর্ব্বক প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি এবং স্বর্গ হইতে বর্ষিত পরমেশ্বরের করুণাধারা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হই।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

অপূর্ণ

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার আত্মা মরে না এবং তাহার জীবিতকালের অনেকখানি মনের ভাব বাঁচিয়া থাকে এই মতবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যখন যোগমায়া কয়েকদিন তীর্থবাসের পর তাঁহার স্বামী-পুত্রের গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন সেখানে তাঁহার আর প্রবেশাধিকার নাই, সেই তাঁহার স্বামী ও পুত্রের শত স্মৃতি বিজড়িত গৃহের দ্বার তাঁহার নিকট চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন শরতের আত্মা পরলোকের সমস্ত সুখ শান্তি ফেলিয়া এই তাহার ইহলোকের গৃহের দুয়ারে আসিয়া কি করুণ নেত্রেই না মায়ের পানে চাহিয়া ছিল! তাহার ইহলোকের হৃদয় তখন তাহার ছিল না, নহিলে তাহার প্রত্যক্ষ দেবী জননীকে গৃহতাড়িতা দেখিয়া সে হৃদয়খানি ফাটিয়া যাইত এবং সেখানে রক্তের নদী বহিত।

দুয়ারের তালা ও বিজ্ঞাপন দেখিয়া যোগমায়া খানিক-ক্ষণ সেই দুয়ারের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম বিমূঢ় ভাবটুকু কাটিয়া যাইতেই অশোকের টেলি-গ্রামের কারণ তিনি বুঝিলেন এবং ইহা যে শরতের শ্বশুরের কার্য্য ইহা বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। কাহা-কেও তিনি কোন অভিসম্পাত দিলেন না। অদৃষ্টেরও নিন্দা করিলেন না। একদিন যে তিনি বড় মুখ করিয়া অশোককে বলিয়াছিলেন—যদি শরতের বিয়োগ দুঃখ তাঁহাকে সহিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন দুঃখই নাই যাহা তিনি সহিতে পারিবেন না—আজ এই সময়—শুধু সেই কথাটা একবার মনে করিয়া মনকে সতেজ করিয়া লইলেন। মনে মনে একটিবার বলিলেন—শ্রীমন্দির হইতে সদ্য ফিরিয়া তিনি এই সামান্য দুঃখটাকে যদি তুচ্ছ না করিতে পারেন তবে তাঁহার দেবদর্শন বৃথা হইয়াছে। তাহার পর অতি ক্লান্ত ও ভীতিবিহ্বল অনুপ্রভার হাত ধরিয়া যোগমায়া অশোকের সন্ধানে যাইবার উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে

রুক্মিণী আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সানুনয়ে বলিল—"দিদি, এস।"

নিজের বাড়ীতে ঢুকিতে না পারায় একটা লজ্জা যোগমায়ার মুখে ফুটিয়া উঠিতেই যাহা দমন করিয়া তিনি সহজকণ্ঠে কহিলেন, "আগে আমার একটা আস্তানা ঠিক করে নিই, ছোট বৌ, তার পর তোমার কাছে আসব'খন।"

এমন অবস্থাতেও যোগমায়ার এই সহজভাব দেখিয়া রুক্মিণী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—"আজকের দিন আর তুমি দোষ নিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি।"—বলিয়া রুক্মিণী সত্যই নত হইয়া যোগমায়ার দুটি পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

রুক্মিণীকে উঠাইতে গিয়া তাহার মাথার উপর যোগমায়ার ফোঁটা কয়েক অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া যোগমায়া বলিলেন, "তোর মন তো আমি জানি ছোট বৌ। তোর কাছে যেতে আমার কোন লজ্জা নেই ভাই। আর এ দুর্য্যোগে ঠাকুরপোর আশ্রয়ই তো আমার একমাত্র আশ্রয়ই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুই ত সবই জানিস।"

রুক্মিণী আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "তবু দিদি তুমি আজকের দিনটাও চল। তুমি যদি আমাকে এমন করে এখান থেকে চলে যাও, আমার স্বামী পুত্র কারু মঙ্গল হবে না। আমার সর্ব্বনাশ হবে।"

যোগমায়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রুক্মিণীর আগে আগে দেবরের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অম্বুও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুসঙ্গিনীর পিতা হেরম্ব বাবু যেদিন সংবাদ পাইলেন তাঁহার বৈবাহিকা যোগমায়া দেবী দিন পনেরো হইল পুরীধামে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, তাহার কয়েকদিন পরেই তিনি একটি কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

হেরম্ব বাবু লোকটীর এক সময়ে বিষয় ও বুদ্ধি দুইটী জিনিষই অধিক মাত্রায় ছিল। গোড়া হইতে সুতা ছিঁড়িয়া ঘুড়ি ও সুতা গিয়া হাতে যেমন শূন্য লাটাইটী রহিয়া যায়, তেমনি কালক্রমে হেরম্ব বাবুর বিষয়ের অধিকাংশ উবিয়া গিয়া বুদ্ধিটুকু পূরামাত্রায় রহিয়া গিয়াছিল।

জামাতা শরতের মৃত্যুর পর হইতে কি করিয়া জামাতার বাটীখান আপনার অধিকারে আনিয়া ফেলিবেন ইহা ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি বড় বড় উকিলদের নিকট হইতে বেশ করিয়া জানিয়াছিলেন, বৈবাহিক যদুনাথ বাবুর উইল অনুসারে এবং হিন্দু আইন মতে ঐ বিষয়ের উপর তাঁহার কন্যার ষোল আনা অধিকার, যোগমায়ার তাহাতে কোন সত্ত্ব নাই। বাড়ী অধিকার করিতে হইলে যোগমায়াকে বাড়ী হইতে সরানো সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সেইটিই এখন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। উকিল আইনমতে পরামর্শ দিলেন, উচ্ছেদের মোকদ্দমা করুন, তাহা হইলে আপনার জয় নিশ্চয়, তখন শরতের মা উঠিয়া যাইতে পথ পাইবে না। কিন্তু এ পরামর্শ তাঁহার মনঃপূত হইল না। প্রথমত তাহাতে খরচ বেশী, দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়-সাপেক্ষ। চাই কি গৃহে যাহার ষোল আনা অধিকার ছিল, তাহার মাকে একেবারে বাহির হইয়া যাইতে বলিতে শেষটা হয়ত আইনেরও চক্ষুলজ্জা আসিয়া পড়িবে এবং হয়ত বা একখানি ঘর পর্য্যন্ত তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে।

তাঁহার এক কূটবুদ্ধি বন্ধু উকিল তখন কাণে কাণে একটা পরামর্শ দিলেন। এইবারের পরামর্শটি তাঁহার বেশ পছন্দসই হইল। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

সেই সুযোগ মিলিল যখন যোগমায়া পুরী গেলেন।

হেরম্ববাবুর এক সম্বন্ধী তাঁহার বাড়ীতে থাকিত। থাকিত যে 'স্বভাবের' জন্য তাহা নহে, নিতান্ত অভাবে পড়িয়া। হেরম্ব বাবুর শ্বশুর মৃত্যুকালে হেরম্ব বাবুকেই তাঁহার বিষয়ের অছি নিযুক্ত করিয়া যান। তখন কেবলরামের বয়স দশ বৎসর। তাহার দুই বৎসর পরে কেবলরামের মায়ের মৃত্যু হইলে কেবলরাম এই

ভগিনীপতির গৃহে আশ্রয়লাভ করে।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে; তাহার বয়স ২৫ বৎসর হইলেও এখনও সে জামাই বাবুর অধীনেই রহিয়া গিয়াছে। কারণ হেরম্ব বাবু অতি সূক্ষ্ম হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন শ্বশুরের সমস্ত দেনা শোধ করিতে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তিতে কুলায় নাই, তাঁহার নিজেরও কিছু গচ্চা লাগিয়াছে। কাযেই বেচারা কেবলরামকে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়া ভগিনীপতির অন্ন ধংসের অপবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। কেবলরামের শিশুকালে কি একটা চোখের অসুখ হইয়াছিল, তাই হেরম্ব বাবু প্রিয় শ্যালকের পাছে আরও চোখ খারাপ হইয়া যায় এই ভয়ে তাহার লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেও ভগিনীপতির সুবিবেচনার ফলে চক্ষুরত্ন সুস্থ সবল রাখিয়া সরস্বতীর খোঁয়াড় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। শিশুকালে মাথায় কি একটা পীড়া হওয়ায় সে সুখ দুঃখ ও মান অপমানের প্রভেদ জ্ঞান হইতেও অনেকটা পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

যোগমায়ার পুরী যাওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে মতলব স্থির করিয়া হেরম্ব বাবু রাত্রি একটার সময় কেবলরামকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেবল, একটা কায খুব সাবধানে করে আসতে হবে। সুনীর শ্বাশুড়ী মাগীটা বাড়ীতে নেই, এই ফাঁকে সুনীর বাড়ীটায় দখল নিয়ে আসতে হবে। পারবে তো?"

কেবলরাম দখল নেওয়া কথাটা সম্যক্ না বুঝিয়া কহিল, "কি করতে হবে?"

হেরম্ববাবু কহিলেন—"এ বুদ্ধিটাও তোমার আজও হল না? তোমার সঙ্গে স্বরূপ আর দারোয়ান যাবে। সমুখের দুয়ার ভিতর থেকে বন্ধ। পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে যেতে হবে। তার পর ঘরের আসবাব যে সব জিনিষ দামী দামী পাবে নিয়ে আসবে। শরতের জিনিষ পত্র সব আনবে। তার পর তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, ওরা সব ঘরে আমার দেওয়া তালা বন্ধ করে আসবে। তারপর দরজায় খিল খুলে বাইরে আসবে, এসে দরজায় এই বড় ভাল তালাটা লাগাবে। বুঝেছ?"

কেবলরাম তাহার বৃহৎ চোখ দুটা ভগিনীপতির পানে রাখিয়া বলিল, "সুনুর শ্বাশুড়ী যে এখন বাড়ী নেই। তিনি বাড়ী এলে তার পর গেলে ভাল হয় না?"

শ্যালকের এই অদ্ভুত বিজ্ঞতায় তাঁহার আর সহিষ্ণুতা রক্ষিত হইল না। তিনি বিষম চটিয়া কহিলেন—"গাধারাম, এইটুকু বুদ্ধিও ঘটে নেই? সে মাগী এলে তোমাকে ডেকে বল্‌বে এস যাদু আমার, আমার দুয়োর ভাঙ্গবে। বাড়ী সুনীর, ওখান থেকে আমি তাকে তাড়াতে চাই, বুঝলে ঢেঁকীরাম?"

এত সরলভাষায় বুঝাইয়া দিলেও কেবলরাম ওরফে ঢেঁকীরাম বা গাধারাম কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে জামাই বাবুর বাড়ী হইতে জামাই বাবুর মাকে কি করিয়া তাড়ানো সম্ভব হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে জামাই বাবুর মা এসে থাকবেন কোথায়?"

হেরম্ব বাবুর ইচ্ছা হইল যেমন করিয়া তিনি শ্বশুরের বিষয় ভক্ষণ করিয়াছেন তেমনি করিয়া এই শ্বশুর বংশধরের মুণ্ডটি ভক্ষণ করিয়া শ্বশুরবংশ সমাপ্ত করিয়া ফেলেন। কিন্তু সেই সাধু সংকল্প আপাতত কার্য্যে পরিণত না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"তার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমায় যা বলছি তাই কর।"

কেবলরাম তাহার এই অন্নদাতা ভগিনীপতির ক্রোধের ফলটুকু বেশ জানিত। এখনও কাণে হাত দিলে বাল্যকালের কাণের দুর্দ্দশার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। কাণের সঙ্গে মাথাটার ভগবানের হাতের-বাঁধন খুব শক্ত বলিয়াই কেবল কাণ দুটা টিকিয়া আছে। সে সব কথা মনে করিয়া ভয়ে ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবলরাম স্বরূপ ও দ্বারবানের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

যোগমায়া পুরী যাইবার সময়ে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়াছিলেন ও প্রাচীর-সংলগ্ন দুয়ার দিয়া দেবরের বাড়ী যাইয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। কেবল যখন অনুচরদের সহিত প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ভিতরে নামিল, তখন কিসের

একটা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে সভয়ে স্বরূপের হাত ধরিয়া বলিল, "স্বরূপ আমায় ছেড়ে দেও না, আমার ভয় করছে। তোমরাই ত সব পারবে।"

স্বরূপ লোকটা অনেকখানি বীরপুরুষ। দুর্দ্দান্ত প্রভুর অবজ্ঞাত শ্যালকের এই কাপুরুষোচিত উক্তিতে জ্বলিয়া সে ঘৃণাভরে হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "যাওনা, গিয়ে একবার বাবুর কাছে মজাটি দেখগে।"

ভৃত্য-নির্দ্দিষ্ট সেই 'মজাটা' কল্পনা করা কেবলের পক্ষে মেটেই কঠিন হইল না, সে জন্য সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদের সহিত অগ্রসর হইল।

চন্দ্রালোকিত অর্দ্ধরাত্রে নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ দিয়া গৃহের পানে অগ্রসর হইবার সময় সরল নির্ব্বোধ কেবলরামের মনে হইল যেন সে দলবল লইয়া একটা নিদ্রিত মানুষের প্রাণ লইতে চলিয়াছে। একটা আতঙ্ক ও ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সে রাত্রে শিবপ্রসাদ ও তার স্ত্রী রুক্মিণী এখনও জাগিয়া ছিলেন। অত রাত্রে মানুষের পদশব্দ ও কথাবার্ত্তার শব্দ কাণে যাইতে রুক্মিণী স্বামীকে বলিল—"হ্যাঁগা, দিদির বাড়ী থেকে শব্দটা আস্‌ছে না?

এ ব্যাপারটা যে ঘটিবে তাহার আভাস শিবপ্রসাদ পূর্ব্ব হইতেই অনেকটা জানিত। যে ভ্রাতার উপরে তাহার কোন দিন কোন বিশেষ অনুরাগ ছিল না, সেই ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীর জন্য তাহার কোন মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা ছিল না। বরং সে অপর পক্ষের এই দোষটা একটু ঢাকিয়া লইবার ভরসাই দিয়াছিল।

রুক্মিণী আর একটু পরেই পুনরায় কহিল, "হ্যাঁগা ঠিক মানুষের পায়ের শব্দ।" আরও খানিক কাণ খাড়া রাখিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ওই বুঝি তালা ভাঙ্গলে গো! ওই শোন দুয়োর খুলে ফেল্‌লে। ওগো ওঠো না। একেবারে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাবে। দিদি এসে কি বলবে গো! ওগো ওঠো একবার!"

শিবপ্রসাদ পাশ ফিরিয়া একটি প্রকাণ্ড পাশ বালিস আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমার এখন ঘুম আসছে। তোমার যদি অত দয়া হয় ত তুমিই যাও!"

"হ্যাঁগা আমার সাধ্যি থাকলে কি আমি চুপ করে থাক্‌তাম? ওগো একটিবার, উঠে চেঁচিয়ে বল—কেও? তাহলেই পালাবে। নইলে দিদি এসে বাড়ী ঢুকে কি বল্‌বে?"

এবার শিবপ্রসাদ স্ত্রীকে একটু ভরসা দিয়া কহিল, "সে ভাবনা নেই। এবার এসে আর বাড়ী ঢুকতে পারবে না। এরা সব শরতের শ্বশুরের লোক। জিনিষ পত্র নিয়ে যাবে, সদরে তালা বন্ধ করে যাবে। চাই কি ভাড়াটেও বসাতে পারে।"

রুক্মিণী আর কিছু বলিল না। সেই অভিমানিনী স্বামিপুত্রহীনা নারী যখন আসিয়া এই কাণ্ড দেখিবে তখন সে কি ভাবিবে এবং সেই শোক ও অত্যাচারদীর্ণ বক্ষস্থলের কি মূক অভিসম্পাতে তাহার স্বামী পুত্রের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে ইহা ভাবিয়া রুক্মিণী বারবার শিহরিয়া উঠিল এবং অশ্রু মুছিয়া লুটাইয়া আপনার অঞ্চলের একাংশ সিক্ত করিয়া ফেলিল। আর তখন এই সৌভ্রাত্রের দেশে, জ্যেষ্ঠের বিধবা আসিয়া নিরাশ্রয় হইলে তাহার অবস্থাটা কি পরিমাণে উপভোগ্য হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া কনিষ্ঠভ্রাতার মুখভাব নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ততক্ষণ হেরম্ব বাবুর অনুচর দুইজন সম্মুখের দুয়ার খুলিয়া ফেলিয়া ঘরের মধ্যে মধ্যে দিয়া শরতের শয়ন ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ ঘরেই শরতের যাবতীয় দ্রব্যাদি থাকিত।

জামাই বাবুর বিছানা বাক্‌সটা ও কয়েকটি ভাল ভাল জিনিষ যাহা আলমারীতে ছিল তাহাও স্থানে স্থানে একটু সন্ধান করায় মিলিয়া গেল। তাহা লইয়া স্বরূপ ও দ্বারবান বাহিরে আসিয়া দেখিল কেবলরাম নাই। দুই একবার মৃদুস্বরে ডাকিল, কোন উত্তর আসিল না। কেবলরামকে তাহারা চিনিত। বুঝিল, ভয় পাইয়া সে পলাইয়াছে।

একটু ভয়ে ভয়ে সম্মুখের ঘরের দুয়ারে প্রভুর দেওয়া নূতন তালাটী লাগাইয়া, জিনিষপত্র লইয়া তাহারা ধীরে ধীরে একেবারে বাড়ীর বাহিরে আসিল। তাহাদেরও

মনে হইল কি যেন একটা অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। দারোয়ানটা তাড়াতাড়ি শিকল তুলিয়া দিতে স্বরূপ তাহাতে একটা মজবুত তালা লাগাইয়া দিল। পকেট হইতে একটা লেখা কাগজ ও কাগজে জড়ানো খানিকটা আঠা বাহির করিল এবং কাগজের বিপরীত পৃষ্ঠে খানিকটা আঠা লাগাইয়া দরজার মাঝামাঝি জায়গায় তাহা লাগাইয়া দিল।

তার পর জিনিষপত্র সব গুছাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পথ দিয়া তাহারা প্রভুর গৃহাভিমুখে চলিল।

ঠিক সেই সময়ে হেরম্ব বাবু বৈঠকখানা ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলেন রোয়াকের একধারে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া।

"কে?" বলিতেই মূর্ত্তি মৃদুস্বরে ভয়জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আমি।"

"আমি কে? কেবলা?"

"আজ্ঞে।"

"এখানে দাঁড়িয়ে যে? এরা সব কোথায়? কথা কচ্ছিসনে কেন?"

"এরা সেখানে।"

"সেখানে? তুই চলে এলি যে?"

"আমার ভয় কর্‌ছিল। জামাইবাবু দেখতে পাচ্ছিলেন।"

বিস্ময়ে ও রোষে ঈষৎ একটু স্তব্ধ থাকিয়া হেরম্ব বাবু বলিলেন, "আচ্ছা ভিতরে আয়।"

অত্যন্ত ভয়ে নিরুপায় হইয়া কেবলরাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্রগম্ভীর স্বরে হেরম্ব বাবু বলিলেন, "বদমাইসি ছেড়েছে? ঠিক করে বল্ কেন পালিয়ে এলি?"

কেবলরাম ভয়ে ভয়ে বলিল, "জামাই বাবু রাগ কচ্ছিলেন, আর জামাই বাবুর মা ফিরে এসে আমায়—"

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবিংশবর্ষীয় শ্যালকের গালে প্রৌঢ় ভগ্নীপতির প্রকাণ্ড চড় পড়িল। ভগিনীপতি গর্জ্জিয়া বলিলেন, "জামাই বাবু রাগ কর্‌বে? জামাই বাবু মরে গিয়েছে জানিস নে?"

চড় খাইয়া কেবলরামের ভয় অনেকটা কমিয়া গেল। গালের জায়গাটায় একটীবার হাত বুলাইয়া কহিল, "মরামানুষে সব দেখতে পায় মার কাছে আমি শুনেছি। আমার যেন মনে হল জামাই বাবু ঘরটায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখ দুটো যেন জলছিল।"

এই অদ্ভুত আজগুবি গল্প শুনিয়া অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া হেরম্ব বাবু আর একবার শ্যালককে অন্নদানের শোধ তুলিবার জন্য হাত তুলিলেন—এমন সময় স্বরূপ ও বিষণ সিং বাহির হইতে ডাকিল—"বাবু!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অধিকাংশ স্থলেই স্বামী স্ত্রীর মিলনের মধ্যে ভগবানের একটি নিপুণ হস্তের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামী সদাশিব ভোলানাথ গোছের হইলে স্ত্রী বেশ একটু গোছালো এবং একটু কড়া ধাতের হইয়া থাকে। স্বামী একেবারে রুক্ষ স্বভাবের হইলে স্ত্রী সেখানে শান্তশিষ্ট। স্বামীর হাত দিয়া যেখানে জলবিন্দু গলিবার উপায় নাই, স্ত্রী সেখানে একেবারে মুক্তহস্ত। ভগবান সর্ব্বত্র এইরূপ বৈচিত্র্য দিয়া শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

রুক্মিণী যে যোগমায়াকে অত অনুনয় বিনয় করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল, রুক্মিণীর স্বামী শিবপ্রসাদ মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিল—"হ্যাঁ গা, বড় বৌকে নাকি নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা হয়েছে?"

রুক্মিণীর মুখ হইতে মুহূর্ত্তে সমস্ত রক্ত সরিয়া গিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই ভয়ানক তীক্ষ্ণ ও হৃদয়হীন কথা কয়টি যদি দিদির কাণে গিয়া থাকে এই আশঙ্কায় ও লজ্জায় সে স্বামীকে নিষেধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। পর ক্ষণে মনে পড়িল যে যোগমায়া নীচে রান্নাঘরে আছেন, তখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বামীকে

বলিল, "হ্যাঁ, দিদিকে এবাড়ীতে এনেছি তাতে কি হয়েছে? দিদির এই অবস্থায় কোথায় তুমি দিদির সাহায্য করবে তা নয় তোমার মুখে এই কথা?"

শিবপ্রসাদ পুরুষ বলিয়া যথেষ্ট অভিমান রাখে। সে বুঝিল স্ত্রীর গরম কথায় এখন নরম হইলে হারিয়া যাইতে হইবে। বরং এখন নিজেও ঐরূপ গরম থাকিতে পারিলে একটা মাঝামাঝি রফা হইতে পারে। তাই সে তাহার কণ্ঠকে উচ্চে চড়াইয়া কহিল—"দেখ, ওসব হবে টবে না। ওকে অন্যজায়গায় ভর করতে বল। তুমি না পার আমি খেয়ে উঠে বলছি।"

স্বামীর মনুষ্যত্ব রুক্মিণীর অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি এতখানির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। দুঃখে ক্রোধে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে একটু সামলাইয়া বলিল—"দেখ, তুমি যদি দিদিকে এতটুকু একটা অপমানের কথা বল, আমি দিব্যি করে বলছি আমি তাহলে আত্মঘাতী হয়ে তোমার হাত থেকে জুড়োব।"

কাযেই শিবপ্রসাদকে তাহার সাধু সংকল্প আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল। রুক্মিণী খুবই কম কথা বলে কিন্তু যেটা বলে সেটা প্রায়ই সে কাযে পরিণত করে তাহা শিবপ্রসাদ জানিত।

আর গ্রাস কয়েক ভাত নিঃশব্দে খাইয়া লইয়া শিবপ্রসাদ কহিল, "তোমারই ভালোর জন্যে বলছিলাম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয় তাই ভয় হয়। হেরম্ব বাবু কি বলে বাড়ী চাবি বন্ধ করেছেন জান?"

রুক্মিণী জিজ্ঞাসুভাবে স্বামীর পানে চাহিল।

শিবপ্রসাদ বলিল, "তিনি বলেছেন ওঁর লজ্জা সরম নেই। শরতের বন্ধু বলে যারা আসে তাদেরই উনি বাড়ীর ভেতর ডেকে কথাবার্ত্তা কন, যেন তাদেরই ঘরকন্না। এ অবস্থায় তাঁর মেয়ের এখানে থাকা অসম্ভব, কাযেই তাঁকে বাড়ী অধিকার করতে হল। এত বড় বাড়ী ত আর ছেড়ে দিতে পারেন না। তার উপর মায়ের বদনাম ত আছেই। যেমন মা তেমনি মেয়ে কথাটা তো—"

শিবপ্রসাদের কথাটা আর শেষ করিতে হইল না। রুক্মিণী একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখ নিজের বড়ভাইয়ের সতীলক্ষ্মী বৌয়ের সম্বন্ধে এমন কথা মুখে এন না। একেবারে সর্ব্বনাশ হবে, আঁটকুড়ো হবে। যিনি দিদিকে এই করে ভিটে ছাড়া করলেন, আবার এই অপবাদ দিচ্ছেন, তার তো হবেই। তুমিও যদি এ কথা আর দ্বিতীয়বার মুখ দিয়ে বার কর তোমারও হবে। এ আমি ঠিক বলছি।"

এমন জোরের সহিত রুক্মিণী কথাকয়টি বলিয়াছিল যে, শিবপ্রসাদ বাল্য হইতেই অসদাচরণে অভ্যস্ত থাকিলেও ইহার উত্তরে কিছু বলিবার সাহস পাইল না।

ঠিক এই সময়ে রুক্মিণী মা পিছনের বারান্দা হইতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আমিও বলি মা, অতটা ভাল নয়। ঘরে মুখ বন্ধ করে কি হবে মা, বাইরে যে এই কথাই ঢি ঢি হয়ে গেছে। তা তোরা কেউ যদি ও কথা মুখ ফুটে মাগীকে বলতে না পারিস, আমিই বলছি। যে কটা দিন তোদের এখানে আছি তোদের ভাল ত দেখতে হবে।"

মা যে লুকাইয়া লুকাইয়া এই সব কথাগুলি শুনিতেছিলেন ইহাতে ঘৃণা ও রোষে রুক্মিণীর পিত্ত অবধি জ্বলিয়া গেল।

"মা তোমার এমন গায়ে পড়ে ভাল করতে হবে না। দিদি তোমার চেয়ে তোমার মেয়ের চেয়ে শত গুণে ভাল তা মনে রেখ। যতক্ষণ দিদি আছেন ততক্ষণ দিদিকে যদি একটি কোন কথা তোমার কেউ বল, তা হলে আমি রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।"

বলিয়া রুক্মিণী রোষে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়া এক প্রকার ছুটিয়াই নীচের দিকে চলিয়া গেল।

সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া চোখ মুখ মুছিয়া একটু শান্ত হইয়া রুক্মিণী যখন রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তার ঠিক একটু আগেই অশোক আসিয়া নতমুখে যোগমায়ার নিকট দাঁড়াইয়াছে। অশোক তখন কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতেছিল, "শরৎ যা বলে গিয়েছিল খুড়িমা তা যে এত শীঘ্র হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আমিও খুড়িমা অমনি ছাড়ব না। আমি থানায় খবর দিচ্ছি।

ডেপুটি বাবুকে খবর দিয়েছি। হেরম্ব বাবুকে আমি একবার দেখে নেব। শরৎ নেই বলে তিনি আজ তোমার এমন অপমান কল্লেন।"

বলিতে বলিতে অশোক সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগমায়া পুত্রস্নেহে অশোককে শান্ত করিয়া বলিলেন—"তোকে তখনও বলেছিলাম, এখনও বলছি বলছি অশোক, শরৎকে হারিয়ে আমি যে দুঃখ পেয়েছি এ দুঃখ তার কাছে কিছু নয়। তাই এতে আমার কোন কষ্ট হবে না। তুই মনে ক্ষোভ করিস নে বাবা।"

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

"প্রতাপসিংহ"-এর গান

(অষ্টম গীত)

[রচনা—স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

রেবা

কীর্ত্তন (মিশ্র খাম্বাজ)—তাল ফের্ত্তা।

ভালবাসি যারে সে বাসিলে মোরে আমি চিরদিন তারি
চরণের ধুলি ধুয়ে দিতে তার দিব নয়নের বারি।
(তারে) দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, রব তারি অনুরাগী ;
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহারি লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি তাহে অভিমান নাই রে,
সুখে সে থাকুক্ চিরদিন তবু হবে দু'জনার ঠাঁই রে ;
নিরবধি কাল—হয়ত কখনও ভুলিব সে ভালবাসা ;
বিপুল জগৎ হয়ত কোথাও মিটিবে আমার আশা॥

[স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

স্থায়ী———মধ্যমান।

০				১			
II সা	সরগমপা	-সণা	ধপা ।	মপধা	-মপা	গরগা	গমা I
ভা	ল০০০০	০ ০	বা০	সি০ ০	০ ০	যা০ ০	রে০

* এ গানখানি অভিনয়কালে আজকাল গীত হইতে অন্ততঃ আমি শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে বারদুই যে সুরে ও যে তালে গীত হইতে শুনিয়াছিলাম, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করিয়াই স্বরলিপি করিলাম।—লেখিকা।

২´ ৩
I মা মপা রগমা মগমা । গা -রগা রসা -া ।
সে বা০ সি০ ০ লে০০ মো ০ ০ রে০ ০

০ ১
। সরা -গা গমা গমা । গমা গরা -গা সা]
আ০ ০ মি ০ চি০ র ০ দি০ ০ ন

২´ ৩
I সরা -গমা -পমা -পমা । গা -রমা -গরা -সা ।
তা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ১
। র্সণা -ধপা মপধা -মপমা । রগমা -পধপা মগমা মগা]
তা ০ ০ ০ ল০ ০ ০ ০বা সি০ ০ ০ ০ ০ বা০ ০ রে০

২´ ৩
I মা পা পা পধণা । -ধপা মগা -মগা -রগা ।
সে বা সি লে০ ০ ০ মো০ ০রে ০ ০

০ ১
। গমা পমা মধা পধা । -ণা ধপা মগা -মা]
আ০ মি০ চি ০ র ০ ০ দি০ ন ০ ০

২´ ৩
I রা -গমা -পধা -পমা । গা -রগা -মা -গা ।
তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০ ০

০ ১
। সা সা সা সা । -রগা গরা -গগা -মপা]
চ র শে র ০ ০ ধূ ০ ০লি ০ ০

২´ ৩
I মগা মা পা মপধা । পধা -ণধা -ণা -ধা ।
ধূ০ রে দি তে০০ তা০ ০ ০ ০ র্

০ ১
। পা -ধা পা মা । মা গা রগা -মগরা]
দি ০ ব ন র নে র০ ০ ০ ০

২´ ৩
I সরা -গমা -পমা -পমা । গরা -মগা -রা -সা ।
বা০ ০০ ০০ ০০ রি০ ০০ ০ ০

০ ১
। মা মা -গমা পা । পা মা -গমা গা I
চ র ০০ ণে র ধূ লি

২´ ৩
I মা ধা পা পা । -ধণা ণা -ধা -পা ।
ধূ য়ে দি তে তা ০ র্

০ ১
। র্সা -ণধা পধা পধা । মপা মা -গমা -গমা I
দি ০০ ব০ ন০ য়০ নে ০য় ০০

২´ ৩
I গরা -গমা -পমা -পা । মা -গা -া -া II
বা০ ০০ ০০ ০ রি ০ ০ 0

অন্তরা—লোফা

০ ১ ২´ ৩
II পপা মপা পা । পধা -ননা নর্সা I র্সা নর্সা র্সা । নর্সরা´ নর্সা র্সা ।
তারে দেব তা ক০ ০রি য়া০ হৃ দ০ য়ে রা০০ খি০ ব

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সনর্সা । নধনা পক্ষাপা পা I পা -না -া । ধনা -র্সনা পধনর্সর্রগর্রা ।
র ব তা০০ রি০০ অ০০ শ্রু রা ০ ০ গী০ ০০ তা০০০ ০রে০

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সনা । র্সা নর্সা নর্সা I পা নর্সা না । ধনর্সা নধনা পক্ষা ।
দে ব তা০ ক রি০ য়া০ হৃ দ০ য়ে রা০০ খি০০ ব০

০ ১ ২´ ৩
। পা না ধনা । নর্সা পক্ষা ক্ষা I গা -না -ধা । না -র্সা -না ।
র ব তা০ রি০ অ০ শ্রু রা ০ ০ গী ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। র্সা র্সা র্সণা । ণা ধণা ধপা I পা ধপা ধপা । মপধা মা গা ।
ম রু ভূ০ মে অ০ লে০ কা ন০ নে০ অ০০ ন লে

০ ১ ২´ ৩
। রা পমপা পা । মা গা রগা I -মপা গমা -পমা । গা -রা -সা ।
প্র শি০০ ব তা হা রি০ ০০ না০ ০ ০ গি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। মা মা মপা । মপা পক্ষা পা I র্সা র্সণা ণধা । মপা -ধমা গা I
ম রু ভূ ০ মে০ ঙ্গ০ লে কা ন ০ নে০ অ০ ০ন লে

০ ১ ২ ৩
। মধা পধা মপা । মা গা গমা I রগা -মপা -ধা । পা -মা -গা II
প০ শি০ ব০ তা হা রি০ না০ ০ ০ ০ গি ০ ০

সঞ্চারী—জলদ ঠুংরী

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
II সা সা । সন্‌া সা I -ন্‌রা সরা । রা -া । সা রা । গমা রা I
ভা ল বা০ সি ০ ০ যা০ রে ০ সে না বা০ সে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
-গা গরা । গসা মমা । মপা মপা । মগমা -পা I গমপধা ণধা । ক্ষা -পা ।
০ ব ০ দি০ তাহে অ০ ভি ০ মা০০ ন্ না০ ০০ ই০ রে ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা -ণা । ধণা ধা I ধা -পা । পা -া । পা -া । মা -া I
সু ০ খে০ সে থা ০ কু ক্ চি ০ রি ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I ধপা ধা । পমা গরা । সরগগা মগা । রগা সা I সরগমা -পমপমা ।
দি০ ন ত০ বু০ হ ০বে০ তুজ না০ র ঠাঁ০০০ ০ই ০০

৩ ১ ২´ ৩
। গরমা -গরসা । সা গরা । গমা গরগা I গা মপধা । মপা মগরা ।
রে০০ ০ ০ ০ ভা লবা সি০ যা০রে সে নাবা০ সে০ যদি ০

০ ১ ২´ ৩ ০
। রা মগা । রগরা সন্‌ন্‌া I সগা রা । গা -া । গ্‌রা গক্ষাপা ।
তা হেত্ ভি০০ মা০ন্ না০ ই রে ০ সু০ খেসে ০

।ধা ক্ষপক্ষপা I নক্ষপা ধমপা । -পমা গমগরা । গমা গরা । সনা সা I
থ কু০কৃ০ চি র০ দি০০ নৃত বু হবে ভুজ না০ র

I সরগমপা মপমা । গা -া ।
ঠাঁ০০০০ ইঁ০০ রে ০

আভোগ—দ্রুত কাওয়ালী

। পা নধা । না ক্ষপপা I পধনা -র্সর্সা । নর্সর্সা নর্সর্সা । র্সর্গর্মা র্গর্রা ।
নি র ব ধি কা০ল্ হ০০ রত ক০খ ন০ও ভুলি০ ব০

। র্সনা নপক্ষা I পনা -ধনা । র্সা -না । র্সর্সা ণধা । পধা মগা I
সে০ ভাল০ বা০ ০০ সা ০ বিপু ল০ জ০ গৎ

I সসা সরগপক্ষা । গা -গরগা । মধা পধমপা । মা গমরা I সরগমা -পমপমা ।
হয় ত০০কো০ থা ০০ও মি০ টি০বে০ আ মা০র আ০০০ ০০০০

। গপমা -গরসা । পা ধপা । ধনা ধধা I র্সর্সা র্সনর্সা । না ধনধপা ।
শা০০ ০০০ নি র ব ধি০ কাল্ হ য় তক খ ন০ও

। গমা পা । নর্সা র্সনর্সা I ধনা -র্রা । না -র্সা । পর্সা র্সণা । ধপা মধণা I
ভুলি ব সে ভা০ল বা০ ০ সা ০ বিপু ল০ জ০ গ০ৎ

I ধধা পমধা । পমা -পগা । মমা মা । গা রগসা I সরা -গমপা ।
হয় তকো০ থা০ ০ও মিটি বে আ মা০র আ০ ০০০

। র্সণধপা -মগরসা II II
শা০০০ ০০০০

ন্যায় বিচার

(গল্প)

সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর শ্রান্ত ক্লান্ত পা দু'খানাকে হলধর যখন কুটীরের অভিমুখে ফিরাইল, সন্ধ্যা তখন হয় হয়। আস পাশ ক্ষেতের কৃষকের দল সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই তাহাদের দৈনিক কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; সে কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত পারে নাই। কারণ উদয় অস্ত 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা' পরিশ্রমের পর শেষের বেলায় যে জিনিষটা সংসারের প্রায় পনের আনা লোককে ঘরের দিকে টানে সেইটারই ছিল তাহার অভাব। কিন্তু সেই অভাবের প্রচণ্ড কশাঘাত ও প্রবল আর্থিক অসচ্ছলতা নীরবে সহ্য করিয়াও অতীত জীবনের স্বচ্ছন্দময় জীবন যাত্রার পন্থাটাকে সে তখনও পর্য্যন্ত কতকাংশে বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল শুধু একটি প্রাণীর মুখ চাহিয়া। সেটি তাহার বড় আদরের কন্তা দুলালী।

বছর কয়েক পূর্ব্বে নিজের সেই নির্জ্জন সঙ্গীহীন জীবনকে কোলাহল-মুখরিত করিবার আশায় সে যখন দুলালীর মাকে ঘরে আনিয়াছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবে নাই যে সংসারে দুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার এই বিষম ভুল সে বুঝিতে পারিল যে দিন দুলালীর মা কালের তাড়নায়, তাহার চোখের উপর নিজের রক্ত মাংসের দেহটা ছাড়িয়া মনুষ্য দৃষ্টির বহির্ভূত একটা চিরশান্তিময় রাজ্যে চলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিত বিপদের এই প্রবল তাড়নাটা হলধর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না।

দিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ দুঃখের পরিমাণ অনেকটা কমিয়া আসে বটে, তাহার পক্ষে কিন্তু ঘটিল ইহার ঠিক বিপরীত। শোকের প্রথম আঘাত যেমন ভাবে তাহার অন্তরে ঘা দিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত ঠিক সেইভাবেই সেটুকু তাহার ভিতর ছিল। কতবার সে নিষ্কৃতি লাভের আশায় সংসার হইতে পা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু পারে নাই। একখানি কোমল মুখের স্নেহমাখা অনুযোগ আর দু'টী জলভরা চোখের করুণ চাহনি নিমেষের মধ্যে তাহার সকল সঙ্কল্প ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাধা পাইয়া এক একদিন স্নেহপূর্ণ বিরক্তির সহিত সে কন্যাকে তিরস্কার করিয়া বলিত—"তুই বেটীই ত যত নষ্টের গোড়া! এতদিন যে হলা দাসের পাত্তাও কেউ এ গ্রামে পেতনা রে, তুই খালি আমাকে বেঁধে রেখেছিস বৈত নয়! নইলে দেখতাম সে কত বড় ঘোষের বেটী, যে আমায় একলা ফেলে কেমন করে যায়।"

পিতার এই মনের যন্ত্রণাটা দুলালী মোটেই তলাইয়া বুঝিত না, মুখ টিপিয়া কেবল একটু হাসিত মাত্র। সেই হাসিটুকু বড় নির্ম্মল বড় সুন্দর।

দশ বছরের এই ফুট ফুটে মেয়েটীর মুখের উপর এমন একটা সৌন্দর্য্যের আভাস পাওয়া যাইত, যেটুকু, চাষার ঘরে ত দূরের কথা, ভোগবিলাসী অনেক বড় ঘরে মিলিত কিনা সন্দেহ। আর সেইটুকুর জন্য পাড়ার ইতর ভদ্র সকলেই মেয়েটীকে স্নেহের চক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। কেহ কেহ হলধরকে বলিত, "বলি হাঁরে দাসের পো, তোর ঘরে এমন সোণার পিতিমে এল কোত্থেকে বল্ ত?"

ম্লান হাস্যের সহিত হলধর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিত "কি জানি বাবু, বেটী বোধ করি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা টেব্তা হবে, আমাকে ছলতে এসেছে। বলতে কি বাবু মশায়, যে জিনিষ সেদিন খুইয়েছি তাতে কি আর এ পোড়া জগতে থাকতে মন চায়? কিন্তু ঐ বেটীই আমার সব মাটি করে দিলে।"

"ষাট, ষাট, ওকে ছেড়ে যাবি কোথা রে? বেঁচে থাক ওটা, তার বেথা দিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতবি এখন। তখন দেখবি আবার কতকাল বাঁচতে ইচ্ছে করবে।"

"আশীর্ব্বাদ কর কত্তা যেন তাই হয়। আমাকে কিন্তু দেবতা ওটুকু বোল না, যেতে পারলেই যে আমার হাড় জুড়য়! বরং ঐ হতভাগীটা এরপর যাতে আপনাদের জুতোর তলায় একটু জায়গা পায় শুধু এইটুকু কোর বাবু।" এই বলিয়া হলধর প্রণাম করিয়া বিদায় হইত।

ক্রোশখানেক পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হলধর তাহার অন্ধকার কুটীরখানির সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"আমার মা জননী কই রে?" অমনি দুলালী ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। সেই স্নেহস্পর্শে হলধরের সারাটা দিনের পরিশ্রমজনিত গ্লানিটুকু যাদুমন্ত্রের মত কাটিয়া গেল। তাহার পর অভিমানের সুরে হলধরের এই ক্ষুদ্র জননীটি তাহার রাজুকাকা, তিনুমামা প্রভৃতির সকাল সকাল গ্রামে ফিরিয়া আসা সত্ত্বেও তাহার এই বিলম্বের জন্য যখন কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিল, তখন তাহার স্নেহের এই অভিযোগটুকু কাটান করিবার মত যুক্তি তর্ক সে ত খুঁজিয়া পাইলই না, অধিকন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে ভবিষ্যতে এরূপ বিলম্ব সে আর করিবে না। সেই সময় কিসের একটা ক্ষণিক চিন্তা হলধরের হৃদয় তন্ত্রীগুলিকে কঠিন ভাবে নাড়িয়া দিয়া গেল। সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"এমনতর খোঁজ ঠিক আর একজন নিত বটেরে!"

মুখখানি হঠাৎ একটু ভার করিয়া দুলালী জিজ্ঞাসা করিল—"কে বাবা?"

এই দুর্ব্বলতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়া হলধর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, কে আবার!" এই বলিয়া সে কন্যাকে এমন ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিল যে অপর কেহ সে সময় তাহাকে দেখিলে বিকৃতমস্তিষ্ক সাব্যস্ত না করিয়া থাকিতে পারিত না। লোকে যাহাই বলুক না কেন, তাহার কিন্তু শোক সন্তপ্ত দেহখানাকে শীতল করিবার ইহাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। গরিবের দিন এই রূপেই কাটিত।

২

সেদিন বিকাল হইতেই হলধরের মনটা মোটেই ভাল ছিল না। ভোরের আঁধারটুকু গাছের আগায় মিলাইতে না মিলাইতে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। পার্শ্বে নিদ্রিত দুলালীর দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আনন্দের পরিবর্ত্তে, আজ কি জানি কেন, প্রাণটা তাহার আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। স্থিরদৃষ্টিতে সে সেই হাস্যমাখা মুখখানির দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যেন সে দৃষ্টি মুখখানিকে গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা আজ তৃপ্ত হইল না। বরং আকুল প্রাণের সমস্ত বেদনা ফোঁটাকতক জলের সহিত মিশিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল। নিজের প্রশস্ত বুকখানাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল—"এ আবার আজ কি জ্বালা!"

অতলস্পর্শ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত প্রাণের বেদনা কমাইয়া দিবার বিফল চেষ্টা করিয়া যখন সে সেখান হইতে উঠিল, পূর্ব্বাকাশ তখন রক্তরাগে রাঙা। নিঃশব্দে পা টিপিয়া সে সবে মাত্র কুটীর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে, এমন সময় ছোট দুইখানি হাত পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। চমকাইয়া হলধর ফিরিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ! যাহার জন্য এত সাবধানতা সেই তাহার সমুখে। হঠাৎ এই ভাবে ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ ভাবটা মনে চাপিয়া হলধর বলিয়া উঠিল, "ওরে বেটি! আজ যে বড় এর মধ্যেই উঠে পড়িছিস? যা যা শুগে যা, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে!"

অভিমানের সুরে ক্ষুদ্র ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকাইয়া বালিকা বলিল, "হুঁ! কাল থেকে না বলে রেখেছি তোমার সঙ্গে যাব, তাই বুঝি চুপি চুপি পালান হচ্ছে?"

"আজ আর নয়রে বেটি, আজ বড় ঠাণ্ডা!" বলিয়া হলধর কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বালিকা পূর্ব্বদিকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "হঁা! ঠাণ্ডা বৈ কি? ভারি চালাক! সুয্যি মামা উঠলে বুঝি আবার ঠাণ্ডা থাকে? আজ যাবই যাব, কোন কথা শুনব না।"

দৃঢ়তার সহিত কন্যার এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত হলধর কখনও ঠেলিতে পারে নাই। অবশেষে সঙ্গে লইতে হইল।

গ্রামের পথ যেখান হইতে বাঁকিয়া বরাবর প্রান্তরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, ঠিক তাহার পার্শ্বের সেই ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্য উপত্যকার উপর বিরাজিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলাখানি নীলকর চার্লস সাহেবের। সংসার-কোলাহল-ক্লান্ত সঙ্গীহীন জীবনটা জুড়াইবার আশায় ও নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এই কুটীরখানিতে তিনি তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা ইলাইজাকে লইয়া বাস করিতেন। দৈহিক ও মানসিক নির্য্যাতনের মাঝখানে থাকিয়া এই শ্বেতাঙ্গ মহোদয়ের মেজাজ এতদূর খিটখিটে হইয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার নিম্ন কর্ম্মচারিদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না যে সে ঝাঁঝটা একবারও উপলব্ধি না করিয়াছে।

মোড় ঘুরিয়া বাংলাখানির সামনে হলধর যখন আসিয়া পড়িল, সাহেবের পাঁচ বৎসরের মেয়েটী তখন ফটকের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। দূর হইতে দেখিয়া দুলালীর স্নেহপূর্ণ হৃদয়খানি হঠাৎ তালে তালে নাচিয়া উঠিল। প্রবল আবেগে সে বলিয়া উঠিল, "বাবা দেখ কেমন ফুটফুটে মেয়েটী, একবার কোলে নেবে বাবা?" বলিয়া সেইদিকে ছুটিতেই হলধর খপ করিয়া তাহার হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "সে কিরে পাগলি! ও যে সাহেবের মেয়ে! তার ওপর তিনি যে রাগী যদি দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। ওরে আমরা যে ছোট লোক, কাঙ্গাল গরিবের মনের সাধ মনেই চাপতে হয় রে বেটী, ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ করবার জোটি নেই তা জানিস?"

হঠাৎ বাধা পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে দুলালী বলিল, "তা হোক, শুধু একবার কোলে নেব বাবা।"

"তা হয় না রে তা হয় না। সেদিন সাধুমল্লিকের বেটা ঐ মেয়েটিকে একবার কোলে নিয়েছ্যাল বলে সাহেব তাকে এমন মেরেছে যে বেচারা এখনও বিছ্নেয় পড়ে।"

"হ্যাঁঃ, মিছিমিছি দোষ না কল্লে বুঝি আবার কেউ কাউকে মারে। এদিক পানে তাকিয়ে কেমন ফিক্ ফিক্ করে হাসছে দেখ বাবা।" এই বলিয়া দুলালী আর একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেই হলধর তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ওরে মুখ্যু মেয়ে, ওদের কাছে কি দোষগুণ বিচার আছে রে, ওরা যে রাজার জাত। ওদের যা ইচ্ছে যায় তাই করে। নইলে সাধুর বেটা কি অন্যায় করেছিল? মুখুয্যে বাবা ঠাকুর বলে কি জানিস—বলে আমরাই নাকি সবস্ব খুইয়ে ওদিকে এই বাঙ্গালার রাজত্বে নিয়ে এসেছি, অথচ ওরা আমাদিকে দেখলেই নাতি জুতো দিয়ে তাড়না কত্তে থাকে।"

হলধর আর দাঁড়াইল না, জোর করিয়া মেয়েকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বালিকা কিন্তু কিছুতেই যেন শান্তি পাইল না। ক্ষুদ্র এই মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া ধরিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণের মধ্যে সে তাহার ভালবাসাপূর্ণ দৃষ্টি একবারের জন্যও বাংলার দিক হইতে ফিরাইল না।

ক্ষেতের কায লইয়া হলধর যখন ব্যস্ত, দুলালী তখন ছোট ছোট পাহাড়গুলির উপর ছুটাছুটী করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও হলধরের দৃষ্টি কন্যার দিক হইতে একবারও সরে নাই। এবং মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া সে কন্যাকে সাবধান করিতেছিল, "ওরে যাসনে এদিকে আয়। পাহাড়ে জঙ্গলে যে সাপ খোপের বাসা রে।"

বালিকার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই, সে তখন নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর।

এক সময় হলধর হেলে দুটার পিছু পিছু তাড়া করিয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল। সেই সুযোগে বালিকা নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে সাহেবের বাংলার সমুখে আসিয়া পড়িয়াছে হলধর তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। সমুখে দৃষ্টি পড়িতেই দুলালী দেখিল সাহেবের মেয়েটি তখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া। বাহ্যিক আমোদে লুপ্ত তাহার স্নেহের উৎস তৎক্ষণাৎ ভরিয়া উঠিল। সে আবেগ কিছুতেই সে চাপিতে পারিল না। দুই একবার এদিক ওদিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি শিশুকে কোলে তুলিয়া

লইয়া তাহার কোমল মুখখানি অজস্র চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। শিশুর ক্ষুদ্র মস্তকটী আপনা হইতেই দুলালীর কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িল।

চিত্তহরণকারী এই স্বর্গীয় দৃশ্য সাধারণের চক্ষে যতই কেন মনোমুগ্ধকর হউক না, সাহেবের কিন্তু সেটা একেবারেই ভাল লাগিল না। নিকৃষ্ট কৃষক-কন্যার এই অনধিকার চর্চ্চা বোধ হয় সাহেবের আত্মমর্য্যাদায় ঘা দিল। সেই সঙ্গে উদ্ভূত বিজাতীয় ক্রোধের প্রবল উত্তেজনা ক্ষমাহীন মূর্খ শ্বেতাঙ্গ কিছুতেই দমন করিতে করিতে পারিল না। ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া সাহেব তাহার পৈশাচিক ক্রোধ এমন ভাবে চরিতার্থ করিল যে, তাহার ফলে দুলালীর দেহটা গভীর আর্ত্তনাদের সহিত ফটকের নিকট হইতে কয়েক হাত দূরে একটা পাথরের উপর গিয়া পড়িল।

কর্ত্তব্যের মাঝখানে নিমগ্ন থাকিলেও কন্যার এই হৃদয়ভেদী চীৎকার হলধরের কাণে পৌছিল। চমকিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কৈ, কেহই ত নাই! সেই সময়ে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত তড়িদ্‌বেগে মাথায় গিয়া উঠিল। হাতের লাঙ্গলখানা সজোরে মাটিতে ফেলিয়া সে বাংলার দিকে দৌড়িল।

৩

দুই দিন পরেও মেয়েটীর জ্ঞানহীন দেহখানিতে যখন কোন প্রকার চেতনা শক্তির লক্ষণ দেখা গেল না, হলধরে শোকসন্তপ্ত দেহটা তখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যাহা বাস্তবিক শোচনীয়। দুইটা দিন অনাহারে অনিদ্রায় তাহার যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই।

পাড়াপড়শী কেহ খাওয়ার জন্য তাহাকে জোর করিয়া ধরিলে সে কোন কথা বলিত না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত। সে দৃষ্টি যেন বলিত, পৃথিবীর শেষ সম্বলটুকু যে গ্রাস করিতে বসিয়াছে তাহার ক্ষুধা কি সহজে মেটে? তাহার পর দন্তে অধর চাপিয়া তাহাদের পায়ের তলায় পড়িয়া সে বলিয়া উঠিত, "মশাই গো, বোধ করি মাকে আর আমার পারলাম না রাখতে। ইহসংসারে আপনার বলতে আমার যে আর কেউ রইল না হুজুর! এই অসাড় জানটা নিয়ে যদি অমনতর একটা জানের কিনারা করতে পার, দেখনা বাবু একবার চেষ্টা করে। আচ্ছা তোমরা না নাও, দেখ আমি দিতে পারি কি না।"—বলিয়া একখানা ইট লইয়া নিজের বুকের উপর এমন জোরে সে আঘাত করিল যে, দেখিতে দেখিতে পরনের তাহার শাদা কাপড়খানা লাল হইয়া উঠিল। আকুল প্রাণের বেদনার অশ্রু তখন কিছুতেই বাধা মানিল না।

অনেক চেষ্টা করিয়াও ডাক্তার ক্ষতস্থানের রক্ত কিছুতেই বন্ধ করিতে পারেন নাই। তাহার পর আজ সকাল বেলা আসিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গেলেন, তাহাতে হলধর বুঝিল সেই রাত্রি বুঝিবা কাল রাত্রি। বিছানার পার্শ্বে বসিয়া কন্যার শীর্ণ মুখখানিকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তাহার পর আস্তে নাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছিস বেটী, তবুও ঘুম ভাঙ্গল নারে? এদিকে দিন যে যায়। আহা সোণার চাঁদ ঘুমিয়ে কালা হয়ে গিয়েছে। ওরে সে যে তোরে আমার জিম্মেয় রেখে গিয়েছে, কিন্তু আমি এমন হতভাগা যে সেটুকুও আটকে রাখতে পারলাম না। বাছারে আমার, শুধু মুখতুলে একবার কথা ক' আর কিছু চাই না।" হলধর দেহখানি বুকে চাপিয়া ধরিল।

সন্ধ্যার পর দুলালীর মস্তকের ক্ষত হইতে এমন বেগে রক্ত ছুটিল যে হলধর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়াও তাহা রোধ করিতে পারিল না। বার কয়েক ঘরের চারিদিকে উন্মত্তের মত দৌড়াইয়া, সে একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হইল।

চার্লস সেদিন বাংলায় ছিলেন না। কি একটা কাযে সহরে গিয়াছিলেন। তখনও ফিরিতে পারেন নাই। তাঁহার মেয়েটী সেদিন আয়ার কাছে ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে নিদ্রিত মেয়েটিকে লইয়া বসিয়া রহিল। অন্যদিন সাহেব

থাকিলে সে ইহার কত পূর্ব্বে তাহার ও মেয়েটীর দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য গ্রামে চলিয়া যাইত। আজ কিন্তু সে মেয়েটিকে একলা রাখিয়া কি প্রকারেই বা যায়। অথচ না রহিলেও নয়।

ঘুমে অচেতন শিশুকে শয্যায় রাখিয়া, ঘরে তালা বন্ধ করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল! বিছানার পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ডটা যে রহিয়া গেল, তাড়াতাড়িতে তাহা তাহার মনেই হইল না। সামান্য এই ভুলের বশে সে আজ যে শোচনীয় বিপদের সূচনা করিয়া গেল, ইহজীবনে তাহা আর সংশোধিত হইবার নহে।

জমাট অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে সাহেব বাংলার অভিমুখে চলিয়াছেন। অপর দিন অপেক্ষা সেদিনের শীত যেন বেশী কন্‌কনে। আর অধিক দূর নাই। হঠাৎ দূরে দৃষ্টি পড়িতেই সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। ওকি! বাংলার কাছে অত আলো কিসের? না না কাছে ত নয়, ঐটাই যে তাহার বাংলা। তবে কি আগুন নাকি! সর্ব্বনাশ! সাহেব প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িলেন। এক নিশ্বাসে কতখানি পথ অতিক্রম করিয়া বাংলার প্রায় নিকটে আসিয়া পড়িলেন। আর একটু পথ—কিন্তু এঁকি! দুইখানা শক্ত হাত, তাঁহার হাত দুখানা শুদ্ধ কোমরটা এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যে তাঁহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না।

"কোন হ্যায়, শুয়ারকি বাচ্ছা?" সাহেব পকেটে পিস্তল অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নড়িবার সামর্থ্য কোথায়? বাংলার জানালার ফাঁক দিয়া অগ্নিশিখা তখন বেশ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। সাহেবের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। দুই একবার চেষ্টা করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হামি তুমকো সব দেগা, কোন হ্যায়, ছোড় দেও। কোঠিমে হামারা বেটী হ্যায়।—"

এইবার কর্কশ কণ্ঠে উত্তর হইল, "হাঃ হাঃ আমারও এক বেটী ছিল সাহেব, এতক্ষণ বোধ হয় আর সে নেই। অনেক দূর চলে গেল।"

"ওহো! যাতা হ্যায়, দেও জলদি ছোড় দেও। হাম্ তুমকো বহুৎ রূপিয়া দেঙ্গে।" সাহেব প্রচণ্ডবেগে আস্ফালন করিয়া উঠিলেন।

বিকট হাস্যের সহিত আবার উত্তর হইল, "তা হয় না সাহেব, তা হয় না। ঠিক ঐ রকম—বোধ করি ওর চাইতেও বেশী জোরে এই বুকখানার ভিতরটা জলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। সাহেব, উঃ সাহেব! রক্ত— ফুটন্ত কাঁচা চাপ রক্ত! দুহাতে চেপে ধরেছি, রাখতে পারি নি। আঙ্গুলের ফাঁক ফিনকি দিয়ে ছুটে এসে মুখে লেগেছে। উঃ সাহেব, কি তোমার করেছিল সে?"

"উঃ বাপ, হামারা সব যাতা হ্যায়, কোন হ্যায় তুম?"

"এখন চিন্‌তে পারবে না সাহেব। আর একট আর একটু যাক্। সাহেব, ধর্ম্মাবতার! এত কঠিন প্রাণ তোমাদের? উঃ সেই নরম দেহটাকে পায়ে করে ছুড়ে দিতে প্রাণে কি একটুও বাজলো না? ছোট লোক— ইতরলোক—ইতরের জান কি জান নয়? ধর্ম্ম অবতার, তোমারও যে মেয়ে আছে এটা তখন যদি একটীবার ভাবতে, একটিবার বুঝতে—পরের প্রাণটা যদি নিজের ভেতর দিয়ে দেখতে তা হলে আজ—থাক্, হা হা কেমন জলছে দেখেছ?"

আগুন তখন প্রায় অর্দ্ধেক বাংলা খানিকে গ্রাস করিয়াছে। এমন সময় ভিতর হইতে শিশু কণ্ঠের করুণ চীৎকার শোনা গেল। "ঐ ঐ এখনও আছে।" সেই দারুণ শীতেও সাহেবের শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহ ছুটিল। চার্লস এবার শেষ বার নিজকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস, সে বন্ধন বজ্র অপেক্ষাও কঠিন। চারিদিক স্তব্ধ। সেই সময় একটা পৈশাচিক হাস্য সাহেবের কাণে পৌঁছিল। বিপন্ন ব্যক্তির করুণ আর্ত্তনাদও বুঝি সে হাস্য অপেক্ষা শতগুণ আরামপ্রদ। তাহার পর সব নিস্তব্ধ।

হলধরের শিথিল হস্ত হইতে সাহেব যখন মুক্ত হইলেন, অর্দ্ধদগ্ধ গৃহখানির উপর অগ্নিশিখা তখনও অল্প দেখা যাইতেছিল; হলধরের বুকের আগুন কিন্তু নিবিয়া গিয়াছিল তাহার অনেক পূর্ব্বে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা।

বেলা ২টার সময় ছুটী হইয়া গেলে আমরা মেসকোট হইতে ব্যারাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। ইহার কিছু সময় পরই হাবিলদারদের বক্তৃতা ব্যারাক রুমের ভিতরই আরম্ভ হইত। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

বেলা ৪টা পর্য্যন্ত আমাদের ছুটী ছিল, এ সময় কেহ পুস্তক পাঠে, কেহ ইউনিফরম পরিস্কারে, কেহ খোস গল্পে সময় অতিবাহিত করিতেন। অনেকের আত্মীয় স্বজন এই সময় দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাহার পর ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পুনরায় ড্রিল শিক্ষা হইত। স্কোয়াড ড্রিল, কোম্পানি ড্রিল প্রভৃতি সম্পূর্ণ হইয়া যাইবার পর সন্ধ্যাকালীন ড্রিলের সময় কেবলমাত্র ষ্ট্রেচর ড্রিল শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ও এখন যে ড্রিলের কথা বলিলাম, ইহা সপ্তাহের প্রতিদিনই হইত, কেবলমাত্র ভারতীয় ফৌজী আইন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ও রবিবার আমাদের সম্পূর্ণ ছুটী ছিল।

কোন কোনও দিন বৈকালের ড্রিল শেষ হইবার পূর্ব্বেই কর্ণেলের আদেশ শুনান হইত যে সন্ধ্যার পর সার্চ্চ লাইট সহযোগে Night Manœvures শিক্ষা

কলিকাতা গঙ্গাবক্ষে "বাঙ্গালী" হাঁসপাতাল জাহাজ
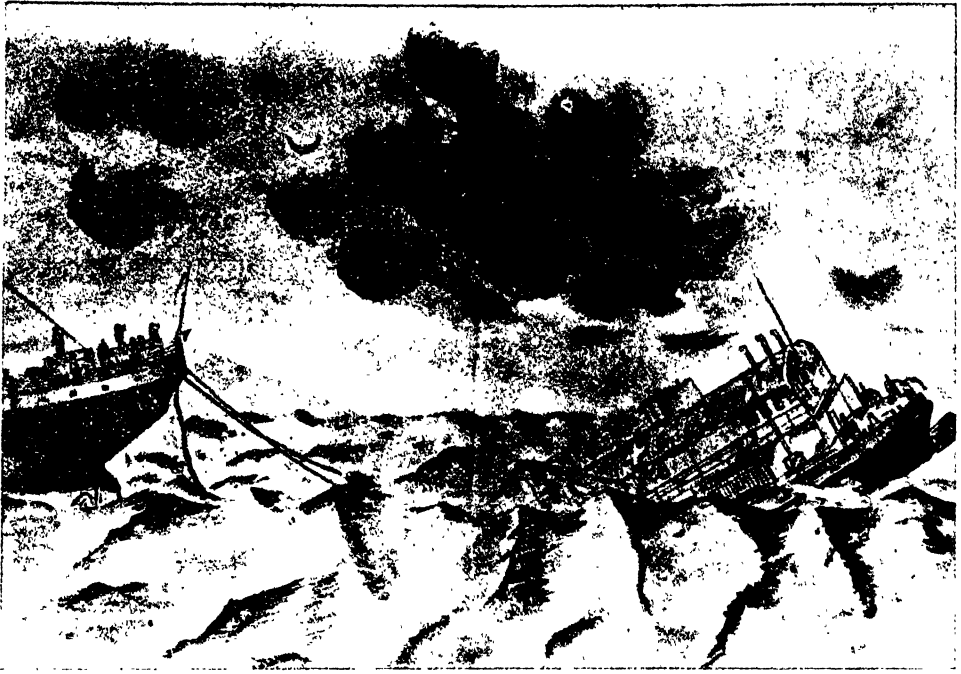
মান্দ্রাজ উপকূলে "বাঙ্গালী" জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে (১৭—৫—১৭)

দেওয়া হইবে। ইহার ভার কাপ্তেন তারাপুর লইয়াছিলেন, সার্চ্চ লাইটএর কায কাপ্তেন সাহেবের মোটরের লণ্ঠনসহযোগে হইত। অন্ধকার মাঠে ইতস্তত কয়েকজনকে বুকে ট্যালি মার্ক বাঁধিয়া শোয়াইয়া রাখা হইত, এক একটী ষ্ট্রেচারপার্টি তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইত। প্রথমে মাত্র একজন যাইত, তাহার দৃষ্টিতে কোন আহত পতিত হইলে তাহার বাঁশীর সঙ্কেত শুনিয়া অন্য সকলে ষ্ট্রেচার লইয়া উপস্থিত হইত। ইহার মধ্যে মধ্যে শত্রুশিবির হইতে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সার্চ্চ লাইটের আলোক ফেলা হইত এবং তৎক্ষণাৎ গুলির পথ এড়াইবার জন্য আমাদিগকে মাটীতে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িতে হইত।

বৈকালের ড্রিল হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ ইনফ্যান্ট্রি-লাইনস্এ উপস্থিত হইতেন। আফিসে ঘণ্টা দুই থাকিয়া আমাদের ব্যারাক দেখিতে আসিতেন। তাঁহার আগমন প্রায় প্রাত্যহিক ছিল। কোন কোনও দিন বৈকালিক ড্রিলের পূর্ব্বেই আসিতেন। প্রতিদিন ব্যারাকে আসিয়া উপস্থিত সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। আহার, পাকশালা প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক সমাচার অবগত হইতে তাঁহার আগ্রহের একদিনও লাঘব হইত না। ইহা ব্যতীত প্রতি সন্ধ্যায়ই তাঁহার আহ্বানে রাজপুত শিক্ষকেরা প্যারেডের ময়দানে আমাদের সমবেত করাইত। এ সময় ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন—"তোমরা সামান্য সিপাহী নও, গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে যাইতেছ—তোমরা 'যোগী সোলজার্স'। তোমাদের কার্য্যাবলীর উপর—তোমাদের দেশের সুনাম নির্ভর করে।" প্রভৃতি কথা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে সুললিত ভাষায় যখন আমাদিগকে বলিতেন, তখন আমাদের হৃদয়ে অবর্ণনীয় উৎসাহের সঞ্চার হইত। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের ন্যায় যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাহা যে সফল হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেই পারে না। আমার এখনও স্মরণ আছে, প্রথম যেদিন তাঁহার নিকট ভর্ত্তি হইবার জন্য উপস্থিত হই, সেদিন হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলেন; কথায় কথায়

তাঁহার চেষ্টার সফলতা জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিলে ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ যে ভাবে বলিলেন যে "কার্য্য সফল হওয়াতে আমি নিজেকে ১০ইঞ্চি বেশী দীর্ঘ মনে করিতেছি, তাহা আমি কখনও ভুলিব না।

প্রতিদিনই বক্তৃতা অন্তে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তিন-বার সম্রাটের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেন। প্রকৃত রাজ-ভক্ত না হইলে কেহ প্রকৃত সৈনিক হইতে পারে না, এই ভাবটী আমাদের মনে জাগরূক করিবার চেষ্টা করি-তেন।

সন্ধ্যা ৬টার পর হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমাদের ছুটী ছিল। তখন ব্যারাকে যে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতে পারিত। ব্যারাক পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইতে হইলে নন-কমিসাণ্ড অফিসারের অনুমতি লইয়া যাইতে হইত। কিছুদিন পর এই অনুমতির প্রয়োজন হইত না। খাকী পরিহিত ব্যক্তিদিগের বায়স্কোপ দেখিতে অর্দ্ধেক মূল্যের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া অনেকেই এই সময় বায়স্কোপ দেখিতে যাইত। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী আমাদের জন্য ফুটবল, ওয়াটার পোলো, ডাম্বেল প্রভৃতি ক্রীড়ার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। সেই জন্য অধিকাংশ যুবক ছুটীর পর ক্রীড়া ব্যায়াম প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। এই সময় একটী শিখ কোম্পানী বর্ম্মা হইতে আমাদের সেনা-নিবাসে উপস্থিত হয়, এবং আমাদের নিকট ফুটবলে পরাজিত হইয়া কলহের সূচনা করে। ইহার পর কর্ণে-লের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন সৈন্যদলের সহিত আমা-দের ফুটবল খেলা বন্ধ হইয়া যায়।

রাত্রি ৯॥টার সময় 'রোল কল' হইত। আহা-রাদি তাহার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইত। রাত্রি ১০টার পর আলো নিবাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে হইত এবং রাত্রের পাহারা আরম্ভ হইত। কোনও অফিসার উপস্থিত হইয়া প্রতি রাত্রেই রোল কল সমাধা করাইতেন এবং অর্ডারলি অফিসার দেখিয়া যাইতেন যে আলো নিভানো হইয়াছে কি না। মধ্যে মধ্যে কোনও রাত্রে কার্ণেল কিংবা অন্য অন্য কোন অফিসার রাউণ্ডে বাহির হইয়া দেখিতেন পাহারায় কায ঠিক ভাবে চলিতেছে কি না।

বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কতিপয় অফিসর ; পশ্চাতে কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক দেশনেতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেঙ্গলী হসপিট্যাল ফ্ল্যাট।

আমাদের আলিপুর সেনানিবাসে মাস দুই অবস্থানের পর আমাদের অবগত করান হয় যে আমাদের দ্বারা অ্যাম্বুলেন্সের কায করান হইবে না—আমাদের একটী নৌ হাঁসপাতালে কার্য্য করিতে হইবে।

তখন খিদিরপুর ডকে 'বেঙ্গলী' হসপিট্যাল ফ্ল্যাট তৈয়ারী হইতেছে এবং আমাদের রেজিমেণ্টের ব্যাজ এই সময় B H T বা বেঙ্গল হস্পিট্যাল ট্রান্সপোর্ট নামে পরিণত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দ্বারা ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্সের কার্য্য না করাইয়া ক্লিয়ারিং হস্পিট্যালের কার্য্য করানো। এই স্থানে ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্স ও ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমুদয় যোদ্ধা, যুদ্ধের উপকরণ এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দল যায়, শাসন কার্য্য সুশৃঙ্খলার জন্য তাহারা এক একটি নির্দ্দিষ্ট দলে বিভক্ত হয়। এ সম্বন্ধে এক একটী রেজিমেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক দল বা ইউনিট বলিয়া গণিত হইতে পারে, এইরূপ তিনটী রেজিমেণ্ট লইয়া এক একটী ব্রিগেড। এক একটী ব্রিগেডের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য একদল গোলন্দাজ, একদল অশ্বারোহী, একদল রসদ প্রদানকারী, একদল ইঞ্জিনিয়ার ও একদল অ্যাম্বুলেন্স থাকে। এইরূপ তিনটী ব্রিগেডে বা চারিটী ব্রিগেডে একটী ডিভিসন গঠিত হয় এবং তাহার জন্য একটী করিয়া স্বতন্ত্র ডিভিসন্যাল তোপখানা, ডিভিসন্যাল সৈন্যদল প্রভৃতি থাকে এবং ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল ও ষ্টেশনারি হস্পিট্যাল প্রভৃতিও এক একটী ডিভিসনের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত বাহিনীর, ডিভিসন, আর্ম্মি কোর প্রভৃতির প্রয়োজন অনুসারে একাধিক 'বেস হস্পিট্যাল' স্থাপিত হইয়া থাকে।

আমাদের দলগঠনের সময়ে মনে করা হইয়াছিল যে আমাদের দ্বারা ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্সের কাষ করান হইব।

হাওড়া, ট্রেণে আমাদের আরোহণ দৃশ্য

হাওড়া ষ্টেশন। আর এক দৃশ্য

অর্থাৎ আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, যে সময় ব্রিগেডের যোদ্ধারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিবে, তখন আমরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আহতদের সংগ্রহ করিয়া ক্লিয়ারিং হস্পিট্যালে পাঠাইয়া-দিব। ক্লিয়ারিং হস্পিট্যালের কার্য্য হইতেছে ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্স যে সমুদয় আহত লইয়া আসে তাহাদের চিকিৎসার জন্য সফরের রাস্তার (Line of Communication) ধারে ষ্টেশনারি হস্পিটালগুলিতে পৌছাইয়া দেওয়া। ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্স সাধারণতঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ১ মাইল অথবা ১॥ মাইল দূরে অবস্থান করে, এবং মধ্যে মধ্যে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রবেশ করে। ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রায়ই তিন হইতে পাঁচমাইল দূরে অবস্থান করে এবং প্রকৃত যুদ্ধ দেখা তাহাদের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। এইজন্য যখন আমরা শুনিলাম যে আমাদের দ্বারা হস্পিটাল ট্রান্সপোর্ট বা ক্লিয়ারিং হস্পিট্যাল গঠিত হইবে, তখন আমরা দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট যাইয়া একার্য্যে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমাদের আপত্তির কারণ ছিল যে, কেবলমাত্র আহতের সেবা আমরা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি যে কোনস্থানের সামরিক হাঁসপাতালে যোগ দিলেই করিতে পারি; যুদ্ধ দেখিতে পাইব না অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব তাহাতে বিশেষ গৌরবের বিষয় নাই। যুদ্ধঘোষণার পর হইতেই আমরা অস্ত্র ধারণের জন্য লালায়িত ছিলাম। যখন তাহা হইল না, তখন মাতুলহীনতা অপেক্ষা একচক্ষু মাতুল থাকা ভাল বিবেচনা করিয়া আগ্রহের সহিত অ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগ দিয়াছিলাম। এখন যখন তাহারও কোনও সম্ভাবনা থাকিল না, তখন আমরা বিদেশে যাইতে ইচ্ছুক নই। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমাদের আবেদন কর্ত্তৃপক্ষীয়দের জানাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। বোধ হয় ভগবান আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন, এবং একটি দুঃখজনক ঘটনার পর আমাদের দ্বারা ফীল্ড অ্যাম্বুলেন্স গঠিত হওয়াই সাব্যস্ত হইয়াছিল। সে ঘটনাটীর এখানে উল্লেখ করিতেছি।
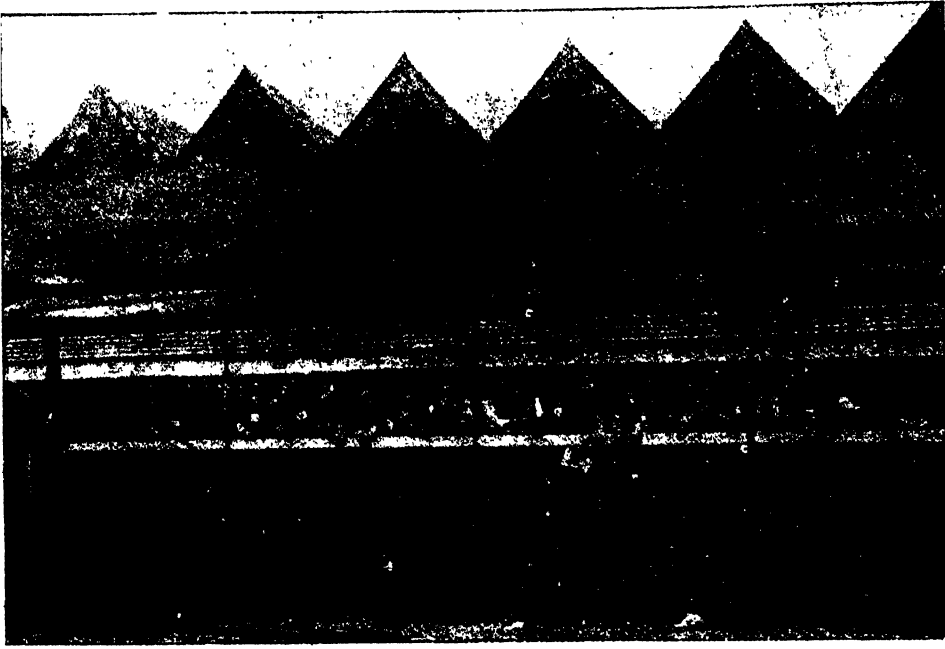
"বন্দেমাতরম্" ধ্বনির ভিতর বোম্বে মেল হাওড়া ছাড়িল ।"

জুনমাসে বেঙ্গলী হস্পিটাল জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া যায়। একদিন দ্বিপ্রহরে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাহার নামকরণ অনুষ্ঠানের কার্য্য সমাধান করেন। সেদিন বেলা ৯টা হইতে আমাদের সাজগোজ করিবার ধুম পড়িয়া যায় এবং বেলা ১টার সময় সদলে আমরা সুসজ্জিত হইয়া কেল্লার সন্নিহিত ঘাটে উপস্থিত হই। আমাদের উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই কেল্লা হইতে ১৬ সংখ্যক রাজপুত রেজিমেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ষ্ট্র্যাণ্ড রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। আমরা লাটসাহেবের অভ্যর্থনার জন্য ঘাটের ফটকের পশ্চিমে দণ্ডায়মান হই। সেই অনুষ্ঠানে কলিকাতার উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। অনেকগুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালী মহিলাও আগমন করিয়াছিলেন। বেলা ৪টার সময় লাটসাহেব গাড়ী করিয়া শরীর রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া ঘাটে আগমন করিলেন। রাজপুত সৈন্যেরা বন্দুক নামাইয়া তাঁহার সম্মান করিল। আমরাও সকলে একসঙ্গে পদদ্বয় একত্র করিয়া দাঁড়াইলাম। প্রখর রৌদ্রে ৪ঘণ্টা এক অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকা বড় সোজা কথা নয়। লাটসাহেবের আগমনের কিছু পরেই তুইজন রাজপুত সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া আমাদের সম্মুখেই পড়িয়া গেল। আমাদেরও প্রথম অভ্যাসের দরুণ শরীরের প্রতি গ্রন্থিতে বেদনা অনুভূত হইতেছিল। একজন ইংরাজ মহিলা হাঁসপাতাল জাহাজের গলুইতে একটী বোতল আছড়াইয়া ভাঙ্গিলেন। লাট সাহেবের হস্তস্থিত রজ্জুর টানে জাহাজের নামের আবরণ খসিয়া পড়িল। "বাঙ্গালী" নাম দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র মাস্তলের উপর ইউনিয়ন জ্যাক তুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপুত সিপাহীরা ও আমরা পুনরায় সামরিক প্রথামত পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। রাজপুতদের বাজনার সলাম থামিয়া গেলে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকলে হস্পিট্যাল ফ্লাট দেখিতে গমন করিলেন। কেহ কেহ আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে আসিলেন, কিন্তু প্যারেড বলিয়া ওস্তাদ বাঘ সিং পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজনকে আমাদের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিল। বেঙ্গলী হাঁসপাতাল বোটের নাম-

করণের সমারোহ প্রায় তিনদিন যাবত ছিল। বহু বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক তাঁহাদের পরিবার লইয়া বোট দেখিতে আসিতেন। আমাদের সে কয়দিন কায ছিল তাঁহাদের প্রতি জিনিষটী বুঝাইয়া দেওয়া। ডিনেমোতে কি কায করা হইবে, বরফের কল কি রকম করিয়া ব্যবহার করা হয়, এক্সরে'র তাৎপর্য্য কি, প্রভৃতি বিষয় সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইত। অনেক ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের উৎসাহ দিতেন। আমাদের এইরূপ উৎসাহের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। বহুবৎসর পরে বাঙ্গালাদেশ হইতে আমরা প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি। কিন্তু যে তিনমাস আলিপুর ব্যারাকে ছিলাম, একমাত্র ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও মিষ্টার গোর্লে ব্যতীত কেহই একদিনের জন্য আমাদের উৎসাহ দিতে আসেন নাই। লোকমান্য ও দেশপূজ্য ব্যক্তিগণ আমাদের উৎসাহ দিতে আসিলে আমরা যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতাম তাহা বলা বাহুল্য। ভাবপ্রবণ বাংলাদেশের নেতাদের মনে এই ভাবটীর কেন উদয় হয় নাই তাহা বলিতে পারি না।

নামকরণ হইয়া যাইবার পর বাঙ্গালী হাঁসপাতাল বোটটী ডায়মণ্ডহারবারে লইয়া যাওয়া হয়। বোটে চট্টগ্রামের ১৩জন খালাসী, একজন ইউরোপীয় গানার বা জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধারক ছিল। ডায়মণ্ডহারবার হইতে একখানি R. I. M. S,এর বৃহৎ জাহাজ সেটীকে টানিয়া লইয়া, মেসোপটেমিয়া অভিমুখে রওনা হয়। ৩।৪ দিন পরেই আমরা টেলিগ্রাফে খবর পাইলাম যে, বোটখানি ঢেউয়ের ধক্কা সামালাইতে না পারিয়া মান্দ্রাজের উপকূলের নিকট জলমগ্ন হইয়াছে। বোটের খালাসীরা ঝড় উঠিলেই বড় জাহাজখানিতে আরোহণ করিয়াছিল। একসপ্তাহ পরে সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। এই সংবাদ কলিকাতায় প্রচার হইবা মাত্র সকলে জাহাজ জলমগ্ন হওয়া সম্বন্ধে নানারূপ কাল্পনিক কারণ প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ট্রামে অথবা রাস্তায় কোন লোকের সহিত দেখা হইলে প্রায়ই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হইত যে, কয়টি গোলার আঘাতে বোটটি জলমগ্ন হয়, আমাদের কয়জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ইত্যাদি। কলিকাতাবাসীর মনে হইয়াছিল যে মৃত এমডেন বুঝি জার্ম্মান যাদুকরের কৃপায় সমুদ্র-গর্ভ হইতে পুনরুত্থান করিয়া বাঙ্গালীবোট গ্রাস করিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত ও পদস্থ লোক, দেখা ও আলাপ হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী হাঁসপাতাল বোটের সহিত কয়জন জলমগ্ন হইয়াছিল? যখন বলি যে আমাদের দলের কেহই বোটে ছিল না, তখন অনেকেই অবিশ্বাসের হাসি হাসেন। কেহ কেহ বোধ হয় মনে করেন, লোকটা আদপেই দলে ছিল না।

যাহা হউক, বোট জলমগ্ন হইবার পর সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম যে, বুঝি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকেও কয়েকদিন যাবৎ বিমর্ষ দেখাইতে লাগিল। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিলেন—"যদিও, 'বাঙ্গালী' বোট জলমগ্ন হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী এখনও ভাসিয়া আছে।"—(Though the "Bengalee" is down the Bengalis are still afloat.) তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ও কর্ণেল নট উভয়েই সিমলা গমন করিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমরা শুনিলাম যে, আমাদের অভিলষিত অ্যাম্বুলেন্স কোরই আমাদের দ্বারা গঠিত হইবে, এবং আমাদের একটী ষ্টেশনারি হাঁসপাতাল মেসোপটেমিয়ায় স্থাপিত হইবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ময়দানে আমাদের আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন যে আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন আমাদের আত্মপরিচয় সমস্ত জগদ্বাসীকে দিতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ ফিরিয়া যাইতে চাও? সকলে একতানে বলিয়া উঠিল না, না। তাহার পর ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া ও সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া আমরা ব্যারাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর সেই জলন্ত দেশভক্তি-সূচক কথাভঙ্গি এখনও যেন কাণে শুনিতেছি। বক্তৃতা-

ব্যবসায়ী নেতার ও এই প্রকৃত দেশভক্তের প্রাণোন্মাদকারী বক্তৃতায় অনেক প্রভেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উদ্যোগপর্ব্ব।

কর্ণেল নট সিমলা হইতে আমাদের দল সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসূচক পেটেণ্ট পাঞ্জা লইয়া আসিলেন। তাহাতে বাঙ্গালী চারিজন ডাক্তারের প্রতি সম্রাটের কমিশন ও চারিজন সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনের জন্য ভারতীয় কমিশন প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে তাঁহাদের পদমর্য্যাদাসূচক তারাচিহ্ন স্কন্ধে পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনজন হাবিলদার, তিনজন নায়েক ও চারিজন লান্স নায়েক নিযুক্ত হইল। এবং দলের অন্যান্য সকলকে ফার্ষ্টক্লাস প্রাইভেট ও সেকেণ্ড-ক্লাস প্রাইভেটের পদ দেওয়া হইল। অ্যাম্বুলেন্সের কার্য্যকারী অন্য ভারতীয় দলগুলিকে নন-কম্বাটাণ্ট ডুলি বেহারার পদ দেওয়া হয়, কিন্তু বাঙ্গালী যুবকদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের কম্বাটাণ্ট পদবী দেওয়া হয় এবং সিপাহীর অন্যান্য অধিকার ও সম্মানের অধিকার এই পেটেণ্টের বলে বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরের প্রাপ্য হয়।

এই ঘটনার পর প্রায় একমাস যাবত আমাদের প্যারেড বন্ধ থাকিল। প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমরা আমাদের আবশ্যক জিনিষ পত্র বাক্সবন্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। বৃহৎ বৃহৎ বাক্সগুলিতে ডাক্তারখানার সরঞ্জাম, আমাদের ইউনিফর্ম্ম, রোগীপরিচর্য্যার জিনিষগুলি বন্ধ করা হইল। অসংখ্য মেডিক্যাল প্যানিয়ার ও খাজাঞ্চির আফিসগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল।

এই সময় প্রায় একশতজন 'ক্যাম্প ফলোয়ার' ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে পাচক, ধোবা, নাপিত, মিস্ত্রি, মেথর প্রভৃতি থাকিল।

২১শে জুন তারিখে প্রাতঃকালে সেরিমোনিয়াল প্যারেড হইয়া গেল। দলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং কর্ণেল নট ও আমরা সকলে সে প্রার্থনাতে যোগ দিলাম। সেদিন সকলেরই আত্মীয়স্বজন আসিয়া তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পরম পূজনীয় ৺স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে একটী কবিতায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। কবিতাটী তাঁহার স্বরচিত।

বেলা ১২টার সময় ঢাকা হইতে দুইজন মহারাষ্ট্র হাবিলদার আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করিল। ইহারা Pack store Havildarএর কার্য্য করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে যাইতে আদিষ্ট হইয়াছে। হাবিলদার বাঘ সিং ও আর একজন রাজপুত হাবিলদারও এই কার্য্যের জন্য আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইল।

ইহার পূর্ব্বের দিন আমাদের সমুদায় ভারী লগেজ ও হাঁসপাতালের বাক্সগুলি বোম্বাই রওনা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের ভার লইবার জন্য লেফটেনাণ্ট চ্যাটার্জ্জি ও নায়েক সৌরীন্দ্রকুমার মিত্র তাহাদের সঙ্গে গিয়াছেন।

আমরা অতি প্রাতেই আমাদের সমুদয় জিনিষপত্র, ট্রান্সপোর্ট কোরের বলদের গাড়ীতে করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই সকলে বাঙ্গলা দেশে শেষ দিনের মত আহার করিয়া লইলাম। বেলা তিনটার সময় পূর্ব্ব আদেশ মত সফরের পুরা পোষাকে ময়দানে উপস্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী ট্রাম লাইনের ধারে পৌঁছিলাম। সমবেত সেনানিবাসের সৈনিকেরা ও রাস্তার পাশের হিন্দুস্থানী দোকানদারেরা "কালী মায়িকী জয়" বলিয়া আমাদের যাত্রা করাইয়া দিল।

৩টা ০ মিনিটে তিনখানা রিজার্ভ ট্রাম আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা সেগুলিতে আরোহণ করিয়া হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করিলাম। টালিগঞ্জের পুল পার হইবার পর ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর মোটর আমাদের

সহিত যোগদান করিল। আমরা তথন প্রাণ খুলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "আমার জন্মভূমি" গান গাহিতেছিলাম। সেদিন যেন আমাদের নিকট ময়দানের গাছগুলি ও তৃণরাজি অধিক সবুজ ও কোমল বোধ হইতেছিল, আকাশের নীলিমা যেন সেই প্রথম উপলব্ধি করিলাম। "আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি" গাহিবার সময় আমাদের কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মোটরে বসিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছিলেন। এসপ্লানেড পার হইয়া হাওড়া অভিমুখে ট্রাম ছুটিল। বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের ন্যায় আমাদের অভিনন্দনের পালা ছিল না। রাস্তায় সকলে সিপাহীর পরিচ্ছদধারী এতগুলি লোককে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তুলিতে শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রাহিল।

খাকীর সহিত বন্দেমাতরমের সম্বন্ধ সেই প্রথম স্থাপিত হইল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম ষ্টেশনে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। একটি সংকীর্ত্তনের দল "আমার দেশ" গাহিতেছিল। আমাদের কিট ব্যাগ বা জিনিষপত্রের থলিগুলি ব্রেকে উঠাইয়া দিয়া, আমাদের জন্য যে তিনখানি সম্পূর্ণ গাড়ী রিজার্ভ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলাম। কর্ণেল নট মাল্যবিভূষিত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পিতা, ভ্রাতা আত্মীয়স্বজনের আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা লইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনির ভিতর বোম্বে মেল বেঙ্গল নাগপুর লাইন দিয়া ছুটিয়া চলিল।

সারাপথে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর আয়োজনমত প্রচুর মিষ্টান্ন আমাদের কামরায় উঠিতে লাগিল। চন্দননগরের বোস মহাশয় বহুসংখ্যক টিনের কৌটায় করিয়া মিষ্টান্ন উপহার দিলেন। বোম্বে পৌছিবার পূর্ব্বেই আমাদের অরুচি উপস্থিত হইল। সম্বলপুর ষ্টেশনে স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসুও আমাদের জন্য বহু মিষ্টান্ন গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বেই একটী দুর্ঘটনা ঘটে। হঠাৎ ট্রেণ বন্ধ হইয়া গেল। আমরা নামিয়া দেখি যে, একটী দরিদ্র বৃদ্ধার পদদ্বয়ের উপর দিয়া ইঞ্জিন চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে আমাদের সঙ্গের ডাক্তারেরা শুশ্রূষা করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

পরদিন সমস্ত বেলা ধরিয়া বোম্বে মেল মধ্য ভারতের কৃষ্ণবর্ণ ভূপৃষ্ঠ দিয়া চলিতে লাগিল। প্রতি ষ্টেশনেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা আসিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বন্দে বস্ত মত আহার যোগাইতে লাগিলেন।

১লা জুলাই ভোর বেলায় বোম্বে নগরে পৌছিলাম। সমুদ্রের বন্যার জন্য নগরের চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। আমাদের ট্রেণখানি যেন একটা হ্রদের উপর দিয়া চলিতেছে বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী সুবৃৎ ভিক্টোরিয়া টার্ম্মিনাস ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সামরিক বিভাগ হইতে আনীত মোটর লরি বোঝাই হইয়া আমরা জাহাজে উঠিবার জন্য আলেক্‌জান্দ্রা ডকে উপস্থিত হইলাম। অফিসারেরা তাজমহল হোটেলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বোম্বাই সহরে

১লা জুলাই তারিখ (১৯১৫) আমরা বোম্বাই পৌছাইলাম। মোটর লরি সহরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। সহরটি কলিকাতা অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। প্রায় আধ ঘণ্টার ভিতর আলেক্‌জান্দ্রা ডকে উপস্থিত হইলাম। এই ডকটী তথন সম্পূর্ণভাবে সামরিক বিভাগের কার্য্যের জন্য লওয়া হইয়াছিল। তখনও মেরিন লাইন্‌স প্রস্তুত হয় নাই, ভারতবর্ষ হইতে যে সিপাহীরা বিদেশে অভিযান করিত তাহারা ডকেই দুই একদিন থাকিয়া পরে জাহাজে আরোহণ করিত। আমাদের জন্য গুদাম ঘরের একটি প্রকাণ্ড দোতলা কামরা ছাড়িয়া দেওয়া হইলে। সেটীকে একটী ছোট খাট পাড়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাঠের মেঝের উপর আমরা নিজেদের কম্বল বিছাইয়া প্রত্যেকের স্থান ঠিক করিয়া লইলাম। আমাদেরই এক পার্শ্বে ক্যাম্প ফলোয়ারের দল আড্ডা স্থাপন করিল এবং অন্য পার্শ্বে আমাদের জমাদারেরা ও ভারতীয়

ফৌজের প্রেরিত ডাক্তার সুবেদার করমচাঁদ আড্ডা গাড়িলেন।

ইহার কিছু পরই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং এই বৃষ্টি আমরা যে কয়দিন বোম্বাইয়ে ছিলাম সে কয়দিন অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছিল। প্রায় ৯ ঘটিকার সময় মোটরে করিয়া কর্ণেল নট ও অফিসারেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে ভারি লগেজগুলি আসিয়া পৌছিয়াছিল সেগুলি তখন বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল। আমরা সকলে মিলিয়া সেগুলি গুদামের নীচে সরাইয়া রাখিলাম, বোম্বাই না পৌছান পর্য্যন্ত মোট বহা প্রভৃতি কায আমরা কুলি দিয়া করাইয়াছিলাম; কিন্তু বোম্বে হইতে সৈনিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ফেটিগ ডিউটি অথবা মুটের কার্য্য আমাদের আরম্ভ হইল। আমাদের মোটগুলি আলিপুর হইতে হাওড়া পৌছাইতে কেবলমাত্র কুলির মাজুরীস্বরূপ প্রায় দুইশত টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই মোটের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। পরিচ্ছন্নতা পায়খানা, অর্ডারলি আফিসার, অর্ডারলি এন-সি-ও প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া কর্ণেল নট চলিয়া গেলেন। কমিসারিয়েটের লোকেরা আমাদের দৈনিক খোরাক ডাল, আটা, ঘি ও লকড়ি লইবার জন্য আহবান করিল। সে বৃষ্টিতে কোথায় চুলা প্রস্তুত করিয়া ডাল রুটি পাকান হইবে সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে আমাদের জন্য গোয়ানিজ কন্ট্রাক্টার আসিয়া ভাত ও মাংসের কারি উপস্থিত করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। এবং আমাদের ভাগের ডাল, আটা ও ঘি পাইয়া ক্যাম্পফলোয়ারেরাও মহা সন্তুষ্ট হইল।

সেদিন বৈকালে অনুমতি লইয়া এক একটী দল সহর দেখিতে বাহির হইয়া গেল। ডকের ফটক পার হইয়া যেই বাহিরে আসিয়াছি, অমনি একদল ছোকরা তসবির বিক্রয় করিতে আসিল। কলিকাতায় প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কুৎসিৎ ছবি বিক্রয় করা সম্ভবপর নয়। আমরা বাহিরে আসিয়া ভিক্টোরিয়া নামক ছোট ফিটনে করিয়া সেখানকার মিউনিসিপাল মার্কেটে উপস্থিত হইলাম। আয়তনে কলিকাতার মার্কেট অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া বোধ হইল। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা ধূমপান নিষেধ। বোম্বাইতে এ বিষয়ে কড়া আইন। মার্কেট হইতে বাহির হইয়া ট্রামে উঠিয়াছি এবং নবক্রীত সিগারেট সংবমাত্র ধূম উদ্গীরণ করিয়াছে এমন সময় কণ্ডাক্টার আসিয়া ট্রামের গায় দেখাইল "ধূমপান নিষেধ" লেখা আছে। সিগারেট ফেলিয়া দিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পাশে তাকাইয়া দেখি যে একজন অষ্ট্রেলিয়ান রেড ক্রসের লোক হাসিতেছে। বুঝিতে পারিলাম লোকটি ভুক্তভোগী। ট্রামে মাত্র একখানি করিয়া গাড়ী বলিয়া মনে হইতেছে, টিকিটের ট্রানফার শ্লিপ নাই। যে তিনদিন বোম্বাইয়ে ছিলাম তাহার মধ্যে এই সহরের ট্রামের টিকিটের বন্দোবস্ত বুঝিতে পারি নাই।

ট্রামে পাটল নামক কলকারখানার অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম। এ যায়গাটি কলিকাতার মিল অঞ্চল অপেক্ষা অনেক অপরিস্কার বোধ হইল। পথে একটী দৃশ্য প্রায়ই দেখিতে লাগিলাম যে, সন্ধ্যা সমাগমে নৈবেদ্যের থালা হাতে করিয়া দলে দলে সুপরিচ্ছদধারিণী ভাটিয়া ও মহারাষ্ট্র মহিলাগণ মন্দিরে যাইতেছেন। এখানকার লোকেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বেশ ভদ্র বলিয়া বোধ হইল। সকলে স্ত্রীলোকদিগকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে এবং আমাদের দেশের ন্যায় একটী লোকও হাঁ করিয়া তাকাইয়া নাই। আমাদের দলের দিকে কয়েকটী ভদ্রলোক তাকাইয়া ছিলেন। আমরা মহিলাদিগকে সম্ভ্রমের সহিত রাস্তা ছাড়িয়া দিলাম দেখিয়া তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। আমরা কলিকাতাবাসী এবং সংবাদপত্রে দৃষ্ট বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্সের লোক শুনিয়া অনেকেই আলাপ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। অদ্ভুত পরিচ্ছদধারী একজন পুলিশ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল যে বাঙ্গালীরা বোম্বা ছাড়িয়া খাকী পরিধান করিল কেন? রাত্রি ৯টার সময় ডকের ফটক বন্ধ হইবে এবং রেলিং টপকাইতে গেলে শাস্ত্রীর গুলি খাইতে হইবে মনে করিয়া

আমরা তাহাদের ভদ্র এবং সকৌতুক আলাপ ক্ষান্ত করিয়া ডকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। একটী দলে তিন জন যুবক মোটরে করিয়া বহুদূর গিয়াছিল, তাহারা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি গার্ডরুমে কাটাইতে বাধ্য হয়। পরদিন সকালে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রাত্রে গোয়ানিজ খানা খাইয়া বম্বেতে প্রথম রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন ভোর বেলায় কয়েকজনে তাজমহল হোটেল দেখিতে গেলাম। হোটেলটী ইউরোপীয় প্রথায় চালিত তাহা বলা বাহুল্য। সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত কক্ষরাজি, বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট, লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিয়া এবং আমাদের অফিসার দিগের নিকট বিদায় লইয়া ডকে ফিরিয়া আসিলাম। সমস্ত সহরে কোথাও রাস্তায় একটী বাঙ্গালীর সহিত দেখা হইল না। শুনিলাম একদল বাঙ্গালী স্বর্ণকার ব্যতীত বোম্বাই বাজারে কোন বাঙ্গালীর দোকান নাই।

বৈকালে মোটর যোগে মালাবার হিল নামক অঞ্চলটী ঘুরিয়া আসিলাম। বোম্বাইয়ের লাট সাহেবের প্রাসাদ এই মালাবার হিলের উপর। অসংখ্য তরুরাজি বেষ্টিত গিরিশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া প্রশস্ত লাল রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। বামপার্শ্বে মৌসুমী ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ধূসর ঊর্ম্মিমালা শোভিত আরব সাগরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বেলাভূমির নিকট অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে সারি সারি বেঞ্চ রাস্তার ধারে রাখা হইয়াছে। স্থলে পাহাড় বৃক্ষ প্রভৃতি থাকায় সমুদ্রের শোভা এস্থানে পুরীর সৈকতভূমি অপেক্ষা অধিক রমণীয় বোধ হইল।

বোম্বাইয়ের 'হালুয়া শোভন' খাইয়া ও মালাবারের সমুদ্রের দৃশ্য দেখিয়া তিনদিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিনে শুনিলাম উপযুক্ত ট্রান্সপোর্টের অভাবে মান্দ্রাজ হস্পিটাল ষ্টীমারের অধ্যক্ষেরা আমাদিগকে বসরা পৌছাইয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন। ৬ই জুন ভোর বেলা হইতে আমাদের জিনিষপত্র কপিকলের সাহায্যে ষ্টীমারের খোলে নামাইয়া দিলাম। ৫টার সময় ষ্টীমারের সম্মুখে সারি বন্দী হইয়া দাঁড়াইলাম। বৈকালে ৬টার সময় পরিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া লর্ড ওয়েলিংডন আমাদের বিদায় দিতে আসিলেন। কয়েকজনের সহিত বাক্যালাপ করিয়া কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের গুর্খা টুপী দেওয়া হইয়াছে কেন? কর্ণেল সাহেব বলিলেন যে বাঙ্গলা দেশ খুব সবুজ অর্থাৎ বৃক্ষাদির জন্য সেখানে ছায়ার অভাব নাই সেই জন্য বাঙ্গালীদের কোন জাতীয় মস্তকাবরণ না থাকায় ইহাদিগকে গুর্খা টুপী দেওয়া হইয়াছে, কারণ নেপাল বাঙ্গালার প্রতিবেশী। কর্ণেল সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে গুর্খা হ্যাট বলিয়া পরিচিত টুপি গুর্খাদেরও নিজস্ব নয়, তাহা অষ্ট্রেলিয়া অথবা মেক্সিকো হইতে আমদানি।

৭ই জুন ভোর বেলায় ষ্টীমার ছাড়িল একটী খর্ব্বকায় Tug বিরাটকায় ষ্টীমারখানিকে জেটীর মধ্য হইতে টানিয়া বাহির সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। আমাদের বন্দেমাতরম ধ্বনি ও ডকের অন্যান্য দেশীয় পল্টনের উচ্চারিত বিদায় জয়ধ্বনির মধ্যে ষ্টীমার ধীরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

৭

নাগবংশ

এখন সকলেই জানেন, নাগ মানে সাপ। কিন্তু অমরকোষ বা হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণিতে সাপের প্রতিশব্দ নাগ নয়। নাগ অর্থে কাদ্রবের অর্থাৎ কদ্রুর পুত্র। কশ্যপের দুই স্ত্রী, কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর পুত্র সহস্র নগ এবং বিনতার পুত্র গরুড় ও অরুণ। কিন্তু পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জন্মেজয় যে নাগযজ্ঞ করেন.

তাহাকে সর্পসত্র বলা হইয়াছে। এবং যে নাগগণ এই নাগযজ্ঞে মারা যায়, তাহাদিগকে অনেক স্থলে সর্পের সহিত অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। এই নাগযজ্ঞের পূর্ব্বে তিনটি ঘটনা ঘটে।

প্রথমতঃ রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অবস্থায় মৌনব্রতাবলম্বী শমীক ঋষিকে পলায়িত মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া ক্রোধে এক মৃতসর্প মুনির গলদেশে স্থাপন করেন। মুনির পুত্র শৃঙ্গী এই ব্যাপার অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দেন, "পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করিবে।" শমীক পুত্রের শাপবাক্য শুনিয়া শিষ্য গৌরমুখকে দিয়া রাজাকে এই সংবাদ জানাইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ একস্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় ঔষধ, চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাখিয়া স্বয়ং তথায় সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করিলেন। তক্ষক পথিমধ্যে দেখিল বিষবিদ্যা-বিশারদ কাশ্যপ মুনি রাজাকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন। তক্ষক কাশ্যপকে বহুধন দিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তৎপরে নাগরাজ তক্ষকের আদেশে নাগগণ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ ছলে কুশ, জল ও ফল প্রদান করিল। একটি ফলের ভিতর হইতে তক্ষক বাহির হইয়া রাজা পরীক্ষিতের গ্রীবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে দংশন করিল। মন্ত্রিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিশুপুত্র জনমেজয় রাজা হইলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ—আয়োধধৌম্যের শিষ্য বেদকে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্যভূপাল উপাধ্যায় পদে বরণ করেন। এই বেদের শিষ্য উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পৌষ্যমহিষীর কর্ণের কুণ্ডল আনিতেছিলেন। পৌষ্যমহিষী বলিয়া দিয়াছিলেন, পথে তক্ষক হইতে সাবধান থাকিবে। সাবধানতা সত্ত্বেও তক্ষক কুণ্ডল লইয়া পলায়ন করিল। তখন উতঙ্ক মুনি স্তব আরম্ভ করিলেন—"ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ এবং যাহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সেই সকল সর্পদিগকে স্তব করি। যখন ধৃতরাষ্ট্র স্বর্গ গমন করেন, তৎকালে ২০৮৮০ সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া ইক্ষুমতী তীরে সতত বাস করিতেন। মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রুতসেন যিনি সর্ব্ব নাগের আধিপত্য লাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন তাঁহাকেও প্রণাম করি।" পরে উতঙ্ক নানারূপ উপায়ে তক্ষকের নিকট হইতে কুণ্ডল আদায় করিয়া উপাধ্যায়ানীকে দেন। এবং তক্ষকের ব্যবহারে চটিয়া গিয়া প্রতীকার বাসনায় রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছিল, আপনি পিতৃবৈরিকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন।"

তৃতীয় ঘটনাটি এইরূপ—কুরুক্ষেত্রে রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তৎকালে এক কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইলে জনমেজয়ের সহোদরেরা ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিল। তাহাতে তাহার মাতা দেবশুনী সরমা কহিলেন, "তোমরা নিরপরাধকে প্রহার করিয়াছ অতএব অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" যজ্ঞ সমাপনান্তে জনমেজয় সরমাশাপ নিবারণের নিমিত্ত শ্রুতশ্রবাঃ ঋষির পুত্র সোমশ্রবাঃকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। সোমশ্রবাঃর এক সর্পীর গর্ভে জন্ম হয়। শ্রুতশ্রবাঃ রাজাকে এ সংবাদ দিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে ইনি কখনও বিমুখ করিবেন না।" রাজা জনমেজয় অগত্যা এই নিয়মে স্বীকৃত হইয়া রাজধানীতে গিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "এই মহাত্মা যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে।" তৎপরে জনমেজয় তক্ষশিলায় গিয়া সেই প্রদেশ অধিকার করিলেন।

পরে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ হইলে শত শত সর্প যজ্ঞাগ্নিতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তক্ষক দেবরাজ ইন্দ্রের

শরণাপন্ন হইয়া কিছুকাল গোপনে আত্মরক্ষা করিয়াছিল কিন্তু সেও শেষে মন্ত্রের বলে যজ্ঞাগ্নিতে পড়িতে যাইতেছিল, এমন সময়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত বাসুকির ভাগিনেয় আস্তিক মুনি "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলায় তাহার জীবন কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা হইল। পরে আস্তিকমুনি জনমেজয়কে বলিয়া নাগযজ্ঞ বা সর্পসত্র বন্ধ করিয়া দিলেন। এই আস্তিকমুনি যাযাবর ব্রাহ্মণ জরৎকারুর পুত্র। তাহার মাতা বাসুকির ভগিনী জরৎকারু।

পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা জনমেজয় নাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং উতঙ্কও তক্ষকের দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতীকার বাসনায় রাজাকে নাগযজ্ঞ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু তৃতীয় ঘটনার সহিত নাগযজ্ঞ বা অন্য কোন ঘটনার সংস্রব সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে সকল ঋষি সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন তাহার মধ্যে শ্রুতশ্রবাঃর নাম আছে, তৎপুত্র সোমশ্রবাঃর নাম নাই। কিন্তু যদি নাগযজ্ঞ সাপ মারিবার জন্য যজ্ঞ না হইয়া নাগগণের সহিত যুদ্ধোপলক্ষে নাগগণের হত্যা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় ঘটনার কিছু উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

এখন প্রধান সমস্যা এই,—এই সর্পসত্র বা নাগযজ্ঞ কি বাস্তবিকই সাপ মারিবার জন্য যজ্ঞ, না নাগজাতিকে মারিবার জন্য যুদ্ধ? সর্পগণ যে মানুষের রূপ ধরিতে পারে এবং সেই রূপে পরীক্ষিতের একস্তম্ভ গৃহে আসিয়াছিল একথা শিশু ছাড়া কেহ বিশ্বাস করিবে না। নাগগণের কাজ দেখিলে এবং উতঙ্ক মুনির স্তবটা ভাল করিয়া পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, নাগেরা বাস্তবিকই মানুষ। তক্ষককে মহাত্মা বলা হইয়াছে। বাসুকির ভাগিনেয় আস্তিক বেদবেদাঙ্গপারগ পরম ধার্ম্মিক ঋষি। নাগগণের প্রধান প্রধান রাজার নাম শেষ বা অনন্ত, তক্ষক, বাসুকি, ধৃতরাষ্ট্র ও ঐরাবৎ। ইহাদের কুলজাত ও কৌরব কুলোৎপন্ন সর্পও জনমেজয়ের নাগযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উতঙ্কমুনি বলিয়াছেন যে, নাগগণ পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেন। অথচ পরে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন পোড়াইয়াছিলে এবং জনমেজয় কুরুক্ষেত্রে দীর্ঘসত্র করিতেছিলেন! একবার মধ্যম পাণ্ডব ভীমকে দুর্য্যোধন বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন খাওইয়া নিঃসংজ্ঞ করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ভীম ভাসিতে ভাসিতে নাগভবনে উপস্থিত হইলে নাগগণ ভীমের চৈতন্য সম্পাদন করেন। পন্নগরাজ বাসুকী ভীমের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অর্জ্জুন বনবাসকালে নাগকন্যা উলুপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে বৈশালীরাজ মরুত্তের সহিত নাগদের যুদ্ধ হয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্কোট নাগকে পরাজিত করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে নাগেরা প্রকৃতই মানুষ ছিলেন, অথচ তাঁহারা সাধারণ মানুষ নহেন। দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব অপ্সর বিদ্যাধর প্রভৃতির ন্যায় তাঁহারা নরযোনি অর্থাৎ সাধারণ মানুষ চাইতে একটু উচ্চশ্রেণীর জীব। রীস ডেভিড সাহেব নাগদের বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষ বলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, "ইলাবৃতবর্ষের (অর্থাৎ পামীরের) পূর্ব্বে মন্দার, তাহার পূর্ব্বদিকে শীতান্ত। এই শীতান্ত ও সন্নিকটস্থ পর্ব্বত দুর্গম, এখানে বিদ্যাধর, যক্ষ, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেব ওগন্ধর্ব্বগণ বাস করেন।" মহাভারতে আছে রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ার্থ "মানস সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ব রক্ষিত দেশ সকল অধিকার করিলেন।" তিব্বতে এখনও এক জাতীয় লোক আপনাদের বিদ্যাধর বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বিদ্যাধারণ করেন অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে বিদ্যানুশীলন করেন। ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না যে, নাগগণ কিন্নর, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ। এই নাগগণের প্রস্তুত অমৃত কুম্ভ পান করিয়া ভীম সহস্রনাগ অর্থাৎ হস্তীর বললাভ করিয়াছিলেন।

সানুচর কালিয়নাগ গোকুলে গোপবালকগণের প্রতি অত্যাচার করিত। শ্রীকৃষ্ণ এই কালিয়নাগকে দমন করেন। এই নাগগণের সহিত গরুড়ের বিষম বিবাদ ছিল। আবার এই গরুড়ই শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ রাজা পরীক্ষিৎ শমীক ঋষির উপর অত্যাচার করায় তৎপুত্র শৃঙ্গী তক্ষকের সহিত মিলিয়া পরীক্ষিতের প্রাণ সংহার করেন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে উতঙ্ক মুনি তাঁহাকে নাগদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করেন, কারণ উতঙ্ক তক্ষকের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ছিলেন। নাগযজ্ঞ বা সর্পসত্র নাগদের সহিত যুদ্ধ হইলে, সরমার শাপবাক্যের "অনুপলক্ষিত ভয়ের" অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জনমেজয়ের সহিত নাগদের প্রকৃতই যুদ্ধ হয়, তাই জনমেজয় তক্ষকের রাজধানী তক্ষশিলা অধিকার করেন। শ্রুতশ্রবাঃর পুত্র সোমশ্রবাঃর নিকট জনমেজয় প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, কোন ব্রাহ্মণকে তিনি বিমুখ করিতে দিবেন না। সর্পসত্রে বা নাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ সূত্রধার জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন, "একজন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা দ্বারপালকে বলিয়াছিলেন, "যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।" অথচ আস্তীক মুনি প্রবেশ করিবার কালে কেহই বারণ করে নাই। সম্ভবতঃ সোমশ্রবাঃর নিকট জনমেজয়ের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তদনুযায়ী আস্তীকের প্রার্থনা পূরণ করিতে রাজা বাধ্য হন। অর্থাৎ জনমেজয়ের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাই নাগযজ্ঞের সরলার্থ বলিয়া অনুমিত হয়।

পুরাণগুলি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নাগগণ দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, অপ্সরের মত হিমালয় পর্ব্বতে বা ভারতবর্ষের বাহিরে হিমালয়ের উত্তরে পর্ব্বতের উপর বাস করিত। কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষে নাগগণের উল্লেখ আছে সেইখানেই দেখা যায়, তাহারা জলের মধ্যে বা রসাতলে বাস করে। কালিয় সর্প কালিয় হ্রদে বাস করিত। দুর্য্যোধন-প্রদত্ত কালকূট প্রভাবে ভীমসেন নিঃসজ্ঞ হইলে দুর্য্যোধন যখন তাঁহাকে গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেন, তখন ভীমসেন জলমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে নাগভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তক্ষক ক্ষপণক-মূর্ত্তি ধরিয়া উতঙ্ক মুনির আহৃত কুণ্ডল হরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ বিদারণ পূর্ব্বক রসাতলে গমন করে। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় যেখানে নাগগণের উল্লেখ আছে সেইখানেই দেখা যায়, নাগগণ হয় জলাশয় বা সমুদ্রবিহারী অথবা তাহারা পাতালে বাস করে। নাগগণ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ হইয়াও কিরূপে জলমধ্যে অথবা পাতালে বাস করিত তাহা বুঝা কঠিন।

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণগুলির মধ্যে যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা নিতান্তই দুষ্কর। কিন্তু ভবিষ্য পর্ব্বে যে সকল রাজবংশের বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই সত্য বলিয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে, "বিদিশার ভবিষ্যৎ রাজগণের কথা শ্রবণ করুন। নাগরাজ শেষের পুত্র শত্রুপুর-বিজয়ী ভোগী অতঃপর রাজা হইবেন, তিনি নাগবংশের যশোবৃদ্ধি করিবেন। তৎপরে ক্রমশঃ সদাচন্দ্র, চন্দ্রাংশ, ধনধর্ম্মা ও ভূতিনন্দ বিদিশায় রাজা হইবেন।" আবার বায়ু, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও ভাগবতে আছে, "নব নাগরাজ পদ্মাবতী ও সপ্তনাগরাজ মথুরায় রাজা হইবেন।"

হিন্দু পুরাণগুলিতে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে যে অজাতশত্রুর নাম পাওয়া যায়, তিনি পুরাণে শিশুনাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর তাঁহার নবপ্রকাশিত ইংরাজীতে লিখিত "ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, বিম্বিসার ও অজাতশত্রু বড় নাগবংশীয় এবং এই বংশের পরে সুসুনাগ বা ছোটনাগ-বংশীয়েরা এক সময়ে প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে নন্দবংশের প্রাদুর্ভাব হয়।

রকহিল সাহেব তাঁহার বুদ্ধের জীবনীতে তেঙ্গুর হইতে অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, "কাশ্যপ বুদ্ধের সময়ে খোতানে ঋষিরা আসিতেন। তাহাতে নাগেরা নিতান্ত অসুবিধায় পড়িত।" অর্থাৎ পূর্ব্বতাতারে নাগদের বাস ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যে শীতান্ত প্রদেশের সন্নিকটে নাগদের বাস ছিল বলিয়া লেখা আছে, সেই শীতান্ত প্রদেশ পূর্ব্বতাতারের অন্তর্গত।

রীস্ ডেবিড সাহেবের "বৌদ্ধ ভারত" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ মহাসময়সুত্তন্তের মতে বহু-

প্রকারের দেবতা বুদ্ধদেবের পূজা করিতে আসিতেন। তন্মধ্যে দিক্‌পাল, গন্ধর্ব্ব, নাগ প্রভৃতির নাম আছে। ঐ পুস্তকে ভর্হুৎস্তুপস্থিত চকবাক নাগরাজের যে ছবি দেওয়া আছে, তাহার মূর্ত্তি মানুষের মত কেবল মস্তকের পশ্চাতে ৫টী সাপের ফণা আছে। একস্থানে প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে যে, বুদ্ধদেব নাগদের উপদেশ দিতেছেন। নাগেরা ঠিক মানুষের মতন, কেবল তাহারা যে নাগ তাহা বুঝাইবার জন্য সকলের পশ্চাতে মোট ৫টী সাপের ফণা আছে। বার্গেস সাহেবের "ভারতে বৌদ্ধশিল্প" নামক গ্রন্থে জলমধ্যে নাগকুমারীদের যে চিত্র দেওয়া আছে, তাহাতে নাগকুমারীদের কটিদেশ হইতে নিম্নভাগ সাপের মত এবং উপরের দিকটা মানুষের মত। অজন্তাগুহায় এক নাগপুরুষের চিত্র আছে, তাহার মাথার পিছনদিকে দুইটি ফণা।

শ্রাবণ মাসে নাগ পঞ্চমীর দিনে বাঙ্গলা দেশে নাগ দেবী মনসার পূজা হয়। আস্তিকের মা জরৎকারুরই অপর নাম মনসা। মনসার ভাসান গানে মনসাকে পদ্মা নামে শক্তির সহিত অভেদ করা হইয়াছে। চন্দননগরে নাগ পঞ্চমীর দিন মনসার যে চতুর্ভুজা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়ান হয়, তাহার দুই স্কন্ধে দুইটি সাপ থাকে। বাঁকুড়া জেলায় জয়কৃষ্ণপুরে "জগৎগৌরী" নামে যে মনসার মূর্ত্তি আছে, তাহার পশ্চাতে ৭টী সাপের ফণা এবং দুই পার্শ্বে দুইটী সাপ আছে। টড সাহেব লিখিয়াছেন, রাজপুতেরা নাগপঞ্চমীর দিনে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করেন। এই মূর্ত্তির উপরের দিক মানুষের মতন, নীচের দিক সাপের মতন। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরুস বলেন, পৃথিবীর কুমারী কন্যা (ইলা?) হইতে সিথিয়ানদের উৎপত্তি। ইহার মূর্ত্তি ঠিক নাগকুমারীর মত।

প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে, প্রথমে নাগ সর্প অর্থে ব্যবহৃত হইত না। যে কয়েকটি মূর্ত্তি ও চিত্রের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি মূর্ত্তির পশ্চাতে সাপের ফণা এবং নাগকুমারীদের নীচের দিক সাপের মত। মহাভারতে কিন্তু নাগ ও সাপকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অথচ এই নাগ ও সাপদের কাজ ঠিক মানুষেরই মত। অনেক স্থানে বর্ণনা আছে যে, নাগেরা জলমধ্যে বাস করিত অথবা পাতালে থাকিত। রীসডেবিড সাহেব বলিয়াছেন, নাগেরা বিশিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। নাগেরা কেন যে সর্পের সহিত অভিন্ন বা সর্পফণাযুক্ত রূপে বর্ণিত হইল তাহা নিঃসংশয় নিরূপণ করা দুষ্কর। সম্ভবতঃ নাগজাতি সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিত এবং মস্তকের দীর্ঘ কেশপাশ শীর্ষদেশে সর্পের ফণার মতন করিয়া বাঁধিয়া রাখিত, এবং সর্পই তাহাদের ধ্বজলাঞ্ছন রূপে ব্যবহৃত হইত।

মহাভারতের মূল ঘটনার সহিত নাগদের কোন সম্বন্ধই নাই অথচ নানা আকারে মহাভারতের প্রারম্ভে নাগদের উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান হয় যে শুধু জনমেজয় ও মহাভারতের কথক সূত জাতির সহিত নাগদের সঙ্গী হইয়াছিল এমন নহে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিতও নাগদের ধর্ম্ম মিশিয়া গিয়াছিল তাই মানসদেবীর সঙ্গে সঙ্গে সর্পদেবতা মহাদেব, দুর্গা ও নারায়ণেরও অনুচররূপে গৃহীত হইয়াছে। শেষ বা অনন্ত নাগ তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া পৃথিবীকে ফণায় ধারণ করিয়াছেন এমন কল্পনাও করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম অনন্তনাগের অবতার বলিয়া পুরাণকারেরা মনে করেন।

এইবার ইতিহাসে কোথায় নাগজাতির উল্লেখ আছে, তাহা দেখা যাক। পণ্ডিচেরী কলেজের ফরাসী অধ্যাপক দুব্রেইল সাহেব তাঁহার "দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "প্রায় ৩৫০ খ্রীঃ বাসুদেবের সাম্রাজ্য শতবৎসরের জন্য যৌধেয় ও নাগদের অধিকারে ছিল। মথুরা, কান্তিপুর ও পদ্মাবতী ('সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান নরোয়ার) নাগগণের রাজধানী ছিল। গণপতিনাগের পূর্ব্বপুরুষ শিবনন্দী সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। হর্ষচরিতে পদ্মাবতীর নাগবংশের যে নাগসেনের উল্লেখ আছে তিনি এবং এলাহাবাদ স্তম্ভে উল্লিখিত নাগসেন একই ব্যক্তি। প্রভাকর নাগ, স্কন্দনাগ, দেবনাগ ও ভীমনাগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।" "অন্ধ্র সাম্রাজ্যের করদ রাজারা মহারঠি উপাধি ধারণ

করিত, তাহারা নাগ। অন্ধ্ররাজ পুলমায়ির প্রধান সেনাপতির নাম স্কন্দনাগ। অন্ধ্র শালবাহন বংশ শেষ হইলে নাগেরা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। চুটুনাগেরা তখন শালবাহনদের স্থলাভিষিক্ত হইল।" "কর্লির সিংহস্তম্ভ মহাবীর অগ্নিমিত্র নাগের দান। চুটু এবং মহারঠিগণ প্রায় সাতকার্ণি উপাধি গ্রহণ করিতেন। চুটুরা শুধু মহীশূরে নহে, অপরান্ত প্রদেশেও অন্ধ্র বংশের পরে রাজত্ব করিতেন।" "বনবাসী, মরবল্লী ও চিত্তলদ্রুগের অধিবাসিগণ নাগগণের দৌহিত্র বংশ। বনবাসী প্রদেশে সাতবাহন রাজগণের যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহাতে রাজকন্যার নাম নাগশ্রী। ইনি কাহ্নেরীর খোদিত লিপির স্কন্দনাগ সাতবাহনের মাতা। ইনি একটি নাগমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই প্রদেশ এককালে নাগখণ্ড নামে অভিহিত হইত। সম্ভবতঃ সাতকার্ণি উপাধিধারী মহারঠি নাগগণই অন্ধ্রভৃত্য। অন্ধ্রগণের পরে যে মহারঠিগণ অন্ধ্র সাম্রাজ্য শাসন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট চুটু, নাগ ও পল্লব নামক তিনটি জাতি ছিল।"

ছাব্রইল সাহেবের "৩৫০ খৃঃ" এইকাল সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে। য়ুএচি জাতির কোশান শাখার কনিষ্ক ও বাসুদেবের কাল নির্ণয় হইলে তবে ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে, কখন যৌধের ও নাগগণ বাসুদেবের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ভিন্সেণ্টস্মিথ সাহেব ১২০ খ্রীঃ কনিষ্কের সিংহাসনারোহণের কাল বলেন। তাহা হইলে বাসুদেবের রাজ্যারোহণকাল প্রায় খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকের শেষে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি ফ্লিট সাহেবের মতানুযায়ী কনিষ্ককে বিক্রম সংবতের স্থাপয়িতা মনে করা যায়, তাহা হইলে নাগগণ খৃঃ প্রথম শতকের শেষভাগ হইতে শতবৎসর রাজত্ব করিয়াছিল ধরিতে হইবে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ রচিত "অক্সফোর্ড হিষ্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে মহাভারতের প্রথম রচনাকাল প্রায় ২০০ খ্রীঃ বলা হইয়াছে। উত্তর ভারতে এই সময়ে নাগগণের প্রাধান্য ছিল তজ্জন্য মহাভারতে নাগগণের প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মহাবংশে লিখিত আছে, নাগ মহাসেন খৃঃ তৃতীয় শতকে রাজত্ব করিতেন। র‍্যাপসনের মতে প্রভাকর ও স্কন্দনাগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন আর ৯ জন নাগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি খৃঃ দ্বিতীয় শতকের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃহস্পতি নাগ, দেব নাগ ও গণপতি নাগের নাম পড়িতে পারা গিয়াছে।

ডি কনকসভাই রচিত ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তামিল দেশ" নামক পুস্তকে লিখিত আছে, নাগেরা সভ্যজাতি ও খুব যোদ্ধা ছিলেন। জনৈক নাগসামন্ত পাণ্ড্য রাজার মন্ত্রী ছিলেন। অপর একজন নাগসামন্ত চেররাজ ওলিয়ারের মন্ত্রী ছিলেন। কারিকল চোল নাগদের পরাজিত করেন। নাগেরা যে সভ্য ছিলেন ছন্দঃসূত্র প্রণেতা পিঙ্গল নাগই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় পূর্ব্বোক্ত চুটু ও নাগগণ হইতেই নাগপুর ও চুটিয়া নাগপুর বা ছোট নাগপুর প্রদেশের নামকরণ হইয়াছে।

কর্ণেল টডের মতে রাজপুতানার ৩৬ রাজকুলের মধ্যে হুন, আভীর, তাক বা তক্ষক কুলের নাম পাওয়া যায়। অথচ বর্ত্তমানে রাজপুতানার কোন রাজপুতই নিজেকে এই সকল বংশ সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। কর্ণেল টড বলেন, তাতার ও মোগলদের ইতিহাস প্রণেতা আবুল গাজির মতে মোগলের ৬ পৌত্রের মধ্যে একজনের নাম কিউন অর্থাৎ সূর্য্য, আর একজনের নাম আয় অর্থাৎ চন্দ্র। আয়ের দশম বংশধরের একজনের নাম কাজান্ অপরের নাম নাগস্। পুরাণের মতে কশ্যপের দুই স্ত্রী হইতে নাগগণের ও গরুড়ের উৎপত্তি, এবং বৈবস্বত মনু হইতে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের উৎপত্তি। চন্দ্র বংশে বুধের বা ইলার পৌত্রের নাম আয়ু। যদি আবুলগাজির আয় ও হিন্দু পুরাণের আয়ু একই ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে আবুল গাজির মতে চন্দ্রবংশেই নাগগণের উৎপত্তি হয়াছিল বলিতে হইবে। আর মোগল বা তাতারদের সহিত ভারতের সূর্য্য, চন্দ্র ও নাগবংশের কিছু সম্বন্ধ ছিল।

পূর্ব্বে যে সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নাগগণ প্রথমে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে ছিল। পরে এক সময়ে উত্তর ভারতে রাজত্ব করে এবং সর্ব্বশেষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তাহাদের আধিপত্য হয়।

রাজপুতানার বাহিরে বাঙ্গলা, বিহার ও অযোধ্যা অঞ্চলে নাগবংশী রাজপুত বাস করেন। বৈস বা বাইস (টডের Byce) রাজপুতগণ রাজপুতানা, যুক্ত প্রদেশ, বাঙ্গলা ও বিহারে আছেন। যুক্ত প্রদেশের বাইস রাজপুতগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মূলে নাগবংশী। তাহাদের কুলদেবতা নাগ। ইহাদের আদিপুরুষ শালবাহন অনন্ত নাগের পুত্র। তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করিয়া পরে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত জয় করেন এবং শালকোটে তাঁহার মৃত্যু হয়। ছোটনাগপুরের মহারাজা নাগবংশী। তাঁহাদের আদিপুরুষ তক্ষকনাগের বংশ। বর্ত্তমান নাগবংশী ও বৈস রাজপুতগণ যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাগদেরই বংশ তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই। পুরাণে নাগদের সূর্য্য বা চন্দ্র বংশের ন্যায় কোন দিন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। একটা কল্পিত পূর্ব্বপুরুষের নাম করিতে গেলে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশ ছাড়িয়া নাগবংশের নাম করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। উদয়পুরের রাণারা আদি পুরুষের কল্পিত নাম করিতে গিয়া রামচন্দ্রকেই আদিপুরুষ স্থির করিয়াছিলেন। এখন ঐতিহাসিকগণ অকাট্য প্রমাণের বলে স্থির করিয়াছেন রাণারা নাগর ব্রাহ্মণের বংশ।

বাঙ্গলার দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদের মধ্যে নাগ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত নাগ বংশের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শার্দ্দূল, সিংহ পুঙ্গব প্রভৃতি শব্দের ন্যায় নাগ। সম্ভবতঃ হস্তী অর্থে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। কায়স্থদের মধ্যে নাগ সম্ভবতঃ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আসাম অঞ্চলের চুটু ও নাগাগণের সহিত ঐতিহাসিক চুটু ও নাগগণের কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। যে চুটু ও নাগগণ এক দিন অন্ধ্র বংশের পরে দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিল, যে নাগগণের সহিত ভোজ ও পাণ্ডবদের সম্বন্ধ ছিল, তাহাদেরই বংশধরগণ যে এমন অসভ্য অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে একথা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান চুটু ও নাগারা ঐতিহাসিক নাগদের দলভুক্ত ছিল কিন্তু এক জাতীয় নহে।

"বাঙ্গলার এথ্‌নোলজী" বা জাতিতত্ত্বের লেখক ড্যাল্টন্ সাহেব একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। অথচ এই ড্যাল্টন সাহেব ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাগজাতি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া একেবারে স্থির করিয়াছেন যে, ছোটনাগপুরের মহারাজ যে নাগবংশী বলিয়া পরিচয় দেন, সে নাগবংশ মুণ্ডা বা ওরাঁও হইতে হইয়াছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেকগুলি করিয়া শাখা আছে। জীব জন্তু গাছপালা ও জিনিষের নামে এই সকল শাখার নাম। যথা ওরাঁওদের মধ্যে ইঁদুর, কাছিম, নেকড়ে বাঘ, হাঁস কুকুর, ইত্যাদি; সাঁওতালদের মধ্যে ইঁদুর, নীলগাই, পান, শঙ্খ, সুপারি, মহিষ ইত্যাদি। মানভূমের কুর্ম্মি ও ভূমিজদের মধ্যে এইরূপ শাখা আছে। যে, যে শাখার লোক সে, সেই বস্তু বা জীব ব্যবহার করিতে বা মারিতে পারিবে না এবং সেই শাখার লোকের সঙ্গে তাহার আদান প্রদান চলিবে না।

রীজ্‌লী সাহেব ড্যাল্টন সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলেন, শুধু নাগবংশী বলিয়া নহে, চন্দ্রবংশী, বাঘেল, অবহবন্, কলহন্‌স্ রাজপুতগণের নাম হইতে মনে হয় ইহারাও অনার্য্য হইতে রাজপুত হইয়াছেন। এরূপ অনুমানের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ হইলে হিন্দুর পৌরাণিক দেবতারা সব অনার্য্য হইয়া পড়েন। তাঁহাদেরও সব একটা একটা করিয়া বাহন আছে। আর বাঙ্গালী হিন্দুদের সেই সকল বাহনকে মারিতে নাই। বিশেষ করিয়া বাস্তুসাপ মারা অনেকের পক্ষে নিষেধ।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

চিরাগত

আবার এসেছ তুমি! পসারি আঁচল
অনাহূত দাঁড়াইলে কাছে,
করুণ মিনতি মাখা আঁখি ছল ছল,
সুধাইছ—আর কিছু আছে?
—এখনো মেটেনি আশ? হে চিরপিয়াসী!
হে অনন্ত অভিশাপ মম!
এ জীবন আঁধারিয়া ফিরিছ প্রত্যাশী
কাছে কাছে রাহু-ছায়া সম!
কি চাহ নিঠুর বঁধু, কি সাধ আবার?
উজাড়িয়া দিয়াছ ত সব,
বুকভরা হাসিরাশি, পীযূষ ভাণ্ডার,
উথলিত সঙ্গীত সৌরভ।
লুটিয়াছ বসন্তের কুসুম-বিতান,
হরিয়াছ নিদাঘ-স্বপন,
বরষায় পথ চাহি' অশ্রুঝরা গান,
শরতের অর্ঘ্য-আয়োজন
অপূর্ণ আঁচল তবু তৃপ্তিহীন আশ,
সর্ব্বগ্রাসী অনন্ত ও ক্ষুধা!—
কি দিয়া ভরিব ঝুলি, মিটাব তিয়াস?
কোথা বুকে উৎসারিত সুধা?
আঁকড়িয়া বক্ষ তবু শিশুর মতন
স্তন্যহীনা জননীর বুকে!
সাধ কি মিটাতে হায় মর্ম্ম-আকিঞ্চন
রক্তধারা পান করি সুখে?
সবি তো নিয়াছ কাড়ি' রিক্ত করি প্রাণ,
শতবার শত ছলনায়,
আবার এসেছ ফিরে আহরিত দান
তেয়াগিয়া পথের ধূলায়!
বারবার এ কি ছল, এ কি আকর্ষণ,
এ কি তীব্র কামনা আকুল!
নিয়ত আগলি পথ এ কি নিবেদন,
ভিখারীর বাসনা বিপুল!

জানি বন্ধু নহে প্রেম অঞ্জলি আমার,
মালা নয়, কণ্টকের জ্বালা!
নহে ফুল্ল বসন্তের বনবীথিকার,
কুসুমিত হৃদি-অর্ঘ্য-ডালা।
যে কথা ফোটেনি গানে, বিদারি' পঞ্জর
তরঙ্গিছে শোণিত ধারায়,
ব্যথার বুদ্বুদ সম বক্ষে নিরন্তর
হাহাকারে ফেটে ফেটে যায়!
অর্ঘ্য তাই ফুলহীন কণ্টকের হার,
ভাষা তাই কাতর নয়ন,
তবু হায় তারি তরে নিত্য অনিবার
কত সাধ কত আয়োজন!
কাঙালের বিত্ত সে যে, চাহনিক তায়,
কোথা পাব রতন-সম্ভার?
সকল লুটিয়া লয়ে ফেলিয়া ধূলায়
ফিরে এসে কি চাহ আবার?
দাঁড়ায়েছ সঙ্কুচিত ভিখারীর সম
চক্ষে ভরি মিনতি আকুল,
সবি যে ভুলায় ওই আঁখি অনুপম,
ও নীরব চাহনি অতুল!
ভুলে যাই—ভুলে যাই নিঠুর ছলন,
আঘাতের বেদন গভীর,
ভুলে যাই অবহেলা, হৃদি-বিদলন,
ঝরে-পড়া বাসনা অধীর!
হে মোর নিদয় বঁধু! ফিরাইতে যাই,
ফিরে আসি ব্যথিত হিয়ায়!
যে কথা কঠিন হয়ে কহিবারে চাই,
বেধে যায় কণ্ঠের সীমায়!
এবার নাহিক গান, লহ হাহাকার,
হাসি নাই, লহ আঁখিজল,
নিঃস্বের কামনায় লহ, ব্যথা নিরাশার
জীবনের সাধনা বিফল।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

সাহিত্য ও নীতি

সাহিত্য সাধারণতঃ সমাজের দর্পণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার অর্থবোধ হয় এই যে, সমাজের বক্ষে যখন যে ভাবতরঙ্গ বহিতে থাকে, মানুষের অভ্যন্তরে যে সকল ঘটনার অভিনয় হইতে থাকে, সমসাময়িক কাব্যে ও সাহিত্যে তাহারই ছায়া ও ছবি আসিয়া পড়ে। আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য অধিকাংশই উপন্যাস-সাহিত্য ; ইহাকে ক্রমশঃই নানারূপ নায়ক নায়িকার চিত্রাঙ্কনে এবং বিভিন্ন বীভৎস প্রেমের চিত্রে পরিপূর্ণ হইতে দেখিয়া, ইহার দ্বারা সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা লইয়া অনেকের চিত্তই উদ্বেলিত হইয়াছে। সাহিত্যকে শুধু সমাজের দর্পণ স্বরূপ ধরিয়া লইলে, যে সমাজে এরূপ সাহিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই পূর্ব্বেই আক্রান্ত হইয়াছে এবং সেই অস্বাস্থ্যকর সমাজ-চিত্রের ছায়া লইয়াই বর্ত্তমান উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে এ কথাও বলিলে বলা যাইতে পারে।

কিন্তু সাহিত্য শুধু সমাজের দর্পণ নহে। সাহিত্য নূতন আদর্শ ও চিত্র সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তাহার প্রভাব সমাজের উপর পড়িয়া মনুষ্যহৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলে। এই দিক দিয়া দেখিতে হইলে, আধুনিক সমাজ চরিত্রের কোনও স্বাস্থ্যহানি হইতেছে ধরিয়া লইলেও ঐ স্বাস্থ্যহানির কারণে যে বর্ত্তমান উপন্যাস সাহিত্য ব্যতীত আরও অনেক কিছু বিদ্যমান আছে তাহা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন এবং তাহা বলা আমার উদ্দেশ্যও নহে। বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস সাহিত্য কর্ত্তৃক সমাজের কতদূর কি অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে, তাহা "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" নামক প্রবন্ধে "ধ্রুবতারা" উপন্যাস প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার এই প্রবন্ধের সমুদয় চিন্তা ও যুক্তির প্রতিবাদ স্বরূপে কিছু না বলিয়া, আমি শুধু সাহিত্যকে কোনরূপ সীমাবদ্ধভাবে না দেখিয়া সাহিত্যের বাস্তবিক উদ্দেশ্য কি এবং তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোথায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু তাহারই আলোচনা করিব এবং সেই উদ্দেশ্যের দিকে হইতে সাহিত্য ও তাহার ফলাফলের বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

সমাজ ও মনুষ্যের মঙ্গলই যে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সাহিত্য মাত্রেই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপদেশময় হওয়া উচিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহা বলিয়া সাহিত্যকে যদি শুধু শিক্ষকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়—কেবলমাত্র উপদেষ্টার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়—তাহা হইলে সাহিত্যে প্রতিভা এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইবে কেমন করিয়া? লেখনী ধরিবার অগ্রেই যদি লেখককে ভাবিয়া লইতে হইল তাঁহার কল্পনার কোন্ গতিটীর দ্বারা সমাজের গায়ে কোন আঁচড়টী পড়িবে,তাহা কতদূর কল্যাণ বা অকল্যাণকর হইবে, তাহা হইলে তাঁহার লেখনীর অগ্রে কবিপ্রতিভার স্বাধীন উন্মুক্ত ভাবের স্ফুরণ হইবে কি করিয়া? কল্পনা যদি অবাধে বিচরণ করিতে না পাইল, তবে তাহা হইতে নূতন বিমোহন সৃষ্টির উদ্ভাবন হইবে কেমন করিয়া? সাহিত্যে সৌন্দর্য্য কোথায়? মানব-চিত্তের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সকল সঙ্কীর্ণতার উপর দাঁড়াইয়া সত্য চিন্তা ও মনোভাবের অভিনব চিত্রাঙ্কনের বিকাশেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। সমাজের অপরিচিত সৃষ্টি মাত্রেই তাহার রুচির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে, হয়ত তাহার চিরপ্রচলিত পথে বিদ্রোহ আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা মঙ্গলকর নহে সুতরাং সুন্দর নহে না বলিয়া। কেবলমাত্র সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে দেখিব তাহাতে কল্পনার ঊর্দ্ধ বিচরণ আছে কি না, কলাকুশলতার পারিপাট্য আছে কি না, তাহাতে মনে আনন্দ আনিয়া দিতেছে কি না,—তাহা চিন্তাকে কোনও অভিনব পথে চালিত করিতেছে কি না, তাহাতে শিল্পের সার্থ-

কতা হইয়াছে কি না। শুধু এই সকল দেখিয়াই তাহার সফলতা ও কৃতিত্ব উপলব্ধি করিব এবং সমাজের দিকে না তাকাইয়াই তাহাকে সাহিত্যের আসনে বরণ করিয়া লইব।

মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের উপাসক। দৈহিক সৌন্দর্য্য হউক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হউক, চরিত্রের সৌন্দর্য্য হউক, চিন্তার সৌন্দর্য্য হউক—যেখানে যে ভাবেই এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও মূর্ত্তির স্ফুরণ, সেইখানেই আনন্দ ও আত্মার উপভোগ। যে সাহিত্যে এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও আনন্দ উপভোগের উপকরণ প্রকৃত শিল্পনৈপুণ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা মানুষের সাধারণ জীবনের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া গেলেও মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তি সে সৌন্দর্য্যের প্রতি অন্ধ হইতে পারে না, সে কল্পনার সৃষ্টিকে মানুষ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেয়,—কেননা তাহাতে মানুষ চিরদিন সমানভাবে আনন্দ পাইয়া থাকে। নৈয়ায়িকের বা নৈতিক সংস্কারকের শাসনবাক্যে সাহিত্যের প্রকৃত মাধুর্য্য হ্রাস হয় না—তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। কাব্য বা দর্শন বা বিজ্ঞান বা অন্য কোন মৌলিক চিন্তা লইয়া সবল সাহিত্যের বা সৌন্দর্য্যের আদর্শের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আজকাল প্রতিভার স্ফুরণ বিরল। ঐরূপ উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের স্বাস্থ্য বা ফলাফল লইয়া বড় কোন আপত্তি দেখিতে পাই না। বর্ত্তমানে একমাত্র উপন্যাস সাহিত্যে প্রেমের চিত্রাঙ্কনে এবং তাহার ফলাফলের প্রতিই কটাক্ষ পড়িয়াছে বলিয়া সেই উপন্যাস-সাহিত্যের দিক হইতে আমার উপরিউক্ত বক্তব্য বিষয়টীর সত্যাসত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর প্রণয়ন করিলেন, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্বে হিন্দুর ঘরের বিধবা অথবা সধবা রমণী পরপুরুষের প্রেমে কখনও পতিত হইত কি না সেরূপ তর্কের দ্বারা কোন কথার সমর্থন না করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সমাজের দিক হইতে বঙ্কিমের ঐ উপন্যাস সৃষ্টি তত আদরণীয় বা আদর্শযোগ্য হয় নাই বলিয়া সমাজের নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কঠিন সমালোচক তজ্জন্য আজিও সে সাহিত্য সম্রাট্‌কে কশাঘাত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। সমালোচকের এরূপ কশাঘাত করিবার অধিকার থাকিলেও, (কেননা তাঁহার উদ্দেশ্য সমালোচনার দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া যাহাতে ভাল কাব্য গ্রন্থাদি উৎকৃষ্ট ফসল তাহাতে ফলে তাহাই দেখা) তাঁহার এই সমালোচনা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। যে প্রতিভার দ্বারা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহা কোন সমালোচনার দ্বারা পরিচালিত হয় না—তাহা বন্যমৃগের ন্যায় স্বীয় অঙ্কস্থিত সৌরভে আপনি বিভোর হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে উন্মত্তের ন্যায় আপন পুলকে আপনি ছুটিয়া যায় এবং তাহার ফলে অপরকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর পাঠ করিয়া কুন্দনন্দিনীর আফিং খাওয়ার অনুকরণে গৃহে গৃহে অপরিণতবয়স্কা নারী আফিং খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা প্রতাপ-শৈবলিনীর অনুকরণে তাহাদিগের ন্যায় প্রেমের অভিনয় করিতে থাকিবে, অতএব এরূপ কুৎসিৎ আদর্শের সৃষ্টি করিও না, সমালোচকের এরূপ রোষলোচনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী ধরিতে হইলে বঙ্গসাহিত্যে—শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে-বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখরের ন্যায় এমন মধুর সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রাণস্পর্শী অপূর্ব্ব কাব্যের সৃষ্টি আশা করা যাইত কি? সাহিত্য সৌন্দর্য্য এবং অভিনব সৃষ্টি এক এবং সমালোচকের প্রার্থিত সামাজিক শিক্ষার নৈতিক সাহিত্য আর এক। বঙ্কিম যে সমাজের কল্যাণকে ভুলিয়াছিলেন তাহা নহে—বিষবৃক্ষ লিখিয়া তাহা দ্বারা গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে আশা করিয়া তাহার যে উপসংহার করিয়াছেন তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে তিনি সমাজের প্রতি সাহিত্যের ফলাফল সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। তবুও সাহিত্যে প্রেমের ওরূপ অভিনব চিত্রাঙ্কনের ও রসাত্মক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং তাহাও মহান্ উদ্দেশ্যেই করিয়াছিলেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এখন তাহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন। প্রকৃত প্রতিভা কখনও সীমাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর কোনও সামাজিক মাপদণ্ডে আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচিত

হইলেও তাহার চিত্রসৌন্দর্য্যে আজিও মানুষের অন্তঃকরণে যে আনন্দ ও করুণ রসের সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে তাহারা সাহিত্যে আর্টের আদর্শ স্বরূপে চিরদিন বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে।

এ সংসারে সকল জিনিসেরই ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে মানুষের চিন্তা যে ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, আজ তাহা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। সাহিত্যের গতিও স্থিতিশীল নহে। এক দিন যাহা romanceএ আনন্দ পাইয়াছে বা বিকশিত হইয়াছে আজ তাহা realistic রূপ ধারণ করিয়াছে। মানবজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব ও গূঢ় চিন্তাগুলি সূক্ষ্মরূপে নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া দেখাইতে পারিলেই যেন সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষে পৌঁছান হইল। এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে realistic উপন্যাসের আধিক্য হইয়া পড়িয়াছে। এবং বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" তাহারই পূর্ণ বিকশিত প্রয়াস মাত্র। যে চিত্র romanceএর আবরণে প্রতাপ শৈবলিনীতে গঙ্গাবক্ষে, যুদ্ধক্ষেত্রে, নানা দৃশ্যপটের মধ্য দিয়া অঙ্কিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে, "ঘরে বাইরে" গল্পে তাহাই রূপান্তরিত এবং সর্ব্বপ্রকার দৃশ্যপট ও বাক্যের আবরণ বিবর্জ্জিত হইয়া সমসাময়িক ঘটনা স্বাদেশিকতা ও বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সম্মোহনের মধ্য দিয়া 'সন্দীপ' ও 'বিমলাতে' আসিয়া দেখা দিয়াছে। ইহাতেও সেই এক পরকীয়া প্রেম, কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভেদে অধিক পরিমাণে realistic বলিয়া সামাজিক নীতিরক্ষকের চক্ষে কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইয়াছে। সামাজিক নীতির চক্ষু দিয়া ইহার সৌন্দর্য্য না দেখিয়া realistic সাহিত্যের কৃতিত্ব এবং শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে ইহার বিচার করিলে দেখিতে পাইব, বাস্তবিক ইহাতে কাব্যরসের মধ্য দিয়া মানব মনের ও অন্তর্জীবনের যে সকল তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার ও বিকাশ হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব ও বিস্ময়কর। আমাদিগের নিজের মনের মধ্যেই এমন অনেক কথা অনেক তত্ত্ব রহিয়াছে যাহা পরিস্ফুটভাবে আমরা নিজেই কখনও ধরিতে পারি নাই বা ভাষায় কখনও ব্যক্ত করিতে পারি নাই। কিন্তু কবি সে কথাটী—মনের সেই নিগূঢ় অবস্থাটী—কেমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যটী কেমন স্পষ্ট করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিয়াছেন! তাহাতে যে চিত্রের বা পাপ মূর্ত্তির স্ফুরণ হইয়াছে তদ্দ্বারা সমাজের অনিষ্ট সাধন হইবে বলিয়া চক্ষু বুজিলে সাহিত্যের কোনও নূতন সৌন্দর্য্য আমরা কোনও কালেই দেখিতে পাইব না। প্রণয়-কাহিনীর নভেল লেখা একেবারে বন্ধ করিতে পারিলে সে একরকম হইত। ঐ নভেলের ভিতর দিয়া যে সকল প্রতিভার স্ফুরণ হইয়া থাকে তাহা আর আমরা দেখিতে পাইতাম না। আমাদিগের একমাত্র সাহিত্য রামায়ণ মহাভারতের ভাবাবিষ্ট সমাজ, নভেলের দ্বারা উৎসন্ন গেল বলিয়া কোন অভিযোগ বা গোলোযোগই উঠিত না। কিন্তু উপন্যাসের প্রবল বন্যা যখন বন্ধ করিবার উপায় নাই, নারীর প্রেমের আখ্যান এবং সমাজের নানাচিত্র যখন সাহিত্যের আহার যোগাইতে থাকিবেই, এবং বঙ্কিমের সময়ের পর হইতে ক্রমশঃই যখন মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও মীমাংসার উপরই ঐ সকল উপন্যাস সাহিত্য স্থাপিত হইতেছে, তখন মানব মনের শুধু উৎকৃষ্ট ভাবগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহাদ্বারা একমাত্র সুন্দর আদর্শ অঙ্কনেই ঔপন্যাসিকের কর্ম্ম সীমাবদ্ধ থাকিবে এরূপ আশা বা ইচ্ছা বিড়ম্বনা। মানব মনের অন্ধকার গুহার মধ্যে অপকৃষ্ট বৃত্তিগুলি কি করিয়া জন্মলাভ করিয়া জীবনে কত ভাবে কুহক জাল বিস্তার করে এবং মানুষকে সংসারের ভাল মন্দ কতদিকে লইয়া যায়, বড় শিল্পী সমাজের সমক্ষে তাহাও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়া, তাঁহার ছবি আঁকিয়া, তাহার ফলাফল দেখাইয়া প্রতিভার কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" বা "চোখের বালিতে"ই যে ইহা দেখান হইয়াছে তাহা নহে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমূহও এইরূপ নানা চিত্রাঙ্কনে পরিপূর্ণ এবং সময়ের এইরূপ বিপ্লবময় আবর্ত্তনের মধ্যেই তাহার জন্ম। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বলিতে গেলে, "স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান

সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরী রাশি রাশি ঢাকা-ঢুকির মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তার নিজের কাজ করতে হয়, এই জন্যে তার গতিবিধি জানতে পারে না অবশেষে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্ত্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার যায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম্ম বল বিশ্বাস বল কেউ তাহাকে ঠেকাতে পারে না।" মনুষ্য জীবনে বাস্তবের এই লীলা দেখাইবার জন্য এবং আধুনিক ইউরোপীয় আদর্শের সংযম হইতে প্রবৃত্তিকেই বড় বলিয়া বাস্তব বলিয়া পূজা করিলে মানুষকে কি ঘোর প্রলয়ের পথে গিয়া পড়িতে হয়, "ঘরে বাইরে" গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাহারই অভিনব বাস্তব চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। এইরূপ উপন্যাসের দ্বারা বঙ্গের গৃহলক্ষ্মীগণকে অপর পুরুষের স্বাধীন-ভাবে ভালবাসিবার ও লোকনিন্দা বা সামাজিক ভয় উপেক্ষা করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে মাত্র মনে না করিয়া, যাঁহারা প্রকৃত কাব্য-সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের পক্ষপাতী তাঁহারা যে এই সকল উপন্যাসে মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম সত্যগুলির তত্ত্বালোচনার বিচিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন এবং প্রবৃত্তিকে বড় করিয়া লইয়া চলিলে জীবনে কি বিপত্তি তাহাও জানিয়া সাবধান হইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল আখ্যায়িকার প্রত্যেকটীর ঘটনাগুলি বিবৃত করিয়া তাহাদিগের লিখিত চরিত্রগুলির স্ফুরণ ও তাহার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য দেখাইবার স্থান ইহা নহে। তবে মোটামুটি দু'একখানি—যাহার নীতি ও রুচি লইয়া বিশেষ আপত্তি শুনিতে পাই—তাহার মধ্যে কাব্য সৌন্দর্য্য, কলাকুশলতা ও কল্পনার লীলা কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা দেখা যাইতে পারে।

"ঘরে বাইরে"র বিমলা-চরিত্রে যে নারীচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীমূর্ত্তি। তাহাতে আমরা সীতা সাবিত্রী অথবা ভ্রমর সূর্য্যমুখীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাইলেও, বাঙ্গালীর গৃহলক্ষ্মী যে স্বামীকে পূজা এবং ভক্তি করিয়াই ভালবাসায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে—তাহা ভুলিয়া গিয়া, ইংরাজি আর্ট এবং স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের সমান অধিকার চর্চ্চা করিয়া আধুনিক শিক্ষিতা রমণী বাহিরের সংস্রবে নূতন 'আইডিয়ার' পক্ষপাতী স্বামীর ফর-মাইস মত মানসী তিলোত্তমা গঠিত হইতে গিয়া কিরূপ বিকৃত এবং জীবনে সত্য ও সুন্দর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তাহারই উপদেশপূর্ণ বাস্তব মূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইহাতে সাময়িক ঘটনার ছায়া লইয়া কাব্যসৃষ্টির মৌলিক-ত্বের পরিচয় পাই, নায়িকার জীবন ইতিহাসে বিস্ময় এবং করুণায় পূর্ণ হইয়া যাই। তাহাকে অবশেষে অধঃপতনের পথ হইতে কোনরূপ অসামঞ্জস্য না ঘটাইয়া অথবা বঙ্কিমের ন্যায় কোন সাধুপুরুষ ও সন্ন্যাসীর অবতারণা না করিয়া যেরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, এবং সামাজিক আদর্শের শেষরক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে লেখকের সিদ্ধহস্তের অপূর্ব্ব ক্ষমতার ও আখ্যায়িকার সৌন্দর্য্য রক্ষার বহুল সরিচয় পাই।

সন্দীপ একটী পাপ ও দুর্ম্মতির চিত্র—লালসার স্থূল মূর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার তাহার মুখে সীতা সম্বন্ধে রাবণের সঙ্কোচ থাকা সম্বন্ধে যে সব কথা বলাইয়া-ছেন, তাহাতে পবিত্র সীতাচরিত্র কলুষিত হইয়াছে ধারণায় অনেকের মনে আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রকৃতপক্ষে সীতাচরিত্রের পবিত্রতার কোন হ্রাস হইয়াছে কি না এবং সীতা সম্বন্ধে মনে ব্যথা পাইবার কারণ আছে কি না সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া, কাব্যের দিক হইতে চরিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে ও মনুষ্যহৃদয়ে পাপচিন্তার প্রসার সম্বন্ধে বলিতে হইলে বলিব, মনস্তত্ত্বের এমন নিগূঢ় একটী সত্য খুব কম কাব্যেই এত পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত হই-য়াছে। মানুষের আত্মা যে বস্তু লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, তাহা হাতের কাছে পাইয়া কোনরূপ সঙ্কোচ বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা যে সেই ঈপ্সিত বস্তু হইতেই বঞ্চিত হওয়া মাত্র। সে বস্তু পাইতে হইলে সে দুর্ব্বলতা একেবারে এড়াইতে হইবে, সকল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতে হইবে। সন্দীপ বিমলা সম্বন্ধে সীতাকে লইয়া রাবণের ঐ সঙ্কোচের দৃষ্টান্ত দ্বারায় নিজের মনকে পাপের পথে সবল ও প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল। ইংরাজিতে বলে—

The devil can quote the scripture for his purpose। রামায়ণের কবি তাঁহার মহাকাব্যে অপূর্ব্ব কলাকুশলতা দেখাইয়া জগৎপূজিত সীতা চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহার অত্যুজ্জল তেজ মহিমায় প্রতিহত হইয়া রাক্ষকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইয়াছে দেখাইয়াছেন। সন্দীপের অন্তরে যে পাপ রাক্ষস তাহাকে চালিত করিতেছিল, তাহা সন্দীপের কাণে কাণে বলিল, "পাপের মাত্রা পূর্ণ হয় না—নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না—ঐ দেখ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াও নিজ অন্তরের দুর্ব্বলতার জন্য সীতাকে লাভ করিতে পারে নাই। বিমলার জন্য তোমাকে সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে হইবে।" সন্দীপ নিজ অন্তরে সেই পাপের প্ররোচনায় দুর্ব্বলতার সঙ্কোচের এই ফলাফলের এই পৌরাণিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া নিজ মনকে সবল ও আত্মকর্ম্ম-সমর্থন করিতেছে। 'মনের মধ্যে পাপের চিন্তার এরূপ গতি সন্দীপের ন্যায় চরিত্রে খুবই স্বাভাবিক। ইহা অপেক্ষা মনস্তত্ত্বের সুন্দর বিশ্লেষণ আর কি হইতে পারে? সন্দীপের তাৎকালীন মনের ভাব ঐ একটী প্রসঙ্গের দ্বারা যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর অন্য কোন প্রকারে অমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করিয়া বলা যাইত না। ইহার জন্য কবি সীতা চরিত্রের পবিত্রতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও চলে। "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ সমালোচনা এখানে উদ্দেশ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"তে বিনোদিনী-চরিত্রে ও শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীনে" কিরণময়ী-চিত্রে ঐরূপ আপত্তির কটাক্ষ দেখিতে পাই। কিন্তু পাঠক সর্ব্বপ্রকার নৈতিক বিকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তহৃদয়ে বলুন দেখি, বিনোদিনী-চরিত্র-চিত্রণে ও কিরণময়ী চরিত্র গঠনে বাস্তবিক গ্রন্থকারগণের কলাকৌশল ও রচনামাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন কি না? কিরণময়ী ও বিনোদিনী দুশ্চরিত্র হইলেও তাহাদিগের চিত্রাঙ্কনের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতায় তাহা, পাঠে তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কি না? যদি হইয়া থাকেন, তবে ঐখানেই ত কাব্য আপন কারিগরী দেখাইয়াছে। হউক না কেন তাহা চরিত্রহীন, তাহাকে সুন্দর বলিয়া সাহিত্য কোলে তুলিয়া লইয়াছে এবং তাহাকে চিরদিনের জন্য আপন বক্ষে স্থান প্রদান করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই এবং হইবেও না।

স্থানাভাব ও বাহুল্য ভয়ে ঐরূপ দুইএকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিলাম মাত্র। কিন্তু উপরিউক্ত শ্রেণীর উপন্যাসগুলি তাহাদের রুচি সম্বন্ধে কঠোর প্রশ্ন হওয়া সত্ত্বেও, আপন অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে এবং গুণে তাহারা আপন প্রভাব আপনি বিস্তার করিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাদিগের দ্বারা বঙ্গগৃহে বস্তুতঃ কোনও অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যে স্থানে উপন্যাস পাঠে অনিষ্টের আগুন ধরিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে সেখানে পূর্ব্ব হইতেই বারুদ সঞ্চিত ছিল, শুধু অগ্নিসংযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। যাহা হউক তাহা বলিয়া আমি বলিতে চাহি না যে, মন্দ পুস্তকপাঠে সমাজের কোন অনিষ্টই হয় না। আজকাল যাহা ছাপা হইতেছে তাহাই গ্রন্থ হইয়া নগদমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। "টপ্পা সাহিত্যে"র সে সকল গুলিরই যে সমান মূল্য আছে, বা তাহারা সকলেই যে কাব্য সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ এমন কথাও বলিতে চাহি না। তবে তাহাদিগের হইতে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন দেখি না। কেন না যাহা বাস্তবিকই কুৎসিৎ, যেখানে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও শিল্পের অভাব, তাহা সাহিত্য বা সমাজে কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই, পারিবেও না। কালস্রোতে বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিয়াছে, আবার দুদিনেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। সাহিত্য বা সমাজ কেহই তাহাকে স্থান দিবে না। এজগতে একমাত্র গুণের আদরই হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র সুন্দরই জয় লাভ করিয়া থাকে।

একমাত্র সুন্দরের উপাসনা করিয়াই মানুষ আপনাকে সুন্দর করিয়া তুলে। মানুষ এ সংসারে কোন্ পথ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিলে চিরদিন সুখে থাকিতে পারিবে, সেই পথের আদর্শ অঙ্কনই এবং তাহার নির্দ্দেশ করণই সাহিত্যের একমাত্র

উদ্দেশ্য এবং কার্য্য। সাহিত্য সে আদর্শ সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারে। সমাজ সহজেই তখন সে সুন্দর আদর্শ অনুকরণে আপনাকে সৌন্দর্য্যের পথে লইয়া যাইতে পারে। *সাহিত্য যখন ঐ সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি না আঁকিয়া বীভৎস রসের অবতারণা করিয়া সমাজের সম্মুখে নানা কুৎসিৎ চিত্র আনিয়া ধরে, তখন তদ্দারায় পরোক্ষ ভাবে উপদেশ দেওয়াই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। উপন্যাসে এমন নরনারীর চিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে যদ্দারায় লোকে আপাতসুখের ও পাপের পরিণাম দেখিয়া প্রেমের কুৎসিৎ মূর্ত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়া তাহা হইতে অন্তরে নিজ আদর্শের সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়া লইতে পারে এবং তাহার উপাসনা করিয়া প্রকৃত সুখের পথ অনুসরণ করিতে পারে। তাহা যে না করে, সে শুধু নভেল পড়িবার জন্যই নভেল পড়িয়া থাকে। ঐ শ্রেণীর পাঠকের জন্য বর্ত্তমান উপন্যাস সাহিত্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। তাহাদিগের জন্য একমাত্র প্রত্যক্ষ উপদেশপূর্ণ সাহিত্যেরই প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালের এই বিবর্ত্তন এবং মানুষের চিন্তার অবাধ প্রসারের মধ্যে সাহিত্যকে যদি সেই একই ভাবে উপদেষ্টার আসনে বসিয়া বেত্র হস্তে শুধু 'শিশু শিক্ষা'ই পড়াইতে হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের অসীম নীলাকাশে কাব্য-সৌন্দর্য্যের অনন্ত দীপ্তিময়ী নক্ষত্রলীলা ফুটিয়া উঠিবার আশা করা যায় না। *

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

* কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাখার অধিবেশনে পঠিত।

বিধ্বস্ত

মঞ্জুমোহন কুঞ্জ বনের
কুসুম হরণ করলে কে?
কোন্ শ্মশানের পূজারী, তা দিয়ে
পূজার সাজী ভরলে রে?
বন বালাদের নোলক ছিঁড়ে
বন জোনাকীর আলোক ছিঁড়ে
কুঞ্জলতার পুলক কেড়ে
গলায় মালা পরলে কে?

লতায় লতায় বোঁটায় বোঁটায়
কুসুম শিশুদের শোকে
ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়ায়
বন জননীদের চোখে।

কুঞ্জরাণীর শ্রীগরিমায়,
বিধবা বেশ কে দিল হায়?
নিঠুর করে কঠোর হয়ে
সীথির সিঁদুর হরলে কে?

বনভূমের দীপ দেয়ালী
নিভ্‌ল কাহার নিশ্বাসে?
পর্ণবালা খোস খেয়ালী
মলয় চুমে কৈ হাসে?
'পিক পাপিয়া নীরব কাতর,
মূর্চ্ছে' পড়ে মক্ষী ভ্রমর,
ভাঙ্‌ল এমন সোনার স্বপন
কার কলুষের কর লেগে?

শ্রীকালিদাস রায়।

হেমচন্দ্র

তৃতীয় খণ্ড—নবম পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

হাইকোর্টে শোক প্রকাশ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুদ্‌গতিতে দেশময় প্রচারিত হইল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং প্রাট মহোদয়গণ আসনগ্রহণ করিলে (২৪শে মে ১৯০৩) তদানীন্তন প্রধান সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র সি-আই-ই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"I have just been informed by Babu Umakali Mukharjee that Babu Hem Chandra Banerjee who for many years practised before the Hon'ble Court and was latterly the Senior Government pleader of this court died yesterday at his residence at Kidderpore. The sad event took place yesterday at 8 o' clock in the morning and was due to fever attended with unconsciousness. The deceased was so well-known to your Lordships that it is hardly necesary to say that he enjoyed the reputation of being a successful pleader of this Court for several years. He conducted his cases with great ability. He was always fair to his adversaries and he always discharged his duties to the satisfaction of his clients. Outside the Court also he had the reputation of being a very able writer. His poems would bear comparison with the best poems of any other country and his writings show that he was possessed of independent and deep thought. His loss will not only be mourned by the members of our profession but also by the outside public. On his retirement he was not in affluent

মিরর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন

circumstances aud considering that he was suffering from loss of sight death no doubt has been a relief to him; but the loss to the country is very great."

স্যর চন্দ্রমাধব প্রত্যুত্তরে বলিলেন :—

"I need hardly say to you, Babu Ram

Charan Mitra and the other members of the High Court Bar appellate side, that we have learnt the intelligence that you have just conveyed to us with very great sorrow, and speaking for myself, I must say that I have been taken rather by surprise that Babu Hem Chandra Banerjee should have passed away so soon. His

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর

death was, no doubt, anticipated for sometime. I went to see him about three weeks ago, if I am not mistaken, and though I found him to be in a very bad condition, yet I did not think, nor did his people think that his death would come off so soon. You have referred to his abilities as a pleader and his good qualities as a man and his superior qualifications as a poet. Every word that has fallen from you finds an echo in my heart, and I have no doubt in the heart of my learned colleague. He was, if I may say so, an exceptional man. He had many virtues and the manner in which he discharged his onerous duties as a Vakil of this Court always commanded the esteem and admiration of the Judge before whom he had the honour of practising, so much so that at one time he was talked of as being one of the future Judges of this Court. His loss I have no doubt will be felt not only by the members of the Appellate Side of the High Court Bar but by all those with whom he came in contact, and I am sure his loss will be keenly felt by the literary world. We desire to offer a sincere condo lenace to the family of the deceased. It is an irreparable loss to them and I have no doubt that every one who had the pleasure of knowing Babu Hem Chandra Banerjee will sympathise with his family."

হাইকোর্টের উকীলসভার প্রযত্নে 'বীরলাইব্রেরীতে' হেমচন্দ্রের একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শোকগীতি ও শোকসূচক প্রবন্ধাবলী।

কেবল হাইকোর্টে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে হেমচন্দ্রের মৃত্যুজনিত শোকের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। মাননীয় স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম :—

"যেখানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত আছে সেইখানেই বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ অকৃত্রিম শোকের সঞ্চার করিবে। মাইকেলের

বন্ধু ও জীবনচরিত-লেখক, বঙ্কিম এবং দীনবন্ধুর সঙ্গে, স্বর্গগত কবি অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সংযোগশৃঙ্খল-স্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন। কে এমন দেশবাসী আছেন যিনি হেমচন্দ্রের কবিতার আন্তরিক অনুরাগী নহেন? যে উদ্দীপনাময়ী জাতীয় কবিতা বাঙ্গালীজাতির নিকট হেমচন্দ্রের নাম নিত্যস্মরণীয় করিয়াছে, অন্য কোন্ বাঙ্গালী কবির কোন্ কবিতা তদপেক্ষা খ্যাত ও জনাদর লাভকরিতে সমর্থ হইয়াছে? তাঁহার বিখ্যাত অগ্রগামী মাইকেলের ন্যায় স্বর্গগত কবি ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রগামীর ন্যায় ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হন নাই। পরন্তু প্রভূত সাফল্য লাভ করিয়া অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান সরকারী উকীলের ঈপ্সিত পদলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের "এই 'পাপপূর্ণ ধরা' হইতে 'চির আলোকের দেশে' বাঙ্গালার অন্ধ কবির প্রয়াণে যে হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতিগণ সময়োচিত শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন ইহা অতিশয় শোভন হইয়াছে। বঙ্গজননী শ্রেষ্ঠতম সন্তান-রত্ন হারা হইলেন। যতকাল বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন হেমচন্দ্রের স্মৃতিও উজ্জ্বল থাকিবে।"

বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমস্বরে হেমচন্দ্রের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর 'ইণ্ডিয়ান মিররে' এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম :—

"'প্রতিবাসী' 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' এবং অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্রে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেগুলিতে একটি কথা বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে, সেটি এই, যে, তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী কবিতাগুলিদ্বারা হেমচন্দ্র দেশবাসীর মধ্যে যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, জীবিত বা মৃত আর কেহই সেরূপ পারেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার 'ভারত সঙ্গীত'—যাহাতে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরব ও মহিমার সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে বর্ত্তমান অবনতির অতল গহ্বরে

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

পতিত দেশবাসীকে তাহাদের যথার্থ অবস্থা স্মরণ করিতে ওজস্বিনী ভাষায় অনুরোধ করিয়াছেন—তাহা এই প্রবন্ধ লেখকগণের মতে অমূল্য এবং স্কটের টম মুরের এবং ক্যাম্বেলের প্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতগুলির সহিত তুলনীয়। তাঁহারা একথা আরও বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে ও কাব্যরাজ্যে তিনি যে সিংহাসন শূন্য করিয়া গেলেন তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবার নহে—এবং জীবিত কবিদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যাঁহার নাম তাঁহার নামের সহিত উচ্চারিত হইতে পারে কিংবা যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালার সেই শেষ মহাকবির অদ্ভুত মহত্ত্বের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন—যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াও দরিদ্র ভিখারীর ন্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।"

এই সময়ের সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় হেমচন্দ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মাসিকপত্রাদিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এত শোকগীতি ও শোকসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমরা এইস্থলে দুই চারিটী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

সুকবি বরদাচরণ মিত্র হেমচন্দ্রের একজন পরম অনুরাগী ছিলেন। তিনি হেমচন্দ্রকে আধুনিক কবিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—উহার নাম রাখিয়াছিলেন "হৈমী"। উহার প্রারম্ভে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'নব্যভারতে' বরদাচরণ 'অন্তর্ধান' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত করেন তাহাই সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিব।

সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হেমচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি
("বসুমতী"র সৌজন্যে)

অনন্ত গম্ভীর নীল অম্বর বিদারি,
মণ্ডিত স্ফুরৎ-প্রভ তড়িৎ কেয়ূরে
বাহিরিল শ্বেতবাহু, ঝলসি নয়ন
দীপ্তি-শুভ্র বহ্নিতেজে। অদূরে যথায়
ভাস্বর তপন কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গ কাব্যাকাশে রাজে, ঢালি আলাময়
কিরণ প্রপাত. যাহে ঘুরিছে ফিরিছে
উছলি রয়েছে উর্দ্ধে চারু ইন্দ্রধনু
কল্পনার মহাবর্ত্ত, দিগন্ত আলোড়ি,
সেই দিকে গতিশীল সে প্রদৃপ্ত বাহু.
ছুটাইয়া ব্যোমউর্ম্মি স্ফুলিঙ্গরচিত।
অমনি বিমানমার্গে অশনি-নিঃস্বনে
ধ্বনিল গম্ভীর বাণী জড় বিজড়িত
প্রতিভার দীপ্ত সূর্য্য। পার না সহিতে
সৌর কলঙ্কের ভার অমঙ্গল সূচি,
কালিমা নিবিড় যাহে মূঢ় উপেক্ষার,
অকৃতজ্ঞ পূজা ব্যতিক্রমে? এস তবে,
জড় যেথা চিৎ, আর কলঙ্ক মণ্ডন।
স্তম্ভিত মরতবাসী সে রুদ্র নিনাদে।
না খুলিতে আঁখি পাতা বিহ্বলে মুদিত।
না মিলাতে প্রতিধ্বনি চক্রবাল-সীমে,
গ্রাসিল সে দিব্যহস্ত নিমেষ-মাঝারে,
দীপ্তি শতুশূল সম অঙ্গুলিতে ঘিরি
বঙ্গ কবিতার সূর্য্য। কিম্বা যেন কোন
করুণার শুভ্ররাহু গ্রাসিল তাহায়।
বঙ্গভূমিলগ্ন পদ উর্দ্ধনেত্র যত
নরনারী দেখিল সে আকাশে চাহিয়া।
সেই চিরপরিচিত উজ্জ্বল পরিধি.
কোথা এবে? কোথা সেই প্রণম্য মহিমা?
দৃশ্যমাত্র, শিথিলিত কপিশ গগনে
আকুঞ্চিত শ্বেতবাহু, অলন্ত ভয়াল,
বিধাতার স্ফুরদগ্নি ভ্রূকুটির মত।
ত্রাসিত অযুত হৃদে শোণিত প্রবাহ
সহসা থামিল, যেন আকুল আবেগে;
অনুতাপ অশ্রুযুত অযুত নয়ন;
উচ্ছ্বসিত অবরুদ্ধ অযুত কণ্ঠেতে
তপ্তশ্বাসে অর্দ্ধস্ফুট "হেমচন্দ্র কোথা!"
জানু পাতি উর্দ্ধনেত্রে যতেক পরাণী

বসিল যাচিবে বলি কাতরে করুণা।
ভয়ে, গুরু পরিতাপে, স্মৃতির দংশনে।
অর্চ্চনায় ত্রুটি-জাত কঠিন পাতকে,
প্রকট বিধাতৃ-রোষে বিরাট বিয়োগে,
যুগপৎ উদ্বেলিত যতেক হৃদয়।
কি বচনে রচিয়া সে বিবিধ বেদনা
নিবেদিবে দেবতার বেদীপাদ পীঠে,
নাহি জানে, নিরাশার ভাবাহীন মোহে,
স্থাপিত কাতর দৃষ্টি কপিশ আকাশে।
আবার জীমূত মন্দ্রে দীর্ণ নভস্তল,
করালীর জিহ্বা শতংক্রুর সৌদামিনী,
স্ফুলিঙ্গিয়া রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকান আবার,
আবার ধ্বনিল বাণী শূন্যপথ হতে,
"ভাগ্যহীন বঙ্গদেশ। ভুঞ্জিছ কি এবে
নিজকর্ম্মফলজাত পাতক যাতনা?
ক্ষরিছে কি শোণিতাশ্রু, স্রোতে গণ্ড বহি,
হৃৎপিণ্ড ফাটি ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড আঘাতে?
ধ্রুব সত্য, পরিতাপ পাপ মহৌষধ।
হেমচন্দ্র লুপ্ত নহে, লুক্কায়িত শুধু;
তব দৃষ্টিযোগ্য কভু সেই দিব্যবিভা?
নিষ্কলঙ্ক কর আঁখি; স্বার্থমুক্ত হৃদি;
ব্রত ধরি, মহাভাবে পুষ্ট করি প্রাণ,
কর তার ভক্তিপূত, অর্চ্চনা প্রবণ,
ভাবিতে নয়নে পুনঃ সেই মহাগ্রহ।
ভাস্বর তপন কান্তি হেমচন্দ্র কবি
বঙ্গের কবিতাকাশে চির জ্যোতিষ্মান।"
থামিল ভৈরব রব; নিবিল সহসা
দীপ্ত সেই শ্বেতবাহু গগন মাঝারে;
নিবিড় রজনী আসি গ্রাসিল সংসার।
মন্ত্রীভূত অন্ধকার, মসীবিন্দু হয়ে,
কলঙ্ক বরষা ঢালে বঙ্গের বদনে;
অধোমুখে, অন্ধভাবে, কৃষ্ণ ঝটিকায়,
সপ্ত দিবানিশি বঙ্গ কাঁদিল নীরবে।

সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছিলেন—

ঘুমাও মৃত্যুর কোলে, হে সিদ্ধচারণ,
ঘুমাও নিশ্চিন্তে কবি, ভারত গৌরব রবি,
ঘুমাক তোমার সনে বিস্মৃতি মগন;
ঘুমাও মৃত্যুর কোলে হে সিদ্ধচারণ।

ঘুমাও অমর কবি অনন্ত শয়নে
অনন্ত কালের কূলে কীর্ত্তি কল্পতরু মূলে,
অনন্ত নয়ন মুদে যশের স্বপনে
ঘুমাও অমর কবি অনন্ত শয়নে।

"প্রচার"-সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হায়রে নীরব বীণা কে বাজাবে আর,
তুলিবে স্বাধীন তান, গাইবে গভীর গান,
শবদেহে নব প্রাণ করিবে সঞ্চার,
হায়রে নীরব বীণা কে বাজাবে আর?

নাই হেম, জাতিপ্রেম কে শিখাবে হায়,
জন্মভূমি ক্ষীণ আশা, বুকে পুষে ভালবাসা,

একতা শিখাবে কেবা আত্ম উপেক্ষায়,
নাহি হেম, জাতিপ্রেম কে শিখাবে হায় ?

নির্ভীক হৃদয়ে হায় কে আর এমন
ভারত সঙ্গীত গানে, জাগাবে নিদ্রিত প্রাণে,
কবির গভীর রব নীরব এখন
নীরব ভারতভূমি ঘুমে অচেতন।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্রগণ

নট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু হেমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সময় রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যে অসামান্য অনুরাগ ছিল তাহাতে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপনকরা অবিধেয় বিবেচনায় আত্মীয়গণ সংবাদটি গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন : মৃত্যুর তিন চারিদিন পরে কোন বন্ধু অসতর্ক ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে সংবাদটি প্রকাশ করিয়া ফেলেন। অমৃতলালের চক্ষুতে সম্প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তিনি শয্যায় শুইয়া মুখে মুখে হেমচন্দ্রের "সৎকার" সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিয়া একজনকে লিখিয়া লইতে বলেন। সেই কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;

বল হরি হরিবোল হরি হরি বোল।
ধীরে ধীরে তোল শব কোরোনাক গোল ॥
শোয়া রে দড়ির খাটে,
নে চল শ্মশান ঘাটে,
খেলো ঠাটে ডেলো কাঠে সাজাইয়া চুলি।
মুখঅগ্নি কয়ো জ্বেলে ভিক্ষা করা ঝুলি ॥

এ নয় সে হেম যেই শামলা মাথায়।
হপ্তায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায় ॥
সন্ধ্যায় বৈঠকে যায়,
বন্ধুরা দিতেন যায়
প্রভাতে পাতিতে হাত আসিত অনাথ।
বাড়ীতে পড়িত কত হাভাতের পাত ॥

সে হেম অনেক দিন মরিয়াছে আজ,
পূজেছিল বঙ্গ যারে বলে কবিরাজ ॥
শিহরি যাহার গীতে,
ঘুম ভেঙ্গে আচম্বিতে,
শুনেছিনু কলরব বাঙালী টোলায়।
"জাগরে ভারতবাসী" বঙ্গবাসী গায় ॥

মানবের কণ্ঠে গান জন্ম দেব বরে।
শুনেছিনু সেই গান অবশ্য অপরে।
বুঝিবা জাপানে কেউ
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ,
'অসভ্য' জাপানী তাই আজি বজ্রপাণি।
পাশ্চাত্য জগৎ যত মহিমা বাখানি ॥

মধুদত্ত মৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে।
বঙ্কিম বসালে যারে দর্পে সিংহাসনে ॥
চক্ষু অর্থ নষ্ট ক'রে,
সে হেম গেছে গো ম'রে,
দুর্ভাগ্য দশায় ক'রে গ্রহদোষে ভর।
রেখেছিল দেহখানা এ কয় বছর ॥

বিধিয়ে বুঝায়ে বুঝি আজি সরস্বতী,
পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব রাখি করালেন গতি ॥
চুপি চুপি চল ভাই
ঘাটে ভুলে ঘাটে যাই,
মরা মড়া পোড়াইতে কাজ নাই গোল।
মনে মনে কাঁদ বল ধীরে হরিবোল ॥

বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রদীপে" কবিগুরু হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন ;—

হেমচন্দ্র অস্ত গেল অনন্তের কোলে
বঙ্গ কাব্যাকাশ হতে, গেল কবি চলে'
দিব্যধামে ; অন্ধতার দারুণ আঁধার
সেথা নাই, দারিদ্র্যের ভীষণ আকার
সেথা নাহি যায় দেখা। সেথা শুধু আলো,
স্বচ্ছন্দতা সুখশান্তি যত কিছু ভাল।
যাও কবি রাখি পিছে গুঞ্জরিত গানে
বাণীপদ কোকনদে, মত্ত মধুপানে।
শুনি শুনি সেই গান ভারত নিদ্রিত
যদি জাগে কোন দিন, তা হ'লে নিশ্চিত
তুমি তব স্বর্গ ছাড়ি অন্য কবিমুখে
আবার গাহিবে গান। যার সুখে দুখে
যে কবির হৃদি-তন্ত্রী করিবে ঝঙ্কার
জন্মভূমি-দুঃখাতুর তব আত্মা তাঁর।

আমরা আর একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিব। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর বহুদিন পরে প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যরচয়িতা অক্ষয়-কুমার বড়াল মহাশয়ের এই সুন্দর চতুর্দ্দশপদী কবিতাটী এইস্থানে উদ্ধৃত করা অশোভন হইবে না :—

হে কবি, হে পূজ্য কবি, চির-দুঃখিনীর
ভক্তিমান্ কীর্ত্তিমান্ কৃতজ্ঞসন্তান।
অন্ধনেত্র—আজীবন ঢালি নেত্রনীর
ক্রীতদাসী জননীর হেরি' অসম্মান।
অক্ষরে অক্ষরে তব হৃদয়-রুধির
কি গৌরবে মহাযজ্ঞে করিছে আহ্বান।
নিরাশা নির্ভীক আজ,—বিশ্বাস গভীর,
অন্ধ বর্ত্তমান হেরে ভবিষ্য মহান্।

হে দরিদ্র, একদিন ক্ষোভে শোকে দুখে
আলোড়িলে জীবনের উদ্দেশ্য অতল।
হে অমর, তব যশোমুকুট-ময়ুখে
জটিল কর্ত্তব্য আজ সরল উজ্জ্বল।
স্বর্ণ সিংহাসনে নৃপ দু'দিন জীবনে
চির প্রতিষ্ঠিত তুমি বঙ্গ-হৃদাসনে।

হেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র

স্মৃতি সভা। হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে স্মৃতিসভা আহূত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও সাহিত্য-সেবকের মৃত্যুতে এরূপ দেশব্যাপী শোকের প্রবাহ পরিদৃষ্ট হয় নাই। হেমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ আর কোনও কবি ইতঃপূর্ব্বে জাতীয় ঐক্যসাধনার্থ তাঁহার ন্যায় প্রয়াস পান

নাই বা তাঁহার ন্যায় সাফল্য লাভ করেন নাই। কলিকাতা মহানগরীতেই অনেকগুলি বিরাট শোক সভা আহূত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটি মাত্র সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিব।

নৃত্যকালী দেবী

(ক) 'সাহিত্য সম্মিলনে'র উদ্যোগে—কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩১০) ক্লাসিক থিয়েটারে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। থিয়েটার গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগমে সভা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সভাধিবেশনের প্রথমেই সুকবি বিহারীলাল সরকার রচিত একটি সঙ্গীত সুগায়ক অমৃতলাল সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক গীত হয়। তৎপরে 'সাহিত্য সম্মিলনের' স্থায়ী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের সুবিখ্যাত সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটি সুলিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। এই সভায় যোগদান করিবার জন্য তার-যোগে অনুরুদ্ধ হইয়া রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কবিবরের জীবিতকালে তাঁহার বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া মফঃস্বলের মধ্যে ঢাকায় প্রথম সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে প্রথম সাহায্য করেন। ইনিই সভাপতি পদে বৃত হন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—"কবিবর হেমচন্দ্রের পরলোকগমনে এই সভা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

প্রস্তাবক।—কবিরাজ শ্রীবিজয়রত্ন সেন।

সমর্থক। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।

শোকসমবেদনাজ্ঞাপক প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বজনসম্মতি-ক্রমে পরিগৃহীত হইবার সময় রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—"এই প্রস্তাব পরিগ্রহণকালে কবিবরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ আমাদের সকলের দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য।" সভাস্থ সকলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।—"কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন অক্ষয় রাখিবার নিমিত্ত 'হেমচন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডার' নামে একটী স্বতন্ত্র ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। এই ভাণ্ডারের অর্থসংগ্রহাদি ও কার্য্য-ব্যবস্থার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চেষ্টায় যে মহতী সভার আয়োজন হইতেছে, 'সাহিত্যসম্মিলন তাহার সহিত মিলিত হইয়া একযোগে কার্য্য করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমর্থক।—রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।

অনুমোদক। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর সভাপতি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সময়োচিত বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর বিহারীলালের আর একটি সঙ্গীত গীত হয়। সর্ব্বশেষে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে সভাপতি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে (ঢাকা হইতে আসিয়া এই সভায় যোগদান জন্য), রায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে (সাহিত্যসম্মিলনের স্থায়িসভাপতিরূপে সভার কার্য্য-নির্ব্বাহ-কল্পে সমূহ সাহায্য জন্য), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে (বিনাখরচায় মায় গ্যাসের খরচাটী পর্য্যন্ত না লইয়া তাঁহার ক্লাসিক থিয়েটারে সভার অধিবেশন-স্থান প্রদান করায়) এবং পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে (সভার কার্য্য নির্ব্বাহে যথেষ্টভাবে সাহায্য করায়) ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের সময় আর একটী সঙ্গীত গীত হয়। সন্ধ্যা ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, সভা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় নীরবে কার্য্য সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিল।

(খ) সাহিত্যসভা'র উদ্যোগে—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ (ইং ১৪ই জুন ১৯০৩) সাহিত্যসভার ৪র্থবার্ষিক ১ম অধিবেশনে ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণার্থ 'সভার' কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, কিঞ্চিৎ আলোচনার পর পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে,—

১।—কবিবরের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার গ্রন্থাদির সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ, সভার কোন অধিবেশনে পঠিত হউক ও সেই প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-সংহিতায়' মুদ্রিত হউক।

২। এই সভার পক্ষ হইতে ৺কবিবরের কোন স্মরণ-চিহ্ন সভাগৃহে স্থাপনের চেষ্টা করা হউক। পরে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ মহাশয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা সম্বন্ধে যে সকল প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইতেছে, তাহার সহিত "সাহিত্যসভার" সমবেদনা আছে।

প্রথম প্রস্তাব অনুসারে সাহিত্যসভার ৩য় অধিবেশনে (৩রা শ্রাবণ ১৩১০ ইং ১৯শে জুলাই ১৯০) রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত "বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র"-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ১৩১০ সালের 'সাহিত্যসংহিতা'য় ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে "প্রদীপে" প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধপাঠান্তে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং সভাপতি পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রত্যেকে এক একটি বক্তৃতা করেন। তৎপরে দুইটী শোক সঙ্গীত গীত হইলে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে সভাপতি, প্রবন্ধপাঠক, প্রভৃতিকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে সভাভঙ্গ হয়।

সাহিত্যসভার উদ্যোগে হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য ১৫১৯।৶১০ সংগৃহীত হয়। সাহিত্যপরিষদও একটি বিরাট সভা আহ্বান করিয়া এই উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং অনেকের ইচ্ছা হয় সমস্ত টাকা একত্র করিয়া একটী উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হয়। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ৩০০৲ চাঁদা দিয়াছিলেন। তিনি সভার অভিপ্রায়ানুসারে কবির স্মৃতিরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ টাকা পুনর্গ্রহণ করেন। এবং সাহিত্যসভা হইতে "Hem Chandra Memorial series" নাম দিয়া কতকগুলি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

(গ) 'সাহিত্য পরিষদে'র উদ্যোগে—স্বর্গীয় কবিবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি সাধারণ শোক সভার অধিবেশন হয়। সম্প্রতি পর-

লোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে সাধারণকে এই সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়।—

কলিকাতা
১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১৬ই আষাঢ়।

সবিনয় নিবেদন,—

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালা সাহিত্য অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঙ্গবাসী মাত্রই অতিশয় শোক সন্তপ্ত। আগামী ১৮ই আষাঢ় ১৩১০, ৩রা জুলাই ১৯০৩, শুক্রবার অপরাহ্ন ৬॥ টার সময় পটলডাঙ্গা, হ্যারিসন রোড চৌরাস্তার উপর ওভার টুন হলে একটি সাধারণ শোকসভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিলে অনুগৃহীত হইব ; ইতি।

বশংবদ
স্বাঃ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
৺হেমবাবুর শোক সভার
কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি।

উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে যথাসময়ে ওভারটুন হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, সি-এস-আই মহোদয় অদ্যকার সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবক—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-এস্।

সমর্থক—বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যের শোভা ও সমৃদ্ধি সম্পাদন এবং বাঙ্গালীর অবসন্ন জাতীয় জীবনে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে বঙ্গ সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, এবং সমগ্র বঙ্গবাসী শোক-সন্তপ্ত। অদ্য বঙ্গের সকল সম্প্রদায় এই সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

সমর্থক—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

তৃতীয় প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি এই সভা আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন এবং স্থির করিতেছেন যে, এই সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষর সংবলিত এই মন্তব্যের প্রতিলিপি মহাকবির পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্।

সমর্থক—বরদাচরণ মিত্র এম্ এ সি, এস্।

চতুর্থ প্রস্তাব—

মহাকবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্যে সুব্যবস্থা করিবার জন্য নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হউক এবং সেই সমিতির সদস্যগণকে প্রয়োজন মত সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—নরেন্দ্রনাথ সেন।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(সমিতির সদস্য প্রায় দুইশত গণ্য মান্য ব্যক্তির নাম এস্থলে অপ্রয়োজনীয় বোধে সন্নিবিষ্ট হইল না।)

পঞ্চম প্রস্তাব—

শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এই সভাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সভা তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

হেমচন্দ্র স্মৃতি রক্ষণ সমিতির চেষ্টায় সর্ব্বসমেত ২৪৮১।৴৫ সংগৃহীত হয়। সমিতির ব্যয় ৪৫৲৵৩ বাদে অবশিষ্ট টাকা হইতে কবির স্বর্গারোহণের অনতিকাল পরে স্বর্গগতা কবিপত্নীর শ্রাদ্ধের সাহায্যে ৫০ এবং কবিবরের আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্য ১২০০৲ এবং কবির জীবনী ও গ্রন্থসমালোচনা মূলক প্রবন্ধ (৺অক্ষয় চন্দ্র সরকার লিখিত) খরিদ বাবদ ২০০৲ মোট ১৫৬৵ ব্যয় হয়। বাকী ৫৭৫৶৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে নিম্নলিখিত সর্ত্তে প্রদত্ত হয়—অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবটী সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত করিবেন এবং বক্রী টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য রচনার জন্য "হেমচন্দ্র বৃত্তি বা পুরস্কার বা পদক প্রদান করিবেন।"

সাহিত্য পরিষৎ ১৪৮৵ ব্যয়ে অক্ষয় চন্দ্রের প্রবন্ধটি "কবি হেমচন্দ্র" নামে পরিষৎ গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া প্রকাশিত করেন এবং বাকী টাকা হইতে প্রতিবৎসর কবিবরের নামে এক একটি সুবর্ণ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মর্ম্মরময়ী প্রতিমূর্ত্তিটী অতি সুন্দর হইয়াছে এবং সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অক্ষয় চন্দ্রের গ্রন্থখানিতে তিনি কবিবরের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যে ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সাহিত্যপরিষদের ন্যায় সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া উচিত হয় নাই। উহাতে কবিবরের স্মৃতির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহা অক্ষয়চন্দ্রের অক্ষয় কলঙ্ক স্বরূপ বিবেচিত হইবে। গ্রন্থের ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পরিষৎ ছয় বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া পরে প্রকাশিত করেন। কোনও সদস্য উহা প্রকাশিত করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন কি না জানি না। অক্ষয়চন্দ্র ভূমিকার আরম্ভে লিখিয়াছেন—

"১৩১০ সালের ১০ জ্যৈষ্ঠ কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অচিরকাল মধ্যে কলিকাতায় হেমচন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি রাজা শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কবি হেমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি সেই বৎসরের মধ্যেই 'কবি হেমচন্দ্র' লিখিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করি; তিনি আমাকে ২০০ টাকা দেন। ইত্যাদি।"

আমরা যথাস্থানে অক্ষয়চন্দ্রের অন্যায় অভিমত গুলির বিচার করিয়াছি, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হেমচন্দ্রের প্রতি অন্যায়ভাবে অক্ষয়চন্দ্র যে সকল কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও রাজা প্যারীমোহনের ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কিরূপে প্রবন্ধটি পুরস্কারযোগ্য বা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া আমরা কিছুকাল পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থ হইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া রাজা প্যারীমোহনকে এই সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

"সাহিত্যসভায় অক্ষয় বাবুকে যে ২০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা তাহাদিগের নিযুক্তির Judge দিগের অভিপ্রায়ে দেওয়া হয়; আমি অক্ষয় বাবুর পুস্তক পড়ি নাই; যে সকল কথা অক্ষয়বাবুর পুস্তক হইতে আপনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হেমবাবুর অন্যায় কলঙ্ক, আমার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রবন্ধ বিচারকদিগের নাম, তাঁহারা অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবটী পাঠ করিয়াছিলেন কি না এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন সেই সাহিত্যমহারথীর রচনা সম্বন্ধে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার যোগ্য ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করাও আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

আলোচনা

"বিবাহ কি বিড়ম্বনা ?"

৪ঠা পৌষের "হিন্দুস্থান" পত্রিকায় "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিবাহ কি বিড়ম্বনা ?" আলোচনার প্রতিবাদ হইয়াছে। পত্রিকার "সোনার পাথর বাটি" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ (১) সংযমের খাতিরে বিবাহের উপদেশ দেওয়া "পাপকারণ" এবং (২) বাংলা দেশে গড়পড়তা মাসিক ২।৷৹ আড়াই টাকা ব্যক্তিগত আয়ে বিলাসিতা চরিতার্থ করার সামর্থ্য কাহারও নাই।

সহজ বুদ্ধিতে কোনও সিদ্ধান্তে আসাই লোকের উদ্দেশ্য। বাংলা দেশে সাড়ে চারি কোটি লোকের মধ্যে তিন চারি হাজার লোকের অবস্থা স্বচ্ছল, দরিদ্রের বিবাহ বিড়ম্বনা অতএব শতকরা ৯৯টি বিবাহ বন্ধ দিয়া দেশের উন্নতি করিতে হইবে ইহাই কি সমুচিত সিদ্ধান্ত ? এই ৯৯টি বিবাহ যদি পাপ হয় উহা বন্ধ দেওয়া অধিকতর পাপ নহে কি ? কাজেই এই বিবাহগুলি অবর্জ্জনীয় পাপ (necessary evil) এবং যে কোন দোহাই দিয়া ইহার সমর্থন অমার্জ্জনীয় "পাপকারণ" নহে।

বাঙ্গালীর গড়পড়তা ২।৷৹ টাকা মাসিক আয়ে বিলাসিতা করা যায় কি না ইহা বিচার্য্য। বাঙ্গালীর গড়পড়তা জীবদ্দশা অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান লেখক অবশ্য মৃত। এই গড়পড়তা ভূতের কথা কেহ মন দিয়া শুনিবেন কি না জানিনা। ২।৷৹ আড়াই টাকা আয়ে যদি ।৹ চারি আনা বিলাসিতায় ব্যয় হয় তাহা ২৫ টাকা আয়ে ২।৷৹ অপব্যয় অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। বিগত ২০।৩০ বৎসরে জীবন যাত্রার পরিমাপ (Standard of living) অনেক বাড়িয়াছে। যে শ্রেণীর লোকেরা জুতা পায়ে দিত না, জামা গায়ে দিত না, গাড়ি ঘোড়া করিত না তাহারা এখন ঐ সকল করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যাহার এক যোড়া জুতা থাকিত, এখন তাহার এক দুই যোড়া চটি ও সু আছেই, ঐ সঙ্গে এক যোড়া বুট কি পম্প, অভাব পক্ষে টেনিস সু বা নাগরা জুতা আছে। একটি সার্ট যাহার চলিত তাহার এখন সেই সঙ্গে একটি কোট, গেঞ্জি বা ফতুয়া একটী, ও পাঞ্জাবী একটি, অবশ্য প্রয়োজন। চিঁড়া, মুড়ী মুড়কী জলপানের সঙ্গে সন্দেশ লুচি কচুরী চলিত, এখন চপ, কাটলেট পোলাও প্রভৃতি দৈনিক জলযোগ। বাইসাইকেল, হার্ম্মোনিয়ম, গ্রামোফোন সহরে দুইটী চারিটী দেখা যাইত, এখন উহা ঘরে ঘরে। তাহার উপর টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখা, বায়স্কোপ, মোটর কার আছে। এ সকল অবাধ ভোগের নাম বিলাসিতা দিলেই সেই ক্ষুধাতুর ম্যালেরিয়া পীড়িত দরিদ্র পল্লীবাসীর দুঃখে অশ্রুপাত হয়। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় গড়পড়তা করিয়া যখন বলেন পূর্ব্বে মাসিক ২ টাকা স্থলে এখন ২।৷৹ টাকা মাসিক আয় হইয়াছে, ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, প্রজা সুখে আছে, তখন আমরাই প্রতিবাদে মুখর হই যে গড়পড়তা ধনবৃদ্ধি সাধারণের সুখবৃদ্ধি প্রমাণ করে না। সেইরূপ গড়পড়তা আয়ে বিলাসিতার অসামর্থ্য প্রমাণ হয় না। এক মহাত্মা গান্ধী ভিন্ন আর কোন ভারতবাসী দেশের দারিদ্র্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া সেই অনুপাতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নিয়মিত করিয়াছেন কি ? বাঙ্গালী একজনও নহেন, বরং বিলাস ব্যসনে বাঙ্গালী অপর ভারতবাসীকে হারাইয়াছে। মহাত্মার দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি, স্বার্থকতা বুঝি না। যদি তাঁহার দৃষ্টান্তে আড়াই টাকা আয়ে সকলকেই চলিতে হয়, তবে দেশের ধনবৃদ্ধির প্রয়োজন নাই, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে সকল দরিদ্রের অভাব মোচন হইবে। তাঁহার এই আদর্শ দেশবাসীর কষ্টের নমুনাও নহে, কারণ এই গড়পড়তা অবস্থা অপেক্ষা অধিক দৈন্য অনেক দরিদ্রের আছে। অপর কেহ গড়পড়তার দোহাই দিলে যেন ভূতের মুখে রামনাম শুনায়। দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, তাহাতে দরিদ্রের কিছু সুবিধা হয় নাই। আধুনিক ধনের ব্যবহারে গড়পড়তা ধনবৃদ্ধিতে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বাড়িয়া যায়। ধনীর উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি হইতেছে, দরিদ্র কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্রের দুঃখের প্রতিকার কি হইতে পারে তাহা সোসিয়ালিষ্ট, বলসেভিষ্ট প্রভৃতি বিজ্ঞগণ ভাবিতে থাকুন। কতদিনে যে মীমাংসা হইবে বা স্বরাজলাভে অর্থকষ্ট ঘুচিবে তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা হাল ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া আপাতমধুর সুখান্বেষণে, বিলাসিতার ধ্বংস পথে অগ্রসর হইতেছি। পরিচ্ছন্নতার দোহাই দিয়া প্রসাধন ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর, দেহরক্ষার দোহাই দিয়া ভোজনে বিলাসিতা, স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া কলেজ, আফিস বন্ধে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি দেশভ্রমণ পক্ষে ২।৷৹ টাকা আয়ই পর্য্যাপ্ত।

ছেলেদের স্কুল কলেজে শিক্ষা দেওয়া অনেক সময় অভিভাবকের প্রচ্ছন্ন বিলাসিতা। মেয়েদের শিক্ষা বিবাহ বাজারের চাহিদা অনুসারে হইয়া থাকে। বিলাতে সাধারণতঃ মেয়েদের যেমন একটু লেখাপড়া, গৃহস্থালী, একটু নাচগান শিখাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করা হয়, এখানেও তাহাই। স্ত্রীশিক্ষা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে, যত অধিক হয় ততই মঙ্গল এবং উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা না হওয়াপর্য্যন্ত বর্ত্তমান প্রণালীতে ইহার প্রসার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছেলেদের বেলা—হয়ত ক্লাস প্রমোশন পায় নাই, ম্যাট্রিকুলেসন ফেল হইতেছে,তবুও তাহাকে ভদ্রসমাজোপযোগী করিবার জন্য পড়িতেই হইবে; স্বজন ও প্রতিবেশী বাহবা দিবে। ছেলেটীর পড়াশুনায় বিরাগ, অবহেলায় ও যে কুসঙ্গে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছে তাহার খরচা অবাধে চলিতে থাকে, অবশেষে কুক্রিয়াশক্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। উচ্চশিক্ষা দুর্ম্মূল্য, তাহার কৈফিয়ৎ এই যে সকল অল্পসংখ্যক ছাত্র প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী তাহারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করুক। এ তথ্য অবহেলা করিয়া সকলেই ছেলে পড়াইতে ব্যস্ত। ফলে অর্থনাশ ও সময় নষ্ট। পত্র লেখা বা হিসাব রাখা শিখিতে পাঠশালাই যথেষ্ট,যদিও তাহা অত্যল্প বিদ্যা। তদ্‌ব্যতীত উচ্চশিক্ষা সাধারণের প্রকৃত কল্যাণকর কি না সন্দেহ। আবার অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। কিন্তু কোন ভদ্রলোকের বা তাঁহার অনুচিকীর্ষু ভদ্রেতর ব্যক্তির সন্তানের যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া উচ্চশিক্ষার বা অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সৎসাহস আছে? উচ্চশিক্ষা আর অর্থকরী নহে accomplishment বা অলঙ্কার বিশেষ—সাধারণ জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। শিল্প শিক্ষার সুযোগ না থাকিতে পারে, ব্যবসায় শিক্ষা অনায়াস সাধ্য কিন্তু স্কুল কলেজের নেশা প্রবল অন্তরায়। উহার উপর Mass Education বা সার্ব্বজনীন শিক্ষার কথা উঠিয়াছে। ইহাকে কি করিয়া শিক্ষা বলা যায়? জানিনা। শিক্ষা বলিতে যে শিক্ষা তাহাতে রুচি প্রবৃত্তি প্রভৃতি মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হওয়ার কথা হয়ত হইবে, তবে দারিদ্র্য যে ঘুচিবে না ইহা নিশ্চয়। বরঞ্চ বিলাসিতা বর্জ্জনে আজই ব্যক্তিগত অর্থস্বচ্ছলতা দূর হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ব্যয়সঙ্কোচে বদ্ধপরিকর। যে পাশ্চাত্যের আদর্শে বাংলা সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানে উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ভবিষ্যজীবনের সংস্থান (Competence) —বিবাহিত পুত্রের স্বাবলম্বন। প্রত্যেক দম্পতি স্বতন্ত্র পরিবার ই আদর্শ: বাঙ্গালীর উপার্জ্জন বর্ত্তমান ভোগের জন্য, তে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বাধীন, অথচ পুত্রের উপার্জ্জনের ভাগ প্রাপ্তির আশা করিয়া ছেলে পড়াইতে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা যত পূর্ব্বে জানিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। এই সকল বিলাসিতা আছে ও তাহার বর্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীচন্দ্রশেখর রায়।

চিতোরের রাণা সমর সিংহ।

পৌষের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে (৪৪৮ পৃঃ) শ্রীযুক্ত কামিনী বাবু চিতোরের রাণা সমর সিংহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি পারিলাম না। বহুকাল রোগে ভুগিয়া এখন চাকরী ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইব ভাবিয়া মাস দুই পূর্ব্বে আমার নিজের পুস্তকগুলি স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছি, কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ আলোচনা করিতে সাহস হয় না। তবে আমি সন্ধান দিতে পারি, কোনও বড় লাইব্রেরী নিকটবাসী পাঠক অনুগ্রহ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিলে মানসী পাঠকদের কৌতূহল দূর হইতে পারেন।

রাসোতে যে সত্য কথা কিছুই নাই এমন কথা বলা অন্যায় হইবে। তবে বড় জোর এক আনা কি দুই আনা সত্য কথা থাকিতে পারে। এরূপ পুস্তকের ঐতিহাসিক মূল্য নাই। গত ১৮৮৫।৮৬ সালে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী রাসো প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬।৮৭ সালে রাজপুতনার একটি পণ্ডিত (নাম মনে নাই, তবে তিনি পশ্চিম ভারতবাসী ব্রাহ্মণ) আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত সমালোচনা ৮৭ সালের সোসাইটির জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি রাসোর ভাষা ও নানাস্থানের অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ পুস্তকখানি শাজাহানের সময়ে লেখা হইয়াছে এবং সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে জীবিত ছিলেন। আজমীর মিউজিয়মের বর্ত্তমান কিউরেটর শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা কাশীর একখানি মাসিকে কয়েকটী মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণ করিয়াছেন যে চিতোরে এক জন মাত্র সমর সিংহ রাণা হইয়াছেন, তাঁহার কয়েকটী দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। ওঝা মহাশয় এই দানপত্রগুলি এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকাতে ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হয়। তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের লোক, অতএব পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি বা সমসাময়িক হইতে পারেন না। রাজপুতনায় ১৮৮৭ সালের আপত্তিকারকের মতে চোহানদের কোন ভাট কবি চোহান মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য এই চোহান রাজকন্যার সহিত রাণার বিবাহ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার আপত্তির উপর অন্য বড় বড় পণ্ডিতেরাও মত দিয়াছেন। এসকল প্রতি-

বাদের কলে সোসাইটী রাসো ছাপা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ হয় ইণ্টর সাহেবেরও কিছু মতামত ঐ জর্ণালে ছাপা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ যুগের ইতিহাস একমাত্র রাসের উপর নির্ভর করিয়াছে, এখন আবার অনুসন্ধান করিয়া নূতন ভাবে লিখিতে হইবে।"

কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা রাসো প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল কথা লইয়া তর্ক করিয়াছেন। কিন্তু বলেন যে তাঁহাদের কাছে ৩।৪ শত বৎসর পুরাতন রাসো আছে এবং প্রমাণ আছে যে একবার এক বিশেষ সভা করিয়া সম্রাট্ অকবর রাসো ও আলুহা শুনিয়াছিলেন। অকবর যে গান শুনিয়াছিলেন সেই খানিই যে আধুনিক রাসো তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কাশীর শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস বি-এ লিখিয়াছেন তিনি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে একখানি পুথি পাইয়াছিলেন তাহার নাম "চন্দবরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসো" কিন্তু পড়িয়া দেখিলেন সেখানি পৃথ্বী রাসো হইতে পারে না। এখন সেই পুস্তকখানি তিনি (নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে) "পরমাল রাসো" নাম দিয়া ছাপিয়াছেন। কারণ পুস্তকে পৃথ্বীরাজ ও মহোবার চন্দেল পরমালের যুদ্ধের কথা ও আল্হার বিস্তারিত কথা আছে। এরূপ পুস্তকের নামও যখন "চন্দবরদাইর পৃথ্বীরাজ রাসো" হইয়াছে, তখন যে পুস্তকখানি পৃথ্বীরাজ রাসো নামে চলিত সেখানি কাহার এবং কবেকার লেখা কে বলিতে পারে?

চলিত "রাসো" একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্য হিসাবে তাহার স্থান অতি উচ্চে, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। সমর সিংহের যখন দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, আর সেগুলি প্রায় এক শত বৎসর পরের, তখন তাঁহাকে পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি বলা অন্যায় হয়।

কোনও পাঠক অনুগ্রহ করিয়া ১৮৮৭ সালের (কিম্বা ৮৮ সালের) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল দেখিয়া আলোচনা করিলে বাধিত হইব। আমি পুস্তকাভাবে পারিলাম না বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

পেটেণ্ট ঔষধ

(গল্প)

সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মীরগঞ্জ সহরের উত্তর ভাগে একটি নাতিক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর সম্মুখে ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া একখানি বিবর্ণ ভাড়াটীয়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মধ্য হইতে অনুমান পঞ্চবিংশতী বর্ষীয় একটী যুবক ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিল। ফটকের পাশেই ছোট একটি ছেলে কোলে লইয়া একজন হিন্দুস্থানী চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয় বাবুকা কুঠী হ্যায়?"

চাকরটি বলিল, "হাঁ।"

"উকীল প্রিয় বাবু?"

চাকরটি এবার ডবল "হাঁ" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিল। আগন্তুক যুবকটী তখন ফটক পার হইয়া উঠানের দিকে অগ্রসর হইল।

সম্মুখস্থ কক্ষটীতে একখানি তক্তপোষের উপর শতরঞ্চ বিছানো ছিল, তাহার মধ্যস্থলে একটী পিতলের থালার উপরে একটী কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই সম্মুখে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বুকে একটি তাকিয়া দিয়া উপুড় হইয়া একখানি 'ল জার্ণ্যাল' দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে একখানি সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়া কি লিখিয়া লইতেছেন। ইনিই প্রিয় বাবু—সম্পূর্ণ নাম প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন উকীল, মাত্র তিন মাস মীরগঞ্জে আসিয়াছেন, ইহারই মধ্যে বেশ একটু সুনাম অর্জ্জন করিয়া ফেলিয়াছেন।

যুবকটি ঘরে ঢুকিবামাত্র প্রিয় বাবু একটু চমকিয়া উঠিয়া সম্মুখে চাহিয়াই বলিলেন, "আরে অবিনাশ যে, এসো এসো। খবর সব ভাল ত? এই পশুদিন তোমার চিঠি পেলাম। ছোট বকুলীদের এটেটে

নায়েবী পাবে লিখেছিলে, শুনে তো আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছে। বাঃ বেশ ছোকরা, বাহাদুর ছোকরা! নিজের চেষ্টায় এত অল্প বয়সে নায়েবী যোগাড় করা অল্প কথা নয়। বেশ হয়েছে! তা আমাদের ভুলে থেকো না যেন। ছোট বক্সীদের জমীদারীর বড় বড় মৌজাগুলো এই মীরগঞ্জ সবডিভিজনেই, সেটা যেন ভুলে থেকো না। বুঝলে তো? আর জমীদারী কাযে উকিল আর পুলিস এই দুইয়ের সঙ্গে হৃদ্যতা করার সুফল যে কত—"

প্রিয় বাবু এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা মুখস্থ পড়া বলার মত বলিয়া গেলে, অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর বেশ ভাল আছে ত? মীরগঞ্জের জল হাওয়া শুনেছি ভাল।"

প্রিয় বাবু "ল জার্ণ্যাল" ও হাতের কাগজখানি রাখিয়া বলিলেন, "খুব ভাল জল হাওয়া, এক্সেলেণ্ট একেবারে। আমি ত এই তিন মাস সবে এখানে এসেছি, তা বল্লে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না অবিনাশ, সেদিন ষ্টেশনে গিয়ে ওজন হয়ে দেখলাম যে এই তিন মাসের মধ্যেই সাড়ে সাত সের ওজনে বেড়েছি!"

অবিনাশ খুব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "অঁা! বলেন কি, তিন মাসে সাড়ে সাত সের! খুব ইমপ্রুব করেছেন তো!"

প্রিয় বাবু নিজের স্বাস্থ্যোন্নতি ও মীরগঞ্জের জলবায়ু সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, কবে থেকে বাহাল হলে ওখানে? একেবারেই পাকা নায়েবী পোষ্ট পেয়েছ তো? না এখন দিনকতক একটিনি করতে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "আজ্ঞে কৈ আর চাকরি পেলাম! সেই জন্যেই ত আপনার কাছে এসেছি। বেটারা পাঁচ হাজার টাকা জামিন চায়!"

পর মুহূর্ত্তেই অবিনাশ যে কি কথা পাড়িবে তাহা অনুমান করিয়াই প্রিয় বাবুর মুখখানি গম্ভীর হইয়া গেল। ল জার্ণ্যাল ও সেই কাগজখানি পুনরায় উঠাইয়া লইয়া পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলি হিজি বিজি লিখিতে লিখিতে খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলিলেন, "হুঁ খুব মুস্কিল তো দেখছি তা হলে।" বলিয়াই অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে বইখানির কয়েকটি পাতা অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যেই উল্টাইয়া ফেলিলেন।

অবিনাশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "চাকরি বাকরি তো সুবিধে হয়ে উঠলো না। তাই মনে করছি আর ও সব চেষ্টা না করে, একটা ব্যবসা ট্যাবসা করবো।"

প্রিয় বাবু হাসিলেন। বলিলেন, "বেশ ভাল কথা, বলিয়াই সেই বইখানি চোখের অত্যন্ত নিকটে ধরিয়া খুব মনোযোগের সহিত একটী বিশেষ অংশ দেখিতে লাগিলেন।

অবিনাশ বলিল, "আজ্ঞে সেই জন্যেই ত আজ এলাম আপনার কাছে। একটা উপায় স্থির করেছি। এইবার আপনাকে একটু হেল্প করতে হবে।"

প্রিয় বাবু হাসিয়া বলিলেন, "উকীলের হেল্প! সে কি কথা হে? কি উপায় ঠাউরেছ বল দেখি? চুরি জুচ্চোরি নয় তো?"

অবিনাশ জিভ কাটিয়া বলিল, "পাগল হয়েছেন! সে সব কিছুই নয়। চাকরীতে তো আর কিছুই হল না,—তাই মনে করেছি যে এবার গোটাকতক পেটেণ্ট ওষুধ তৈরী করে, বাজারে বের করবো। এই ধরুন না কেন একটা জ্বরের ওষুধ, একটা সালসা, একটা হজমী, হলো বা একটা সুগন্ধি তেল, এই রকমের কতকগুলো করে, পাঁজিতে খুব করে বিজ্ঞাপন দেবো, ওষুধের সঙ্গে ২।১টি উপহারও দেব, তখন দেখবেন এই অবিনাশ চাটুয্যের অবস্থা কি রকম ফিরে যায়। কলকাতায় দেখে এলাম মশাই, এই রকমের ওষুধ হাজার হাজার রয়েছে, কেবল বিজ্ঞাপনের জোরেই কেটে যাচ্ছে।"

প্রিয় বাবুর মুখের হাসির রেখা তখনও মিলায় নাই। তিনি বলিলেন, "তা মন্দ নয় বেশ। এই

রকম চাই বই কি!" বলিয়া "ল জার্ণ্যাল"খানি আবার তুলিয়া ধরিলেন।

অবিনাশ বলিল, "ও বইটই এখন রাখুন মশাই। আমি এলাম এতদূর থেকে; আমাকে একটি পরামর্শ দিন।"

প্রিয় বাবু বলিলেন, "এর আর পরামর্শ কি দেব? বেশ তো, করতে পার, খুব ভাল। তবে জুচ্চুরি টুচ্চুরির দিকে যেন যেও না।"

অবিনাশ বলিল, "না সে সব কিছুই নয়। বড় বড় ডাক্তারদের কাছ থেকে খানকতক প্রেসৃক্রুপ্সন যোগাড় করেছি, বিজ্ঞাপনও ছাপিয়ে ফেলেছি। এইবার কতকগুলো প্রশংসা পত্র যোগাড় করা দরকার। এই দেখুন বিজ্ঞাপনগুলো আমার পকেটেই রয়েছে—" বলিয়াই অবিনাশ জামার পকেট হইতে কতকগুলি ছাপান কাগজ বাহির করিয়া প্রিয় বাবুর সম্মুখে ধরিল।

কাগজগুলি তুলিয়া হইল, প্রিয় বাবু দেখিলেন প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা রহিয়াছে—

"অসম্ভব সম্ভব হইল এতদিনের পর বঙ্গবাসীর প্রকৃত অভাব ঘুচিল।

প্রাচ্যের সহিত প্রাতীচ্যের সংমিশ্রণ!

অদ্ভুত আবিষ্কার!!!

মহাযুদ্ধ! মহাযুদ্ধ!! মহাযুদ্ধ!!!

বৃটিশে জার্ম্মানে নয়, ফ্রান্সে জার্ম্মানে নয়, রুসিয়া জাপানে নয়। এবার যুদ্ধ কাহার সহিত কাহার জানেন?

ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে—স্বামীতীর্থানন্দের আবিষ্কৃত

জরামৃত! জরামৃত!! জরামৃত!!!

বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ উপাদানের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ!

ইহা সেবনে ইত্যাদি ইত্যাদি—"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই প্রিয় বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তীর্থানন্দ স্বামীটী আবার কে?"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "আপাততঃ আমি নিজেই। কি আর করা যায় বলুন, অবিনাশ চাটুয্যের ওষুধ বল্লে তো আর কেউ হঠাৎ কিনতে আসবে না। কাযেই স্বামীজি হতে হল।"

প্রিয় বাবু কোন কথা না বলিয়া দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটি উল্টাইতে লাগিলেন—

"বিজ্ঞানের সঙ্গে যাহা কল্পনার অতীত, তাহাও হইল, পঙ্গুও বুঝি এইবার গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল।

দূষিত শোণিত শোধনের এমন ঔষধ এই প্রথম ও এই শেষ—স্বামী তীর্থানন্দের বহু গবেষণার ফল

ব্লডোল! ব্লডোল!! ব্লডোল!!!

ইহার এক এক বিন্দুর মূল্য এক এক ঘড়া মোহরের চেয়েও অধিক। এক শিশি ব্লডোলের ভিতর যাহা আছে তাহার দাম দেবীচৌধুরাণীর গুপ্ত ধনের অপেক্ষা শতগুণ বেশী।

সাবধান! ইহারই মধ্যে আবার দুর্ব্বৃত্তগণ ইহার জাল আরম্ভ করিয়াছে। প্যাকেটের উপর "স্বামী তীর্থানন্দ" এই দুইটি কথা বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন, নচেৎ ঠকিলে আমরা দায়ী নহি।

ইহার উপর আবার উপহার। উপহারের মত উপহার! একেবারে উপহারের আমোদর বন্যা!!

যিনি তিন শিশি ঔষধ এক সঙ্গে ক্রয় করিবেন, তিনি কি উপহার পাইবেন জানেন কি?—

সেই কল্পনা উদ্যানের ফুটন্ত পারিজাত, সেই সৌন্দর্য্য যাহা পুরাতন হইয়াও চির নূতন, যাহার ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে বসন্তের মলয় হিল্লোল, সেই গন্ধর্ব্ব দুর্গের বিজয় বৈজয়ন্ত, রস সাম্রাজ্যের ইউনিয়ন জ্যাক, সেই চির আদরের চির আকাঙ্ক্ষার "আরব্য রজনী!!!"

এই সকল বর্ণনার নীচে একটি ছবি ছিল, তাহাতে একজন বিপুলকায় ব্যক্তি দুইটি হাত উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং দুই হস্তের উপর দুইটি প্রকাণ্ড হস্তী শুঁড় উঁচু করিয়া আছে।

তাহার নীচে লেখা "ব্লডোল সেবনের ফল দেখুন! ধন্য বিজ্ঞান, ধন্য তোমার অদ্ভুত কৌশল, ধন্য তোমার অসীম শক্তি, আর ধন্য তোমার আবিষ্কারক স্বামী তীর্থানন্দ!"

প্রিয় বাবু হাসিয়া কাগজখানি অবিনাশের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। তা, এখন আমাকে কি করতে বলছো?"

অবিনাশ বলিল, "সবই আমি ঠিক করেছি, কিন্তু খালি বিজ্ঞাপনে ত আর লোকের মন ভুলবে না, কতকগুলো প্রশংসাপত্র চাই। আমি খানকতক যোগাড় করেছি, কিন্তু আপনাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিতেই হবে।"

প্রিয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কি হে? আমি আবার কি প্রশংসাপত্র দেব?"

অবিনাশ বলিল, "এই, সকলেই যে রকম লেখে সেই রকম আর কি। ঐ যে তখন বল্লেন যে সেদিন ওজন হয়ে দেখলেন এই তিন মাসে সাড়ে সাত সের বেড়ে গেছেন—সেইটেই উল্লেখ করে দুই লাইন লিখে দিন না যে আমার ব্লডোল খেয়েই আপনার ওজন বেড়েছে। এইটুকু অনুগ্রহ আমাকে করুন। আপনি যদি একটু আমার উপকার না করেন তা হলে আর কার কাছে দাঁড়াব বলুন?"

অবিনাশের কাকুতি মিনতিতে প্রিয় বাবুর মন ভিজিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া অবিনাশের উক্তিমত দুইখানি প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে অবিনাশ চলিয়া গেল।

২

শ্রীদাম সরকার নামধারী এক ব্যক্তি প্রিয় বাবুর মুহুরী ছিল। সে একদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়া তাহার পিসীমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সে বার তুমি তোমার কার কথা বলছিলে ভাল? কে তোমার টগরফুলের বোনপো না কে ছেলেটী—"

পিসী বলিলেন, "টগরফুল নয় রে পাগল, বেগুনফুল। কি হয়েছে রে' ছিদেম? বেগুনফুলের বোনপোর কোন ভালমন্দ হয়নি তো? আহা! ষাট্ ষাট্ ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, বেঁচে থাক তবু ঘর আলো করে। ছেলেটী আজ ঝাড়া ছুটী বছর—আহা আমার বেগুনফুল—"

শ্রীদাম বলিল, "ম্যালেরিয়া জ্বর তো?"

পিসী বলিলেন, "শুধু জ্বর? তার সঙ্গে পিলেটা তো একেবারে গলায় গলায় হয়েছে। কত ওষুধ বিষুধ—"

শ্রীদাম বলিল, "ব্যস্ আর ভাবনা নেই পিসী। এইবার একটা ওষুধ যা বেরিয়েছে, তার নামটা কি জান পিসী—জ্বরামৃত—আঃ অমোঘ তো অমোঘই বটে। অন্য লোক হলে আমি বিশ্বাস করতাম না কখনও, কিন্তু স্বয়ং আমাদের উকীলবাবু মশাই সেই ওষুধ খেয়েই ছাপার অক্ষরে তাতে লিখে দিয়েছেন যে এমনি ওষুধ যে আর বলবার নয়। তাই খেয়ে তিনি তিন মাসে সাড়ে সাত সের ওজনে ভারী হয়েছেন। শুনলে পিসী?"

পিসী বলিলেন, "বাবা, উকীল মিন্সের গতর আগেও তো কম ছিল না!"

শ্রীদাম বলিল, "গতর কি আর আগে ছিল পিসী? সেই ওষুধ খেয়েই হয়েছে। তাই বলছিলাম যে সেই ওষুধ একশিশি আনিয়ে তোমার টগর—"

"বেগুনফুলের বোনপো।"

"হ্যাঁ সেই বোনপো ছোঁড়াকে খেতে দাও। দেখবে আধ শিশি খেলেই, পিলে টিলে সব ফেটে কাঁকুড়ফাটা হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি পিসী—ছেলেটা সেরে গেলেই, কিন্তু আমাকে জানাতে হবে, আমি একখানি প্রসংশাপত্র লিখে তাঁদের দেব। তখন দেখবে এই যে ছিদাম সরকার—এর নামে ছাপার অক্ষরে কাগজে বেরিয়ে যাবে।"

পিসী অবাক হইয়া গেলেন। শ্রীদাম যে উকীলের মুহুরীগিরি করিয়া কিরূপ 'নায়েক' হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভাবিয়াই বৃদ্ধা গর্ব্ব অনুভব করিলেন। সুতরাং শ্রীদামের কথানুযায়ী সেই দিনই তাঁহার বেগুনফুলের বোনপোর জন্য "জ্বরামৃতের" অর্ডার দেওয়াইবার সম্মতি-দান করিলেন।

৩

প্রিয়বাবুর শরীরের ওজন বাড়ুক আর না বাড়ুক, কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই অবিনাশের শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। তাহা যে "জরামৃত" বা "ব্লডোল" সেবনের ফল তাহা নহে, সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দেহের উক্ত পরিবর্ত্তন তাহার আর্থিক অবস্থা পরিবর্ত্তনেরই ফল।

চিৎপুর রোডের নিকটেই একখানি ঘর ভাড়া করিয়া অবিনাশ ওরফে তীর্থানন্দস্বামী তাহার পেটেণ্ট ঔষধের 'কারখানা' খুলিয়া এই কয়েক মাসের মধ্যেই প্রত্যহ অনেক গুলি পার্শেল্ মফঃস্বলে চালান করিয়াছে। এখন নিজে ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাহার ক্লান্তিবোধ হয় বলিয়া, নিজের দেশ হইতে একটী নিরক্ষর কায়স্থ সন্তানকে আনিয়া তাহাকে কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা দিতেছে। "জরামৃত," "ব্লডোল" প্রভৃতি অমৃতভাণ্ডগুলি এখন সেই ছোকরার দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবিনাশ কেবল ভিঃ পির হিসাব লইয়া আর গড়ের মাঠে হাওয়া খাইয়া অথবা থিয়েটার দেখিয়া কাটায়।

দিনগুলি যখন এইভাবে বেশ কাটিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশ তাহার দেশ হইতে তাহার জেঠাইমার এক পত্র পাইল।

পত্রখানিতে জেঠাইমা নিয়ত ৺স্থানে তাহার কুশল প্রার্থনা করিয়া নানা কথার পর জানাইয়াছেন যে, শ্রীমান পাঁচু বাবাজীবন দীর্ঘকাল ধরিয়া 'মালোয়ারি' জ্বরে ভুগিয়া একেবারে 'অস্থি-চর্ম্ম-অবশেষ' হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সংপ্রতি কয়েকদিন যাবৎ তাহার অবস্থা এমনই হইয়া পড়িয়াছে যে পত্র পাঠ মাত্র বাড়ী রওনা না হইলে বুঝি বা এ জন্মের মত পাঁচুধনকে আর দেখিতে পাইবা না। আসিবার সময় অবশ্য অবশ্য কিছু বেদানা আনিবা, এবং ফতাই মণ্ডলের জন্য একটী হারিকেন লণ্ঠন, ও আধসের 'কিছ্ মিছ্' আনিবা।

পত্রখানি পাইয়া অবিনাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। পাঁচু নামধারী এই বালকটীকে, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহারই হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি শিশুটীকে সে নিজের সন্তানের মতই প্রতিপালন করিতেছিল, এবং তাহার প্রতি তাহার যে স্নেহের একটী ধারা ছিল, তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না।

তখন ভাদ্র মাস। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার এ সময়ে পূর্ণ প্রকোপ। সুতরাং জ্বরের ঔষধগুলি বিক্রয়ের প্রশস্ত সময়। সে কারণ অবিনাশকে একটু ইতস্তত করিতে হইল। অবশেষে তাহার কম্পাউণ্ডার ছোকরা-টীকে নানা উপদেশ দিয়া, পোষ্ট আফিসের ভিঃ পিঃ গুলি যাহাতে কয়েকদিন ধরিয়া রাখা হয়, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, অবিনাশ একদিন লণ্ঠন, বেদানা ও কিস্‌মিস্ লইয়া দেশে রওনা হইল।

৪

জেঠাইমা তো আছাড় খাইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এসেছিস্ বাবা, তুই এলি না ধড়ে প্রাণ এলো বাবা। ঐ ঘরে শুয়ে রয়েছে পাঁচুধন, ওকে রক্ষে কর।"

অবিনাশ অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকমটী হয়েছে বল দিকিনি জেঠাইমা? কোন গুরুতর নাকি? পিলে ফিলে বেড়েছে বুঝি? যে রকম চিঠি তুমি লিখেছিলে, আমি তো সারা রাস্তাটা দুর্গানাম জপতে জপতে আসছি।"

জেঠাইমার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী দুই এক জন আসিয়া উপস্থিত হইল।

জেঠাইমা সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর —আর বলিসনে বাবা সে কথা। ফেলারাম ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খেয়ে তো বাছার আমার 'পিত্তি' জল হয়ে গেল। এমন সময় ও গাঁয়ের আমার দিদির বেগুনফুলের ভাইপো, সে একটা কেও কেটা নয় রে বাবা, একেবারে জেলার কোন বড় উকিলের বড় মুহুরী—সেই এসে দিদির বেগুন ফুলের কাছে সব শুনে বল্লে যে কলকাতায় নাকি খুব ভাল একটা ওষুধ উঠেছে, আর সেই উকীল মুখপোড়া নাকি খেয়ে বলেছে যে অমন ওষুধ আর

ভূভারতে নেই—সেই ওষুধ একে খাওয়াও, সব সেরে যাবে। তা বল্লে না পিত্যেয় যাবে অবিনাশ, জিজ্ঞেসা কর বরং এই ফাম মিত্তিরকে—ওকে দিয়ে কোলকাতায় চিঠি লিখে তো ওদের কাছারীর ঠিকানায় এক শিশি সেই অষুধ মত্তে পড়ে আনালাম। আমিই না হয় মেয়েমানুস, সাতেও থাকি না পাঁচেও না, কিন্তু ফাম মিত্তির, তুই তো বাবু কাছারীর গোমস্তা, তোরও কি আক্কেল নেই?"

শ্যাম মিত্র নামধারী এক ব্যক্তি বলিল, "বাঃ আমার কি দোষ হল? তুমি আনাতে বল্লে! তোমার দিদির বেগুন ফুলের সেই কাগজখানা আমাকে দিয়ে খোসামোদ করলে, তাই তো আনিয়ে দিলাম। পাছে তোমাদের ঠিকানায় আনালে তাজা ওষুধ না দিয়ে খারাপ ওষুধ দেয়, সেই জন্যে আমাদের কাছারীর ঠিকানায় আনালাম। আর আমারই কি না দোষ হল? কলিকাল কি না!"

অবিনাশ বাধা দিয়া বলিল, "যাক্ যেতে দাও হে শ্যাম। তার পর কি হল শুনি?"

জেঠাইমা বলিতে লাগিলেন, "তার পর আর কি শুনবি বাবা! দু দাগ সেই ওষুধ খাওয়াইতেই ছেলে একেবারে 'টঙ্কার' ছেড়ে যায় আর কি। একেবারে কালী মুত্তি হয়ে গেল। মরি ত তখন চীচ্‌কার ছেড়ে কেঁদে—তখন কোথায় সেই ফ্যালারাম ডাক্তার—সে তখন মাঠে ধান নিরুচ্ছিলো, হাতে পায়ে ধরে, ব্যগস্তা করে ত নিয়ে আসি তাকে। সে বল্লে যে ওগো, একেবারে যে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলছো ছেলেকে—"

অবিনাশ বিস্ময়ের সহিত বলিল—"কি জেঠাইমা? কি ওষুধ হে শ্যামলাল?"

শ্যামলাল বলিল, "সে এক নতুন ওষুধ, এই পাঁজিতে টাঁক্তিতে সব জায়গাতেই তাদের বিজ্ঞাপন—একজন মস্তবড় স্বামীজি—খুব বড় এক সাধু আর কি—ইয়া মাথায় জটা, খুব দাড়ি—"

জেঠাই মা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "পোড়ারমুখো সাধু! তার জটায় আর দাড়িতে আগুন লাগুক, তার বাড়ীতে ঘোড়া মড়া মরুক, উচ্ছন্ন যাক, পিটুলি পোতার ঘাটে যাক্। ড্যাকরা হতচ্ছাড়া, হাড়হাবাতে সে আবার সাধু! তার দেখা পেলে একবার ঝ্যাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে—"

অবিনাশ বাধা দিয়া বলিল, "আহা, থামো থামো জেঠাইমা। হ্যাঁ হে শ্যাম, সে ওষুধটার নাম কি বলতে পার? একবার দেখি যে হারামজাদদের কতদুর আস্পর্দ্ধা। কালই কলকাতায় গিয়ে পুলিস কোর্টে তাদের নামে যদি আমি না কেস্ করি তা হলে ---"

শ্যাম মিত্র বলিল, "সে আয়োজনও আমরা করেছি। আমাদের জমীদার বাবুদের উকীল হয়েছেন গিয়ে মীরগঞ্জের প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী। আমি বাবুদের বলে তাঁর কাছে এক বিবরণ লিখে পাঠিয়ে একটা আর্জ্জির মুসাবিদা করতে বলেছি। করতে কি আর আমরা কসুর করেছি? কি ভয়ানক বলুন দেখি, ফেলারাম ডাক্তার বলে সে শিশিতে আর কিছুই নেই, সুধু আর্সেনিকে ভরা।"

অবিনাশ বলিল, "দেখি নিয়ে এসো তো সেই শিশিটা জেঠাইমা।"

শ্যাম মিত্র অগ্রসর হইয়া শিশিটা জেঠাইমার হাত হইতে লইয়া বলিল, "এই দেখ অবিনাশ দা। ওষুধটা হচ্ছে গিয়ে "জরামৃত" আর সে সাধুট হচ্ছেন গিয়ে স্বামী তীর্থানন্দ। এই যে ছবি রয়েছে—স্বামীজি পাহাড় থেকে নামছেন, আর এক রাজা ওষুধ নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে রয়েছেন।"

ফতাই মণ্ডলের জন্য অবিনাশ যে লণ্ঠনটা আনিয়াছিল, সেটা তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া চিমনিটা ভাঙ্গিয়া গেল। বেদানা ও কিস্‌মিস্ গুলি ছড়াইয়া পড়িল।

শ্যাম মিত্র বলিল, "যাতে সে বেটার পাঁচটি বছর জেল হয়, তারই ব্যবস্থা যদি করতে পার অবিনাশ দা, তবেই বলবো যে হ্যাঁ, তুমি কলকাতায় গিয়ে—"

অবিনাশ বলিল, "জেঠাইমা, পাঁচু এখন একটু সামলেছে তো?"

"হ্যাঁ বাবা, ভাগ্যিস ফেলারাম ডাক্তার ছিল, কাল থেকে একটু বিশেষ হয়েছে বাবা।"

"চলো জেঠাইমা, ঘরে চল।" বলিয়া অবিনাশ মাতালের মত টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে গেল।

৫

কাযের আছিলা করিয়া অবিনাশ সেই রাত্রেই কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

কম্পাউণ্ডার ছোকরাকে ডাকিয়া বলিল "রাইচরণ!"

রাইচরণ তাহার প্রভুর দেরাজের ভিতর হইতে একটী সিগারেট আবিষ্কার করিয়া সেটি সবেমাত্র ধরাইয়াছে, এমন সময়ে সহসা প্রভুর ডাক শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। জ্বলন্ত সিগারেটটি কাপড়ের উপর পড়িয়া কাপড়ের একটা জায়গা পুড়িয়া গেল এবং উরুতেও তাপ লাগিল।

অবিনাশ বলিল, "রাইচরণ, আজকাল তুই যেমন ওষুধ তৈরী করিস, আমার সামনে বসে এক শিশি কর দিকিনি।"

রাইচরণ বলিল, "সে আমি এক ভারি মজা করেছি।"

"কি মজা করেছিস রে?"

কুইনাইনের শিশিটা দেখাইয়া সে বলিল, "এটা তো গুঁড়ো কি না, এটা যেমন এক চামচে করে দিতে বলেছিলেন তা ঠিক দিই। তবে এক চামচের বেশীও এক একবার হয়ে যায়। আর শিশির ওষুধ যে গুলো মিশিয়ে দিতে বলেছিলেন, তারই এক মজার কল আমি তৈরী করেছি।"

"কি রকম মজার কল বল দিকিনি?"

"শিশির ওষুধগুলো দেখতে সবই তো একই রকম কি না, সেই জন্যে সব গুলো একটু একটু করে না মিশিয়ে, সাদা গুঁড়োটার উপর এইটেই সব ঢেলে দিই।" বলিয়া সেই আর্সেনিকের বোতল দেখাইল। "এটী ফুরিয়ে গেলে, আবার এই বোতলটা নিয়ে ঢেলে দেব।" বলিয়া সে নাইট্রো-মিউরিয়েটিক এসিডের বোতল দেখাইল।" এবং বলিল, "আর জলও একটু ঢেলে দিই তাতে।"

একটু থামিয়া রাইচাইরণ বলিল, "প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ শিশি "জরামৃত" এইরকম করে তৈরী করেছি, তার তো সবই পার্শেল হয়ে গিয়েছে। কেবল সাতটী শিশি এখনও আছে।"

অবিনাশ হঠাৎ হাতের ছাতাটা দিয়া রাইচরণের পৃষ্ঠে ধমাস ধমাস করিয়া দুই ঘা বসাইয়া দিল। সে বাপরে বলিয়া ছুটিয়া পাশের ঘরে পলায়ন করিল। অবিনাশের তখন মাথা ঘুরিতেছিল।

চিঠি আসিবার জন্য দ্বারের পার্শ্বে যে বিস্কুটের টিনটী রক্ষিত ছিল, তাহাতে হাত দিয়া অবিনাশ দেখিল মাত্র একখানি চিঠি রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিল মীরগঞ্জ হইতে উকীল প্রিয় বাবু লিখিয়াছেন।

প্রিয় বাবু জানাইয়াছেন যে পাথুরেপোতার বাবুদের একজন কর্ম্মচারীর আত্মীয় 'জরামৃত' সেবন করিয়া মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেজন্য উক্ত বাবুরা জরামৃতের প্রোপ্রাইটারের নামে ফৌজদারী দায়ের করিতে বলিয়াছেন। মীরগঞ্জের নিকট আর একটী স্থানে একটি লোক মৃত্যুমুখ হইতে অনেক চেষ্টায় ফিরিয়াছে এবং জরামৃত সেবন করিয়াই যে তাহার ওরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহাও রাষ্ট্র হইয়াছে। সুতরাং অবিনাশ যদি এখন ও সব ছাড়িয়া দিয়া কোন দূরস্থানে গিয়া আত্মগোপন না করে তাহা হইলে পরিণামের জন্য প্রিয়বাবু দায়ী হইতে পারিবেন না।

পরিণাম যে কি তাহা অবিনাশ উত্তমরূপেই বুঝিল।

জিনিষ পত্র গুছাইয়া রাইচরণকে লইয়া পরদিন প্রাতেই সে রওনা হইল। পাশের দোকানদারগণকে বলিয়া গেল যে পূর্ব্ববঙ্গে এক রাজার চিকিৎসার জন্য সে 'কলে' যাইতেছে, ৫।৭ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে।

শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত।

পৌষ-সংক্রান্তি

(গল্প)

ত্রিবেণীর ঘাটের রাস্তার উপর ঐ যে বৃহৎ আড়ত খানি দেখা যাইতেছে, উহার মালিকের নাম প্রবোধ মিত্র। বিস্তর টাকার কারবার। চাকর মুহুরি কর্ম্মচারী অনেকগুলি ঐ দোকানে প্রতিপালিত হইতেছে। চাউল, ঘি, ময়দা, বেণে মসলা---গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্তই ঐ এক দোকানে পাওয়া যায়। তাহার উপর, চালানী কারবারও আছে—চাউল, দাল প্রভৃতি প্রভুত পরিমাণে দেশের নানা মোকামে এই আড়ত হইতে চালান যায়। তোমরা—যাহারা আজিকালি বলিতেছ, চাকরি করিব না, ব্যবসা করিব; কিন্তু ব্যবসা করিতে গিয়া 'ফেল' মারিতেছ—তোমরা ঐ কারবারটীর ইতিহাস শুনিতে চাও? তবে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এক পৌষ-সংক্রান্তির দিনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাই বলি শুন।

* * * *

শীতের মধ্যাহ্ন। এক যুবক রেল ষ্টেশন হইতে গ্রাম্য পথ দিয়া চলিতেছিল। তাহার হাতে একটি ফুলকপি ও গামছায় বাঁধা কয়েকটি কমলালেবু। কনকনে বাতাসে গাছপালা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছে। মাঝে মাঝে বাঁশবনের মধ্যে পাখীর দল কিচিরমিচির করিতেছে। বনফুলের ঝোপে অগণিত বনফুল ধরিয়া রহিয়াছে। সে-গুলি মৃদু রৌদ্রে সবুজ মাণিকের ন্যায় ঝিকমিক্ করিতেছে। রাস্তার দুই ধারে বাবলাগাছে ফুল ফুটিয়াছে, বাতাস তাহার তীব্রগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেছে। পল্বলগুলি দামে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে জলচর পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে।

যুবক গাছপালায় ঘেরা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিল। পথে দুই একজন লোক তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। সে তাহাদের কথার উত্তর দিয়া, এক দুর্ব্বা-আচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিল; এবং এক ক্ষুদ্র বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

সে 'মা' বলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। বাটীতে দুইখানি খোড়ো ঘর। একখানির রোয়াকে এক প্রৌঢ়া তেলের কড়ায় বেগুনি ফুলুরি প্রভৃতি ভাজিতে-ছিলেন। আর এক ঘরের রোয়াকে এক যুবতী প্রদীপ পরিষ্কার করিতেছিল। যুবককে দেখিয়া প্রৌঢ়া কড়া নামাইয়া আনন্দে উঠানে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমার চাঁদ এসেছে রে! অনেক দিন চিঠি দাওনি বাবা, আমরা কত ভাবছিলাম।"

যুবক মাতার পদধূলি গ্রহণ করিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, নাওয়া খাওয়া হয়েছে?"

যুবক বলিল, "না, মা।"

প্রৌঢ়া ব্যস্ত হইয়া যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বৌমা, প্রবোধকে তেল আর গামছা দাও, আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো ভেজে নিই।"—এই যুবকই এখন পূর্ব্বোক্ত আড়তের মালিক।

প্রবোধ বলিল, "বাবা কোথায়?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "কোথা গেলেন।"

প্রবোধ মাতার মুখের দিকে ভালরূপে চাহিয়া বলিল, "মা, তোমার শরীর ত ভাল নেই, জ্বর এসেছে বোধ হয়?"

মাতা বলিলেন, "ও মেলেরিয়া জ্বর, এখুনি ছেড়ে যাবে।"

প্রবোধ বলিল, "জ্বর গায়ে ওসব কেন করছ? ওদের দাওনা কেন?"

মাতা একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা কি এখন এসব পারে বাবা? ওরা ছেলেমানুষ।"

প্রবোধ বলিল, "ছেলেমানুষ বল্লে হবে কেন, শিখতে হবে ত?"

মাতা পুত্রের কথার উত্তর না দিয়া আবার কড়া চাপাইলেন।

যুবতী একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। শ্বাশুড়ীর আদেশে পা ধুইবার জল, বাটীতে তেল ও গামছা দিল। প্রবোধ পা ধুইয়া তেল মাখিতে বসিল।

এমন সময় হুঁকা টানিতে টানিতে প্রবোধের পিতা পরেশ নগ্নপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। প্রবোধের মাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কতদূর, আর দেরী হলে যে হাট পাব না।"

প্রবোধের মাতা বলিলেন, "ছেলে এসেছে।"

পুত্র পিতাকে প্রণাম করিল। পরেশ বলিলেন, এই যে, বাবাজি, শরীর ভাল ত?"

প্রবোধ বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে শরীর ভাল আছে। কিন্তু কাযের কিছু করতে পারি নি।"

পরেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তা আর কি হয়েছে, বেঁচে থাক, হবেই।" তার পর প্রবোধের মাতাকে বলিলেন, "ছেলেকে খেতে দাও, ওসব রাখ।"

প্রবোধের মাতা বলিলেন, "ছেলে নেয়ে আস্‌তে আস্‌তে আমি সব ঠিক্ করে নেব।"

প্রবোধ বলিল, "মায়ের অসুখ, তার উপর পরিশ্রম করে ওগুলো না ভাজলেই হত। আজ না, হয় হাটে না যেতেন।"

পরেশ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পরিশ্রম বেশী কিছু না। হাটে বেশ দুপয়সা হয়।"

আর কিছু না বলিয়া প্রবোধ স্নান করিতে গেল।

২

পরেশ যখন বাটী ফিরিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। প্রবোধ মায়ের কোলটীতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার স্ত্রী কিছু দূরে ছিল। পরেশ মাথা হইতে শূন্য ডালাটি নামাইয়া, পয়সা বাঁধা চাদরখানি পত্নীর কাছে ফেলিয়া দিলেন। প্রবোধের মাতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া উনান হইতে গরম জলের ঘটি তুলিয়া আনিলেন এবং তাহাতে কিছু ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া স্বামীকে পা ধুইতে দিলেন। প্রবোধ বলিল, "মা, তুমি বস। তোমার বউ ভাত চড়িয়ে দিক।"

মাতা আপত্তি করিলেন, কিন্তু প্রবোধ কিছুতেই শুনিল না।

জলযোগের পর পরেশ হরিনামের মালা লইয়া পত্নী ও পুত্রের কাছে বসিলেন। তাঁহার মালা জপ হইলে প্রবোধ বলিল, "বাবা, শুন্‌ছেন?"

পরেশ বলিলেন, "কি বাবা?"

প্রবোধ বলিল, "আমি আর চাকরি খুঁজতে যাব না। আপনার এই কষ্টের পয়সা খরচ করে আর চাকৃরি খুঁজব না। এতদিন ধরে খুঁজলাম, মিল্‌ল না, আর খোঁজায় দরকার নেই।"

পরেশ বলিলেন, "ব্যস্ত হয়ো না, শীঘ্র কি চাকরি মেলে? দুদিন পরে আবার চেষ্টা করবে। তোমার সঙ্গে যারা পাস হয়েছে তারা সবাই বসে আছে।"

প্রবোধ বলিল, "তাদের বাবাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে হয় না।"

পরেশ হাসিয়া বলিলেন, "এতে আমার কষ্টও নেই লজ্জাও নেই। অনেকে আমায় বলেছিল বটে, কায়স্থ সন্তান হয়ে তুমি মাথায় মোট বইবে? আমি বলেছিলাম, পরের দাসবৃত্তি করার চেয়ে নিজের মোট মাথায় করা আমি ঢের বেশী সম্মানের কায মনে করি।"

প্রবোধ বলিল "আপনায় লজ্জা কষ্ট না থাক্‌তে পারে, আমার বড় কষ্ট হয়।"

পরেশ বলিলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখেছ বাবা, তোমার লজ্জা ত হবেই। যাতে আমার কষ্ট দূর করতে পার, ভগবান তাই করুন।"

প্রবোধ বলিল, "কাল থেকে আমি মাথায় করে বেচতে যাব, আপনি বাড়ীতে থাকবেন।"

পরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "শুনলে পাগলা ছেলের কথা? ইংরাজি লেখাপড়া শিখে, মাথায় করে ফুলুরি বেচতে যাবে—লোকে বলবে কি?"

প্রবোধের মাতা বলিলেন, "তোমার কায হবে বাবা, ব্যস্ত হয়ো না।"

প্রবোধ বলিল, "আমার বাবার যাতে অপমান নেই, আমার তাতে কিসের অপমান? চাকরি হয় ভাল, যতদিন না হয় ততদিন হাটে বেচতে যাব।"

পরেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ীতে বসে' খাবে বলে' আমি তোমার উপর বিরক্ত হব তাই মনে করেছ?"

প্রবোধ দৃঢ়স্বরে বলিল, "কখনই না।"

পরেশ বলিলেন, 'তবে ছেলেমি করো না।"

প্রবোধ আর কিছু বলিল না।

৩

শয়ন গৃহে প্রবোধের স্ত্রী প্রবোধকে বলিল, "তখন বাবাকে কি বলছিলে?"

প্রবোধ বলিল, "বলছিলাম, বাবার মত আমি হাটে বেচতে যাব।"

প্রবোধের স্ত্রী বলিল, "তা তুমি পারবে কেন?"

প্রবোধ বলিল, "বাবার বয়স হয়েছে, তিনি পারছেন, আর আমি পারব না কেন?"

প্রবোধের স্ত্রী বলিল, "পারলেও তাতে আর কত টাকা হব? একটা ভাল মত কায হলে তার চেয়ে ঢের বেশী রোজগার হবে।"

প্রবোধ বলিল, "দেখ, চাকরির ঢের চেষ্টা করেছি। বাবার ঢের পয়সা খরচ করেছি। আর চেষ্টা করব না। বাড়ীতে বসে কিছু যাতে উপায় করতে পারি তার চেষ্টা দেখব। তুমি কি বল?"

প্রবোধের স্ত্রী প্রশান্তমুখে বলিল, "আমরা মেয়ে-মানুষ ওসব আর কি বুঝি! যা ভাল হয় তাই কর।"

ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া মাতা পিতার গলার শব্দ শুনিয়া সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা কি করছেন?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "দেখে এলাম বাবা বেগুনি ফুলুরি ভাজছেন, মা মুড়ির নাড়ু বাঁধছেন।"

প্রবোধ বলিল, "এখন কেন?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "কাল সকালে সংক্রান্তি উপলক্ষে ত্রিবেণীর ঘাটে অনেক লোক হবে। সেইখানে যাবেন।"

প্রবোধ বলিল, "কাল মায়ের জ্বর হয়েছিল, তিনি বাইরে ঠাণ্ডায় আছেন?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "না, পর্দ্দা ফেলা আছে।"

প্রবোধ উঠিয়া গেল।

সে পর্দ্দা সরাইয়া ঢুকিতেই তাহার মাতা পিতা বলিলেন, "এত সকালে কেন উঠলে, বাবা?"

প্রবোধ বলিল, "আর রাত্রি শেষ হয়ে এল।"

পরেশ বলিলেন, "তবে আগুনের কাছে বস।"

প্রবোধ বলিল, "বাবা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব, লোকের ভিড়ে আপনার কষ্ট হবে।"

পরেশ স্মিত মুখে বলিলেন, "কিছু কষ্ট হবে না বাবা, দেখ ত কত শীঘ্র ফিরে আসি।"

একটু থামিয়া পরেশ বলিলেন, "তুমি যদি স্নান করতে যাও, একটু বেলা হলে যেও। তবে পথ অনেকটা, কাল হেঁটে এসেছ, আজ আবার হাঁটলে কষ্ট হবে।'

প্রবোধ বলিল, "না বাবা, আমি যাবই।"

পরেশ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, "ছি, বাবা, আমার কথার অবাধ্য হয়ো না।"

প্রবোধ বলিল, "বাবা, তবে আমি কি করব? আমি আর চাকরি খুঁজতে যাবনা। বাড়ীতে বসে কিছু উপার্জ্জন করতে পারি তার উপায় বলে দিন।"—বলিয়া প্রবোধ মুখখানি অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বৃদ্ধের মন গলিল। বলিলেন, "আচ্ছা যদি-এ বিষয়ে এতই তোমার আগ্রহ হয়ে থাকে, তা হলে চল না হয়।"

প্রবোধ আহ্লাদে পিতার পদধূলি লইল।

যথাসময়ে প্রবোধ নিজ "বাবু" বেশ পরিত্যাগ করিয়া, ফুলুরী প্রভৃতির চাঙারী মাথায় করিয়া, পিতার অনুবর্ত্তী হইল। ত্রিবেণীর ঘাটের নিকট এক বৃক্ষতলে বসিয়া পিতাপুত্রে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। পিতা খুসী হইয়া বলিলেন, অন্যান্য দিনের অপেক্ষা আজ অধিক লাভ হইয়াছে।

উভয়ে তখন স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া

বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রবোধ বলিল, "বাবা, এই টাকাপয়সা গুলি বাড়ী না নিয়ে গিয়ে, আমাদের গ্রামে সহজে বিক্রী হতে পারে এমন কিছু জিনিষ যদি এই ত্রিবেণীর বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাই, তা হলে ত আরও কিছু লাভ হতে পারে।"

পিতা বলিলেন, "ঠিক ত। ঘরে যা আছে তাতে ২।৩দিন এখন আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। তার মধ্যে ও সব জিনিষও বিক্রী করে ফেলতে পারবো।"

উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া, উপযুক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া পিতাপুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিল। চদিন পরে দেখা গেল, ফুলুরী প্রভৃতি তৈরী করিয়া যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, পণ্যদ্রব্যগুলি গ্রামে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ চতুর্গুণ হইয়াছে।

তদবধি পিতাপুত্রে মিলিয়া এইভাবেই ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। দিন দিন টাকা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর ত্রিবেণীর বাজারে ঘর ভাড়া লইয়া মুড়ি, ফুলুরী, বাতাসা, পাটালির দোকান খোলা হইল। তাহার পর চাউল, ডালের দোকান স্থাপিত হইল। প্রবোধ তাহার ইংরাজী বিদ্যাভিমান ভুলিয়া, স্বহস্তে দাঁড়ি পাল্লা ধরিয়া জিনিষ ওজন করিয়া বেচিত। সেই দোকানই কালক্রমে রীতিমত আড়তে পরিণত হইল।

আজ দশ বৎসর হইল প্রবোধের পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিয়াছিলেন, কয়জন বি-এ পাসের পিতা সেরূপ পারেন?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সাহিত্য সমাচার

শোকসংবাদ

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিগত ২৪শে পৌষ সোমবার রাত্রি ৩টার সময়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, তাঁহার বালিগঞ্জ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কোনও বিশেষ পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হন নাই, সারাদিন মৃত্যুর কোন লক্ষণও ছিল না, রাত্রিকালে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থামিয়া যায়। তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল।

সত্যেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৬৪ সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া, বোম্বাই প্রদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। ২৫ বৎসর কাল জজ কার্য্য করিয়া, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পেন্সন গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল। "অমৃত ধনে কে জানেরে," "কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি তাঁহারই রচিত। "মিলে সব ভারতসন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতেরি যশোগান" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি তাঁহার দেশভক্তির পরিচায়ক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা তিনিই প্রথম ভঙ্গ করেন----তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।

সঙ্গীত রচনা ছাড়া "বোম্বাই চিত্র" "বুদ্ধদেব চরিত", ভগবদ্গীতার বঙ্গানুবাদ, মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

———

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অশ্রুকুমার" উপন্যাস যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

———

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম প্রণীত "খেলাঘর" (ইবসেনের Doll's House-এর বঙ্গানুবাদ) প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲

১৪শ বর্ষ—২য় খণ্ড সমাপ্ত

কলিকাতা